www.bari.gov.bd

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই

বিএআরআই উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তির বিবরণী

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

জয়দেবপুর, গাজীপুর

বাংলাদেশ কৃষির আধুনিকায়নের রূপকার
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই

বিএআরআই উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তির বিবরণী

অষ্টম সংস্করণ

সম্পাদনায়

ড. আবুল কালাম আযাদ
ড. মো. আব্দুল ওহাব
ড. মদন গোপাল সাহা
জেবুন নেছা
ড. মো. লুৎফর রহমান
মো. হাসান হাফিজুর রহমান
মো. আল-আমিন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

অষ্টম সংস্করণ
মাঘ ১৪২৫, জানুয়ারি ২০১৯
২,২০০ (দুই হাজার দুইশত) কপি

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

স্বত্ব সংরক্ষিত

মুদ্রণে
বেঙ্গল কম-প্রিন্ট
৬৮/৫, গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১৭১৩০০৯৩৬৫

Correct citation : Azad *et al*., 2019, Edited
KRISHI PROJUKTI HATBOI (Handbook on Agro-Technology), 8th edition
Bangladesh Agricultural Research Institute, Gazipur-1701, Bangladesh

بسم الله الرحمن الرحيم

Minister
Ministry of Agriculture
Government of the People's
Republic of Bangladesh

মন্ত্রী
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

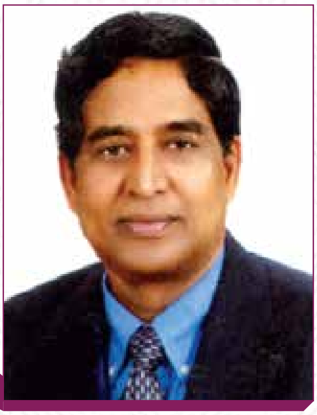

বাণী

বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত সময়োপযোগী পরিকল্পনাসমূহের সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার নিবিড় শস্য উৎপাদন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। কৃষিক্ষেত্রে সময়োপযোগী ও পরিবেশবান্ধব সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দিকে অগ্রসরমান। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সহ ভিশন ২০২১ ও ২০৪১ অর্জনে দেশ ইতোমধ্যে দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে।

সরকার দীর্ঘমেয়াদী খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পর্যায়ে বীজ, সার, সেচ, কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্য করেছে। এছাড়া ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, শস্য বহুমুখীকরণ, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন, লাভজনক, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই কৃষি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ফলে দেশের কৃষি উৎপাদন বেড়েছে এবং পেশা হিসেবে কৃষি জীবিকা নির্বাহের স্তর থেকে বাণিজ্যিক স্তরে উন্নীত হচ্ছে। উন্নয়নের ধারাকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের যথাযথ প্রয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য লাগসই প্রযুক্তিসমূহ কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসম্বলিত **কৃষি প্রযুক্তি হাতবই**-এর ৮ম সংস্করণ বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি মনে করি প্রযুক্তি হস্তান্তরে **কৃষি প্রযুক্তি হাতবই**-এর মতো প্রকাশনার গুরুত্ব অপরিসীম।

এ পুস্তকটি প্রথম ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে সকলের নিকট বেশ সমাদৃত হয় এবং এর ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। আশা করি, আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে লেখা **কৃষি প্রযুক্তি হাতবই** এর ৮ম সংস্করণ কৃষি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের চাহিদা পূরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে এবং কৃষি উৎপাদনে নতুন গতির সঞ্চার করবে।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই-এর ৮ম সংস্করণ প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হোক এ কামনা করছি। এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, এমপি

Secretary In Charge
Ministry of Agriculture
Government of the People's
Republic of Bangladesh

ভারপ্রাপ্ত সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ আজ অপ্রতিরোধ্য। আর উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রায় অন্যতম চালিকাশক্তি কৃষি। বর্তমান সরকারের বাস্তবধর্মী কৃষিবান্ধব কর্মসূচী ও কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। কৃষি খাতে উন্নয়নের এ ধারাকে অব্যাহত রাখতে গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে অধিক গুরুত্ব প্রদান অপরিহার্য। দেশে কৃষি জমির পরিমাণ প্রতিনিয়তই কমলেও বাড়ছে আমাদের জনসংখ্যা। বর্ধিত এ জনসংখ্যা আগামী দিনের খাদ্য যোগানের ক্ষেত্রে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এমতাবস্থায়, এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু নতুন নতুন জাত ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন জরুরি।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিজ্ঞানীগণ প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ফসলের নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করছে। প্রতিষ্ঠানটি তাদের উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসম্বলিত **কৃষি প্রযুক্তি হাতবই**-এর ৮ম সংস্করণ বর্ধিত কলেবরে প্রকাশ করছে। এ পুস্তকে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ অত্যন্ত সহজ ভাষায় প্যাকেজ আকারে স্থান পেয়েছে যা ব্যবহারকারীগণ অনায়াসে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন। কৃষি প্রযুক্তি প্রয়োগকারীদের কাছে এ বইয়ের ব্যাপক চাহিদাও রয়েছে। এ ছাড়া বইটিতে নতুন অনেক প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ব্যবহারকারীরা সমধিক উপকৃত হবেন মর্মে আশা করি।

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রায়োগিক প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হলে প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রমকে বেগবান করতে হবে। প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রকাশনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই-এর ৮ম সংস্করণ প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হোক এ কামনা করি। প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

মোঃ নাসিরুজ্জামান

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট

মুখবন্ধ

বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের ঐকান্তিক চেষ্টার ফসল হিসেবে বিশ্বের বুকে দেশের মানুষ আজ মাথা উঁচু করে বলতে পারে বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কৃষির এই অগ্রযাত্রায় দেশের সর্ববৃহৎ বহুবিধ ফসল ভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। দেশের খাদ্য উৎপাদন ও পুষ্টির নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই নিরলসভাবে গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে আসছে অত্র ইনস্টিটিউট এর বিজ্ঞানীগণ। বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের সচিত্র প্রকাশনা হলো **কৃষি প্রযুক্তি হাতবই**। ১৯৯৯ সালে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই এর ব্যাপক চাহিদা পরিলক্ষিত হয় এবং পরবর্তীতে আরও ৬টি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বইটির ৮ম সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

এ বইটিতে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ প্যাকেজ আকারে স্থান পেয়েছে যা কৃষকসহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য খুবই উপযোগী। **কৃষি প্রযুক্তি হাতবই**-এর ৮ম সংস্করণ পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রযুক্তি ও তথ্যসমৃদ্ধ হওয়ায় এর কলেবর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আশা করি, বইটির এ সংস্করণ গবেষক, কৃষক, সম্প্রসারণবিদ ও এনজিওকর্মীসহ কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে এবং সকলেই উপকৃত হবেন।

কৃষি প্রযুক্তি হাতবই প্রকাশের উদ্দেশ্য সফল হোক এই কামনা করছি। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের সঙ্গে জড়িত বিজ্ঞানীদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। বইটির সংকলন ও সম্পাদনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। পরিশেষে, বইটির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে বলে আশা করি।

ড. আবুল কালাম আযাদ

ভূমিকা

'প্রযুক্তি' শব্দটি অহরহ ব্যবহৃত হলেও এর সর্বজনস্বীকৃত কোন সংজ্ঞা এখনও তৈরি হয়নি। শিল্প বিপ্লবকে কেন্দ্র করে এ শব্দের উৎপত্তি হয়েছিল। প্রথম দিকে কেবল শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের কৌশলকে বোঝাতে প্রযুক্তি (Technology) শব্দটি ব্যবহার করা হতো। কালক্রমে এর ধারণা ও ব্যবহারের ব্যাপ্তি ঘটেছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সকল ক্ষেত্রেই প্রযুক্তির ব্যবহার হয়ে থাকে। ব্যাপক অর্থে, এখন আমরা প্রযুক্তি বলতে সেইসব কারিগরি বা বিজ্ঞানভিত্তিক কৌশল ও প্রক্রিয়াকে বুঝে থাকি যেগুলো ব্যবহার করে কোনো না কোনভাবে উপকৃত হওয়া যায়। স্বাভাবিক কারণেই প্রযুক্তির মধ্যে বৈচিত্র খুব বেশি। ভাল বলে বিবেচিত হতে হলে প্রতিটি প্রযুক্তির নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়।

- বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।
- স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষিত।
- ব্যবহার সর্বাবস্থায় লাভজনক এবং উপকারিতা মাপযোগ্য (Measurable)।
- ব্যবহার পদ্ধতি সহজ, আংশিক সংশোধনযোগ্য (Flexible) ও কম ব্যয়বহুল।
- স্থিতিশীল/স্থায়ীত্বসম্পন্ন (Sustainable) এবং বৃহৎ এলাকার জনগোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহারযোগ্য।

যে কোনো একটি ফসলের উৎপাদনের শুরু থেকে এর ব্যবহার পর্যন্ত অনেকগুলো কাজ করতে হয়, যথা- জমি তৈরি, বীজ বপন/রোপণ, সার প্রয়োগ, সেচ দেওয়া, অন্তর্বর্তী পরিচর্যা, পোকা ও রোগ দমন, ফসল সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ (মাড়াই, শুকানো, গ্রেডিং বা শ্রেণিবিদ্ধকরণ, শোধন), সংরক্ষণ ইত্যাদি। এসব কাজের প্রতিটিই একাধিক পদ্ধতিতে করা যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এগুলো করার উন্নত কৌশল/পদ্ধতি উদ্ভাবন ফসল গবেষণার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। যদি নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, একটি বিশেষ সময়ে কোন ফসল বুনলে পূর্বে বা পরে বোনা অপেক্ষা বেশি ফলন পাওয়া যায় তাহলে এক্ষেত্রে এ তথ্যটিই একটি প্রযুক্তি। এভাবে ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর পর্যায়ের প্রতিটি কাজের জন্যই উন্নত পদ্ধতি বা প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা যেতে পারে। এগুলোকে বলা হয় 'অংশ প্রযুক্তি' (Component technology)। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আওতাধীন প্রধান প্রধান ফসলের উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনার জন্য অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'অংশ প্রযুক্তি' উদ্ভাবিত হয়েছে যা বিভিন্ন পুস্তক, পুস্তিকা ও প্রতিবেদনে বর্ণিত হয়েছে। একই ফসলের প্রতিটি অংশ প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপাদনের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব।

ফসল উৎপাদনে আরেক ধরনের প্রযুক্তি আছে যেগুলোকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। ফসলের উন্নত জাত, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ এ অর্থে যে, এদের প্রয়োগের উপকারিতা সম্পূর্ণরূপে অন্যান্য প্রযুক্তির উপর সরাসরি নির্ভরশীল নয়। ক্ষেত্র বিশেষে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অংশ প্রযুক্তির ব্যবধান সুস্পষ্ট নয়। বাংলাদেশে একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে, প্রযুক্তি হবে এমন যা ব্যবহার করলে বিদ্যমান অবস্থার দ্রুত ও নাটকীয় উন্নতি সাধিত হবে, যেমন হয়েছিল ধান, আলু, ভুট্টা ইত্যাদির উচ্চ ফলনশীল জাত প্রবর্তনের ফলে। বাস্তবে প্রতিটি প্রযুক্তি এরূপ হওয়া সম্ভব নয়, কারণ ফসলের ফলন ও মানের উৎকর্ষতা সীমাহীন নয়। কৃষির সার্বিক উন্নতির জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রযুক্তির উপর নির্ভর করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

কৃষি বিষয়ক প্রযুক্তি মূলত দু'রকমের, যথা- বস্তু (Material) এবং তথ্য (Information)। প্রযুক্তি স্থানীয় গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত হতে পারে কিংবা সরাসরি বিদেশ থেকে আসতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রযুক্তি সুপারিশ করা সম্ভব। বর্তমান পুস্তকে যেসব প্রযুক্তি পরিবেশিত হয়েছে সেগুলোকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে।

ফসলের উন্নত জাত: প্রতিটি ফসলেরই অনেক জাত আছে যেগুলোর মধ্যে ফলনশীলতা, পরিবেশগত উপযোগিতা, পোকা ও রোগ বালাই প্রতিরোধ ক্ষমতা, দৈহিক বৈশিষ্ট্য (আকার, আকৃতি ও বর্ণ), পুষ্টিমান, খাদ্যগুণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ যোগ্যতা ইত্যাদির দিক দিয়ে প্রচুর বিভিন্নতা বিদ্যমান। সাধারণভাবে, একই জাতে সকল বৈশিষ্ট্যের সর্বোৎকৃষ্ট সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয় না। যদি কোন নতুন উদ্ভাবিত জাত এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্যে প্রচলিত জাত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয় তাহলে আমরা সেটাকে উন্নত জাত বলে থাকি। ধরা যাক, সরিষার একটি নতুন জাতের বীজে প্রচলিত অন্যান্য জাতের তুলনায় শতকরা তিন ভাগ বেশি তেল আছে। ফলন বেশি না হলেও এ জাতের চাষ করে কৃষকরা লাভবান হবেন তা সহজেই অনুমেয়।

ফসল উৎপাদন ও ব্যবহারের নতুন/উন্নত পদ্ধতি বা কৌশল: ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফসলের উৎপাদন ও ব্যবহারের প্রক্রিয়া কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে সম্পূর্ণ হয় এবং কাজগুলো করার উন্নত পদ্ধতি/কৌশলকে আমরা 'অংশ প্রযুক্তি' বলে থাকি। একই ফসলে সবগুলো অংশ প্রযুক্তি মিলে সেই ফসল উৎপাদন ও ব্যবহারের সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি তৈরি হয়। যেহেতু অংশ প্রযুক্তি সংখ্যায় অনেক, সেগুলো এ পুস্তকে (হাতবই) লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ফসল উৎপাদন, বীজ উৎপাদন এবং ব্যবহার বিষয়ে উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মধ্যে যেগুলো মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং যেসব অংশ প্রযুক্তি ব্যবহার করে কৃষকরা কোনো না কোনো সমস্যার সমাধান করতে কিংবা তাদের আয় বাড়াতে পারবেন কেবল সেগুলোই এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে।

উন্নত ফসল বিন্যাস (Cropping Systems): বাংলাদেশের মোট চাষাধীন (Cultivated) জমির শতকরা ৩৪ ভাগ এক ফসলি, ৫৩ ভাগ দু'ফসলি এবং ১৩ ভাগ তিন ফসলি। প্রথমোক্ত শ্রেণির জমিতে চাষযোগ্য ফসলের সংখ্যা সীমিত, কিন্তু অপর দু'টির বেলায় প্রত্যেক মৌসুমে বিভিন্ন প্রকার ফসল জন্মানো সম্ভব। একই জমিতে বছরের বিভিন্ন সময় কোন কোন ফসল কি ক্রম অনুযায়ী চাষ করলে কৃষক ও দেশের জন্য সবচেয়ে লাভজনক তা গবেষণার মাধ্যমে নির্ণয় করা সম্ভব। দেশের কয়েকটি এলাকার জন্য এটা নির্ণয় করা হয়েছে। জমির সর্বাধিক লাভজনক ও স্থিতিশীল (Sustainable) ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য সাম্প্রতিক কালে একাধিক ফসল একই সময় সাথী ফসল হিসাবে চাষ করার পদ্ধতি (Intercropping and mixed cropping) উদ্ভাবিত হয়েছে। উন্নত ফসল বিন্যাস তাই ফসল উৎপাদন প্রযুক্তির পর্যায়ভুক্ত।

যন্ত্রপাতি: ফসল উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। যদি এমন কোনো নতুন যন্ত্র আবিষ্কার করা যায় যার দ্বারা কম খরচে অল্প সময়ে এবং অধিক দক্ষতার সাথে কাজ সমাধা হয় তাহলে তা অবশ্যই একটি প্রযুক্তি। প্রচলিত যন্ত্রপাতির উন্নত সংস্করণ উদ্ভাবনও নতুন প্রযুক্তি।

অন্যান্য প্রযুক্তি: এমন কিছু প্রযুক্তি আছে যেগুলো উপরে বর্ণিত কোন শ্রেণিতে পড়েনা, অথচ এগুলোর ব্যবহার দ্বারা কৃষকরা অনেক ভাবে উপকৃত হতে পারেন। ধরা যাক, একখণ্ড জমিতে একটি বিশেষ সময়ে 'ক, খ এবং গ'-এ তিনটি ফসলের যেকোনটির চাষ করা সম্ভব। গবেষণায় যদি দেখা যায়, ফসল 'খ' এর চাষ করলে কৃষক কম পুঁজি খরচ করে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবেন তাহলে এক্ষেত্রে এ তথ্যটিই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। এ ধরনের আরও গবেষণালব্ধ তথ্য আছে যেগুলোকে প্রযুক্তি হিসেবে গণ্য করা যায়। তাই বলা যায়, গবেষণালব্ধ যে কোন বস্তু বা তথ্য যার দ্বারা কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা কোনো না কোনভাবে উপকৃত হতে পারেন তাই কৃষি প্রযুক্তি।

যেসব ফসল ও বিষয়ের উপর গবেষণার দায়িত্ব বিএআরআই এর উপর ন্যস্ত তার সংখ্যা অনেক। এমন বহু গৌণ ফসল আছে সেগুলোর উপর এখন পর্যন্ত কোন গবেষণাই হয়নি। তবে মুখ্য অথবা গৌণ যে কোন ফসল উৎপাদনে সমস্যা দেখা দিলে সেগুলো অনুসন্ধান করে যথাযথ সমাধান বলে দেওয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভব। বিএআরআই-এর কাছে ছোট বড় অনেক প্রযুক্তি আছে। একটি পুস্তকে সবগুলো পরিবেশন করা সম্ভব নয়। কৃষি প্রযুক্তি হাতবইয়ে বেছে বেছে কেবল সেসব প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলোর মাধ্যমে কৃষকরা তাৎক্ষণিকভাবে ও উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উপকৃত হতে পারবেন।

প্রযুক্তি হাতবই এর বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য অন্যান্য সাধারণ বই পুস্তক থেকে ভিন্ন। প্রযুক্তির বিবরণ কিভাবে পরিবেশন করলে পাঠকরা তা সহজে বুঝতে ও ব্যবহার করতে পারবেন সে বিষয়ে আমাদের দ্বিধা রয়ে গেছে। তাই বইটির দোষত্রুটি উল্লেখ করে এর পরিবেশনার ধরন উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দিতে পাঠকদের প্রতি আমাদের অনুরোধ রইল যাতে পরবর্তী সংস্করণে এটিকে আরো সহজবোধ্য করা যায়।

বিষয়-সূচি

কন্দাল ফসল ১
আলু ১
আলুর জাত ১
বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা) ১
বারি আলু-২৫ (এসটেরিক্স) ২
বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা) ২
বারি আলু-২৯ (কারেজ) ২
বারি আলু-৩৪ (লরা) ৩
বারি আলু-৩৫ .... ৩
বারি আলু-৩৬ .... ৪
বারি আলু-৪০ .... ৪
বারি আলু-৪১ .... ৫
বারি আলু-৪৬ .... ৫
বারি আলু-৪৮ .... ৬
বারি আলু-৫৩ .... ৬
বারি আলু-৫৪ (মিউজিকা) ৭
বারি আলু-৫৬ .... ৭
বারি আলু-৫৭ .... ৮
বারি আলু-৬২ .... ৮
বারি আলু-৬৩ .... ৯
বারি আলু-৬৬ (পামেলা) ৯
বারি আলু-৬৮ (আটলানটিক) ১০
বারি আলু-৭০ (ডেসটিনি) ১০
বারি আলু-৭২ .... ১১
বারি আলু-৭৩ .... ১১
বারি আলু-৭৪ (বারসেলোনা) ১২
বারি আলু-৭৫ (মন্টেকার্লো) ১২
বারি আলু-৭৬ (কারুসো) ১৩
বারি আলু-৭৭ (সার্পো মিরা) ১৩
বারি আলু-৭৮ (সিআইপি-১১২) ১৪
বারি আলু-৭৯ (সিআইপি-১২৬) ১৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৫
মিষ্টি আলু ২৮
বারি মিষ্টি আলু-২ (কমলা সুন্দরী) ২৮
বারি মিষ্টি আলু-৪ .... ২৯
বারি মিষ্টি আলু-৫ .... ২৯
বারি মিষ্টি আলু-৮ .... ২৯
বারি মিষ্টি আলু-১১ .... ৩০
বারি মিষ্টি আলু-১২ .... ৩০
বারি মিষ্টি আলু-১৩ .... ৩০
বারি মিষ্টি আলু-১৪ .... ৩১
বারি মিষ্টি আলু-১৫ .... ৩১
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩১
মিষ্টি আলুর অন্যান্য পরিচর্যা ৩৩
কচু ৩৬
পানি কচুর জাত ৩৬
লতিরাজ (বারি পানি কচু-১) ৩৬
বারি পানি কচু-২ .... ৩৬
বারি পানি কচু-৩ .... ৩৬
বারি পানি কচু-৪ .... ৩৭
বারি পানি কচু-৫ .... ৩৭
বারি পানি কচু-৬ .... ৩৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৭
অন্যান্য পরিচর্যা ৩৮
মুখী কচু ৪২
মুখী কচুর জাত ৪২
বিলাসী ৪২
বারি মুখী কচু-২ .... ৪২
উৎপাদন প্রযুক্তি ৪২
ওলকচু ৪৪
ওলকচুর জাত ৪৪
বারি ওলকচু-১ .... ৪৪
বারি ওলকচু-২ .... ৪৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ৪৫

ডাল ফসল ৪৭
খেসারী ৪৭
খেসারীর জাত ৪৮
বারি খেসারী-১ .... ৪৮
বারি খেসারী-২ .... ৪৮
বারি খেসারী-৩ .... ৪৮
বারি খেসারী-৪ .... ৪৮
বারি খেসারী-৫ .... ৪৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ৪৯
অন্যান্য পরিচর্যা ৫০
মসুর ৫১
মসুরের জাত ৫১
বারি মসুর-১ .... ৫১
বারি মসুর-২ .... ৫১
বারি মসুর-৩ .... ৫১
বারি মসুর-৪ .... ৫২
বারি মসুর-৫ .... ৫২
বারি মসুর-৬ .... ৫২
বারি মসুর-৭ .... ৫৩
বারি মসুর-৮ .... ৫৩
বারি মসুর-৯ .... ৫৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ৫৪
অন্যান্য পরিচর্যা ৫৫
রোপা আমন ধানের সাথে মসুরের সাথী ফসল চাষ ৫৮
শুষ্ক ভূমি অঞ্চলে প্রাইম পদ্ধতিতে মসুর চাষ ৫৯

বিষয়-সূচি

মসুরের স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট (পাতা ঝলসানো) রোগ দমন ব্যবস্থাপনা ৬০
সংরক্ষণ কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে ধানী জমিতে মসুর চাষ ৬০
ছোলা ৬১
ছোলার জাত ৬১
বারি ছোলা-২ (বড়াল) ৬১
বারি ছোলা-৩ (বরেন্দ্র) ৬২
বারি ছোলা-৪ (জোড়াফুল) ৬২
বারি ছোলা-৫ (পাবনাই) ৬২
বারি ছোলা-৬ (নাভারুন) ৬৩
বারি ছোলা-৭ .... ৬৩
বারি ছোলা-৮ .... ৬৩
বারি ছোলা-৯ .... ৬৪
বারি ছোলা-১০ .... ৬৪
বারি ছোলা-১১ .... ৬৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ৬৫
মাসকলাই ৬৮
মাসকলাইয়ের জাত ৬৮
বারি মাস-১ .... ৬৮
বারি মাস-২ (শরৎ) ৬৮
বারি মাস-৩ (হেমন্ত) ৬৯
বারি মাস-৪ .... ৬৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ৭০
মুগ ৭৩
মুগের জাত ৭৩
বারি মুগ-২ (কান্তি) ৭৩
বারি মুগ-৩ (প্রগতি) ৭৪
বারি মুগ-৪ (রূপসা) ৭৪
বারি মুগ-৫ (তাইওয়ানী) ৭৪
বারি মুগ-৬ .... ৭৪
বারি মুগ-৭ .... ৭৫
বারি মুগ-৮ .... ৭৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ৭৫
পাহাড়ের পাদদেশে সরিষা কর্তনের পর খরিফ-১ মৌসুমে 'বারি মুগ-৬' এর চাষ ৮১
ফেলন ৮১
ফেলনের জাত ৮১
বারি ফেলন-১ (বোস্তামী) ৮১
বারি ফেলন-২ .... ৮১
উৎপাদন প্রযুক্তি ৮২
অন্যান্য পরিচর্যা ৮২
মটর ৮৩
বারি মটর-১ .... ৮৩
বারি মটর-২ .... ৮৩
বারি মটর-৩ .... ৮৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ৮৫
তেল ফসল ৮৮
সরিষা ৮৮
সরিষার জাত ৮৮
টরি-৭ .... ৮৮
সোনালী সরিষা (এসএস-৭৫) ৮৯
কল্যাণীয়া (টিএস-৭২) ৮৯
দৌলত (আরএস-৮১) ৮৯
রাই-৫ .... ৯০
বারি সরিষা-৬ (ধলি) ৯০
বারি সরিষা-৭ (ন্যাপাস-৩১৪২) ৯০
বারি সরিষা-৮ (ন্যাপাস-৮৫০৯) ৯১
বারি সরিষা-৯ .... ৯১
বারি সরিষা-১০ .... ৯১
বারি সরিষা-১১ .... ৯২
বারি সরিষা-১২ .... ৯২
বারি সরিষা-১৩ .... ৯২
বারি সরিষা-১৪ .... ৯৩
বারি সরিষা-১৫ .... ৯৩
বারি সরিষা-১৬ .... ৯৩
বারি সরিষা-১৭ .... ৯৪
বারি সরিষা-১৮ (ক্যানোলা টাইপ) ৯৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ৯৪
অন্যান্য পরিচর্যা ৯৬
তিল ৯৭
তিলের জাত ৯৮
টি-৬ .... ৯৮
বারি তিল-২ .... ৯৮
বারি তিল-৩ .... ৯৮
বারি তিল-৪ .... ৯৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ৯৯
অন্যান্য পরিচর্যা ১০০
চীনাবাদাম ১০২
চীনাবাদামের জাত ১০২
মাইজচর বাদাম (ঢাকা-১) ১০২
বাসন্তী বাদাম (ডিজি-২) ১০২
ঝিঙ্গা বাদাম (এসিসি-১২) ১০৩
ত্রিদানা বাদাম (ডিএম-১) ১০৩
বারি চীনাবাদাম-৫ .... ১০৩
বারি চীনাবাদাম-৬ .... ১০৩
বারি চীনাবাদাম-৭ .... ১০৪
বারি চীনাবাদাম-৮ .... ১০৪
বারি চীনাবাদাম-৯ .... ১০৪
বারি চীনাবাদাম-১০ (উফশী) ১০৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ১০৫
অন্যান্য পরিচর্যা ১০৬

বিষয়-সূচি

সূর্যমুখী ১০৯
সূর্যমুখীর জাত ১০৯
কিরণী (ডি এস-১) ১০৯
বারি সূর্যমুখী-২ .... ১০৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ১০৯
অন্যান্য পরিচর্যা ১১০
সয়াবিন ১১২
সয়াবিনের জাত ১১২
সোহাগ (পিবি-১) ১১২
বাংলাদেশ সয়াবিন-৪ (জি-২) ১১২
বারি সয়াবিন-৫ .... ১১২
বারি সয়াবিন-৬ .... ১১৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ১১৩
অন্যান্য পরিচর্যা ১১৪
গর্জন তিল ১১৫
গর্জন তিলের জাত ১১৫
শোভা ১১৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ১১৫
অন্যান্য পরিচর্যা ১১৫
তিসি ১১৬
তিসির জাত ১১৬
নীলা ১১৬
উৎপাদন প্রযুক্তি ১১৬

সবজি ফসল ১১৭
টমেটো ১১৭
টমেটোর জাত ১১৮
বারি টমেটো-১ (মানিক) ১১৮
বারি টমেটো-২ (রতন) ১১৮
বারি টমেটো-৩ .... ১১৮
বারি টমেটো-৪ .... ১১৮
বারি টমেটো-৫ .... ১১৯
বারি টমেটো-৬ (চৈতী) ১১৯
বারি টমেটো-৭ (অপূর্ব) ১১৯
বারি টমেটো-৮ (শিলা) ১১৯
বারি টমেটো-৯ (লালিমা) ১২০
বারি টমেটো-১০ (অনুপমা) ১২০
বারি টমেটো-১১ (ঝুমকা) ১২০
বারি টমেটো-১৪ .... ১২১
বারি টমেটো-১৫ .... ১২১
বারি টমেটো-১৬ .... ১২১
বারি টমেটো-১৭ .... ১২১
বারি টমেটো-১৮ .... ১২১
বারি টমেটো-১৯ .... ১২১
উৎপাদন প্রযুক্তি ১২২
পরবর্তী পরিচর্যা ১২৩
বারি হাইব্রিড টমেটো-৪ (গ্রীষ্মকালীন) ১২৩
বারি হাইব্রিড টমেটো-৫ .... ১২৪
বারি হাইব্রিড টমেটো-৮ (গ্রীষ্মকালীন) ১২৪
বারি হাইব্রিড টমেটো-৯ .... ১২৪
বারি হাইব্রিড টমেটো-১০ .... ১২৪
বারি হাইব্রিড টমেটো-১১ .... ১২৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ১২৫
বেগুন ১২৬
বেগুনের জাত ১২৬
বারি বেগুন-১ (উত্তরা) ১২৬
বারি হাইব্রিড বেগুন-২ (তারাপুরী) ১২৭
বারি বেগুন-৪ (কাজলা) ১২৭
বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা) ১২৭
বারি বেগুন-৬ .... ১২৭
বারি বেগুন-৭ .... ১২৮
বারি বেগুন-৮ .... ১২৮
বারি বেগুন-৯ .... ১২৮
বারি বেগুন-১০ .... ১২৮
বারি হাইব্রিড বেগুন-৩ .... ১২৮
বারি হাইব্রিড বেগুন-৪ .... ১২৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ১২৯
বিটি বেগুন ১৩৩
বিটি বেগুনের জাত ১৩৩
বারি বিটি বেগুন-১ .... ১৩৩
বারি বিটি বেগুন-২ .... ১৩৩
বারি বিটি বেগুন-৩ .... ১৩৩
বারি বিটি বেগুন-৪ .... ১৩৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৩৩
মুলা ১৩৯
মুলার জাত ১৩৯
বারি মুলা-১ (তাসাকীসান) ১৩৯
বারি মুলা-২ (পিংকী) ১৩৯
বারি মুলা-৩ (দ্রুতি) ১৪০
বারি মুলা-৪ .... ১৪০
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৪০
শিম ১৪১
শিমের জাত ১৪১
বারি শিম-১ .... ১৪১
বারি শিম-২ .... ১৪১
বারি শিম-৩ (গ্রীষ্মকালীন) ১৪২
বারি শিম-৪ .... ১৪২
বারি শিম-৫ .... ১৪২
বারি শিম-৬ .... ১৪২
বারি শিম-৭ .... ১৪২

বিষয়-সূচি

বারি শিম-৮ .... ১৪৩
বারি শিম-৯ (খাইস্যা) ১৪৩
বারি শিম-১০ (খাইস্যা) ১৪৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৪৩
জ্যাক শিম ১৪৫
বারি জ্যাক শিম-১ .... ১৪৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৪৫
ঝাড় শিম ১৪৬
ঝাড় শিমের জাত ১৪৬
বারি ঝাড় শিম-১ (ফরাসী শিম) ১৪৬
বারি ঝাড় শিম-২ .... ১৪৬
বারি ঝাড় শিম-৩ (খাইস্যা) ১৪৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৪৭
মটরশুঁটি ১৪৮
মটরশুঁটির জাত ১৪৮
বারি মটরশুঁটি-১ .... ১৪৮
বারি মটরশুঁটি-২ .... ১৪৮
বারি মটরশুঁটি-৩ .... ১৪৮
চিচিঙ্গা ১৪৯
চিচিঙ্গার জাত ১৪৯
বারি চিচিঙ্গা-১ .... ১৪৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৪৯
অন্যান্য পরিচর্যা ১৫০
ফুলকপি ১৫২
ফুলকপির জাত ১৫২
বারি ফুলকপি-১ (রূপা) ১৫২
বারি ফুলকপি-২ .... ১৫২
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৫২
বাঁধাকপি ১৫৪
বাঁধাকপির জাত ১৫৪
বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী) ১৫৪
বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত) ১৫৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৫৪
চীনাকপি ১৫৫
চীনাকপির জাত ১৫৫
বারি চীনাকপি-১ .... ১৫৫
লালশাক ১৫৫
লালশাকের জাত ১৫৫
বারি লালশাক-১ .... ১৫৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৫৫
বারি চীনাশাক ১৫৬
বারি বাটিশাক ১৫৬
বাটিশাক ও চীনাশাকের উৎপাদন প্রযুক্তি ১৫৬
মিষ্টি কুমড়া শাক উৎপাদন প্রযুক্তি ১৫৭
গীমাকলমি ১৫৮
গীমাকলমির জাত ১৫৮
বারি গীমাকলমি-১ .... ১৫৮
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৫৮
ঢেঁড়স ১৫৮
ঢেঁড়সের জাত ১৫৮
বারি ঢেঁড়স-১ .... ১৫৮
বারি ঢেঁড়স-২ .... ১৫৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৫৯
লাউ ১৬০
লাউয়ের জাত ১৬০
বারি লাউ-১ .... ১৬০
বারি লাউ-২ .... ১৬০
বারি লাউ-৩ .... ১৬০
বারি লাউ-৪ .... ১৬১
বারি লাউ-৫ .... ১৬১
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৬১
সীতা লাউ ১৬৪
সীতা লাউয়ের জাত ১৬৪
বারি সীতা লাউ-১ .... ১৬৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৬৪
মিষ্টি কুমড়া ১৬৫
মিষ্টি কুমড়ার জাত ১৬৫
বারি মিষ্টি কুমড়া-১ .... ১৬৫
বারি মিষ্টি কুমড়া-২ .... ১৬৫
বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া-১ .... ১৬৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৬৫
ঝিঙ্গা ১৬৮
ঝিঙ্গার জাত ১৬৮
বারি ঝিঙ্গা-১ .... ১৬৮
বারি ঝিঙ্গা-২ .... ১৬৮
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৬৮
লেটুস ১৭০
লেটুসের জাত ১৭০
বারি লেটুস-১ .... ১৭০
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৭০
বরবটি ১৭১
বরবটির জাত ১৭১
বারি বরবটি-১ .... ১৭১
করলা ১৭১
করলার জাত ১৭১
বারি করলা-১ .... ১৭১
বারি করলা-২ .... ১৭১
বারি করলা-৩ .... ১৭১
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৭২
চালকুমড়া ১৭৩

বিষয়-সূচি

চালকুমড়ার জাত ১৭৩
বারি চালকুমড়া-১ .... ১৭৩
পটল ১৭৩
পটলের জাত ১৭৩
বারি পটল-১ .... ১৭৩
বারি পটল-২ .... ১৭৩
হাইব্রিড পটলের জাত ১৭৪
বারি হাইব্রিড পটল-১ .... ১৭৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৭৪
পুঁইশাক ১৭৫
পুঁইশাকের জাত ১৭৫
বারি পুঁইশাক-১ .... ১৭৫
বারি পুঁইশাক-২ .... ১৭৫
ডাঁটা ১৭৬
ডাঁটার জাত ১৭৬
বারি ডাঁটা-১ (লাবণী) ১৭৬
বারি ডাঁটা-২ .... ১৭৬
সবুজ ডাঁটা শাকের জাত ১৭৬
বারি সবুজ ডাঁটা শাক-১ .... ১৭৬
মিষ্টি মরিচ ১৭৭
মিষ্টি মরিচের জাত ১৭৭
বারি মিষ্টি মরিচ-১ .... ১৭৭
বারি মিষ্টি মরিচ-২ .... ১৭৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৭৭
চিনাল ১৭৮
বারি চিনাল-১ .... ১৭৮
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৭৯
ব্রোকলি ১৭৯
বারি ব্রোকলি-১ .... ১৭৯
কামরাঙ্গা শিম ১৮০
বারি কামরাঙ্গা শিম-১ .... ১৮০
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৮০
পালংশাক ১৮১
বারি পালংশাক-১ .... ১৮১
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৮১
স্কোয়াশ ১৮১
স্কোয়াশের জাত ১৮১
বারি স্কোয়াশ-১ .... ১৮১
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৮১

ফল ফসল ১৮৩
আম ১৮৩
আমের জাত ১৮৪
বারি আম-১ (মহানন্দা) ১৮৪
বারি আম-২ .... ১৮৪
বারি আম-৩ .... ১৮৪
বারি আম-৪ (হাইব্রিড) ১৮৫
বারি আম-৫ .... ১৮৫
বারি আম-৬ .... ১৮৫
বারি আম-৭ .... ১৮৫
বারি আম-৮ .... ১৮৬
বারি আম-৯ (কাঁচা মিঠা) ১৮৬
বারি আম-১০ .... ১৮৬
বারি আম-১১ .... ১৮৬
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৮৭
অন্যান্য পরিচর্যা ১৮৮
অন্যান্য প্রযুক্তি ১৮৮
নিরাপদ, বিষমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি ১৮৯
কাঁঠাল ১৯০
কাঁঠালের জাত ১৯০
বারি কাঁঠাল-১ .... ১৯০
বারি কাঁঠাল-২ .... ১৯১
বারি কাঁঠাল-৩ .... ১৯১
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৯১
অন্যান্য পরিচর্যা ১৯২
কলা ১৯৩
কলার জাত ১৯৩
বারি কলা-১ .... ১৯৪
বারি কলা-২ .... ১৯৪
বারি কলা-৩ .... ১৯৪
বারি কলা-৪ .... ১৯৪
বারি কলা-৫ .... ১৯৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৯৫
অন্যান্য পরিচর্যা ১৯৬
পেঁপে ১৯৭
পেঁপের জাত ১৯৭
শাহী পেঁপে ১৯৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ১৯৮
অন্যান্য পরিচর্যা ১৯৯
আনারস ২০০
আনারসের জাত ২০০
হানিকুইন ২০০
জায়েন্ট কিউ (কেলেঙ্গা) ২০০
ঘোড়াশাল ২০০
জলঢুপি ২০১
উৎপাদন প্রযুক্তি ২০১
হরমোন প্রয়োগে সারা বছর আনারস উৎপাদন প্রযুক্তি ২০১
পেয়ারা ২০২
পেয়ারার জাত ২০২

বিষয়-সূচি

কাজী পেয়ারা ২০২
বারি পেয়ারা-২ .... ২০৩
বারি পেয়ারা-৩ .... ২০৩
বারি পেয়ারা-৪ .... ২০৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ২০৩
অন্যান্য পরিচর্যা ২০৫
কুল ২০৬
কুলের জাত ২০৬
বারি কুল-১ .... ২০৬
বারি কুল-২ .... ২০৬
বারি কুল-৩ .... ২০৬
বারি কুল-৪ .... ২০৬
বারি কুল-৫ .... ২০৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ২০৭
অন্যান্য পরিচর্যা ২০৮
লিচু ২০৯
লিচুর জাত ২০৯
বারি লিচু-১ .... ২০৯
বারি লিচু-২ .... ২০৯
বারি লিচু-৩ .... ২০৯
বারি লিচু-৪ .... ২১০
বারি লিচু-৫ .... ২১০
উৎপাদন প্রযুক্তি ২১০
অন্যান্য প্রযুক্তি ২১১
অন্যান্য পরিচর্যা ২১২
নারিকেল ২১৩
নারিকেলের জাত ২১৩
বারি নারিকেল-১ .... ২১৩
বারি নারিকেল-২ .... ২১৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ২১৩
অন্যান্য পরিচর্যা ২১৫
কমলা ২১৭
কমলার জাত ২১৭
বারি কমলা-১ .... ২১৭
বারি কমলা-২ .... ২১৭
বারি কমলা-৩ .... ২১৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ২১৭
অন্যান্য পরিচর্যা ২১৯
লেবু ২২১
লেবুর জাত ২২১
বারি লেবু-১ (এলাচী লেবু) ২২১
বারি লেবু-২ .... ২২২
বারি লেবু-৩ .... ২২২
বারি লেবু-৪ .... ২২২
বারি লেবু-৫ .... ২২৩
জারা লেবু ২২৩
জারা লেবুর জাত ২২৩
বারি জারা লেবু-১ .... ২২৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ২২৪
অন্যান্য পরিচর্যা ২২৪
কাগজীলেবু ২২৫
কাগজীলেবুর জাত ২২৫
বারি কাগজীলেবু-১ .... ২২৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ২২৫
মিষ্টি লেবুর জাত ২২৮
বারি মিষ্টি লেবু-১ .... ২২৮
উৎপাদন প্রযুক্তি ২২৯
বাতাবিলেবু ২৩০
বাতাবিলেবুর জাত ২৩০
বারি বাতাবিলেবু-১ .... ২৩০
বারি বাতাবিলেবু-২ .... ২৩০
বারি বাতাবিলেবু-৩ .... ২৩০
বারি বাতাবিলেবু-৪ .... ২৩১
বারি বাতাবিলেবু-৫ .... ২৩১
বারি বাতাবিলেবু-৬ .... ২৩১
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৩১
সাতকরা ২৩২
সাতকরার জাত ২৩৩
বারি সাতকরা-১ .... ২৩৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৩৩
আমড়া ২৩৪
আমড়ার জাত ২৩৪
বারি আমড়া-১ (বারমাসি আমড়া) ২৩৪
বারি আমড়া-২ .... ২৩৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৩৫
অন্যান্য পরিচর্যা ২৩৬
জামরুল ২৩৬
জামরুলের জাত ২৩৭
বারি জামরুল-১ .... ২৩৭
বারি জামরুল-২ .... ২৩৭
বারি জামরুল-৩ .... ২৩৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৩৭
সফেদা ২৩৮
সফেদার জাত ২৩৮
বারি সফেদা-১ .... ২৩৮
বারি সফেদা-২ .... ২৩৮
বারি সফেদা-৩ .... ২৩৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৩৯
কামরাঙ্গা ২৪০
কামরাঙ্গার জাত ২৪০

বিষয়-সূচি

বারি কামরাঙ্গা-১ .... ২৪০
বারি কামরাঙ্গা-২ .... ২৪০
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৪১
অন্যান্য পরিচর্যা ২৪২
তৈকর ২৪৩
তৈকরের জাত ২৪৩
বারি তৈকর-১ .... ২৪৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৪৩
লটকন ২৪৪
লটকনের জাত ২৪৪
বারি লটকন-১ .... ২৪৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৪৪
অন্যান্য পরিচর্যা ২৪৫
আমলকি ২৪৬
আমলকির জাত ২৪৭
বারি আমলকি-১ .... ২৪৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৪৭
অন্যান্য পরিচর্যা ২৪৮
আঁশফল ২৪৮
আঁশফলের জাত ২৪৯
বারি আঁশফল-১ .... ২৪৯
বারি আঁশফল-২ .... ২৪৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৪৯
রাম্বুতান ২৫০
রাম্বুতানের জাত ২৫০
বারি রাম্বুতান-১ .... ২৫০
স্ট্রবেরি ২৫২
স্ট্রবেরির জাত ২৫২
বারি স্ট্রবেরি-১ .... ২৫২
বারি স্ট্রবেরি-২ .... ২৫২
বারি স্ট্রবেরি-৩ .... ২৫৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৫৩
অন্যান্য পরিচর্যা ২৫৪
বিলাতি গাব ২৫৫
বিলাতি গাবের জাত ২৫৬
বারি বিলাতি গাব-১ .... ২৫৬
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৫৬
কদবেল ২৫৭
বারি কদবেল-১ .... ২৫৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৫৭
বেল ২৫৯
বারি বেল-১ .... ২৫৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৫৯
জলপাই ২৬০
বারি জলপাই-১ .... ২৬০
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৬০
ড্রাগন ২৬১
বারি ড্রাগন ফল-১ .... ২৬১
মাল্টা ২৬৩
মাল্টার জাত ২৬৪
বারি মাল্টা-১ .... ২৬৪
বারি মাল্টা-২ .... ২৬৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৬৫
নাশপাতি ২৬৬
নাশপাতির জাত ২৬৬
বারি নাশপাতি-১ .... ২৬৬
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৬৬
প্যাশন ফল ২৬৮
প্যাশন ফলের জাত ২৬৮
বারি প্যাশন ফল-১ .... ২৬৮
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৬৮
অন্যান্য পরিচর্যা ২৬৯
তেঁতুল ২৭০
তেঁতুলের জাত ২৭০
বারি তেঁতুল-১ .... ২৭০
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৭০

ফুল ফসল ২৭৩
গ্লাডিওলাস ২৭৩
বারি গ্লাডিওলাস-১ .... ২৭৩
বারি গ্লাডিওলাস-২ .... ২৭৩
বারি গ্লাডিওলাস-৩ .... ২৭৩
বারি গ্লাডিওলাস-৪ .... ২৭৪
বারি গ্লাডিওলাস-৫ .... ২৭৪
বারি গ্লাডিওলাস-৬ .... ২৭৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৭৪
অর্কিড ২৭৫
বারি অর্কিড-১ .... ২৭৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৭৬
চন্দ্রমল্লিকা ২৭৭
বারি চন্দ্রমল্লিকা-১ .... ২৭৭
বারি চন্দ্রমল্লিকা-২ .... ২৭৭
বারি চন্দ্রমল্লিকা-৩ .... ২৭৭
বারি চন্দ্রমল্লিকা-৪ .... ২৭৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৭৭
অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ২৭৮
রজনীগন্ধা ২৮০
রজনীগন্ধার জাত ২৮০
বারি রজনীগন্ধা-১ .... ২৮০
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৮০

বিষয়-সূচি

জারবেরা ২৮১
বারি জারবেরা-১ .... ২৮১
বারি জারবেরা-২ .... ২৮১
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৮২
এ্যানথুরিয়াম ২৮৩
বারি এ্যানথুরিয়াম-১ .... ২৮৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৮৪
ডালিয়া ২৮৫
বারি ডালিয়া-১ .... ২৮৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৮৫
অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ২৮৬
অন্যান্য পরিচর্যা ২৮৬
লিলি ২৮৭
বারি লিলি-১ .... ২৮৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৮৭
অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ২৮৭
অন্যান্য পরিচর্যা ২৮৮
এলপিনিয়া ২৮৮
বারি এলপিনিয়া-১ .... ২৮৮
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৮৮
অন্যান্য পরিচর্যা ২৮৮
গাঁদা ২৮৯
বারি গাঁদা-১ .... ২৮৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ২৮৯
নন-কমোডিটি প্রযুক্তি ২৯১

মসলা ফসল ২৯৭
পেঁয়াজ ২৯৭
পেঁয়াজের জাত ২৯৭
বারি পেঁয়াজ-১ (রবি) ২৯৭
বারি পেঁয়াজ-২ (খরিফ) ২৯৭
বারি পেঁয়াজ-৩ (খরিফ) ২৯৮
বারি পেঁয়াজ-৪ .... ২৯৮
বারি পেঁয়াজ-৫ .... ২৯৮
শীতকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন ২৯৮
গ্রীষ্ম/খরিফ পেঁয়াজ উৎপাদন ৩০০
পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন ৩০১
কন্দ থেকে বীজ উৎপাদন ৩০১
পাতা পেঁয়াজ ৩০৯
পাতা পেঁয়াজ জাত ৩১০
বারি পাতা পেঁয়াজ-১ .... ৩১০
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩১০
মরিচ ৩১১
মরিচের জাত ৩১১
বারি মরিচ-১ .... ৩১১
বারি মরিচ-২ .... ৩১২
আধুনিক পদ্ধতিতে বারি মরিচ-২ এর উৎপাদন কলাকৌশল ৩১২
অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ৩১৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩১৪
মৌরি ৩২২
মৌরির জাত ৩২২
বারি মৌরি-১ .... ৩২২
বারি মৌরি-২ .... ৩২২
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩২৩
রসুন ৩২৪
রসুনের জাত ৩২৪
বারি রসুন-১ .... ৩২৪
বারি রসুন-২ .... ৩২৫
বারি রসুন-৩ .... ৩২৫
বারি রসুন-৪ .... ৩২৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩২৬
অন্যান্য পরিচর্যা ৩২৬
হলুদ ৩২৬
হলুদের জাত ৩২৬
বারি হলুদ-১ (ডিমলা) ৩২৬
বারি হলুদ-২ (সিন্দুরী) ৩২৭
বারি হলুদ-৩ .... ৩২৭
বারি হলুদ-৪ .... ৩২৭
বারি হলুদ-৫ .... ৩২৭
বারি হলুদ-৪ ও বারি হলুদ ৫-এর উৎপাদন কৌশল ৩২৭
অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ৩২৮
ধনিয়া ৩৩১
ধনিয়ার জাত ৩৩১
বারি ধনিয়া-১ .... ৩৩১
বারি ধনিয়া-২ .... ৩৩১
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৩২
গোল মরিচ ৩৩৩
গোল মরিচের জাত ৩৩৩
জৈন্তিয়া গোল মরিচ ৩৩৩
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৩৪
আদা ৩৩৫
আদার জাত ৩৩৬
বারি আদা-১ .... ৩৩৬
বারি আদা-২ .... ৩৩৬
বারি আদা-৩ .... ৩৩৬
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৩৬
দারুচিনি ৩৪০
বারি দারুচিনি-১ .... ৩৪০
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৪০
তেজপাতা ৩৪১

বিষয়-সূচি

তেজপাতার জাত ৩৪২
বারি তেজপাতা-১ .... ৩৪২
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৪২
অন্যান্য পরিচর্যা ৩৪৩
একাঙ্গীর জাত ৩৪৪
বারি একাঙ্গী-১ .... ৩৪৫
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৪৫
চিভ ৩৪৭
চিভ এর জাত ৩৪৮
বারি চিভ-১ .... ৩৪৮
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৪৮
কালোজিরা ৩৪৯
বারি কালোজিরা-১ .... ৩৪৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৫০
অন্যান্য পরিচর্যা ৩৫০
মেথীর জাত ৩৫১
বারি মেথী-১ .... ৩৫১
বারি মেথী-২ .... ৩৫১
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৫১
অন্যান্য পরিচর্যা ৩৫২
আলুবোখারা ৩৫২
বারি আলুবোখারা-১ .... ৩৫২
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৫২
অন্যান্য পরিচর্যা ৩৫৩
পান ৩৫৪
পানের জাত ৩৫৪
বারি পান-৩ .... ৩৫৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৫৪

দানা ফসল ৩৬০
গম ৩৬০
গমের জাত ৩৬১
বারি গম-২৫ .... ৩৬১
বারি গম-২৬ .... ৩৬১
বারি গম-২৭ .... ৩৬২
বারি গম-২৮ .... ৩৬২
বারি গম-২৯ .... ৩৬২
বারি গম-৩০ .... ৩৬৩
বারি গম-৩১ .... ৩৬৩
বারি গম-৩২ .... ৩৬৪
বারি গম-৩৩ .... ৩৬৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৬৪
অন্যান্য পরিচর্যা ৩৬৫
গমের ব্লাস্ট রোগ ও তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা ৩৬৭
ট্রিটিক্যালি ৩৬৮
ট্রিটিক্যালির জাত ৩৬৮
বারি ট্রিটিক্যালি-১ .... ৩৬৮
বারি ট্রিটিক্যালি-২ .... ৩৬৯
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৬৯
ভুট্টা ৩৭০
ভুট্টার জাত ৩৭০
খৈ ভুট্টা ৩৭০
মোহর ৩৭০
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫ .... ৩৭০
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭ .... ৩৭১
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯ .... ৩৭১
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১০ .... ৩৭১
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১ .... ৩৭২
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২ .... ৩৭২
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩ .... ৩৭২
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪ .... ৩৭৩
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫ .... ৩৭৩
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬ .... ৩৭৪
বারি মিষ্টি ভুট্টা-১ .... ৩৭৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৭৪
অন্যান্য পরিচর্যা ৩৭৬
বারি বেবী কর্ণ-১ .... ৩৮০
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৮০
চীনা ৩৮২
চীনার জাত ৩৮২
তুষার ৩৮২
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৮২
কাউন ৩৮৩
কাউনের জাত ৩৮৩
তিতাস ৩৮৩
বারি কাউন-২ .... ৩৮৩
বারি কাউন-৩ .... ৩৮৪
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৮৪
বার্লি ৩৮৫
বার্লির জাত ৩৮৫
বারি বার্লি-১ .... ৩৮৫
বারি বার্লি-২ .... ৩৮৫
বারি বার্লি-৩ .... ৩৮৬
বারি বার্লি-৪ .... ৩৮৬
বারি বার্লি-৫ .... ৩৮৬
বারি বার্লি-৬ .... ৩৮৬
বারি বার্লি-৭ .... ৩৮৭
বারি বার্লি-৮ .... ৩৮৭
বারি বার্লি-৯ .... ৩৮৭
উৎপাদন প্রযুক্তি ৩৮৮
অন্যান্য পরিচর্যা ৩৮৮

বিষয়-সূচি

কৃষি যন্ত্রপাতি ৩৯০
বারি বীজ বপন যন্ত্র ৩৯০
বারি বেড প্লান্টার ৩৯১
বারি স্ট্রিপ টিল প্লান্টার ৩৯২
বারি জিরো টিল প্লান্টার ৩৯৩
বারি সৌর পাম্প ৩৯৪
বারি এক্সিয়াল ফ্লো পাম্প ৩৯৫
বারি মোবাইল ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র ৩৯৬
বারি গার্ডেন বুম স্প্রেয়ার ৩৯৭
বারি আলু রোপণ যন্ত্র ৩৯৮
বারি আলু উত্তোলন যন্ত্র ৩৯৮
বারি ফল শোধন যন্ত্র ৩৯৯
বারি আলু গ্রেডিং যন্ত্র ৪০০
বারি মূলজাতীয় সবজি ধৌতকরণ যন্ত্র ৪০১
বারি নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ানো যন্ত্র ৪০২
বারি মোবাইল তেল নিষ্কাশন যন্ত্র ৪০২

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা ৪০৪
অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতিতে টমেটো ও আলু উৎপাদন ৪০৪
ড্রিপ ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে টমেটো ও বেগুন উৎপাদন ৪০৬
গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদনে ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে সার এবং পানি ব্যবস্থাপনা ৪০৭
ড্রিপ পদ্ধতিতে সার মিশ্রিত সেচ পানির ব্যবহার ৪০৮
পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে সেচ ও মাল্চ প্রযুক্তি ৪০৯
স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে পেঁয়াজ ও রসুন উৎপাদন ৪১১
ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম চাষ ৪১৪
ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি উৎপাদন ৪১৫
প্রসেসিং আলু উৎপাদনের সেচ প্রযুক্তি ৪১৭
করলা উৎপাদনে সেচ ও মালচ্ প্রযুক্তি ৪১৮
বেড ও ফারো (নালা) সেচ পদ্ধতিতে লবণাক্ত এলাকায় ফসল চাষ ৪১৯
লবণাক্ত অঞ্চলে রবি ফসলে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহার ৪২০
হাইব্রিড ভুট্টার গুণগত মানের বীজ উৎপাদনের জন্য সেচ ব্যবস্থাপনা ৪২১
কাঁঠাল চাষে সেচ পদ্ধতি ৪২৩
লিচু চাষে সেচ প্রযুক্তি ৪২৪

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) ৪২৭
পেস্টিসাইড টক্সিকোলজি ৪৪২

শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ৪৪৫
বিভিন্ন শাক ও সবজির গুণাগুণ বজায় রেখে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ ৪৪৫
স্ট্রবেরি ফলের গুণাগুণ বজায় রেখে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ ৪৪৫
ম্যাংগোবার তৈরিকরণ ৪৪৫
স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পেয়ারার পাল্প সংরক্ষণ ৪৪৬
স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পেঁয়াজের পেস্ট সংরক্ষণ ৪৪৬
পাপড় তৈরি পদ্ধতি ৪৪৭
বিভিন্ন ফলের (আমড়া, চালতা) আচার ও চাটনী তৈরিকরণ পদ্ধতি ৪৪৭
ডাবের পানি সংরক্ষণ ৪৪৮
নারিকেলের ক্যান্ডি তৈরিকরণ ৪৪৮
গুণাগুণ বজায় রেখে কৃত্রিমভাবে ফল পাকানোর জন্য গ্রহণযোগ্য রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রা নির্ধারণ ৪৪৯
ভুট্টার কনডেন্সড মিল্ক তৈরিকরণ ৪৫০
কাঁচা আমের জুস তৈরিকরণ ৪৫০
তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আনারস, কলা ও লেবুর সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ ৪৫১

অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণি ব্যবস্থাপনা ৪৫৩

বীজ প্রযুক্তি ৪৫৬

লাক্ষা ফসল ৪৫৮

পাহাড়ী কৃষি ৪৬০
ম্যাথ মডেল ৪৬০
বসত বাড়িতে সবজি চাষ ‘খাগড়াছড়ি মডেল’ ৪৬২
পাহাড়ী এলাকায় টেকসই কৃষির জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রযুক্তি ৪৬৩
পাহাড়ী অঞ্চলে উন্নত ঝাড়শিমের চাষ ৪৬৩
পাহাড়ী অঞ্চলে বিলাতি ধনিয়ার উৎপাদন প্রযুক্তি ৪৬৪
অ-মৌসুমে লেবুর উৎপাদন প্রযুক্তি ৪৬৫

উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ ৪৬৬

সরেজমিন ও সিস্টেম গবেষণা ৪৬৭
ফসল বিন্যাস প্রযুক্তি ৪৬৭
রসুন/ভুট্টা-রোপা আমন ধান-কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলের জন্য একটি লাভজনক ফসল বিন্যাস ৪৬৭
রংপুর সমতল বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য আলু/মুখীকচু-রোপা আমন ফসল বিন্যাস ৪৬৮
রোপা আমন-আলু-বোরো ধান (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৯ এর সেচের আওতাধীন মাঝারী উঁচু জমি) ৪৬৯
উন্নত ফসল বিন্যাস: আলু + করলা + পটল (আন্তঃফসল)-পেঁয়াজ (বাল্ব) ৪৭০
একটি উন্নত ফসল ধারা: আলু + ভুট্টা-পাট-রোপা আমন ৪৭১
একটি উন্নত ফসল বিন্যাস: তিসি-রোপা আউশ-রোপা আমন ধান ৪৭২
একটি উন্নত ফসল ধারা: গম-পতিত-রোপা আমন ৪৭৩

বিষয়-সূচি

রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে মসুর এবং সরিষার মিশ্র চাষ ৪৭৪
রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে মটরশুঁটির চাষ ৪৭৫
সরিষা-বোরো মিশ্র চাষ একটি লাভজনক প্রযুক্তি ৪৭৬
উপকূলবর্তী লবণাক্ত অঞ্চলে তরমুজের সাথে রসুনের আন্তঃফসল চাষ ৪৭৭
রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে মিষ্টি কুমড়া চাষ ৪৭৮
আমন ধানের পর বেড পদ্ধতিতে কুমড়া জাতীয় সবজি চাষ ৪৭৯
মরিচের সাথে রসুনের আন্তঃফসল চাষ ৪৮০
কচুরিপানা মালচ্ এর মাধ্যমে আলু ও টমেটো উৎপাদন ৪৮১
উন্নত ফসল বিন্যাস: আলু-চীনাবাদাম-রোপা আমন ধান ৪৮২
সবজি উৎপাদনে সারের দক্ষতা বৃদ্ধি করণে এনপিকে ব্রীকেট সার এর ব্যবহার ৪৮৩
হলুদ উৎপাদনে চুনের ব্যবহার ৪৮৪
বাঁধাকপির সাথে ধনিয়ার আন্তঃফসল চাষ ৪৮৫
পাবনার চরাঞ্চলে মসুর + সরিষা-বোনা আউশ ধান-মাসকলাই ফসল ধারার জন্য সার সুপারিশ ৪৮৫
কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চলে মরিচের সাথে রসুনের আন্তঃফসল চাষ ৪৮৬
বরেন্দ্র অঞ্চলে স্বল্পচাষ ও মালচ ব্যবহার করে মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের মাধ্যমে টমেটো উৎপাদন ৪৮৭
পানিকচু উৎপাদনে কাটুই পোকার দমন ব্যবস্থাপনা ৪৮৭
রোপা আমন ধানের পর শীতকালীন মিষ্টি কুমড়ার চাষ: দক্ষিণাঞ্চলের একটি লাগসই প্রযুক্তি ৪৮৮
সরিষা-পাট-রোপা আমন: একটি উন্নত ফসলবিন্যাস ৪৮৯
সরিষা-রোপা আউশ-রোপা আমন: একটি উন্নত ফসলধারা ৪৯০
খুলনা অঞ্চলে ভুট্টার সাথে লালশাক ও পালংশাকের আন্তঃফসল চাষ ৪৯১
রোপা আমন-পতিত-মুগডাল: খুলনা অঞ্চলের একটি উন্নত ফসল বিন্যাস ৪৯২
বরেন্দ্র অঞ্চলে গম-মুগডাল-রোপা আমন ফসল বিন্যাসের জন্য সার সুপারিশমালা ৪৯৩
বরেন্দ্র অঞ্চলে রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে খেসারী চাষ ৪৯৪
রাজশাহী অঞ্চলে আলু-ভুট্টা-রোপা আমন ধান ফসল বিন্যাসে সার ব্যবস্থাপনা ৪৯৪
পাবনা অঞ্চলে খড়ের মালচ্ ব্যবহার করে বিনাচাষে রসুন উৎপাদন ৪৯৫
রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে গমের চাষ ৪৯৬
চার ফসল ভিত্তিক ফসলধারা ৪৯৬
১. রোপা আমন-সরিষা-মুগ-রোপা আউশ ৪৯৬
২. রোপা আমন-সরিষা-বোরো-রোপা আউশ ৪৯৯
৩. আমন ধান-আলু-বোরো ধান-আউশ ধান ৫০২
হালকা বুনটের মাটির জন্য লাভজনক ফসল-ধারা: আগাম আলু-গম-মুগডাল-আমন ধান ৫০৫
হালকা বুনটের মাটির জন্য অধিক লাভজনক ফসল-ধারা: আগাম আলু-গম-ভুট্টা-আমন ধান ৫০৫
গম-ভুট্টা-আমনধান ফসলধারায় স্বল্পচাষ ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনবৃদ্ধি ৫০৬
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে বাঁধাকপি উৎপাদন ৫০৭
বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে করলা উৎপাদন ৫০৮
টমেটো উৎপাদনে ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার ৫১০
মটরশুঁটি উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার ৫১১
ঝাড়শিম উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার ৫১২
ফুলকপির বীজ উৎপাদনে মলিবডেনামের ব্যবহার ৫১২
উঁচু বেড পদ্ধতি ও পটাশিয়াম ব্যবহারের মাধ্যমে লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও ভুট্টা উৎপাদন ৫১৩
সমন্বিত আগাছা দমনের মাধ্যমে মুগডালের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ৫১৪
উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক সেচ প্রয়োগে ফসল উৎপাদন ৫১৪
সেডনেটে জারবেরা পাতায় GA_3 প্রয়োগের মাধ্যমে ফুলের গুণগত মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি ৫১৫
প্রযুক্তি-১: কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১ এ আলু-ভুট্টা-রোপা আমন ধান ফসল ধারায় সার-সুপারিশমালা ৫১৬
প্রযুক্তি-২: লাউ এর ডগা উৎপাদনে ইউরিয়া সারের ব্যবহার ৫১৭
প্রযুক্তি-৩: টাংগাইল অঞ্চলে চার ফসল ভিত্তিক আলু-সবজি-পাট-মাসকলাই একটি উন্নত ফসল বিন্যাস ৫১৮
প্রযুক্তি-৬: খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলে রোপা আমন-সরিষা-মুগডাল একটি উন্নত ফসল ধারা ৫১৯
প্রযুক্তি-৭: বগুড়ার চরাঞ্চলে রসুনের সাথে চীনাবাদামের আন্তঃফসল চাষ একটি লাভজনক প্রযুক্তি ৫২১
প্রযুক্তি-৮: ভোলা অঞ্চলে পেঁয়াজের সাথে মরিচ ও বাদামের আন্তঃফসল চাষ ৫২২
বিএআরআই উদ্ভাবিত ফসলের জাতসমূহ ৫২৩

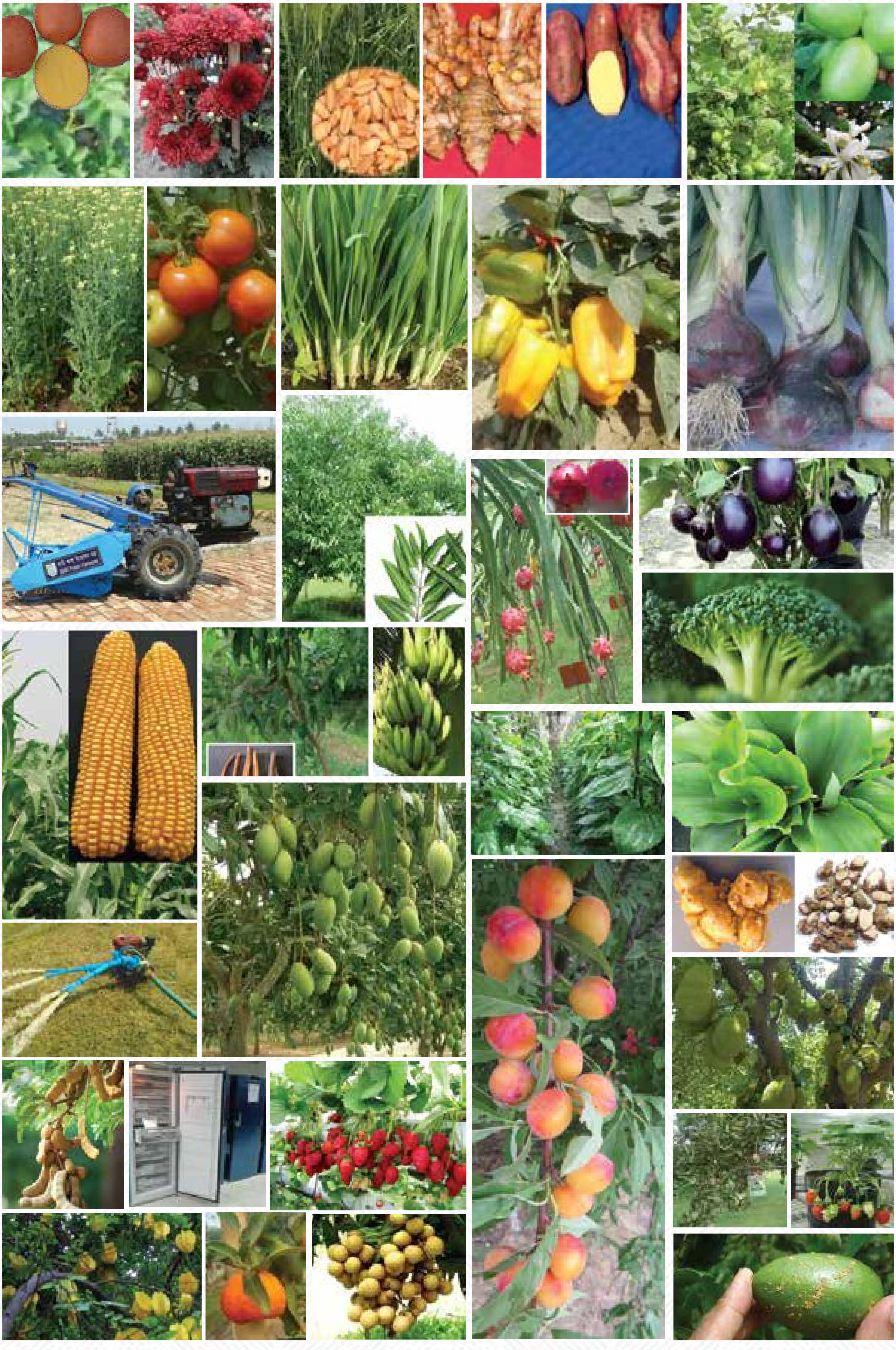

কন্দাল ফসল

যে সকল ফসলের কাণ্ড বা শিকড় কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা জমা হওয়ার দরুন স্ফীত হয়ে রূপান্তরিত হয় সেগুলোকে কন্দাল ফসল বলে। বাংলাদেশে আলু, মিষ্টি আলু, কচু, গাছ আলু বা মেটে আলু, কাসাবা, শটি, ওলকচু ইত্যাদি কন্দাল ফসল হিসেবে আবাদ হয়। অধিক শর্করা থাকার কারণে অনেক দেশেই এসব ফসল প্রধান খাদ্য এবং প্রধান সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কন্দাল ফসল অন্যান্য প্রধান খাদ্য শস্য থেকে বেশি শক্তি ও আমিষ তৈরি করে।

বাংলাদেশে প্রায় ৫.৩০ লক্ষ হেক্টর জমিতে কন্দাল ফসলের চাষ করা হয় যার বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৯৫ লক্ষ টন। তাই কন্দাল ফসল দেশের উৎপাদিত খাদ্য ঘাটতি এবং পুষ্টির অভাব পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কন্দাল ফসলসমূহ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ও খনিজসহ অনেক পুষ্টিকর উপাদান সমৃদ্ধ থাকে।

- আলু
- মিষ্টি আলু
- কচু
- পানি কচু
- মুখী কচু
- ওলকচু

আলুর জাত

বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা)

নেদারল্যান্ড থেকে গ্রানোলা (বংশ ৩৩৩/৬০ × ২৬৭.০৪) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা)' হিসেবে ১৯৯৪ সালে জাত অনুমোদন লাভ করে। গাছ কিছুটা ছড়ানো প্রকৃতির। কাণ্ডের সংখ্যা বেশি ও সবুজ। প্রথমে গাছের বর্ধন ধীর গতিতে হয়, তবে পরবর্তী পর্যায়ে সমস্ত জমি গাছে ঢেকে যায়। খরা সহ্য করার ক্ষমতা আছে। আলু গোল-ডিম্বাকার, মাঝারী আকৃতির, ত্বক অমসৃণ হালকা তামাটে হলদে, শাঁস রং ফ্যাকাসে হলদে ও চোখ অগভীর। অঙ্কুর প্রথমে গোলাকার, পরে খাটো কাণ্ডের মতো, রং তামাটে বেগুনি ও কিঞ্চিৎ রোমশ হয়।

সুপ্তিকাল বেশি এবং সাধারণ তাপমাত্রায় বীজের সুপ্ততা ৭০-৭৫ দিন। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন হয়। মড়ক সহনশীল ও অন্যান্য ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী। জাতটি বিদেশে রপ্তানিযোগ্য কিন্তু আগাম জাত হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সারা দেশেই চাষ করা যায়। আলুর সুপ্তিকাল বেশি হওয়ায় আলু ৪-৫ মাস ঘরে অনায়েসে সংরক্ষণ করা যায়।

বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা)

বারি আলু-২৫ (এসটেরিক্স)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত এসটেরিক্স (বংশ Cardinal × VSP Ve 70-9) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-২৫ (এসটেরিক্স)' জাত হিসেবে ২০০৫ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ খাড়া ও গড়ে প্রতি গাছে ৩-৪ টি কাণ্ড থাকে। পাতা বড়, সবুজ ও ছড়ানো, গাছের গঠন ও পাতার বিন্যাস চমৎকার। আলু ডিম্বাকার থেকে লম্বাকৃতির, মাঝারী থেকে বড় আকৃতির, মসৃণ লাল ত্বক, শাঁস ফ্যাকাসে হলুদ, চোখ অগভীর। অঙ্কুর বেগুনী বর্ণের ও লোমশ। জীবনকাল ৯০-৯৫দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন। প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী তবে ইতোমধ্যেই খাবার আলু হিসেবেও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

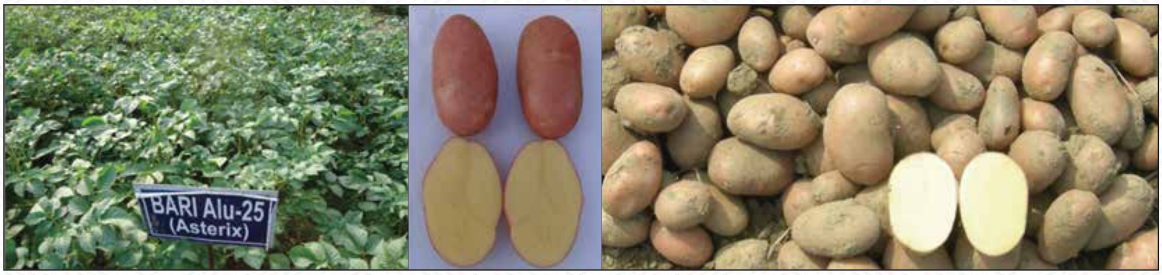

বারি আলু-২৫ (এসটেরিক্স)

বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত লেডি রোসেটা (বংশ Cardinal × VTW 62-33-3) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা)' জাত হিসেবে ২০০৮ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড শক্ত ও খাড়া আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারী ও গাঢ় সবুজ। আলু গোলাকার। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হলুদাভ সাদা। চোখ হালকা গভীর। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা)

বারি আলু-২৯ (কারেজ)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত কারেজ (বংশ Lady Rosetta × HZ 81 H202) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-২৯ (কারেজ)' জাত হিসেবে ২০০৮ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড শক্ত ও খাড়া আংশিক হেলানো, পাতা মাঝারী ও গাঢ় সবুজ। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। আলু গোল থেকে ডিম্বাকৃতি। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হলুদাভ সাদা। চোখ হালকা গভীর। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-২৯ (কারেজ)

বারি আলু-৩৪ (লরা)

জার্মানী থেকে সংগৃহীত লরা (বংশ Saskia × MPI 495402) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৩৪ (লরা)' জাত হিসেবে ২০১১ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ কিছুটা ছড়ানো, মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড শক্ত ও নীল বেগুনী বর্ণের মিশ্রণ দেখা যায় । প্রান্তীয় পাতা একক পাতার সাথে সংযুক্ত থাকে। পত্র কক্ষ সবুজ নীল বর্ণের। পাতায় ও কাণ্ডে হালকা রোমশ দেখা যায়। আলু ডিম্বাকার ও মাঝারী আকৃতির। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং গাঢ় হলুদ। চোখ হালকা অগভীর। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫৫-৬০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। অঙ্কুর ডিম্বাকার, অল্প এন্থোসায়ানিন আছে, অগ্রভাগ হালকা লোমশ ও এন্থোসায়ানিন যুক্ত। আলুতে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০.২২ ± ১%।

৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ২৫-৩৫ টন। জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-৩৪ (লরা)

বারি আলু-৩৫

বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত {(বংশ Cardinal × Unknown) (4.5W)} জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৩৫' জাত হিসেবে ২০১২ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম পাতা কম ডেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন কম। আলু ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং বাদামী, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হালকা ক্রিম, চোখ অগভীর। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। অঙ্কুর মাঝারী উপগোলাকার, খুবই কম এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক পাতলা লোমশ, অগ্রভাগ ছোট আকারের। আলুতে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০.২৬±১%। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩০-৪৫ টন। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৩৫

বারি আলু-৩৬

বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত {(বংশ Patronese × TPS 67 (9.26R)} জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৩৬' জাত হিসেবে ২০১২ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি। পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরা এন্থোসায়ানিন যুক্ত। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং লাল। চোখ অগভীর। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫৫-৬০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। অঙ্কুর ছোট উপগোলাকার, গোড়ার দিকে পাতলা লোমশ, অগ্রভাগে খুবই কম পরিমাণে এন্থোসায়ানিন আছে এবং লোম অনুপস্থিত। আলুতে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯.৬৮±১%। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩০-৪০ টন। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৩৬

বারি আলু-৪০

বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত {(বংশ 934 × TPS-67 (4.45W)} জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৪০' জাত হিসেবে ২০১২ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মাধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম, পাতা খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন নাই। আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম আকারের। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ মধ্যম অগভীর। সাধারণ তাপমাত্রায় ৪০-৪৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। অঙ্কুর মাঝারী ইস্‌ফেরিক্যাল, গোড়ার দিক শক্ত পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক মাঝারী লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী। আলুতে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২০.২২±১%। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৫-৫৫ টন। জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৪০

বারি আলু-৪১

বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত {(বংশ Carlita × TPS-67 (5.183)} জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৪১' জাত হিসেবে ২০১২ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মাধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৫টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি, পাতা বড় খুব কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন মাধ্যম পরিমাণে বিদ্যমান। আলু গোলাকার থেকে চ্যাপ্টা গোলাকার আকারের। আলুর রং গাঢ় লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর রং গাঢ় লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ মধ্যম অগভীর। সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫-৫০ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। অঙ্কুর মাঝারী ওভোয়েড, গোড়ার দিক খুব দুর্বল পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক মাঝারী লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী। আলুতে শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২১.২০±১%। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৮-৫৪ টন। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৪১

বারি আলু-৪৬

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু থেকে সংগৃহীত এলবি-৭ (বংশ CIP-393371.58) জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৪৬' জাত হিসেবে ২০১৩ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

অঙ্কুর মাঝারী ওভোয়েড, গোড়ার দিক মাঝারী পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক ঘন শক্ত লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী। সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫ - ৪৮ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। গাছ কিছুটা লম্বা স্বভাবের এবং গড়ে ৩/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম, পাতা দুর্বল ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় কোন এন্থোসায়ানিন নাই। আলু গোলাকৃতি থেকে খাটো ডিম্বাকৃতি ও মাধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রং হালকা হলুদ, চামড়া মোটামুটি মসৃণ। আলুর শাসের রং ক্রিম। চোখ মাঝারী গভীর। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ১৯ ± ১%। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩০-৪০ টন। এ জাতটি নাবি ধ্বসা রোগ প্রতিরোধী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৪৬

বারি আলু-৪৮

বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত (বংশ MF-II × TPS-67) জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৪৮' জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়। গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। ৩-৪ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিনের মধ্যম বিস্তৃতি আছে। মধ্যম আকারের পাতা কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন খুবই কম বিদ্যমান।

আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে ডিম্বাকৃতি মধ্যম আকারের। আলুর রং হলুদ, শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ মধ্যম অগভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৪২ ± ১%। অঙ্কুর ছোট আকারের ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিক এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মধ্যম, গোড়ার দিক বেশি লোমযুক্ত, অগ্রভাগ ছোট আকারের। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৩.৪২(২৬.০৫-৬২.৪১) টন।

এ জাতটি সাধারন তাপমাত্রায় ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায় এবং খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।

বারি আলু-৪৮

বারি আলু-৫৩

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু থেকে সংগৃহীত এলবি-৬ (বংশ 387015.3 × 386316.14) জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৫৩' জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ কিছুটা লম্বা স্বভাবের এবং গড়ে ৩/৫ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি গাঢ় কম, পাতা কম ঢেউ খোলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন বিস্তৃতি মধ্যম। আলু গোলাকৃতি থেকে খাটো ডিম্বাকৃতি ও মাধ্যম আকারের। আলুর রং গাঢ় লাল, চামড়া মোটামুটি মসৃণ। আলুর শাসের রং হালকা হলুদ। চোখ গভীর। শুষ্ক পদার্থ ২০.৪২ ± ১%। অঙ্কুর মাঝারী ওভোয়েড, গোড়ার দিক মাঝারী পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক ঘন শক্ত লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী কিঞ্চিৎ লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫- ৪৮ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন । গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩২-৩৪ টন।

এ জাতটি নাবি ধ্বসা রোগ প্রতিরোধী এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৫৩

বারি আলু-৫৪ (মিউজিকা)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত মিউজিকা (বংশ CMK 1993-042-005 × Lady Christl) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৫৪' (মিউজিকা) জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ কিন্তু গোড়ার দিকে এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। ৩-৬ টি কাণ্ড থাকে। পাতা ছোট আকারের, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি খুবই কম বা থাকে না। আলু মাঝারী আকারের, ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির। চামড়ার রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট। শুষ্ক পদার্থ ১৮.১৮ ± ১%। অঙ্কুর ছোট আকারের ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিক এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মধ্যম, গোড়ার দিক মাঝারী লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী । সাধারণ তাপমাত্রায় ৪৫-৪৮ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪১.১৯ (২৫.৫৯-৫৭.৫১) টন। এ জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৫৪ (মিউজিকা)

বারি আলু-৫৬

বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত {(বংশ G90) (8.46)} জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৫৬' জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। ৪-৬ টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড লাল-বাদামী এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুব বেশি। পাতা মধ্যম আকৃতির, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। আলু খাটো ডিম্বাকৃতি থেকে মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার রং লাল (বেগুনী), চামড়া মসৃণ, শাসের রং হলুদ। গভীর চোখ বিশিষ্ট। শুষ্ক পর্দাথ ১৯.১৫ ± ১%। অঙ্কুর মাঝারী ওভোয়েড, গোড়ার দিক খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৬.৬৭ (২৯.৬৪-৪৫.০১) টন। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী ও স্ক্যাব রোগ প্রতিরোধী।

বারি আলু-৫৬

বারি আলু-৫৭

বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত {(বংশ C90) (8.73)} জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৫৭' জাত হিসেবে ২০১৪ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং কাণ্ড সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পাতা মধ্যম আকৃতির, কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর রং হলুদ, চামড়া মসৃণ, আলুর শাসের রং সাদা। চোখ মধ্যম গভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৯৭ ± ১%। অঙ্কুর মাঝারী ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিক এন্থোসায়ানিনের বিস্তৃতি মধ্যম, গোড়ার দিক হালকা লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী। সাধারণ তাপমাত্রায় ৫০-৫৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৭.৭৪ (২৯.৩৪-৪৫.২৪) টন। এ জাতটি নাবিধ্বসা রোগ প্রতিরোধী, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৫৭

বারি আলু-৬২

বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত {(বংশ Dura × TPS-67) (9.11)} জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৬২' জাত হিসেবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মধ্যম। পাতা মাঝারী আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতায় সবুজ রঙের আধিক্য মাঝারী এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী । মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা বেশি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারী সংখ্যক বড় আকারের উপপত্র দেখা যায়। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির ও মধ্যম থেকে বড় আকারের। আলুর চামড়ার রং হলুদ, চামড়ার মসৃণতা মাঝারী, শাসের রং হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত থাকে। শুষ্ক পদার্থ ১৯.২৪ (১৭.৩৩-২০.৮০%)। অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও কনিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও হালকা লোমযুক্ত। অগ্রভাগ মাঝারী, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি এবং মাঝারী

লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৬ মাসে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৩.৭০ (৩৫.৭৮-৫৬.৩২) টন। এ জাতটি খাবার আলু হিসেবে উপযোগী। সাধারণ তাপমাত্রায় জাতটি ৫-৬ মাস সংরক্ষণ যোগ্য এবং সুপ্তাবস্থা বিদ্যমান থাকায় জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

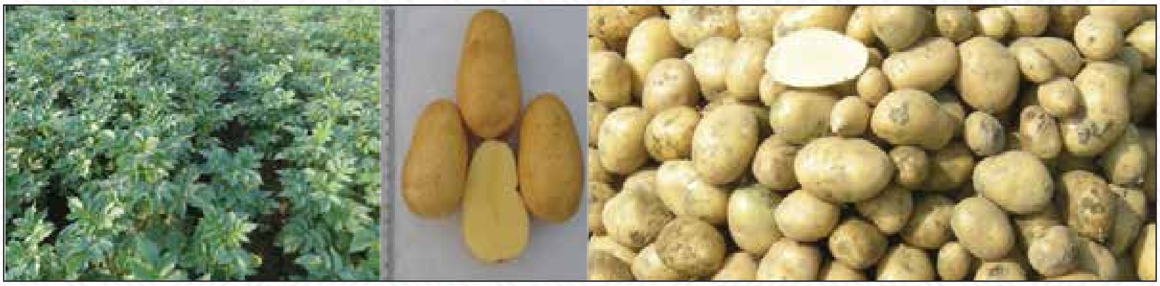

বারি আলু-৬২

বারি আলু-৬৩

বাংলাদেশে নিজস্ব সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত {(বংশ B25 × TPS-67) (9.125)} জাতটি এদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৬৩' জাত হিসেবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬ টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মধ্যম। পাতা মাঝারী আকারের ও মধ্যম ঢেউ খেলানো। পাতায় সবুজ রঙের আধিক্য মাঝারী এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মধ্যম। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা বেশি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারী সংখ্যক বড় আকারের উপপত্র দেখা যায়। আলু গোলাকার থেকে খাটো ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর চামড়ার রং আপেলের মতো লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হলুদ। চোখ মধ্যম গভীর এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়। শুষ্ক পদার্থ ১৯.২২ (১৭.৯২-২১.৮২%)। অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও হালকা লোমযুক্ত। অগ্রভাগ মাঝারী, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুব বেশি এবং হালকা লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৩.২৯ (৩২.৩০-৫১.৬৭) টন। জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও খাবার আলু হিসেবে উপযোগী।

বারি আলু-৬৩

বারি আলু-৬৬ (পামেলা)

ফ্রান্স থেকে সংগৃহীত পামেলা (বংশ Mondial × Carmine) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৬৬ (পামেলা)' জাত হিসেবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৮টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুব বেশি। পাতা মাঝারী আকারের ও খুব কম ঢেউ খেলানো। পাতায় সবুজ রঙের আধিক্য মাঝারী এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি। পত্রফলক

মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে খুবই কম সংখ্যক মাঝারী আকারের উপপত্র দেখা যায়। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতির ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং লাল, শাঁসের রং হালকা হলুদ। অগভীর চোখ বিশিষ্ট এবং চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ১৯.৪৭% (১৭.৩০-২১.৫৫%)। অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও বেশ লোম দেখা যায়। অগ্রভাগ মাঝারী, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি এবং মাঝারী লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৯০-৯৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৪.৪০ (২৫.৫২-৪৬.০৬) টন। জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৬৬ (পামেলা)

বারি আলু-৬৮ (আটলানটিক)

ইউ.এস.এ থেকে সংগৃহীত আটলানটিক (বংশ Wauseon × Lenape) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৬৮ (আটলানটিক)' জাত হিসেবে ২০১৫ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা মধ্যম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পাতা মাঝারী আকারের ও খুবই কম ঢেউ খেলানো। পাতায় সবুজ রঙের আধিক্য মাঝারী এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই কম। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। পার্শ্বের পত্রফলকে খুবই কম সংখ্যক মাঝারী আকারের উপপত্র দেখা যায়। আলু গোলাকার (চাপা) ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারী রং হলুদ, শাঁসের রং সাদা এবং চোখের গভীরতা মধ্যম। চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়। শুষ্ক পদার্থ ১৯.৮৮% (১৮.২৭-২২.৫৭%)। অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও মাঝারী লোমযুক্ত। অগ্রভাগ বড়, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম এবং মাঝারী লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৮৫-৯০দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩১.৭২ (১৯.১৫-৪৫.৫১) টন। জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

বারি আলু-৬৮ (আটলানটিক)

বারি আলু-৭০ (ডেসটিনি)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত ডেসটিনি (বংশ AR 91-1409 × HERMES) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৭০ (ডেসটিনি)' জাত হিসেবে ২০১৬ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মাঝারী। পাতা বড় আকারের ও খুব কম ঢেউ খেলানো। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পত্রফলক মধ্যম আকারের ও মাঝারী ধরনের চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা বেশি। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। পার্শ্বের পত্রফলকে কম সংখ্যক বড় আকারের উপপত্র দেখা যায়। আলু খাটো ডিম্বাকৃতির থেকে গোলাকার ও মধ্যম আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারী ও রং হলুদ, শাঁসের রং হলুদ। চোখের গোড়ার দিকের রং লাল ও গভীরতা মধ্যম। চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়। শুষ্ক পদার্থ ২০.৫৯% (২০.০৫-২১.৯৩%)। অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ওভোয়েড আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও মাঝারী লোমযুক্ত। অগ্রভাগ মাঝারী, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম এবং কম লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩২.১৬ (২৮.৬৬-৩৮.২৯) টন। এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

বারি আলু-৭০ (ডেসটিনি)

বারি আলু-৭২

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু থেকে সংগৃহীত ((বংশ 391925.2 × C92.030) (সিআইপি-১৩৯)} জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৭২' জাত হিসেবে ২০১৬ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ও ইন্টারমিডিয়েট টাইপ। কাণ্ড সবুজ-বেগুনী এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুব বেশি। মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মাঝারী আকারের। মধ্য শিরায় ও কচি পত্রফলকের কিনারায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি নেই। আলু খাটো ডিম্বাকৃতি এবং মাঝারী থেকে বড় আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হলুদ। চোখ অগভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৭৫ ± ০.১১%। অঙ্কুর মাঝারী ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিকে বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিকে দুর্বল লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী ও লোমমুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ২১.৮৫ (১১.৩২-৩৭.৫৩) টন। এ জাতটি তাপ ও লবণাক্ততা সহনশীল এবং খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৭২ (সিআইপি-১৩৯)

বারি আলু-৭৩

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু থেকে সংগৃহীত {(বংশ 391925.2 × C92.030) (সিআইপি-১২৭)} জামপ্লাজম সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৭৩' জাত হিসেবে ২০১৬ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪/৬টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ এবং এতে সামান্য এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি আছে। পাতা গাঢ় সবুজ ও মাঝারী আকারের এবং কম ঢেউ খেলানো। মধ্য শিরায় ও শীর্ষ মুকুলের কচি পত্রফলকের কিনারায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি নেই, তবে বোঁটায় উপরিভাগে সামান্য এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি আছে। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বাটে ধরনের ও মধ্যম আকারের। আলুর রং সাদা (ক্রীম), চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং ক্রীম। চোখ হালকা গভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৮৫ ± ০.৪১%। অঙ্কুর মাঝারী ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল, গোড়ার দিকে মাঝারী পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিকে মাঝারী লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারী ও দুর্বল এন্থোসায়ানিন আছে এবং খুব দুর্বল লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৮৫-৯০ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ২১.৮৫ (১১.৩২-৩৭.৫৩) টন। এ জাতটি তাপ সহনশীল এবং খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৭৩ (সিআইপি-১২৭)

বারি আলু-৭৪ (বারসেলোনা)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত বারসেলোনা (বংশ Mondial × Felsina) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৭৪ (বারছেলোনা)' জাত হিসেবে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৫টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মাঝারী। পাতা মাঝারী আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা মাঝারী সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই কম। পত্রফলক বড় আকারের ও চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারী আকারের কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়। আলু ডিম্বাকৃতি থেকে লম্বা ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারী ও রং হলুদ, শাঁসের রং ক্রীম। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ১৭.৬৫ (১৬.৩৬-১৯.২৬)%। অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও কনিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও বেশি লোমযুক্ত। অগ্রভাগ ছোট, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম এবং কম লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৬.৬১ (৩৭.৩৮-৬৭.৫১) টন। অন্য জাতের তুলনায় ৬৫ দিনে ফলন {২৭.১৩ (২২.৪০-৪০.৬৩) টন/হেক্টর} আগাম জাত হিসেবে জাতটি খুবই ভাল।

বারি আলু-৭৪ (বারছেলোনা)

বারি আলু-৭৫ (মন্টেকার্লো)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত মন্টেকার্লো (বংশ Mul 91-13 × Bu 93-136) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৭৫ (মন্টেকার্লো)' জাত হিসেবে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি। পাতা মাঝারী আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা মাঝারী সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই কম। পত্রফলক মাঝারী ধরনের ও মাঝারী চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারী আকারের কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়। আলু খাটো ডিম্বাকৃতি ও মাঝারী আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারী ও রং লাল, শাঁসের রং সাদা। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ১৭.৮১(১৬.৩৭-১৯.০৭)%। অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও খুব বেশি লোমযুক্ত। অগ্রভাগ বড়, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মাঝারী এবং খুব বেশি লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৭০-৭৫দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৭.২৫ (২৩.৬২-৫৩.২৩) টন। জাতটি সবচেয়ে কম সময়ে পরিপক্ক হয় এবং খাবার আলু হিসাবে ভাল ।

বারি আলু-৭৫ (মন্টেকার্লো)

বারি আলু-৭৬ (কারুসো)

নেদারল্যান্ড থেকে সংগৃহীত কারুসো (বংশ SA 2952/72 × SA 92-352-6) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৭৬ (কারুসো)' জাত হিসেবে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়। গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপএবং গড়ে ৪-৭টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা-প্রশাখা মাঝারী। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই কম। পাতা মাঝারী আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা মাঝারী সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি খুবই কম। পত্রফলক মাঝারী আকারের ও চওড়া মাঝারী এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারী আকারের খুবই কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়। আলু খাটো ডিম্বাকৃতি, গোলাকার ও মাঝারী আকারের। আলুর চামড়ার মসৃণতা মাঝারী ও রং হলুদ, শাঁসের রং হালকা হলুদ। চোখ গভীরতা মাঝারী ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত নয়। শুষ্ক পদার্থ ২০.৫৪ (১৮.৩৬-২২.৪০)%। অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে কম পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও কম লোমযুক্ত। অগ্রভাগ মাঝারী, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি কম এবং কম লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৯০-৯৫দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৫.৯৯ (২৭.৭৪-৪৪.৪০) টন। জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী।

বারি আলু-৭৬ (কারুসো)

বারি আলু-৭৭ (সার্পো মিরা)

ডেনমার্ক থেকে সংগৃহীত সার্পো মিরা (বংশ 76 PO 1214268 × D187) জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগিতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি আলু-৭৭ (সার্পো মিরা)' জাত হিসেবে ২০১৭ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন লিফি টাইপ এবং গড়ে ৪-৬টি কাণ্ড থাকে। গাছ কিছুটা খাড়া প্রকৃতির ও শাখা প্রশাখা খুবই কম। কাণ্ড সবুজ মাঝারী ধরনের মোটা এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি। পাতা মাঝারী আকারের ও কম ঢেউ খেলানো। পাতা মাঝারী সবুজ এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি মাঝারী। পত্রফলক বড় আকারের ও চওড়া এবং পত্রফলকের উপরের দিকের মসৃণতা মাঝারী। মধ্য শিরায় উপপত্রের সংখ্যা মাঝারী। শীর্ষের পত্রফলকে উপপত্রের সংখ্যা খুবই কম। পার্শ্বের পত্রফলকে মাঝারী আকারের খুবই কম সংখ্যক উপপত্র দেখা যায়। আলু লম্বা ডিম্বাকৃতি ও বড় আকারের। আলুর চামড়া মসৃণ ও রং লাল, শাঁসের রং হালকা হলুদ। চোখ অগভীর ও চোখ আলুতে সমভাবে বিন্যস্ত। শুষ্ক পদার্থ ১৯.৭২ (১৭.৬৮-২০.৭৬)%। অঙ্কুর মাঝারী আকারের ও ব্রড-সিলিন্ড্রিক্যাল আকৃতির, গোড়ার দিকে খুব বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে ও কম লোমযুক্ত। অগ্রভাগ মাঝারী, এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি বেশি এবং কম লোমযুক্ত। সাধারণ তাপমাত্রায় ৭০-৭৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবনকাল ৯০-৯৫ দিনে আলু পরিপক্কতা লাভ করে। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩৩.৪০ (২৭.৯৫-৪২.৪৭) টন। এ জাতটি নাবিধ্বসা রোগ প্রতিরোধী এবং খাবার আলু হিসাবে ভাল।

বারি আলু-৭৭ (সার্পো মিরা)

বারি আলু-৭৮ (সিআইপি-১১২)

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু থেকে (বংশ: 65-ZA-5 × CFK ৬৯.১) জাতটি দেশে যাচাই বাছাই করে এর পরে ২০১৭ সলে অনুমোদিত হয়। গাছ মধ্যম উচ্চতা সম্পন্ন ইন্টারমিডিয়েট টাইপ এবং গড়ে ৪/৬টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড গাঢ় সবুজ এবং এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি নেই। পাতা গাঢ় সবুজ এবং মাঝারি আকারের। পাতা কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি হালকা/নেই। আলু গোলাকার এবং মাঝারি আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া মসৃণ। আলুর শাসের রং হলুদ। চোখ হালকা গভীর। শুষ্ক পর্দাথ : ১৮.৭৫%। অঙ্কুর মাঝারি ওভোয়েড, গোড়ার দিকে বেশি পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক মাঝারি লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি। সাধারণ তাপমাত্রায় ১০০-১০৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবন কাল ৮৫-৯০ দিন। গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪৬.৩৮ (৩৩.৯৮-৬১.৩৫) টন। জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৭৮

বারি আলু-৭৯ (সিআইপি-১২৬)

আন্তর্জাতিক আলু কেন্দ্র, লিমা, পেরু থেকে সংগৃহীত (বংশ: 387521.3 × APHRODITE) জাতটি যাচাই বছাই করে ২০১৭ অনুমোদিত হয়। গাছ মধ্যম উচ্চতাসম্পন্ন এবং গড়ে ৪/৬টি কাণ্ড থাকে। কাণ্ড সবুজ, সবল এবং অধিক এন্থোসায়ানিন এর বিস্তৃতি আছে। পাতা কম ঢেউ খেলানো এবং মধ্য শিরায় এন্থোসায়ানিন এর মধ্যম বিস্তৃতি আছে। আলু

লম্বাটে মধ্যম-বড় আকারের। আলুর রং লাল, চামড়া হালকা অমসৃণ। আলুর শাসের রং ক্রীম। চোখ অগভীর। শুষ্ক পদার্থ ১৮.৮৫%। অঙ্কুর মাঝারি কনিক্যাল, গোড়ার দিক অধিক পরিমাণে রেড-ভায়োলেট এন্থোসায়ানিন আছে, গোড়ার দিক অধিক লোমযুক্ত, অগ্রভাগ মাঝারি। অঙ্কুরোদগম সাধারণ তাপমাত্রায় ১০০- ১০৫ দিনে অঙ্কুর (স্প্রাউট) বের হয়। জীবন কাল ৮৫-৯০ দিন। গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৪২.৯২ (৩৫.২৩-৫৪.৪৯) টন। এ জাতটি খাবার উপযোগী।

বারি আলু-৭৯

উৎপাদন প্রযুক্তি

আলু বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। সাধারণত ধান ও গমের পরই আলুর স্থান। বর্তমান চাষের জমির পরিমাণ ও ফলনের হিসেবে ধানের পরই আলুর স্থান। একক সময়ে একক জমিতে সর্বাধিক উৎপাদনের কারণে দিন দিন আলু চাষে জমির পরিমাণ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২০১৬-২০১৭ মৌসুমে ৪.৯৯ লক্ষ হেক্টরে মোট ১০২ লক্ষ টন আলু উৎপাদিত হয় যার একক ফলন প্রতি হেক্টরে ছিল ২০.৪৪ টন। আলুর মোট উৎপাদন দেশের চাহিদার তুলনায় বেশি বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেন। কারণ এখনও আলুকে আমাদের দেশে সবজী হিসেবে চিন্তা করা হয়। যদিও আলুর বহুবিধ ব্যবহার ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। চিপস্, ক্রিপস, ফ্লেক্স ও ফেঞ্চফ্রাই তৈরিতে আলু ব্যবহার হচ্ছে এবং দিন দিন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হচেছ। রপ্তানির মাধ্যমে আলু ফসলের নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে। আলু ফসলের গুরুত্ব অনেক গুন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বীজ আলু, খাবার আলু, আগাম আলু, প্রক্রিয়াজাতকরণের জন্য আলু ও রপ্তানির যোগ্য আলু উৎপাদনের জন্য কিছুটা ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা দরকার। নিম্নে আলু উৎপাদনের পদ্ধতি ধারাবাহিক ভাবে বর্ণিত হলো।

জমি নির্বাচন: আলু ফসল যে কোন মাটিতে হতে পারে। তবে বেলে দো-আঁশ থেকে দো-আঁশ মাটি আলু চাষের জন্য উত্তম। উঁচু থেকে মাঝারী উঁচু জমি যেখানে সেচ ও নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা আছে সে সকল জমি নির্বাচন করতে হবে। জমিটি অবশ্যই রৌদ্র উজ্জ্বল হতে হবে। জমিটিতে অবশ্যই একবার ধান চাষ করতে হবে। আগাম ধান আবাদ করা জমি যেখানে ধান কাটার পরই আলুর আবাদ করা সম্ভব সে সকল জমি নির্বাচন করা সবচেয়ে ভাল।

জাত নির্বাচন: কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই এ পর্যন্ত আলুর মোট ৯০টি জাত (যার মধ্যে বারি আলু হিসেবে ৮০ টি) অবমুক্ত করছে। মুক্তায়িত জাতগুলোর মধ্যে রয়েছে খাবার আলু, প্রক্রিয়াজাতকরণের উপযোগী আলু, রপ্তানিযোগ্য আলু, রোগপ্রতিরোধী, আগাম আলু ও সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায় এমন আলুর জাত। এদের মধ্য থেকে প্রয়োজন/চাহিদা মোতাবেক জাত নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরি: মাটিতে "জোঁ" আসার পর গরুর লাঙ্গল বা যন্ত্র চালিত কর্ষণ যন্ত্র পাওয়ার টিলার/ট্রাক্টর দ্বারা গভীরভাবে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে প্রস্তুত করতে হবে। আড়াআড়িভাবে কমপক্ষে ৪টি চাষ দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমিতে বড় মাটির ঢেলা না থাকে এবং মাটি ঝুরঝুরে অবস্থায় আসে। কারণ বড় মাটির ঢেলা আলুর সঠিক বৃদ্ধিতে বাধাগ্রস্থ করে এবং অনেক সময় অসম ও বিকৃত আকার তৈরি করে। জমি তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে জমিতে সুষম সেচ প্রদান করা যায়। সেজন্য জমির উপরিভাগ সমতল করতে হবে।

আলু বীজ সংগ্রহ ও পরিচর্যা: কোল্ড স্টোরেজ থেকে বীজ আলু বের করার পর ৪৮ ঘণ্টা প্রি হিটিং রুমে রাখতে হবে। বীজ আলু বাড়ীতে আনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বস্তা খুলে ছড়িয়ে আবহাওয়ার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য স্বাভাবিকভাবে বাতাস চলাচল করে এমন ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। কারণ বীজ কোল্ড স্টোরেজ থেকে বের করে বস্তা বন্ধ অবস্থায় রাখলে ঘেমে পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বীজ শোধন: কোল্ড স্টোরেজে রাখার আগে বীজ শোধন না হয়ে থাকলে অঙ্কুর গজানোর পূর্বে বীজ আলু দাঁদ বা স্ক্যাব এবং ব্ল্যাক স্কার্ফ রোগ প্রতিরোধের জন্য ৩% বরিক এসিড দিয়ে শোধন করে নিতে হয় (১ লিটার পানি + ৩০ গ্রাম হারে বরিক এসিড মিশিয়ে বীজ আলু ১০-১৫ মিনিট চুবিয়ে পরে ছায়ায় শুকাতে হবে)। পলিথিন সিটের উপর আলু ছড়িয়ে স্প্রে করেও কাজটি করা যায়। তবে খেয়াল রাখতে হবে যেন আলুর সকল অংশ ভিজে যায়।

বীজের পরিমাণ: সাধারণত হেক্টরপ্রতি ১.৫-২.০ টন বীজ আলু প্রয়োজন ।

বীজ তৈরি: অঙ্কুর গজানোর পর ১ম কুঁড়িটি ভেঙ্গে নিতে হবে। কারণ ১ম কুঁড়ি ভেঙ্গে দেয়ার পর অন্যান্য কুঁড়ি সমান ভাবে বৃদ্ধির সুযোগ পায়। আলু ফসলের জন্য ৩০-৪০ গ্রাম ওজনের আস্ত আলু বীজ হিসেবে ব্যবহার করা উত্তম। কেটেও বীজ লাগানো যেতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন প্রতিটি কর্তিত অংশে কমপক্ষে ২টি চোখ থাকে। বীজ লাগানোর ২-৩ দিন পূর্বে আলু কেটে ছায়াযুক্ত স্থানে আর্দ্র আবহাওয়ায় রেখে দিলে কাটা অংশের উপর একটা প্রলেপ পড়ে ফলে মাটি বাহিত রোগ জীবাণু সহজে বীজে প্রবেশ করতে পারবে না। অন্যভাবে পরিষ্কার ছাই মেখেও কাজটি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এক কেজি পরিষ্কার ছাই এর সাথে ১০০-২০০ গ্রাম ফানাইসাইড ডেইমেন এম-৪৫ এত্রোবেধ এম ডেই ইত্যাদি মিশিয়ে দিতে হবে। এতে আলু পচন অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব। আলু কাটার সময় প্রতিটি আলু কাটার পর সাবান পানি দ্বারা ছুরি বা বটি পরিষ্কার করা উচিত যাতে রোগ জীবাণু এক বীজ থেকে অন্য বীজে না ছড়ায়। বীজ আলু আড়াআড়ি ভাবে না কেটে লম্বালম্বিভাবে কাটতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে যাতে প্রতিটি অংশে কমপক্ষে দুটি চোখ বা কুঁড়ি থাকে।

রোপণ সময়: বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫ কার্তিক থেকে ১৫ অগ্রহায়ণ (নভেম্বর মাস) আলু লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে এর আগে এবং পরেও আলু লাগানো সম্ভব। সেক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফলন ও মান অনেক ক্ষেত্রে নাও হতে পারে।

রোপণ পদ্ধতি: গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে প্রচলিত বর্তমান পদ্ধতিতে সারি থেকে সারি দূরত্ব ৬০ সেমি। বীজ থেকে বীজের দূরত্ব আস্ত আলু বীজের জন্য ২৫ সে.মি. এবং কাটা আলুর জন্য ১০-১৫ সে.মি.।

সারের পরিমাণ: দেশের বিভিন্ন স্থানের মাটির উর্বরতা বিভিন্ন রকমের এজন্য সারের চাহিদা সকল জমির জন্য সমান নয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত “সার সুপারিশ গাইড” অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করতে হবে। কারণ জমিতে খাদ্য উপাদানের অভাব হলে আলু গাছে ভাইরাস রোগের লক্ষণ শনাক্ত করতে অসুবিধা হয়। এছাড়া কাঙ্ক্ষিত ফলনও পাওয়া যাবে না। কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই নিম্নলিখিত সারের সুপারিশ করেছে। স্থান ভেদে তা বিএআরসি এর সার সুপারিশ গাইডের সাথে মিল রেখে কম/বেশি করে ব্যবহার করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ		
	হেক্টরে	কেজি/বিঘা	কেজি/শতক
ইউরিয়া	৩২৫-৩৫০ কেজি	৪৪.৭৮-৪৮.২৩	১.৩২-১.৪২
টিএসপি	২০০-২২০ কেজি	২৭.৫৬-৩০.৩২	০.৮১-০.৮৯
এমপি	২৫০-৩০০ কেজি	৩৪.৪৩-৪১.৩২	১.০২-১.২২
জিপসাম	১০০-১২০ কেজি	১৩.৭৮-১৬.৫৪	০.৪০-০.৪৯
জিংক সালফেট	৮-১০ কেজি	১.১০-১.৩৮	০.০৩২-০.০৪০
বোরন (প্রয়োজনবোধে)	৬-৯ কেজি	০.৮৩-১.২৪	০.০২৪-০.০৩৭
গোবর	১০ টন	১,৩৭৮.০০	৪১.০০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: গোবর ও জিংক সালফেট শেষ চাষের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া, সম্পূর্ণ টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও বোরন সার রোপণের সময় সারির দুই পার্শ্বে বা জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ দ্বিতীয়বার মাটি তোলার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে ভালো পদ্ধতিতে বীজ রোপণ লাইনের উভয় পার্শে ১০-১২ সেমি দূরে লাইন টেনে সার দেওয়া ভালো। এতে সারের সঠিক প্রয়োগ হয়। সার প্রয়োগের পর সাথে সাথে সার ও বীজ মাটি দিয়ে ভেলি তুলে ঢেকে দিতে হবে।

সার প্রয়োগের নালা এবং বীজ আলু রোপণের সারির নক্সা নিম্নে দেখানো হল:

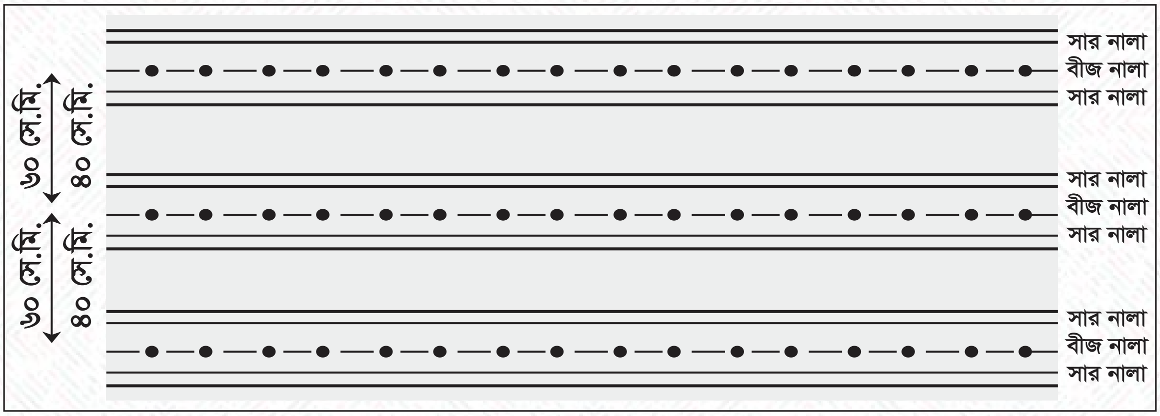

সার প্রয়োগের নালা এবং বীজ আলু রোপণের সারির নক্সা

সেচ প্রয়োগ: বীজ রোপণের পর জমিতে পরিমিত রস না থাকলে সেচ দেওয়া উত্তম, তবে খেয়াল রাখতে হবে ক্ষেতে কোনভাবেই পানি না দাঁড়ায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পানিতে ভেলির ২/৩ অংশ পর্যন্ত ডুবে যায়। এছাড়াও ২-৩ টি সেচ প্রয়োগ করা প্রয়োজন হতে পারে (২০-২৫ দিনের মধ্যে স্টোলন বের হওয়ার সময়। ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে গুটি বের হওয়া পর্যন্ত এবং পরে আলু বৃদ্ধির সময়। জমি থেকে আলু উঠানোর ৭-১০ দিন পূর্বে মাটি ভেদে সেচ প্রয়োগ বন্ধ রাখতে হবে। উল্লেখ্য যে, দাঁদ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আলু রোপণের পর ৩০-৫০ দিনের সময়ে জমিতে কোন অবস্থায় রসের ঘাটতি এবং ৬০-৬৫ দিনের পর রসের আধিক্য হতে দেয়া যাবে না।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: আলুর জমি সর্বদা আগাছামুক্ত রাখা উচিত। আলু লাগানোর ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে আগাছা পরিষ্কার করে দুই সারির মধ্যবর্তী স্থান কুপিয়ে উপরি সার প্রয়োগ করতে হবে। সার মিশ্রিত মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে, কোপানোর সময় যাতে আলু শিকড় বা স্টোলন না কাটে এবং মাটি দেওয়ার সময় গাছের পাতা মাটি চাপা না পড়ে। ৫৫-৬০ দিন পর প্রয়োজন হলে পূণরায় আগাছা পরিষ্কার করে মাটি তুলে দিতে হবে। এছাড়াও পরবর্তীতে কোন কারণে আলু মাটির উপরে উন্মুক্ত হলে তা দেখার সাথে সাথে মাটি তুলে ঢেকে দিতে হবে। প্রয়োজনমতো রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন করতে হবে। রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলে জমি থেকে দূরে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে। এতে ক্ষেতে আলুর মড়ক রোগসহ বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

রোগিং: মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদনে রোগিং একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সঠিকভাবে রোগিং করা না হলে বীজ আলুর গুণাগুণ কমে যায়। এ জন্য গাছের বয়স ৩০-৩৫ দিন থেকে শুরু করে ফসল সংগ্রহ পর্যন্ত নিয়মিত আলুর জমিতে বিভিন্ন জাতের মিশ্রিত গাছ, অস্বাভাবিক এবং রোগাক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে আলু গাছ মাটির নিচে আলুসহ উঠিয়ে অন্যত্র মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে। সকালে এবং বিকালে রোগিং এর জন্য উপযুক্ত সময়। সূর্যের বিপরীত দিকে মুখ করে রোগিং করতে হবে যেন পাতায় সকল লক্ষণ স্পষ্ট বুঝা যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন রোগাক্রান্ত গাছ কোনক্রমেই কোন সুস্থ গাছের সঙ্গে না লাগে এবং শ্রমিকের হাতের স্পর্শ দ্বারাও যেন সুস্থ গাছ রোগ সংক্রমণ না হয়। বীজ ফসলের ক্ষেতে বীজ আলু মাটি ভেদ করে উঠে আসার পর থেকে হাম পুলিং পর্যন্ত ৪/৫ দিন অন্তর অন্তর ফসলের মাঠে যেয়ে রোগিং করতে হবে। রোগমুক্ত মানসম্পন্ন আলু উৎপাদন করায় রপ্তানিযোগ্য আলু উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার।

হামপুলিং বা গাছ উপড়ে ফেলা: হামপুলিং হলো গাছ টেনে উপড়ে ফেলা। হামপুলিং এর ৭-১০ দিন পূর্ব হতে সেচ বন্ধ করতে হবে। তবে বালি মাটি হলে ৫-৭ দিন পূর্বে সেচ বন্ধ করা ভালো। বেশিদিন পূর্বে সেচ বন্ধ করলে বালি মাটির আলুতে হিট ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। হামপুলিং করার সময় মাটিতে পর্যাপ্ত রস থাকলে গাছ ক্ষেত থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। যদি পর্যাপ্ত রস না থাকে তবে গাছ দ্বারা পিলি ঢেকে দিতে হবে। যাতে হিট ইনজুরি হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাবে। ফসল কর্তন (Crop Cutting) করে আলুর আকার ও ফলন দেখে হামপুলিং এর তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।

মাঠে মাটির নিচে কিউরিং: হামপুলিং এর পর মাটি ও আলুর অবস্থার উপর নির্ভর করে ৭-১০ দিন পর্যন্ত মাটি নিচে রেখে আলুর ত্বক শক্ত করতে হবে। আলুর ত্বক শক্ত হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য আলু তুলে বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা আলুর ত্বকে চাপ দিতে হবে। চামড়া না উঠলে বুঝা যাবে কিউরিং হয়েছে। অথবা চটের বস্তায় ২/৩ কেজি নমুনা আলু উঠিয়ে ঝাকুনি দিতে হবে। যদি ছাল না উঠে তবে বুঝা যাবে কিউরিং হয়েছে। বীজআলু মাটির নিচে থাকা অবস্থায় প্রয়োজনে লাইনে মাটি দিয়ে আলু ঢেকে দিতে হবে যেন সূর্যালোকে আলুতে সবুজায়ন ও হিট ইনজুরি না হতে পারে।

আলু উঠানো/সংগ্রহ: শুষ্ক, উজ্জ্বল ও ভালো আবহাওয়াতে আলু উত্তোলন করতে হবে। এক সারির পর এক সারি কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে আলু উঠাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলু আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। আলু উঠানোর পর প্রখর রৌদ্রে রাখা যাবে না। মাঠে প্রাথমিক বাছাইয়ের মাধ্যমে কাটা, ফাটা, আংশিক পচা আলু বাতিল হিসাবে পৃথক করতে হবে যেন ভাল আলুর গাদার সাথে মিশ্রিত হতে না পারে। মাঠে বস্তায় অথবা চট দ্বারা আবৃত ঝুড়িতে ভরে সতর্কতার সাথে অস্থায়ী শেডে পরিবহন করে আনতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আলুর বস্তা বা ঝুড়ি আছড়িয়ে ফেলে আলু ফাটিয়ে বা আলুর ছাল উঠিয়ে থেতলিয়ে ফেলা না হয়।

অস্থায়ী শেড নির্মাণ ও অস্থায়ী শেডে কিউরিং: আলু উৎপাদন মাঠ বা ব্লকের কাছাকাছি ছায়াযুক্ত ঠাণ্ডা ও সহজে বাতাস চলাচল করে এমন উপযোগী করে অস্থায়ী শেড তৈরি করতে হবে। মাঠ থেকে কেবল মাত্র প্রাথমিক বাছাইকৃত আলু শেডের মেঝেতে বিছিয়ে রাখতে হবে যেন আলুর স্তূপ ৪৫ সে.মি. এর বেশি উঁচু না হয়। এ অবস্থায় কমপক্ষে ৩-৫ দিন কিউরিং করতে হবে।

সর্টিং-গ্রেডিং: আলু সংরক্ষণ করার জন্য অবশ্যই ভালোভাবে বাছাই করা দরকার। বাছাই ভাল হলে সংরক্ষণ/ রপ্তানিযোগ্য আলুর মান ভাল হবে। রোগাক্রান্ত, আঘাতপ্রাপ্ত, আংশিক কাটা, ফাটা, অসম আকৃতির ও অতীব সবুজায়নকৃত আলু সঠিকভাবে বাছাই করে পরে বস্তাবন্দী করতে হবে। বাছাইকৃত আলুতে দু-একটি রোগাক্রান্ত বা খারাপ আলু থাকলে অবশিষ্ট আলুর মান ক্ষতিগ্রস্থ হবে এবং আলু রপ্তানির সময় জাহাজেই পচে নষ্ট হবে।

আলু সংরক্ষণ: সর্টিং-গ্রেডিং করার পর আলু নির্দিষ্ট সাইজের বস্তায় (৮০/৫০ কেজি) করে কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ আলু অবশ্যই কোল্ড স্টোরেজে সংরক্ষণ করতে হবে। তবে কিছু পরিমাণ খাবার আলু কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে জাত ভেদে ৩-৫ মাস সংরক্ষণ করা যেতে পারে।

আলুর ক্ষতিকর প্রধান রোগ এবং সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

আলু বীজ জমিতে বপন থেকে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন প্রকারের ক্ষতিকর রোগ দ্বারা আলু গাছ ও বীজ আলু আক্রান্ত হয়। আলুর ক্ষতিকর প্রধান রোগের মধ্যে নাবি ধ্বসা, ঢলে পড়া, দাঁদ, স্কাব বা ষ্টেম ক্যাঙ্কার, ব্লাক লেগ এবং বিভিন্ন প্রকার ভাইরাস রোগ হলো অন্যতম। এ সমস্ত রোগ দমনে সময়োপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে কৃষক পর্যায়ে আলুর লাভজনক উৎপাদন ব্যহত হয়। এসব রোগের লক্ষণ এবং সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

আলুর মড়ক বা নাবি ধ্বসা (Late blight) রোগ

লক্ষণ: আলুর মড়ক রোগ বাংলাদেশের আলু উৎপাদনের প্রধান অন্তরায়। ফাইটোপথোরা ইনফেসট্যান্স (*Phytophthora infestans*) নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় ছোপ ছোপ ভেজা হালকা সবুজ গোলাকার বা এলোমেলো দাগ দেখা দেয়, যা দ্রুত কালো হয়ে পচে যায়। গাছের কাণ্ড এবং টিউবারেও এ রোগের আক্রমণ দেখা যায়। সকাল বেলা মাঠে গেলে পাতার নিচে সাদা সাদা পাউডারের মত ছত্রাক দেখা যায়। তীব্র আক্রমণে সম্পূর্ণ জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। নিম্ন তাপমাত্রা এবং কুয়াশাযুক্ত আবহাওয়ায় আক্রান্ত গাছ, দ্রুত লতাপাতা ও কাণ্ডসহ পচে যায় এবং ২-৩ দিনের মধ্যেই মাঠের সমস্ত গাছই মরে যেতে

আলুর মড়ক রোগ আক্রান্ত গাছ

আলুর মড়ক রোগ আক্রান্ত পাতা

পারে। আক্রান্ত টিউবারের গায়ে ও ভিতরের অংশে গাঢ় বাদামী থেকে কালচে দাগ পড়ে।

অনুকূল আবহাওয়া ও রোগের উৎস: ঠাণ্ডা ও ভেজা আবহাওয়া এ রোগ বিস্তারের জন্য অনুকূল। যদি রাতে নিম্ন তাপমাত্রা ও উচ্চ জলীয় বাষ্প এবং তার সাথে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, কুয়াশা এবং পাতায় শিশির জমে থাকে তাহলে এ রোগ কয়েক দিনের মধ্যে মহামারী রূপ ধারণ করে। ডিসেম্বরের মাঝামাঝী থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের যে কোন সময় এ রোগ আলু গাছে দেখা দিতে পারে। এ রোগের প্রধান উৎস হল আক্রান্ত বীজ। সাধারণত এক হেক্টর জমিতে একটি রোগাক্রান্ত বীজ আলু থাকলেই সেটা অনুকূল পরিবেশে ঐ পরিমাণ জমির ফসল নষ্ট করে ফেলতে পারে। বাতাস, বৃষ্টিপাত, সেচের পানি ইত্যাদির সাহায্যে এ রোগের জীবাণু আক্রান্ত গাছ থেকে সুস্থ গাছে বিস্তার লাভ করে। বিকল্প পোষক যেমন টমেটো গাছ থেকেও এ রোগ বিস্তার লাভ করতে পারে। হিমাগারে রাখা আলুতে এই রোগের জীবাণু সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং গাছ গজানোর ৪৫-৫০ দিন পর অনুকূল পরিবেশে এই রোগের সূচনা হতে পারে।

আলুর মড়ক রোগে মারাত্মক আক্রান্ত মাঠ

রোগ আক্রান্ত আলু

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগ প্রতিরোধী বা সহনশীল জাত যেমন- বারি আলু-৪৬, বারি আলু-৫৩, বারি আলু-৭৭ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে সেচ বন্ধ করে দিতে হবে।
- সারিতে ভালোভাবে মাটি উঁচু করে দিতে হবে।
- আগাম জাতের আলু চাষ করতে হবে এবং আগে সংগ্রহ করতে হবে ।

কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া

- নিম্ন তাপমাত্রা, কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া ও বৃষ্টির পূর্বাভাস পাওয়ার সাথে সাথে রোগ প্রতিরোধের জন্য ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর ম্যানকোজেব গোত্রের ছত্রাকনাশক যেমন- ডাইথেন এম-৪৫/ইন্ডোফিল ইত্যাদি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে স্প্রে করতে হবে।
- জমিতে রোগ দেখা দেওয়া মাত্রই ৭ দিন অন্তর অন্তর নিম্নের যে কোন একটি ছত্রাকনাশক বা ছত্রাকনাশকের মিশ্রণ স্প্রে করতে হবে।
  - সিকিউর (২ গ্রাম/লিটার) অথবা
  - এক্রোভেট এম জেড (২ গ্রাম/লিটার) অথবা
  - মেলোডি ডুও ৪ গ্রাম + সিকিউর ২ গ্রাম (প্রতি লিটার পানিতে) অথবা
  - এক্রোভেট এম জেড ২ গ্রাম + সিকিউর ১ গ্রাম (প্রতি লিটার পানিতে) অথবা
  - মেলোডি ডুও ১ গ্রাম + এক্রোভেট এম জেড ২ গ্রাম (প্রতি লিটার পানিতে)

এখানে উল্লেখ্য যে রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হলে আরো ঘন ঘন ঔষধ ছিটানোর প্রয়োজন পড়তে পারে। ভেজা অবস্থায় জমিতে ছত্রাকনাশক না দেয়াই ভাল। আর যদি দিতেই হয় তাহলে প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ গ্রাম সাবানের গুড়া পাউডার যোগ করে নিতে হবে। ছত্রাকনাশক ভালভাবে ছিটাতে হবে যাতে পাতার নিচে ও উপরে ভালভাবে ভিজে যায়। এ ক্ষেত্রে সাধারন স্প্রেয়ারের পরির্বতে পাওয়ার স্প্রেয়ার ভাল ফল দেয়।

- মাটি ভেজা অবস্থায় কিংবা বৃষ্টির পর পর আলু না তুলে শুকনা অবস্থায় মাটিতে ‘জো’ এলে আলু তুলতে হবে।
- হিমাগারে আলু রাখার আগে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বীজ বাছাই করতে হবে, যাতে কোনভাবে রোগাক্রান্ত আলু সুস্থ বীজের সাথে না থাকে।
- রোগাক্রান্ত গাছ দিয়ে আলুর স্তুপ বা সংগৃহীত আলু ঢেঁকে রাখা যাবে না।

পাতার উপরে স্প্রে

পাতার নিচে স্প্রে

- আলুর মৌসুমে নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করতে হবে।
- মেটালেক্সিল গোত্রের ছত্রাকনাশকের বিরুদ্ধে ফাইটোপথোরা ইনফেসট্যান্স এর নতুন রেস তৈরি হওয়ায় এখন থেকে ঐ গোত্রের ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যাবে না।
- আক্রান্ত জমি হতে বীজ আলু সংগ্রহ করা যাবে না।

বি.দ্র.: কীটনাশক ব্যবহারের পূর্বে স্প্রেকারীকে অবশ্যই এপ্রোন, হাত মোজা, সানগ্লাস ও মাস্ক ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। তাছাড়াও বাতাসের অনুকূলে সব সময় স্প্রে করতে হবে।

ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ (Bacterial wilt)

লক্ষণ: ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ আলুর আর একটি মারাত্মক সমস্যা। র‌্যালসটোনিয়া সোলানেসিয়ারাম (*Ralstonia solanacearum*) নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগে গাছ সাধারণত সবুজ অবস্থায়ই ঢলে পড়ে। গাছের একটি শাখা বা এক অংশও ঢলে পড়তে পারে। কাণ্ডের নিম্নাংশ ও শিকড় অক্ষত থাকে। কাণ্ডের ভিতরে পরিবহন কলায় বাদামী বর্ণের উপস্থিতি, ঢলে পড়া রোগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ যা কাণ্ড চিরলে স্পষ্ট দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের কাণ্ড কেটে পরিষ্কার পানিতে খাড়া করে রাখলে কিছুক্ষণ পর দুধের মতো সাদা উজ (Ooze) বের হয় । সংগৃহীত আলুর চোখে সাদা পুঁজের মতো দেখা যায় এবং আলু অল্প দিনের মধ্যেই পচে যায়। বীজ আলুর ক্ষেত্রে একরপ্রতি যদি ১টি গাছ আক্রান্ত হয় তাহলে সেই মাঠ হতে বীজ আলু কখনই সংগ্রহ করা যাবে না।

অনুকূল আবহাওয়া: আলুর ঢলে পড়া রোগ প্রধানত তাপমাত্রা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। সাধারনত ২৮-৩০° সে তাপমাত্রা এ রোগের জন্য সবচেয়ে অনুকূল। তবে নিম্ন তাপমাত্রায় আলুর কাণ্ডে ও টিউবারে এই জীবাণু সুপ্ত অবস্থায় থাকে। বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০-৯০% এ রোগের বৃদ্ধির জন্য খুবই সহায়ক।

রোগের উৎস ও বিস্তার: এই ব্যাকটেরিয়া মাটিতে কিংবা আক্রান্ত আলুতে বেঁচে থাকে। এ ছাড়াও ফসলের পরিত্যক্ত অংশ ও বিকল্প পোষকেও বেঁচে থাকতে পারে। মাটিতে বৃষ্টি ও সেচের পানি, কৃষি যন্ত্রপাতি, কৃষকের পায়ের মাটি, চারা সংলগ্ন মাটি ইত্যাদি দিয়েও এই জীবাণুর বিস্তার হতে পারে। এই জীবাণু মাটিতে ৩০ সেমি থেকে ৭৫ সেমি গভীরতা পর্যন্ত স্বতন্ত্রভাবে বা শস্যাবশেষের মধ্যে বেঁচে থাকে। সাধারণত আলু গাছের শিকড়ে জীবাণুর আক্রমণের সূচনা হয়ে থাকে। অনেক সময় আলুতে এ রোগের লক্ষণ সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং বাহির থেকে আক্রমণের কোন লক্ষণ বুঝা যায় না।

ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগাক্রান্ত আলু গাছ

ঢলে পড়া রোগাক্রান্ত কাণ্ডের ভিতরের অংশ

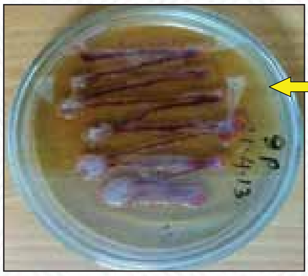

ঢলে পড়া রোগের ব্যাকটেরিয়া (র‌্যালসটোনিয়া সোলানেসিয়ারাম)

ঢলে পড়া রোগের পরীক্ষা- সাদা উজ নির্গমন

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

এই রোগ দমন করা বেশ কষ্টসাধ্য, কেননা এই জীবাণু মাটিতে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে এবং যার অনেক বিকল্প পোষক আছে। তবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাদি অবলম্বন করলে ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ অনেকাংশে কমানো যায়।

- প্রত্যায়িত অথবা রোগমুক্ত এলাকা থেকে সুস্থ ও রোগমুক্ত বীজ সংগ্রহ করতে হবে। বীজ আলু চাষের ক্ষেত্রে কাটা বীজ লাগানো পরিহার করতে হবে।
- আলু লাগানোর সময় জমিতে সর্বশেষ চাষের পূর্বে প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ কেজি হারে ষ্ট্যাপল ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে হবে। বপনের পর যত শীঘ্র সম্ভব গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।
- পরিমিত মাত্রায় সেচ প্রয়োগ করতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ আলুসহ আশেপাশের মাটি দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে। আক্রান্ত জায়গায় ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে হবে। সেচের প্রয়োজন হলে আক্রান্ত অংশ বাদ দিয়ে সেচ দিতে হবে। আশে পাশের গাছও এভাবে বাছাই করতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে পরবর্তীতে আলু, টমেটো, বেগুন, মরিচ, তামাক ইত্যাদি জাতীয় ফসল চাষ করা যাবে না।
- গম, ধান, ভুট্টা, কাউন, বার্লি, সরগাম, পেঁয়াজ, রসুন, কপি, গাজর ইত্যাদি ফসল দিয়ে শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে। বীজ আলু জমিতে ভুট্টা দ্বারা আন্তঃফসল চাষ করলে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ কম হয়।

ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ কমানোর জন্য আলু জমিতে ভুট্টা দ্বারা আন্তঃফসল চাষ

- গ্রীষ্মকালে কয়েকবার জমি চাষ করে প্রখর রৌদ্রে মাটি শুকিয়ে নিতে হবে এতে মাটিতে অবস্থিত রোগ জীবাণু অনেক কমে যায়।
- এ রোগ দেখা মাত্র আক্রান্ত জমিতে সেচ প্রদান, নিড়ানী দেওয়া, মালচিং ইত্যাদি বন্ধ করতে হবে।
- আলু লাগানোর পূর্বে জমিতে ধান থাকলে সে ধানের নাড়া শুকিয়ে মাটিতে বিছিয়ে পুড়ে ফেলতে হবে। এতে মাটির রোগ জীবাণু অনেকাংশে কমে যায়।
- যে জমি সব সময় ভেজা বা স্যাঁত স্যাঁতে থাকে সে জমিতে বীজ আলু কখনই চাষ করা যাবে না। কারণ ভেজা জমিতে ব্যাকটেরিয়ার উপদ্রব বেশি হয়।

আলুর দাঁদ (Scab) রোগ

লক্ষণ : আলুর দাঁদ রোগ বর্তমানে আলুর একটি মারাত্মক রোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। এই রোগে আক্রান্ত আলু কখনই বীজ আলু হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। স্ট্রেপ্টোমাইসিস স্কেবিজ (*Sterptomycis scabies*) নামক জীবাণুর আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। দাঁদ রোগে আলুর টিউবারের উপরে উঁচু অমসৃণ বিভিন্ন আকারের বাদামী খস্‌খসে দাগ পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে পুরো টিউবারই দাগে ভরে যায় এবং অনেক সময় দাগগুলো দেবে যায়। রোগের আক্রমণ সাধারণত ত্বকেই সীমাবদ্ধ থাকে।

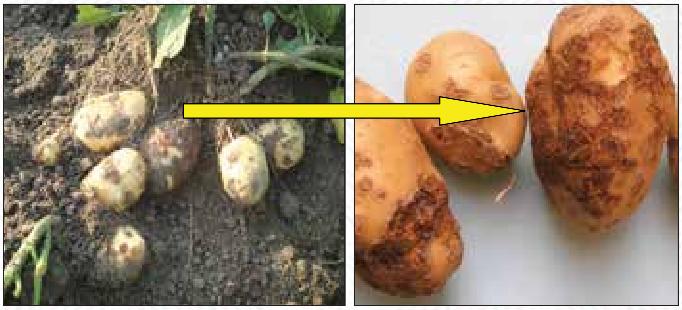

দাঁদ রোগে আক্রান্ত আলু

অনুকূল আবহাওয়া ও রোগের উৎস: উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ আর্দ্রতা এ রোগ বিস্তারে সহায়ক। এ রোগটি বীজ ও মাটি বাহিত। কোন পোষক গাছ ছাড়াই এ রোগের জীবাণু মাটিতে পাঁচ (৫) বছরের অধিক কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে।

সাধারণত গাছে টিউবার আসার সময় কম পক্ষে ৩০ দিন পর্যন্ত যদি জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকে অথবা আলু গাছের বয়স ৬৫ দিন পর যদি জমিতে অতিরিক্ত রস থাকে তাহলে এ রোগটি বেশি হয়। বিভিন্ন প্রকার ফসল যেমন মূলা, গাজর, শালগমে এই রোগের জীবাণু বহুদিন বেঁচে থাকে।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- মুক্তায়িত নতুন জাত যেমন- বারি আলু-২৫, বারি আলু-২৮, বারি আলু-৩১, বারি আলু-৩৪, বারি আলু-৪১, বারি আলু-৪৮, বারি আলু-৫০, বারি আলু-৫৩, বারি আলু-৫৬, বারি আলু-৫৭ সহ অন্যান্য নতুন জাত ব্যবহার করা যেতে পারে।
- রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- বীজ আলু বোল্ড স্টোরেজ হতে সংগ্রহের পরে স্প্রাউটিং এর পূর্বে প্রোভেক্স-২০০ (০.২%) বা ডাইথেন এম-৪৫ (০.২% দিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- সেচের তারতম্যের কারণে অনেক সময় দাঁদ রোগের সূচনা হয়। দাঁদ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য আলু লাগানের ৩০-৩৫ দিন পর্যন্ত কোন অবস্থাতেই মাটিতে রসের যেন ঘাটতি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আলুর টিউবার ধারণের সময় ৩৫-৫৫ দিন পর্যন্ত পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। আলু উত্তোলনের আগে মাটিতে বেশি রস থাকলে আলু দাঁদ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। গাছের বয়স ৭০ দিনের পর সেচ বন্ধ করতে হবে।
- বীজ আলু চাষের পূর্বে জমিতে সবুজ সার চাষ করতে হবে।
- শস্য পর্যায়ে জমিতে গম বা ডাল জাতীয় ফসল চাষ করতে হবে।
- সুষম সার (জৈব ও অজৈব) ব্যবহার করতে হবে।

আলুর স্টেম ক্যাঙ্কার (Stem canker) বা স্কার্ফ রোগ

লক্ষণ: আলুর স্কার্ফ রোগও আলুর একটি ক্ষতিকারক রোগ। রাইজোকটনিয়া (*Rhizoctonia* spp.) প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। কৃষক পর্যায়ে একে রাইজোকটনিয়া রোগ বলে। এ রোগের প্রধান লক্ষণ হলো কাণ্ডের সাথে ছোট ছোট সবুজ টিউবার দেখা যায়। বড় গাছের গোড়ার দিকে কাণ্ডে লম্বা কালো বর্ণের দাগ বা ক্ষতের সৃষ্টি হয়। অনেক ক্ষেত্রে গাছে বেশি শাখা প্রশাখা দেখা দেয় এবং পাতা ভাইরাসের মত হালকা মোড়ানো দেখা যায়। গাছের কাণ্ড তুলনামূলকভাবে শক্ত হয়ে যায়, কাণ্ডের গিঁট মোটা হয়ে যায় ও কাণ্ড সহজেই মট করে ভেঙে যায়। আক্রান্ত আলুতে কালো কালো উঁচু দাগ পড়ে এবং বীজ হিসেবে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

অনুকূল আবহাওয়া ও রোগের উৎস: উচ্চ তাপমাত্রা এবং জমির উচ্চ আর্দ্রতা এ রোগ বিস্তারে সহায়ক। এ রোগটি বীজ ও মাটি বাহিত এবং প্রাথমিক উৎস আক্রান্ত বীজ।

আলুর স্কার্ফ রোগে আক্রান্ত হালকা পাতা মোড়ানো গাছ

স্কার্ফ রোগে আক্রান্ত আলুর কাণ্ডে সবুজ বায়বীয় কন্দসমন্বিত

দমন ব্যবস্থাপনা

- প্রত্যায়িত অথবা রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- ভালোভাবে অঙ্কুরিত বীজ আলু রোপণ করতে হবে।
- শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।
- বীজ আলু মাটির বেশি গভীরে রোপণ পরিহার করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম প্রোভেক্স ২০০ অথবা বেভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে বীজ শোধন করে বপন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- রোগের আক্রমণ বেশি হলে ব্যাভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে গাছের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- কখনও জমিতে অতিরিক্ত পানি দেয়া যাবে না।

আলুর কালো পা (Black leg)

লক্ষণ: আলুর কালো পা বীজ আলুর একটি প্রধান রোগ। আরউইনিয়া কেরোটোভোরা (*Erwinia carotovora*) নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। মাঠে ও সংরক্ষিত আলুতে এ রোগ দেখা দেয়। মাঠে গাছের গোড়ায় কালো দাগ পড়ে বলে কালো পা এবং সংরক্ষণাগারে টিউবার আক্রান্ত হলে নরম পচা রোগ বলে। আক্রান্ত গাছের কাণ্ডের গোড়ার দিকে বাদামী থেকে কালো রঙের দাগ পড়ে এবং যা সহজেই সুস্থ অংশ থেকে আলাদা করা যায়। আক্রান্ত ডাল তুলে নাকের কাছে ধরলে এক ধরনের পচা আলুর মতো গন্ধ পাওয়া যায়। আক্রান্ত গাছের আলু পচে যায়।

আলুর কালো পা রোগে আক্রান্ত গাছ

অনুকূল আবহাওয়া ও রোগের উৎস: উচ্চ তাপমাত্রা এবং জমির উচ্চ আর্দ্রতা এ রোগ বিস্তারে সহায়ক। এ রোগটি বীজ ও মাটি বাহিত।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- প্রত্যায়িত অথবা রোগমুক্ত বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- অতিরিক্ত সেচ পরিহার করতে হবে।
- উচ্চ তাপ এড়ানোর জন্য আগাম চাষ করতে হবে।
- ভালভাবে বাছাই করে হিমাগারে আলু সংরক্ষণ করতে হবে।
- আলু লাগানোর সময় জমিতে সর্বশেষ চাষের পূর্বে প্রতি হেক্টরে ২০-২৫ কেজি হারে স্টেপল ব্লিচিং পাউডার জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বপনের পর যত শীঘ্র সম্ভব গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।
- স্টেপল ব্লিচিং পাউডার প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম অথবা বোরিক এসিড প্রতি লিটার হালকা গরম পানিতে ৩০ গ্রাম দ্রবণে টিউবার শোধন করে বীজ আলু সংরক্ষণ করতে হবে।
- রোগ দেখা মাত্র পানি সেচ বন্ধ করতে হবে। আলুর কালো পা রোগে আক্রান্ত গাছ আলুসহ আশেপাশের মাটি দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নষ্ট করে ফেলতে হবে। আক্রান্ত জায়গায় ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করতে হবে। সেচের প্রয়োজন হলে আক্রান্ত অংশ বাদ দিয়ে সেচ দিতে হবে। আশে পাশের গাছও এভাবে বাছাই করতে হবে ।

আলুর শুকনো পচা রোগ

ফিউজেরিয়াম (*Fusarium sp.*) প্রজাতির ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। আলুর গায়ে কিছুটা গভীর বাদামী চক্রাকার দাগ পড়ে। আলুর ভিতরে গর্ত হয়ে যায়। প্রথম পচন যদিও ভিজা থাকে পরে তা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়। আক্রান্ত অংশে গোলাকার ভাঁজ এবং কখনো কখনো ঘোলাটে সাদা ছত্রাক জালিকা দেখা যায়।

শুকনো পচা রোগ

প্রতিকার

- আলু বাছাই করে এবং যথাযথ কিউরিং করে আলু গুদামজাত করতে হবে।
- যান্ত্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ টিউবার ব্যবহার করা যাবে না। আগাম বপন করা এবং আগাম সংরক্ষণ করা।
- বস্তা, ঝুড়ি ও গুদামঘর ইত্যাদি ৫% ফরমালিন দিয়ে শোধন করতে হবে।

ভিতরের কালো দাগ

ভিতরের কালো দাগ সাধারনত হিমাগারে অক্সিজেন এর অভাব হলে এ রোগ দেখা দেয় এবং আলুর গুণাগুণ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। বীজ হিমাগারে ২.২-৩.৫°c তাপমাত্রা সবসময় বহাল রাখতে হবে। হিমাগারে বাতাস চলাচল স্বাভাবিক

রাখতে হবে। তাছাড়া, আলুর বস্তা প্রতি মাসে অন্তত একবার উল্টাতে হবে ।

ভিতরে ফাঁপা রোগ: এ রোগে আলুর ভিতরের অংশ ফাঁপা হয়ে যায়। জমিতে সাধারনত পানির অভাব হলে হঠাৎ সেচ প্রয়োগের ফলে টিউবার অতিরিক্ত বড় আকার ধারণ করলে এ রোগ হতে পারে।

ভিতরের কালো দাগ

প্রতিকার

- নিয়মিত সেচ প্রয়োগে এ রোগ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- জমির মাটির নমুনা পরীক্ষা করে মাইক্রো নিউট্রিয়েন্ট এর ঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে।

আলুর ভাইরাস রোগ (Viral Diseases of Potato)

আলুর ভাইরাস রোগ আলুর ফলন কম হওয়ার অন্যতম কারণ। আমাদের দেশের কৃষকরা এই রোগ সম্পর্কে সচেতন নয় বিধায় ভাইরাস আক্রান্ত আলু বছরের পর বছর ব্যবহার করে। ফলে কৃষক দ্বারা উৎপাদিত আলুর ফলন অত্যন্ত কম। আলুর ভাইরাস রোগসমূহের মধ্যে আলুর পাতা মোড়ানো (PLRV), আলুর ভাইরাস ওয়াই (PVY), আলুর ভাইরাস এক্স (PVX) এবং আলুর ভাইরাস এস (PVS) এ দেশের জন্য প্রধান। এই সমস্ত ভাইরাস এককভাবে অথবা যৌথভাবে আলু গাছ আক্রমণ করে। সাধারণভাবে ভাইরাস আক্রান্ত আলু গাছ আকারে ছোট, পাতা কোঁকড়ানো, হলুদ অথবা মোজাইকের রং হয় এবং খসখসে হয় যা সহজেই নিবিড় পর্যবেক্ষণ করলে কৃষক সুস্থ গাছ থেকে ভাইরাস আক্রান্ত আলু গাছ আলাদা করতে পারবে। ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হলে আলুর আকার ছোট হয় এবং আলুর উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। ভাইরাসসমূহ জাব পোকা এবং স্পর্শের মাধ্যমে গাছ থেকে গাছে ছড়ায়। বাংলাদেশের আবহাওয়া আলুর এই ভাইরাস রোগসমূহের বাহক জাব পোকা (Aphids) বংশ বিস্তারের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। রোগমুক্ত বীজ আলু উৎপাদনের জন্য আলুর ভাইরাস রোগসমূহ চেনা কৃষকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে প্রধান কয়েকটি ভাইরাস রোগের লক্ষণ ও দমন সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো।

আলুর পাতা মোড়ানো ভাইরাস (Potato Leaf Roll Virus)

লক্ষণ: জাব পোকার মাধ্যমে আলুর এই ভাইরাস গাছ থেকে গাছে ছড়ায় । এ রোগের প্রধান লক্ষণ হলো আক্রান্ত গাছের পাতা উর্ধ্বমুখী হয়ে উপরের দিকে গুটিয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ হলে নিচের পাতা খসখসে, খাড়া ও উপরের দিকে গুটানো হয়। কখনও কখনও পাতার কিনারা শুকিয়ে যায়। গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় ফলে গাছ খাটো ও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে । এ রোগে আক্রান্ত হলে শতকরা ৪০-৮০% উৎপাদন হ্রাস পায় এবং আলুর আকার ছোট হয়।

সুস্থ আলুর গাছ

পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগে আক্রান্ত গাছ

অনুকূল আবহাওয়া ও রোগের উৎস: এ রোগটি আক্রান্ত বীজ আলু ও জাব পোকার সাহায্যে ছড়ায়। সাধারণত জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে জাব পোকার দ্রুত বংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে এ রোগটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। ধুতুরা, ফোসকা বেগুন ইত্যাদি এ রোগের বিকল্প পোষক হিসেবে কাজ করে।

আলুর ওয়াই ভাইরাস (Potato Virus Y)

লক্ষণ: পাতা মোড়ানো ভাইরাসের পরই আলুর ওয়াই ভাইরাস এর স্থান। এ রোগে ক্ষতির পরিমাণ ৯৫% পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং আলুর আকার অত্যন্ত ছোট হয়। এ রোগ জাব পোকা এবং স্পর্শ দুই ভাবেই বিস্তার লাভ করে। আক্রান্ত গাছের পাতার শিরায় কালচে দাগ, পাতা মরে যেয়ে গাছে ঝুলে থাকা, গাছ বেটে ও কুঁকড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি এ রোগের লক্ষণ । আবার অনেক সময় পাতায় মৃদু মোজাইক লক্ষণও দেখা যায়।

ওয়াই ভাইরাসে আক্রান্ত আলু গাছের লক্ষণ

রোগের বিস্তার ও বিকল্প পোষক: প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত বীজ আলু এবং পরবর্তীতে জাবপোকা, জমিতে কাজ করার কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদির স্পর্শের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। টমেটো, বথুয়া ইত্যাদি এ রোগের বিকল্প পোষক।

এক্স ভাইরাস আক্রান্ত আলু গাছ

আলুর এক্স ভাইরাস (Potato Virus X)

লক্ষণ: আলুর ওয়াই ভাইরাসের পরই আলুর এক্স ভাইরাসের স্থান। এ রোগে ৫-১৫% ফলন কমতে পারে। যা একটি মারাত্মক স্পর্শক (Contact) রোগ। গাছে এ রোগের লক্ষণ কদাচিৎ মোজাইক, হলদেভাব, ছোট পাতা, মরা বা থুবড়ে যাওয়া পাতা দেখা যায় । এ রোগের ফলে গাছ ও টিউবার ছোট হয়ে যায়। মরিচ, টমেটো, বথুয়া, ধুতুরা, তামাক ইত্যাদি এ ভাইরাসের বিকল্প পোষক হিসাবে কাজ করে।

আলুর এস ভাইরাস (Potato Virus S)

লক্ষণ: আলুর এস ভাইরাসের লক্ষণ বোঝা বেশ কঠিন । কোন কোন জাতে এ রোগে পাতার উপরে শিরা গভীর হয়ে যায়, পাতা তামাটে বর্ণ ধারণ করে ঝরে যেতে পারে, অনেক সময় পাতা খসখসে হয় এবং পাতায় মরা দাগ পড়ে। এ ভাইরাসের আক্রমণেও আলুর আকার ছোট হয়ে যায়।

এস ভাইরাসে আক্রান্ত আলু গাছ

রোগের উৎস ও বিস্তার: আক্রান্ত বীজ আলু, জাব পোকা এবং স্পর্শের সহায়্যে এ রোগের বিস্তার ঘটে।

মিশ্র ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত আলু গাছের বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ: আলু গাছ যখন পরিপক্কতার দিকে যায় তখন সাধারণত একই গাছে একাধিক ভাইরাস আক্রমণ করে। যৌথ ভাইরাস আক্রান্ত পাতাও কোঁকড়ানো ও খসখসে হয় এবং এতে কাল দাগ পড়ে জটিল লক্ষণ দেখা যায়। একাধিক ভাইরাস আক্রান্ত গাছেও আলু আকারে ছোট হয় এবং ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায়।

এক্স ও ওয়াই ভাইরাস এর মিশ্র আক্রমণে আলু গাছের বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ

এস, এক্স ও ওয়াই ভাইরাস এর মিশ্র আক্রমণে আলু গাছের বিভিন্ন ধরনের লক্ষণ

ভাইরাস রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

এক্স ও এস ভাইরাস এর মিশ্র আক্রমণে আলু গাছের লক্ষণ

- ভাইরাসমুক্ত প্রত্যায়িত বীজ আলু ব্যবহার করতে হবে।
- আগাম জাতের আলু চাষ যা নভেম্বরের ২৫ তারিখের (১১ কার্তিক) মধ্যে করতে হবে এবং আগাম সংগ্রহ করতে হবে ।
- জমি আগাছা মুক্ত করতে হবে। জমির আশে পাশের বিকল্প পোষক গাছ যেমন- টমেটো, তামাক, মরিচ, ধুতুরা, বথুয়া, ফোসকা বেগুন ইত্যাদি থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে।
- সারিতে ভালোভাবে মাটি উঁচু করে দিতে হবে।
- আলু গজানোর সাথে সাথে (২০-২৫ দিন বয়স হতে) নিয়মিতভাবে ভাইরাস আক্রান্ত গাছ রোগিং অর্থাৎ আলু সহ তুলে মাটির নিচে পুঁতে ফেলতে হবে।
- জাব পোকা দমনে ইমিডাক্লোরোপিড গোত্রের কীটনাশক যেমন- এডমায়ার (০.৫ মি.লি./লিটার পানিতে) অথবা ম্যালাথিয়ন (২ মি.লি./লিটার পানিতে) ১০-১৫ দিন পর পর জমিতে নিয়মিত ভাবে স্প্রে করতে হবে।
- আলু গাছের বয়স ৮০ দিন হলে হামপুলিং (আলু গাছ শিকড়সহ তুলে ফেলা) করতে হবে এবং এরপর কমপক্ষে ৮-১০ দিন আলু জমিতে মাটির নিচে রেখে দিতে হবে।

আলুর পোকামাকড়

কাটুই পোকা

কাটুই পোকার কীড়া বেশ শক্তিশালী, ৪০-৫০ মিমি লম্বা। পোকার উপর পিঠ কালচে বাদামী বর্ণের, পার্শ্বদেশ কালো রেখাযুক্ত এবং বর্ণ ধূসর সবুজ। শরীর নরম ও তৈলাক্ত। এই পোকার কীড়া দিনের বেলা মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে এবং রাতের বেলা চারা গাছ কেটে দেয়। এই পোকা আলুতে ছিদ্র করে আলু ফসলের ক্ষতি করে থাকে।

কাটুই পোকার মথ

কাটুই পোকা ডিম ও কীড়া

কাটুই পোকার কীড়া

কাটুই পোকার পিউপা

কাটুই পোকার দ্বারা কাটা গাছের কাণ্ড

কাটুই পোকা দ্বারা আক্রান্ত আলু

প্রতিকার

- ❀ আক্রান্ত কাটা আলু গাছ দেখে তার কাছাকাছি মাটি উল্টে পাল্টে কীড়া খুঁজে সংগ্রহ করে মেরে ফেলা উচিত।
- ❀ কাটুই পোকার উপদ্রব খুব বেশি হলে সেক্স ফেরোমন ট্রাপ + ফুরাডান ৫জি (কার্বোফুরান) @ ২০ কেজি/হেক্টর জমি তৈরির সময় এবং শেষ সেচের পূর্বে প্রয়োগ করে এই পোকার আক্রমণ কমানো সম্ভব।
- ❀ এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ক্লোরোপাইরফস ২০ ইসি জাতীয় কীটনাশক (ক্লোরোপাইরফস) ৫ মিলি হারে মিশিয়ে গাছের গোড়া ও মাটিতে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে। আলু লাগানোর ৩০-৪০ দিন পর স্প্রে করতে হবে।
- ❀ কাটুই পোকার কীড়া দমনের জন্য বিষটোপ ব্যবহারে ভালো ফল পাওয়া যায়। ১ কেজি ধানের কুড়া এবং ক্লোরোপাইরিফস ৫ এমএল মিশিয়ে বিষটোপ তৈরি করা হয়।

আলুর সুতলী পোকা

আলুর সুতলী পোকার মথ আকারে ছোট, ঝালরযুক্ত ও সরু ডানা বিশিষ্ট ধূসর বাদমী বর্ণের হয়। পূর্ণাঙ্গ কীড়া সাদাটে বা হাল্কা গোলাপী বর্ণের এবং ১৫-২০ মিমি লম্বা হয়ে থাকে। কীড়া আলুর মধ্যে লম্বা সুড়ঙ্গ করে আলুর ক্ষতি করে থাকে। বাংলাদেশে বসতবাড়িতে সংরক্ষিত আলু এ পোকার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সুতলী পোকর মথ

সুতলী পোকর ডিম

সুতলী পোকর কীড়া

সুতলী পোকর পিউপা

সুতলী পোকা দ্বারা আক্রান্ত কাণ্ড

সুতলী পোকা দ্বারা আক্রান্ত আলু

প্রতিকার

জমিতে সুতলী পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

- ❀ আলুর জমিকে সর্বদা আবর্জনামুক্ত রাখতে হবে।
- ❀ আলুর সুতলী পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্রাপ এর সাথে মাটি উঠানোর (Hilling up) মাধ্যমে এই পোকা দমন করা যায়। সেক্স ফেরোমন ট্রাপ + মাটি উঠানো (সর্বশেষ মাটি উঠানো অবশ্যই আলু সংগ্রহের কমপক্ষে ৬০ দিন পূর্বে করতে হবে)।
- ❀ মাঠ থেকে তোলার পর আলু উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা যাবে না, কারণ স্ত্রী মথ রাত্রি বেলায় উন্মুক্ত আলুর গায়ে ডিম পাড়ে। তাই মাঠ থেকে আলু তোলার পর মশারি অথবা পাতলা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

বসত বাড়িতে সংরক্ষিত আলুর সুতলী পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

- আলু সংরক্ষণ করার আগে সুতলী পোকা আক্রান্ত আলু বেছে ফেলে দিতে হবে।
- আলুর সুতলী পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্রাপ এর সাথে শুকনো বালি এবং নীম ওয়েল কেক (বালি এবং নীম ওয়েল কেক মিশ্রিত স্তর ০.৫ সেমি) এর ব্যবহার-সেক্স ফেরোমন ট্রাপ + শুকনো বালির পাতলা স্তর + নীম ওয়েল কেক @ ৩:১।
- বাড়িতে সংরক্ষিত আলু শুকনা বালি, ছাই, তুষ অথবা কাঠের গুঁড়ার একটি পাতলা স্তর (আলুর উপরে ০.৫ সেমি) দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

ফেরোমন ট্রাপ এর সাথে শুকনো বালি এবং নীম ওয়েল কেক দ্বারা আলু সংরক্ষণ করার পদ্ধতি

মিষ্টি আলু

বাংলাদেশে মিষ্টি আলু আজও অবহেলিত, তাই একে গরীবের ফসল বলা হয়। কিন্তু এর পুষ্টিমান বিবেচনা করে বর্তমানে কেউ আর এটাকে অবহেলিত বা গরীবের ফসল বলছেন না । কারণ, এতে প্রচুর পরিমাণ শর্করা, খনিজ ও ভিটামিন আছে। এটি বিশ্বের অন্যতম শর্করা সমৃদ্ধ ফসল। এক একক জমি থেকে মিষ্টি আলু যে পরিমাণ শর্করা উৎপন্ন করে তা অন্যান্য ফসল থেকে অনেক বেশি। এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-এ আছে। এই ভিটামিন-এ এর অভাবে আমাদের দেশে প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) শিশু রাতকানা রোগে ভোগে এবং আস্তে আস্তে অনেকে অন্ধত্ব বরণ করে। এক পরীক্ষায় দেখা গেছে , রঙিন শাঁস যুক্ত ১২৫ গ্রাম মিষ্টি আলু প্রতিদিন খেলে একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের 'ভিটামিন-এ' চাহিদা পূরণ হয়। মিষ্টি আলুতে Glycemic index অনেক কম থাকার কারণে ডায়বেটিস রোগীরাও সহজে খেতে পারেন। মিষ্টি আলুর ভিটামিন B6 রক্তনালীকে স্বাভাবিক রেখে হৃদরোগ নিয়ন্ত্রণ করে।

বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই মিষ্টি আলুর চাষ হয়। এ ফসলের স্থানীয় জাতগুলো গুণেমানে ও ফলনে উৎকৃষ্ট নয়। স্থানীয় জাতগুলোর গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ১০ টনের কম কিন্তু উচ্চফলনশীল মিষ্টি আলুর জাতের ফলন প্রায় ৩০-৪০ টন/হেক্টর। প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উৎকৃষ্ঠমানের হালুয়া, চিপস, জ্যাম, জেলী ইত্যাদি মিষ্টি আলু থেকে তৈরি করা যায়।

কৃষি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০১৪-১৫ তে বাংলাদেশে মিষ্টি আলুর আওতায় জমির পরিমাণ প্রায় ৩০ হাজার হেক্টর এবং বার্ষিক উৎপাদন প্রায় ৩.৫ লক্ষ মে.টন।

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, দীর্ঘ দিন যাবৎ এ ফসলের উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। দীর্ঘ দিন গবেষণার পর এ পর্যন্ত ১৩ টি উচ্চ ফলনশীল ও গুণাগুণ সমৃদ্ধ মিষ্টি আলুর জাত উদ্ভাবন করেছে। জাতগুলি হলো বারি মিষ্টি আলু-১ (তৃপ্তি), বারি মিষ্টি আলু-২ (কমলাপুরী), বারি মিষ্টি আলু-৩ (দৌলতপুরী), বারি মিষ্টি আলু-৪, বারি মিষ্টি আলু-৫, বারি মিষ্টি আলু-৬, বারি মিষ্টি আলু-৭, বারি মিষ্টি আলু-৮, বারি মিষ্টি আলু-৯, বারি মিষ্টি আলু-১০, বারি মিষ্টি আলু-১১, বারি মিষ্টি আলু-১২, বারি মিষ্টি আলু-১৩, বারি মিষ্টি আলু-১৪, বারি মিষ্টি আলু-১৫। নিম্নে উদ্ভাবিত লাগসই ও সম্ভাবনাময় জাত সমূহের প্রধান বৈশিষ্ট গুলো বর্ণণা করা হল-

বারি মিষ্টি আলু-২ (কমলা সুন্দরী)

১৯৮০ সালে এশীয় সবজি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র, তাইওয়ান থেকে লাইনটি এনে অন্যান্য জার্মপ্লাজমের সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উপযোগিতা যাচাই করে ১৯৮৫ সালে জাতটি কমলা সুন্দরী নামে অনুমোদিত হয়।

এ জাতের কাণ্ড সবুজ, পাতা কচি অবস্থায় বেগুনী, কাণ্ডের অগ্রভাগ বেগুনী ও পাতা সবুজ। কন্দমূল লাল, শাঁস কমলা বর্ণের। কন্দমূলের আকৃতি উপ বৃত্তাকার হয়। কন্দমূলের ওজন ১৮০-২২০ গ্রাম। শাঁস নরম। প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে প্রায় ৭,৫০০ আ.ইউ. ভিটামিন 'এ' আছে। এ জাতের কাণ্ডের অগ্রভাগ বেগুনী ও পাতার উল্টো দিকের শিরা বর্ণহীন। জীবনকাল ১৩৫-১৪০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ৪০-৪৫ টন ফলন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ আলুর চাষ করা যায়।

বারি মিষ্টি আলু -৪

কমলা সুন্দরী, তৃপ্তি, দৌলতপুরী ও এস পি-০২৯ এর সাথে উন্মুক্ত পরাগায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ক্লোন থেকে বাছাই করে জাতটি বারি মিষ্টিআলু-৪ নামে ১৯৯৪ সালে অনুমোদন লাভ করে। কন্দমূল ও শাঁস ঘি বর্ণের। কন্দমূলের ওজন ১৭৫-১৯৫ গ্রাম ও আকৃতি উপ বৃত্তাকার। প্রতি গ্রাম শাঁসে প্রায় ১০৫০ আ.ইউ. ভিটামিন 'এ' আছে। জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন।

উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন হয় ৪০-৪৫ টন। উইভিলের আক্রমণ কম হয়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই বিশেষ করে যশোর ও খুলনায় এ জাতটি আগাম চাষ করা যায়। বারি মিষ্টিআলু-৪ একটি উচ্চ ফলনশীল, ক্যারোটিন সমৃদ্ধ ও মাঝারী শুষ্ক শাঁসযুক্ত জাত। এ জাতের কাণ্ড সবুজ, কাণ্ডের অগ্রভাগ বেগুনী, পাতা সবুজ, কচি পাতা বেগুনী।

বারি মিষ্টি আলু -৫

কমলা সুন্দরী, তৃপ্তি, দৌলতপুরী ও এস পি-০২৯ এর সাথে উন্মুক্ত পরাগায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ক্লোন থেকে বাছাই করে জাতটি বারি মিষ্টিআলু-৫ নামে ১৯৯৪ সালে অনুমোদন লাভ করে। কন্দমূল লম্বাটে উপ বৃত্তাকার, বর্ণ ঘিয়ে, শাঁস হলুদাভ। কন্দমূলের ওজন ১৮০-২২০ গ্রাম। প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে প্রায় ১০০০ আ.ইউ. ভিটামিন 'এ' আছে। জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন হয় ৩৫-৪৪ টন। উইভিলের আক্রমণ কম হয়। বিশেষ করে যশোর ও খুলনায় এ জাতটি আগাম চাষ করা যায়। বারি মিষ্টিআলু-৫ একটি উচ্চ ফলনশীল, ক্যারোটিন সমৃদ্ধ ও শুষ্ক শাঁসযুক্ত জাত। এ জাতের কাণ্ড ও কাণ্ডের অগ্রভাগ সবুজ ও কাণ্ড রোমশ হয়। পাতা সবুজ ও সামান্য খাঁজ কাটা। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এ আলুর চাষ করা যায়।

বারি মিষ্টি আলু -৮

আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০২ সালে কয়েকটি মিষ্টি আলুর লাইন সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সিআইপি-৪৪০০২৫ লাইনটি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল প্রতীয়মান হওয়ায় ২০০৮ সালে উক্ত লাইনটি বারি মিষ্টি

আলু-৮ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ জাতের লতা ও পাতার বর্ণ সবুজ। কন্দমূলের চামড়ার বর্ণ লাল, শাঁসের বর্ণ হলুদ। কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০ গ্রাম। শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ শতকরা ৩৫.৩ ভাগ। প্রতি ১০০ গ্রামে ৬৫০ আ.ইউ ভিটামিন 'এ' রয়েছে। জীবনকাল ১২০-১৩৫ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ৪০-৪৫ টন ফলন পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতের চাষ করা যায়। এ জাতটি খরা সহিষ্ণু। এ জাতে উইভিলের আক্রমণ কম হয়।

বারি মিষ্টি আলু-১১

বারি মিষ্টি আলু-৭ সিআইপি-৪৪০০২৫ এবং সিআইপি-৪৪০০৭৫-২ এর সাথে ২০০৬ সালে উন্মুক্ত পরাগায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত ক্লোন এসপি-৬১৩ কে বাছাই করে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর এ জাতটি বারি মিষ্টি আলু-১১ নামে ২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। লতার কাণ্ড বেগুনী ও পাতা সবুজ। কন্দমূলের চামড়া লাল ও শাঁস হালকা হলুদ, কন্দমূলের গড় ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ৩৫.৪৪%, ভিটামিন-এ ৫০০ আ.এ/১০০ গ্রাম। জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। সাধারন অবস্থায় এর ফলন হেক্টরপ্রতি প্রায় ৩৫-৪০ টন। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতের চাষ করা যায়। জাতটিতে উইভিলের আক্রমণ কম হয়।

বারি মিষ্টি আলু-১২

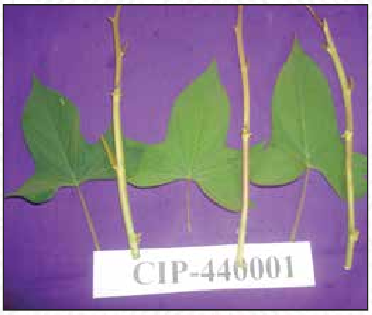

আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০৬ সালে কয়েকটি মিষ্টি আলুর লাইন সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সিআইপি-৪৪০০০১ লাইনটি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত লাইনটি বারি মিষ্টি আলু-১২ নামে ২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ। কন্দমূলের চামড়া হলুদ ও শাঁস কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২৯.৪৬%, ভিটামিন-এ ৫৮০০ আ.এ/১০০ গ্রাম। সাধারন অবস্থায় এর ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ৩৫-৪০ টন। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতের চাষ করা যায়। জাতটিতে উইভিলের আক্রমণ কম হয়।

বারি মিষ্টি আলু-১৩

আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০০৬ সালে কয়েকটি মিষ্টি আলুর লাইন সংগ্রহ করা হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সিআইপি-৪৪০০১৪ লাইনটি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত লাইনটি 'বারি মিষ্টি আলু-১৩' নামে

২০১৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। লতার কাণ্ড ও পাতা সবুজ এবং খাঁজকাটা, কন্দমূলের চামড়া গাঢ় হলুদ ও শাঁস কমলা রঙের, কন্দমূলের গড় ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম, শুষ্ক বস্তুর পরিমাণ ২৮.৯৩%, ভিটামিন-এ ১৩,২০০ আ.এ/১০০ গ্রাম। সাধারন অবস্থায় এর ফলন হেক্টরপ্রতি প্রায় ৩৫-৪০ টন। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতের চাষ করা যায়। জাতটিতে উইভিলের আক্রমণ কম হয়।

বারি মিষ্টি আলু-১৪

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রে আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র হতে কিছু উন্নত লাইন পাওয়া যায় যা কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র হতে মূল্যায়িত হয়েছে। এর মধ্যে "বারি মিষ্টি আলু-১৪ (CIP-441132)" জাতটি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। নিম্ন বর্ণিত জাতটির উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ ও চাষাবাদ পদ্ধতি সংক্ষেপে দেয়া হলো।

বারি মিষ্টি আলু-১৪

কাণ্ড মধ্যম পুরু এবং সবুজ বর্ণের। পাতা খাঁজ কাটা, মধ্য শিরা পর্যন্ত পৌছায়। কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ কিন্তু কিনারা বেগুনী। পাতার উল্টা দিকের শিরা বেগুনী বর্ণের। কাণ্ডের অগ্রভাগ কিছুটা রোমশ। কন্দমূল লম্বাটে ও অনিয়মিত। কন্দমূলের বর্ণ হালকা গোলাপী ও শাঁস কমলা বর্ণের, শাঁসের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২৪.১২±১ %। আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত কালার চার্ট অনুযায়ী প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমান ৪.৯২ মিলিগ্রাম (আনুমানিক)।

বারি মিষ্টি আলু-১৫

"বারি মিষ্টি আলু-১৫ (CIP-440267.2)" জাতটি খুবই প্রতিশ্রুতিশীল হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। নিম্ন বর্ণিত জাতটির উদ্ভিদতাত্ত্বিক বিবরণ ও চাষাবাদ পদ্ধতি সংক্ষেপে দেয়া হলো।

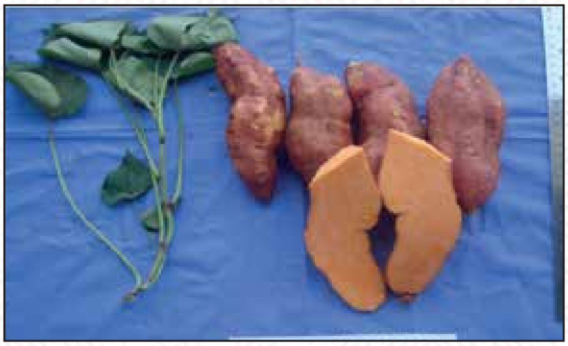

বারি মিষ্টি আলু-১৫

কাণ্ড মধ্যম পুরু এবং সবুজ বর্ণের। পাতা খাঁজ কাটা নয়। কচি ও বয়স্ক পাতার বর্ণ সবুজ। পাতার উল্টা দিকের শিরা বেগুনী বর্ণের। কাণ্ডের অগ্রভাগ কিছুটা রোমশ। কন্দমূল লম্বাটে ও অনিয়মিত। কন্দমূলের বর্ণ হালকা গোলাপী ও শাঁস কমলা বর্ণের, শাঁসের শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ ২২.৩৯±১ %। আন্তর্জাতিক আলু গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত কালার চার্ট অনুযায়ী প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে বিটা ক্যারোটিনের পরিমাণ ৪.৪১ মিলিগ্রাম (আনুমানিক)।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তার প্রস্তুতি: সুনিষ্কাশিত, উঁচু ও রৌদ্রজ্জ্বলসম্পন্ন জমি মিষ্টি আলু চাষের জন্য নির্বাচন করা প্রয়োজন। বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম তবে ভাল ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সব ধরনের মাটিতে মিষ্টিআলুর চাষ করা যায়। মাটির অম্লতা (pH) ৫.৬ থেকে ৬.০ হলে ভাল। মিষ্টি আলুর জন্য মাটির উপরের ৩০ সেমি পর্যন্ত গভীর করে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরা করা প্রয়োজন। মিষ্টি আলু চাষের জন্য এঁটেল মাটি ভাল নয়। এঁটেল মাটিতে চাষ করলে কন্দ চিকন, লম্বা বা অনিয়মিত আকারের হয় ফলে বাজার মূল্য দারুণভাবে কমে যায়।

বংশবিস্তারের জন্য লতা প্রস্তুতি: মিষ্টি আলু সাধারণত লতার কাটিং এর মাধ্যমে বংশবিস্তার করা হয়। রোগ জীবাণু মুক্ত সুস্থ, সবল, পরিপক্ক লতা হতে কাটিং প্রস্তুত করা হয়। লতার কাটিং এর দৈর্ঘ্য ২৫-৩০ সেমি (প্রায় ১ ফুট) হওয়া উচিত যাতে ২-৩ টি পর্ব বিদ্যমান থাকে। মিষ্টি আলুর লতার প্রথম কাটিং সর্বোত্তম ও ফলন বেশি দেয়।

রোপণের সময়: অক্টোবরের মাঝামাঝী থেকে নভেম্বর মাস পর্যন্ত (কার্তিক থেকে মধ্য অগ্রহায়ণ) মিষ্টি আলুর লতা রোপণ করা যায়।

রোপণ পদ্ধতি ও চারার সংখ্যা: মিষ্টি আলুর লতার কাটিং সমতল বেডে বা উঁচু ভেলি পদ্ধতিতে রোপণ করা যায়। তবে উঁচু ভেলি পদ্ধতিতে ফলন বেশি হয়। সাধারণত চরাঞ্চলে এবং সেচবিহীনভাবে চাষ করলে সমতল জমিতে ফারো করে লতার কাটিং লাগানো হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি, (২ফুট) এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০ সেমি (১ ফুট)। লতার অগ্রভাগ মাটির উপরে রেখে দুই থেকে তিনটি পর্ব সমান্তরাল ভাবে মাটির ৪ থেকে ৮ সেমি নিচে পুঁতে দিতে হবে।

এ পদ্ধতিতে রোপণ করলে প্রতি হেক্টর জমির জন্য প্রায় ৫৬ হাজার লতার প্রয়োজন হয়। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে লতা লাগানোর পর পরই সেচ দিতে হবে এবং চারা ভালভাবে না লাগা পর্যন্ত প্রয়োজনানুসারে ১-২ দিন পর পর সেচ দেয়া উচিত।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি: কৃষক ভাইয়েরা মিষ্টিআলুতে সাধারণত সার দিতে চান না। তবে সর্বোচ্চ ফলনের জন্য সুষম সার সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। সারের পরিমাণ নির্ভর করে মূলত মাটির প্রকৃত ও প্রকার ফসলের জাত, সেচ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর মিষ্টিআলুর জন্য সারের মাত্রা সারণী-১ এ উল্লেখ করা হলো।

সারনী-১ মিষ্টিআলুর জন্য সারের মাত্রা

সারের নাম	সারের পরিমাণ		
	কেজি/হেক্টর	কেজি/বিঘা	কেজি/শতক
ইউরিয়া	২৫০-২৮০	৩৪.৪-৩৮.৬	০.১৪-০.১৬
টি এস পি	১৪০-১৭০	১৯.৩-২৩.৪	০.০৮-০.১০
এমও পি	২৩০-২৬০	৩১.৭-৩৫.৫	০.১৩-০.১৫
জিপসাম	৬০-৮০	৮.২৬-১১.০	০.০৩-০.০৫
জিংক সালফেট*	১০-১২	১.৩৮-১.৬৫	০.০০৬-০.০০৭
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট*	৯০-১২০	১২.৪-১৬.৫	০.১৫-০.১৭
বরিক এসিড*	৬-৮	০.৮৩-১.১০	০.০০৩-০.০০৪
গোবর	১০,০০০	১৩৭৭	৫.৫৯

*জিপসাম, জিংক সালফেট ও বরিক এসিড এলাকাভেদে প্রয়োজন হয়।

সম্পূর্ণ গোবর বা খামারজাত সার, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও বরিক এসিড এবং অর্থেক ইউরিয়া ও এমপি সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্থেক ইউরিয়া ও এমপি রোপণের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে সারির পার্শ্বে (সারি থেকে উভয় দিকে ১০ সেমি দূরে) ফারো তৈরি করে প্রয়োগ করা উত্তম। সারের উপরি প্রয়োগের পর পরই গাছের গোড়ায় অল্প পরিমাণে মাটি উঠিয়ে দিয়ে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। চরাঞ্চলে বা সেচবিহীনভাবে চাষ করলে উপরোক্ত রাসায়নিক সার শতকরা ১০-১২ ভাগ কমিয়ে একসঙ্গে জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: মিষ্টিআলুর গাছ মাটিতে লেগে গেলে ৩০ দিন, ৬০ দিন ও ৯০ দিন পর ৩ বার সেচ দেয়া উচিত। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে পানি নিষ্কাশনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সময়মতো পানি সেচ মিষ্টি আলুর ফলন এবং বাজার জাতকরণের উপযোগী কন্দমূলের সংখ্যা, ওজন ও গুণাগুণ বৃদ্ধি করে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা: মিষ্টি আলু দ্রুত বর্ধনশীল ফসল এবং এটি দ্রুত মাটিকে ঢেকে ফেলে ও আগাছাকে অবদমিত করে। তবুও গাছের বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে আগাছা দমন করা জরুরি। ভাল ফলনের জন্য চারা রোপণের পর এবং সারির উপরি প্রয়োগের আগে কমপক্ষে একবার আগাছা দমন করা অত্যাবশ্যক।

লতা নাড়ানো: চারা রোপণের ৫০-৬০ দিন পর থেকে মাসে অন্তত একবার লতা নেড়ে চেড়ে দিতে হবে। এতে মিষ্টি আলুর পর্ব থেকে শিকড় গজানো তথা বাজারজাত অনুপযোগী কন্দমূল উৎপাদন এড়ানো সম্ভব হয় এবং ফলশ্রুতিতে কন্দের আকার ও ফলন বৃদ্ধি পায়।

পোকা ও দমন ব্যবস্থাপনা: মিষ্টি আলুর উইভিল বিশ্বব্যাপী পরিচিত একটি ক্ষতিকর পোকা। এটি জমিতে এবং গুদামজাত কন্দমূলে আক্রমণ করে ফলশ্রুতিতে মিষ্টি আলু খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- পোকার আক্রমণমুক্ত সুস্থ্য, সবল মিষ্টি আলুর লতা বা কাণ্ডের অগ্রভাগ (৩০ সেমি) জমিতে লাগানো উচিত।
- মিষ্টিআলুর লতা এডমায়ার দ্রবণে (০.৫ মিলিলিটার/লিটার পানি) ২০ মিনিট ডুবিয়ে রেখে পরে রোপণ করতে হবে।

- ❀ ফেরোমোন ফাঁদ পেতে পুরুষ উইভিল মেরে ফেলা সম্ভব। এত করে নতুন উইভিলের জন্ম হতে পারে না এবং আস্তে আস্তে উইভিলের সংখ্যা কমে যাবে।
- ❀ গাছের গোড়ায় সময়মতো মাটি উঠিয়ে দিতে হবে।
- ❀ উইভিল আক্রান্ত লতা ও কন্দমূল পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা গর্ত করে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে।
- ❀ হেক্টরপ্রতি ১৫ কেজি হারে ডায়াজিনন ১৪জি/কারবোফুরান ৫জি/ প্রয়োগ করে হাল্কা সেচ দিতে হবে।

কন্দমূল উত্তোলন ও ফলন: চারা রোপণের ১২০ থেকে ১৪০ দিন পর কন্দমূল উত্তোলন উপযোগী হয় তবে ১৬০ দিনের বেশি রাখলে শাঁস আঁশযুক্ত হয়। মাটির সাধারন 'জো' অবস্থায় কোদাল দ্বারা কুপিয়ে মিষ্টি আলু উত্তোলন করা হয়। উত্তম ব্যবস্থাপনায় উচ্চফলনশীল মিষ্টি আলুর জাতগুলোর ফলন ৩৫-৪০ টন/হেক্টর হয়ে থাকে।

মিষ্টিআলু সংরক্ষণ: মিষ্টি আলুর সংরক্ষণ গুণ খুব একটা আশাপ্রদ নয়। বাংলাদেশে মিষ্টি আলু সংগ্রহকালীন সময় মার্চ-এপ্রিল মাসে (মধ্য ফাল্গুন থেকে মধ্য বৈশাখ) তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, ফলে উইভিলের আক্রমণ বৃদ্ধি পায় এবং কন্দমূল সহজেই নষ্ট হয়। মিষ্টি আলু সংরক্ষণের পূর্বে কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। যেমন: ১. মিষ্টি আলু সংগ্রহের সময় মাটি সাধারণ 'জো' অবস্থায় অর্থাৎ মাটি যেন কাদাময় না থাকে। ২. ফসল সংগ্রহের পূর্বে লতা টান দিয়ে না ছিড়ে কাঁচি দ্বারা কেটে আলাদা করতে হবে। ৩. সংগ্রহের পর মিষ্টি আলু ৭-১০ দিন ছায়ায় ছড়িয়ে রেখে কিউরিং করে নিতে হবে। ৪. রোগাক্রান্ত কাটা বা থেতলানো এবং উইভিল আক্রান্ত মিষ্টি আলু দ্রুত বাছাই করে আলাদা করে ফেলতে হবে। ৫. কন্দমূলের ত্বক যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেজন্য ফসল সংগ্রহ থেকে সংরক্ষণ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। এরপর কিউরিংকৃত বাছাই করা নিখুঁত মিষ্টি আলু উত্তম বায়ু চলাচলযুক্ত ঘরে শুকনা বালি বিছিয়ে তার উপর একস্তর মিষ্টি আলু (৭৫ সেমি) আবার বালুর স্তর (১০ সেমি) এভাবে ৫-৬টি স্তরে সংরক্ষণ করা হয়। বায়ু চলাচলযুক্ত ঘর যেখানে তাপমাত্রা ১৬-১৮° স. থাকে সেখানে মিষ্টি আলু ৫-৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

ব্যবহার: রুপান্তরিত কন্দমূল এবং লতার কচি ডগা মানুষের ভক্ষণযোগ্য অংশ। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় মিষ্টি আলুর কচি ডগা সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। এটি একটি উপাদেয় ও পুষ্টিকর সবজি। মিষ্টি আলুর কন্দ সাধারনত পুড়িয়ে বা সিদ্ধ করে খাওয়া হয়। মিষ্টি আলুর পেকটিন হতে জ্যাম, জেলি ও মারমালেট প্রস্তুত করা যায়। এছাড়া স্টার্চ/শর্করা, সিরাপ, অ্যালকোহল এবং বেকিং ও কনফেকশনারী শিল্পে এটির বহুল ব্যবহারের সম্ভাবনা আছে। এ ছাড়াও উন্নত মানের চিপস ও ফ্রেঞ্চ ফ্রাই তৈরি করা সম্ভব। অপরিনত কন্দমূল এবং লতা গোখাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কমলা রঙের মিষ্টি আলু সিদ্ধ করলে কিছুটা নরম হয়। সিদ্ধ মিষ্টি আলু দুধের সাথে মিশিয়ে বা পায়েশ তৈরি করে খাওয়ানো যায়। এছাড়া মিষ্টিআলু টুকরা টুকরা করে খিচুড়ী রান্না করে বা ময়দার সাথে মিশিয়ে রুটি তৈরি করেও শিশুদের খাওয়ানো সম্ভব। সুতরাং ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ মিষ্টি আলু আমাদের ভিটামিন-এ চাহিদা পূরণে এবং এর বহুমুখী ব্যবহার কৃষি অর্থনীতিতে বৈচিত্রময় ভূমিকা রাখতে পারে।

মিষ্টি আলুর অন্যান্য পরিচর্যা

মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা

পূর্ণ বয়স্ক উইভিল প্রায় ৬ মিমি লম্বা এবং ১.৪ মিমি চওড়া হয়ে থাকে। এ পোকার মাথার শুঁড়ের মতো একটি মুখাংশ আছে। মাথা এবং শাখার উপরিভাগ গাঢ় নীল রং এর চোখ ও পা উজ্জ্বল লাল-কমলা বর্ণের। কীড়া কন্দমূলের ভিতরে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ করে ক্ষতিকরে থাকে। উইভিল আক্রান্ত কন্দমূল খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

- ❀ মিষ্টি আলুর লতা বা কাণ্ডের অগ্রভাগ (৩০ সে.মি.) জমিতে লাগানো উচিত। লতার অগ্রভাগে সাধারণত মিষ্টি আলুর উইভিলের ডিম থাকে না।
- ❀ মিষ্টি আলুর উইভিল পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্রাপ এর সাথে মাটি উঠানো (Earthing up) এবং কার্বোফুরান ৫ জি প্রয়োগের মাধ্যমে এই পোকা দমন করা যায়। সেক্স ফেরোমন ট্রাপ + মাটি উঠানো (মাটি উঠানো কমপক্ষে তিন বার-৩০, ৬০, ৯০ দিনে করতে হবে) + কার্বোফুরান ৫ জি (মিষ্টি আলুর লতা লাগানোর ৬০ দিন পর প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে)।

❀ মিষ্টি আলু সংরক্ষণের সময় উইভিল আক্রমণমুক্ত কন্দমূল শুকনা বালি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। মেঝেতে প্রথমে ১০ সেমি পুরু একটি শুকনা বালির স্তর সাজানো যেতে পারে। এরপর ৭৫ সেমি পুরু পর্যন্ত মিষ্টি আলুর স্তর সাজাতে হবে। মিষ্টি আলুর উপরে আবার ১০ সেমি পুরু বালির স্তর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

মিষ্টি আলুর বিভিন্ন রোগ ও তার দমন ব্যবস্থাপনা

মিষ্টি আলু বাংলাদেশের শর্করা সমৃদ্ধ খাদ্য ফসলের অন্যতম হলেও, পূর্বে এটি অবহেলিত ছিল। তবে বর্তমানে পুষ্টিমানের বিবেচনায় এটি, এ দেশে ধান, গম, আলুর পরই অবস্থান করছে। এতে প্রচুর শর্করা, খনিজ ও ভিটামিন বিশেষ করে ভিটামিন এ রয়েছে। এ সকল কারণে এর চাষ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্নে মিষ্টি আলুর বিভিন্ন রোগের লক্ষণ সহ এদের প্রতিকার দেয়া হল

নরম পচা রোগ (Soft Rot)

এ রোগটি রাইজোপাস রট নামেও পরিচিত। এ রোগটি প্রধানত সংরক্ষিত মিষ্টি আলুতে দেখা যায়। এটি সংরক্ষিত অবস্থায় মিষ্টি আলুর সবচেয়ে মারাত্মক রোগ।

নরম পচা রোগে আক্রান্ত সংরক্ষিত মিষ্টি আলু

রোগের কারণ: রাইজোপাস নিগরিকান্স (*Rhizopus* Spp.) নামক এক ধরনের ছত্রাক দ্বারা এ রোগটি হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

❀ আক্রান্ত আলু, দুপ্রান্ত হতে দ্রুত নরম ও আর্দ্র হয়ে পচে যায় যা গাজন এর গন্ধ ছড়াতে থাকে।

❀ আক্রান্ত আলুর উপরিভাগে মাইসেলিয়ামের পুরু স্তর দেখা যায়।

❀ এছাড়া প্যাথোজেনের কাল বর্ণের ফ্রুটিং বডিও দেখা যায়।

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

❀ জমি হতে টিউবার উত্তোলন, পরিবহন, সংরক্ষণ প্রভৃতির সময়ে খেয়াল রাখতে হবে যাতে টিউবার আঘাত প্রাপ্ত না হয়।

❀ সংরক্ষণের পূর্বে টিউবার ভাল করে কিউরিং করতে হবে।

❀ এ রোগ কমানোর জন্য কাটা, ছেড়া থেতলানো টিউবার বেছে শুধু নিখুঁত টিউবার সংরক্ষণ করতে হবে।

কালচে রোগ বা বাক রট/চারকোল রট (Charcol rot)

এ রোগটি প্রধানত সংরক্ষিত মিষ্টি আলুতে দেখা যায়।

রোগের কারণ: ম্যাকরোফোমিনা ফ্যাজিওলিনা / ডিপোডিয়া নাটালেনসিস (*Macrophomina phaseolina/Diplodia natalensis*) নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

ব্লাক রটে আক্রান্ত সংরক্ষিত মিষ্টি আলু

ব্লাক রটে আক্রান্ত সংরক্ষিত মিষ্টি আলু (কর্তিত)

রোগের লক্ষণ:

❀ এ রোগের আক্রমণে আক্রান্ত গাছ ধীরে ধীরে কাল হয়ে যায়।

❀ গুদামজাত অবস্থায় টিউবারেও এ রোগ দেখা যায়। টিউবারে এ রোগের আক্রমণে কাল দাগ পড়ে।

❀ পরবর্তীতে পচন শুরু হয়ে পুরো টিউবারটি পচে নষ্ট হয়ে যায়।

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

❀ সংরক্ষিত টিউবারকে এ রোগের আক্রমণ হতে রক্ষা করতে টিউবারকে সংরক্ষণের পূর্বে ভালভাবে কিউরিং করে নিতে হবে।

❀ এ রোগ কমানোর জন্য কাটা, ছেড়া, থেতলানো টিউবার বেছে শুধু নিখুঁত টিউবার সংরক্ষণ করতে হবে।

❀ ফসল উঠানোর পর প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি ডায়থেন এম-৪৫ অথবা রিডোমিল গোল্ড প্রয়োগ করে তা টিউবারে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

ফিদারী মোটল ভাইরাস রোগ

এটি এক প্রকার ভাইরাস রোগ। এ রোগের ফলে ফলন মারাত্মক হ্রাস পায়।

রোগের কারণ: এই ভাইরাসের নাম মিষ্টি আলুর ফিদারি মোটল ভাইরাস। জাব পোকা দ্বারা এ ভাইরাসটি অসুস্থ গাছ হতে সুস্থ গাছে ছড়িয়ে পড়ে।

ফিদারী মোটল ভাইরাস আক্রান্ত মিষ্টি আলুর গাছ

রোগের লক্ষণ

- মিষ্টি আলুর পাতায় হালকা থেকে গাঢ় মোটল দাগ পড়ে।
- গাছের আকার ছোট হয়ে যায়।
- মিষ্টি আলুর রাসেট ক্রাক, ভেইন ক্লিয়ারিং, ভেইন ফিদারিং এবং ক্লোরোটিক স্পট এ রোগের অন্যতম লক্ষণ।

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগ মুক্ত লতা লাগানো।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করলে রোগের প্রকোপ কমানো যায়।
- জাব পোকা দমনের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার রোধের জন্য এডমায়ার নামক কীটনাশক ০.১% হারে প্রতি ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করা।

পাতা কোকড়ানো বা লিফ কার্ল ভাইরাস

এটি এক ধরনের ভাইরাস রোগ। এ রোগের আক্রমণে ফলন মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ রোগটি সাদা মাছি পোকা দ্বারা ছড়ায়।

পাতা কোকড়ানো বা লিফ কার্ল ভাইরাসে আক্রান্ত মিষ্টি আলুর পাতা

রোগের লক্ষণ

- এ রোগে মিষ্টি আলুর পাতা খুব ছোট হয়ে যায়।
- মিষ্টি আলুর পাতা উর্ধ্বমুখী হয়ে কুকড়িয়ে যায়।

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগমুক্ত লতা লাগানো।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করা।
- এডমায়ার নামক কীটনাশক ০.১% হারে প্রতি ১৫ দিন পর পর স্প্রে করে সাদা মাছি পোকা দমনের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার রোধ করা।

মিষ্টি আলুর মাইল্ড্ মোটল, ক্লোরটিক ফ্লেক্স এবং লেটেন্ট ভাইরাস

একাধিক ভাইরাস এ রোগের জন্য দায়ী। এ ভাইরাসটি বাহক পোকার মাধ্যমে আক্রান্ত গাছ হতে সুস্থ গাছে ছড়িয়ে পড়ে।

রোগের লক্ষণ

- পাতায় হালকা মোজাইক বা হালকা হলুদ রঙ ধারণ করা।
- গাছ ছোট হয়ে যাওয়া এ সব ভাইরাসের মূল লক্ষণ।
- এ রোগের ফলে মিষ্টি আলুর ফলন কিছুটা হ্রাস পায়।

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগমুক্ত গাছ থেকে লতা সংগ্রহ করে ব্যবহার করতে হবে।
- এ ভাইরাস রোগের বিস্তার রোধের জন্য এদের বাহক পোকা কীটনাশকের মাধ্যমে দমন করতে হবে।

সুস্থ মিষ্টি আলুর পাতা ও মাইল্ড মোটল ভাইরাস আক্রান্ত মিষ্টি আলুর পাতা

কচু

বাংলাদেশে কচু একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সবজি। এ দেশে কচু জাতীয় সবজির মধ্যে পানিকচু, মুখীকচু, ওলকচু ও মানকচু ইত্যাদির চাষ হয়ে থাকে। কচুতে ভিটামিন ‘এ’ এবং লৌহ প্রচুর পরিমাণে থাকে। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু কচু চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

পানি কচু

যে সমস্ত কচু স্বল্প পানিতে চাষ করা যায় তাকে পানি কচু বলে। আমাদের দেশে পানি কচু একটি সুস্বাদু সবজি হিসেবে পরিচিত। পানি কচু দুই প্রকার, যথা- লতি ও কাণ্ড বা রাইজোম উৎপাদী। বাংলাদেশে পানি কচুর বিভিন্ন নাম রয়েছে যেমন নারিকেল কচু, জাত কচু, বাঁশ কচু ইত্যাদি। বাংলাদেশে প্রায় ২৩ হাজার হেক্টর জমিতে কচুর চাষ করে প্রায় ২ লক্ষাধিক টন ফলন পাওয়া যায়। পানি কচু ও মুখী কচু এর মধ্যে প্রায় ৮৫% জায়গা দখল করে আছে।

পানি কচুর জাত

লতিরাজ (বারি পানি কচু-১)

বারি পানি কচু-১

সারাদেশ থেকে সংগৃহীত ১০০টি পানি কচুর জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে লতিরাজ জাতটি ১৯৮৮ সালে অনুমোদন করা হয়। লতিরাজ জাতের কাণ্ড অপেক্ষা লতির প্রাধান্য বেশি। এর গাছ মাঝারী, পাতা সবুজ, পাতা ও বোঁটার সংযোগস্থলের উপরিভাগ লাল রং বিশিষ্ট যা জাতটির শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। জীবনকাল ১৮০-২৭০ দিন। লাগানোর ২ মাস পর থেকে ৭ মাস পর্যন্ত লতি হয়ে থাকে। সাধারণ অবস্থায় হেক্টরপ্রতি ২৫- ৩০ টন লতি এবং প্রায় ১৫- ২০ টন কাণ্ড উৎপন্ন হয়।

লতি লম্বায় ৯০-১০০ সেমি, সামান্য চেপ্টা, হাল্কা পিংক রং বিশিষ্ট। লতি সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং গলা চুলকানিমুক্ত অর্থাৎ এ কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট এর পরিমাণ কম থাকায় গলা চুলকায় না। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই চাষ করা যায়।

বারি পানি কুচু-২

বারি পানি কচু-২

দেশিয় জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ২০০৮ সালে এ জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এ জাতের সব অঙ্গই সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। যদিও লতিই হলো এ জাতের প্রধান ভক্ষণযোগ্য অংশ। এ জাতটি প্রচুর উৎকৃষ্ট মানের লতি উৎপাদন করে যার প্রতিটি লতি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মিটার লম্বা হয়।

লতি গোলাকার, অপেক্ষাকৃত মোটা ও গাঢ় সবুজ বর্ণের হয় এবং গলা চুলকানীমুক্ত অর্থাৎ এ কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট এর পরিমাণ কম থাকায় গলা চুলকায় না। সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন লতি এবং প্রায় ১৮-২২ টন কাণ্ড উৎপন্ন হয়।

বারি পানি কচু-৩

দেশিয় জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ২০০৮ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এ জাতেরও সব অঙ্গই সবজি হিসেবে খাওয়া যায়। তবে কাণ্ড (রাইজোম) হলো এ জাতের প্রধান ভক্ষণযোগ্য অংশ।

কাণ্ড গোলাকার, মোটা ও হালকা সবুজ বর্ণের হয় এবং গলা চুলকানীমুক্ত অর্থাৎ এ কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট এর পরিমাণ কম থাকায় গলা চুলকায় না। কাণ্ডের দৈর্ঘ্য প্রায় ১ মিটার লম্বা হয়। সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন কাণ্ড এবং প্রায় ১০- ১২ টন লতি হয়।

বারি পানি কচু-৩

বারি পানি কচু-৪

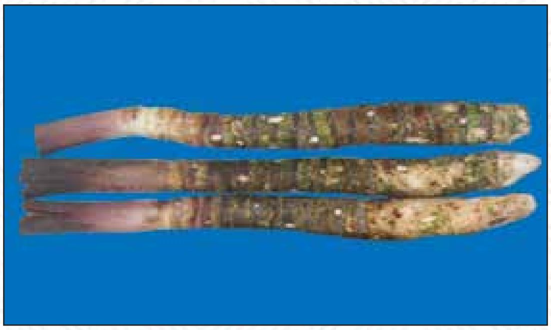

বারি পানি কচু-৪

দেশিয় জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ২০১৩ সালে এ জাতটি অবমুক্ত করা হয়েছে।

গাছ খাড়া, কাণ্ড থামাকার এবং সবুজ বর্ণের। পাতা সবুজ ও Peltate আকৃতির। কাণ্ড মোটা এবং গোলাপী রঙের। পত্র ফলকের মধ্য ও অন্যান্য শিরা নিম্নপৃষ্ঠে গাঢ় গোলাপী রঙের এবং উপরের পৃষ্টে গোলাপী রঙের। বোঁটা এবং বোঁটা ও পত্র ফলকের সংযোগস্থল গোলাপী রঙের। রাইজোম গোলাপী রঙের এবং ফ্লেস হালকা গোলাপী যা অন্য জাত থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এটি মূলত রাইজোম উৎপাদিত তবে অল্প পরিসরে লতিও উৎপন্ন করে। গলা চুলকানীমুক্ত অর্থাৎ এ কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট এর পরিমাণ কম থাকায় গলা চুলকায় না। সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫-৪৫ টন কাণ্ড এবং প্রায় ৫-৮ টন লতি উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এর চাষ করা যায়।

বারি পানি কচু-৫

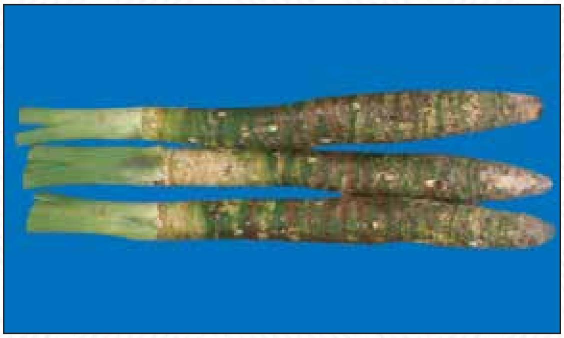

বারি পানি কচু-৫

দেশিয় জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ২০১৩ সাথে এ জাতটি অবমুক্ত করা হয়েছে।

গাছ খাড়া, কাণ্ড থামাকার এবং সবুজ বর্ণের। পাতা সবুজ ও Peltate আকৃতির। কাণ্ড মোটা এবং সবুজ রঙের। পত্র ফলকের মধ্য ও অন্যান্য শিরা সবুজ রঙের। বোঁটা এবং বোঁটা ও পত্র ফলকের সংযোগস্থল সবুজ রঙের। রাইজোম হালকা সবুজ রঙের এবং ফ্লেস সাদাটে।

এটি মূলত রাইজোম উৎপাদিত তবে অল্প পরিসরে লতিও উৎপন্ন করে। গলা চুলকানীমুক্ত অর্থাৎ এ কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট এর পরিমাণ কম থাকায় গলা চুলকায় না। সিদ্ধ করলে সমানভাবে সিদ্ধ হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫-৪০ টন কাণ্ড এবং প্রায় ৫-৮ টন লতি উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এর চাষ করা যায়।

বারি পানি কচু-৬

বারি পানি কচু-৬

গাছ খাড়া, কাণ্ড থামাকার এবং সবুজ বর্ণের। পাতা সবুজ ও তীরাকার। পত্র ফলকের মধ্য ও অন্যান্য শিরা সবুজ রঙের। পাতার উপরের ও নিচের দিকের শিরাগুলো ভাসা। রাইজোম/কাণ্ড ১ মিটার লম্বা ও বেড় ৩০-৩৫ সেমি। হালকা সবুজ রঙের এবং শাঁস আকর্ষণীয় সাদা। এটি মূলত রাইজোম উৎপাদন করে। তবে অল্প পরিসরে লতিও উৎপাদন করে। গলা চুলকানিমুক্ত, সমানভাবে সিদ্ধ হয়। হেক্টরপ্রতি লতির ফলন ৬-৭ টন এবং রাইজোমের ফলন ৮০-৯০ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: পলি দোআঁশ ও এঁটেল মাটি পানি কচু চাষের উপযোগী।

রোপণের সময়: আগাম ফসলের জন্য কার্তিক (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর) ও নাবী ফসলের জন্য মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-বৈশাখ (মার্চ-এপ্রিল) মাসে লাগানো যায়। তবে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অগ্রহায়ণ-পৌষ মাস (ডিসেম্বর থেকে মধ্য-জানুয়ারি) চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

রোপণ পদ্ধতি: কচু চাষে প্রয়োজন প্রতি হেক্টরে ৩৭-৩৮ হাজার চারা।

বীজ রোপণের দূরত্ব: উন্নত জাতের কচুর জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সেমি রাখতে হবে।

সারের পরিমাণ

সারের নাম	সারের পরিমাণ		
	কেজি/হেক্টর	কেজি/বিঘা	কেজি/শতক
গোবর	১০,০০০-১৫,০০০	১৩৭৭-২০৬৬	৫.৫৯-৮.৫০
ইউরিয়া	৩০০ - ৩৫০	৪১.৩২-৪৮.২১	০.১৭-০.২০
টিএসপি	১৫০ - ২০০	২০.৬৬-২৭.৫৫	০.০৮-০.১১
এমওপি	২৫০-৩৫০	৩৪.৪৪-৪৮.২১	০.১৪-০.২০
জিপসাম	১০০ - ১৩০	১৩.৭৭-১৭.৯১	০.০৬-০.০৭
জিংক সালফেট*	১০ - ১৬	১.৩৮-২.২	০.০১
বরিক এসিড*	১০ - ১২	১.৩৮-১.৬৫	০.০১

*এলাকাভেদে প্রয়োজন হয়

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট, বরিক এসিড এবং অর্ধেক এমওপি সার জমি তৈরির সময় শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের ১.৫-২ মাস সময়ে অর্ধেক এমওপি এবং ইউরিয়ার এক ষষ্ঠাংশ ছিটিয়ে দিতে হবে। বাকি পাঁচ ভাগ ইউরিয়া সার সমান কিস্তিতে ১৫ দিন পর পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: পানি কচুর গোড়ায় দাঁড়ানো পানির গভীরতা ৮-১০ সেমি এর বেশি হলে ফলন কমে যায় এবং দাঁড়ানো পানি মাঝে মাঝে নাড়িয়ে দিতে হবে। বর্ষাকালে জমি থেকে ৮-১০ সেমি এর বেশি পানি সরিয়ে ফেলতে হবে।

আগাছা দমন: পানি কচুর জমি সব সময়ই আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারা লাগানোর পর থেকে ৩ মাস পর্যন্ত জমিতে আগাছা জন্মাতে পারে। এ সময় জমি আগাছামুক্ত রাখা খুবই প্রয়োজন।

সেচ ও পানি নিষ্কাশন: পানি কচু জলজ উদ্ভিদ হলেও দীর্ঘ জলাবদ্ধতার জন্য ভাল নয়। এ জন্য মাঝে মাঝে দাঁড়ানো পানি নেড়ে চেড়ে দেয়া আবশ্যক। পানি কচুর জন্য দাঁড়ানো পানির গভীরতা ৮-১০ সেমি এর বেশি হওয়া উচিত নয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

পোকামাকড়, রোগবালাই এবং এর প্রতিকার

পানি কচুতে কয়েকটি পোকা ও রোগবালাই এর আক্রমণ হতে পারে। সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন করা হলো।

পোকামাকড়

লেদা পোকা বা প্রডেনিয়া ক্যাটারপিলার

পূর্ণবয়স্ক মথের পাখার বিস্তৃতি ২.৫ সে.মি.। পূর্ণবয়স্ক মথ গাছের পাতার নিচে গুচ্ছাকারে ডিম পাড়ে। কীড়া প্রাথমিক পর্যায়ে সবুজ বর্ণের হয় এবং মাথার রং কালো হয়। একটি পূর্ণবয়স্ক কীড়া ২.৫ সে.মি. লম্বা হয়। প্রাথমিকভাবে এরা গুচ্ছাকারে থাকলেও পরবর্তীতে সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রডেনিয়া ক্যাটারপিলার এর পূর্ণাঙ্গ পোকা

প্রড়েনিয়া ক্যাটারপিলার এর ডিম

প্রড়েনিয়া ক্যাটারপিলার এর পূর্ণবয়স্ক কীড়া

প্রডেনিয়া ক্যাটারপিলার আক্রান্ত কচুর পাতা

প্রতিকার

- ডিম সংগ্রহ করে নষ্ট করা এবং হাত দ্বারা কীড়া আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করা।
- এই পোকার আক্রমণ বেশি হলে ট্রেসার ৪৫ এসসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৪ মি.লি. মিশিয়ে ২০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

- ফেরোমোন ফাঁদ পেতে পুরুষ পোকা মেরা ফেলা সম্ভব। এতে করে নতুন পোকার জন্ম হতে পারে না এবং আস্তে আস্তে পোকার সংখ্যা কমে যাবে। এছাও ফেরোমন ফাঁদের সাথে বায়োপেস্টিসাইড প্রয়োগ করলে সহজে পোকা দমন করা যায়।
- আক্রমণ তীব্র হলে কুইনালফস গ্রুপের কীটনাশক (দেবীকুইন ২৫ইসি/কিনালাক্র ২৫ইসি/ করোলাক্র ২৫ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি লিটার পরিমাণ মিশিয়ে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

কচুর লাল মাকড়

কচুর পাতার নিচের দিকে লাল রঙের ক্ষুদ্র মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায়। এদেরকে খালি চোখে দেখা যায় না। পূর্ণ বয়স্ক এবং নিম্ফ উভয়ই গাছের ক্ষতি করে থাকে।

- প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ মি.লি. এবামেকটিন (ভার্টিমেক ১.৮ ইসি) পানির সাথে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর জমিতে প্রয়োগ করে লাল মাকড় দমন করা যায়।

কচুর লাল মাকড়

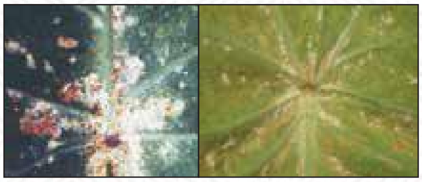
লাল মাকড় আক্রান্ত কচুর পাতা

- পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে। কারণ পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক অতিরিক্ত ব্যবহারে জমিতে পরভোজী মাকড়ের সংখ্যা কমে যায় এবং ফলশ্রুতিতে ক্ষতিকারক মাকড়ের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

কচুর জাব পোকা

জাব পোকা (*Aphis gossypii*) রস শোষণ করে এবং ভাইরাস রোগ ছড়িয়ে ফসলে ক্ষতি করে। এই পোকা পাতার রস শোষণ করে এবং ক্লোরোফিলের পরিমাণ হ্রাস করে। ফলে গাছের খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় ফলশ্রুতিতে ফলন ও কমে যায়।

প্রতিকার

- হাইডাক্লোপ্রিড (এডমায়ার ১০০ এসপি) ০.৫ মি.লি. হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

কচুর বিভিন্ন রোগ ও তার দমন ব্যবস্থাপনা

কচু বাংলাদেশের একটি প্রধান সবজি। এতে প্রচুর পরিমাণ শ্বেতসার, ক্যালসিয়াম, লৌহ, ফসফরাস এবং ভিটামিন এ ও সি রয়েছে। এছাড়া এর স্টার্চ কণা ছোট বলে শিশু খাদ্য হিসেবে সহজেই ব্যবহার করা যায়। কচু সাধারণত খরিফ মৌসুমে চাষ করা হয়। এটি খরিফ মৌসুমের শতকরা প্রায় ২৬ ভাগ দখল করে থাকে। বর্ষার শেষ ভাগে বাজারে সবজির ঘাটতি দেখা যায়। এ সময় কচুই সবজির ঘাটতি অনেকটা পূরণ করে থাকে। বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া কচু চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। অন্যান্য ফসলের ন্যায় কচুও নানা রোগ বালাই দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে, যার ফলে এর ফলন হ্রাস পায়। নিম্নে কচুর বিভিন্ন রোগ ও তার দমন ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হল।

পাতা ঝলসানো রোগ

কচুর রোগের মধ্যে পাতা ঝলসানো রোগ অন্যতম। পৃথিবীতে এ রোগ ট্যারো লিফ ব্লাইট (Taro Leaf Blight), ফাইটোফথোরা লিফ ব্লাইট (Phytophthora leaf blight) ইত্যাদি নামে পরিচিত। ধারণা করা হয় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে এ রোগ প্রথম দেখা দেয় যা পরবর্তীতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ ও ওশেনিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তবে আমাদের দেশে এ রোগ, কচুর পাতা ঝলসানো রোগ নামে পরিচিত। আক্রান্ত বীজ ও আক্রান্ত গাছের অংশবিশেষ স্থানান্তরের মাধ্যমে এ রোগ, আক্রান্ত স্থান হতে রোগমুক্ত স্থানে বিস্তার লাভ করে। এ রোগের আক্রমণে ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়। এ রোগ ফসলের পাতা, করম (Corm) ও অন্যান্য দেহতাত্ত্বিক অংশে হয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণে পাতা ও করম (Corm) পচে যায়। এক প্রতিবেদনে দেখা যায় এ রোগের আক্রমণে মাঠে ৩০-৪০% পর্যন্ত ফলন হ্রাস পেয়ে থাকে। এমনকি সংরক্ষিত করমে এ রোগের আক্রমণে পচন দেখা যায়। ফিলিপিনে এক গবেষণায় দেখা যায়, এ রোগের আক্রমণে সহনশীল জাতগুলাতে ২৪.৪% ও রোগপ্রবণ জাতে ৩৬.৫% ক্ষতি হয়। উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা, ঘন করে গাছ লাগানো এ রোগের আক্রমণকে ত্বরান্বিত করে। অতিরিক্ত অর্দ্র আবহাওয়ায়, আক্রান্ত পাতা অথবা কিউটিকলে প্রচুর পরিমাণে এ রোগের জীবাণু উৎপাদিত হয়। যা বৃষ্টির মাধ্যমে পুরো জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এদেশে জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসে এ রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

পাতা ঝলসানো রোগ প্রারম্ভিক অবস্থা

পাতা ঝলসানো রোগে মারাত্মক আক্রান্ত পাতা

এই রোগের স্পোরাঞ্জিয়া (Sporangia) অঙ্কুরিত (Germination) হওয়া ও জুস্পোর চলাচলের জন্য মুক্ত পানির প্রয়োজন। গাছের পাতা কত সময় ভেজা থাকে, তার উপরে এ জীবাণুর আক্রমণ নির্ভর করে। তাপমাত্রা ২৪-২৭° সে. এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ শতকরা প্রায় ১০০ ভাগের কাছাকাছি হলে ৬-৮ ঘণ্টার মধ্যে জুস্পোর স্পোরাঞ্জিয়া থেকে বের হয়ে গাছের পাতায় আক্রমণ করে থাকে। দিনের তাপমাত্রা ২৫-২৮° সে. এবং রাতের তাপমাত্রা ২০-২২° সে. ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা যথাক্রমে শতকরা ৬৫ ও ১০০ ভাগ এ রোগের বিস্তারের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।

রোগের জীবাণু: ফাইটোফথোরা কলোকোসিয়া (*Phytophthora colocasiae*) নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এ ছত্রাকটির মাইসেলিয়াম বর্ণহীন, শাখাযুক্ত ও প্রস্থ প্রাচীর বিহীন (Coenocytic) ।

রোগের লক্ষণ

- আক্রান্ত পাতায় প্রথমে ছোট কাল দাগ দেখা যায় যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে হলুদ প্রান্তযুক্ত বাদামী বর্ণে পরিণত হয়। আক্রান্ত স্থানে চক্রাকার (Concentric) জোনের সৃষ্টি হয় এবং তা হতে হলুদ বর্ণের উজ (ooze) বের হয়ে আসে, যা পরর্বতীতে শুকিয়ে গাঢ় পাঁপল (Purple) বর্ণ ধারণ করে
- কিছু কিছু রোগাক্রান্ত টিস্যু সাদা বর্ণের স্পোরাঞ্জিয়া বেষ্টিত থাকে। পরবর্তীতে দাগগুলো বৃদ্ধি পায় এবং অনেকগুলো দাগ একত্রিত হয়ে (সাধারণত পাতার প্রান্ত বরাবর) পুরো পাতায় ছড়িয়ে যায়। আক্রান্ত পাতায় অনিয়মিত আকার ও আকৃতির দাগ দেখা যায়।
- মাঝে মাঝে এ রোগের আক্রমণের ফলে পেটিউলে ছোপ ছোপ ভেজা দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে সম্পূর্ণ গাছ ও পাতা পুড়ে যায়। সংরক্ষিত করমে এ রোগের আক্রমণে ধুসর বাদামী হতে কালচে নীল রঙের দাগ দেখা যায়। এ দাগগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে একত্রিত হয়ে সমস্ত করম পচে যায় ।

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- এ রোগের অন্যতম উৎস হল আক্রান্ত বীজ। বীজে সাধারণত ছত্রাকটির মাইসেলিয়াম থাকে, তাই রোগ দমনের জন্য রোগমুক্ত এলাকা থেকে সুস্থ বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- গাছের রোগাক্রান্ত পাতা ছেটে ফেলা এবং ফসল সংগ্রহের পর জমিতে পড়ে থাকা করম ও পাতা ধ্বংস করতে হবে।
- জমিতে রোগ দেখা মাত্রই ছত্রাকনাশক যেমন- সিকিউর / ডাইথেন এম-৪৫ নামক ছত্রাকনাশক ২০ গ্রাম ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন অন্তর স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়।

পাতায় দাগ পড়া বা লিফ স্পট রোগ

এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ। বাংলদেশে কচুর জমিতে সাধারনত এ রোগ সহজেই চোখে পড়ে।

রোগের জীবাণু: কোলেটোট্রিকাম (*Colletotrichum*) গনের অর্ন্তভুক্ত কোলেটোট্রিকাম ক্যাপসিসি (*Colletotrichum capsicii*)/ কোলেটোট্রিকাম লিন্ডেমুথিয়ানাম (*Colletotrichum lindemuthianum*) নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

পাতায় দাগ পড়া বা লিফ স্পট রোগ

রোগের লক্ষণ

- এ রোগের আক্রমণে কচু পাতায় শুকনো ছোট ও মাঝারী আকারের দাগ পড়ে।
- আক্রমণ বেশি হলে সম্পূর্ণ গাছই পুড়ে যেতে পারে, ফলে ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়।

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগমুক্ত স্থান হতে সুস্থ সবল চারা/করম সংগ্রহ করা।

- কচুর জমিতে এ রোগ দেখা গেলে টিল্ট নামক ছত্রাক নাশক (০.৫ মিলি/লিটার) ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়।
- পরিষ্কার চাষাবাদ ও শস্য পর্যায় অবলম্বন করে এ রোগ কমানো যাবে।

গোড়া পচা রোগ বা ফুট/কলার রট

স্ক্লেরোশিয়াম রফসি (Sclerotium rolfsii) নামক এক ধরনের ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

- এ রোগের আক্রমণে গাছের গোড়ায় সাদা বর্ণের মাইসোলিয়াম দেখা যায়। ভাল করে তাকালে কালচে বাদামী বর্ণের সরিষার দানার মত স্ক্লেরোশিয়া গঠন দৃষ্টিগোচর হয়।
- আক্রান্ত গাছটি সম্পূর্ণ রূপে হলুদ হয়ে যায় এবং সবশেষে গাছটি কলার (Collar) অঞ্চল হতে ঢলে পড়ে।
- রোগের মারাত্মক আক্রমণে, মাটির নিচের করম (Corm) ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও পুরো গাছ ঢলে পড়ে।

গোড়া পচা রোগ বা ফুট / কলার রট এ আক্রান্ত ফসল (গাছের গোড়াতে সাদা বর্ণের মাইসেলিয়ামের অবস্থান)

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগমুক্ত এলাকা হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- ক্ষেতের পানি সরিয়ে বেভিস্টিন (১ গ্রাম/লিটার) নামক ছত্রাক নাশক দিয়ে ফসলের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। তবে ভিজিয়ে দেয়ার ১ দিন পর আবার পানি দেয়া যাবে।
- ফসল কর্তনের পর, ফসলের অবশিষ্টাংশ সরিয়ে ফেলতে হবে।
- পরিষ্কার চাষাবাদ ও শস্য পর্যায় অবলম্বন করে এ রোগ কমানো যাবে।

রাইজম পচা / করম রট

পিথিয়াম আফানিডারমাটাম (*Pythium aphanidermatum*) নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ

- এ রোগের আক্রমণে অল্প বয়স্ক গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, এমনকি গাছ মারা যেতে পারে।
- অধিক বয়স্ক গাছে, এ রোগের আক্রমণে গাছ হলুদ হয়ে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়, পরবর্তীতে পুরো গাছটি ঢলে পড়ে।
- অধিক আক্রমণে করমটি (Corm) পচে যায়, এমনকি গাছ হতে কোন রকম ফলনই সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না।

রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- রোগমুক্ত এলাকা হতে চারা/ করম সংগ্রহ করে লাগাতে হবে।
- পরিষ্কার চাষাবাদ, শস্যাবর্তন অনুসরণ করতে হবে।
- ফসল কর্তনের পর, ফসলের অবশিষ্টাংশ ধ্বংস করতে হবে।
- জমির পানি সরিয়ে রিডোমিল গোল্ড (২ গ্রাম/লিটার) নামক ছত্রাক নাশক দিয়ে ফসলের গোড়ার মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। তবে ভিজিয়ে দেয়ার ১ দিন পর আবার পানি দেয়া যাবে।

বি.দ্র.- কচুপাতায় ছত্রাকনাশক বা কীটনাশক ছিটানোর সময় ডিটারজেন্ট যেমন- সার্ফ/হুইল পাউডার ২০ গ্রাম/১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। তা না হলে ছিটানো ঔষুধ পাতা থেকে গড়িয়ে পড়ে যাবে।

মুখী কচু

মুখী কচু একটি সুস্বাদু সবজি। এ সবজি খরিফ মৌসুমের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এর চাষ হয়। মুখী কচু বাংলাদেশে গুঁড়া কচু, কুঁড়ি কচু, ছড়া কচু, দুলি কচু, বিন্নি কচু ইত্যাদি নামেও পরিচিত। মুখীর ছড়া বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মুখী কচুর গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে গেলে এ কচু তুলতে হয়। এতে ৬-৭ মাস সময় লাগে।

মুখী কচুর জাত

বিলাসী

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত ১৮০টি জার্মপ্লাজম হতে গবেষণার মাধ্যমে 'বিলাসী' নামে একটি উফশী জাত উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৮৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

মুখী কচুর জাত বিলাসী

বিলাসী গুণে উৎকৃষ্ট ও উচ্চ ফলনশীল। এর গাছ সবুজ, খাড়া, মাঝারী লম্বা। এর মুখী খুব মসৃণ, ডিম্বাকার হয়। সিদ্ধ মুখী নরম ও সুস্বাদু। সিদ্ধ করলে মুখী সমানভাবে সিদ্ধ হয় ও গলে যায় এবং গলা চুলকানীমুক্ত অর্থাৎ এ কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট এর পরিমাণ কম থাকায় গলা চুলকায় না। জীবনকাল ২১০-২৮০ দিন। সাধারণ অবস্থায় এর ফলন হেক্টরপ্রতি প্রায় ২৫-৩০ টন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ৪০ টন পর্যন্ত ফলন হয়ে থাকে।

বারি মুখী কচু-২

দেশিয় জার্মপ্লাজম থেকে উপযোগিতা যাচাইয়ের মাধ্যমে ২০১৩ সালে এ জাতটি অবমুক্ত করা হয়েছে।

বারি মুখী কচু-২

গাছ খাড়া, মাঝারী আকৃতির এবং সবুজ বর্ণের। পাতা সবুজ ও Peltate আকৃতির। বোঁটা ও পত্র ফলকের সংযোগস্থল সবুজ রঙের। মুখী ধূসর রঙের এবং ফ্লেস সাদা। মুখী সহজে সমানভাবে সিদ্ধ হয় এবং গলা চুলকানীমুক্ত। সাধারণ অবস্থায় এর ফলন হেক্টরপ্রতি প্রায় ৩৫ টন। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এর চাষ করা যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: দোআঁশ মাটি মুখী কচুর জন্য উত্তম। বর্ষাকালে পানি দাঁড়ায় না এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।

রোপণের সময়: মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি)।

রোপণ পদ্ধতি:

একক সারি পদ্ধতি: উর্বর মাটির জন্য সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সেমি। অনুর্বর মাটির বেলায় সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪০ সেমি রাখতে হয়।

ডাবল সারি পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে ৭৫ সেমি × ৬০ সেমি দূরত্ব বেশি উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। ৭৫ সেমি দূরে দূরে লম্বালম্বি দাগ টানতে হয়। এই দাগের উভয় পাশে ১০ সেমি দূর দিয়ে ৬০ সেমি পর পর বীজ লাগিয়ে যেতে হয়। এতে দুই সারির মধ্যে দূরত্ব ৫৫ সেমি এবং এক সারির দুই লাইনের মধ্যে দূরত্ব হয় ২০ সেমি। এই পদ্ধতিতে বীজ লাগালে ফলন প্রায় ৪০-৫০% বেড়ে যায়। দুই সারির ৩টি বীজ সমদ্বিবাহু ত্রিভূজ উৎপন্ন করবে।

বীজের হার: মুখীর ছড়া ৪৫০-৬০০ কেজি/হেক্টর (১৫-২০ গ্রাম ওজনের মুখী)।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: সম্পূর্ণ গোবর বা খামারজাত সার, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও বরিক এসিড এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি জমি প্রস্তুতির শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক এমওপি চারা গজানোর

২০-২৫ দিন পর এবং বাকি ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে বীজ গজানোর ২০-২৫ দিন এবং ৪০-৫০ দিন এর মধ্যে পার্শ্ব প্রয়োগ পদ্ধতিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

মুখী কচুর চাষে নিম্নলিখিত হারে সার ব্যবহার করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ		
	কেজি/হেক্টর	কেজি/বিঘা	কেজি/শতক
গোবর	১০,০০০	১৩৭৭	৫.৫৯
ইউরিয়া	২৫০-৩৩০	৩৪.৪৪-৪৫.৪৫	০.১৪-০.১৮
টিএসপি	১৫০-২০০	২০.৬৬-২৭.৫৫	০.০৮-০.১১
এমওপি	২৫০-৩৫০	৩৪.৪৪-৪৮.২১	০.১৪-০.২০
জিপসাম	১০০ - ১৩০	১৩.৭৭-১৭.৯১	০.০৬-০.০৭
জিংক সালফেট*	১০ - ১৬	১.৩৮-২.২	০.০১
বরিক এসিড*	১০-১২	১.৩৮-১.৬৫	০.০১

*এলাকাভেদে প্রয়োজন হয়

আগাছা দমন: মুখী কচু ৬ থেকে ৯ মাসের ফসল। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় জমিতে প্রচুর আগাছা জন্মে। মুখী কচুর পুরো উৎপাদন মৌসুমে ৪-৬ বার আগাছা দমনের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে সারের উপরি প্রয়োগের আগে আগাছা দমন অত্যাবশ্যক। নচেৎ উপরি প্রয়োগের সার ফসলের চেয়ে আগাছাই বেশি গ্রহণ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে এবং মুখীর ফলন দারুণভাবে হ্রাস করবে। অঙ্কুরোদ্‌গম পূর্ব আগাছানাশক ম্যাগনাম গোল্ড (Pre-emergence herbicide Magnum Gold) বীজ রোপণের পরপর বা পরের দিন প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি ঔষধ মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। চারা লাগানোর দুই মাস পর হতে এক মাস অন্তর অন্তর চার বার নিড়ানী দ্বারা আগাছা দমন করতে হবে।

সেচ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা: মুখীকচু খরা মৌসুমে লাগানো হলে বীজ অঙ্কুরোদগমের জন্য তো বটেই প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে মাটির প্রকারভেদে ১০-২০ দিন পর পর সেচ দেয়া প্রয়োজন হয়। বর্ষাকালে সেচ দেওয়ার দরকার পড়ে না তবে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে মুখী কচুর উচ্চ ফলনের জন্য প্রয়োজনীয় সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা যথাসময়ে গ্রহণ করতে হবে।

রোগ ও পোকামাকড় দমন ব্যবস্থাপনা: পানি কচুর অনুরূপ।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

গাছের গোড়ায় মাটি তোলা: রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর এবং ৯০-১০০ দিন পর দুই সারির মাঝের মাটি কুপিয়ে ঝুরঝুরে করে কচু গাছের গোড়ায় উঠিয়ে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: বীজ রোপণের ছয় মাস পর আগাম ফসল সেপ্টেম্বর (মধ্য-ভাদ্র) মাস থেকে মুখী সংগ্রহের উপযোগী হয় এবং ঐ সময় গাছের পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করতে থাকে এবং ধীরে ধীরে মারা যায়। কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে মুখী সংগ্রহ করা হয়।

ফলন: উচ্চ ফলনশীল বিলাসী জাতে গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ৩০-৩৫ টন। মোট ফলনের ৭৫- ৮৫% মুখী (Corm) এবং বাকিটা গুঁড়িকন্দ (Cormel) ।

মুখী কচুর সাথে ডাঁটার আন্তঃফসল চাষ

মুখী কচু একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ সবজি। বর্ষাকালে যখন গ্রীষ্মকালীন সবজি শেষ হয়ে আসে এবং শীতকালীন সবজি বাজারে আসে না তখন কচুই সবজির উল্লেখযোগ্য চাহিদা পূরণ করে। মুখী কচু একটি দীর্ঘ মেয়াদী ফসল এবং ৭-৯ মাস জমিতে থাকে। যেহেতু দীর্ঘ সময় পর একক ফসল হিসেবে মুখী কচুর জমি থেকে আয় আসে সেজন্য মুখী কচুর জমি থেকে বাড়তি আয় করার জন্য আন্তঃফসল হিসেবে সবজি চাষ করা লাভজনক। মুখী কচুর দুই সারির মাঝে কয়েকটি সবজি সমন্বয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে আন্তঃফসল হিসেবে ডাঁটা থেকে বেশি আয় হয়। যেহেতু ডাঁটা বপনের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে পুরোটাই জমি থেকে উঠে আসে। তাই মুখী কচুর সাথে প্রতিযোগিতা কম হয় বিধায় মুখীর ফলনের উপরও তেমন প্রভাব পড়ে না।

মুখী কচুর সাথে ডাঁটার আন্তঃফসল

বিষয়	উৎপাদন প্রযুক্তি
ফসল	মুখী কচু ও ডাঁটা
জাত	**মুখী কচু:** বিলাসী ও **ডাঁটা:** বারি ডাঁটা ১ (লাবণী)
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	**মুখী কচু:** ৬০০ - ৭০০; **ডাঁটা:** ২ - ২.৫
রোপণ/বপন দূরত্ব	**মুখী কচু:** ৬০ সেমি × ৪৫ সেমি **ডাঁটা:** ৩০ সেমি × ৮ - ১০ সেমি মুখী কচুর প্রথম সারি থেকে ১৫ সেমি দূরে হালকা নালা করে এক সারি তারপর ৩০ সেমি দূরে আরেক সারি নালা টেনে ডাঁটার বীজ বুনতে হবে, ডাঁটার বয়স ১৫-২০ দিন হলে প্রায় ৮ - ১০ সেমি দূরত্ব রেখে ডাঁটা পাতলা করে দিতে হবে ।
রোপণ/বপনকাল	ফাল্গুন মাস (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য-মার্চ)
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	
ইউরিয়া	৩০০ - ৩৫০
টিএসপি	১৫০ - ২০০
এমওপি	২৫০ - ৩৫০
গোবর	১০ - ১৫ টন
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি এবং অর্ধেক এমওপি সার জমিতে শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া এক মাস পর ডাঁটা পাতলা করে ডাঁটা ও মুখী কচুর সারির পার্শ্ব দিয়ে নালা টেনে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া এবং এমওপি সার ডাঁটা তোলার পর মুখী কচুর সারির দুই পার্শ্বে নালা টেনে প্রয়োগ করে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে।
অন্যান্য পরিচর্যা	আগাছা দমন করতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ প্রয়োগ করতে হবে। বর্ষার সময় পানি নিষ্কাশনে সচেষ্ট থাকতে হবে।
ফলন (টন/হেক্টর)	**মুখী কচু:** ২৩ - ২৫ ও **ডাঁটা:** ২৪ - ২৮

আয়-ব্যয়

চাষ পদ্ধতি	মোট আয় (টাকা/হেক্টর)	মোট ব্যয় (টাকা/হেক্টর)	আয়-ব্যয়ের অনুপাত
একক মুখী কচু	২,৬০,০০০ - ২,৮৫,০০০	১,৩৫,০০০ - ১,৫০,০০০	১.৯ : ১
আন্তঃফসল (মুখী কচু - ডাঁটা)	৪,৬০,০০০ - ৪,৭৫,০০০	১,৬০,০০০ - ১,৬৭,০০০	২.৮৪ : ১

ওলকচুর জাত

বারি ওলকচু -১

বৈশিষ্ট্য: পত্রকগুলি ঘনভাবে বিন্যস্ত, একটার সাথে আরেকটা লেগে থাকে। ভূয়াকাণ্ডে সাদা ছোপ ছোপ দাগগুলো বড় আকারের এবং অল্প সংখ্যক কাঁটা কাঁটা গঠন থাকে বিধায় ভূয়াকাণ্ডটি হালকা খসখসে হয়। প্রধান গুড়িকন্দ বড় আকারের হয়, প্রতিটি গুড়িকন্দ হতে গড়ে ৩-৩.৫ টি করমেল উৎপন্ন করে। গুড়িকন্দের মাংশল অংশ ক্রিম রঙের এবং ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। একক গুড়িকন্দের ওজন ২-৫ কেজি। হেক্টর প্রতি ফলন : ৪৫-৫৫ টন।

বারি ওলকচু -১ এর গুঁড়িকন্দ

উপযোগী এলাকা: বাংলাদেশে সব অঞ্চলেই উঁচু জমিতে চাষ করা যায়।

বপনের সময়: মধ্য -মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি-মধ্য মার্চ) মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। প্রয়োজনে মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য-বৈশাখ (এপ্রিল) মাসেও লাগানো যায় তবে এরপরে রোপণ করলে ফলন কমে যায়।

ফসল উত্তোলনের সময়: ২১০-২৭০ দিন পর।

বারি ওলকচু-২

বারি ওলকচু -২ এর গুঁড়িকন্দ

বৈশিষ্ট্য: পত্রকগুলি হালকাভাবে বিন্যস্ত, একটা থেকে আরেকটা পৃথক থাকে। ভূয়াকাণ্ডে সাদা ছোপ ছোপ দাগগুলো ছোট আকারের এবং অধিক সংখ্যক কাঁটা কাঁটা গঠন থাকে বিধায় ভূয়াকাণ্ডটি বেশ খসখসে হয়। প্রধান গুড়িকন্দ মাঝারী আকারের হয়, প্রতিটি গুঁড়িকন্দ হতে গড়ে ৮-৯ টি করমেল উৎপন্ন করে। গুঁড়িকন্দের উপরের অংশ পার্পল রঙের, এর মাংশল অংশ হলুদ বর্ণের । একক গুঁড়িকন্দের ওজন ১-৩ কেজি। হেক্টরপ্রতি ফলন : ৩৫-৪৫ টন।

উপযোগী এলাকা: বাংলাদেশে সব অঞ্চলেই উঁচু জমিতে চাষ করা যায়।

বপনের সময়: মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। প্রয়োজনে মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য-বৈশাখ (এপ্রিল) মাসেও লাগানো যায় তবে এরপরে রোপণ করলে ফলন কমে যায়।

ফসল উত্তোলনের সময়: ২১০-২৭০ দিন পর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি: সু-নিষ্কাশিত এঁটেল দো-আঁশ, বেলে দো - আঁশ মাটি উপযোগী। অতিরিক্ত এঁটেল ও বেলে মাটিতে চাষ না করাই ভাল। মাটির 'জো' থাকা অবস্থায় মাটির প্রকারভেদে ৩-৪ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিয়ে ভাল করে মই দিয়ে মাটি চেপে দিতে হবে।

বীজ তৈরি: সাধারণত বিভিন্ন আকারের মুখী এক/দুই বছর আবাদ করার পর যে গুঁড়িকন্দ তৈরি হয় তাই বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের জন্য বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে ছোট আকারের গুঁড়ি কন্দগুলিকে এক বছর রোপণ করে বীজ তৈরি করতে হয়।

বীজ বপনের সময়: মধ্য -মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। প্রয়োজনে মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য-বৈশাখ (এপ্রিল) মাসেও লাগানো যায় তবে এরপরে রোপণ করলে ফলন কমে যায়।

বীজ বপণের দূরত্ব: অন্যান্য ফসলের মত ওলকচুর জন্য কোন একক দূরত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। বীজের আকারের অসমতার জন্য বিভিন্ন আকারের বীজ বিভিন্ন দূরত্বে বপণ করতে হবে।

স্বাভাবিক ও বাণিজ্যিক উৎপদনের জন্য বীজ বপনের দূরত্ব।

বীজের আকার (গ্রাম)		বপনের দূরত্ব (সেমি)	
স্বাভাবিক	বাণিজ্যিক	স্বাভাবিক	বাণিজ্যিক
৫০	৪০০ -৬০০	৫০ সেমি × ৪০ সেমি	৬০ সেমি × ৫০ সেমি
৫০ -২০০	৬০০ -৮০০	৬০ সেমি × ৪৫ সেমি	৬০ সেমি × ৬০ সেমি
২০০ -৪০০	৮০০ -১০০০	৬০ সেমি × ৫০ সেমি	৭৫ সেমি × ৬০ সেমি

বীজ বপনের পদ্ধতি: মুখী ও ছোট গুঁড়ি বপনের জন্য আলুর মত নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। লাঙ্গল দিয়ে লাইন তৈরি করে নির্দিষ্ট দূরত্বে বীজ বসিয়ে মাটি তুলে দিতে হবে বাণিজ্যিক উৎপাদনের জন্য নিদিষ্ট দূরত্বে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের আকার বীজের ব্যাসের চেয়ে একটু বড় হবে। গভীরতা হবে ব্যাসের তিন গুণ। তবে কন্দের ভিন্নতার উপর গত্রের আকার আকৃতি ভিন্ন হয়।

ফসলের পরিচর্যা

সার প্রয়োগ: আশানুরূপ ফলন পেতে হলে নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
গোবর বা আবর্জনা পচা সার	২০ টন
ইউরিয়া	৩২৫ কেজি
টিএসপি	২১০ কেজি
এমপি	১৭৫ কেজি

সম্পূর্ণ গোবর এবং ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সারের অর্ধেক জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক বীজ বপনের গর্তে বা লাইনে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান বা ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের ৮০-৮৫ দিন পর ভালভাবে আগাছা পরিষ্কার করে প্রথমবার এবং ১১০-১১৫ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা: বীজ লাগানোর পরে যদি মাটির 'জো' না থাকে এবং বৃষ্টিপাত না হয় তবে সেচ দিতে হবে। দুই সারি বা প্রতি সারির পার্শ্ব দিয়ে হালকা নালা তৈরি করে দিতে হবে যাতে সহজেই বৃষ্টির পানি চলে যেতে পারে। ধান, গমের খড় বা কচুরিপানা দ্বারা আচ্ছাদন (মালচ) দিলে ফলন অনেক গুন বৃদ্ধি করা যায় এবং সহজেই আগাছা দমন করা যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, বিভিন্ন আচ্ছাদন ব্যবহার করে শতকরা ৭০-৭৫ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব। জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

কীট পতঙ্গ ও রোগ বালাইয়ের প্রতিকার: ওলকচুর ক্ষেত্রে কীট পতঙ্গ ও রোগ বালাইয়ের তেমন কোন সমস্যা নেই। তবে মাঝে মাঝে লিফ বাইট (পাতা ও ডগা পচা রোগ), কলার রট প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

লিফ বাইট: এ রোগে পাতা বেশি আক্রান্ত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কাণ্ডতে ও লিফ বাইট রোগের লক্ষণ দেখা যায়। এ রোগের প্রতিকারের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম ডায়থেন এম-৪৫ বা রিডোমিল এম জেড বা এক্রোবেট এম জেড ছত্রাকনাশক ১৫ দিন পর পর ৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

কলার রট: এ রোগ শস্যের বৃদ্ধির শেষের দিকে দেখা যায়। এ রোগে মাটির সংযুক্ত স্থান আক্রান্ত হয়। কলার রট রোগে আক্রান্ত গাছ মাটি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে এবং শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে। আক্রান্ত গাছে ভিটাভ্যাক্স-২০০ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম মিশিয়ে সিঞ্চন যন্ত্রের সাহায্যে প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: একটি কন্দ থেকে ২-৪ টি পর্যন্ত ভূয়া কাণ্ড বের হতে দেখা যায়। একটি নতুন ভূয়া কাণ্ড বের হওয়ার পর পুরানটি মারা যায়। ক্ষেতে যখন শতকরা ৮০ ভাগ গাছ হলুদ হয়ে যায় তখন ফসল পরিপক্ক হবে এবং তখন থেকে ফসল সংগ্রহ করা যাবে। বীজের জন্য ক্ষেতের গাছ সম্পূর্ণ রূপে শুকিয়ে মারা যাওয়ার পর সংগ্রহ করতে হবে। বাজার মূল্য এবং বাজারের চাহিদা মোতাবেক ঠিকমতো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ক ওলও সংগ্রহ করা যেতে পারে।

বীজ সংরক্ষণ: ওলের গুড়িকন্দ, ক্ষুদ্রাকার গুঁড়িকন্দ ও মুখী বীজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। বীজ তোলার সময় যদি ভিজা থাকে তবে তা হালকা রোদে শুকিয়ে শীতল স্থানে সংরক্ষণ করতে হয়। দীর্ঘ দিন সংরক্ষণ করতে হলে ছায়াযুক্ত মাটিতে সমানভাবে গর্ত করে তার ভেতর ওল পাশাপাশি সাজিয়ে ১৫-২০ সেমি বালি মিশ্রিত মাটি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। বীজ যে জমিতে থাকে যদি অন্য কাজে প্রয়োজন না হয় তবে জমিতেই রেখে দেওয়া যায়। সেক্ষেত্রে লাগানোর ৩০-৩৫ দিন পূর্বে বীজ উঠিয়ে পুণরায় রোপণ করতে হবে।

ডাল ফসল

- ❀ খেসারী
- ❀ মসুর
- ❀ ছোলা
- ❀ মাসকলাই
- ❀ মুগ
- ❀ ফেলন
- ❀ মটর

ডাল ফসল বাংলাদেশে উদ্ভিদ জাতিয় আমিষের অন্যতম প্রধান উৎস। দরিদ্র মানুষের পুষ্টির অভাব পূরণে, তৃনভোজী প্রাণির স্বাস্থ্য সুরক্ষায়, মাটির উর্বরা শক্তি ও জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে ডাল জাতীয় ফসলের ভূমিকা অন্যতম। ডাল ফসলে প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিজ্জ আমিষ পাওয়া যায়। প্রজাতিভেদে ডাল ফসলে আমিষের পরিমাণ ২০-৩৫%। রুই মাছ, মুরগির মাংস, গরুর দুধ, গমের আটা অপেক্ষা ডাল ফসলে আমিষের পরিমাণ বেশি থাকে। এই কারণে ডালকে গরিবের মাংস বলা হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি এবং আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৮৫ লক্ষ হেক্টর। ডাল জাতীয় ফসলের আবাদকৃত জমির পরিমাণ ৯.৯৭৩ লক্ষ হেক্টর যা মোট আবাদি জমির শতকরা ১১.৭৪ ভাগ এবং উৎপাদিত ডালের পরিমাণ ১০.২৬৩ লক্ষ মেট্রিক টন (কৃষি ডাইরি ২০১৮)। বিশ্ব খাদ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিদিন একজন মানুষের ৪৫ গ্রাম ডাল খাওয়া উচিত সেই তুলনায় আমরা ভক্ষণ করি গড়ে মাত্র ১৭ গ্রাম। অপর্যাপ্ত উৎপাদনের জন্য এদেশের জনগণের মাথাপিছু দৈনিক ডালের প্রাপ্যতা খুবই কম।

বাংলাদেশের ডাল উৎপাদন খাত খুবই সম্ভাবনাময়। দেশের দক্ষিণ-উত্তর-পশ্চিম জেলাসমূহে (বরিশাল, পটুয়াখালী, বরগুনা, ভোলা, যশোর, মাগুরা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, পটুয়াখালী, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ) ব্যাপকভাবে ডাল জাতীয় ফসল মসুর, মুগ, খেসারী, মাসকলাই ও মটর চাষাবাদ হয়। এই সব এলাকার মাটি দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ এবং উচু ও মাঝারী উঁচু এবং বন্যামুক্ত হওয়ায় কৃষকেরা সহজেই সঠিক সময়ে আমন ধান রোপণ করতে পারে এবং সহজেই ডাল জাতীয় ফসল চাষ করে লাভবান হতে পারেন। ডাল শুটি জাতীয় ফসল হওয়ায় অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতেও ডালের চাষ করা যায়।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি মাটির উর্বরা শক্তি ফিরে পেতে ও জৈব পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধিতে এবং অর্থনৈতিক খাতকে শক্তিশালী করতে ডালের আবাদ বাড়ানো একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উচ্চ ফলনশীল বিভিন্ন জাত এবং উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ডাল ফসল চাষে এসব প্রযুক্তি ও উন্নত জাত ব্যবহার করে অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব। তাই ডাল ফসল চাষ করলে পুষ্টি উপাদান সরবারহের পাশাপাশি দেশে ডালের চাহিদা অনেকাংশে মেটানো সম্ভব হবে।

খেসারী

বাংলাদেশের ডাল ফসলের মধ্যে চাষযোগ্য এলাকা ও মোট উৎপাদনের দিক থেকে খেসারীর স্থান দীর্ঘদিন যাবৎ প্রথম থাকলেও ২০১৮ সালের কৃষি ডাইরি অনুযায়ী খেসারী দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। চাষ যোগ্য মোট জমি প্রায় ২.৬৬৪ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ৩.০১৮ লক্ষ মে.টন। খেসারী একক ফসল হিসেবে চাষের পাশাপাশি রিলে বা সাথী ফসল হিসেবে সহজেই চাষাবাদ করা যায়। উৎপাদিত অধিকাংশই ডাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এর খড় ও ভুষি গবাদি পশুর খাবার হিসেবে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট।

খেসারী ফসল

খেসারীর দানা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর ডাল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক এ পর্যন্ত মোট ৫ (পাঁচ) টি

উচ্চ ফলনশীল খেসারীরজাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব জাতে অধিক পুষ্টিমান এবং ক্ষতিকারক নিউরিটক্সিনের [ODAP (Oxalyl diaminopro pionic acid)] পরিমাণ ক্ষতিকর মাত্রার চেয়ে কম হওয়ায় কৃষক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

খেসারীর জাত

বারি খেসারী-১

বারিখেসারী-১ জাতটি ১৯৯৫ সালে অনুমোদন করা হয়েছে। এ জাত সমগ্র বাংলাদেশে চাষ করা যায়। বারি খেসারী-১ জাতটি স্থানীয় জাতের তুলনায় ৪০% পর্যন্ত বেশি ফলন দেয়। এ জাতের গাছ গাঢ় সবুজ এবং প্রচুর শাখা-প্রশাখা হয়ে থাকে।

বারি খেসারী-১ এর ফসল

বারি খেসারী-১ এর দানা

বারি খেসারী-১ জাতের এক হাজার বীজের ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম। জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১৪০০-১৬০০ কেজি। এ জাত পাউডারি ও ডাউনী মিলিডিউ রোগ সহনশীল। ওডাপের (ODAP) পরিমাণ ০.০২৫%।

বারি খেসারী-২ এর ফসল

বারি খেসারী-২ এর দানা

বারি খেসারী-২

বারি খেসারী-২ জাতটি ১৯৯৬ সালে সারাদেশে আবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। পাতা স্থানীয় জাতের তুলনায় বেশি চওড়া।

ফুলের রং নীল। গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি। বীজ একটু বড় এবং রং হালকা ধূসর। হাজার বীজের ওজন ৫০-৫৫ গ্রাম। বীজ বপন থেকে ফসল পাকা পর্যন্ত ১২৫-১৩০ দিন সময় লাগে। ওডাপের (ODAP) পরিমাণ ০.০২৫%। ফলন হেক্টরপ্রতি ১৫০০-২০০০ কেজি।

বারি খেসারী-৩

সিরিয়ায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট, ইকার্ডা (ICARDA) হতে সংগৃহীত ২২টি সংকরায়িত লাইন বহুস্থানিক অভিযোজন পরীক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন মাটি ও আবহাওয়াতে পরীক্ষা করা হয়। এগুলোর মধ্যে একটি লাইন Sel-190 রোগ সহনশীল, উচ্চফলনশীল এবং বেশি বায়ো-মাস উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় বারি খেসারী-৩ হিসেবে ২০১১ সালে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতটি বাংলাদেশের প্রধান খেসারী আবাদী এলাকাসমূহের একক ফসল এবং সাথী ফসল হিসেবে আমন ধানের সাথে চাষ করা যায়। এঁটেল দোঁআশ, পলি বা পলি দোঁআশ মাটি জাতটি চাষের জন্য উপযোগী।

বারি খেসারী-৩ এর ফসল

বারি খেসারী-৩ এর দানা

ফুল বড় ও গাছের উচ্চতা ৬২-৬৫ সেমি এবং প্রতি গাছে পড সংখ্যা ৩৫-৩৭ টি, ১০০০ বীজের ওজন ৫৩-৫৮ গ্রাম। ফলন হেক্টরপ্রতি ১৮০০-২০০০ কেজি এবং জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। ওডাপ (ODAP) এর পরিমাণ ০.০৪%।

বারি খেসারী-৪

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম হতে প্রাথমিক, অগ্রগতি ও বহুস্থানীক পরীক্ষার মাধ্যমে ২০১৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বারি খেসারী-৪ জাতটি আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুর হতে উদ্ভাবিত হয়েছে।

- গাছের উচ্চতা ৬৫-৭০ সেমি
- পাতা হালকা সবুজ এবং পত্রাংশগুলো বেশ ছোট হয়।
- পত্রফলক বড়, ফুল সাদা ও বীজের রং সাদা
- প্রতি গাছে পডের সংখ্যা ১৭-২৩ টি।
- পডগুলো একটু লম্বাকৃতির।
- বীজের ওজন : ৭.০-৭.১ গ্রাম (প্রতি ১০০টি)
- জীবনকাল : ১১৪-১১৭ দিন
- ফলন : ৭০০-১১০০ কেজি/হেক্টর
- পাউডারি মিলডিউ রোগ সহনশীল
- বারোমাস উৎপাদনশীল বিধায় এ জাতটি অধিক গো-খাদ্য হিসাবে খুবই উপযোগী

বারি খেসারী-৪ এর ফসল

বারি খেসারী-৪ এর দানা

বারি খেসারী-৫

বারি খেসারী-৫

২০১০ সালে আন্তর্জাতিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ICARDA (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas) এর সহযোগিতায় কম ODAP সম্পন্ন ১৫টি জার্মপ্লাজম বা লাইন সংগ্রহ করে প্রাথমিকভাবে তাদের ফলন পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে উচ্চফলনশীল এবং কম ODAP সম্পন্ন জার্মপ্লাজমগুলোকে বাছাই করে বহুস্থানীক পরীক্ষা ও রিলে ফসল হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। ২০১৪ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের মাদারীপুর, সাতক্ষীরা ও পাবনা অঞ্চলে ফলন ও অভিযোজন ক্ষমতা, রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় সংবেদনশীলতা এবং গুণগত মান মূল্যায়ন করা হয়। তন্মধ্যে এটি উচ্চফলনশীল এবং প্রতিরোধী লাইন হিসেবে নির্বাচন করা হয়। দীর্ঘদিন পরীক্ষার পর লাইনটি একটি সম্ভাবনাময় লাইন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় জাত হিসেবে মুক্তায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়। জাত হিসাবে এ লাইনটি নির্বাচিত করা হলে রবি মৌসুমে খেসারী আবাদযোগ্য দেশের একটি বিশাল পতিত জমি চাষ আবাদের আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং দেশের ডালের ঘাটতি পুরনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। তাই এই জাতটি ২০১৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

গাছ লম্বা আকৃতির (৭০-৮০ সেমি) এবং অধিক বায়োমাস বিশিষ্ট। এর ফুল বড় এবং গাঢ় নীল, বীজ মসৃণ ও ধূসর বর্ণের এবং এ জাতটি গোড়া পচা এবং ডাউনি মিলডিউ রোগ সহনশীল। গাছে ফলের সংখ্যা বেশি (৩০-৪৯ টি) ও তুলনামূলক বড় আকৃতির বীজ (১০০ বীজের ওজন ৫.৩-৫.৮ গ্রাম)। জীবনকাল ১২১-১২৫ দিন। গড় বীজের ফলন-১.৪৭-১.৭০ টন/হেক্টর। তবে অনুকূল আবহাওয়া ও যথাযথ যত্ন নিলে ফলন হেক্টরপ্রতি ২ টনের অধিক হতে পারে। ODAP এর পরিমাণ খুব কম (০.০৪%)।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: সুনিষ্কাশিত দোআঁশ/পলি দোআঁশ এবং এঁটেল দোআঁশ মাটিতে খেসারী ভাল জন্মে।

জমি তৈরি: একক ফসল হিসেবে আবাদের ক্ষেত্রে জমিতে সুনিষ্কাশিত ও উপর্যুক্ত রস থাকলে ২-৩ টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। খেসারী প্রধানত আমন ধানের জমিতে সাথী ফসল (রিলে ক্রপ) হিসেবে আবাদ করা হয়। সেক্ষেত্রে জমি চাষের প্রয়োজন হয় না।

বপনের সময়: রিলে ফসলের ক্ষেত্রে আমন ধানের পরিপক্কতাকাল এবং জমির রসের পরিমাণের উপর খেসারীর বীজ বপনের সময় অনেকটা নির্ভর করে। তবে আমন ধান কাটার ১০-১৫ দিন পূর্বে জমি থেকে পানি নেমে যায়ার সাথে সাথে বীজ বপন করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ কার্তিক মাসের (অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য নভেম্বর) পর্যন্ত বীজ বপন করতে হয়।

বপন পদ্ধতি: ছিটানো ও সারি দুই পদ্ধতিতেই খেসারীর বীজ বপন করা যায়। সারিতে বীজ বপন করলে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা যেমন আগাছা দমন, রোগ ও পোকামাকড় ব্যবস্থাপনা সহজেই করা যায়। তবে সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সেমি বা ১৬ ইঞ্চি রাখতে হবে। এবং সারির মধ্যে অবিরাম বীজ বপন করতে হবে।

বীজের হার: সারিতে বপন করলে বিঘাপ্রতি ৭-৮ কেজি (৫৩-৬০/কেজি) এবং রিলে বা ছিটিয়ে বপন করলে বীজের পরিমাণ কিছু বেশি দিতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর(কেজি)	সারের পরিমাণ/বিঘা(কেজি)
ইউরিয়া	৩০-৩৫	৪০-৫০
টিএসপি	৫৩-৬০	৭-৮
এমপি	৪০-৪৫	৫-৬
জিপসাম	৪০-৪৫	৫.০-৬.০
বোরন (প্রয়োজনবোধে)	৭-১০	১-১.৫
অণুজীব সার (প্রয়োজনবোধে)	সুপারিশমতো	সুপারিশমতো

খেসারীর রিলে ফসলের ক্ষেত্রে সারের তেমন প্রয়োজন হয় না। একক ফসলের জন্য অনুর্বর জমিতে হেক্টরপ্রতি শেষ চাষের সময় উপরোক্ত হারে সার ব্যবহার করতে হবে। তবে গাছের বৃদ্ধি কম হলে গাছ গজানের ৩০-৩৫ দিন পর উভয় ক্ষেত্রেই উপরোক্ত মাত্রায় ইউরিয়া সার বিকাল বেলায় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: বীজ বপনের ১১৪-১৩০ দিন (জাত ভেদে দিনের পরিবর্তন হয়) পর বা ফাল্গুন (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য-মার্চ) মাসে ফসল সংগ্রহ করতে হয়। খেসারীর ফল পেকে গাছ শুকিয়ে গেলে গাছগুলোকে কেটে শক্ত মাটিতে বা মাটির উপরে পলিথিন বিছিয়ে অথবা পাকা মেঝেতে ছড়িয়ে রেখে শুকাতে হবে। তারপর রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে অথবা যান্ত্রিক উপায়ে মাড়াই করতে হবে। ঝাড়াই করার জন্য কুলা বা বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করা উত্তম।

অন্যান্য পরিচর্যা

খেসারী

খেসারীর ডাউনি মিলডিউ রোগ দমন

পেরোনোসপোরা ভিসি নামক ছত্রাক এ রোগ ঘটায়। রোগাক্রান্ত খেসারী গাছের পাতা কিছুটা হলদে হয়ে যায়। পাতার নিচে লক্ষ্য করলে ছত্রাকের অবস্থান খালি চোখেই দেখা যায়। রোগের মাত্রা বেশি হলে পাতা কুঁচকে ও ঝলসে যায়। এ ছত্রাকের জীবাণু মাটিতে ১-২ বৎসর বেঁচে থাকতে পারে।

প্রতিকার

- সঠিক সময়ে (কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত) বীজ বপন করতে হবে।
- রোগ সহনশীল জাত, যেমন- বারি খেসারী-২, বারি খেসারী-৩, বারি খেসারী-৪ এবং বারি খেসারী-৫ চাষ করতে হবে।
- টিল্ট-২৫০ ইসি (০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে) বা থিওভিট ৮০ WP ২ গ্রাম পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ৩ বার স্প্রে করে এরোগ দমন করা যায়।

জাবপোকা

খেসারীতে মাঝে মাঝে জাব পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এদের আক্রমণে গাছ খর্বাকৃতি হয়, ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্থ হয়, বীজের দানা অপুষ্ট ও আকারে ছোট হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ডাইমেথয়েট গ্রুপের যেমন: টাফগর ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি লিটার ঔষধ মিশিয়ে ব্যবহার করলে এই পোকা দমন করা যায়।

মসুর

মসুর ডাল ফসল

বাংলাদেশে মসুর সবচেয়ে জনপ্রিয় ডাল ফসল। জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের ভিত্তিতে মসুর ডাল বাংলাদেশে ২য় স্থানে অবস্থান করলেও, ব্যবহার ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে ১ম স্থান লাভ করে আছে। বাংলাদেশে ডাল ফসলের এলাকা ও উৎপাদনের দিক থেকে মসুরের স্থান দ্বিতীয়। মোট আবাদী এলাকা প্রায় ২.৭৪ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ৩.৫৫ লক্ষ মে. টন এবং গড় ফলন প্রতি হেক্টর ১৩১৫ কেজি। ডাল গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ সংকরায়ণ ও প্রচলিত প্রজনন পদ্ধতি অবলম্বন করে মসুরের জাত উদ্ভাবন কাজ করছেন। এছাড়া ICARDA হতে প্রাপ্ত লাইনসমূহ বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়াতে পরীক্ষার মাধ্যমে সরাসরি প্রর্বতন করা হয়। তারপর কাঙ্ক্ষিত লাইনকে প্রাথমিক, অগ্রবর্তি, অঞ্চলভিত্তিক ও কৃষকের মাঠে মুল্যায়ন পরীক্ষার পর জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয়। এই পর্যন্ত ডাল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক ০৯টি উচ্চ ফলনশীল, রোগ সহনশীল ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন মসুরের জাত অবমুক্ত করা হয়েছে।

বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত এসব জাত কৃষক পর্যায়ে ব্যাপক আবাদ হলে দেশে ডালের চাহিদা অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হবে। মসুর একদিকে একক ফসল এবং অন্যদিকে সাথী ও আন্তঃফসল হিসেবে বাংলাদেশের কৃষকের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। মসুর চাষে জমির উর্বরতাও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়।

মসুরের জাত

বারি মসুর-১

বারি মসুর-১ এর ফসল

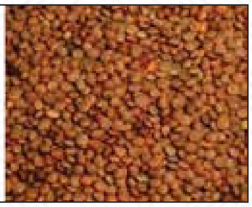

বারি মসুর-১ এর দানা

বারি মসুর-১ জাত পাবনা এলাকার সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে উদ্ভাবন করা হয়েছে। ১৯৯১ সালে কৃষক পর্যায়ে আবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক এ জাতটি অনুমোদন লাভ করে। গাছের আকৃতি মধ্যম এবং উপরিভাগ লতানো হয় না ও ডগা বেশ সতেজ। গাছের পাতা গাঢ় সবুজ। কাণ্ড হালকা সবুজ। ফুলের রং সাদা।

হাজার বীজের ওজন ১৫-১৬ গ্রাম। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ১০-১২ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২৬-২৮%। এ জাতের জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৭০০-১৮০০ কেজি।

বারি মসুর-২

বারি মসুর-২ এর ফসল

বারি মসুর-২ এর দানা

ইকার্ডা (ICARDA) থেকে ১৯৮৪ সালে এ লাইনটি বাংলাদেশে আনা হয়। এ লাইনটি বিভিন্ন এলাকায় প্রাথমিক, অগ্রবর্তী ও পরবর্তীতে বহুস্থানিক পরীক্ষার পর ১৯৯৩ সালে সারা দেশে আবাদের জন্য জাতটি অবমুক্ত করা হয়।

গাছের আকার মধ্যম ও গাছের উপরিভাগ সামান্য লতানো হয়। পাতায় সরু আকর্ষী থাকে। গাছের পাতা গাঢ় সবুজ। কাণ্ড হালকা সবুজ ও ফুল সাদা। হাজার বীজের ওজন ১২-১৩ গ্রাম। রান্না হওয়ার সময়কাল ১৪-১৬ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২৭-২৯%। জাতটির জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫০০-১৭০০ কেজি।

বারি মসুর-৩

বারি মসুর-৩ এর ফসল

বারি মসুর-৩ এর দানা

বারিমসুর-৩ জাতটি একটি সংকর জাত। একটি স্থানীয় জাত এবং অগ্রবর্তী লাইনের (বিএলএক্স ৭৯৬৬৬)

সাথে ১৯৮৫ সালে সংকরায়ণ করা হয়। পরবর্তীতে বহুস্থানিক ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাইকৃত এ জাতটি ১৯৯৬ সালে কৃষক পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়।

কান্ডে পিগমেন্টেশন বিদ্যমান। পাতার রং সবুজ। বীজের রং ধূসর এবং বীজে ছোট ছোট কালচে দাগ আছে। বীজের আকার স্থানীয় জাত অপেক্ষা বড়। হাজার বীজের ওজন ২২-২৫ গ্রাম। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ১০-১২ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২৪-২৬%। জীবনকাল ১০০-১০৫ দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ১৫০০-১৭০০ কেজি।

বারি মসুর-৪

বারি মসুর-৪ এর ফসল

বারি মসুর-৪ এর দানা

বারি মসুর-৪ জাতটি ১৯৮৫ সালে বারি মসুর-১ এবং ইকার্ডা থেকে প্রাপ্ত জাতের সাথে সংকরায়ণ করে ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়াতে পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে ফলন ও অন্যান্য গুণাবলী বিবেচনা করে এ লাইনটি (আইএলএক্স ৮৭২৪৭) সন্তোষজনক হওয়ায় উন্নত জাত হিসেবে চাষাবাদের জন্য ১৯৯৬ সালে অবমুক্ত করা হয়।

গাছের রং হালকা সবুজ। পত্রফলক আকারে বড় এবং পাতার শীর্ষে আকর্ষী আছে। ফুলের রং বেগুনি। বীজের আকার স্থানীয় জাত হতে বড় ও চেপ্টা ধরনের।

বীজের রং লালচে বাদামি। হাজার বীজের ওজন ২০-২১ গ্রাম। এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ সহনশীল। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ১১-১৩ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২৪-২৬%। ফলন হেক্টরপ্রতি ১৬০০-১৭০০ কেজি।

বারি মসুর-৫

বারি মসুর-৫ এর ফসল

বারি মসুর-৫ এর দানা

ইকার্ডা, সিরিয়া হতে সংকরায়িত লাইন থেকে প্রাপ্ত GX-3 পপুলেশন বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়াতে পরীক্ষা করা হয়। পরবর্তীতে ফলন ও অন্যান্য গুণাবলী যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, আগাম পরিপক্কতা ইত্যাদি বিবেচনা করে ১৩টি লাইন বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত এ সমস্ত লাইনগুলোকে দেশের ভিন্ন মসুর উৎপাদন এলাকায় প্রাথমিক, অগ্রবর্তী ও বহুস্থানীক ফলন পরীক্ষা করা হয়। কৃষকের জমিতে এ লাইনটি (X-95S-136) ফলন সন্তোষজনক বিবেচিত হওয়ায় উন্নতজাত হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এ লাইনটি ২০০৬ সালে বারি মসুর-৫ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

পাতা ও গাছের রং সবুজ, পাতার অগ্রভাগে ছোট আকারের টেন্ড্রিল থাকে। গাছের ধরন ঝোপালো, গাছের উচ্চতা ৩৮ সেমি এবং ফুলের রং হালকা বেগুনী, বীজ স্থানীয় জাত হতে বড় ও চেপ্টা ধরনের। বীজের রং লালচে বাদামী পরিপক্কতার সময় ১১০-১১৫ দিন। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ২১০০-২২০০ কেজি। এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ সহনশীল।

বারি মসুর-৬

২০০০ সালে ইকার্ডা সিরিয়া হতে সংগৃহীত সংকরায়িত লাইন থেকে প্রাপ্ত এফ-৩ পপুলেশন বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়াতে পরীক্ষা করা হয়। প্রাথমিকভাবে ৫৮ টি একক গাছ নির্বাচন করা হয়। পরর্তীতে ফলন ও অন্যান্য গুণাবলী যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, আগাম পরিপক্কতা ইত্যাদি বিবেচনা করে ১১টি লাইন বাছাই করা হয়। বাছাইকৃত এ সমস্ত লাইনগুলোকে দেশের বিভিন্ন মসুর উৎপাদন এলাকায় প্রাথমিক, অগ্রবর্তী ও বহুস্থানীক ফলন পরীক্ষা করা হয়। কৃষকের জমিতে এ লাইনটির [X-95S-167(5)] ফলন সন্তোষজনক, রোগ সহনশীল, উচ্চ মাত্রায় আয়রন ও জিংক সমৃদ্ধ এবং দেশের সর্বত্র আবাদ উপযোগী বিবেচিত হওয়ায় উন্নতজাত হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এ লাইনটি ২০০৬ সালে বারি মসুর-৬ নামে জতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

বারি মসুর-৬ এর সবুজ ফসল *বারি মসুর-৬ এর পরিপক্ক ফসল* *বারি মসুর-৬ এর দানা*

পাতার রং গাঢ় সবুজ,পাতার অগ্রভাগে টেন্ড্রিল থাকে না। গাছের ধরন ঝোপালো,উচ্চতা ৩৫-৪০ সেমি। ফুলের রং বেগুনী, বীজ আকারে স্থানীয় জাত হতে অনেক বড় ও চেপ্টা ধরনের। বীজের রং গাঢ় বাদামী, হেক্টরপ্রতি ফলন ২২০০-২৩০০ কেজি। পরিপক্কতার সময় ১১০-১১৫ দিন। এ জাতটি মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগ সহনশীল।

বারি মসুর-৭

ইকার্ডা, সিরিয়া হতে সংগৃহীত সংকরায়িত X95S-16(4) লাইন থেকে প্রাপ্ত এফ-৩ পপুলেশন বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়ায় পরীক্ষা করা হয় এবং পরবর্তীতে ফলন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ও পরিপক্কতা বিবেচনা করে বারি মসুর-৭ হিসেবে অবমুক্তির জন্য নির্বাচিত করা হয়। জাতটি বাংলাদেশের সকল এলাকায় চাষাবাদের উপযোগী বিশেষ করে মসুর উৎপাদন এলাকা যেমন-পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া,ফরিদপুর, রাজশাহী, মাগুরা, ঝিনাইদহ এবং মাদারীপুরে জাতটি অধিক উৎপাদনক্ষম। সব ধরনের মাটিতেই জাতটি চাষ করা যেতে পারে। তবে সুনিষ্কাশিত বেলে দোঁআশ মাটিতে ভাল জন্মে। জমিতে পানি জমে না থাকলে কাঁদা মাটিতেও রিলে ফসল হিসাবে এর চাষ করা যেতে পারে।

বারি মসুর-৭ এর পরিপক্ক ফসল

বারি মসুর-৭ এর দানা

গাছের উচ্চতা ৩২-৩৮ সেমি। প্রতি গাছে পড সংখ্যা ৫৫-৬০টি। বীজের রং লালচে বাদামী ও হালকা কালো ফোঁটাযুক্ত। ১০০০ বীজের ওজন ২২-২৩ গ্রাম। জীবনকাল ১১০-১১৫দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ১৮০০-২৩০০ কেজি।

বারি মসুর-৮

কৌলিক সারি নং আইএলএল-৫৮৮৮ এবং আইএলএল-৬০০২। ইকারডা (ICARDA), সিরিয়াতে উক্ত কৌলিক সারিগুলো সংকরায়ণের ফলে জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ এলআর-৯-২৫ লাইনটি উদ্ভাবিত হয়। ২০০৭ সাল হতে আর্ন্তজাতিক সংস্থা ইকার্ডা কর্তৃক প্রাপ্ত এলআর-৯-২৫ লাইনটি বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়াতে পরীক্ষা করা হয়। এই লাইনটি উচ্চফলনশীল এবং মরিচা ও স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট (পাতা ঝলসানো) রোগ সহনশীল এবং সর্বোপরি দেরিতে বপনযোগ্য হওয়ায় প্রাথমিকভাবে লাইনটিকে নির্বাচন করা হয়। বাছাইকৃত ঐ লাইনটিকে প্রাথমিক, অগ্রবর্তি, অঞ্চলভিত্তিক ও কৃষকের মাঠে মুল্যায়ন পরীক্ষার পর জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয় এবং ২০১৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

বারি মসুর-৮ এর পরিপক্ক গাছ

বারি মসুর-৮ এর দানা

এ জাতটির পাতা ও কাণ্ড হালকা সবুজ এবং পাতায় হালকা ট্রেন্ড্রিলযুক্ত। গাছ ঝোপালো আকৃতির এবং ফুলের রং বেগুনী। গাছের গোড়ায় খয়েরী পিগমেন্ট বিদ্যমান। বীজ গোলাকার, ধূসর ও হালকা কালো ফোটা যুক্ত। ষ্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট (পাতা ঝলসানো) রোগ সহনশীল। আমিষের পরিমাণ ২৪.০ - ২৪.৯ %। জিংক এর পরিমাণ ৬০ পিপিএম। আয়রন এর পরিমাণ ৮০ পিপিএম। ১০০০ টি বীজের ওজন ১৯-২২ গ্রাম। জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন। ফলন হেক্টর প্রতি ২১০০-২২০০ কেজি। নাবিতে বপন যোগ্য (নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত)।

বারি মসুর-৯

২০০৭ সালে ডাল গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনায় ICARDA, সিরিয়া, থেকে উচ্চ মাত্রায় জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ কিছু জার্মপ্লাজম আসে। উক্ত জার্মপাজমগুলো পরপর তিন বছর ডাল গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনাতে মূল্যায়ন করা হয়। এটি স্বল্পকালীন হওয়ায় ২০১২ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত বাংলাদেশের যশোর, জামালপুর, ফরিদপুর ও পাবনা অঞ্চলে ফলন ও অভিযোজন ক্ষমতা, রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় সংবেদনশীলতা এবং গুণগত মান মূল্যায়ন করা হয় । দীর্ঘদিন পরীক্ষার পর লাইনটি একটি সম্ভাবনাময় লাইন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় জাত হিসেবে মুক্তায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়। জাত হিসাবে এ লাইনটি নির্বাচিত করা হলে দেশের একটি বিশাল পতিত জমি (আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী) চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হবে, মসুর ডালের ফলন বৃদ্ধির পাশাপাশি মানব স্বাস্থ্যে আয়রন ও জিংকের ঘাটতি পূরনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে এবং দেশের ডালের ঘাটতি পুরনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে ।

বারি মসুর-৯

এ জাতটি বিশেষভাবে স্বল্পকালীন এবং উচ্চ মাত্রায় জিংক ও আয়রন সমৃদ্ধ। সেক্ষেত্রে আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী পতিত জমিতে এটি একটি অতিরিক্ত ফসল হওয়ায় কৃষকগন আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। জাতটি রবি মৌসুমে ডাল ফসল হিসেবে দেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। এই জাতটি ২০১৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড বানিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

পাতা ও কাণ্ড হালকা সবুজ রংয়ের, ফুল নীলাভ সাদা, বীজ হালকা ধুসর বর্ণের এবং জীবনকাল ৮৫-৯০ দিন। এ জাতটি পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল, ১০০ বীজের ওজন ২.২২-২.৯৬ গ্রাম এবং গড় ফলন- ১.১৯ - ১.৫২ টন/হেক্টর। জাতটি স্বল্প মেয়াদী হওয়ায় আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে সহজেই চাষোপযোগী ।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: সুনিষ্কাশিত দোআঁশ/বেলে দোআঁশ/এঁটেল দোআঁশ মাটি মসুর চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি: একক ফসল হিসেবে আবাদের ক্ষেত্রে জমিতে সুনিষ্কাশিত ও উপর্যুক্ত রস থাকলে ৩-৪ টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মসুর আমন ধান কাটার পূর্বে রিলে ফসল হিসেবে আবাদ করা হলে চাষের প্রয়োজন হয়না।

বপনের সময়: কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সঠিক সময়ে বীজ বপন করা প্রয়োজন। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত (কার্তিকের ২য় সপ্তাহ - কার্তিকের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত) বীজ বপনের উত্তম সময়। গবেষণায় দেখা যায় বপনের সময় প্রতি ১০ দিন বাড়ার সাথে সাথে ফলন ২০ ভাগ হারে কমতে থাকে। তবে বারি মসুর-৮ নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত বোনা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে ফলন কিছুটা কমলেও রোগের কারণে ব্যাপক ক্ষতি হওয়ার আশংকা কম।

বীজ শোধন: ডাল জাতীয় ফসল বীজ বপনের পূর্বে শোধন করলে মাটি ও বীজ বাহিত অনেক জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই মসুর বীজ বপনের পুর্বে অবশ্যই প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউ পি (কার্বোজিন+থিরাম) ২.৫ গ্রাম হারে প্রতি কেজি বীজে মিশিয়ে শোধন করলে শুরুতে গোড়া পচা রোগের প্রকোপ কমে যায়।

বপন পদ্ধতি: ছিটানো ও সারি এই দুই পদ্ধতিতে মসুরের বীজ বপন করা যায়। সারিতে বীজ বপন করলে গাছ সমানভাবে বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বিভিন্ন রকম অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা যেমন- আগাছা দমন, রোগ ও পোকা দমন, সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা এবং পরিশেষে ফসল সংগ্রহ সহজ হয়। তাই সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার দেয়া ভালো।

বীজের হার: বীজের হার ৩০-৩৫ কেজি/হেক্টর। ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ সামান্য বেশি দিতে হয়। তবে বারি মসুর-৩ এর বেলায় হেক্টরপ্রতি ৩৫-৪০কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে। বারি মসুর-৯ জাতের ক্ষেত্রে বীজ হার ৭০-৮০ কেজি/হেক্টর। তবে আমন ধানের সাথে সাথী ফসল (রিলে ক্রপ) হিসাবে আবাদ করলে ৫০-৬০ কেজি/ হেক্টর বীজ প্রয়োজন হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: যে জমিতে পূর্বে মসুর চাষ করা হয় নাই সেখানে প্রতি কেজি বীজের জন্য ৫০ গ্রাম হারে অনুমোদিত অণুজীব সার বীজের সাথে মিশিয়ে বপন করতে হবে। ইনোকুলাম ব্যবহার করলে সাধারণত ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হয় না। একক ফসলের জন্য অনুর্বর জমিতে হেক্টরপ্রতি নিম্নলিখিত সারগুলি জমি শেষ চাষের সময় ব্যবহার করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর (কেজি)	সারের পরিমাণ/বিঘা (কেজি)
ইউরিয়া	৪০-৪৫	৫-৬
টিএসপি	৮০-৯০	১০-১৩
এমপি	৩০-৪০	৪-৫
জিপসাম	৫০-৫৫	৭-৮
বোরন (প্রয়োজনবোধে)	৭-১০	১-১.৫
অণুজীব সার (প্রয়োজনবোধে)	সুপারিশমতো	সুপারিশমতো

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: জমিতে আগাছা থাকলে বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে নিড়ানী দ্বারা একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। অতিবৃষ্টির ফলে জমিতে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেজন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। তবে মাটিতে রসের অভাবে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হলে গাছ গজানোর ৩০-৪০ দিনের মধ্যে একবার হালকা সেচ দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: বীজ বপনের ১১০-১১৫ দিন পর মসুর সংগ্রহ করা যায়। (মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মার্চ) মাসে ফসল সংগ্রহ করা যায়)। বারি মসুর-৯ জাতটি স্বল্প জীবনকাল হওয়ায় ৮৫-৯০ দিন পর মসুর সংগ্রহ করা যায়।

অন্যান্য পরিচর্যা

স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট (পাতা ঝলসানো রোগ)

স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট বাংলাদেশে বর্তমানে মসুরের সবচেয়ে ক্ষতিকর রোগ। ১৯৮৬ সালে এ রোগ সর্ব প্রথম শনাক্ত করা হয়। এর পর থেকে ঢাকা জেলাসহ দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে এর প্রকোপ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাধারণভাবে সমগ্র বাংলাদেশে এর আক্রমণ লক্ষ করা গেছে। স্টেমফাইলিয়াম বোট্রায়সাম (*Stemphylium botryosum*) নামক একটি ছত্রাক জাতীয় জীবাণু এ রোগের কারণ। এ রোগের রোগচক্র খুব বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করা না গেলেও এটা নিশ্চিত যে জীবাণু ছত্রাকটি বায়ু প্রবাহ দ্বারা পরিবাহিত হয়। বীজের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিকভাবে পরিবাহিত হওয়ারও কোন নিদর্শন বা প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ রোগের আক্রমণের ফলে শতকরা ৮০ ভাগ পর্যন্ত ফলন কমে যেতে পারে বলে গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়।

রোগের লক্ষণ: রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পাতার উপর হালকা বাদামী বা শুকনা খড়ের রঙের পিনের মাথা বরাবর সাইজের ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। এই দাগগুলো আকারে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ৩ থেকে ৪ দিনের মধ্যেই সম্পূর্ণ পাতাটি

আক্রান্ত হয়ে ঝরে পড়ে। ধীরে ধীরে নতুন নতুন শাখার অগ্রভাগও আক্রান্ত হয় এবং শুকিয়ে মরে যায়। আক্রমণের প্রকোপ বেশি হলে সমগ্র ফসলের মাঠটি ঝলসানো রং ধারণ করে। তবে ফলগুলি তখনও সবুজ থেকে যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা: এ ক্ষতিকর রোগটি দমনের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডাল গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভিদ রোগতত্ত্ববিদগণ বিভিন্ন প্রকার গবেষণা ও অনেক পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন। এসব পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা যায় যে রুভরাল-৫০ ডব্লিউ পি অথবা ফলিকূর ২৫০ ইসি অথবা দুটি ঔষুধের মিশ্রণ ০.২% হারে পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর তিন থেকে চার বার হালকা রোদ্রোজ্জ্বল সকালে (৯-১০ টা) স্প্রে করলে এই রোগের অনিষ্ট থেকে ফসল রক্ষা করা যায়। এছাড়া বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মসুরের উন্নত জাত বারি মসুর-৮ এ, এ রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে। উক্ত জাতটি আবাদ করলে এ রোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করে ক্ষতির মাত্রা বহুলাংশে কমানো যায়।

গোড়া পচা রোগ

গোড়া পচা মসুরের একটি ক্ষতিকর রোগ। মসুর আবাদকারী অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও এ রোগের যথেষ্ট প্রকোপ রয়েছে। গোড়া পচা রোগটি মূলত একটি চারা আক্রমণকারী রোগ। ইহা সাধারণত এক মাস বা তার চেয়ে কম বয়সের চারাকে আক্রমণ করে। এই রোগটি স্ক্লেরোশিয়াম রল্‌ফছি (*Sclerotium rolfsii*) নামক ছত্রাকের আক্রমণের কারণেই হয়ে থাকে। এই ছত্রাক জীবাণু প্রধানত মাটিতেই অবস্থান করে।

রোগের লক্ষণ: অতি অল্প বয়সে আক্রান্ত হলে চারা হঠাৎ নেতিয়ে পড়ে মারা যায় এবং নেতিয়ে পড়া চারা শুকিয়ে খড়ের রং ধারণ করে এবং পরিশেষে তা অদৃশ্য হয়ে যায়। বয়স্ক চারা আক্রান্ত হলে আক্রান্ত অংশে সুতার মত ছত্রাকের মাইসিলিয়াম এবং সরিষার বীজের মত স্ক্লোরোশিয়াম লক্ষ্য করা যায়। গাছের মূল এবং শিকড় আক্রান্ত হলে প্রাথমিক অবস্থায় গাছের আকার বামুন বা খর্বাকৃতির হয় এবং পরিশেষে গাছ ঢলে পড়ে মারা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা: গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে সাধারণত যে সকল জমির মাটিতে বপনের প্রারম্ভে স্বাভাবিক অবস্থার (জো অবস্থা) চেয়ে বেশি রস থাকে সেই সকল জমিতে গোড়া পচা রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। সুতরাং বপনের সময় জমিতে যাতে অতিরিক্ত রস না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়া বিভিন্ন ছত্রাক নাশক দিয়ে বীজ শোধন করেও এ রোগ দমনের প্রচেষ্ট নেয়া যায়। এ সমস্ত ছত্রাক নাশকের মধ্যে প্রেভেক্স-২০০ ডব্লিউ @ ২.৫-৩.৫ গ্রাম প্রতি বীজের সাথে মিশিয়ে বীজ শোধন করলে এ রোগের প্রকোপ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়।এছাড়া রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে অটোস্টিন-৫০ ডব্লিউ পি নামক ঔষধ ০.২ গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ৭ হতে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে এরোগ অনেকাংশে দমন করা যায়।

মরিচা রোগ

মরিচা রোগ “ইউরোমাইসিস ফেবেই (*Uromyces fabae*) নামক এক প্রকার ছত্রাক জাতীয় জীবাণুর আক্রমণে হয়ে থাকে। মসুরের বেশি ক্ষতিকর রোগসমূহের অন্যতম। তবে রোগের কারণে ক্ষতির পরিমাণ ফসলের অবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি ফুল আসার সাথে সাথে আক্রমণ শুরু হয় তা হলে ক্ষতির পরিমাণ হয় অনেক বেশি। পক্ষান্তরে ফল পরিপক্কতার পরে আক্রান্ত হলে কম ক্ষতি হয়। কিন্তু আক্রমণের মাত্রা কম বেশি হওয়া নির্ভর করে আবহাওয়া এবং জমিতে গাছের ঝোপের পরিমাণের উপর। ঘন ঝোপ (Dense canopy) যুক্ত জমিতে যেখানে ঝোপের অভ্যন্তরে বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা শতকরা ৮৫-৯০ ভাগ থাকে এবং বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা ২০-২২° সেলসিয়াস সে স্থান এ রোগের

আক্রমণের জন্য খুবই উপযোগী। রোগের আক্রমণকারী ছত্রাক মসুর গাছেই তার জীবনচক্র পরিপূর্ণ করে। বীজের সাথে মিশ্রিত আক্রান্ত গাছের অংশ বিশেষের সহিত জীবাণু পরবর্তী বৎসর প্রাথমিক আক্রমণের উৎস হিসাবে বাহিত হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ: সাধারণত জমির যে অংশ গাছের ঘনত্ব বেশি এবং বৃদ্ধি বেশি সে অংশে সর্ব প্রথম রোগের আক্রমণ শুরু হয়। পাতা কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা এবং ফলের উপর হলুদ বা মরিচা রঙের ফোস্কা পড়া দাগ দেখা দেয়। পরে এই ফোস্কাগুলি গাঢ় বাদামী বা কাল রং ধারণ করে। আক্রমণের প্রকোপ বেশি হলে পাতা ঝরে যায় এবং পরিপক্ক হওয়ার আগেই গাছগুলো শুকিয়ে যায়। দূর থেকে তাকালে ফসল ধূসর বর্ণের দেখায়। সাধারণত দেশের দক্ষিণাংশে জানুয়ারি মাস শেষ হওয়ার পূর্বে এবং উত্তরাংশে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে এ রোগের আক্রমণ শুরু হয়।

ব্যবস্থাপনা: বারি মসুর-৪, বারি মসুর-৬, বারি মসুর-৭ এবং বারি মসুর-৮ জাতটি মরিচা রোগের প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। ইহা সাধারণত ১১০-১১৫ দিনের মধ্যে পাকে। এ জাতটি যদি দক্ষিণাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে এবং উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বপন করা যায় তাহলে এরোগের আক্রমণ থেকে ফসলকে বাঁচানো যায়। স্বাভাবিক উর্বর জমিতে জৈব সার কিংবা নাইট্রোজেন সার দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। আক্রান্ত গাছের অংশ বিশেষের সাথে এ রোগের জীবাণু বাহিত হয় বিধায় বীজ ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিলে আক্রমণের প্রাথমিক উৎস নির্মূল করা যায়। এছাড়া রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে পানিতে মিশিয়ে ৭ হতে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়।

ঢলে পড়া রোগ

ঢলে পড়া বা নেতিয়ে পড়া মসুরের একটি ক্ষতিকর রোগ। মসুর আবাদকারী অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেও এ রোগের যথেষ্ট প্রকোপ রয়েছে। বাংলাদেশে এ রোগটি সর্ব প্রথম শনাক্ত করা হয় ১৯৭৭সালে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর খামারে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন থানার কৃষকের মাঠে এরোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। আক্রান্ত গাছের নমুনা ল্যাবরেটরিতে বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে, ইহা একটি ছত্রাকজনিত রোগ এবং আক্রমণকারী ছত্রাক হল “ফিউসারিয়াম অক্সিস্পোরাম (*Fusarium oxysporum* f. sp. *lentis*) নামক একটি জীবাণু। এই ছত্রাক জীবাণু প্রধানত মাটিতেই অবস্থান করে তবে কখনও ইহা বীজের মাধ্যমে বিস্তার ঘটায় বলেও জানা যায়। এরোগের কারণে ফসলের শতকরা কতভাগ ক্ষতি হতে পারে ইহার পরিমাণ বাংলাদেশের অবস্থায় নির্ণয় করা হয় নাই।

রোগের লক্ষণ: চারা গজিয়ে উপরে উঠার আগে ও পরে উভয় অবস্থায়ই রোগের লক্ষণ শনাক্ত করা যায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে এরোগের জীবাণু ছত্রাক বীজের মাধ্যমে বাহিত হয়ে বিস্তার লাভ করতে পারে। আক্রান্ত বীজ অঙ্কুরিত হলে অঙ্কুর বাদামী রং ধারণ করে এবং চারা মাটির উপরে বের হওয়ার পূর্বেই মারা যায়। চারা অবস্থায় মাটিতে থাকা জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে চারার বৃদ্ধি থেমে যায় এবং গাছের নিচের দিক থেকে ক্রমশ উপরের দিকে পাতা হলুদ রং ধারণ করে বেকে যায়। চারার আগা নেতিয়ে পড়ে এবং চারা মারা যায়। বয়স্ক গাছ আক্রান্ত হলেও মোটামুটি একই ধরনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এছাড়াও আক্রান্ত গাছের শিকড় হলুদাভ বাদামী থেকে গাঢ় বাদামী রং ধারণ করে। তবে আক্রান্ত শিকড়ের উপর ফুটরট বা গোড়া পচা রোগের অনুরূপ কোন ছত্রাকের সাদা মাইসেলিয়াম দেখা যায় না। কম বয়সের চারার শিকড়ের অগ্রভাগ আক্রান্ত হলে শিকড়ের নিচের অংশ নষ্ট হয়ে যায়। মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণ রস থাকলে আক্রান্ত শিকড়ের উপরের অংশে গুচ্ছ আকারের নতুন শিকড় গজায়। ঢলে পড়া রোগ আক্রান্ত গাছের শিকড় বা মূল লম্বালম্বিভাবে চিরলে লম্বা কালো বা গাঢ় বাদামী রঙের ডোরা দাগ দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থা: এরোগের দমন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে গোড়া পচা রোগের অনুরূপ পদক্ষেপ নেওয়া যায়। রাসায়নিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ছত্রাকনাশক ব্যবহার করে এ রোগ দমনের চেষ্টা করা যেতে পারে। অটোস্টিন এবং থিরাম নামক ঔষধ একত্রে (১:১ অনুপাতে) শুকনা বীজের সাথে ০.২৫% হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করলে এ রোগ উল্লেখযোগ্য হারে কম হয়। আবাদ কৌশলে বা ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনেও এ রোগ দমনের চেষ্টা করা যায়। উপযুক্ত সময়ে বপন করে যেমন দেশের মধ্য দক্ষিণাঞ্চলে অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহে এবং উত্তারাঞ্চলে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বপন করলে এরোগের আক্রমণ উল্লেখযোগ্য হারে কম হতে দেখা যায়। এছাড়া বপনের সময় জমির মাটিতে যাতে "জো" অবস্থার চেয়ে বেশি রস না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। কারণ মাটিতে অতিরিক্ত রস থাকা অবস্থায় বপন করলে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে অটোস্টিন ২ গ্রাম/প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ হতে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়।

মসুরের জাবপোকা

জাবপোকা মসুরের পাতা, কাণ্ড, পুষ্পমঞ্জুরী ও ফলে আক্রমণ করে থাকে এবং সেখান থেকে রস চুষে খায়। মারাত্মক আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি কমে যায় এবং ফলন ব্যাহত হয়। মারাত্মক আক্রমণে ডায়মেথয়েট জাতীয় কীটনাশক (যেমন- টাফগর ৪০ ইসি বা অন্য নামের) প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

জাবপোকা আক্রান্ত মসুর গাছ

রোপা আমন ধানের সাথে মসুরের সাথী ফসল চাষ

এ দেশে সাধারণত রোপা আমন ধান কর্তনের পরই রবি শস্যের আবাদ হয়ে থাকে। তবে ধান কাটার পর অনেক ক্ষেত্রেই জমিতে রস থাকে না। আবার কখনও কখনও জমিতে 'জো' আসে না। এ অবস্থায় সময়মত মসুর বপন করা যায় না। কিন্তু আমন ধানের জমিতে মসুর সাথী ফসল (রিলে ক্রপ) হিসেবে চাষ করলে সময়মত মসুর বপন করে ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব।

জুলাই	আগস্ট	সেপ্টে.	অক্টো.	নভে.	ডিসে.	জানু.	ফেব্রু.	মার্চ	এপ্রি.	মে	জুন

আমন ধান

বারি মসুর-৯

বোরো ধান

ফসল ধারা: আমন ধান-মসুর-বোরো ধান

সাথী ফসল (রিলে ক্রপ): আমন ধানের ফসলের ফুল আসার পর কিন্তু কর্তনের পূর্বে অন্য যে ফসলটি বপন করা হয় তাকে সাথী ফসল বলে। এ পদ্ধতিতে ধান কাটার ১০-১৫ তিন পূর্বে ধানের জমি থেকে পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথেই কাদার মধ্যে মসুরের বীজ ছিটিয়ে বপন করতে হয়। এ পদ্ধতিতে আবাদ করলে চাষ করে আবাদের চেয়ে ৪৫% খরচ কম হয়। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে মুসরের উৎপাদন কৌশল নিম্নরুপ:

বপনের সময় : অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ (কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ-শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত) মসুর বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

জমি নির্বাচন ও বপন পদ্ধতি: এ পদ্ধতিতে মসুর আবাদের জন্য দোআঁশ/এঁটেল-দোআঁশ-মাটি বেশি উপযোগী। রোপা আমন/বোনা আমন ধানের যে সমস্ত জমি অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহের মধ্যে 'জো' আসে না অথবা ধান কাটা সম্ভব হয় না, এমন জমি নির্বাচন করে ধান কাটার ১০-১৫ দিন পূর্বে বর্ষার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে ধানের মধ্যে মসুরের বীজ ছিটিয়ে বপন করতে হয়। বীজ বপনের পূর্বে ৮-১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে বপন করলে ভালো হয়।

বীজের পরিমাণ: প্রতি হেক্টরে ৫০-৬০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

সার প্রয়োগ: বীজ বপনের ১/২ দিন পূর্বে হেক্টরপ্রতি ৯০ কেজি টিএসপি এবং ৩৫কেজি এমওপি সার একসাথে পরিমাণমতো ছিটাতে হবে। জমিতে বোরনের অভাব থাকলে হেক্টরপ্রতি ৭-১০ কেজি বারিক এসিড/বোরাক্স সার প্রয়োগ করতে হবে। কোন জমিতে প্রথমবার মসুর চাষ করলে মসুরের প্রতি কেজি বীজের সাথে ৫০ গ্রাম জীবাণু সার, পরিমাণমতো ভাতের মাড়/চিটাগুড় মিশিয়ে বপন করতে হবে। তবে ইউরিয়া সার ধান কাটার ৪-৫ দিন পর প্রতি হেক্টরে ৪৫ কেজি হিসেবে উপরি প্রয়োগ করতে হয়। এক্ষেত্রে জমিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে বিকাল বেলায় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা : মসুরের বীজ গজানোর ৫-৭ দিন পর ধানের খড় মাটি থেকে ২৫ সেমি উচ্চতায় রেখে ধান কাটতে হবে। এ পদ্ধতিতে মসুরের জমিতে সাধারণত আগাছা দমন ও সেচেরে তেমন প্রয়োজন পড়ে না। তবে জমিতে সামান্য কিছু আগাছা থাকলে বপনের ৩০- ৩৫ দিন পর হাত দ্বারা আগাছা পরিষ্কার করতে হয়।

ফলন: এ পদ্ধতিতে মসুরের ফলন হেক্টরপ্রতি ১৫০০-১৬০০ কেজি হয়ে থাকে।

ফসল সংগ্রহ, মাড়াই ও সংরক্ষণ: সাধারণত বীজ বপনের ১১৫-১২০ দিন পর মসুর সংগ্রহ করা হয়। মাঠে গাছ ফলসহ শুকিয়ে হলুদ হলে মাটির উপর থেকে গাছের গোড়াসহ কেটে এনে পরিষ্কার খোলায় ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে/গরু ঘুরিয়ে/মেশিনের সাহায্যে মাড়াই করে বীজ সংগ্রহ করা হয়। বীজ সংগ্রহের পর ভালোভাবে পরিষ্কার করে ২- ৩ দিন ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে বায়ু নিরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

শুষ্ক ভূমি অঞ্চলে প্রাইম পদ্ধতিতে মসুর চাষ

শুষ্ক ভূমি অঞ্চলে জমিতে প্রয়োজনীয় রসের অভাব একটি উল্লেখযোগ্য সমস্যা। আমাদের দেশে সাধারণত রোপা আমন ধান কাটার পরই রবি শস্যের আবাদ হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ধান কাটার পর জমিতে পরিমিত রস থাকে না। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উঁচু জমিতে বপন সময়ের পূর্বেই জমির রস শুকিয়ে যায়। তবে এ ধরনের জমিতে বীজ প্রাইমিং (বীজ ভিজানো) করে বপন করলে স্বাভাবিক পদ্ধতির চেয়ে ৩-৪ দিন আগে বীজ গজায় এবং গাছের পরবর্তী বৃদ্ধিও ভালো হয়, যা উচ্চ ফলনের সহায়ক। প্রাইম পদ্ধতিতে মসুরের চাষ নিম্নরূপ:

বপনের সময়: অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের ২য় সপ্তাহ (কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত) বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

জমি নির্বচন: সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি মসুর চাষের জন্য বেশি ভালো।

বীজের পরিমাণ: জমিতে পরিমিত পরিমাণ গাছের জন্য প্রতি হেক্টরে ৩০-৩৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ প্রাইমিং পদ্ধতি: রাত্রে প্রয়োজনীয় বীজ বালতি/গামলা অথবা অনুরূপ পাত্রে ৮-১০ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে। পরের দিন সকালে পাত্র থেকে বীজগুলি উঠিয়ে ছায়াতে রেখে শুধু মাত্র বীজের গায়ের পানি শুকিয়ে ঐ দিনই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বীজ বপন করতে হবে।

সার প্রয়োগ: জমি তৈরির শেষ চাষের সময় হেক্টর প্রতি ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ৯০ কেজি টিএসপি এবং ৩৫ কেজি এমওপি সার একসাথে ছিটাতে হবে। কোন জমিতে প্রথমবার মসুর চাষ করলে মসুরের প্রতি কেজি বীজের সাথে ৫০ গ্রাম জীবাণুসার, পরিমিত পরিমাণ ভাতের মাড়/চিটাগুড় মিশিয়ে বপন করতে হবে। তবে জমিতে বোরনের অভাব থাকলে অন্যান্য সারের সাতে ৭-১০ কেজি/হেক্টর বারিক এসিড বোরাক্স সার প্রয়োগ করতে হবে।

জমি চাষ ও বপন পদ্ধতি: মাটির প্রকারভেদে ৩-৪ টি চাষ ও উত্তমরূপে মই দিয়ে তৈরি করতে হয়। জমি তৈরির শেষ চাষের পর পরিমাণ মতো বীজ ছিটিয়ে বপন করতে হয়। তারপর একটি চাষ ও আড়াআড়িভাবে দুটি মই দিতে হয়। এতে করে জমির রস ধারণ ক্ষমতা বাড়ে এবং বীজ গজাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া ২৫ সেমি দূরে সারি করেও বীজ বপন করা যায়।

আন্তঃপরিচর্যা: সাধারণত মসুর বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসেবে চাষ করা হয়ে থাকে। তবে মাটিতে যদি রসের অভাব হয় এবং রসের অভাবে গাছের বৃদ্ধি কম হয় সেক্ষেত্রে চারা গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর একবার হালকা সেচ দিতে হয়। সেচ দেওয়ার পর জমি নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে। জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে। কারণ মসুর জলবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। আগাছার প্রকোপ বেশি হলে বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর এক বার নিড়ানী দিতে হবে।

মসুরের স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট (পাতা ঝলসানো) রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

বর্তমানে মসুর চাষে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হল স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট (পাতা ঝলসানো) রোগ যার ফলে শতকরা ৮০ ভাগ ফলন কমে যেতে পারে। এ রোগের অনুকুল আবহাওয়ায় যেমন রাতের তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রির নিচে ও দিনের তাপমাত্রা ২১ ডিগ্রির উপরে এবং গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি ও কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া থাকলে এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। রোগের প্রাথমিক অবস্থায় পাতার উপর হালকা বাদামী রঙের ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সমগ্র ফসলের মাঠটিই ঝলসে যায়। তাই রোগ সংক্রমণের সাথে সাথেই গাছে ফল ধরা শুরু করলেই প্রতিষেধক হিসেবে এই প্রযুক্তিটি ব্যবহার করে গবেষণা পর্যায়ে ভাল ফলাফল পাওয়া গিয়াছে।

ফলিকুর প্রয়োগ প্লট

দমন ব্যবস্থাপনা: নাটিভো এবং ফলিকুর নামক ছত্রাকনাশক মসুরের স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট রোগের দমনে কার্যকরী ভাবে কাজ করে। তবে এ রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে শুধুমাত্র ফলিকুর ২ এমএল/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগের অনিষ্ট থেকে ফসল রক্ষা করা যায় এবং অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

কন্ট্রোলপ্লট

সংরক্ষণ কৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে ধানী জমিতে মসুর চাষ

প্রযুক্তির বিস্তারিত বিবরণ: অনিশ্চিত জলবায়ুগত অবস্থা, শ্রমিক এবং জ্বালানী ঘাটতির এই বর্তমান সময়ে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদনে প্রচলিত কৃষক পদ্ধতিতে (নিবিড় চাষাবাদ এবং পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ উচ্ছেদকরণ) চাষাবাদের কারণে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোতে জৈব পদার্থের ক্রমাগত হ্রাস, মাটির ভৌতিক গুণাবলীর অবনতি ও ফসলের ফলন ঘাটতিসহ কৃষকের খামারের মুনাফা হ্রাস হচ্ছে। ফলে বর্তমান কৃষি ব্যবস্থাপনা অস্থিতিশীল হয়ে পড়েছে। এই অসুবিধা নিরসনের লক্ষ্যে সংরক্ষণ কৃষির পদ্ধতিতে ধানী জমিতে মসুর চাষ করা হচ্ছে এবং সফলতার সাথে বিস্তার লাভ করছে। এই পদ্ধতি (স্ট্রিপ টিলেজ এবং পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ) যা তিনটি আন্তঃসংযুক্ত মূলনীতি যেমন- স্বল্প চাষ, পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ ধরে রাখা এবং উপযোগী শস্য বিন্যাসের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বাড়ানো, ফসলের ফলন ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখা যায় । দেশের উত্তরাঞ্চলের যেসকল মাটির pH ৭-৮ এর মধ্যে, সেসকল ধানী জমিতে সংরক্ষণকৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে আমন ধানের পরে মসুর উৎপাদন করা যায়। আমন ধান কাটার সময় ধানের খড়ের ৫০ % অবশিষ্টাংশ জমিতে রেখে টু-হুইল ট্রাক্টর (2-wheel tractor) নামক একটি মেশিন ব্যবহার করে স্ট্রিপ টিলেজে একই সাথে জমি চাষ, বীজ বপন ও সার প্রয়োগ করা হয় (ছবি-১)। এ পদ্ধতিতে মসুর বপনের উপযুক্ত সময় নভেম্বর মাসের প্রথম দুই সপ্তাহ। এই

টু-হুইল ট্রাক্টর (2-wheel tractor) দ্বারা স্ট্রিপ টিলেজে ৫০ % ধানের খড়ের মধ্যে মসুরের বীজ বপন ও সার প্রয়োগ।

স্ট্রিপ টিলেজে ও ৫০ % ধানের খড়ের মধ্যে মসুর।

পদ্ধতিতে ধানের খড়ের মধ্যে মসুর সারিতে বপন করা হয়, ফলে প্রতিটি গাছ সমানভাবে আলো, বাতাস ও পুষ্টি পায় এবং খড়ের দ্বারা সংরক্ষিত মাটির রস পায় যা প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় গাছের বর্ধন ও ফলন বৃদ্ধিতে সাহায্য করে (ছবি-২)। এই পদ্ধতিতে মসুর চাষ করলে প্রতিটি স্ট্রিপ ৪-৫ সে. মি. প্রসস্থ এবং ৫-৭ সে. মি. গভীরতার হয়ে থাকে। মসুরের সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-৩০ সে. মি. রাখা হয়। উল্লেখ্য যে, পদ্ধতিটিতে শুধুমাত্র সারির মধ্যে চাষ হয় এবং দুই সারির মধ্যে অচাষ অবস্থায় থাকে, ফলে পুরো জমির মাত্র ২০ ভাগ জায়গা একবার চাষ হয় এবং বাকি ৮০ ভাগ জায়গা অচাষ অবস্থায় থাকে। সংরক্ষণকৃষি প্রযুক্তির মাধ্যমে ধানী জমিতে মসুর চাষ করে কৃষক প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ১৬-১৮ % ফলন বেশি পায়। অধিকন্তু, এই পদ্ধতিতে চাষবাদ প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় তিনগুন জ্বালানী খরচ ও সময় কমায়। এছাড়া প্রচলিত কৃষক পদ্ধতির তুলনায় সংরক্ষণকৃষি পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে মসুরের আগাছার পরিমাণ, জাবপোকা এবং পাতা ঝলসানো রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়। সুতরাং, কৃষক সংরক্ষণকৃষি (স্বল্প চাষ, পূর্ববর্তী ফসলের অবশিষ্টাংশ ধরে রাখা এবং লিগিউম ভিত্তিক শস্য বিন্যাস) পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে স্বল্প খরচে, সময়ে ও স্বল্প শ্রমিকে মসুরের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির সাথে সাথে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়।

ছোলা

স্বল্প পরিচর্যা ও বৃষ্টি নির্ভর ফসল হিসেবে অপেক্ষাকৃত কম উর্বর জমিতে ছোলা চাষ হয়ে থাকে। ডাল ফসলের এলাকা ও উৎপাদনের দিক থেকে ছোলা বাংলাদেশে পঞ্চমস্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশে প্রায় ৬.৫ হাজার হেক্টর জমিতে ছোলার চাষ হয়। এর মোট উৎপাদন প্রায় ৮ হাজার মেট্রিক টন।

ছোলার বার্ষিক গড় চাহিদার মাত্র ১০-১২% এদেশে উৎপাদিত হয় এবং বাকি চাহিদার সিংহভাগই সরকারী এবং বেসরকারীভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। তাই বিপুল পরিমাণ অর্থ অপচয় রোধ করতে উচ্চফলনশীল ও রোগসহনশীল ছোলার জাত চাষাবাদ করা এসময়ের অপরিহার্য দাবি। বাংলাদেশে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এ পর্যন্ত ছোলার ১১টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। ছোলার এ জাতসমূহ একক ফসলের পাশাপাশি আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করে লাভবান হওয়া যায়।

ছোলার ফসল

ছোলার দানা

ছোলার জাত

বারি ছোলা-২ (বড়াল)

এ জাতটি ১৯৮৫ সালে ICRISAT হতে আনা হয়। পরবর্তীতে বহুস্থানিক পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চ ফলনশীল হিসেবে ১৯৯৩ সালে এ জাতটি সারাদেশে চাষাবাদের জন্য বারি ছোলা-২ নামে অনুমোদন করা হয়। গাছের শাখার অগ্রভাগ তুলনামূলকভাবে হালকা ও উপশিরা লম্বা। গাছের রং গাঢ় সবুজ। বীজ স্থানীয় জাতের চেয়ে বড়। হাজার বীজের ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম।

আমিষের পরিমাণ ২৩-২৭%। বারি ছোলা-২ এর জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৩০০-১৬০০ কেজি। এ জাত নুয়ে পড়া বা উইল্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। বীজের পার্শ্বদিকে সামান্য চেপ্টা। বীজের রং হালকা বাদামী। বীজের আকার বড় হওয়ায় এ জাতের ছোলা কৃষক ও ক্রেতার কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ৩০-৩৫ মিনিট।

বারি ছোলা-২ এর ফসল

বারি ছোলা-২ এর দানা

বারি ছোলা-৩ (বরেন্দ্র)

বারি ছোলা-৩ বা বরেন্দ্র জাতের মূল কৌলিক সারিটি ১৯৮৫ সালে ICRISAT হতে আনা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় মাটি ও আবহাওয়াতে বহুস্থানিক পরীক্ষার মাধ্যমে এ জাতটি ১৯৯৩ সালে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে। এ জাতের গাছ খাড়া প্রকৃতির। রং হালকা সবুজ, পত্রফলক বেশ বড় এবং ডগা সতেজ। সর্বোপরি এ জাতটি গভীরমূলী। বীজের আকার বেশ বড়। হাজার বীজের ওজন ১৮৫-১৯৫ গ্রাম।

বারি ছোলা-৩ এর ফসল

বারি ছোলা-৩ এর দানা

ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ৪০-৪৪ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২৩-২৬%। সঠিক সময়ে বুনলে পাকতে সময় লাগে ১১৫-১২৩ দিন। এ জাতটি রাজশাহীর বরেন্দ্র অঞ্চলে আবাদের জন্য উপযোগী। ফলন হেক্টরপ্রতি ১৮০০-২০০০ কেজি পাওয়া যায়।

বারি ছোলা-৪ (জোড়াফুল)

বারি ছোলা-৪ এর ফসল

বারি ছোলা-৪ এর দানা

এ জাতটি ১৯৮৫ সালে ICRISAT হতে নার্সারির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে বহুস্থানিক পরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কৃষক পর্যায়ে আবাদের জন্য বারি ছোলা-৪ নামে অনুমোদন করা হয়। এক বৃন্তে ২টি করে ফুল ও ফল ধরে। গাছ মাঝারি খাড়া এবং পাতা গাঢ় সবুজ। কাণ্ডে খয়েরি রঙের ছাপ দেখা যায়। বীজের পার্শ্ব দিক সামান্য চেপ্টা, ত্বক মসৃণ। বীজের রং হালকা বাদামী। হাজার বীজের ওজন ১৩২-১৩৮ গ্রাম। গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সেমি। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ৩২-৩৮ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ১৮-২১%। জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ১৯০০-২০০০ কেজি। এ জাতটি ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগ সহনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন।

বারি ছোলা- ৫ (পাবনাই)

বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা হতে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও তা মূল্যায়ন করে বারি ছোলা-৫ বা পাবনাই জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তীতে বহুস্থানিক পরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জাতটি চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়।

বারি ছোলা-৫ এর ফসল

বারি ছোলা-৫ এর দানা

গাছ কিছুটা ছড়ানো প্রকৃতির। গাছের উচ্চতা ৪৫-৫০ সেমি এবং রং হালকা সবুজ। চারা অবস্থায় গাছের কাণ্ডে কোন রং থাকে না, কিন্তু পরিপক্ক অবস্থায় কাণ্ডে হালকা খয়েরি রং পরিলক্ষিত হয়। বীজ আকারে ছোট, রং ধূসর বাদামী এবং হিলাম খুব স্পষ্ট। বীজের পার্শ্বে কিছুটা চেপ্টা এবং ত্বক মসৃণ। হাজার বীজের ওজন ১১০-১২০ গ্রাম।

ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ৩৫-৪০ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২০-২২%। এ জাত ১২৫-১৩০ দিনে পাকে। ফলন হেক্টরপ্রতি ১৮০০-২০০০ কেজি।

বারি ছোলা-৬ (নাভারুন)

বারি ছোলা-৬ বা নাভারুন জাতটি ১৯৮৫ সালে ICRISAT হতে আন্তর্জাতিক নার্সারির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে প্রাথমিক, অগ্রবর্তী, অঞ্চলভিত্তিক ও বহুস্থানিক পরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে জাতটি কৃষক পর্যায়ে আবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন দেয়া হয়।

গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি। পত্রফলক মাঝারী আকারের এবং রং হালকা সবুজ। চারা অবস্থায় কাণ্ডে কোন রং দেখা যায় না, কিন্তু পরিপক্ক অবস্থায় কাণ্ডে হালকা খয়েরি রং পরিলক্ষিত হয়। বীজের আকার কিছুটা গোলাকৃতি, ত্বক মসৃণ এবং রং উজ্জ্বল বাদামী হলদে। বীজ আকারে দেশি জাতের চেয়ে বড়। হাজার বীজের ওজন ১৫৫-১৬৫ গ্রাম।

বারি ছোলা-৬ এর ফসল

বারি ছোলা-৬ এর দানা

এ জাতের ডাল রান্নার সময়কাল ৩২-৩৭ মিনিট। এতে আমিষের পরিমাণ ১৯-২১%। জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ১৮০০-২০০০ কেজি। জাতটি নাবীতে বপন করেও অন্যান্য জাতের চেয়ে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

বারি ছোলা-৭

১৯৯০ সালে আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট ICRISAT হতে আন্তর্জাতিক নার্সারির (ICSN) মাধ্যমে ছোলার বিভিন্ন প্রজাতি সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত প্রজাতিগুলি উইল্ট রোগাক্রান্ত জমিতে বাছাই করা হয়। ICCL-3272 নামক এই প্রজাতিটিকে উইল্ট রোগ সহনশীল ক্ষমতাসম্পন্ন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যান্য জাতের চেয়ে উচ্চফলনশীল প্রতীয়মান হওয়ায় জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে চাষের জন্য এটিকে বরিছোলা-৭ নামে অনুমোদন দেয়া হয়।

বারি ছোলা-৭ এর ফসল

বারি ছোলা-৭ এর দানা

গাছের উচ্চতা প্রায় ৫৫-৬০ সেমি হয়ে থাকে এবং মাঝারী বিস্তৃত। পত্রফলকগুলি মাঝারী আকারের এবং রং হালকা সবুজ। চারা অবস্থায় কাণ্ডে হালকা পিগমেন্ট পরিলক্ষিত হয়। বীজের আকার কিছুটা গোলাকৃতি, ত্বক মসৃণ, রং উজ্জ্বল বাদমী হলুদ। ফুল আসতে সময় লাগে প্রায় ৫৫-৬০ দিন এবং পাকতে সময় লাগে ১২৫-১৩০ দিন। তবে নাবী বপনের ক্ষেত্রে আনুপাতিকহারে এর জীবনকাল কমে আসে। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ২২০০-২৫০০ কেজি পাওয়া যায়।

বারি ছোলা-৮

১৯৯০ সালে ICRISAT হতে কাবুলী জাতের বেশ কয়েকটি লাইন সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত লাইনগুলোর মধ্যে ICCL-88003 লাইনটি রোগ প্রতিরোধী ও উচ্চ ফলনশীল পাওয়া যায়। ফলন বারি ছোলা-৭ জাতের চেয়ে কম হলেও ভিন্ন ধরনের ছোলা হওয়ায় ও রোগ বালাই সহনশীল বিবেচিত হওয়ায় ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশে চাষের জন্য এটিকে বারি ছোলা-৮ নামে অনুমোদন করা হয়। এ জাতটি কাবুলী জাত হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে।

বারি ছোলা-৮ এর ফসল

বারি ছোলা-৮ এর দানা

এই জাতের গাছের উচ্চতা প্রায় ৬০-৬৫ সেমি হয়ে থাকে এবং বিস্তৃত। পত্রফলকগুলো বড় আকারের এবং রং সবুজ। চারা অবস্থা হতে পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত কাণ্ড হালকা সবুজ থাকে। বীজের আকার কিছুটা গোলাকৃতির, মসৃণ এবং রং সাদা। বীজ আকারে দেশি জাতের চেয়ে অনেক বড়। ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ২২০-২৪০ গ্রাম। এই জাতে ফুলের রং সাদা এবং জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন।

বারি ছোলা-৯

ভারতের হায়দ্রাবাদে অবস্থিত আন্তর্জাতিক ইনস্টিটিউট ICRISAT থেকে সংগ্রহকৃত সংকরায়িত ICCV-95138 লাইনটি প্রাথমিক, অগ্রগামী ও বহুস্থানিক পরীক্ষার মাধ্যমে রোগসহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল বিবেচিত হওয়ায় বারি ছোলা-৯ হিসেবে ২০১১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়। লাইনটি বাংলাদেশের সকল জেলায় চাষাবাদের উপযোগী হলেও বরেন্দ্র এলাকা, পাবনা, ফরিদপুর, মাদারীপুর এবং রাজবাড়ী এলাকায় ভাল ফলন দেয়। জাতটি এঁটেল দোঁআশ থেকে এঁটেল মাটিতে চাষ করা যায়।

বারি ছোলা-৯

এ জাতের গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি। প্রতি গাছে পড সংখ্যা ৫৫-৬০টি। ১০০০ বীজের ওজন ১৮০-২২০ গ্রাম। জীবনকাল ১২৫-১৩০ দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ২৩০০-২৭০০ কেজি।

বারি ছোলা-১০

২০১১ সালে ডাল গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনায় ICRISAT, হায়দ্রাবাদ, ভারত থেকে খরা ও তাপ সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল হিসেবে ছোলার কিছু জার্মপ্লাজম নিয়ে আসা হয়। উক্ত জার্মপ্লাজমগুলো পরপর দুই বছর ডাল গবেষণা কেন্দ্র, পাবনাতে মূল্যায়ন করা হয়। এটি উচ্চ ফলনশীল হওয়ায় পরবর্তীতে বরেন্দ্র, রাজশাহী ও যশোর অঞ্চলে মূল্যায়নের জন্য পাঠানো হয়। এটি খরা, রোগ সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল হওয়ায় ২০১৩ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ফলন ও অভিযোজন ক্ষমতা, রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় সংবেদনশীলতা এবং গুণগত মান মূল্যায়ন করা হয়। দীর্ঘদিন পরীক্ষার পর লাইনটি একটি সম্ভাবনাময় লাইন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় জাত হিসেবে মুক্তায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয় এবং ২০১৭ সালে এটি অবমুক্ত করা হয়। ছোলার নতুন ও সম্ভাবনাময় আগাম (১০-১৫ দিন) জাত হিসেবে এটি দেশে ছোলা ডালের ফলন বৃদ্ধির মাধ্যমে ছোলার সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে।

বারি ছোলা-১০

জাতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- গাছ খাড়া প্রকৃতির তাই রোগ-বালাই আক্রমণ কম
- কাণ্ড খয়েরী পিগমেন্টযুক্ত
- বীজ চক্‌চকে বাদামী বর্ণের
- খরা ও তাপ সহনশীল তাই বরেন্দ্র অঞ্চলে চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে
- ছোলার সবচেয়ে ক্ষতিকারক রোগ- বট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগ সহনশীল
- দেরিতে বপনযোগ্য (ডিসেম্বরের মাঝামাঝী পর্যন্ত)
- গাছে ফলের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি (৬৭-৭২টি)
- তুলনামূলকভাবে মধ্যম আকৃতির বীজ (১০০ বীজের ওজন ২১-২৩ গ্রাম)
- জীবনকাল: ১১২-১২১ দিন
- ফলন: হেক্টর প্রতি ১৮০০-২০৩০ কেজি

বারি ছোলা-১১

বারিছোলা-১১ (১০০ দিন বয়স)

বারিছোলা-১১ জাতের বীজ

২০১৪ সালে আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ICRISAT, হায়দ্রাবাদ, ভারত থেকে সুপার আগাম (Super early) শিরোনামে ছোলার ৮টি জার্মপ্লাজম ডাল গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনাতে আনা হয়। আনিত ৮টি লাইন ডাল গবেষণা কেন্দ্র, ঈশ্বরদী, পাবনার গবেষণা মাঠে ২০১৪-১৫ ও ২০১৫-১৬ সালে মূল্যায়ন করা হয় এবং সেখান থেকে ICCX 060157-3 লাইনটি স্বল্পকালীন ও সম্ভাবনাময় লাইন হিসেবে প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সালে সালে বাংলাদেশের ছোলা উৎপাদনকারী প্রধান প্রধান অঞ্চল যেমন- যশোর, রাজশাহী, মাদারীপুর, বরিশাল, জামালপুর, জয়দেবপুর ও পাবনা অঞ্চলে প্রাথমিক ফলন পরীক্ষা ও বহুস্থানীক ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে উক্ত অগ্রবর্তী লাইনটির (ICCX 060157-3) ফলন, অভিযোজন ক্ষমতা, রোগ বালাই, পোকা-মাকড় সংবেদনশীলতা এবং গুণগত মান মূল্যায়ন করা হয়। দীর্ঘদিন পরীক্ষার পর লাইনটি একটি সম্ভাবনাময় স্বল্পকালীন লাইন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় জাত হিসেবে মুক্তায়নের জন্য ২০১৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় এবং ২০১৮ সালের আগস্ট মাসে উক্ত লাইনটি বারি ছোলা-১১ নামে জাত হিসাবে অবমুক্ত হয় । বারি ছোলা-১১ জাতটি আগাম হওয়ায় দেশের একটি বিশাল অঞ্চল ছোলা চাষাবাদের আওতায় আসবে এবং রবি মৌসুমের শেষের দিকে অনাকাঙ্খিত ঝড় বৃষ্টির কারণে ছোলার ফলনের যে ব্যাপক ক্ষতি হয় তা থেকে পরিত্রান পাওয়া সম্ভব হবে। ফলে জাতীয় পর্যায়ে ছোলার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

এ জাতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাতা ও কাণ্ড হালকা সবুজ রঙের, ফুল গোলাপী রঙের। বীজ উজ্জ্বল বাদামী বর্ণের এবং ১০০ বীজের ওজন ১৯.৫-২০.৫৬ গ্রাম। জীবনকাল ১০০-১০৬ দিন। স্বল্পমেয়াদী হওয়ায় ছোলার ক্ষতিকারক রোগ বট্রাইটিস গ্রে মোল্ড সহনশীল। গড় ফলন- ১২৫০ - ১৫০০ কেজি/হেক্টর। জাতটি আগাম হওয়ায় রবি মৌসুমের শেষের দিকে বিরূপ আবহাওয়া শুরু হওয়ার পূর্বেই ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: এঁটেল ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতে ছোলা ভালো জন্মে।

শস্য পরিক্রমা: বাংলাদেশে প্রধানত আউশ/পাট-পতিত-ছোলা, রোপা আউশ-রোপা আমন- ছোলা, আমন-ছোলা-পতিত ফসল ধারায় ছোলার চাষ হয়ে থাকে। এছাড়া একক ফসলের পাশাপাশি মিশ্র বা সাথী ফসল অথবা আন্তঃফসল হিসেবে তিসি, ধনিয়া, বার্লি, গম, ইক্ষু বা ভুট্টার সাথে ছোলা চাষ করে লাভবান হওয়া যায়।

জমি তৈরি: ২-৩ টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি গভীরে ভালোভাবে চাষ করতে হবে। জমিতে বেশি বড় ঢেলা না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে ছোলা চাষের জন্য মাটি একেবারে ঝুরঝুর করা যাবে না।

বপন পদ্ধতি: ছিটিয়ে ও সারি করে বীজ বপন করা যায়। সারি করে বপন করলে গাছ পর্যবেক্ষণ, বাছাই এবং মাঠের অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সহজ হয়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০-৫০ সেমি বা ১৬-২০ ইঞ্চি রাখতে হবে এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ১০-১২ সেমি।

বীজের হার: বীজের হার ৩৫-৪০ কেজি/হেক্টর, ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ কিছু বেশি অর্থাৎ ৪০-৪৫ কেজি/হেক্টর দিতে হয়।

বীজ শোধন: ডাল জাতীয় ফসল বীজ বপনের পূর্বে শোধন করলে মাটি ও বীজ বাহিত অনেক জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই বীজ বপনের পুর্বে অবশ্যই প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউ পি (কার্বোজিন+থিরাম) ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে প্রতি কেজি বীজে মিশিয়ে শোধন করলে শুরুতে গোড়া পচা রোগের প্রকোপ কমে যায়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি:
নিম্নরূপ হারে সার ব্যবহার করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর (কেজি)	সারের পরিমাণ/বিঘা (কেজি)
টিএসপি	৮০-৯০	১১-১২
এমপি	৩০-৪০	৪-৫
জিপসাম	৫০-৫৫	৭-৮
বোরন (প্রয়োজনবোধে)	৭-১০	১-১.৫
অণুজীব সার (প্রয়োজনবোধে)	সুপারিশমতো	সুপারিশমতো

বি: দ্র: জমি খুব উর্বর হলে ছোলা চাষে সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।

বপন সময়: নভেম্বর ৩য় সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বর ১ম সপ্তাহ উত্তম সময়। তবে বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য কার্তিক মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে তৃতীয় সপ্তাহে (অক্টোবর শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ) বীজ বপন করতে হবে।

রগিং: জাতের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের জন্য মূল গাছের সাথে সামঞ্জস্য নয় এরুপ অবাঞ্চিত গাছ বৃদ্ধির কয়েক পর্যায়ে (যেমন- সজিব বৃদ্ধি পর্যায়ে, ফুল আসার সময় ও পরিপক্কতার সময়) সমূলে উপড়িয়ে ফেলতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: বপনের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। অতি বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। জমিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে বপনের পর হাল্কা সেচ দিতে হবে। বরেন্দ্র অঞ্চলে গাছ গজানোর ২৫-৩০ দিনে মধ্যে ১ বার হালকা সেচ দিলে ভালো ফলন পাওয়া যায়। তবে এসময় বৃষ্টি হলে সার, সেচ দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সেচ বা বৃষ্টির পানি জমি হতে বাহির হওয়ার জন্য পর্যাপ্ত নালা থাকা আবশ্যক।

রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনা

ছোলার উইল্ট রোগ দমন: ফিউজেরিয়াম অক্সিসপোরাম নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। সাধারণত মাটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ও যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা থাকলে এ রোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। চারা অবস্থায় এ রোগে আক্রান্ত গাছ মারা যায় এবং পাতার রঙের কোন পরিবর্তন হয় না। আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়, ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। লম্বালম্বিভাবে কাটলে কাণ্ডের মাঝখানের অংশ কালো দেখা যায়। ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত জমিতে পরবর্তী বৎসর ছোলা না বুনে দুই বা তিন বৎসরের জন্য শস্য পর্যায় অনুসরণ করা প্রয়োজন।

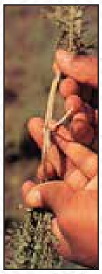

প্রতিকার

- বীজ শোধক ঔষধ দিয়ে বপনের পূর্বে বীজ শোধন করলে ছোলার উইল্ট রোগ দমন করা যায়, প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউ পি প্রতি কেজি বীজের জন্য ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।
- মাঠে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম (অটোস্টিন ডি এফ অথবা নোইন) + প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউ পি ১ গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকালে গাছের গোড়ায় ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধী জাত, যেমন- বারি ছোলা-৫ এবং বারি ছোলা-৯ এর চাষ করতে হবে।
- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে।

গোড়া পচা রোগ দমন: স্ক্লেরোশিয়াম রলফসি নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। চারা গাছে এ রোগ বেশি দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ হলদে হয়ে যায় এবং শিকড় ও কাণ্ডের সংযোগ স্থলে কালো দাগ পড়ে। গাছ টান দিলে সহজেই উঠে আসে। আক্রান্ত স্থানে গাছের গোড়ায় ছত্রাকের জালিকা ও সরিষার দানার মত স্ক্লেরোশিয়া গুটি দেখা যায়।

প্রতিকার

- প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউ পি প্রতি কেজি বীজের জন্য ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে
- মাঠে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম অটোস্টিন + প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউ পি ১ গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকালে গাছের গোড়ায় ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোগ সহনশীল জাত, যেমন- বারি ছোলা-৫, বারি ছোলা-৯ এবং বারি ছোলা-১০ এর চাষ করতে হবে।
- সুষম হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ছোলার বট্রাইটিস গ্রে মোল্ড রোগ

বট্রাইটিস প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ ঘটে থাকে। ছোলার বৃদ্ধি অবস্থায় কিংবা ফল আসার শুরুতেই এ রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। ফুল আসার পর থেকে ফল পাকার পূর্ব পর্যন্ত যেকোন সময়ে ভারি বৃষ্টি হলে, বাতাসে আর্দ্রতা শতকরা ৯৫ ভাগ বা বেশি থাকলে এবং জমিতে গাছ বেশি ঘন হলে এ রোগের ব্যাপকতা লাভ করে। এ রোগের লক্ষণ কাণ্ড, পাতা, ফুল ও ফলে প্রকাশ পায়। আক্রমণের ৫-৭ দিনের মধ্যেই গাছের ভিতরের পাতাগুলো হলুদ রং ধারণ করে। অনুকূল আবহাওয়া চলতে থাকলে আক্রান্ত হলুদ পাতাগুলো ক্রমশ: শুকিয়ে যেতে থাকে। শুকনো পাতা বিশিষ্ট এ রোগ আক্রান্ত গাছ রোদ্রোজ্জ্বল দুপুরে ঝাকুনি দিলে আক্রান্ত পাতার স্পোর ধুলার মত উড়তে থাকে। আক্রান্ত স্থানে ধূসর রঙের ছত্রাকের উপস্থিতি দেখা যায়। ফলের মধ্যে আক্রান্ত হলে সাদা বর্ণের মাইসেলিয়াম দেখা যায় এবং আক্রান্ত ফলগুলো পরিপুষ্ট না হওয়ার কারণে বীজগুলো কুচ্‌কানো আকৃতির হয়।

প্রতিকার

- গাছ ঘন হয়ে থাকলে পাতলা করে দিতে হবে।
- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- অ্যাক্রোবেট এম জেড ২ এমএল প্রতি লিটার পানিতে অথবা অটোস্টিন ২.০ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধী জাত বারি ছোলা-১০ অথবা বারি ছোলা-১১ এর চাষ করতে হবে।
- অটোস্টিন অথবা থিরাম প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।

ছোলার ফলছেদক পোকা ব্যবস্থাপনা: ফলছেদক পোকার আক্রমণে অনুকূল আবহাওয়ায় ছোলার ফলন শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি কমে যেতে পারে। ছোলার গাছে ফুল আসা শুরু করলে স্ত্রী মথ পাতায় ২-৬টি করে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড় বের হয়ে পাতা, ডগা ও ফুল খেয়ে থাকে। গাছে ফল ধরা শুরু করলে ফলের ভিতর ছিদ্র করে ঢুকে বর্ধনশীল বীজ খেয়ে ফেলে। এদের মারাত্মক আক্রমণে ফলন দারুনভাবে ব্যহত হতে পারে।

ফলছেদক পোকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য- (ক) উপযুক্ত সময়ে (নভেম্বরের মাঝামাঝি) এবং সঠিক হারে বীজ বপন করতে হবে। (খ) ক্ষেতে পতঙ্গভূক পাখি বসার ব্যবস্থা করার জন্য বাঁশের কঞ্চি/গাছের ডালপালা পুঁতে দেয়া যেতে পারে। (গ) ছোলার মধ্যে আন্তঃফসল যেমন- ধনিয়া, গম, সরিষা, তিসি ইত্যাদি ফসলের চাষ করে পোকার আক্রমণ কমানো যেতে পারে। (ঘ) আক্রমণ মারাত্মক হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে থায়ামিথক্সাম+ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল এর মিশ্রণ কীটনাশক (যেমন- ভিরতাকো ৪০ ডব্লিউ জি বা অন্য নামের) প্রতি লিটার পানিতে ০.১৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: গাছের ফল যখন শুষ্ক খড়ের মত রং দেখা যাবে তখন অর্থাৎ চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য-চৈত্র (মধ্য-মার্চের শেষ) এর মধ্যে ফসল সংগ্রহ করতে হবে।

মাসকলাই

বাংলাদেশে মাসকলাই একটি গুরুত্বপূর্ণ আমিষ সমৃদ্ধ সুপাচ্য খাদ্য উপাদান। বাংলাদেশে প্রচলিত ডাল ফসলের মধ্যে মাসকলাইয়ের স্থান চতুর্থ। দেশে মোট উৎপাদিত ডালের ১০-১১% আসে মাসকলাই থেকে। দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, বিশেষ করে চাঁপাইনবাবগঞ্জে মাসকলাইয়ের চাষ বেশি হয়ে থাকে। দেশের উত্তরাঞ্চলে এটি একটি জনপ্রিয় ডাল। দেশে মাসকলাইয়ের মোট আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৬৮ হাজার হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ৬৩ হাজার মেট্রিক টন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকলাইয়ের ৪টি উন্নত জাত হল বারি মাস-১, বারি মাস-২ (শরৎ), বারি মাস-৩ (হেমন্ত) এবং বারি মাস-৪। বারি উদ্ভাবিত এ জাতসমূহ কৃষক পর্যায়ে আবাদ করে দেশে ডালের ঘাটতি অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব।

মাসকলাইয়ের জাত

বারি মাস-১

১৯৮১ সালে ভারত থেকে পান্ত ৩০ নামে মাসকলাইয়ের একটি অগ্রবর্তী লাইন আনা হয়। পরবর্তীতে বহুস্থানীক পরীক্ষার মাধ্যমে এ জাত উচ্চ ফলনশীল হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ১৯৯০ সালে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য বারি মাস-১ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।

বারি মাস-১

গাছের উচ্চতা ৩২-৩৬ সেমি। এ জাতের বীজের রং কালচে বাদামী। বীজের আকার বড়। হাজার বীজের ওজন ৩৮-৪৩ গ্রাম। জাতটি দিবস নিরপেক্ষ হওয়ার ফলে খরিফ-১ ও খরিফ-২ মৌসুমে চাষ করা যায়। ডাল রান্না হওয়ার সময় কাল ৩০-৩৫ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২১-২৩%। জীবনকাল ৬৫-৭০দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ১৪০০-১৫০০ কেজি। এ জাত হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল।

বারি মাস-২ (শরৎ)

মাসকলাইয়ের এ জাতটি ১৯৮৭ সালে বিএমএ-২১৪১ এবং বিএমএ-২১৪০ অগ্রবর্তী লাইনের মধ্যে সংকরায়ণ করা হয়। পরবর্তীতে প্রাথমিক, অগ্রগামী ও অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে এ জাতটি দেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়।

বারি মাস-২

গাছের আকার মধ্যম। গাছের উচ্চতা ৩৩-৩৫ সেমি। স্থানীয় জাতের মতো লতানো হয় না। পত্র ফলক মাঝারী সরু। পাকা ফলের রং কালচে, ফল খাড়া, ফলের গায়ে শুং আছে। বীজের রং কালচে। বীজের আকার স্থানীয় জাতের চেয়ে বেশ বড়। হাজার বীজের ওজন ৩২-৩৬ গ্রাম।

রান্না হওয়ার সময়কাল ৩০-৩৫ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২১-২৪%। জীবনকাল ৬৫-৭০ দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ১৪০০-১৬০০কেজি। জাতটি দিবস নিরপেক্ষ এবং হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল।

বারি মাস-৩ (হেমন্ত)

মাসকলাইয়ের এ জাতটি ভারত হতে সংগৃহীত লাইন বিএমএ-২১৪০ এবং বিএমএ-২০৩৮ এর মধ্যে সংকরায়ণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তীতে অঞ্চলভিত্তিক পরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়।

বারি মাস-৩

গাছের আকার মধ্যম। গাছের উচ্চতা ৩৫-৩৮ সেমি। স্থানীয় জাতের মতো লতানো হয় না। ফল পাকলে কালো হয়। শুঁটিতে ঘন শুং আছে। বীজের রং কালচে। বীজের আকার স্থানীয় জাতের চেয়ে বড়। হাজার বীজের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম।

রান্না হওয়ার সময়কাল ৩০-৩৭ মিনিট । আমিষের পরিমাণ ২১-২৪%। জীবনকাল ৬৫-৭০ দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ১৫০০-১৬০০ কেজি। এ জাত হলদে মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল।

বারি মাস-৪

প্রস্তাবিত লাইনটি ডাল গবেষণা কেন্দ্রে ২০০৭ সালে বারি মাস-২ ও BBL 05016-এর সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তীতে F_3 ও F_4 জেনারেশনে উক্ত কৌলিক সারিটি অগ্রায়িত করা হয়। পরবর্তীতে ২০১২ সালে Pure line হিসেবে লাইনটিকে নির্বাচন করা হয়। এর পর ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জয়দেবপুর, যশোর, জামালপুর, মাদারীপুর, বরিশাল, বরেন্দ্র ও পাবনা অঞ্চলে ফলন ও অভিযোজন ক্ষমতা, রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় সংবেদনশীলতা এবং গুণগত মান মূল্যায়ন করা হয়। তন্মধ্যে এটি উচ্চফলনশীল এবং পোকা ও রোগ প্রতিরোধী লাইন হিসেবে নির্বাচন করা হয়। দীর্ঘদিন পরীক্ষার পর লাইনটি একটি সম্ভাবনাময় লাইন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় জাত হিসেবে মুক্তায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয় এবং ২০১৭ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বারি মাস-৪ হিসেবে অবমুক্ত করা হয়।

বারি মাসকলাই-৪ এর ফলসহ গাছ

জাতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য

- গাছ খাটো আকৃতির (৪২-৪৬ সেমি)
- পাতা সবুজ রঙের ও কাণ্ড খয়েরী পিগমেন্টেশনযুক্ত
- বীজ কালচে বাদামী বর্ণের
- পাউডারী মিলডিউ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল
- গাছে ফলের সংখ্যা বেশি (২৮-৩১টি)
- তুলনামূলক বড় আকৃতির বীজ (১০০০ বীজের ওজন ৫০.৪-৫৪.০ গ্রাম)
- জীবনকাল: ৬৯-৭৩ দিন
- ফলন: ১২৫০-১৪৪০ কেজি/হেক্টর

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: উঁচু থেকে মাঝারী উচুঁ ও সুনিষ্কাশিত দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি মাসকলাই উৎপাদনের জন্য বেশি উপযোগী।

জমি তৈরি: ২-৩টি আড়াআড়ি চাষ ও প্রয়োজনীয় মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে তৈরি করতে হবে।

বপন পদ্ধতি: ছিটিয়ে এবং সারি করে বপন করা যায়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি রাখতে হবে। খরিফ-২ মৌসুমে ছিটিয়ে বোনা যায়। বিশেষ করে খরিফ-২ মৌসুমে আউশ ধানের জমিতে সাথী ফসল হিসাবে চাষ করা যায়।

বীজের হার: প্রতি হেক্টরে ৩০-৩৫ কেজি। ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ কিছু বেশি দিতে হবে।

বপনের সময়: এলাকা ভেদে বপন সময়ের তারতম্য দেখা যায়। খরিফ-১ মৌসুমে মধ্য-ফাল্গুন থেকে ৩০শে ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি শেষ হতে মধ্য-মার্চ) এবং খরিফ-২ মৌসুমে শ্রাবণ মাসের ৩য় সপ্তাহ থেকে ১৫ই ভাদ্র (আগস্টের ১ম সপ্তাহ থেকে সেপ্টেম্বর ১ম সপ্তাহ)। তবে সেপ্টেম্বর ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা যায়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: অনুর্বর জমিতে হেক্টরপ্রতি নিম্নরুপ সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর (কেজি)	সারের পরিমাণ/বিঘা (কেজি)
ইউরিয়া	৪০-৪৫	৫-৬
টিএসপি	৮০-৯০	১০-১৩
এমপি	৩০-৪০	৪-৫
জিপসাম	৫০-৫৫	৭-৮
বোরন (প্রয়োজনবোধে)	৭-১০	১-১.৫
অণুজীব সার (প্রয়োজনবোধে)	সুপারিশমতো	সুপারিশমতো

সমস্ত সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হয়।

অন্তবর্তীকালিন পরিচর্যা: বপনের ২৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। বৃষ্টিপাতের ফলে যাতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হতে না পারে সে জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

মাসকলাই

মাসকলাই চাষাবাদের ক্ষেত্রে কৃষকগণ যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হন তার মধ্যে রোগ-বালাই এবং পোকা-মাকড় এর আক্রমণ অন্যতম। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মাসকলাইয়ের মোট ২০টি রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। যার মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ফসলে ১৭টি এবং গুদামজাত শস্যে ৩টি রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ৪টি এবং গুদামজাত অবস্থায় ২টি রোগ বেশি ক্ষতিকর। নিম্নে প্রধান প্রধান রোগসমূহের ব্যবস্থাপনা আলোচনা করা হল।

হলুদ মোজাইক

হলুদ মোজাইক মাসকলাইয়ের সবচেয়ে মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রায় সব কটি দেশেই মাসকলাইয়ের জমিতে এ রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। তবে মুগের তুলনায় এর প্রকোপ কিছুটা কম হয়। চারা অবস্থা থেকে শুরু করে পূর্ণ বয়স্ক গাছ পর্যন্ত ফসলের যেকোন অবস্থায়ই এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। তবে আক্রমণ যত কম বয়সে হয় ক্ষতির পরিমাণ তত বেশি হয়। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় এরোগের আক্রমণ আট সপ্তাহ বয়সের মাসকলাই ক্ষেতে তেমন কোন ক্ষতি হয় না। পক্ষান্তরে সাত, ছয়, পাঁচ এবং চার সপ্তাহ বয়সের ফসলে যথাক্রমে

শতকরা ২০, ৩৮, ৬০ ও ৮৫ ভাগ ফলন কমে যেতে পারে। এমনকি এক থেকে দুই সপ্তাহ বয়সের মাসকলাই ফসল আক্রান্ত হলে প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ ফলন বিনষ্ট হতে পারে (Yang, 1987)। এই রোগের আক্রমণকারী ভাইরাস সাদা মাছি (White Fly) দ্বারা বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ: আক্রান্ত পাতার উপর চমকা ও গাঢ় সবুজ এবং হলুদ রং এর মিশ্রণ যুক্ত নানা বর্ণের বিন্যাস এ রোগের প্রধান লক্ষণ। জাত ভেদে এ রোগের লক্ষণের কিছুটা তারতম্য হলেও এরূপ হলুদ হয়ে যাওয়া সর্বাবস্থায় দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ খর্বাকৃতির হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পাতা, ফুল ও ফল কুঁকড়ে যায় এবং ফলের আকার ছোট হয়। বীজ অপুষ্ট ও কুঁকড়ানো হয়। প্রতিটি ফলে বীজের সংখ্যা হ্রাস পায়। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত গাছে ফুল ফল মোটেই ধরে না বা খুবই কম ধরে থাকে।

ব্যবস্থাপনা: এরোগটির ব্যবস্থাপনা খুবই কষ্টসাধ্য। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে এই রোগের সম্পূর্ণ প্রতিরোধী কোন জাতের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মাসকলাইয়ের কিছু কিছু অগ্রবর্তি লাইন, রোগ প্রতিরোধী বা সহনশীলতা প্রদর্শন করলেও পরবর্তীতে তা প্রতিরোধী থাকে না। তবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকলাইয়ের উন্নত জাতসমূহের (বারি মাস-১, বারি মাস-২,বারি মাস-৩ এবং বারি মাস-৪) এ রোগ সহ্য ক্ষমতা রয়েছে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বপনকৃত ফসলে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বপনকৃত ফসলের তুলনায় এ রোগের আক্রমণ উল্লেখযোগ্য হারে কম হতে দেখা যায়। ফসলের প্রাথমিক পর্যায়ে হলুদ মোজাইক আক্রান্ত গাছ মাঠে দেখার সাথে সাথে গাছ উপড়ে ফেলে দিতে হবে। তাছাড়া রোগ বিস্তারকারী সাদা মাছি কীটনাশকের মাধ্যমে দমন করেও রোগ বিস্তার রোধ করা যায়।

পাতার সারকোস্পোরা দাগ

সারকোস্পোরা দাগ মাসকলাই পাতার একটি অতি ক্ষতিকর রোগ। আবহাওয়ার তারতম্যের উপর ভিত্তি করে এ রোগের প্রকোপ কম বেশি হয়ে থাকে। রোগের অনুকূল আবহাওয়ায় পাতার দাগের কারণে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে থাকে। এরোগ "সারকোস্পোরা ক্রোয়েন্টা" বা "সারকোস্পোরা কেনেসেন্স" নামক ছত্রাকের আক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। জীবাণু ছত্রাক আক্রান্ত ফসলের পরিত্যক্ত আবর্জনার মাধ্যমে বেঁচে থাকতে পারে। গাছের আক্রান্ত অংশ বীজের সাথে মিশে পরবর্তী মৌসুমে আক্রমণের প্রাথমিক উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে।

রোগের লক্ষণ: রোগের লক্ষণ প্রথমে পাতার উপর ছোট ছোট পানিতে ভেজা আলপিনের মাথার সমান দাগের আকারে প্রকাশ পায়। পরে এই দাগগুলি বাদামী বা লালচে বাদামী রং ধারণ করে ক্রমশ আকারে বড় হতে থাকে। দাগগুলি প্রায় ১.৫ সেমি ব্যস বিশিষ্ট হয়। একাধিক দাগ এক সাথে মিশে বড় দাগের সৃষ্টি হতে পারে। ফসলের জাত ভেদে দাগগুলি বিভিন্ন ধরনের হতে দেখা যায়। কোন কোন জাতের দাগগুলি চারিদিকে বাদামী রং বলয়যুক্ত এবং কেন্দ্রের কিছুটা অংশ সাদা হয়। আবার কোন কোন জাতে দাগের বেশির ভাগ অংশই সাদাটে হয়। সাধারণত দাগগুলো কোন নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতির হয় না। খুব বেশি মাত্রায় আক্রান্ত হলে গাছের পাতা ঝরে যায়।

ব্যবস্থাপনা: রোগের জীবাণু ফসলের আক্রান্ত অংশে বেঁচে থাকতে পারে বিধায় আক্রান্ত ফসলের আবর্জনা যাতে ভালোভাবে পচে যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভবিত মাসকলাইয়ের উন্নত জাতসমূহের (বারি মাস-১, বারি মাস-২, বারি মাস-৩ এবং বারি মাস-৪) এ রোগের আক্রমণ কম হয়। এছাড়া রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে অটোস্টিন-৫০ ডব্লিউ পি নামক ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করলে এরোগ দমন করা যায়।

পাউডারী মিলডিউ

পাউডারী মিলডিউ মাসকলাইয়ের একটি প্রধান রোগ। বাংলাদেশ ছাড়া ভারত এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের মাসকলাইতে এ রোগ আক্রমণ করে থাকে। বাংলাদেশে এ রোগটি খরিফ-২ মৌসুমে বেশি আক্রমণ করে। বিশেষত

দেরিতে বোনা ফসলের বেশি ক্ষতি করে থাকে। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় যে, এ রোগের আক্রমণের কারণে মাসকলাইয়ের খরিফ-২ মৌসুমে ৪২% এবং খরিফ-১ মৌসুমে ১৭% পর্যন্ত ক্ষতি করে থাকে। ইহা একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এরোগের জীবাণু ছত্রাক ইরাইছিফি পলিগনি (*Erysiphe polygoni*)বা অয়ডিয়াম এসপি (*Oidium sp*) প্রধানত বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্য স্থানে বাহিত হয়।

রোগের লক্ষণ: এ রোগ সর্ব প্রথম পাতার উপরে ছোট ছোট সাদা হালকা পাউডারী দাগের আকারে প্রকাশ পায়। ধীরে ধীরে এ দাগ থেকে আরও অসংখ্য অনুরূপ পাউডারী দাগের সৃষ্টি হয় এবং পাতার উপরের পুরো অংশ আক্রান্ত হয়ে সাদা পাউডারের মত হয়ে যায়। পরে পাতা থেকে কাণ্ড ও ফল-ফুল প্রভৃতি অংশেও আক্রমণ বিস্তার লাভ করে। পাতার উপরের সাদা পাউডার ক্রমে ছাই রং ধারণ করে এবং পরিশেষে তা কাল বা গাঢ় বাদামী রঙের পাউডারে পরিণত হয়। পাতার সবুজ রং পরিবর্তিত হয়ে ছাই রঙে পরিণত হয়।

ব্যবস্থাপনা: রোগ সহনশীল কোন জাতের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। তবে আগাম বোনা অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শুরু থেকে আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে বোনা ফসলে এ রোগের আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। এছাড়া ছত্রাকনাশক ব্যবহার করেও এ রোগ দমন করা যায়। টিল্ট-২৫০ ইসি ০.৪ মিলি অথবা থিউভিট ৮০ ডব্লিউ পি ২.০ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে রোগের আক্রমণের শুরু থেকে ৭ হতে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মাসকলাইয়ের উন্নত জাতসমূহে এ রোগের আক্রমণ তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না।

পাতা পচা রোগ

সাম্প্রতিকালে মাকলাইয়ে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইহা একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগটি সর্ব প্রথম যশোর এবং ঈশ্বরদী আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রসমূহের গবেষণা খামারে লক্ষ্য করা যায় এবং আক্রমণকারী ছত্রাককে শনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকের জমিতেও এ রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে এই রোগ একটা প্রধান রোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

রোগের লক্ষণ: এরোগের আক্রমণের শুরুতে পাতার উপর পানিতে ভেজা দাগের সৃষ্টি হয়। উষ্ণ ও মেঘলা আবহাওয়ায় দাগের আকার বৃদ্ধি পেয়ে পাতার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে আক্রান্ত পাতাগুলো শুকিয়ে বাদামী রং ধারণ করে। শুকনা আক্রান্ত অংশে ছত্রাকের সাদা মাইসিলিয়াম দেখা যায় এবং পরে বিভিন্ন আকারে স্কেরোশিয়াম তৈরি হয়। স্কেরোশিয়ামগুলো প্রথমে সাদা রঙের থাকে এবং পুরোমাত্রায় পরিপক্কতা আসলে তুলার বীজের মতো গাঢ় বাদামী বা কাল রং ধারণ করে।

রোগ বিস্তার: এ রোগের আক্রমণকারী ছত্রাক (*Selerotinia sclerotiorum*) মাটিতে থাকে। আক্রান্ত গাছের উপর ইহা ছত্রাকের স্কেরোশিয়াম তৈরি করে। স্কেরোশিয়াম মাটির সাথে মিশে মাটিতে থেকে যায়। উপযুক্ত আবহাওয়ায় ইহা অঙ্কুরিত হয়ে এসকোকার্প তৈরি করে। পরিপক্ক এসকোকার্প বিস্ফোরিত হয়ে এসকোস্পোর নিক্ষেপ করে যা শস্যকে আক্রমণ করে।

ব্যবস্থাপনা: এরোগের দমন ব্যবস্থা উদ্ভাবনের উপর বাংলাদেশে খুব বেশি গবেষণা হয়নি। রোগ দমনের জন্য জমিতে আক্রান্ত ফসলের আবর্জনা এবং স্কেরোশিয়াসমূহ পরিপক্ক হয়ে পড়ে যাওয়ার পূর্বে পরিষ্কার করা দরকার। আক্রমণ দেখা দেয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে এ রোগের দমন ব্যবস্থা হিসাবে আক্রান্ত গাছের অংশ পরিস্কার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

এছাড়া রেখা দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল নামক ছত্রাক নাশক ২.০ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ স্প্রে করলে রোগের প্রকোপ কমানো যায়।

জাবপোকা

পোকা ব্যবস্থাপনা: জাবপোকা সাধারণত দলবদ্ধভাবে পাতা, ডগা, ফুল ও ফল থেকে রস চুষে খায়। এদের আক্রমণে গাছ খর্বাকৃতি হয়, ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্থ হয়, বীজের দানা অপুষ্ট ও আকারে ছোট হয়। জাবপোকার আক্রমণ দেখা গেলে ডাইমেথয়েট গ্রুপের (যেমন- টাফগর-৪০ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি/লিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করে সহজেই জাবপোকা দমন করা যায়।

জাবপোকা আক্রান্ত মাসকলাই এর ডাল

মুগ

বাংলাদেশের সুস্বাদু ডাল ফসলের মধ্যে মুগ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সব জেলাতেই মুগ চাষ হয়ে থাকে। দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে বিশেষ করে বরিশাল, ঝালকাঠী, পটুয়াখালী ও ভোলা জেলায় আমন ধান কাটার পর বিলম্ব রবি মৌসুমে ব্যাপক ভিত্তিতে মুগ ডালের চাষ হয়ে থাকে। দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের জেলাসমূহে (যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর) এবং উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের মধ্যে নাটোর, পাবনা ও রাজশাহীতে সরিষা বা অন্যান্য রবিশস্য কাটার পর বপনপূর্ব সেচ দিয়ে ব্যাপক ভিত্তিতে উচ্চ ফলনশীল বারি মুগ-৬ জাতের চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে মুগ ডালের মোট আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৩.১৯ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ২.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন। মোট উৎপাদন ও আবাদী জমির পরিমাণ অনুযায়ী মুগ ডাল তৃতীয় স্থান অর্জন করে আছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডাল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক মুগ ডালের ৮টি উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

মুগ ডাল

মুগের জাত

বারি মুগ-২ (কান্তি)

জার্মপ্লাজম সংগ্রহের আওতায় সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বারি মুগ-২ বা কান্তি জাতটি বাছাই করা হয়। ১৯৮৭ সালে এ জাতটি কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।

গাছের উচ্চতা ৪০-৪৫ সেমি। বীজের রং সবুজ। বীজের ত্বক মসৃণ। হাজার বীজের ওজন ৩০-৩২ গ্রাম। বারি মুগের কান্তি জাত দিবস নিরপেক্ষ হওয়ায় খরিফ-১, খরিফ-২ এবং রবি মৌসুমে চাষ করা যায়। রান্না হওয়ার সময়কাল ১৫-১৮ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২০-২৪%। জীবনকাল ৬৫-৭০ দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ৯০০-১১০০ কেজি। জাতটি পাতায় দাগ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল।

বারি মুগ-২ (কান্তি)

বারি মুগ-৩ (প্রগতি)

বারি মুগ-৩ বা প্রগতি জাতটি সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। এ জাতটি ১৯৯৬ সালে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়। গাছের উচ্চতা ৫০-৫৫ সেমি। বীজ কিছুটা অমসৃণ এবং বাদামী বর্ণের। হাজার বীজের ওজন ২৮-২৯ গ্রাম। রান্না হওয়ার সময়কাল ১৪-১৭ মিনিট। বীজের রং সোনালী বর্ণের।

জাতটি দিবস নিরপেক্ষ হওয়ায় খরিফ-১, খরিফ-২ ও বিলম্ব রবি মৌসুমে আবাদ করা যায়। আমিষের পরিমাণ ১৯-২১%। জীবনকাল ৬০-৬৫ দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ১০০০-১১০০ কেজি। জাতটি পাতায় দাগ ও হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল।

বারি মুগ-৩

বারি মুগ-৪ (রূপসা)

বারি মুগ-৪

বারি মুগ-৪ বা রূপসা সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। এ জাতটি সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন লাভ করে।

এ জাত দিবস নিরপেক্ষ হওয়ায় খরিফ-১, খরিফ-২ ও বিলম্ব রবি মৌসুমে বপন করা যায়। জাতটি দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

গাছের উচ্চতা ৫০-৫৫ সেমি। বীজ মসৃণ ও রং সবুজ। হাজার বীজের ওজন ২৮-৩২ গ্রাম। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ১৫-২০ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২১-২৪%। জীবনকাল ৬৫-৭০ দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ১২০০-১৪০০ কেজি। জাতটি পাতায় দাগ ও হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল।

বারি মুগ-৫ (তাইওয়ানী)

বারি মুগ-৫ (তাইওয়ানী) জাতটি ১৯৯৭ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য উচ্চ ফলনশীল জাত হিসেবে অনুমোদন লাভ করে।

গাছের পাতা, ফল ও বীজ আকারে বেশ বড়। বীজের রং গাঢ় সবুজ। হাজার বীজের ওজন ৪০-৪২ গ্রাম। জাতটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল যে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ ফল এক সাথে পাকে। ডাল রান্না হওয়ার সময়কাল ১৭-২০ মিনিট। আমিষের পরিমাণ ২০-২২%। জাতটির জীবনকাল ৬০-৬৫ দিন। ফলন হেক্টরপ্রতি ১২০০-১৫০০ কেজি। জাতটি পাতায় দাগ ও হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহনশীল।

বারি মুগ-৫

বারি মুগ-৬

বারি মুগ-৬

বাংলাদেশের গম কাটার পর থেকে রোপা আমন ধান রোপণের পূর্ব পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ হেক্টর জমি পতিত থাকে। এ সমস্ত জমিকে কাজে লাগানোর জন্য উপযোগী মুগের জাত উদ্ভাবনের লক্ষে ১৯৯৮ সালে AVRDC থেকে মুগডালের অনেকগুলো জাত/লাইন সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে এই লাইনগুলো প্রাথমিক, অগ্রগামী, অঞ্চলভিত্তিক ও বহুস্থানিক পরীক্ষা করা হয়। ২০০৩ সালে 'বারিমুগ-৬' জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন পায়।

গাছের উচ্চতা ৪০-৪৫ সেমি। একই সময়ে প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ ফল/ শুটি পরিপক্ক হয়। পাতা ও বীজের রং গাঢ় সবুজ এবং পাতা চওড়া। ফুল আসার পরে দৈহিক বৃদ্ধি কম। দানার আকার বড়। প্রতি ১০০ বীজের ওজন ৫.১-৫.২ গ্রাম। গম

কাটার পর এপ্রিলের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত বপন করা যায়। এ ছাড়া খরিফ-২ ও বিলম্ব রবি মৌসুমেও বপন করা যায়। হলুদ মোজাইক ভাইরাস এবং পাতায় দাগ রোগ সহনশীল। জীবনকাল ৫৫-৫৮ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫০০-১৬০০ কেজি।

বারি মুগ-৭

ডাল গবেষণা কেন্দ্রের সংগৃহীত জার্মপ্লাজম/ক্রসিং ম্যাটেরিয়াল (Crossing material) হতে BMX-97024-13 (VC-3960A-88 x VC-6173C) লাইনসহ অনেকগুলো জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে ২০১২ সাল হতে মূল্যায়ন করা হয়। খরিফ-১ মৌসুমে গম ও আমন ধানের মধ্যবর্তী পতিত জমিকে চাষাবাদের আওতায় এনে ডাল ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে লাইনগুলো ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে মূল্যায়ন করা হয়। এছাড়াও, খরিফ-২ ও বিলম্ব রবি মৌসুমেও মূল্যায়ন করা হয়। দীর্ঘদিন পরীক্ষার পর লাইনটি (BMX-97024-13) উচ্চফলনশীল ও রোগ সহনশীল হওয়ায় একটি সম্ভাবনাময় লাইন হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং জাত হিসেবে মুক্তায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ সালে এই লাইনটি বারি মুগ-৭ হিসেবে অবমুক্ত হয়।

বারি মুগ-৭ এর ফসল

বারি মুগ-৭ এর দানা

গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সে.মি.। প্রতি গাছে পডের সংখ্য ২৫-৩০ টি। বীজের রং সবুজ ও দানার আকার বড়। প্রতি ১০০০ বীজের ওজন ৪৯-৫১ গ্রাম। পাতায় দাগ ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল। সবগুলো ফল প্রায় এক সাথে পাকে। জীবনকাল ৬০-৬২ দিন। ফলন ১৭০০-১৯০০ কেজি/হেক্টর।

বারি মুগ-৮

প্রস্তাবিত লাইনটি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম হতে সংগ্রহ করে ২০১২ সাল হতে মূল্যায়ন করা হয়। খরিফ-১ মৌসুমে গম ও আমন ধানের মধ্যবর্তী পতিত জমিকে চাষাবাদের আওতায় এনে ডাল ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে অনেকগুলো স্বল্পজীবনকালীন লাইন ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে মূল্যায়ন করা হয়। দীর্ঘদিন পরীক্ষার পর লাইনটি (LM-101) উচ্চফলনশীল ও রোগ সহনশীল হওয়ায় একটি সম্ভাবনাময় লাইন হিসেবে নির্বাচিত হয় এবং জাত হিসেবে মুক্তায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীতে এ লাইনটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ সালে বারি মুগ-৮ হিসেবে অবমুক্ত হয়।

গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সে.মি.। বীজের রং সোনালী ও দানার আকার ছোট। প্রতি ১০০০ বীজের ওজন ৩০-৩২ গ্রাম। সারকোস্পারা ও হলুদ মোজাইক রোগ সহনশীল, সবগুলো ফল প্রায় এক সাথে পাকে। জীবন কাল ৬০-৬২ দিন। দেরিতে বপনযোগ্য। ফলন ১৬০০-১৭০০ কেজি/হেক্টর।

বারি মুগ-৮ এর ফসল

বারি মুগ-৮ এর দানা

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: বেলে দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি, উঁচু-মাঝারী উঁচু এবং সুনিষ্কাশিত জমি মুগ আবাদের জন্য উপযোগী।

জমি তৈরি: ২-৩টি আড়াআড়ি চাষ ও প্রয়োজনীয় মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে তৈরি করতে হবে।

বপন পদ্ধতি: ছিটিয়ে ও সারি উভয় পদ্ধতিতেই বপন করা যায়। আন্তঃফসল বা মিশ্র ফসল হিসেবে মুগ চাষ করলে সাধারণত ছিটিয়ে বপন করা হয়। তবে সারি করে বপন করাই উত্তম। সারি করে বপন করলে আন্তঃপরিচর্যাসহ ফল সংগ্রহের সুবিধা হয় এবং বীজের গুণাগুণসহ ফলনও বেশি হয়। সারিতে বপনের ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি বা ১২ ইঞ্চি রাখতে হবে এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭-৮ সেমি।

বীজের হার: মুগের বীজের পরিমাণ নির্ভর করে বীজের আকার এবং বপন পদ্ধতির উপর। ১৫-১৫ কেজি ছোট দানার ক্ষেত্রে, ১০০০ বীজের ওজন ২৫-৩২ এবং ২২-২৫গ্রাম কেজি/হে. বেড দানার ক্ষেত্রে, ৪০-৫২ গ্রাম/১০০ বীজের জন্য এবং ছিটিয়ে বপনের ক্ষেত্রে বীজের পরিমাণ সামান্য বেশি দিতে হবে।

বপনের সময়: এলাকাভেদে মুগের বপন সময়ের তারতম্য দেখা যায়। খরিফ-১ মৌসুমে ফাল্গুন মাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারির শেষ ভাগ হতে মার্চের মধ্য-ভাগ)। খরিফ-২ মৌসুমে শ্রাবণ ৩য় সপ্তাহ-ভাদ্র ৩য় সপ্তাহ (আগস্টের প্রথম হতে সেপ্টেম্বরের ১ম সপ্তাহ পর্যন্ত)। বিলম্ব রবি মৌসুমে বরিশাল এলাকার জন্য বপনের উত্তম সময় মাঘ মাস (জানুয়ারির ৩য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্য ভাগ)।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: একক ফসলের জন্য অনুর্বর জমিতে হেক্টরপ্রতি সারগুলি জমি শেষ চাষের সময় নিম্নরূপ হারে সার ব্যবহার করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর (কেজি)	সারের পরিমাণ/বিঘা (কেজি)
ইউরিয়া	৪০-৪৫	৫-৬
টিএসপি	৮০-৯০	১০-১৩
এমপি	৩০-৪০	৪-৫
জিপসাম	৫০-৫৫	৭-৮
বোরন (প্রয়োজনবোধে)	৭-১০	১-১.৫
অণুজীব সার (প্রয়োজনবোধে)	সুপারিশমতো	সুপারিশমতো

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। অতিবৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতে না পারে সে জন্য অতিরিক্ত পানি বের হওয়ার ব্যবস্থা রাখতে হবে। এছাড়া খরিফ-১ মৌসুমে বৃষ্টি না হলে সঠিক সময়ে বপনের জন্য বপনের পূর্বে বা পরে একটি সেচ প্রয়োজন। সেচ দিলে চারা গজানোর পর মালচিং করে দিতে হবে। এছাড়াও প্রয়োজনে পরবর্তীতে মাটিতে রসের অভাব হলে ১-২ টি হালকা সেচ দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: ফল পরিপক্ক হয়ে কালচে বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হয়। আর খরিফ-২ মৌসুমে বপন করলে ফসল পেকে গেলে গাছসহ একেবারে কেটে আনতে হয়।

রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনা

মুগ: মুগ ডালের চাষাবাদের ক্ষেত্রে কৃষকগণ যেসকল সমস্যার সম্মুখীন হন তার মধ্যে রোগ-বালাই এবং পোকা-মাকড় এর আক্রমণ অন্যতম। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এ যাবৎ এ ফসলের ২৮টি রোগ সনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশে মাঠে দাড়ানো ফসল আক্রমণকারী ১৬টি রোগ এবং গুদামজাত অবস্থায় আক্রমণকারী ৩টি রোগ সনাক্ত করা হয়েছে (Bakr; 1993) তন্মধ্যে মাঠ পর্যায়ে ৪টি এবং গুদামজাত অবস্থায় ২টি বেশি ক্ষতিকর রোগ রয়েছে।

হলুদ মোজাইক

হলুদ মোজাইক মুগের সবচেয়ে মারাত্মক ভাইরাসজনিত রোগ। মুগ আবাদী দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রায় সব কটি দেশেই। এ রোগের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। তবে মুগের তুলনায় এর প্রকোপ কিছুটা কম হয়। চারা অবস্থা থেকে শুরু করে পূর্ণ বয়স্ক গাছ পর্যন্ত ফসলের যেকোন অবস্থায়ই এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। তবে আক্রমণ যত কম বয়সে হয় ক্ষতির পরিমাণ তত বেশি হয়। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায় এ রোগের আক্রমণ আট সপ্তাহ বয়সের মুগ ক্ষেতে তেমন কোন ক্ষতি করে না পক্ষান্তরে সাত, ছয়, পাঁচ এবং চার

সপ্তাহ বয়সের ফসলে যথাক্রমে শতকরা ২০, ৩৮, ৬০ ও ৮৫ ভাগ ফসল কমে যেতে পারে। এমনকি এক থেকে দুই সপ্তাহ বয়সের মুগ ফসল আক্রান্ত হলে প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ ফলন বিনষ্ট হতে পারে। এই রোগের আক্রমণকারী ভাইরাস সাদা মাছি (White Fly) দ্বারা বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ: আক্রান্ত পাতার উপর চাকা ও গাঢ় সবুজ এবং হলুদ রঙের মিশ্রণ যুক্ত নানা বর্ণের বিন্যাস এরোগের প্রধান লক্ষণ। জাত ভেদে এ রোগের লক্ষণের কিছুটা তারতম্য হলেও এরূপ হলুদ হয়ে যাওয়া সর্বাবস্থায় দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ খর্বাকৃতির হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পাতা ফুল ও ফল কুকড়ে যায় এবং ফলের আকার ছোট হয়। প্রতিটি ফলে বীজের সংখ্যা হ্রাস পায়। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত গাছে ফুল ফল মোটেই ধরে না বা খুবই কম ধরে থাকে।

ব্যবস্থাপনা: এ রোগটির ব্যবস্থাপনা খুবই কষ্টসাধ্য। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে এই রোগের সম্পূর্ণ প্রতিরোধী কোন জাতের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। অবশ্য কিছু কিছু লাইন রোগ প্রতিরোধী বা সহনশীলতা প্রদর্শন করলেও পরিশেষে তা প্রতিরোধী থাকে না। তবে ডাল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত মুগের জাত বারি মুগ-৬, বারি মুগ -৭ এবং বারি মুগ - ৮ মোটামুটি রোগটির প্রতি সহনশীল। চৈত্র-বৈশাখ মাসে বপনকৃত ফসলে ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বপনকৃত ফসলের তুলনায় এরোগের আক্রমণ উল্লেখযোগ্য হারে কম হতে দেখা যায়।

পাতার সারকোস্পোরা দাগ

সারকোস্পোরা দাগ মুগের পাতার একটি খুবই অনিষ্টকারী রোগ। এই রোগ অনুকূল আবহাওয়ায় মুগের যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। এ রোগ "সারকোস্পোরা ক্রোয়েন্টা" বা "সারকোস্পোরা কেনেসেন্স" নামক ছত্রাকের আক্রমণের কারণে হয়ে থাকে। জীবাণু ছত্রাক আক্রান্ত ফসলের পরিত্যক্ত আবর্জনার মাধ্যমে বেঁচে থাকতে পারে।

রোগের লক্ষণ: রোগের লক্ষণ প্রথমে পাতার উপর ছোট ছোট পানিতে ভেজা আলপিনের মাথার সমান দাগের আকারে প্রকাশ পায়। পরে এই দাগগুলি বাদামী বা লালচে বাদামী রং ধারণ করে ক্রমশ আকারে বড় হতে থাকে। প্রায়ই ০.৫ সেমি ব্যস বিশিষ্ট হয়। একাধিক দাগ এক সাথে মিশে বড় দাগের সৃষ্টি হতে পারে। ফসলের জাত ভেদে দাগগুলি বিভিন্ন ধরনের হতে দেখা যায়। কোন কোন জাতের দাগগুলি চারিদিকে বাদামী রং বলয়যুক্ত এবং কেন্দ্রের কিছুটা অংশ সাদা হয়। আবার কোন কোন জাতে দাগের বেশির ভাগ অংশই সাদাটে হয়। সাধারণত দাগগুলো কোন নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতির হয় না। খুব বেশি মাত্রায় আক্রান্ত হলে গাছের পাতা ঝরে যায়।

ব্যবস্থাপনা: রোগের জীবাণু ফসলের আক্রান্ত অংশে বেঁচে থাকতে পারে বিধায় আক্রান্ত ফসলের আবর্জনা যাতে ভালভাবে পচে যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে। অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারিমুগ-৫ ও বারিমুগ-৬, বারি মুগ-৭ এবং বারি মুগ-৮ এ রোগে কম আক্রান্ত হয়। এছাড়া রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে অটোস্টিন-৫০ ডব্লিউ পি নামক ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়।

পাউডারী মিলডিউ

পাউডারী মিলডিউ মুগ ও মাসকলাই উভয় ফসলকেই আক্রমণ করে। বাংলাদেশে এ রোগটি খরিফ-২ আবাদ মৌসুমে বেশি আক্রমণ করে। বিশেষত দেরিতে বোনা ফসলের বেশি ক্ষতি করে থাকে। গবেষণার ফলাফল থেকে জানা যায়া যে, এ রোগের আক্রমণের কারণে খরিফ-২ মৌসুমে ৪২% এবং খরিফ-১ মৌসুমে ১৭% পর্যন্ত ক্ষতি করে থাকে। ইহা একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগের জীবাণু ছত্রাক ইরাইছিফি পলিগনি বা অয়ডিয়াম এসপি প্রধানত বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্য স্থানে বাহিত হয়।

রোগের লক্ষণ: এ রোগ সর্ব প্রথম পাতার উপরে ছোট ছোট সাদা হালকা পাউডারী দাগের আকারে প্রকাশ পায়। ধীরে ধীরে দাগ থেকে আরও অসংখ্য অনুরূপ পাউডারী দাগের সৃষ্টি হয় এবং পাতার উপরের পুরো অংশ আক্রান্ত হয়ে যায়।

পরে পাতা থেকে কাণ্ড ও ফল-ফুল প্রভৃতি অংশেও আক্রমণ বিস্তার লাভ করে। পাতার উপরের সাদা পাউডার ক্রমে ছাই রং ধারণ করে এবং পরিশেষে তা কাল বা গাঢ় বাদামী রঙের পাউডারে পরিণত হয়। পাতার সবুজ রং ও পরিবর্তিত হয়ে ছাই রঙে পরিণত হয়।

ব্যবস্থাপনা: এ রোগের প্রতিরোধী কোন জাতের সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। তবে আগাম বোনা অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শুরু থেকে আশ্বিন মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে বোনা ফসলে এ রোগের আক্রমণে ক্ষতির পরিমাণ কম হয়। এছাড়া ছত্রাকনাশক ব্যবহার করেও এ রোগ দমন করা যায়। টিল্ট-২৫০ ইসি ০.৫ মিলি অথবা থিউভিট ২.০ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে রোগের আক্রমণের শুরু থেকে ৭ হতে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়।

পাতা পচা রোগ

সাম্প্রতিকালে মুগ ফসলে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইহা একটি ছত্রাকজনিত রোগ। এ রোগটি সর্ব প্রথম যশোর এবং ঈশ্বরদী ডাল গবেষণা কেন্দ্রসমূহের গবেষণা খামারে লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং তার আক্রমণকারী ছত্রাককে সনাক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকের জমিতেও তার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে এই রোগ একটা প্রধান রোগ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

রোগের লক্ষণ: এ রোগের আক্রমণের শুরুতে পাতার উপর পানিতে ভেজা দাগের সৃষ্টি হয়। উষ্ণ ও মেঘলা আবহাওয়ায় দাগের আকার বৃদ্ধি পেয়ে পাতার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই আক্রান্ত হয়ে পড়ে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে আক্রান্ত পাতাগুলো শুকিয়ে বাদামী রং ধারণ করে। শুকনা আক্রান্ত অংশে ছত্রাকের সাদা মাইসিলিয়াম দেখা যায় এবং পরে বিভিন্ন আকারে স্ক্লেরোশিয়াম তৈরি হয়। স্ক্লেরোশিয়ামগুলো প্রথমে সাদা রংয়ের থাকে এবং পুরোমাত্রায় পরিপক্কতা আসলে তুলার বীজের মত গাঢ় বাদামী বা কাল রং ধারণ করে।

রোগ বিস্তার: এ রোগের আক্রমণকারী ছত্রাক (*Sclrotinia sclerotiorum*) মাটিতে থাকে। আক্রান্ত গাছের উপর ইহা ছত্রাকের স্ক্লেরোশিয়াম তৈরি করে। স্ক্লেরোশিয়াম মাটির সাথে মিশে মাটিতে থেকে যায়। উপযুক্ত আবহাওয়ায় ইহা অঙ্কুরিত হয়ে এসকোকার্প তৈরি করে। পরিপক্ক এসকোকার্প বিস্ফোরিত হয়ে এসকোস্পোর নিক্ষেপ করে যা শস্যকে আক্রমণ করে।

ব্যবস্থাপনা: রোগ দমনের জন্য জমিতে আক্রান্ত ফসলের আবর্জনা এবং স্ক্লেরোশিয়াসমূহ পরিপক্ক হয়ে পড়ে যাওয়ার পূর্বে পরিষ্কার করা দরকার। ফলিকুর ২৫০ ইসি ২.০ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে রোগের আক্রমণের শুরু থেকে ৭ হতে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়।

পোকা-মাকড়

ফ্লি-বিটেল : দুই পাতা নিয়ে চারা বের হওয়া মাত্র ফ্লি-বিটল অসম গোলাকার ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে। অনেক সময় চারার বর্ধনশীল কুশিটিও খেয়ে ফেললে চারাটি আর বাড়তে পারে না। এছাড়াও এরা গাছের বৃদ্ধিপর্যায়ে পাতা খেয়ে ঝাঁঝরা করে ফেলে। এতে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ফল ধারণ কমে যায়।

মারাত্মক আক্রমণে আইসোপ্রোকার্ব জাতীয় কীটনাশক (যেমন- মিপসিন ৭৫ ডব্লিও পি বা অন্য নামের) প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চারার থ্রিপস : গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় চারায় প্রথম তিনপত্রকের পাতা বের হলেই থ্রিপসের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে পাতা উপরের দিকে কুঁকড়ে যায়। গাছ খর্বাকৃতির হয়ে বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

থ্রিপস আক্রান্ত চারা গাছ

পাতা মোড়ানো পোকার কীড়া ও আক্রান্ত গাছ

আক্রমণ দেখা দেয়া মাত্র ক্লোরফিনাপির (যেমন- ইন্ট্রিপিড ১০ এসসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ১-২ বার স্প্রে করতে হবে।

পাতা মোড়ানো পোকা : মুগ গাছ সক্রিয় বর্ধনশীল অবস্থায় পাতা মোড়ানো পোকা দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। এ পোকা পাতাকে মুড়িয়ে ভিতরে বসে পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। এতে বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ফুল ও ফল ধারণ কমে যায়।

প্রথমত মোড়ানো পাতাগুলো কীড়াসহ সংগ্রহ করে কীড়া ধ্বংস করতে হবে।

দ্বিতীয়ত আক্রান্ত ক্ষেতে ল্যাম্বডা সাইহ্যালোথ্রিন (যেমন- ক্যারাটে ২.৫ ইসি বা অন্য নামের) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

থ্রিপস আক্রান্তফুল

ফুলের থ্রিপস : গাছে ফুল ধরা শুরু করলেই ফুলে থ্রিপসের আক্রমণ হয়ে থাকে। এপ্রিল মে মাসে গরম ও শুষ্ক আবহাওয়ায় এদের আক্রমণ হয়। দুই/চারটি ফুটন্ত ফুল হাতের তালুতে ঝারা দিলেই ছোট ছোট কালো থ্রিপস পোকা দেখা যায়। এদের মারাত্মক আক্রমণে ফুল ঝরে পড়ে এবং ফল ধারণ ব্যাহত হয়।

গাছে ফুল আসলেই পোকার আক্রমণ বুঝে ইমিডাক্লোপ্রিড জাতীয় কীটনাশক (যেমন- ইমিটাফ ২০ এসএল বা অন্য নামের) প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফুল ও ফল ছেদক পোকা আক্রান্ত পুষ্প মঞ্জুরী

ফুল ও ফল ছেদক পোকা : গাছে ফুল ধরার সময় থেকে ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ পোকার আক্রমণ হয়ে থাকে। প্রথমে এরা ফুল খেয়ে তাকে মুড়িয়ে এবং জড়িয়ে নষ্ট করে ফেলে। পরে ফল ছিদ্র করে বীজ খেয়ে ফেলে। এতে ফলন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

আক্রমণের ব্যাপকতা বেশি মনে হলে থায়ামিথক্সাম+ ক্লোরানট্রানিলিপ্রোল এর মিশ্রণ (যেমন- ভিরতাকো ৪০ ডব্লিউ জি) প্রতি লিটার পানিতে ০.১৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

শুসরী পোকা : মুগ গুদামে সংরক্ষণকালে শুসরী পোকার আক্রমণে বীজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মাঠে ফসল পরিপক্ক অবস্থায় এদের আক্রমণ (ডিম পাড়া) শুরু হয়ে থাকে এবং মাড়াই, ঝাড়াই, শুকানো ও ঠাণ্ডাকরণ ইত্যাদি কাজের মধ্যেও আক্রমণ চলতে থাকে। বীজের গায়ে পেড়ে দেয়া ডিম ফুটে কীড়া বের হয়ে বীজ দানাকে খেয়ে নষ্ট করে ফেলে। এতে বীজ খাওয়ার অনুপোযুক্ত হয়ে যায় ও অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়।

শুসরী পোকা আক্রান্ত মসুর বীজ

গুদামে বীজ সংরক্ষণের আগে বীজকে উত্তমরুপে কট্‌কটে করে শুকিয়ে বায়ুরোধী পাত্রে (যেমন- পলিব্যাগসহ ছালার বস্তা, ধাতব বা প্লাস্টিক ড্রামে) সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রতি ৫০-১০০ কেজি বীজের জন্য ১টি এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড ট্যাবলেট (ফসটক্সিন ট্যাবলেট) ন্যাকড়ার পুটলিতে বেঁধে ব্যবহার করলে দীর্ঘ সময় বীজ ভাল থাকবে।

লবণাক্ত এলাকায় ধানের পর মুগডালের চাষ

বিষয়	বিবরণ
প্রয়োগের স্থান/ক্ষেত্রে	নোয়াখালী, ফেনী, ভোলা, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা ও খুলনা লবণাক্ত এলাকা
প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ	লবণাক্ত এলাকার আমন ধান কর্তনের পর মধ্য ডিসেম্বরের মধ্যে মুগডাল চাষ করে খরা/লবণাক্ততা এড়ানো
উৎপাদন/ব্যবহার/প্রয়োগ নির্দেশনা	
ক) মাটি	বেলে দোআঁশ, দোআঁশ, এঁটেল দোআঁশ ও পলি এঁটেল
খ) জাত	বারি মুগ-৬
গ) জমি তৈরি	প্রচলিত চাষ
ঘ) রোপণ/বপন পদ্ধতি	সারিতে বপন (৩০ সেমি × ৭-৮ সেমি) সারি থেকে সারি ৩০ সে.মি, গাছ থেকে গাছ ৭-৮ সে.মি.।
ঙ) বীজের হার	২০-২৫ কেজি/হেক্টর
চ) বপন সময়	জানুয়ারি ২য় সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি
ছ) আগাছা দমন	চারার ২০ দিন ও ৩০ দিন বয়সে নিড়ানি
জ) জৈব সার	গোবর ৫ টন/হেক্টর
ঝ) রাসায়নিক সার (কেজি/হেক্টর)	ইউরিয়া ৪০-৫০, টিএসপি ৮০-৯০, এমপি ৫০
ঞ) বীজ শোধন	প্রতি কেজি বীজ ৩ গ্রাম হারে প্রোভেক্স ২০০ ডব্লিউ পি দ্বারা শোধন করতে হবে।
ট) সেচ	সম্ভব হলে চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর একটি সেচ।
ঠ) ফসল সংগ্রহ	এপ্রিল
ড) সংগ্রহের ব্যবস্থাপনা	লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মাড়াই করতে হবে অথবা পাওয়ারটিলার, ট্রাক্টর ঘুরিয়েও মাড়াই করা যায়।
ঢ) ফলন (টন/হেক্টর)	১.২-১.৪
প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে ঝুঁকির বিবরণ	কোন ঝুকি নেই।
পরিবেশের উপর প্রভাব	পরিবেশের উপর কোন বিরূপ প্রভাব নেই উপরোক্ত জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
প্রযুক্তি হস্তান্তরের পদ্ধতি	সগবি (বারি), এনজিও এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
লাভ ক্ষতির বিবরণ এবং প্রত্যাশিত ফলাফল	মোট আয়: হেক্টরপ্রতি টাকা ৫০.০০০/- উৎপাদন ব্যয়: হেক্টরপ্রতি টাকা ৩০.০০০/_ লাভ খরচের অনুপাত: ৫.০ : ৩.০ এই প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষক এক ফসলী জমিকে দুই ফসলী জমিতে রূপান্তর করে অধিক লাভবান হতে পারে।
সুপারিশমালা	কৃষকের মুগবিন চাষের সুপারিশকৃত প্রযুক্তিসমূহ সঠিকভাবে প্রয়োগে উৎসাহিত করা।
তাৎপর্যপূর্ণ সাফল্য	লবণাক্ত এলাকায় এক ফসলী জমিকে দুই ফসলী জমিতে রূপান্তর করে উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষকের আয়বৃদ্ধি, ডাল ও পুষ্টির চাহিদা পূরণ এবং জমির উর্বরতা শক্তি সংরক্ষণ করে।

পাহাড়ের পাদদেশে সরিষা কর্তনের পর খরিফ-১ মৌসুমে ‘বারি মুগ-৬’ এর চাষ

বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ এলাকা নিয়ে বিস্তৃত পাহাড়ী এলাকা। পাহাড়ের পাদদেশে কৃষকগণ সাধারণত এক ফসল হিসেবে রোপা আমন ধানের চাষ করে। প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং দীর্ঘ শীতকাল বিরাজমান থাকায় এ অঞ্চল সারা বছর ফসল উৎপাদনের উপযোগী। রবি মৌসুমে আমন ধান কর্তনের পর সরিষার চাষ করে প্রায় ১.৪-১.৮ টন/হেক্টর ফলন পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন পাহাড়ী এলাকায় সরিষা কর্তনের পর খরিফ-১ মৌসুমে পুণরায় ঐ জমিতে মুগ চাষের সম্ভাবনার উপর গবেষণা করা হয় এবং পর পর দুই বছর গবেষণা করে ‘বারি মুগ-৬’ থেকে সব চাইতে ভাল ফলন পাওয়া গিয়েছে।

ফেলন

ফেলন বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে জন্মানোর উপাযোগী তবে দাক্ষিণাঞ্চলে ধান ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাসে ব্যাপকভাবে চাষাবাদ হয়। এছাড়াও পাহাড়ী অঞ্চলে ভালো জন্মে। ইহা তাপ, লবণাক্ততা ও খরা সহনশীল।

বৃহত্তর চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী, ভোলা, ফেনী অঞ্চলের মানুষের নিকট ফেলন ডাল অত্যন্ত সুপরিচিত। বাংলাদেশে প্রায় ৫০ হাজার হেক্টর জমিতে এর চাষ হয় এবং এ থেকে উৎপাদন হয় প্রায় ৫৯ হাজার মে. টন। সবুজ ফল তরকারি হিসেবে খাওয়া যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক এ পর্যন্ত ফেলনের একাধিক জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

ফেলনের জাত

বারি ফেলন-১ (বোস্তামী)

চট্টগ্রাম এলাকার জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই করে প্রাথমিক, অগ্রবর্তী এবং বহুস্থানিক ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। পরে দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে আবাদের জন্য ১৯৯৩ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। গাছের ডগা ও পাতা হালকা সবুজ। গাছ সাধারনত খাড়া থাকে তবে মাটির উর্বতা বেশি হলে লাতানো হয়ে যায়। শাখা প্রশাখা গুলো বেশ মোটা ও শক্ত। প্রতি গাছে ১০-২০টি শুটি ধরে এবং প্রতিটি শুটিতে ১২-১৬টি বীজ থাকে। বীজের উপরের আবরণ ছাই রং এর। গাছের উচ্চতা ৪০-৭০ সেমি। গোড়া পচা ও পাতার দাগ রোগ সহনশীল। জীবন কাল ১২৫-১৩০ দিন। ১০০০ বীজের ওজন ৯০-১০০ গ্রাম। বীজ ও খোসার অনুপাত ৩ ঃ ১। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ১৬০০-১৭০০ কেজি।

বারি ফেলন-১ (বোস্তামী)

বারি ফেলন-২

আন্তর্জাতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান আইআইটিএ (IITA) হতে ফেলন শস্যের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহকৃত জাতগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা, রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ,শস্য পাকার সময়কাল ইত্যাদি মূল্যায়ন করা হয়। জাত উদ্ভাবনের ধারাবাহিক এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ফেলনের উন্নত জাতটি আইআইটিএ (IITA) থেকে সংগৃহীত লাইন থেকে পর্যায়ক্রমিক নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে (Station No. HAF-14)। পরবর্তীতে দেশের বিভিন্নস্থানে প্রাথমিক, অগ্রবর্তী এবং বহুস্থানিক ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে এই জাতটিকে উচ্চ ফলনশীল জাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। ১৯৯৬ সালে জতীয় বীজ বোর্ড এই জাতটিকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদের জন্য ‘বারি ফেলন-২’ নামে অনুমোদন দেয়।

বারি ফেলন-২

গাছের ডগা ও পাতা সবুজ। গাছ সাধারনত খাড়া থাকে তবে মাটির উর্বতা বেশি হলে লাতানো হয়ে যায়। শাখা প্রশাখা গুলো বেশ মোটা ও শক্ত। প্রতি গাছে ১০-২০টি শুটি ধরে এবং প্রতিটি শুটিতে ১২-১৬টি বীজ থাকে। বীজের উপরের আবরণ ছাই রঙের। গাছের উচ্চতা ৪০-৭০ সেমি। গোড়া পচা ও পাতার দাগ রোগ সহনশীল। জীবন কাল ১২০-১৩০ দিন। ১০০০ বীজের ওজন ১০০-১২০ গ্রাম। বীজ ও খোসার অনুপাত ৩ ঃ ১। গড় ফলন হেক্টরপ্রতি ১৫০০ কেজি। আমিষের পরিমাই (%)- ২৩.১।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটিতে ফেলনের চাষ করা যায়। জমি উঁচু ও মাঝারী উঁচু এবং সুনিষ্কাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জমি তৈরি: ২-৩ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি ঝুরঝুরা করতে হবে।

বপন পদ্ধতি: বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে বপন করা হয়। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছ ১০ সেমি রাখতে হবে।

বপনের সময়: নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে মধ্য-ডিসেম্বর পর্যন্ত।

বীজের হার: ৪০-৫০কেজি/হেক্টর।

সারের পরিমাণ: জমিতে নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৩০-৪০ কেজি
টিএসপি	৮০-৯০ কেজি
এমপি	৪০-৪৫ কেজি
অণুজীব সার	৫০/প্রতি কেজি বীজের জন্য

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: শেষ চাষের সময় সমুদয় সার ব্যবহার করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে একবার আগাছা দমন করা প্রয়োজন। সাধারণত ফেলনের জমিতে সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে গাছে শিম আসার সময় একটি হালকা সেচ দিতে পারলে ভালো ফলন হয়। কিন্তু এসময় বৃষ্টি হলে সেচের প্রয়োজন নাই।

ফসল সংগ্রহ: চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ হতে বৈশাখ মাসের শুরু (এপ্রিলের প্রথম হতে দ্বিতীয় সপ্তাহ)।

অন্যান্য পরিচর্যা

ফিউজিরিয়াম উইল্ট রোগ দমন

ফিউজেরিয়াম অক্সিসপোরাম নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। সাধারণত মাটির তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে ও যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা থাকলে এ রোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। চারা অবস্থায় এ রোগে আক্রান্ত গাছ মারা যায় এবং পাতার রঙের কোন পরিবর্তন হয় না। আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায়, ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে এবং টান দিলে সহজেই উঠে আসে। লম্বালম্বিভাবে কাটলে কাণ্ডের মাঝখানের অংশ কালো দেখা যায়। ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত জমিতে পরবর্তী বৎসর ফেলন না বুনে দুই বা তিন বৎসরের জন্য শস্য পর্যায় অনুসরণ করা প্রয়োজন।

প্রতিকার

- বীজ শোধক ঔষধ দিয়ে বীজ শোধন করলে ফেলনের উইল্ট রোগ দমন করা যায়, প্রোভেক্স ২০০ ডব্লিউ পি প্রতি কেজি বীজের জন্য ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।
- মাঠে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে কার্বেন্ডাজিম (অটোস্টিন ডি এফ অথবা নোইন) + প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউ পি) ১ গ্রাম হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকালে গাছের গোড়ায় ভালভাবে স্প্রে করতে হবে।
- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- পর্যাপ্ত পরিমাণে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে।

হলুদ মোজাইক

চারা অবস্থা থেকে শুরু করে পূর্ণ বয়স্ক গাছ পর্যন্ত ফসলের যেকোন অবস্থায়ই এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। তবে আক্রমণ যত কম বয়সে হয় ক্ষতির পরিমাণ তত বেশি হয়। এই রোগের আক্রমণকারী ভাইরাস সাদা মাছি (White Fly) দ্বারা বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণঃ আক্রান্ত পাতার উপর চমকা ও গাঢ় সবুজ এবং হলুদ রঙের মিশ্রণ যুক্ত নানা বর্ণের বিন্যাস এ রোগের প্রধান লক্ষণ। জাত ভেদে এ রোগের লক্ষণের কিছুটা তারতম্য হলেও এরূপ হলুদ হয়ে যাওয়া সর্বাবস্থায় দেখা যায়। আক্রান্ত গাছ খর্বাকৃতির হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পাতা ফুল ও ফল কুঁকড়ে যায় এবং ফলের আকার ছোট হয়। বীজ অপুষ্ট ও কুঁকড়ানো হয়। প্রতিটি ফলে বীজের সংখ্যা হ্রাস পায়। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত গাছে ফুল ফল মোটেই ধরে না বা খুবই কম ধরে থাকে।

ব্যবস্থাপনাঃ এ রোগটির ব্যবস্থাপনা খুবই কষ্টসাধ্য। এপর্যন্ত বাংলাদেশে এই রোগের সম্পূর্ণ প্রতিরোধী কোন জাতের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তবে ফসলের প্রাথমিক পর্যায়ে হলুদ মোজাইক আক্রান্ত গাছ মাঠে দেখার সাথে সাথে উপড়ে ফেলে দিতে হবে। তাছাড়া রোগ বিস্তারকারী সাদা মাছি কীটনাশকের মাধ্যমে দমন করেও রোগ বিস্তার রোধ করা যায়।

মটর

মটর ডালে ১০-১২% প্রোটিন, ১৫-২০% কার্বোহাইড্রেট, ০.৫-২% চিনি, ০.৬-১.৫% চর্বি এবং ২-৩% খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। এটি স্বল্পমেয়াদী হওয়ায় প্রচলিত শস্য বিন্যাসে সহজেই চাষ করা যায়। এছাড়া মটর সবুজ সার হিসেবে মাটিতে নাইট্রোজেন ও জৈব পদার্থ সংযোগ করে মাটির উর্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার গবেষণা প্রতিবেদনে দেখা গেছে মটর প্রতি বছর হেক্টরপ্রতি প্রায় ৬০-৬৫ কেজি নাইট্রোজেন অথবা ১৩০-১৪০ কেজি ইউরিয়া সার মাটিতে যোগ করে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি মটর-১, বারি মটর-২ ও বারি মটর-৩ মানে উৎকৃষ্ট ও খেতে সু-স্বাদু। তাছাড়া মটর গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির পর্যায়ের ডগা উৎকৃষ্ট শাক এবং সবুজ মটর উৎকৃষ্ট ও দামী সবজি হিসেবে খুবই জনপ্রিয়।

মটরের ফসল

বারি মটর-১

জাতটি আঞ্চলিক ডাল গবেষণা কেন্দ্র, মাদারীপুর কর্তৃক ২০১৩ সালে উদ্ভাবিত হয়েছে। জাতটির বৈশিষ্ট্য কাণ্ড সবুজ ও গোলাকার, পাতার রং সবুজ, গাছ ১০০ সেমি লম্বা হয়, গাছের বড় পত্র ফলক ও টেন্ড্রিল বিদ্যমান, ফুল সাদা, ফলের রং কাঁচা অবস্থায় সবুজ এবং পাতা অবস্থায় ধূসর, বীজের রঙ সবুজ, জীবনকাল ৯৫-১০০ দিন, ১০০০ বীজের ওজন ৭৮.৩৩ গ্রাম। ফলন হেক্টরপ্রতি ১২০০-১৫০০ কেজি।

বারি মটর-১

বারি মটর-২

ডাল গবেষণা কেন্দ্রের সংগৃহীত জার্মপ্লাজম হতে সংগ্রহ করে ACIAR প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১০ সাল হতে মূল্যায়ন করা হয়। আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী পতিত জমিকে চাষাবাদের আওতায় আনা এবং ডাল ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে অনেকগুলো স্বল্প জীবনকালীন লাইন বিভিন্ন অঞ্চলে মূল্যায়ন করা হয়। তন্মধ্যে এটি স্বল্পকালীন এবং রোগ প্রতিরোধী লাইন যা ২০১৪ সালে বাংলাদেশের যশোর ও পাবনা অঞ্চলে ফলন ও অভিযোজন ক্ষমতা, রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় সংবেদনশীলতা এবং গুণগত মান পরীক্ষার পর জাত হিসাবে চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করা হয় এবং ২০১৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়।

বারি মটর-২

জাতের বৈশিষ্ট্য

- পাতা ও কাণ্ড হালকা সবুজ ও পাতায় হালকা ট্রেন্ড্রিলযুক্ত।
- ফুলের রং বেগুনী ।
- গাছের গোড়ায় খয়েরী পিগমেন্ট বিদ্যমান।
- বীজ গোলাকার ও ধূসর বর্ণের
- জাতটি স্বল্পকালীন হওয়ায় পাউডারি মিলডিউ ও রাস্ট রোগ এড়াতে সক্ষম।
- প্রতি পডে ৫-৭টি বীজ বিদ্যমান।
- শুটি হিসেবে জীবন কাল ৫০-৫৫ দিন।
- ১০০০টি বীজের ওজন ২৪০-২৭০ গ্রাম।
- ফলন (কাচা অবস্থায়) ৪২০০-৪৫০০ কেজি/হেক্টর।
- ফলন (শুকনো অবস্থায়) ১২০০-১৪০০ কেজি/হেক্টর।

বারি মটর-৩

বারি মটর-৩

প্রস্তাবিত লাইনটি ডাল গবেষণা কেন্দ্রের সংগৃহীত জার্মপ্লাজম হতে সংগ্রহ করে ACIAR প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১০ সাল হতে পুণরায় মূল্যায়ন করা হয়। আমন ধান কাটার পর বা আমন ধানের জমিতে সাথী ফসল হিসাবে জমিকে চাষাবাদের আওতায় এনে মটরের উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে অনেকগুলো লাইন ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন অঞ্চলে সাথী ফসল হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়। তন্মধ্যে এটি উচ্চফলনশীল, কর্দমাক্ত জমিতে চাষোপযোগী (সাথী ফসল হিসেবে) এবং রোগ প্রতিরোধী লাইন হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এটি ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত সালে বাংলাদেশের যশোর, জামালপুর, ফরিদপুর ও পাবনা অঞ্চলে ফলন ও অভিযোজন ক্ষমতা, রোগ বালাই ও পোকা-মাকড় সংবেদনশীলতা এবং গুণগত মান মূল্যায়ন কর হয়। দীর্ঘদিন পরীক্ষার পর লাইনটি একটি সম্ভাবনাময় লাইন হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় জাত হিসেবে মুক্তায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয় এবং ২০১৭ সালে এটি বারি মটর-৩ হিসেবে অবমুক্ত করা হয়। মটরের সম্ভাবনাময় জাত হিসাবে এর মাধ্যমে দেশের একটি বিশাল পতিত জমি চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হবে এবং দেশের ডালের ঘাটতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারবে।

জাতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য:

- গাছ খাড়া প্রকৃতির ও লম্বা
- বীজ সবুজাভ সাদা বর্ণের ও তুলনামূলক বড়
- ফুলের রং সাদা
- চারা অবস্থায় গোড়া পচা রোগ সহনশীল
- পাউডারি মিলডিউ ও রাস্ট রোগ সহনশীল
- মধ্যম আকৃতির বীজ (১০০০ বীজের ওজন ৯৫-১০৫ গ্রাম)
- আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে খুবই উপযোগী
- জীবনকাল ১০১-১০৫ দিন
- ফলন
  - সবুজ ফলের ফলন ৫৬০০-৬০০০ কেজি/হেক্টর
  - বীজের ফলন ২০১০-২২৯০কেজি/হেক্টর

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু: প্রায় সব ধরনের মাটিতেই মটর চাষ করা যায়। তবে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটিতে ভালো হয়। মাটির পিএইচ সাধারণত ৬.০-৭.৫ হলে চাষের জন্য ভালো। এটি চাষে ১৩-১৮° সে. তাপমাত্রা প্রয়োজন। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৬০০-১০০০ মি.মি.হলে ভালো হয়। অতিবৃষ্টি মটরের জন্য ক্ষতিকর।

ফসল বিন্যাস: আউশ/পাট-পতিত-মটর ও রোপা আমন-মটর-মুগ-রোপা আউশ

বপনের সময়: রিলে ফসলের ক্ষেত্রে আমন ধান কাটার ১০-১৫ দিন পূর্বে মাটির রস্ থাকা অবস্থায় বীজ বপন করতে হবে। কার্তিক মাসের মধ্যে দুই সপ্তাহ মটরের বীজ বপন করা উত্তম।

জমি চাষ: একক ফসল হিসেবে আবাদের ক্ষেত্রে ২-৩ টি চাষ ও মই দিতে হবে।

বীজ প্রাইমিং ও বীজ হার : জমিতে আর্দ্রতা কম থাকলে বীজকে ৮-১০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে বীজের গায়ের পানি শুকিয়ে বীজ বপন করলে সহজেই বীজ অঙ্কুরিত হয়।

বীজেরপরিমাণ: জাতভেদে বীজের আকার আকৃতি এবং বপন পদ্ধতির উপর বীজের পরিমাণ নির্ভর করে

জাতেরনাম	বপনপদ্ধতি	বীজের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
বারি মটর-১	চাষ করে	৬৫-৭০
	আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসাবে	৭০-৭৫
বারি মটর-২	চাষ করে	২২৫-২৩০
বারি মটর-৩	চাষ করে	৮০-৯০
	আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসাবে	৯০-১০০

এখানে উল্লেখ্য যে, বারি মটর-২ বড় দানার হওয়ায় সাথী ফসল হিসাবে চাষের উপযোগিতা নেই।

বীজ শোধন: বীজ বপনের পূর্বে বীজ শোধন করলে মাটি ও বীজ বাহিত অনেক জীবাণুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়া যায়। মাটি ও বীজ বাহিত অনেক জীবাণুর সংক্রমণ হতে রক্ষার জন্য মটর বীজ বপনের পূর্বে অবশ্যই প্রোভেক্স ২০০ ডব্লিউ পি (কার্বোক্সিন+থিরাম) ২.৫-৩.০ গ্রাম প্রতি কেজি বীজে মিশিয়ে শোধন করতে হবে।

বপন পদ্ধতি: সারিতে ও ছিটিয়ে বপন করা যায়। সারিতে বপন করতে হলে রিলে ফসল হিসাবে চাষ করা যাবে না। রিলে ফসল হিসেবে ছিটিয়ে বপন করতে হয়। তবে পর্যাপ্ত রস থাকতে হবে। সারিতে বপন করতে হলে জমি তৈরির পরে ৪০ সেমি দূরত্বে সারি করে ৫-৬ সেমি পরপর বীজ বপন করতে হবে। তবে সারতে মটর-২ এর ক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ সেমি।

সারের পরিমাণ : জমি উর্বর হলে সারের পরিমাণ কম লাগবে। কিন্তু অনুর্বর এবং অধিক ফলন পেতে হলে হেক্টরপ্রতি নিম্ন হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর (কেজি)	সারের পরিমাণ/বিঘা (কেজি)
ইউরিয়া	৩০-৪০	৫-৬
টিএসপি	৮০-৯০	১১-১৩
এমপি	৪০-৪৫	৫-৬
জিপসাম (প্রয়োজনবোধে)	৫০-৫৫	৭-৮
বোরন (প্রয়োজনবোধে)	৭-১০	১-১.৫
অণুজীব সার	সুপারিশমতো	সুপারিশমতো

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: মটর চাষ করতে তেমন সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে বপনের পূর্বে পর্যাপ্ত রস না থাকলে অঙ্কুরোদগম নিশ্চিত করতে হালকা সেচ দিতে হবে। মটর চাষে তেমন আগাছা পরিষ্কার করা লাগে না। চাষ দিয়ে বপন করতে ২০-২৫ দিন পরে একটা নিড়ানী দিলে পরে আর আগাছা দমন করা প্রয়োজন হয় না।

ফসল সংগ্রহ ও কর্তন: সবজি হিসাবে সবুজ ফল ৬০-৭০ দিনের মধ্যেই (বারি মটর-২) এবং বারি মটর-৩ এর ক্ষেত্রে ৮০-৯৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়। ডাল হিসেবে সংগ্রহ করতে চাইলে পরিপক্ক অবস্থায় (জাত ভেদে) যখন শতকরা ৮০ ভাগ গাছ শুকনো খড়ের মত রং ধারণ করে তখন গাছসহ কেটে সংগ্রহ করতে হবে। সব ফল পেকে যাওয়ার আগেই কাটতে হবে, তা না হলে ফল ফেটে বীজ ঝরে যাবে। সকালের দিকে ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় কারণ এই সময় কুয়াশা দ্বারা ফল ভিজে নরম হয়, যার ফলে ফল ফেটে বীজ ঝরে পড়ার সম্ভাবনা কম থাকে।

মাড়াই, ঝাড়াই ও সংরক্ষণ: ফসল সংগ্রহ করার পর রৌদ্রে শুকিয়ে বীজ ৮-৯% আর্দ্রতায় (যাতে দাঁত দিয়ে কাটলে কট্ কট্ শব্দ হয়) বায়ু নিরোধ পাত্রে গুদামজাত করতে হবে। দেশি পদ্ধতিতে মাটির পাত্রে, টিনে বা ড্রামে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে বাতাস/কীট-পতঙ্গ ঢুকতে না পারে। পলিথিন/পলিথিনযুক্ত বস্তায়ও বীজ সংরক্ষণ করা যায়। তবে সব ক্ষেত্রেই বীজের পাত্র/বস্তা মেঝে থেকে উঁচুতে রাখতে হবে। বেশি পরিমাণ বীজ গুদামজাত করতে হলে প্রতি ১০০ কেজি বীজের জন্য ২ টি ফসটক্সিন ট্যাবলেট ব্যবহার করে ডালের শুঁসড়ী পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

রোগ ও পোকা ব্যবস্থাপনা

পাউডারী মিলডিউ

Erysiphe polygoni নামক ছত্রাক দ্বারা এই রোগ সৃষ্টি হয়। এ রোগের আক্রমণ হলে পাতায় সাদা পাউডারের মত ছোট ছোট দাগ দেখা যায়। ধীরে ধীরে এ দাগ কাণ্ড, ফুল ও ফলে বিস্তার লাভ করে। রোগের আক্রমণ বেশি হলে সমস্ত গাছ আক্রান্ত হয় ও মারা যায়।

রোগের প্রতিকার :

- সালফার জাতীয় বালাইনাশক থিওভিট ৮০ ডব্লিউ পি অথবা কমুলাস ডি এফ জাতীয় ঔষুধ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে এ রোগের আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

মরিচা রোগ (Rust)

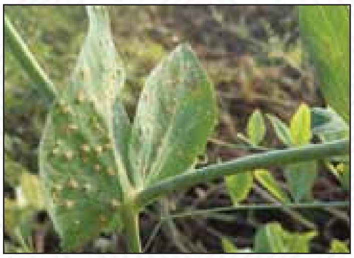

Uromyces fabae নামক ছত্রাকের আক্রমণে মরিচা রোগ হয়ে থাকে। পাতার নিচের দিকে, কাণ্ডে ও ফলের উপর মরিচা রঙের ছোট ছোট দাগ দেখা যায় এবং ফল পাকার পুর্বেই গাছ শুকিয়ে খড়ের মত রং ধারণ করে। উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা, কুয়াশাচ্ছন্ন বা মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া এবং রাতের তাপমাত্রা ২০-২২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলে এ রোগ সহজেই বিস্তার লাভ করে।

রোগের প্রতিকার : আক্রান্ত জমিতে প্রোপিকোনাজোল (টিল্ট ২৫০ইসি) অথবা হেক্সাকোনাজোল (ফলিকুর ২৫০ ইসি বা কনটাফ ৫ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি মিশেয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ টি স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়

বিছাপোকা

বিছাপোকার ছোট কীড়াগুলো প্রাথমিক অবস্থায় পাতার উল্টোপাশে গাদাগাদি করে অবস্থান করে ডিম পাড়ে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ঝাঝরা করে ফেলে, এতে করে পাতা জালের মত হয়ে শুকিয়ে যায়। কীড়াযুক্ত পাতা সংগ্রহ করে কীড়া ধ্বংস করতে হবে এবং প্রয়োজনে সাইপারমেথ্রিন জাতীয় কীটনাশক (যেমন- রিপকর্ড ১০ ইসি বা অন্য নামের) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি লিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

বিছাপোকা পোকা আক্রান্ত মটরের পাতা

গুদামজাত ডালের পরিচর্যা: পূর্ণবয়স্ক পোকা ও কীড়া উভয়ই গুদামজাত ডালের ক্ষতি করে। এ পোকার কীড়া ডালের দানার খোসা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খেতে থাকে। ফলে দানা হাল্কা হয়ে যায়। এতে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা নষ্ট হয় এবং খাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

- গুদামজাতকরণের পূর্বে দানা ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- ডালের দানা শুকিয়ে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমিয়ে ৮-৯% এর নিচে আনতে হবে।

- বীজের জন্য টন প্রতি ৩০০ গ্রাম ম্যালাথিয়ন বা সেভিন ১০% গুড়া মিশিয়ে পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।
- ফসটক্সিন ট্যাবলেট ২টি বড়ি প্রতি ১০০ কেজি গুদামজাত ডালে ব্যবহার করতে হবে। এ বড়ি আবদ্ধ পরিবেশে ব্যবহার করতে হবে।

ডাল সংরক্ষণ:

(ক) সংরক্ষণের জন্য ডাল শুকানোর পদ্ধতি

১। ডালবীজ সব সময়ই পরিষ্কার ও শক্ত খোলায় অথবা প্লাষ্টিকের শিটে পাতলা করে ছড়িয়ে দিয়ে শুকাতে হবে।
২। কোন সময় বৃষ্টি হলে বীজ পুণরায় শুকিয়ে নিতে হবে।
৩। সংরক্ষণের জন্য আর্দ্রতা কমিয়ে ৮-৯% এ আনতে হবে।
৪। শুকানো ডাল দাঁতের নিচে রেখে কামড় দিলে যদি 'কট' শব্দ হয় তবেই বুঝা যাবে বীজ সংরণ করার উপযোগী হয়েছে।

(খ) সংরক্ষণ পাত্রে ডাল ভরা ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি

১। শুকানো ডাল বীজ সংরক্ষণ পাত্রে ভরে ভালভাবে মুখ বন্ধ করতে হবে।
২। শুকানোর পর ডাল বীজ ঠাণ্ডা করে তারপর সংরক্ষণ পাত্রে ভরতে হবে।
৩। উন্নত মাটির বা টিনের পাত্রের মুখ তুষ মিশ্রিত কাদা মাটি দিয়ে ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে যাতে পোকা বা আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।
৪। সংরক্ষণ পাত্র ঠাণ্ডা জায়গায় ইট, কাঠ বা মাচার উপরে রাখতে হবে।
৫। সংরক্ষণ পাত্রের চার পাশে সব সময় পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে পোকা ও ইঁদুরের আক্রমণ না হয়।
৬। যদি কোন কারণে পাত্র ভেঙ্গে অথবা ফেটে যায় তবে ডাল বীজ আবার শুকিয়ে অন্য পাত্রে একই নিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে।

পলিথিনযুক্ত ছালার বস্তা ব্যবহার: ডাল বীজ সংরক্ষণে পলিথিনযুক্ত ছালার বস্তা খুবই উপযোগী। পুরু পলিথিন ব্যাগ পাটের বস্তার ভিতরে ভরে এ ধরনের বস্তা তৈরি করা হয়। বস্তার মধ্যে ডাল বীজ ভরে প্রথমে পলিথিনের মুখটি মুড়িয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরে ছালার ব্যাগের মুখ রশি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। বস্তার ভিতরে পলিথিন থাকায় বাইরের বাতাস বা আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এতে বীজ সংরক্ষণকালে দ্বিতীয়বার শুকানোর প্রয়োজন হয় না। প্রতি ১০০ কেজি ডাল বীজের জন্য একটি বস্তার খরচ পড়ে মাত্র ১০০-১৫০ টাকা। এ ধরনের ছালার বস্তা ২-৩ বৎসর ব্যবহার করা যায়। প্রয়োজনে বস্তার ভিতরের পলিথিন ব্যাগ পরিবর্তন করে তা পুণরায় ব্যবহার করা যায়।

পলিথিনযুক্ত মাটির পাত্র ব্যবহার: উন্নত পাত্রের ভিতরে পুরু পলিথিন ব্যাগ প্রবেশ করিয়ে ডাল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। ডাল ফসলের বীজ পলিথিন ব্যাগের মধ্যে রেখে পলিথিনের মুখ মোমবাতির শিখায় পুড়িয়ে সীল করে দেওয়া হয়। পরে পাত্রের মুখ তুষ মিশ্রিত কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। পাত্রের ভিতরে পলিথিন থাকায় বাইরের বাতাস বা আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এ ধরনের পাত্রে ডাল বীজ এক বৎসর পর্যন্ত ভালো থাকে। সংরক্ষণকালে দ্বিতীয়বার শুকানোর প্রয়োজন পড়ে না। প্রতি ৪০ কেজি ডাল বীজের জন্য সংরক্ষণ খরচ পড়ে মাত্র ৩৫-৪০ টাকা। এ ধরনের পাত্র ৩-৪ বৎসর ব্যবহার করা যায়। শুধু প্রয়োজনে পলিথিন ব্যাগটি পরিবর্তন করতে হয়।

টিনের উন্নত পাত্র ব্যবহার: সাধারণত এমএস শিট দ্বারা এ ধরনের পাত্র তৈরি করা হয়। পাত্রের মুখ বন্ধ করার জন্য গোলাকার ঢাকনার চারদিকে সিল করার ব্যবস্থা থাকে। ফলে সিলিং পদার্থ বা তুষ মিশ্রিত কাদামাটি দিয়ে বন্ধ করলে বাইরের বাতাস বা আর্দ্রতা ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। এ ধরনের পাত্রে ডাল এক বৎসরেরও বেশি সময় ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণের জন্য এ ধরনের পাত্রের খরচ পড়ে ১৫০-১৬০ টাকা। এ পাত্র ১০-১২ বৎসর পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়।

বিভিন্ন প্রকার গুদামজাতকরণ সরঞ্জামাদি:

পলিথিনযুক্ত ছালার বস্তা

পলিথিনযুক্ত বস্তা

টিনের ড্রাম

প্লাষ্টিকের ড্রাম

তেল ফসল

- সরিষা
- তিল
- চীনাবাদাম
- সূর্যমুখী
- সয়াবিন
- গর্জন তিল
- তিসি

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনে তেল ফসল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবাদি তেল ফসলসমূহ হচ্ছে সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, সূর্যমুখী, সয়াবিন, কুসুম ফুল, গর্জন তিল ও তিসি। প্রায় ৪.৮৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে এসব ফসলের চাষ হয় এবং প্রায় ৬.৬১ লক্ষ মে. টন ভোজ্য তেল উৎপাদিত হয়। এ উৎপাদন দেশের প্রয়োজনের তুলনায় মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। ফলে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ টাকার তেল ও তেলবীজ আমদানি করা হয়। তেলের ঘাটতি পূরণের জন্য দেশে তেল ফসলের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি করা একান্ত প্রয়োজন।

এযাবৎ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে দেশে চাষোপযোগী সরিষার ১৮টি, তিলের ৪টি, চীনাবাদামের ১০টি, তিসির ১টি, সূর্যমুখীর ৩টি, গর্জন তিলের ১টি, কুসুম ফুলের ১টি ও সয়াবিনের ৬টি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। উফশী জাতসমূহ এবং চাষাবাদের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে তেল ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

সরিষা

সরিষা বাংলাদেশের প্রধান ভোজ্য তেল ফসল। বর্তমানে ২.৩৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে এর চাষ করা হয় এবং ২.০৩ লক্ষ টন তেল পাওয়া যায়। বিভিন্ন জাতের সরিষার বীজে ৪০-৪৪% তেল থাকে। খৈলে প্রায় ৪০% আমিষ থাকে। তাই খৈল গরু ও মহিষের জন্য খুব পুষ্টিকর খাদ্য। খৈল একটি উৎকৃষ্ট জৈব সার।

বাংলাদেশে সরিষার ফলন প্রতি হেক্টরে গড়ে ১১৩৬ কেজি। এ দেশে ২ প্রকার সরিষার চাষ হয়, যথা-টরি (পিঙ্গল ও শ্বেত) ও রাই।

বর্তমানে আবাদযোগ্য নেপাস সরিষার জাতও উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং তা আবাদ করা হচ্ছে।

বিভিন্ন প্রকার সরিষার দানা

সরিষার জাত

টরি-৭

'টরি-৭' জাতটি বাছাইয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়েছে। এ জাতের গাছের উচ্চতা ৬০-৭৫ সেমি। গাছ খাটো। ফুলের বোঁটা লম্বা থাকে বলে প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়িসমূহের উপরে অবস্থান করে। ফল বা সিলিকুয়া একটু মোটা।

ফল দুই কক্ষ বিশিষ্ট। বীজ গোলাকার ও পিঙ্গল বর্ণের। হাজার বীজের ওজন ২.৬-২.৭ গ্রাম। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৮-৪১%। বর্তমানে জাতটি রোগবালাই ও পোকামাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে কৃষক পর্যায়ে চাষাবাদে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

সরিষার জাত টরি-৭

ফসল বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ৭০-৮০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৯০০-১০০০ কেজি হয়।

সোনালী সরিষা (এসএস-৭৫)

'সোনালী সরিষা' বা এসএস-৭৫ জাতটি ল্যান্ড রেসেস থেকে নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৭৯ সালে অনুমোদন লাভ করে। গাছের উচ্চতা ৯০-১০০ সেমি এবং প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৬টি। গাছে ফলের সংখ্যা ৯০-১২০টি। ফলে ৪টি কক্ষ থাকে এবং প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ৩৫-৪৫টি। বীজের রং হলদে সোনালী। বীজ গোলাকার। হাজার বীজের ওজন ৩.৫-৪.৫ গ্রাম এবং বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%। গাছের কাণ্ড ও শিকড় শক্ত বলে অধিক সার ও সেচ প্রয়োগে গাছ নুয়ে পড়ে না। ফসল পাকতে ৯০-১০০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ১.৮-২.০ টন ফলন পাওয়া যায়। বর্তমানে জাতটি অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

সরিষার জাত সোনালী সরিষা

কল্যাণীয়া (টিএস-৭২)

'কল্যাণীয়া' বা টিএস-৭২ জাতটি সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৭৯ সালে অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ৭৫-৯০ সেমি। গাছে ৪-৬টি প্রাথমিক শাখা থাকে। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ১২০-১৫০টি। ফলে ২টি কক্ষ থাকে এবং প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ১৫-২০টি। বীজের রং পিঙ্গল বাদামী। পাতা বোঁটাহীন ও পুষ্পপত্রের গোড়ার অংশ কাণ্ডকে সম্পূর্ণ ঘিরে রাখে। বোঁটা লম্বা বলে প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ির উপর অবস্থান করে।

বীজ গোলাকার। হাজার বীজের ওজন ২.৫-৩.০ গ্রাম। বীজে তেলের পরিমাণ ৪০-৪২%। ফসল পাকতে ৮৫-৯০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ১.৪৫-১.৬৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

সরিষার জাত কল্যাণীয়া

দৌলত (আর এস-৮১)

সংগৃহীত জার্মপ্লাজম হতে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'দৌলত' (আর এস-৮১) উদ্ভাবিত হয় এবং ১৯৮৮ সালে অনুমোদন লাভ করে। এটি রাই জাতীয় সরিষা। গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি। গাছে ৪-৮টি শাখা থাকে। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ১১৫-১২৫টি। ফল কাণ্ডের সাথে লেগে থাকে। ফলে ২টি কক্ষ আছে। প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ১০-১৫টি। ফল থেকে বীজ ঝরে পড়ে না । বীজের রং লালচে বাদামী। হাজার বীজের ওজন ২.০-২.৫ গ্রাম।

বপন থেকে তোলা পর্যন্ত ৯০-১০৫ দিন সময় লাগে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১.১-১.৩ টন। দৌলত জাত খরা ও কিছুটা লবণাক্ততা সহনশীল। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৯-৪০%। জাতটি অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ সহনশীল।

সরিষার জাত দৌলত

রাই-৫

'রাই-৫' ল্যান্ড রেসেস থেকে বাছাইয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৭৬ সালে অনুমোদিত হয়।

নাবী ফসল হিসেবে 'রাই-৫' উপযোগী। গাছের উচ্চতা ১২০-১৩৫ সেমি। প্রতি গাছে ৪-৬টি প্রাথমিক শাখা থাকে। পাতা বোঁটাযুক্ত ও খসখসে। প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ির নিচে অবস্থান করে। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৯০-১২০টি। ফলে ২টি কক্ষ থাকে এবং প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ৮-১২টি। বীজের রং লালচে বাদামী। বীজ ছোট ও গোলাকার । হাজার বীজের ওজন ১.৭-১.৯ গ্রাম। ফসল পাকতে ৯০-১০০ দিন সময় লাগে। প্রতি হেক্টরে ১.০-১.১ টন ফলন পাওয়া যায়। জাতটি খরা ও কিছুটা লবণাক্ততা সহনশীল। বীজে তেলের পরিমাণ ৩৯-৪০%।

সরিষার জাত রাই-৫ (ইনসেটে দানা)

বারি সরিষা-৬ (ধলি)

'বারি সরিষা-৬' (ধলি) শ্বেত সরিষার একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। ল্যান্ড রেসেস থেকে বাছাইকরণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবিত হয় এবং ১৯৯৪ সালে অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ১০০-১১৭ সেমি এবং প্রতি গাছে প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৭টি। গাছে ফলের সংখ্যা ৯৫-১৩০টি। ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট এবং প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ২২-২৫টি। হাজার বীজের ওজন ৩-৪ গ্রাম। বীজের রং হলদে। কাণ্ড ও শিকড় শক্ত হওয়ায় গাছ হেলে পড়ে না। পরিপক্ক ফল ফেটে গিয়ে বীজ ঝরে পড়ে না। ফল ও ফলের ঠোঁট তুলনামূলকভাবে লম্বা। বারি সরিষা-৬ (ধলি) পাকতে ৯০-১০০ দিন সময় লাগে। পরিমাণমতো সার ও সেচ দিলে প্রতি হেক্টরে ১.৯-২.২ টন ফলন পাওয়া যায়। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৪-৪৫%।

বারি সরিষা-৬ (ধলি)

বারি সরিষা-৭ (ন্যাপাস-৩১৪২)

'বারি সরিষা-৭' জাতটি *ব্রাসিকা ক্যাম্পেস্ট্রিজ* ও *ব্রাসিকা ওলেরিশিয়া* প্রজাতিদ্বয়ের সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয় এবং ১৯৯৪সালে অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি। প্রতি গাছে প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৫টি। গাছের পাতা বোঁটাহীন ও তল মসৃণ। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৯০-১২৫টি। ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট এবং প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ২৫-৩০টি। ফুলের পাঁপড়ির রং সাদা। বীজের রং পিঙ্গল কালো । বীজ বড় ও গোলাকার। হাজার বীজের ওজন ৩.৪-৩.৬ গ্রাম। ফসল ৯০-৯৫ দিনে পাকে। পরিমাণমতো সার ও সেচ দিয়ে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ২.০-২.৫ টন ফলন পাওয়া যায়। বীজে তেলের পরিমাণ ৪২-৪৫%। জাতটি অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ এবং সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল।

বারি সরিষা-৭ জাতের ফসল

বারি সরিষা-৮ (ন্যাপাস-৮৫০৯)

'বারি সরিষা-৮' জাতটি সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। ছোট দিনের উপযোগী এ জাতটি ১৯৯৪ সালে অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ৯০-১১০ সেমি এবং প্রতি গাছে ৪-৫টি প্রাথমিক শাখা থাকে। পাতা বোঁটাহীন ও মসৃণ। পাতার গোড়া কাণ্ডকে অর্ধাবৃত করে রাখে।

ফুলের পাঁপড়ির রং হলদে। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৯০-১২৫টি, ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট। প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ২৫- ৩০টি। বীজের রং কালচে। হাজার বীজের ওজন ৩.৪-৩.৬ গ্রাম। ফসল পাকতে ৯০-৯৫ দিন সময় লাগে।

বারি সরিষা-৮ (ইনসেটে দানা)

পরিমাণমত সার ও সেচ দিয়ে আবাদ করলে প্রতি হেক্টরে ২.০-২.৫ টন ফলন পাওয়া যায়। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৫%। এ জাত অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ ও সাময়িক জলাবদ্ধতা সহনশীল।

বারি সরিষা-৯

সার্ক দেশসমূহের মধ্যে কারিগরি সহযোগিতার আওতায় ভারত থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০০০ সালে অনুমোদিত হয়। এটি ব্রাসিকা ক্যাম্পেস্ট্রিস প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। গাছের উচ্চতা ৮০-৯৫ সেমি এবং প্রতি গাছে ৪-৬টি প্রাথমিক শাখা থাকে। পাতা হালকা সবুজ রঙের এবং মসৃণ। পাতার বোঁটা কাণ্ডকে সম্পূর্ণ ঘিরে রাখে। প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ির উপরে থাকে। ফুলের রং হলুদ। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৮০-১০০টি। ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট। প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ১৫-২০টি। বীজের রং পিঙ্গল। হাজার বীজের ওজন ২.৫-৩.০ গ্রাম। বীজে তেলের পরিমাণ শতকরা ৪৩-৪৪ ভাগ। ফসল পাকতে ৮০-৮৫ দিন সময় লাগে। পরিমাণমতো সার ও সেচ দিলে প্রতি হেক্টরে ১.২৫-১.৪৫ টন ফলন পাওয়া যায়। এ জাতটি টরি-৭ এর চেয়ে শতকরা ১০-২৫ ভাগ বেশি ফলন দেয়। আমন ধান কাটার পর এবং বোরো ধান চাষের আগে স্বল্প মেয়াদী এ জাতটি সহজে চাষ করা সম্ভব।

বারি সরিষা-৯ (ইনসেটে দানা)

বারি সরিষা-১০

'বারি সরিষা-১০' দেশের ভেতর এবং বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের মধ্য বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি ২০০০ সালে অনুমোদন লাভ করে। এটি রাই জাতীয় সরিষা।

গাছের উচ্চতা ৯০-১০০ সেমি। প্রতি গাছে ৪-৬টি প্রাথমিক শাখা থাকে। শাখা থেকে প্রশাখা বের হয়। পাতা হালকা সবুজ রঙের। পাতা বোঁটাযুক্ত ও খসখসে। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ১০০-১২০টি। প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ১২-১৫টি। বীজের রং পিঙ্গল। হাজার বীজের ওজন ২.০-৩.০ গ্রাম। বীজে তেলের পরিমাণ শতকরা ৪২-৪৩ ভাগ। হেক্টরপ্রতি ফলন ১.২৫-১.৪৫ টন। আমন ধান কাটার পর এ জাতটি নাবি জাত হিসেবে চাষ করা হয়।

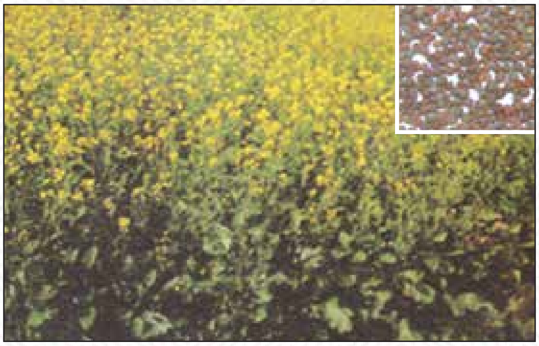
বারি সরিষা-১০ (ইনসেটে দানা)

বারি সরিষা-১১

বারি সরিষা-১১ এর ফসল

দেশের ভেতরে ও বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম হতে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবিত হয় এবং ২০০১ সালে অনুমোদন লাভ করে। এটি ব্রাসিকা জুনসিয়া প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। গাছের উচ্চতা ১২০-১৩০ সেমি। গাছে ৩-৫টি প্রাথমিক শাখা থাকে। পাতা বোঁটাযুক্ত ও খসখসে এবং সবুজ রঙের। শাখাগুলি মাটির একটু উপরে প্রধান কাণ্ড থেকে বের হয়। প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ির নিচে থাকে। ফুলের রং হলুদ। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৭৫-১৫০টি। ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট। প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ১২-১৫টি। বীজের রং পিঙ্গল। হাজার বীজের ওজন ৩.৫-৪.০ গ্রাম। বীজের ওজন অন্যান্য রাই সরিষার চেয়ে বেশি। ফসল ১০৫-১১০ দিনে পাকে। প্রতি হেক্টরে ২.০-২.৫ টন ফলন পাওয়া যায়। এ জাতটি দৌলতের চেয়ে ২০-২৫% বেশি ফলন দেয়। আমন ধান কাটার পর এ জাতটি নাবি জাত হিসেবে চাষ করা যায়। জাতটি খরা এবং লবণাক্ততা সহনশীল।

বারি সরিষা-১২ (ইনসেটে দানা)

বারি সরিষা-১২

এ জাতটি ক্রুসিফেরী পরিবারের ব্রাসিকা ক্যাম্পেস্ট্রিস প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাইনটি উন্নত হিসেবে বিবেচিত হয় এবং ২০০২ সালে অনুমোদন লাভ করে।

গাছের উচ্চতা ৬৫-৮০ সেমি। গাছ খাটো। গাছে ৫-৬টি প্রাথমিক শাখা থাকে। সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়িসমূহের উপরে অবস্থান করে। ফুলের পাঁপড়ির রং হলদে। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৭০-১০০টি। ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট। প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ১৫-২০টি। বীজের রং পিঙ্গল।

হাজার বীজের ওজন ২.৬-৩.২ গ্রাম। বীজে তেলের পরিমাণ ৪৩-৪৪%। ফসল ৮৫-৯০ দিনে পাকে। প্রতি হেক্টরে ১.৪৫-১.৬৫ টন ফলন পাওয়া যায়। এ জাতটি 'টরি-৭' জাতের চেয়ে ১৫-২০% বেশি ফলন দেয়।

বারি সরিষা-১৩

বারি সরিষা-১৩ এর ফসল

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট সুইডেনের উপসালা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী নেপাস প্রজাতির কয়েকটি লাইন উদ্ভাবন করে। ন্যাপ-১৯৮ লাইনটি আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় বারি সরিষা-৭ ও বারি সরিষা-৮ এর চেয়ে বেশি ফলনশীল হওয়ায় লাইনটি নির্বাচন করা হয়। ন্যাপ-১৯৮ লাইনটি ২০০৪ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক 'বারি সরিষা-১৩' নামে অনুমোদন লাভ করে।

গাছের উচ্চতা ৮০-১০০ সেমি। প্রতি গাছে ৫-৬টি প্রাথমিক শাখা থাকে। পাতা গাঢ় সবুজ রঙের মসৃণ ও লোমহীন। পাতা বোঁটাহীন এবং কাণ্ডকে অর্ধেক ঘিরে রাখে। মঞ্জুরীদণ্ডে সদ্য প্রস্ফুটিত ফুল কুঁড়ির নিচে অবস্থান করে। গাছে দীর্ঘ দিন যাবৎ ফুল ধরে। ফুলের পাঁপড়ির রং হলুদ।

প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৬৫-৭৫টি। ফল ২ কক্ষ বিশিষ্ট। প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ২৮-৩০টি। বীজের রং পিঙ্গল। হাজার বীজের ওজন ৩.৭-৩.৯ গ্রাম। বীজে তেলের পরিমাণ শতকরা ৪২-৪৩ ভাগ। হেক্টরপ্রতি ফলন ২.২০-২.৮০ টন। ফসল ৯০-৯৫ দিনে পাকে।

বারি সরিষা-১৪

'বারি সরিষা-১৪' ক্রুসিফেরী পরিবারের *ব্রাসিকা ক্যাম্পেস্ট্রিজ* প্রজাতির অন্তর্গত। তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্রের মাঠে ১৯৯৭ সালে টরি-৭ এর সাথে সোনালী সরিষার সংকরায়ণের মাধ্যমে লাইনটি উদ্ভাবন করা হয়। এ লাইনটি ২০০৬ সালে বারি সরিষা-১৪ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।

বারি সরিষা-১৪ এর ফসল

উচ্চতা ৭৫-৮৫ সেমি। পাতা হালকা সবুজ রঙের এবং মসৃণ। প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা ৮০-১০০টি। শুঁটি যদিও দেখতে চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট মনে হয় কিন্তু আসলে দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। প্রত্যেক শুটিতে বীজের সংখ্যা ২২-২৬টি। বীজের রং হলুদ বর্ণের। হাজার বীজের ওজন ৩.৫-৩.৮ গ্রাম। স্থিতিকাল ৭৫-৮০ দিন। ফলন হেক্টরে ১.৪-১.৬ টন। এ জাতটি টরি-৭ এর চেয়ে ২৫-৩০% বেশি ফলন দেয়। আমন ধান কাটার পর স্বল্পমেয়াদী জাত হিসেবে চাষ করে বোরো ধান রোপণ করা সম্ভব।

বারি সরিষা-১৫ এর ফসল

বারি সরিষা-১৫

'বারি সরিষা-১৫' ক্রুসিফেরী পরিবারের *ব্রাসিকা ক্যাম্পেস্ট্রিজ* প্রজাতির অন্তর্গত। ২০০২ সালে বগুড়ার কাহোলা থেকে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে এ লাইনটি ২০০৬ সালে বারি সরিষা-১৫ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

উচ্চতা ৯০-১০০ সেমি। প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা ৭০-৮০টি। শুঁটি দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট। প্রত্যেক শুঁটিতে বীজের সংখ্যা ২০-২২টি। শুঁটি বারি সরিষা-১৪ এর তুলনায় সরু ও লম্বা। বীজের রং হলুদ বর্ণের। হাজার বীজের ওজন ৩.২৫-৩.৫০ গ্রাম। স্থিতিকাল ৮০-৮৫ দিন। ফলন প্রতি হেক্টরে ১.৫৫-১.৬৫ টন। এ জাতটি 'টরি-৭' এর চেয়ে ৩০-৩৫% বেশি ফলন দেয়। আমন ধান কাটার পর স্বল্পমেয়াদী জাত হিসেবে চাষ করে বোরো ধান রোপণ করা সম্ভব।

বারি সরিষা-১৬

ইউরোপিয়ান কমিশনের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত তৃতীয় বিশ্বের 'উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা' প্রকল্পের আওতায় প্লান্ট রিসার্চ ইন্টারন্যাশনাল, দি নেদারল্যান্ড এর কারিগরি সহায়তায় ২০০১ সালে হেপ্লয়েড প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈলবীজ গবেষণা কেন্দ্র বিজেডিএইচ-১৮ লাইনটি উদ্ভাবন করে। উক্ত লাইনটি ব্রাসিকা জুনসিয়া প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। লাইনটি উদ্ভাবনের পর তৈলবীজ গবেষণা মাঠে আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষা এবং কৃষকের মাঠে ভাল ফলাফল প্রদর্শন করে। উক্ত লাইনটি ২০০৯ সালে 'বারি সরিষা-১৬' জাত হিসেবে অবমুক্ত হয়েছে।

বারি সরিষা-১৬ এর ফসল

উচ্চতা ১৭৫-১৯৫ সেমি। প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা ১৮০-২০০টি। শুঁটি দুই কক্ষ বিশিষ্ট। প্রত্যেক শুঁটিতে বীজের

সংখ্যা ৯-১১টি। বীজের রং পিঙ্গল বর্ণের। হাজার বীজের ওজন ৪.৭-৪.৯ গ্রাম। স্থিতিকাল ১০৫-১১৫ দিন। ফলন (শস্যদানা) ২.০-২.৫ টন/হেক্টর। জ্বালানি ৩.০-৩.৫ টন/হেক্টর। আমন ধান কাটার পর বোরো ধান করে না এরূপ জমিতে এই জাতটি নাবি জাত হিসেবে চাষ করা যায়। এই জাতটি খরা এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু। এটি অলটারনেরিয়া রোগ ও অরোবাংকি পরজীবী সহনশীল।

বারি সরিষা-১৭

বারি সরিষা-১৭ এর ফসল

'বারি সরিষা-১৭' জাতটি ক্রুসিফেরী পরিবারের ব্রাসিকা বাপা প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত। বারি সরিষা-১৫ ও সোনালী সরিষা এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে লাইনটি উদ্ভাবন করা হয়। উদ্ভাবনের পর তৈলবীজ গবেষণা মাঠে, আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় এবং কৃষকের মাঠে প্রচলিত জাতের তুলনায় ভাল ফলাফল প্রদর্শন করে। উক্ত লাইনটি ২০১৩ সালে 'বারি সরিষা-১৭' জাত হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।

'বারি সরিষা-১৭' জাতটি স্বল্প মেয়াদী। স্থিতিকাল ৮২-৮৬ দিন। গাছের উচ্চতা ৯৫-৯৭ সেমি। গাছ সহজে ঢলে পড়ে না। প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা ৬০-৬৫ এবং প্রতি শুঁটিতে বীজের সংখ্যা ২৮-৩০। জাতটির ফুলের ও বীজের রং হলুদ। বীজের রং হলুদ হওয়ায় প্রচলিত বাদামী রঙের বীজের তুলনায় ৩-৪% তেল বেশি থাকে। হাজার বীজের ওজন ৩.০-৩.৪ গ্রাম। প্রতি হেক্টরে ফলন ১.৭-১.৮ টন। এ জাতটি 'বারি সরিষা-১৪' অপেক্ষা ৫-১০% বেশি ফলন দিয়ে থাকে। জাতটি স্বল্প মেয়াদী হওয়ায় রোপা আমন-সরিষা-বোরো ধান শস্য বিন্যাসের জন্য উপযুক্ত অর্থাৎ আমন ধান কর্তনের পর উক্ত জাতটি চাষ করে বোরো ধান চাষ করা সম্ভব।

বারি সরিষা-১৮ এর ফসল

বারি সরিষা-১৮ (ক্যানোলা টাইপ)

বারি সরিষা-১৮ ক্রুসিফেরী পরিবারের ব্রাসিকা ন্যাপাস প্রজাতির অন্তর্গত একটি সরিষার জাত। এ জাতটি বাংলাদেশে উদ্ভাবিত প্রথম "ক্যানোলা" বৈশিষ্ট্যের জাত। অস্ট্রেলিয়ার BN-1404 লাইন অধিকতর নির্বাচনের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতটি ২০১৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন করা হয়। এই জাতের সরিষার গাছের উচ্চতা ৮৮-১২৬ সেমি (অপেক্ষাকৃত খাটো)। বপন হতে কর্তণ পর্যন্ত সময়কাল ৯৫-১০০ দিন। সমগ্র বাংলাদেশে চাষ উপযোগী এ জাতের তেলে ইরুসিক এসিডের পরিমাণ ১.০৬%। যেখানে বর্তমানে বাংলাদেশে চাষকৃত অন্যান্য উন্নত সরিষার জাতে ইরুসিক এসিডের পরিমাণ ৩৫%-৪০%। পরিমাণ মত সার ও সেচ প্রয়োগে এ জাত ২.০-২.৫ টন/হেক্টর (৫০০-৬০০ কেজি/একর) পর্যন্ত ফলন দেয়। এ জাতে তেলের পরিমাণ ৪০%-৪২%। পুষ্টির গুণাগুণ বিবেচনায় বাণিজ্যিকভাবে সরিষা চাষের ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত এ জাত বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সরিষার উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: সরিষা বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে।

জমি তৈরি: জমির প্রকারভেদে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হবে। জমির চারপাশে নালার ব্যবস্থা করলে পরবর্তীকালে সেচ দিতে এবং পানি নিকাশে সুবিধা হয়।

বপন পদ্ধতি: সরিষা বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বোনা হয়। সারি করে বুনলে সার, সেচ ও নিড়ানী দিতে সুবিধা হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি রাখতে হবে। বপনের সময় জমিতে বীজের অঙ্কুরোদগমের উপযোগী রস থাকতে হবে।

বপনের সময়: বিভিন্ন অঞ্চলের তারতম্য এবং জমির 'জো' অবস্থা অনুসারে টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালী সরিষা, বারি সরিষা-৬, বারি সরিষা-৭, বারি সরিষা-৮, বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৭ ও বারি সরিষা-১৮ এর বীজ মধ্য-আশ্বিন থেকে কার্তিক মাস (অক্টোবর থেকে নভেম্বর) পর্যন্ত বোনা যায়। বারি সরিষা-১১, বারি সরিষা-১৬, রাই-৫ এবং দৌলত কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ (মধ্য-অক্টোবর থেকে নভেম্বর) মাস পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলের তারতম্য এবং জমির 'জো' অবস্থা অনুসারে বারি সরিষা-১১, বারি সরিষা-১৩ ও বারি সরিষা-১৬ জাতের বীজ কার্তিক মাসের ১ম সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর) বপনের উপযুক্ত সময়।

সারের পরিমাণ: জাত, মাটি ও মাটিতে রসের তারতম্য অনুসারে সার দিতে হয়। সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর) নিম্নরূপ:

সারের নাম	সোনালী সরিষা, বারি সরিষা-৬, ৭, ৮, ১১, ১২, ১৩ ও ১৬	টরি-৭, কল্যাণীয়া, রাই-৫, দৌলত বারি সরিষা-৯, ১৪, ১৫, ১৭ ও ১৮
ইউরিয়া	২৫০-৩০০	২০০-২৫০
টিএসপি	১৭০-১৮০	১৫০-১৭০
এমপি	৮৫-১০০	৭০-৮৫
জিপসাম	১৫০-১৮০	১২০-১৫০
জিংক সালফেট	৫-৭	৪-৫
বরিক এসিড (প্রয়োজনবোধে)	১০	১০
পচা গোবর	৮-১০ টন	৮-১০ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: ইউরিয়া সার অর্ধেক ও অন্যান্য সার বপনের আগে এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া গাছে ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হয়। সার উপরি প্রয়োগের সময় মাটিতে রস থাকা দরকার।

বীজের হার: টরি-৭, কল্যাণীয়া, সোনালী সরিষা, বারি সরিষা-৬, বারি সরিষা-৭, বারি সরিষা-৮, বারি সরিষা-১১, বারি সরিষা-১৩, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৬, বারি সরিষা-১৭ এবং বারি সরিষা-১৭ এর জন্য প্রতি হেক্টরে ৬-৭ কেজি বীজ লাগে। রাই ও দৌলত সরিষার জন্য প্রতি হেক্টরে ৭-৮ কেজি বীজের প্রয়োজন।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: বীজ বপনের ১০-১২ দিন পর এক বার এবং ফুল আসার আগে ২০-২৫ দিন দ্বিতীয় বার নিড়ানী দিতে হয়।

সেচ প্রয়োগ: সোনালী সরিষা, বারি সরিষা-৬, বারি সরিষা-৭, বারি সরিষা-৮, বারি সরিষা-৯, বারি সরিষা-১১, বারি সরিষা-১২, বারি সরিষা-১৩, বারি সরিষা-১৪, বারি সরিষা-১৫, বারি সরিষা-১৬ ও বারি সরিষা-১৭ উফশী জাতসমূহে পানি সেচ দিলে ফলন বেশি হয়। বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (গাছে ফুল আসার আগে) প্রথম সেচ এবং ৫০-৫৫ দিনের মধ্যে (ফল ধরার সময়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে। বপনের সময় মাটিতে রস কম থাকলে একটি হালকা সেচ দিতে হয়।

ফসল সংগ্রহ: টরি জাতীয় সরিষা ৭০-৯০ দিন এবং রাই জাতীয় সরিষা ৯০-১২০ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা যায়।

বীজ সংরক্ষণ: মাড়াই করার পর রোদে শুকানো বীজ গরম অবস্থায় সংরক্ষণ করলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই রোদে শুকানো বীজ ঠাণ্ডা করে প্লাস্টিকের পাত্রে, টিনে বা ড্রামে রেখে মুখ এমনভাবে বন্ধ করতে হবে যেন পাত্রের ভিতরে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে। সংরক্ষণের জন্য বীজ ভর্তি পাত্র মাটির সংস্পর্শে রাখা বাঞ্ছনীয়। বীজসহ পাত্র আর্দ্রতা কম এমন ঘরের শীতল স্থানে রাখলে ১ বছর এমনকি ২ বছর পর্যন্ত বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বজায় থাকে।

অন্যান্য পরিচর্যা

সরিষার পাতা ঝলসানো রোগ দমন

অলটারনেরিয়া ব্রাসিসি নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগের সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক অবস্থায় সরিষা গাছের নিচে বয়স্ক পাতায় এ রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালে এ ছত্রাকের আক্রমণে গাছের পাতা, কাণ্ড ও ফলে চক্রাকার কালচে দাগের সৃষ্টি হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে পাতা ঝলসে যায়। ফলে সরিষার ফলন খুব কমে যায়।

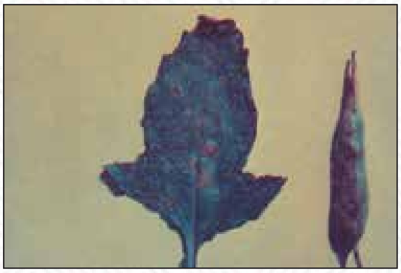

সরিষা পাতা ঝলসানো ও শুঁটি রোগের লক্ষণ

প্রতিকার

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন জাতের সরিষার চাষ করতে হবে।
- রোগমুক্ত বীজ বপন করতে হবে।
- বীজ বপনের পূর্বে প্রোভেক্স-২০০ ছত্রাকনাশক দিয়ে (২-৩ গ্রাম ছত্রাক নাশক/কেজি বীজ) বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- এ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল-৫০ ডব্লিউপি ০.২% হারে (প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম) পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

পরজীবী উদ্ভিদজনিত রোগ দমন

সরিষার পরজীবী উদ্ভিদের মধ্যে অরোবাংকিই প্রধান। সরিষা গাছের শিকড়ের সাথে এ পরজীবী উদ্ভিদ সংযোগ স্থাপন করে খাদ্য সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। এর ফলে পরজীবী আক্রান্ত সরিষার গাছ দুর্বল হয়, বৃদ্ধি কমে যায় এবং ফলন হ্রাস পায়। অরোবাংকি এক প্রকার সপুষ্পক পরজীবী উদ্ভিদ এবং এর বংশবৃদ্ধি সরিষা গাছের উপর নির্ভরশীল। অরোবাংকির বীজ মাটিতেই অবস্থান করে। মাটি, ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, সেচের পানি প্রভৃতির মাধ্যমে অরোবাংকির উৎপত্তি ও বিস্তার ঘটে। বারবার একই জমিতে সরিষা পরিবারের ফসল চাষ করলে এ পরজীবীর বিস্তার ঘটে।

পরজীবী উদ্ভিদ অরোবাংকি

প্রতিকার

- ফুল আসার পূর্বে পরজীবী উদ্ভিদ জমি হতে তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- পরিমিত হারে টিএসপি সার ব্যবহার করতে হবে।
- পূর্বে এ রোগ আক্রান্ত জমি গভীরভাবে চাষ করতে হবে।
- আগাছা নাশক যেমন ২, ৪-ডি ছিটিয়ে পরজীবী উদ্ভিদ দমন করতে হবে।

সরিষার কাণ্ড পচা রোগ দমন

এটি বীজ ও মাটি বাহিত রোগ। বাড়ন্ত গাছে ফুল ধরার সময় আক্রমণ বেশি দেখা যায়। আক্রমণের স্থলে সাদা তুলার মত মাইসেলিয়াম দেখা যায়। ফলে গাছ পচে মারা যায়। আক্রান্ত গাছের কাণ্ড চিরলে কালো রঙের স্কেলেরোশিয়া দেখা যায়। ঠাণ্ডা (১৫-১৮০ সে.) ও আর্দ্র (৮০-৯০%) আবহাওয়ায় এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে।

সরিষার কাণ্ড পচা রোগ

প্রতিকার

- বপনের পূর্বে প্রভেক্স ২০০ এর মাধ্যমে বীজ শোধন করতে হবে (২.৫ গ্রাম/কেজি বীজ)।
- রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে রোভরাল ২.০ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৩ বার (বৃদ্ধি পর্যায়ে, ফুল ও পড ধরার পর্যায়) প্রয়োগ করলে সরিষার কাণ্ড পচা রোগ দমন হয়।

সরিষার জাব পোকার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

জাব পোকা সরিষার পাতা, কাণ্ড, পুষ্পমঞ্জরী, ফুল ও ফল থেকে রস চুসে খায়। ফলে গাছ দুর্বল হয়ে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পাতা কুকড়ে যায়, ফুল ও ফল ধারণ বাঁধাগ্রস্ত হয়। আক্রান্ত ফল কুচকে ছোট হয়ে যায়। সাধারণত ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে গাছে ফুল ও ফল আসার সময় আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। এদের আক্রমণে শতকরা ৩০-৮০ ভাগ ফলন কমে যায়।

জাব পোকা আক্রমণের লক্ষণ

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- স্বাল্প মেয়াদী জাত (বারি সরিষা-৯, ১৪, ১৫ ও ১৭) নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে বপন করা।
- আক্রমণ দেখা মাত্র ৫০ গ্রাম নিম বীজ ভেঙ্গে ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে ২-৩ গ্রাম গুঁড়া সাবান মিশিয়ে ছেকে ৭ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে ম্যালথিয়ন ৫৭ ইসি ২ মিলি বা এডমায়ার ২০০ এম এল ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বিকাল ৩ টার পর ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটাতে হবে।

সাধারণ কাটুই পোকা

সাধারণ কাটুই পোকা বিগত কয়েক বছর ধরে সিরাজগঞ্জের চলনবিল এলাকায় এবং দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের জেলাসমূহে সরিষার ফসলে ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে প্রচুর ক্ষতিসাধন করছে। এ পোকা তেল, ডাল জাতীয় শস্য, সবজি ইত্যাদির চারা অবস্থায় গোড়া কেটে ও পাতা খেয়ে প্রচুর ক্ষতি করে।

ক্ষতির ধরন

এদের কীড়া সরিষার গাছের চারা অবস্থা থেকে শুরু করে পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত পাতা, কাণ্ড, ফুল ও ফল পেটুকের মতো খেয়ে মারাত্মক ক্ষতি করে। দিনে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে, রাত্রিতে লক্ষ লক্ষ কীড়া দলবদ্ধভাবে ফসলে আক্রমণ করে খেয়ে ক্ষতি করে। সাধারণত চারা অবস্থায় ও গাছের বৃদ্ধি পর্যায়ে এদের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। ডিসেম্বর-জানুয়ারি হতে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি থেকে শুরু করে পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত সরিষা গাছে আক্রমণ হয়ে থাকে।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- আলোর ফাঁদ দ্বারা মথ ধরে মারা যায়।
- প্রাথমিক অবস্থায় এ পোকার কীড়া দলবদ্ধভাবে একটি গাছের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকে। তখন হাত দ্বারা পাতাসহ কীড়া সংগ্রহ করে মেরে দমন করা যায়।
- আক্রান্ত ক্ষেতে বিঘাপ্রতি ৮/১০টি ডাল পুঁতে দিলে পোকাভোজী পাখি কীড়া খেয়ে পোকা দমন করতে পারে।
- আক্রমণ বেশি হলে রিপকার্ড- ১০ ইসি বা ডারসবান-২০ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ১০ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করে পোকা দমন করা যায়।
- ফসল বপনের পর ফাঁদ (Sex pheromone) ব্যবহার করলে প্রচুর সংখ্যক পুরুষ পোকা আকৃষ্ট হয়ে ফাঁদে পড়ে মরা যায়।

তিল

তিল বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম ভোজ্য তেল ফসল। বাংলাদেশে প্রায় ৩৩ হাজার হেক্টর জমিতে তিল চাষ হয় এবং মোট উৎপাদন প্রায় ২৯ হাজার মে. টন। বাংলাদেশে খরিফ এবং রবি উভয় মৌসুমেই তিলের চাষ করা হয়। তবে বর্তমানে দুই-তৃতীয়াংশ তিলের আবাদ খরিফ মৌসুমে হয়।

বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই তিলের চাষ হয়। আমাদের দেশে সাধারণত কালো ও খয়েরী রঙের বীজের তিলের চাষ বেশি হয়।

তিল ফসল

তিলের বীজে ৪২-৪৫% তেল এবং ২০% আমিষ থাকে। তিলের ফলন হেক্টরপ্রতি ৫০০-৬০০ কেজি। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করে তিলের ফলন প্রতি হেক্টরে ১২০০ কেজি পাওয়া সম্ভব।

তিলের জাত

টি-৬

স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে 'টি-৬' জাতটি ১৯৭৬ সালে উদ্ভাবন করা হয়। এ জাতটির গাছের উচ্চতা ৮৫-১০০ সেমি।

বীজ চেপ্টা, মাঝারী আকারের। হাজার বীজের ওজন ২.৫-২.৭ গ্রাম। বীজের রং কালো। খরিফ ও রবি উভয় মৌসুমে এ জাতটি চাষ করা যায়। তবে খরিফ মৌসুমে আবাদের জন্য জাতটি বেশি উপযোগী। ফসল বোনা থেকে কাটা পর্যন্ত ৮৫-৯০ দিন সময় লাগে। হেক্টরপ্রতি ফলন ৯৫০-১১০০ কেজি পাওয়া যায়। বর্তমানে জাতটি রোগবালাই ও পোকামাকড় দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। ফলে কৃষক পর্যায়ে জাতটি চাষাবাদে নিরুৎসাহিত করা হয়।

তিলের টি-৬ জাতের ফসল

বারি তিল-২

স্থানীয় এবং বিদেশ থেকে তিলের বিভিন্ন জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বারি তিল-২' জাতটি উদ্ভাবিত হয় এবং ২০০১ সালে অনুমোদিত হয়।

বারি তিল-২ এর ফসল (ইনসেটে দানা)

গাছের উচ্চতা ১০০-১২০ সেমি। পাতা হালকা সবুজ রঙের। নিচের পাতাগুলি অপেক্ষাকৃত চওড়া এবং ক্রমান্বয়ে উপরের পাতা সরু ও বর্শাকৃতির হয়। কাণ্ডের উপরিভাগের শাখা-প্রশাখার প্রতিটি পত্রকক্ষে একটি করে ঘণ্টাকৃতির ফুল ফোটে। ফুলের পাঁপড়ির রং গোলাপি।

প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৬০-৭০টি। প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ৬০-৭০টি। বীজের ত্বক কালচে রঙের। এ জাতটি আগাম বপনের (মাঘ/ফাল্গুন) জন্য উপযোগী। জাতটির জীবনকাল ৯০-১০০ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ১.২০-১.৩০ টন।

বারি তিল-৩

স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত তিলের বিভিন্ন জার্মপ্লাজমের মধ্য থেকে বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবিত হয়। এ জাতটি ২০০১ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি। কাণ্ড, শাখা ও প্রশাখা লোমহীন। পাতা গাঢ় সবুজ ও খসখসে। প্রতি গাছে ৩-৫টি প্রাথমিক শাখা থাকে। শাখাগুলি প্রধান কাণ্ডের একটু উপরে জন্মায়। প্রতিটি শাখায় ২-৩টি প্রশাখা জন্মায়। ফুলের রং হালকা গোলাপী।

প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ৬০-৬৫ টি। ফল ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ৫০-৫৫টি। বীজের ত্বক গাঢ় লালচে রঙের। ফসল বোনা থেকে কাটা পর্যন্ত ৯০-১০০ দিন সময় লাগে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১.২০-১.৪০ টন।

বারি তিল-৩ এর ফসল

বারি তিল-৪

বারি তিল-৪ এর ফসল

অভ্যন্তরীণভাবে সংগৃহীত তিলের জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার করে এ জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে। জাতটি ২০০৯ সালে অবমুক্ত হয়।

জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র খরিফ মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী। খরিফ মৌসুমে (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য-এপ্রিল) বপনের উপযুক্ত সময়। জাতটি বপন সময় থেকে পরিপক্ব হতে ৯০-৯৫ দিন সময় লাগে। গাছের উচ্চতা ৯০-১২০ সেমি। প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা ৮৫-৯০টি। অধিকাংশ শুঁটিই ৮ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট এবং প্রতি শুঁটিতে 'বারি তিল-২' ও 'বারি তিল-৩' এর তুলনায় ২০-৪০% বেশি বীজ থাকে। বীজের ত্বক গাঢ় লালচে বর্ণের। জাতটি পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ সহিষ্ণু। জাতটির হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৪-১.৫ টন যা 'বারি তিল-২' ও 'বারি তিল-৩' এর চেয়ে ৮-১০% বেশি।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: পানি জমে থাকে না এমন ধরনের মাটিতে তিলের চাষ করা যায়। উঁচু বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটি তিল চাষের জন্য বেশি উপযোগী।

জমি তৈরি: তিল চাষের জন্য মাটি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে ভালোভাবে ঝুরঝুরে করে নিতে হয়।

বপনের সময়: তিল খরিফ মৌসুমে চাষ করা যায়। খরিফ-১ মৌসুমে অর্থাৎ ফাল্গুন-চৈত্র মাসে (মধ্যে-ফেব্রুয়ারি হতে মধ্যে-এপ্রিল), খরিফ-২ মৌসুমে অর্থাৎ ভাদ্র মাসে (মধ্য-অগস্ট হতে মধ্য-সেপ্টেম্বর) তিলের বীজ বপনের উত্তম সময়।

বপন পদ্ধতি: তিলের বীজ সাধারণত ছিটিয়ে বপন করা হয়। তবে সারিতে বপন করলে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি ও গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫ সেমি রাখতে হবে।

বীজের হার: প্রতি হেক্টরে ৭.০-৮.০ কেজি।

সারের পরিমাণ: তিলের জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১০০-১২৫ কেজি
টিএসপি	১৩০-১৫০ কেজি
এমপি	৪০-৫০ কেজি
জিপসাম	১০০-১১০ কেজি
জিংক সালফেট (প্রয়োজনে)	০-৫ কেজি
বরিক এসিড (প্রয়োজনে)	৮-১০ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: ইউরিয়া সারের অর্ধেক ও বাকি সব সার জমি শেষ চাষের সময় ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ ও পানি নিষ্কাশন: জমিতে রসের অভাব হলে বীজ বোনার ২৫-৩০ সময় হালকা সেচ দিয়ে বীজ বপন করতে হয়। জমিতে রস না থাকলে ৫৫-৬০ দিন পর ফল ধরার সময় আর একবার সেচ দেওয়া যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ: তিল ফসল সংগ্রহ করতে ৮৫-৯০ দিন সময় লাগে।

অন্যান্য পরিচর্যা

তিলের পাতার দাগ রোগ দমন

সারকোস্পোরা সিসেমী নামক এক প্রকার ছত্রাকের কারণে তিলের এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে পাতায় ছোট, গোলাকার, বাদামী থেকে গাঢ় বাদামী রঙের দাগ পড়ে। দাগ বিভিন্ন আকারের হয় এবং ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে।

প্রতিকার

- এ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ১ গ্রাম হারে অটোস্টিন প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর জমিতে ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ফসলের চাষ করতে হবে।

তিলের কাণ্ড পচা রোগের লক্ষণ

তিলের কাণ্ড পচা রোগ দমন

তিল গাছ কাণ্ড পচা রোগে ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হয়ে থাকে। *কলেটোট্রিকাম ডেমাশিয়াম* নামক ছত্রাকের কারণে এ রোগ সৃষ্টি হয়। আক্রান্ত গাছের কাণ্ডে ছোট, লম্বা আঁকা বাঁকা বিভিন্ন ধরনের গাঢ় খয়েরি ও কালচে দাগ দেখা যায়। এ দাগ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং সমস্ত কাণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। ব্যাপকভাবে আক্রান্ত গাছের পাতা মরে যায়।

প্রতিকার

- বীজ বপনের পূর্বে প্রোভেক্স-২০০ ছত্রাকনাশক দ্বারা (২-৩ গ্রাম/কেজি) বীজ শোধনের মাধ্যমে রোগের আক্রমণ কমানো যায়।
- এ রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে ১ গ্রাম হারে অটোস্টিন বা ২ গ্রাম হারে ডাইথেন এম-৪৫ প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- ফসল কাটার পর গাছের শিকড়, আগাছা, আবর্জনা ইত্যাদি পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- সাধারণত মাঝারী থেকে ভারী বর্ষণ হলে এ রোগের আক্রমণ হয়ে থাকে বিধায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখা গেলে বৃষ্টির কমপক্ষে ৬ ঘণ্টা আগে ডাইথেন এম-৪৫ বা ইনডোফিল নামক ছত্রাকনাশক ০.২% হারে স্প্রে করতে হবে।
- গাছে ফুল আসার পূর্ব থেকে ১২-১৫ দিন পর পর ডাইথেন এম-৪৫ বা ইনডোফিল (০.২%) ৪-৫ বার স্প্রে করা হলে রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।

তিলের হক মথ পোকা

এদেশে তিলের ৩০টি প্রজাতির পোকামাকড় শনাক্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে তিল হকমথ, বিছাপোকা ও পাতা মোড়ানো পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। কীড়া হলুদ রেখাযুক্ত সবুজ বর্ণের। পিছনের খণ্ডের উপরে শিঙের মত অঙ্গ বিদ্যমান। নিচে এদের ক্ষতির নমুনা ও সমন্বিত ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

আক্রমণের সময় ও ফসলের আক্রান্ত ধাপ

এপ্রিল ও মে মাসে তিল গাছে ফুল ও ফল ধরার সময় আক্রমণ বেশি হয়। তিল গাছের অগ্রভাগ থেকে খাওয়া শুরু করে এবং কীড়া সাধারণত সকাল ও বিকালে বেশি খেতে দেখা যায়।

ক্ষতির ধরন

কীড়া তিল গাছের কচি পাতা, কাণ্ড, ফুল ও ফল পেটুকের মত খেয়ে মরাত্মক ক্ষতি করে। ফলে গাছ পাতা শূন্য হয়ে বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ফুল ধারণ বাধাগ্রস্ত হয়। এদের আক্রমণে তিলের শতকরা ২৫-৩০ ভাগ ফলন কমে যায়।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- সকালে ও বিকালে কীড়া হাত দ্বারা সংগ্রহ করে মেরে দমন করা যায়।
- ক্ষেতে বিঘাপ্রতি ৮-১০টি কাঠি পুতে পাখি বসার সুযোগ করে দিলে শিকারী পাখি সবুজ রঙের কীড়া ধরে খায়।
- মাটির নিচের পুত্তলী গভীর চাষের মাধ্যমে ধ্বংস করতে হবে।
- আক্রমণ খুব বেশি হলে নাইট্রো (সাইপারমেথ্রিন+ক্লোরোপাইরিপাস) ৫০৫ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটিয়ে পোকা দমন করা যায়।

তিলের বিছাপোকা

মথ হলদে বাদামী বর্ণের পাখায় কালো ফোটা ফোটা দাগ থাকে। মথ রাতে বিচরণ করে। এদের দেহ কমলা হলুদ রঙের ২০-৩০ মিমি লম্বা ও ৬-৮ মিমি চওড়া। কীড়া কমলা-হলুদ রঙের। গায়ে ছোট বড় অসংখ্য শুঁয়ো বা লোম থাকে।

আক্রমণের সময় ও ফসলের আক্রান্ত ধাপ

এপ্রিল মে মাসে ফুল ও ফল আসার সময় আক্রমণের মাত্রা বেশি হয়। গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি থেকে শুরু করে পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত এদের আক্রমণ দেখা যায়। তবে ফল ধরার সময় আক্রমণের মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

ক্ষতির ধরন

আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় ছোট ছোট কীড়া ১-২টি পাতা খেয়ে জালিকা সৃষ্টি করে। বয়স্ক কীড়াগুলি ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে এবং পাতা, কাণ্ড, ফুল ও ফল খেয়ে প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি করে। ফলে গাছের বৃদ্ধি, ফুল ও ফল ধারণ ব্যাহত হয় এবং ফলন শতকরা ২০-৩০ ভাগ কমে যায়।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- রাতে আলোর ফাঁদ দ্বারা মথকে আকৃষ্ট করে ধরে মারা যায়।
- প্রাথমিক অবস্থায় দলবদ্ধ কীড়াসহ আক্রান্ত পাতা হাত দ্বারা ধ্বংস করে দমন করা যায়।
- ৫০ গ্রাম আধাভাঙ্গা নিম বীজ ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে ২ গ্রাম ডিটারজেন্ট মিশিয়ে ছেঁকে ১০ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করে পোকা দমন করা যায়।
- আক্রামণ খুব বেশি হলে নাইট্রো (সাইপারমেথ্রিন+ক্লোরোপাইরিপাস) ৫০৫ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটিয়ে পোকা দমন করা যায়।

তিলের পাতা মোড়ানো ও ফলছিদ্রকারী পোকা

কীড়া হলদে সুবজ বর্ণের গায়ে কালো ফোটা ফোটা দাগযুক্ত, লম্বা, স্বল্পসংখ্যক লোম থাকে। মথ হালকা বাদামী বর্ণের।

আক্রমণের সময়

মার্চ, এপ্রিল, মে মাস পর্যন্ত অর্থাৎ গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধি থেকে শুরু করে পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত এদের আক্রমণ দেখা যায়। উষ্ণ তাপমাত্রা (৩০-৩৪০ সে.) এবং মধ্যম আর্দ্রতা (৭৫-৮৫%) আক্রমণের জন্য অনুকূল।

ক্ষতির ধরন

হলদে সবুজ রঙের কীড়া তিল গাছের উপরের কয়েকটি পাতা মুড়িয়ে ভিতরে বসে খায়। ফলে গাছের পাতা কুচকে ছিদ্রযুক্ত হয়ে যায়। ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্ত হয়। এরা জাল তৈরি করে ও মল ত্যাগ করে পরবর্তী পর্যায়ে কীড়া ফল ছিদ্র করে ভিতরের অংশ খেয়ে ক্ষতি করে। ফলে ফলন শতকরা ২০-৩০ ভাগ কমে যায়।

সমন্বিত ব্যাবস্থাপনা

- মোড়ানো পাতা ও আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে হাত দ্বারা কীড়া মেরে দমন করা যায়।
- প্রতি বিঘায় ৮-১০টি গাছের ডাল পুঁতে দিয়ে পোকাভোজী পাখি বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া।
- আক্রমণ খুব বেশি হলে পারফেকথিয়ন ৪০ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটিয়ে পোকা দমন করা যায়।

চীনাবাদাম

চীনাবাদাম একটি অর্থকরী ফসল। এটি একটি উৎকৃষ্ট ভোজ্য তেলবীজ। বীজে ৪৮-৫০% তেল ও ২২-২৯% আমিষ রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় ৩২ হাজার হেক্টর জমিতে চীনাবাদাম চাষ করা হয়। চীনাবাদামের মোট উৎপাদন প্রায় ৪৭ হাজার মে. টন। উচ্চ ফলনশীল জাতের ব্যবহার ও উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে চীনাবাদামের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব।

চীনাবাদামের জাত

মাইজচর বাদাম (ঢাকা-১)

'মাইজচর বাদাম' (ঢাকা-১) জাত ১৯৭৬ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়। গাছের উচ্চতা ৩০-৪০ সেমি। গাছ খাড়া এবং প্রতি গাছে ৬-৭টি শাখা থাকে। পাতার রং হালকা সবুজ। প্রতি বাদামে দানার সংখ্যা ১-২টি। দানার আকার মধ্যম, গোলাকর এবং রং হালকা বাদামী। বীজের সুপ্তিকাল নগণ্য। জাতটি আবাদ করতে রবি মৌসুমে ১৪০-১৫০ দিন এবং খরিফ মৌসুমে ১২০-১৩০ দিন সময় লাগে।

খোসাসহ মাইজচর বাদাম

মাইজচর বাদামের দানা

ফলন রবি মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ১.৮-২.০ টন এবং খরিফ মৌসুমে ১.৬-১.৮ টন। দেশের অধিকাংশ এলাকাতে মাইজচর বাদামের চাষ হয়ে থাকে। বর্তমানে জাতটি রোগবালাই ও পোকামাকড় দ্বারা বেশি আক্রান্ত হয়। ফলে চাষাবাদে জাতটি নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

বাসন্তী বাদাম (ডিজি-২)

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বাসন্তী বাদাম' বা ডিজি-২ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। গাছের উচ্চতা ৩০-৩৫ সেমি এবং আকৃতি অল্প ছড়ানো। প্রতি গাছে ৮-১০টি শাখা থাকে। পাতার রং গাঢ় সবুজ। প্রতিটি বাদামে বীজের সংখ্যা ১-২টি। বীজের আকার বড়, লম্বা এবং রং লালচে বাদামী। বাসন্তী বাদামের জীবনকাল ১৫০-১৬০ দিন। মাঘ-ফাল্গুন (মধ্য-জানুয়ারি থেকে মধ্য-মার্চ) মাসে এ জাতটি বপন করে প্রতি হেক্টরে ২.০-২.২ টন ফলন পাওয়া যায়। ফসল পাকার পর ৩০-৪৫ দিন পর্যন্ত এ জাতের বীজের সুপ্ততা থাকে। তাই ফসল কাটার পূর্বে আগাম বন্যা বা বৃষ্টির পানি পেলেও বীজ জমিতে গজিয়ে যায় না। এ জাত গোড়া ও কাণ্ড পচা রোগ এবং পাতার দাগ রোগ সহনশীল ও প্রতিরোধী। বাংলাদেশে নদীর চরাঞ্চলে ও মাঝারী উঁচু জমিতে এর ফলন ভাল হয়।

খোসাসহ বাসন্তী বাদাম

বাসন্তী বাদামের দানা

ঝিঙ্গা বাদাম (এসিসি-১২)

‘ঝিঙ্গা বাদাম’ বা এসিসি-১২ জাতটি ১৯৮৮ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের উচ্চতা ৩৫-৫০ সেমি। গাছ খাড়া। প্রতি গাছে ৫-৮টি শাখা থাকে। পাতার রং হালকা সবুজ।

ঝিঙ্গা বাদামের ফসল

প্রতিটি বাদামে বীজের সংখ্যা ২-৪ টি। বীজের আকার মধ্যম, চেপ্টা এবং রং হালকা বাদামী। ১০০ বীজের ওজন ৪০-৪৫ গ্রাম। ফসলের জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪৫-১৫৫ দিন এবং খরিফ মৌসুমে ১৩০-১৪০ দিন। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-ডিসেম্বর) বীজ বপন করলে ফলন হেক্টরপ্রতি ২.৪-২.৬ টন পাওয়া যায়। জাতটি বেশ খরা সহনশীল।

ত্রিদানা জাতের চীনাবাদাম

খোসাসহ ত্রিদানা বাদাম

ত্রিদানা বাদাম (ডিএম-১)

‘ত্রিদানা বাদাম’ (ডিএম-১) জাতটি মিউটেশনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৮৭ সালে অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ১০-১২ সেমি।

প্রতি গাছে ৬-৭টি শাখা থাকে। পাতার রং গাঢ় সবুজ। প্রতিটি বাদামে বীজের সংখ্যা ১-৪টি। বীজের আকার মধ্যম, লম্বা এবং গাঢ় লাল। ১০০ বীজের ওজন ২৬-২৮ গ্রাম। বীজের সুপ্তিকাল নাই। ফসলের জীবনকাল ১০৫-১১৫ দিন। জাতটি ফাল্গুন (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য-মার্চ) মাসে বপন করে ফলন হেক্টরপ্রতি ২.২-২.৪ টন পাওয়া যায়। ত্রিদানা বাদামের গাছ খাটো হওয়ায় ভুট্টা ও ইক্ষুর সাথী ফসল হিসেবে চাষাবাদের জন্য সুবিধাজনক।

বারি চীনাবাদাম-৫

‘ঢাকা-১’ জাত থেকে মিউটেশন করে ‘চীনাবাদাম-৫’ উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৯৯ সালে অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ৩৫-৪০ সেমি। গাছ খাড়া ও গুচ্ছাকার। পাতার রং হালকা সবুজ। শাখা প্রশাখায় ফুল হয়। প্রতি বাদামে বীজের সংখ্যা ১-২টি।

বারি চীনাবাদাম-৫ এর ফসল

বাদামের শিরা উপশিরা খুব স্পষ্ট, বীজের আকার বড়। ১০০ বীজের ওজন ৪৮-৫০ গ্রাম। বীজের সুপ্তিকাল ১০-১৫ দিন। বীজে তেলের পরিমাণ ৫১-৫২%। আমিষের পরিমাণ ২৫-২৭%। ফসলের জীবন কাল রবি মৌসুমে ১৩৫-১৪৫ দিন এবং খরিফ মৌসুমে ১১৫-১২৫ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন রবি মৌসুমে ২.৭০-৩.১০ টন এবং খরিফ মৌসুমে ২.০-২.৫ টন।

বারি চীনাবাদাম-৬

বারি চীনাবাদাম-৬

বিভিন্ন বিদেশি প্রজাতি হতে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ‘বারি চীনাবাদাম-৬’ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৯৯ সালে অনুমোদিত হয়।

গাছের উচ্চতা ৩৫-৪০ সেমি। গাছ খাড়া ও গুচ্ছাকৃতির হয়। পাতার রং গাঢ় সবুজ। চীনাবাদামের খোসার উপরিভাগ মসৃণ, পাতলা। শিরা, উপশিরা অস্পষ্ট। বীজের রং হালকা বাদামী।

১০০ বীজের ওজন ৫০-৫৫ গ্রাম। বীজে তেলের পরিমাণ ৫০-৫২%। আমিষের পরিমাণ ২৫-২৬%। ফসলের জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪০-১৫০দিন এবং খরিফ মৌসুমে ১২০-১৩০ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন রবি মৌসুমে ২.৫-২.৮ টন এবং খরিফ মৌসুমে ২-২.৪ টন।

বারি চীনাবাদাম-৭

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বাছাই প্রক্রিয়ায় 'বারি চীনাবাদাম-৭' জাতটি এদেশে চাষাবাদের জন্য ২০০৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪৫-১৫৫ দিন এবং খরিফ মৌসুমে ১৩০-১৪০ দিন। ফলন রবি মৌসুমে প্রতি হেক্টরে ২.৮-৩.০ টন এবং খরিফ মৌসুমে ১.৮-২.০ টন। বাদামের খোসা মসৃণ ও কিছুটা সাদাটে ও নরম। বীজের সুপ্ততা নেই। পাতায় দাগ পড়া ও মরিচা রোগ তুলনামূলকভাবে কম হয়।

বারি চীনাবাদাম-৭

বারি চীনাবাদাম-৮

বারি চীনাবাদাম-৮

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত 'বারি চীনাবাদাম-৮' জাতটি ২০০৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪০-১৫০ দিন এবং খরিফ মৌসুমে ১২৫-১৪০ দিন। গাছের উচ্চতা ৩৫-৪২ সেমি। প্রতি গাছে বাদামের সংখ্যা ২০-২৫টি। বাদামগুলি 'ঢাকা-১' জাতের মতো থোকায় থোকায় জন্মে। বীজের আকার মাঝারী, বীজের রং লালচে। ১০০ বাদামের (খোসা ছাড়ানো) ওজন ৫৫-৬০ গ্রাম। শতকরা সেলিং হার ৬৫-৭০। ফলন প্রতি হেক্টরে ২.৫ টন।

বারি চীনাবাদাম-৯

'বারি চীনাবাদাম-৯' জাতটি ICRISAT, ভারত থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০১০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন লাভ করে।

বারি চীনাবাদাম-৯

জাতটি স্প্যানিশ শ্রেণিভুক্ত। বাংলাদেশের সর্বত্র রবি ও খরিফ মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী। রবি মৌসুমে মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর বপনের উপযুক্ত সময়। খরিফ-২ মৌসুমে জুলাই থেকে আগস্ট মাসে চাষ করা যায়। বপন সময় থেকে পরিপক্ক পর্যন্ত রবি মৌসুমে ১৪০-১৫০ দিন এবং খরিফ মৌসুমে ১২০-১৩০ দিন সময় লাগে। 'বারি চীনাবাদাম-৯' জাতটি 'বারি চীনাবাদাম-৬' ও 'বারি চীনাবাদাম-৭' অপেক্ষা ৫-৭ দিন আগে পরিপক্ক হয়। গাছের উচ্চতা মাঝারী ধরনের (৪০-৪৫ সেমি)। প্রতিটি গাছ থেকে ২০-২২টি পুষ্ট বাদাম পাওয়া যায়। বাদামের খোসা কিছুটা অমসৃণ ও শিরা উপশিরাগুলো স্পষ্ট। বীজের আকার মাঝারী এবং রং হালকা বাদামী। ১০০ বীজের ওজন ৪৫-৪৭ গ্রাম। জাতটির প্রতি হেক্টরে ফলন ২.৫-২.৮ টন।

বারি চীনাবাদাম-১০ (উফশী)

'বারি চীনাবাদাম-১০' জাতটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ICRISAT (International Crop Research Inisitute for the Semi Arid Tropic) থেকে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে ভাল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু লাইন প্রাথমিক ভাবে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। এ লাইন গুলোর মধ্যে ICGV-96346 লাইনটি উচ্চ ফলন বিশিষ্ট্য এবং মাঝারী

বারি চীনাবাদাম-১০ (উফশী)

রোগ সহনশীল বলে প্রতীয়মান হয়। লাইনটি স্প্যানিস গোত্রের এবং প্রাথমিক ফলন পরীক্ষায় উক্ত গোত্রের অন্যান্য জাতের সাথে উন্নততর বিবেচিত হয় এবং আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায়ও সর্বোচ্চ ফলন প্রদান করে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৬ সালে কৃষকের মাঠে লাইনটি জাত হিসাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে। গাছের উচ্চতা মাঝারী ধরনের (৪০-৪৫ সেমি) প্রতিটি গাছ থেকে ২০-২২টি পুষ্ট বাদাম পাওয়া যায়। জাতটি বাংলাদেশের চরাঞ্চলের জমিতে চাষাবাদের জন্য খুবই উপযুক্ত। বপন থেকে ফসল উঠানো পর্যন্ত রবি মৌসমে ১৪০-১৫০ এবং খরিফ মৌসমে ১২০-১৩০ দিন সময় লাগে। জাতটি স্বল্পমাত্রায় খরা ও রোগ সহনশীল। লাইনটির দানার আকার ঢাকা-১ এর দানা থেকে বড়। জাতটির গড় উৎপাদনশীলতা ২০০০-২২০০ কেজি/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: বেলে দো- আঁশ মাটি, ক্যালসিয়াম ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ মাটি চীনাবাদাম উৎপাদনের জন্য উপযুক্ত। চীনা বাদাম জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়। বেলে দো-আঁশ মাটিতে সহজে শিকড় ও পেগ প্রবেশ করতে পারে বিধায় চীনাবাদাম অধিক ফলন দেয়। এ ফসল পিএইচ ৬.০-৬.৫ এ ভাল হয়।

চীনাবাদামের ফসল

জমি তৈরি: জমিতে ৩-৪ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুর করে নিতে হবে। শেষ চাষের সময় মই দিয়ে সমান করে জমির চার পাশে নালার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে পরবর্তীতে সেচ ও অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে পানি নিষ্কাশনে সুবিধা হয়।

বপনের সময়: চীনাবাদাম রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে আবাদ করা যায়। রবি মৌসুমে কার্তিক অগ্রহায়ণ, খরিফ-১ মৌসুমে ফাল্গুন-চৈত্র ও খরিফ-২ মৌসুমে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বপন করতে হয়। তবে দেবীগঞ্জ, লক্ষীপুর, নোয়াখালী ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে এ ফসল জানুয়ারিতে বপন করা হয়। রবি মৌসুমে কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে বপন করলে ফলন ভাল পাওয়া যায় এবং জীবনকাল প্রায় ১৫-২০ দিন কমে আসে।

বীজের হার: বারি চীনাবাদাম-৮ চাষে হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি বা একর প্রতি ৪০ কেজি খোসাসহ বীজের প্রয়োজন হয়। প্রতি হেক্টরে গাছের সংখ্যা ১১০০০০-১২০০০০ থাকা দরকার।

বপন পদ্ধতি: বীজ বপনের আগে খোসা হতে বীজ আলাদা করে নিতে হবে। বীজ ও খোসার অনুপাত ৭ঃ৩ অর্থাৎ ১০ কেজি খোসাসহ বাদামের ৭ কেজি বীজ পাওয়া যায়। বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দুরত্ব ৩০ সে.মি. এবং গাছ হতে গাছের দুরত্ব ১৫ সে.মি। বীজ ২.৫ থেকে ৩.০ সে.মি. মাটির গভীরে বপন করতে হয়। প্রতি গর্তে একটি করে পুষ্ট বীজ বপন করতে হয়।

সারের পরিমাণ: চীনাবাদামের জমিতে নিচে উল্লেখিত হারে সার ব্যবহার করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।

সারের নাম	হেক্টরপ্রতি (কেজি)	একরপ্রতি (কেজি)	বিঘাপ্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	২৫	১০	৩.৫
টিএসপি	১৬০	৬৪	১২
এমপি	৮৫	৩৪	১৬
জিপসাম	৩০০	১২০	৪০
বরিক এসিড (প্রয়োজনে)	১০	৪	১.৪

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সারের সবটুকু শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে প্রয়োগ করতে হয় এবং বাকি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ হিসাবে চারা গজানোর ৪০-৫০ দিন পর গাছে ফুল আসার সময় প্রয়োগ করতে হয়। তবে প্রতি কেজি বীজে ৭০ গ্রাম অণুজীব সার ব্যবহার করা যেতে পারে। অণুজীব সার ব্যবহার করলে সাধারণত ইউরিয়া সার ব্যবহার করতে হয় না।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

আগাছা দমন: চীনাবাদামের ফলন ভাল পাওয়ার জন্য প্রাথমিক পর্যয়ে গাছ বৃদ্ধির সময় জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। চারা গজানোর পর প্রয়োজনবোধে দুই বার ১ম বার ১৪-২০ দিন পর এবং ২য় বার ৩৫-৪০ দিন পর জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। ফুল আসার পর গাছে বাদাম ধরার সময় গোড়ায় হালাকাভাবে মাটি তুলে দিলে বাদামের ফলন ভাল হয়।

সেচ: বপন করার ১৮-২০ দিন পর ১ বার এবং শুঁটি হওয়ার ৫০-৫৫ দিন পর ২য় বার সেচ দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও বীজ সংরক্ষণ: চীনাবাদাম গাছের শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ বাদাম যখন পরিপক্ক হয় তখন উঠানোর সঠিক সময়। এ সময় গাছের নিচের পাতাগুলো হলুদ রং ধারণ করে এবং ঝরে পড়তে শুরু করে। বাদামের খোসার শিরা উপশিরাগুলো সুস্পষ্ট দেখা যায়। বাদামের খোসা ভাঙ্গার পর খোসার ভেতরে কালচে বর্ণের দাগ দেখা যায় এবং বীজের উপরের আবরণ বাদামী রং ধারণ করে।

খোসা সহ পরিপক্ক পুষ্ট বাদাম উজ্জ্বল রোদে ১ম ও ২য় দিন দৈনিক ৪ ঘণ্টা, তৃতীয় দিন থেকে দৈনিক ৮ ঘণ্টা উজ্জ্বল রোদে মোট ৭-৮দিন শুকাতে হয়। এভাবে বীজের আর্দ্রতা ৮-৯ শতাংশে নেমে আসবে। বাদাম শুকানোর সময় সরাসরি সিমেন্টের মেঝেতে না রেখে চট বা ত্রিপল এর উপর রোদ্রে শুকাতে হয়। রোদে শুকানোর পরে বাদাম ঠাণ্ডা করে গুদামজাত করতে হয়। বাদাম বীজ সংরক্ষণের জন্য পলিথিন আচ্ছাদিত বা সিনথেটিক ব্যাগ, চটের বস্তা, কেরোসিন টিন বা ড্রাম ,পিলিথিন ব্যাগ ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। বাদাম বীজসহ চটের বস্তা কাঠের বা বাঁশের মাচায় রেখে দিতে হয়। পলিথিন ব্যাগ, টিনের ড্রাম কেরোসিন টিন প্রভৃতিতে বীজ সংরক্ষণ করলে বীজের মান বা গুণাগুণ এক বৎসরের অধিক সময় অক্ষুন্ন থাকে।

অন্যান্য পরিচর্যা

পাতার দাগ রোগ

সারকস্পোরা এরাচিডিকোলা ও ফেরোওপসিস পারসোনেটা নামক দুইটি ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। এ ছত্রাকের আক্রমণে সবুজ পাতার উপরিভাগে প্রথম থেকেই হলুদ বর্ণের বৃত্তাকার রেখা দ্বারা ঘেরা গাঢ় বাদামী রঙের দাগের আবির্ভাব হয়। দাগগুলো নানা আকারের হয় এবং পাতার উপর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণের ফলে গাছের পাতা শুকিয়ে তাড়াতাড়ি ঝরে যায়। ফলে গাছের পাতায় খ্যাদ্য তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটে এবং গাছের গোড়ায় বাদাম পুষ্ট হতে পারে না। বাদাম অপরিপক্ক অবস্থায় থাকে। ফলে বাদামের ফলন ১০-১৫% কম হয়।

চীনাবাদামের পাতায় দাগ রোগের লক্ষণ

রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার: রোগটি মাটি বাহিত । গাছের অবশিষ্টাংশ যা মাটিতে পড়ে থাকে তা থেকে কনিডিয়ার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে গাছকে আক্রান্ত করে। কনিডিয়া বাতাস ও বৃষ্টির পানির মাধ্যমে এক স্থান হতে অন্য স্থানে ছড়িয়ে থাকে। অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া এবং প্রবল বায়ু প্রবাহ এ রোগ বৃদ্ধির সহায়ক।

প্রতিকার

- **রোগ প্রতিরোধী জাত:** ঝিঙ্গাবাদাম ও বারি চীনাবাদাম-৭ জাত দুইটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল। এ দুইটি জাতের চাষাবাদের মাধ্যমে রোগের আক্রমণ এড়ানো যায় এবং অধিক ফলন পাওয়া যায়।
- **ছত্রাকনাশক প্রয়োগ:** এ রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে গাছে অটোস্টিন (১ গ্রাম হারে)/ কণ্টাফ (০.৫ মিলি হারে (১মিলি হারে) প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার ছিটালে এ রোগের অনিষ্ট থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়।

- **জমি পরিষ্কারকরণ:** যেহেতু জমিতে আক্রান্ত গাছে পরিত্যক্ত অংশের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় সেহেতু মৌসুমের শেষে আক্রান্ত গাছসমূহ এবং আগাছা পুড়ে ফেলে বা নষ্ট করে রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।
- **শস্য পর্যায়ক্রম:** একই জমিতে প্রতি বছর চীনাবাদামের চাষ না করে অন্য ফসল দিয়ে শস্য পর্যায়ক্রম গ্রহণ করলে উপর্যুক্ত পোষকের অভাবে অনেক জীবাণু মারা যায় ফলে রোগের প্রাদুর্ভাব কম হয়।

রাস্ট বা মরিচা রোগ

পাকসিনিয়া এরাচিডিস নামক ছত্রাকের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত বয়স্ক গাছে এ রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় পাতার নিম্ম পৃষ্ঠে লাল, লোহার মরিচা পড়ার ন্যায় সামান্য স্ফীত ছোট বিন্দুর মত অসংখ্য দাহ দেখা যায়। দাগগুলো ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। এ রোগের কারণে চীনাবাদামের ফলন প্রায় ৫০% পর্যন্ত কম হতে পারে।

মরিচা রোগে আক্রান্ত পাতা

রোগের উৎপত্তি ও বিস্তার: ফসল কাটার পর এ রোগের ছত্রাক আগাছা, আর্বজনা এবং ফসলের পরিত্যক্ত অংশে আশ্রয় নেয়। বিকল্প পোষক হতে বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ সুস্থ্য গাছে ছড়ায় এবং আদ্র আবহাওয়ায় বিস্তার লাভ করে।

প্রতিকার

- **রোগ প্রতিরোধী জাত:** ঝিঙ্গা বাদাম জাতটি রাস্ট বা মরিচা রোগ প্রতিরোধী। এ জাতের চাষ করে রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- **ছত্রাকনাশক প্রয়োগ:** এ রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে টিল্ট/ কন্টাফ/ক্রীজল শতকরা ০.০৫ভাগ হারে (প্রতি লিটার পানির সাথে ০.৫ মিলি ছত্রাকনাশক) মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার ছিটালে এ রোগের প্রকোপ কমে যায়।
- **জমি পরিষ্কারকরণ:** পূর্ববর্তী ফসল থেকে স্বেচ্ছায় গজানো গাছ. আগাছা এবং আবর্জনা পুড়ে ফেলে এ রোগের উৎস নষ্ট করা যায়।

গোড়া পচা/কাণ্ড পচা রোগ

গোড়া পচা রোগ

স্কেলেরোশিয়াম রলফসি নামক মাটিতে বসবাসকারী এক প্রকার ছত্রাকের কারণে এ রোগ হয়। ইহা সরিষা দানার মত স্কেলেরোশিয়া উৎপন্ন করে। মাইসেলিয়াম একত্রীভূত হয়ে মাইসেলিয়াম গুচ্ছ তৈরি করে যা শক্ত হয়ে স্কেলেরোশিয়াম উৎপন্ন হয়। গাছের গোড়ায় বা মাটির ছত্রাকের সাদা মাইসেলিয়াম এবং সরিষার দানার মত ছত্রাক গুটিকা (স্কেলেরোশিয়া) লক্ষ্য করা যায়। এ রোগের কারণে গাছের মূল শিকড় আক্রান্ত হলে গোড়া পচে যায় ও গাছ সম্পূর্ণ ঢলে পড়ে এবং পরবর্তীতে খাদ্য ও পানি চলাচলের প্রতিবন্ধকতার কারণে গাছ মরে যায়। এ রোগের কারনে ২৫-৩০% এর উপর ফলনের ক্ষতি হতে পারে।

রোগের প্রতিকার

- **গভীর চাষ:** জমি তৈরির সময় গভীর চাষের মাধ্যমে মাটি আলগা করে ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে রোগের উৎস নষ্ট করে আক্রমণ কমানো যায়।
- **বীজ বপন:** বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পূর্বে মুরগির বিষ্ঠা ৫ টন/হেক্টর বা সরিষার খৈল ১টন/হেক্টর প্রয়োগ এবং প্রভেক্স-২০০ ছত্রাক নাশক (২.৫ গ্রাম ছত্রাক নাশক /কোজি বীজ) দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করে বাদামের গোড়া পচা রোগ দমন করা যায়।
- **জমি পরিষ্কারকরণ:** পূর্ববর্তী ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, আগাছা এবং আবর্জনা পুড়ে নষ্ট করে রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।
- **শস্য পর্যায়:** জমিতে পর্যায়ক্রমিকভাবে শস্য চাষ করলে উপযুক্ত পোষকের অভাবে রোগ জীবাণু মরে যায়। ফলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকাংশে কমানো সম্ভব।

চীনাবাদামের ক্ষতিকর পোকামাকড় ও তাদের দমন ব্যবস্থা

জ্যাসিড বা পাতা শোষক পোকা দমন

বাচ্চা ও পরিণত অবস্থায় এরা প্রচুর সংখ্যায় গাছের কচি পাতা ও নরম কাণ্ড থেকে রস চুষে খায় এবং খাওয়ার সময় এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ নিঃসৃত করে ফলে পাতার অগ্রভাগ বাদামী বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত পাতা কুঁচকে যায় ফলে বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্থ হয়।

আক্রমণের সময় ও ফসলের আক্রান্ত ধাপঃ শুষ্ক মৌসুমে বিশেষ করে মার্চ হতে জুন মাস পর্যন্ত গাছের চারা থেকে পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত এদের আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে। তবে অঙ্গজবৃদ্ধি ও ফুল ধারণের সময় আক্রমণের মাত্রা বেশি হয়। শুষ্ক ও গরম আবহাওয়ায় (৩০-৩৮০ সে.) এদের আক্রমণ বেশি হয়।

জ্যাসিড বা পাতা শোষক পোকা

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- ৫০ গ্রাম নিম বীজ ভেঙ্গে ১ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে ২-৩ গ্রাম ডিটারজেন্ট বা গুঁড়া সাবান মিশিয়ে ছেকে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার ছিটিয়ে পোকা দমন করা যায়।
- হাত জাল দিয়ে পোকা ধরে মেরে পোকার সংখ্যা কমানো যায়।
- চীনাবাদামের সাথে রসুন, পিঁয়াজ বা ধনিয়া আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করে পোকার আক্রমণ শতকরা ২০-২৫ ভাগ কমানো যায় ।
- নিম পাতার নির্যাস (১০%) আক্রান্ত ক্ষেতে ১৫ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করলে আক্রমণ কমে যায়।
- আক্রমণ বেশি হলে রিপকর্ড ১০ ইসি ১ মিলি বা এডমায়ার ০.৫ মিলি./প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ৩ বার (বপনের ৬৫,৭৫,৮৫ দিন পর) স্প্রে করা যেতে পারে।

উইপোকা ও পিঁপড়া দমন

উঁইপোকা দলবদ্ধভাবে বাদাম গাছের শিকড় কেটে দেয়। শিকড়ের ভিতর গর্ত করে খায়। ফলে অচিরেই গাছ শুকিয়ে মারা যেতে থাকে। তাছাড়া এরা মাটির নিচের বাদাম ছিদ্র করে বীজ খায়। ফলে বাদাম পচে যায়। তাছাড়া পিঁপড়া বাদাম বপন করার পর বীজ খেয়ে ক্ষতি করে থাকে। এদের আক্রমণে শতকরা ১০-১২ ভাগ ফসলের ক্ষতি হয়।

আক্রমণের সময় ও ফসলের আক্রান্ত ধাপঃ জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত অর্থাৎ বীজ বপন করার পর থেকে পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত এদের আক্রমণ হয়ে থাকে।

চীনাবাদামের উই পোকা

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- প্রতি কেজি বীজের সাথে ১ টা চামচ বা ৫ মিলি কেরোসিন বা নিম তেল ভালভাবে মিশিয়ে বপন করলে পিঁপড়া, উইপোকা ও মাটিতে বসবাসকারী অন্যান্য পোকার আক্রমণ কমানো যায়।
- সেভিন ৮৫ ডব্লিউপি ২-৩ গ্রাম ১ কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে বপন করলে উইপোকা, পিঁপড়া ও মাটিতে বসবাসকারী অন্যান্য পোকার আক্রমণ শতকরা ৮০ ভাগ কমে যায়।
- আক্রান্ত জমিতে পানির সাথে কেরোসিন মিশিয়ে সেচ দিলে বা ডারসবান ২০ ইসি বা পাইরিফস ৫০ ইসি ২ মি.লি. প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সূর্যমুখী

সূর্যমুখী একটি উৎকৃষ্ট তেল ফসল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সূর্যমুখীর ব্যাপক চাষ হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে সূর্যমুখী একটি তেল ফসল হিসেবে বাংলাদেশে আবাদ হচ্ছে। বর্তমানে পটুয়াখালী, রাজশাহী, যশোর, কুষ্টিয়া, নাটোর, পাবনা, দিনাজপুর, গাজীপুর, টাঙ্গাইল প্রভৃতি জেলাতে সীমিত আকারে চাষ হচ্ছে। সূর্যমুখীর বীজে ৪০-৪৫% লিনোলিক এসিড রয়েছে। সূর্যমুখীর তেলে ক্ষতিকারক ইরোসিক এসিড নাই। সূর্যমুখীর হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১.৭-১.৯ টন।

সূর্যমুখী ফসল

কিরণী (ডি এস-১)

সূর্যমুখীর 'কিরণী' (ডিএস-১) জাতটি সংগৃহীত জার্মপ্লাজম হতে বাছাইয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৮২ সালে অনুমোদিত হয়। এ জাতের গাছের উচ্চতা ৯০-১১০ সেমি। বীজ লম্বা ও চ্যাপ্টা। হাজার বীজের ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম। বীজের রং কালো। প্রতি গাছে ১টি করে মাঝারী আকারের পুষ্পস্তবক ধরে থাকে। ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্যে-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর) মাসে বপন করলে সংগ্রহ করতে ৯০-১০০ দিন সময় লাগে। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-ডিসেম্বর) বপন করলে ১০০-১১০ দিন সময় লাগে। প্রতি হেক্টরে ১.৬-১.৮ টন ফলন পাওয়া যায়। বীজে তেলের পরিমাণ ৪২-৪৪%। জাতটি মোটামুটিভাবে অলটারনেরিয়া ব্লাইট রোগ সহনশীল।

কিরণী জাতের সূর্যমুখী ফসল

বারি সূর্যমুখী-২

এসটি-২২৫০ হাইব্রিড থেকে স্ব-পরাগায়ন ও নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এসটি-২২৫০ সি লাইনটি বাছাই করা হয়। এ লাইনটি ২০০৪ সালের মার্চ মাসে 'বারি সূর্যমুখী-২' নামে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

এ জাতের গাছের উচ্চতা ১২৫-১৪০ সেমি ও ব্যাস ২.০-২.৪ সেমি। পরিপক্ক পুষ্পযুগবী বা মাথার ব্যাস ১৫-১৮ সেমি। বীজের রং কালো। প্রতি মাথায় বীজের সংখ্যা ৩৫০-৪৫০টি। বীজে তেলের পরিমাণ শতকরা ৪২-৪৪ ভাগ। ফসলের জীবনকাল রবি মৌসুমে ৯৫-১০০দিন এবং খরিফ মৌসুমে ৮৫-৯০দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন রবি মৌসুমে ২.০-২.৩০ টন এবং খরিফ মৌসুমে ১.৫-১.৮ টন।

বারি সূর্যমুখী-২

উৎপাদন পযুক্তি

জমি তৈরি: সূর্যমুখীর জমি গভীরভাবে চাষ হওয়া প্রয়োজন। জমি ৪-৫ বার আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

বপনের সময়: সূর্যমুখী সারা বছর চাষ করা যায়। তবে অগ্রহায়ণ মাসে (মধ্য-নভেম্বর থেকে মধ্য-ডিসেম্বর) চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে তাপমাত্রা ১৫ সে. এর নিচে হলে ১০-১২ দিন পরে বীজ বপন করা উচিৎ। খরিফ-১ মৌসুমে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ (মধ্য-এপ্রিল থেকে মধ্য-মে) মাসেও এর চাষ করা যায়।

বপন পদ্ধতি ও বীজের হার: সূর্যসুখীর বীজ সারিতে বুনতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২৫ সেমি রাখতে হয়। এভাবে বীজ বপন করলে হেক্টরপ্রতি ৮-১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বারি সূর্যমুখী-২ এর জন্য হেক্টরপ্রতি ১২-১৫ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

সারের পরিমাণ: সূর্যমুখীতে নিম্নরূপ পরিমাণে সার ব্যবহার করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১৮০-২০০ কেজি
টিএসপি	১৫০-২০০ কেজি
এমপি	১২০-১৫০ কেজি
জিপসাম	১২০-১৭০ কেজি
জিংক সালফেট	৮-১০ কেজি
বরিক এসিড*	১০-১২ কেজি
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট*	৮০-১০০ কেজি

* রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও রাজশাহী এলাকার জন্য প্রয়োজন।

'বারি সূর্যমুখী-২' চাষের জন্য নিম্নবর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সারের নাম	বিঘাপ্রতি (কেজি)	একরপ্রতি (কেজি)	হেক্টরপ্রতি (কেজি)
ইউরিয়া	২৫-২৭	৭৫-৮০০	১৮০-২০০
টিএসপি	২৩-২৫	৬৮-৭২	১৬০-১৮০
এমপি	২০-২৫	৬৩-৬৭	১৫০-১৭০
জিপসাম	২০-২৫	৬৩-৬৭	১৫০-১৭০
জিংক সালফেট	১.৩৫	৪	৮-১০
বরিক এসিড*	১.৩৫	৪	১০-১২
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট *	১০.৫-১৩.৫	৩২.৫-৪০.৫	৮০-১০০
গোবর (টন)	১.১-১.৩	৩.২-৪.০	৮-১০

* রংপুর, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ ও রাজশাহী অঞ্চলের জন্য প্রয়োজন।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: ইউরিয়া সারের অর্ধেক এবং বাকি সব সার শেষ চাষের সময় জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ২ ভাগ করে প্রথম ভাগ চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর এবং দ্বিতীয় ভাগ ৪০-৪৫ দিন পর ফুল ফোটার পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ শোধন: মাটি ও বীজ থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের জন্য বীজ শোধন একান্ত প্রয়োজন। বীজ শোধনের ফলে প্রধানত বীজ বাহিত রোগ দমন হয়। ফলে জমিতে আশানুরূপ গাছের সংখ্যা পাওয়া যায় এবং ফলন ভাল হয়। ভিটাভেক্স-২০০ ছত্রাক নিবারক দ্বারা বীজ শোধন করা হয়। প্রতি কেজি সূর্যমুখী বীজের জন্য মাত্র ৩ (তিন) গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ প্রয়োজন। একটি বড় প্লাস্টিকের ঢাকনাযুক্ত পাত্রে সূর্যমুখীর বীজ নিয়ে পরিমাণমতো ঔষধ মিশিয়ে পাত্রের মুখ বন্ধ করে ভালভাবে ঝাঁকিয়ে ১ দিন রেখে দেবার পর বীজ জমিতে বপন করতে হবে।

গাছ পাতলাকরণ: অতিরিক্ত গাছ থাকলে চারা গজানোর ১৫-২০ দিন পর প্রতি হিলে/গোছায় ১টি করে সুস্থ-সবল গাছ রেখে বাকি গাছগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

আগাছা দমন: চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর প্রথম এবং চারা গাজানোর ৪৫-৫০ দিন পর দ্বিতীয় বার নিড়ানী দিতে হয়।

সেচ প্রয়োগ: সূর্যমুখী ফসলের ফলন বেশি পেতে হলে কয়েকবার পানি সেচ দিতে হবে। প্রথম সেচ বীজ বপনের ৩০ দিন পর (গাছে ফুল আসার আগে), দ্বিতীয় সেচ বীজ বপনের ৫০ দিন পর (পুষ্পস্তবক তৈরির সময়) এবং তৃতীয় সেচ বীজ বপনের ৭০ দিন পরে (বীজ পুষ্ট হবার আগে) দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: বপন থেকে পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত ৯০ থেকে ১১০ দিন সময় লাগে।

অন্যান্য পরিচর্যা

সূর্যমুখীর পাতা ঝলসানো রোগ দমন

আমাদের দেশে সূর্যমুখীর রোগের মধ্যে পাতা ঝলসানো রোগটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *অলটারনেরিয়া হেলিয়ান্থি* নামক ছত্রাকের আক্রমণে সূর্যমুখীর এ রোগটি হয়ে থাকে। প্রথমে পাতায় ধূসর বা গাঢ় বাদামী বর্ণের অসম আকৃতির দাগ পড়ে। পরে দাগ মিশে গিয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করে। অবশেষে সম্পূর্ণ পাতা ঝলসে যায়।

প্রতিকার

- রোগ সহনশীল বারি সূর্যমুখী-২ জাত চাষ করতে হবে।
- রোগ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল-৫০ ডাব্লিউপি (২% হারে) পানির সাথে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার পাতায় প্রয়োগ করলে রোগের প্রকোপ কমে যায়।
- ফসল কাটার পর গাছের পরিত্যক্ত অংশ নষ্ট করলে বা পুড়িয়ে ফেললে এ রোগের উৎস নষ্ট হয়ে যায়।

পাতা ঝলসানো রোগের লক্ষণ

সূর্যমুখীর শিকড় পচা রোগ দমন

সূর্যমুখীর সাধারণত স্কেলেরোশিয়াম রলফসি নামক ছত্রাকের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত গাছের গোড়া সাদা তুলার মত ছত্রাকের মাইসেলিয়াম এবং গোলাকার সরিষার দানারমতো স্কেলেরোশিয়াম দেখা যায়। প্রথমে গাছ কিছুটা নেতিয়ে পড়ে। কয়েক দিনের মধ্যে সমস্ত গাছ ঢলে পড়ে এবং শুকিয়ে মারা যায়।

প্রতিকার

- প্রোভেক্স-২০০ এর সাহায্যে বীজ শোধনের মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।
- জমির পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে কারণ ভেজা স্যাঁত স্যাঁতে জমিতে রোগের প্রকোপ বেশি হয়।।
- পর্যায়ক্রমিকভাবে ফসলের চাষ করলে উপযুক্ত পোষক গাছের অভাবে পূর্ববর্তী আক্রমণকারী রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।

সূর্যমুখীর বিছাপোকা

লালচে কমলা রঙের বিছাপোকার ছোট ছোট কীড়াগুলি একত্রে দলবদ্ধভাবে সূর্যমুখীর নিচের সবুজ অংশ খেয়ে জালিকা সৃষ্টি করে। পরে বয়স্ক কীড়া পাতা, ফুল ও নরম কাণ্ড পেটুকের মতো খেয়ে ক্ষতি করে। ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল ও ফল ধারণ বাধাগ্রস্ত হয় এবং ফলন কমে যায়। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে গাছের অংগজ বৃদ্ধির সময় থেকে অর্ধ পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত এদের আক্রমণ হয়ে থাকে।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- দমন পদ্ধতি তিলের বিছাপোকার অনুরূপ। তবে এ ক্ষেত্রে প্রথমে ২/১টি পাতায় বিছাপোকার দলবদ্ধ অবস্থান দেখা মাত্রই হাত দ্বারা পাতাসহ কীড়া সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
- আক্রমণ খুব বেশি হলে নাইট্রো (সাইপারমেথ্রিন+ক্লোরোপাইরিপাস) ৫০৫ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত ক্ষেতে ১০ দিন অন্তর ২ বার ছিটায়ে পোকা দমন করা যায়।

ফসল কাটা ও শুকানো: সূর্যমুখী বপনের ৬৫-৭০ দিন পরে ফুলের বীজ পুষ্ট হওয়া শুরু হয়। সূর্যমুখী কাটার সময় হলে গাছের পাতা হলুদ হয়ে আসে এবং পুষ্পস্তবক (মাথা) সহ গাছগুলো নুয়ে পড়ে। বীজগুলো কালো রং এবং দানাগুলো পুষ্ট ও শক্ত হয়। মৌসুম অনুসারে ফসল পরিপক্ক হতে ৯০-১০০ দিন সময় লাগে।

বীজ সংরক্ষণ বা গুদামজাতকরণ: সূর্যমুখী বীজ পরের মৌসুমে লাগানোর জন্য গুদামজাত করা প্রয়োজন হয়। বীজ সংরক্ষণের পূর্বে অপরিপক্ক এবং ভাঙ্গা বীজ বেছে ফেলতে হবে। মোটা পলিথিন ব্যাগ বা কেরোসিন টিন বা টিনের ড্রামে বীজ সংরক্ষণ করা উত্তম। ভেতরে পলিথিন দিয়ে চটের বস্তায় ভালভাবে শুকানো বীজ প্রতি ৩০ কেজির জন্য ২৫০ গ্রাম ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডসহ সংরক্ষণ করলে ৭-৮ মাস পরেও বীজের শতকরা ৮০ ভাগ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বজায় থাকে। বর্ষাকালে এক থেকে দু'বার বীজ পুণরায় রোদে শুকিয়ে নেয়া ভালো।

তৈল নিষ্কাশন: ঘানিতে ২৫% এবং এক্সপেলারে ৩০-৩৫% তেল নিষ্কাশন সম্ভব।

সয়াবিন

সয়াবিনের ফসল

বাংলাদেশে সয়াবিন একটি সম্ভাবনাময় ফসল। আমিষ ও ভোজ্য তেল উৎপাদনে সয়াবিন এখন অনেক দেশেই একটি প্রধান ফসল।

সয়াবীনে ৪০-৪৫% আমিষ এবং ১৯-২২% তেল রয়েছে। অন্যান্য ডাল ও শুঁটি জাতীয় শস্যের তুলনায় সয়াবিন দ্বিগুণ আমিষ সম্পন্ন অথচ দাম কম। তাই স্বল্প মূল্যে আমিষ সরবরাহের লক্ষ্যে আমাদের দেশে প্রচুর পরিমাণে সয়াবিন চাষ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশে সয়াবিনের হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৫-২.৩ টন। মোট আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ৫৯ হাজার টন।

সয়াবিনের জাত

সোহাগ (পিবি-১)

সয়াবিনের সোহাগ জাতের গাছসহ ফল

সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাইয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবন করে ১৯৯১ সালে জাতটি অনুমোদন দেয়া হয়।

এ জাতের গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সেমি। শত বীজের ওজন ১১-১২ গ্রাম। বীজের রং উজ্জ্বল হলুদ। বীজে আমিষের পরিমাণ ৪০-৪৫% এবং তেলের পরিমাণ ২১-২২%। জাতটির বীজের সতেজতা সংরক্ষণ ক্ষমতা ভাল।

পৌষ মাসে (মধ্য-ডিসেম্বর থেকে মধ্য-জানুয়ারি) বপন করলে ফসল সংগ্রহ করতে ১০০-১১০ দিন সময় লাগে। খরিফ মৌসুমে শ্রাবণ মাস থেকে মধ্য-ভাদ্র পর্যন্ত (মধ্য-জুলাই থেকে আগস্ট মাস) বপন করলে ৯০ থেকে ১০০ দিনের মধ্যে ফসল কাটা যায়। ফলন হেক্টরপ্রতি ১.৫-২.০ টন হয়। সয়াবীনের সোহাগ জাতটি পাতার হলদে মোজাইক রোগ সহনশীল।

বাংলাদেশ সয়াবিন-৪ (জি-২)

বাংলাদেশ সয়াবিন-৪ এর ফসল

'বাংলাদেশ সয়াবিন-৪' জাতটি ১৯৯৪ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের গাছের উচ্চতা ৬০-৬৫ সেমি। বীজের আকার ছোট, হাজার বীজের ওজন ৬০-৭০ গ্রাম। বীজের রং সবুজাভ হলুদ।

শ্রাবণ-ভাদ্র (মধ্য-জুলাই থেকে মধ্য-সেপ্টেম্বর) অর্থাৎ খরিফ মৌসুমে বপন করলে ৮৫-৯৫ দিন পর রবি মৌসুমে, পৌষ মাসে (মধ্য-ডিসেম্বর থেকে মধ্য-জানুয়ারি) বপন করলে ফসল সংগ্রহ করতে ১২০-২২০ দিন সময় লাগে।

হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৫-২.২ টন। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা বেশি। জাতটি পাতার হলদে মোজাইক রোগ সহনশীল।

বারি সয়াবিন-৫

তাইওয়ান থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম মধ্য 'রেনসম' নামের লাইনটি প্রাথমিক ও আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষায় সর্ব্বোচ ফলন দেয়। এ জাতটি ২০০২ সালে 'বারি সয়াবিন-৫' নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। এ জাতটি বাংলাদেশে সব মৌসুমেই চাষ করা যায়।

গাছের উচ্চতা ৪০-৬০ সেমি। প্রতি গাছে ফলের সংখ্যা ২৫-৩৫টি। শুঁটিতে বীজের সংখ্যা ২-৩টি। বীজের আকার সোহাগের চেয়ে সামান্য ছোট এবং 'বাংলাদেশ সয়াবিন-৪' এর বীজের চেয়ে বড়। বীজের রং ক্রীম এবং শত বীজের ওজন ৯-১৪ গ্রাম। জাতটির জীবনকাল ৯০-১০০ দিন। হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৬-২.০ টন।

শুঁটিসহ বারি সয়াবিন-৫

বারি সয়াবিন-৬

বিদেশ হতে সংগৃহীত সয়াবিনের বিভিন্ন জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই পদ্ধতি ব্যবহার করে এ জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ জাতটি ২০০৯ সালে অবমুক্ত করা হয়।

জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র রবি ও খরিফ-২ মৌসুমে চাষাবাদের উপযোগী । রবি মৌসুমে মধ্য-ডিসেম্বর থেকে মধ্য-জানুয়ারি এবং খরিফ-২ মৌসুমে জুলাই মাসে বপনের উপযুক্ত সময়। জাতটি বপন সময় থেকে পরিপক্ক হতে ১০০-১১০ দিন সময় লাগে। গাছের উচ্চতা ৫০-৫৫ সেমি। প্রতি গাছে শুঁটির সংখ্যা ৫০-৫৫টি। শুঁটির দৈর্ঘ্য ৩.০-৩.৫ সেমি। অধিকাংশ শুঁটিতে ২-৩টি বীজ থাকে। বীজের ত্বক ক্রীম বর্ণের। 'বারি সয়াবিন-৬' জাতটিতে ২০-২১% তৈল এবং ৪২-৪৪% প্রোটিন থাকে। জাতটিতে মোজাইক ভাইরাস আক্রমণ কম হয়। জাতটির হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৮০-২.১০ টন যা 'সোহাগ' ও 'বারি সয়াবিন-৫' এর তুলনায় ১০-১৫% বেশি।

বারি সয়াবিন-৬

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: সয়াবিন দোআঁশ, বেলে দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতে চাষের জন্য উপযোগী। খরিফ বা বর্ষা মৌসুমে জমি অবশ্যই উঁচু ও পানি নিকাশ সম্পন্ন হতে হবে। রবি মৌসুমে মাঝারী নিচু জমিতেও চাষ করা যায়।

জমি তৈরি: মাটির প্রকারভেদে জমিতে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালভাবে ঝুরঝুরে ও আগাছামুক্ত করে বীজ বপন করতে হবে।

বপন সময়: বাংলাদেশে শীত (রবি) ও বর্ষা (খরিফ) উভয় মৌসুমেই সয়াবিন বপন করা যায়। পৌষ মাসে (মধ্য-ডিসেম্বর থেকে মধ্য-জানুয়ারি) বপন করা উত্তম। বর্ষা মৌসুমে শ্রাবণ থেকে মধ্য-ভাদ্র পর্যন্ত (মধ্য-জুলাই থেকে মধ্য-আগস্ট) বপন করা উত্তম।

বপন পদ্ধতি: সয়াবিন সারিতে বপন করা উত্তম। তবে কলাই বা মুগ ডালের মতো ছিটিয়েও বপন করা যায়। সারিতে বপন করলে সারি থেকে সারির দূরত্ব রবি মৌসুমে ৩০ সেমি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০ সেমি রাখতে হয়। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫-৬ সেমি রাখতে হয়।

সারের পরিমাণ: সয়াবিনের জমিতে প্রয়োগের জন্য সার সুপারিশ নিম্নরূপ।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৫০-৬০ কেজি
টিএসপি	১৫০-১৭৫ কেজি
এমপি	১০০-১২০ কেজি
জিপসাম	৮০-১১৫ কেজি
বোরন (প্রয়োজন বোধে)	৮-১০ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: সবটুকু সার ছিটিয়ে শেষ চাষের সময় জমিতে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

অণুজীব সার প্রয়োগ: এক কেজি বীজের মধ্যে ৬৫-৭৫ গ্রাম অণুজীব সার ছিটিয়ে দিয়ে ভালভাবে নাড়াচাড়া করতে হবে। এই বীজ সাথে সাথে বপন করতে হবে। অণুজীব সার ব্যবহার করলে সাধারণত ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হয় না।

পানি সেচ: প্রথম সেচ বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (ফুল ধরার পূর্বে) এবং দ্বিতীয় সেচ বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে (শুঁটি গঠনের সময়) দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: চারা গজানোর ২০-২৫ দিন পর আগাছা দমন করতে হবে। গাছ খুব ঘন থাকলে পাতলা করে দিতে হবে। প্রতি বর্গমিটারে রবি মৌসুমে ৫০-৬০টি এবং খরিফ মৌসুমে ৪০-৫০টি চারা রাখা উত্তম।

পরিপক্কতা ও ফসল সংগ্রহ: সয়াবিন বীজ বপন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত ৯০-১২০ দিন সময় লাগে। ফসল পরিপক্ক হলে শুঁটিসহ গাছ হলদে হয়ে আসে এবং পাতা ঝরে পড়তে শুরু করে। এ সময় গাছ কেটে ফসল সংগ্রহ করতে হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

চারা গজানোর ১৫ দিনের মধ্যে সূর্যমুখীর চারা প্রতি গর্তে ১টি করে এবং সয়াবিনের চারা ৫ সেমি পর পর একটি করে রেখে বাকিগুলো তুলে ফেলতে হবে। প্রয়োজনবোধে ১-২ বার নিড়ানী ও সেচ দিতে হবে। 'জো' আসার সাথে সাথে সারির মাঝে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে আলগা করে দিতে হবে।

পোকা ও রোগ দমন

ছত্রাকের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে হলে বপনের পূর্বে প্রোভেক্স-২০০ নামক ঔষধ দিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নাইট্রো ৫০৫ ইসি প্রতি ১ লিটার পানিতে ২ মিলি হিসেবে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের মাধ্যমে ছিটিয়ে দিতে হবে।

সয়াবিনের ক্ষতিকর পোকা দমন

বাংলাদেশে সয়াবিনের ৩০টি ক্ষতিকর পোকা সনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে বিছাপোক, সাধারণ কাটুইপোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, কাণ্ডের মাছি পোকা প্রধান। নিচে এদের ক্ষতির প্রকৃতি ও দমন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো। সয়াবিনের বিছাপোকা ও সাধারণ কাটুইপোকার বৈশিষ্ট্য, ক্ষতির ধরন ও দমন ব্যবস্থাপনা চীনাবাদামের পোকার অনুরূপ।

পাতা মোড়ানো পোকা

এ পোকার মথ হলদে বাদামী বর্ণের। এদের পাখায় ছোট ছোট কালো দাগ থাকে। এদের কীড়া লম্বা, সবুজ বর্ণের গায়ে কালো ফোটা ফোটা দাগ থাকে এবং মাথা হালকা লালচে বর্ণের।

ক্ষতির প্রকৃতি: এ পোকার কীড়া গাছের অগ্রভাগের এবং পার্শ্বের কচি ও অর্ধকচি পাতা গুটিয়ে বা মুড়িয়ে ভিতরে বসে খায়। ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, ফুল ফল ধারণ বাধাগ্রস্ত হয় এবং ফলন কমে যায়। একটি গাছে ৪-৫টি মুড়ানো পাতাসহ কীড়া থাকতে পারে।

আক্রমণের সময় ও ফসলের আক্রান্ত ধাপ: ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল মাস পর্যন্ত অর্থাৎ পাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির সময় থেকে পরিপক্ক অবস্থা পর্যন্ত এদের আক্রমণ হয়ে থাকে। বর্ষা বা খরিফ-২ মৌসুমে এদের আক্রমণ বেশি হয়ে থাকে।

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

- মোড়ানো পাতাসহ কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে।
- প্রতি বিঘায় ৮-১০টি কাঠি পুঁতে পাখী বসার সুযোগ করলে পোকাভোজী পাখী কীড়া খেয়ে কমাতে পারে।
- প্রতিরোধী জাত যেমন, সোহাগ এবং 'বারি সয়াবিন-৬' চাষ করলে আক্রমণ কিছুটা কম হয়।
- সময়মত আগাছা দমন, পাতলাকরণ ও পরিষ্কার পরিছন্ন চাষাবাদ করলে পোকার আক্রমণ কমে যায়।
- আক্রমণ বেশি হলে সুমিথিয়ন ৫৭ ইসি বা সেভিন ২০ ইসি ২ মিলি বা পারফেকথিয়ন ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত জমিতে ১০ দিনের ব্যবধানে ২ বার স্প্রে করলে পোকার আক্রমণ কমে যায়।

গর্জন তিল

গর্জন তিল বা গুজি তিল বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনাময় তেল ফসল। গর্জন তিলের তেল গুণাগুণের দিক থেকে ভাল। এ তেলে অত্যাবশকীয় লিনোলিক ফ্যাটি এসিডের পরিমাণ প্রায় ৫০%।

গর্জন তিলের ফসল

গর্জন তিলের জাত

শোভা

সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাইয়ের মাধ্যমে গর্জন তিলের শোভা জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৮৮ সালে জাতটি অনুমোদন দেয়া হয়।

গাছের উচ্চতা ৬৫-৯৫ সেমি। বীজ চিকন ও লম্বা । হাজার বীজের ওজন ৩-৪ গ্রাম। ফুলের রং গাঢ় ধূসর।

এ ফসলটি অপেক্ষাকৃত অনুর্বর মাটিতেও আবাদ করা যায়। বিশেষ করে নদীর চরের বেলে মাটিতে আবাদ সম্ভব। ফসল বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ১.০৫-১.১৫ টন ফলন পাওয়া যায়। বীজে ৩৮-৪২% তেল থাকে। তেলে আমিষের পরিমাণ ২০-২৫%।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: অধিকাংশ মাটিতেই গর্জন তিল চাষ করা যায়, তবে দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি সবচেয়ে ভাল।

জমি তৈরি: ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরি করতে হয়। চর এলাকায় কম চাষে অথবা বিনা চাষে আবাদ করা হয়।

বপনের সময়: কার্তিক মাস (মধ্য-অক্টোবর হতে মধ্য-নভেম্বর)।

বপন পদ্ধতি: সারিতে বপন করলে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি রাখতে হবে। ছিটিয়েও বীজ বপন করা যায়।

সারের পরিমাণ: নিম্নরূপ হারে সার ব্যবহার করলে অধিক ফলন পাওয়া যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৭০-৮০ কেজি
টিএসপি	১১০-১৩০ কেজি
এমপি	৪৫-৫৫ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: ইউরিয়া সার অর্ধেক ও বাকি অন্য সব সার শেষ চাষের সময় জমিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর কুঁড়ি আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা: জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। জমিতে রস কম হলে পানি সেচ দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: ফসল পরিপক্ক হওয়ার সময় পাতা হলদে হয়ে গাছ শুকিয়ে যায়।

অন্যান্য পরিচর্যা

তিলের সারিতে ৩ সেমি পর পর ১ টি গাছ এবং চীনাবাদামের সারিতে ১০ সেমি পর পর ১ টি করে গাছ রেখে অতিরিক্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। বৃষ্টি না হলে ১/২ বার সেচ দিতে হবে এবং অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য নালার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

পোকা ও রোগ দমন

তিলের গোড়া পচা রোগ হলে জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। অটোস্টিন, ক্যাপটান বা ভিটাভেক্স-২০০ ছত্রাকনাশক দ্বারা প্রতি কেজি শুকনা বীজে ২-৩ গ্রাম ঔষধ মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। তিলে বিছা পোকা দমনের জন্য রিপকর্ড ১০ ইসি ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

তিসি

তিসি থেকে তেল এবং আঁশ পাওয়া যায়। তেল ফসল হিসেবে জমির পরিমাণের দিক থেকে সরিষা, তিল এবং সয়াবিনের পর তিসির স্থান। ফরিদপুর, পাবনা, যশোর, রাজশাহী, কুমিল্লা ও টাঙ্গাইলে তিসি বেশি জন্মে। তিসির তেল ভোজ্য তেল নয়। তিসির তেল 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল অয়েল' হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

তিসির নীলা জাতের ফসল

তিসির জাত

নীলা

তিসির নীলা জাতটি ল্যান্ড রেসেস থেকে বাছাইয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয় এবং ১৯৮৮ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের উচ্চতা ৭০-১০০ সেমি।

বীজ ছোট ও চ্যাপ্টা। ফল ডিম্বাকৃতির হয়। হাজার বীজের ওজন ৩.০-৩.৫ গ্রাম। ফুলের রং নীল। বীজ হাতে ধরলে পিচ্ছিল অনুভূত হয়।

জীবন কাল ১০০-১১৫ দিন। ফলন প্রতি হেক্টরে ০.৯৫-১.১ টন। এটি একটি খরা সহিষ্ণু ফসল।

তিসির ফসল

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: এঁটেল মাটি তিসি চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। পলি দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটিতে তিসির চাষ করা যায়।

জমি তৈরি: তিসির বীজ ছোট বলে জমিতে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও ২-৩টি মই দিয়ে মসৃণ ভাবে জমি তৈরি করতে হয়।

বপনের সময়: কার্তিক (মধ্য-অক্টোবর হতে মধ্য-নভেম্বর)।

বীজের হার: ৭-৮ কেজি/হেক্টর।

বপন পদ্ধতি: তিসি সাধারণত ছিটিয়ে বপন করতে হয়। তবে সারিতে বপন করা ভাল । সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি রাখতে হয়।

সারের পরিমাণ: সাধারণত তিসি বিনা সারে চাষ করা হয়। তবে ভাল ফলন পেতে হলে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করা যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৭০-৮০ কেজি
টিএসপি	১১০-১৩০ কেজি
এমপি	৪০-৫০ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: ইউরিয়া সার অর্ধেক ও বাকি অন্যসব সার শেষ চাষের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা: জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। প্রয়োজনমত ১-২ বার সেচ দিলে ফলন ভালো হয়।

ফসল সংগ্রহ: ফসল পরিপক্ক হওয়ার সময় গাছ ও ফল সোনালী বা কিছুটা তামাটে রং ধারণ করে। এমন হলে ফসল কেটে মাড়াই করে এবং রোদে শুকিয়ে ফসল সংগ্রহ করতে হয়।

সবজি ফসল

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের সবজির চাষ হয়। সবজির মধ্যে বেগুন, টমেটো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, শিম, বরবটি, মুলা, লাউ, পটল, কচু, কুমড়া, ঢেঁড়স, লালশাক, ডাঁটা, পুঁইশাক ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বিগত ৫ বছরে সবজি চাষের জমি ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে সবজির আওতায় মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৪.০০ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন প্রায় ৪০ লক্ষ মেট্রিক টন (বিবিএস, ২০১৭)। রবি বা শীত মৌসুম অধিকাংশ সবজি চাষের অনুকূল হওয়ায় মোট উৎপাদনের প্রায় ৬০% সবজি এ মৌসুমে হয়। বাংলাদেশে হেক্টরপ্রতি সবজির ফলন উন্নয়নশীল দেশসমূহের চেয়ে কম। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সবজির আবাদি জমির হার বৃদ্ধিতে ১ম আর উৎপাদন বৃদ্ধির হারের দিক থেকে ৩য় স্থানে অবস্থান করছে।

উন্নত জাতের অভাব, রোগ ও পোকার আক্রমণ, প্রতিকূল আবহাওয়া যেমন অতিবৃষ্টি, খরা, বন্যা, উন্নত বীজের অভাব ইত্যাদি সবজি চাষের প্রধান অন্তরায়। বর্তমানে উৎপাদিত সবজি দেশের মোট চাহিদার মাত্র ২৫% সরবরাহ করতে পারে। বিদেশে সবজি রপ্তানির সুযোগ থাকায় সবজির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার জন্য বিএআরআই সবজির কিছু লবণাক্ত সহিষ্ণু জাত ও চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে যা দুর্যোগ সংঘটিত হলে দুর্যোগ উত্তর ক্ষতি পূরণ সম্ভব হবে।

- টমেটো
- বেগুন
- মুলা
- শিম
- জ্যাক শিম
- ঝাড় শিম
- মটরশুঁটি
- চিচিঙ্গা
- ফুলকপি
- বাঁধাকপি
- চীনাকপি
- শাক
- ঢেঁড়স
- লাউ
- সীতা লাউ
- মিষ্টি কুমড়া
- ঝিঙ্গা
- লেটুস
- বরবটি
- করলা
- চালকুমড়া
- পটল
- পুঁইশাক
- ডাঁটা
- মিষ্টি মরিচ
- চিনাল
- ব্রোকলি
- কামরাঙ্গা শিম
- পালংশাক
- স্কোয়াশ

টমেটো

টমেটো ভিটামিন সমৃদ্ধ একটি শীতকালীন সবজি। বাংলাদেশে ২০১৬-১৭ সালে প্রায় ২৭৬.৬৬ হাজার হেক্টর জমিতে টমেটো চাষ করা হয় এবং মোট ফলন ৩৮৮৭.২৫ হাজার টন। এতে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন 'এ' এবং ভিটামিন 'সি' রয়েছে। জাতের প্রকারভেদে টমেটোতে সাধারণত ৩০৫ আইইউ ভক্ষণযোগ্য বিটা ক্যারোটিন রয়েছে।

টমেটো ফসল

টমেটোর জাত

বারি টমেটো-১ (মানিক)

উচ্চ ফলনশীল জাত 'বারি টমেটো-১' বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৮৫ সালে স্থানীয় আবহাওয়ার উপযোগী করে উদ্ভাবন করা হয়। গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি, ফল কিছুটা লম্বাটে। ফলের ওজন ৮৫-৯৫ গ্রাম। প্রতিটি গাছে ২৫-৩০টি ফল ধরে। গাছপ্রতি ফলন ২.৫-৩.০ কেজি। চারা লাগানোর ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং গাছ থেকে মাসাধিককাল ফল সংগ্রহ করা যায়। এ জাতে ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা রয়েছে। জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৮৫-৯০ টন হয়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে 'বারি টমেটো-১' জাতের চাষ করা যায়।

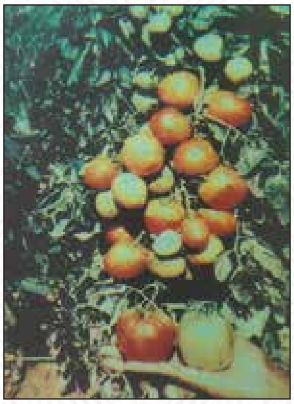

বারি টমেটো-১ এর ফসল

বারি টমেটো-২ এর ফসল

বারি টমেটো-২ (রতন)

'বারি টমেটো ২' জাতটি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। গাছের উচ্চতা ৭৫-৮০ সেমি। ফল গোলাকার। ফলের ওজন ৮৫-৯০ গ্রাম। প্রতিটি গাছে ৩০-৩৫টি ফল ধরে। গাছপ্রতি ফলন ২.০-২.৫ কেজি।

চারা লাগানোর ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে ১ম বার এবং প্রায় ২০ দিন পর্যন্ত ২-৩ বার ফল সংগ্রহ করা যায়। এ জাতের ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা রয়েছে।

জীবনকাল ১০৫-১১০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন হেক্টরপ্রতি ৮০-৮৫ টন হয়। 'বারি টমেটো-২' জাত বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষ করা যায়।

বারি টমেটো-৩

'বারি টমেটো-৩' নামে উদ্ভাবিত জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি। ফল মাংসল এবং কিছুটা চ্যাপ্টা আকৃতির। ফলের রং গাঢ় লাল। প্রতি ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। প্রতিটি গাছে ৩০-৩২টি ফল ধরে। গাছপ্রতি ফলন ২-৩ কেজি। চারা লাগানোর ৮৫-৯০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে। প্রতি গাছ থেকে ৭-৮ বার ফল সংগ্রহ করা যায়। এ জাতের গাছ ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। চারা রোপণের পর থেকে জীবনকাল ১১০-১১৫ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন হেক্টরপ্রতি ৮৫-৯০ টন হয়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এই জাতটি চাষ করা যায়।

বারি টমেটো-৩ এর ফসল

বারি টমেটো-৪ এর ফসল

বারি টমেটো-৪

এ জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। ফলের রং লাল এবং গোলাকার। প্রতিটি ফলের ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম। প্রতিটি গাছে ২০-২৫টি ফল ধরে। গাছপ্রতি ফলন প্রায় ৯০০-১০০০ গ্রাম। চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ শুরু করা যায়। চারা লাগানোর পর থেকে জীবনকাল ৯০-৯৫ দিন। 'বারি টমেটো-৪' জাতটি উচ্চ তাপ সহনশীল এবং সারা বছরই এর চাষ করা যায়। গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে পলিথিন ছাউনিতে চাষ করতে হয় এবং টমেটোটোন নামক হরমোন প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি পায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে বর্ষা মৌসুমে ফলন হেক্টরপ্রতি ২০-২২ টন হয়।

আগাম সবজি হিসেবে ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-সেপ্টেম্বর) মাসে 'বারি টমেটো-৪' জাত চাষ করা যায়। এ জাত চাষ করে বর্ষা মৌসুমে আর্থিক দিক থেকে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

বারি টমেটো-৫ এর ফসল

বারি টমেটো-৫

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি টমেটো-৫' জাতটি ১৯৯৬ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়। 'বারি টমেটো-৫' এর ফল হৃদপিণ্ডাকৃতির। প্রতি ফলের ওজন ৪০-৫০ গ্রাম। প্রতিটি গাছে ২০-২২টি ফল ধরে। গাছপ্রতি ফলন ৮০০-১০০০ গ্রাম। চারা লাগানোর ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে ১ম ফল সংগ্রহ শুরু হয়। টমেটোটোন নামক হরমোন প্রয়োগের ফলে গ্রীষ্ম মৌসুমে ফলন বাড়ে। জাতটি উচ্চ তাপ এবং ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল। শীত মৌসুমে আগাম চাষ করা যায়। জীবনকাল ৯৫-১০০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন গ্রীষ্মকালে হেক্টরপ্রতি ২০-২২ টন হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে পলিথিনের ছাউনিতে চাষ করতে হয় এবং বর্ষা মৌসুমে মূল্য বেশি থাকে বলে এ জাতের টমেটো চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

বারি টমেটো-৬ (চৈতী)

বাছাই প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত 'বারি টমেটো-৬' জাতটি ১৯৯৮ সালে 'চৈতী' নামে অনুমোদন করা হয়। টমেটোর এ জাত উচ্চ ফলনশীল এবং উচ্চ তাপ সহ্য করতে পরে। গাছ লম্বা আকৃতির, উচ্চতা ১২০-১৪০ সেমি। ফুল ও ফল ধারণকালেও গাছের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। ফল গোলাকার এবং রং হালকা লাল। ফলের ত্বকের উপরে আংশিক শিরা বিদ্যমান। প্রতিটি ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। প্রত্যেক গাছে ৩০-৪০টি ফল ধরে। চারা লাগানোর ৮০-৯০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে। এ জাতের টমেটো জমি থেকে মাসাধিককাল ধরে সংগ্রহ করা যায়। জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল। জীবনকাল ১০০-১১০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন শীত মৌসুমে ৮০-৯০ টন এবং গ্রীষ্ম মৌসুমে ৪৫-৫০ টন হয়। বর্ষা মৌসুমে পলিথিন ছাউনিতে চাষ করতে হয়। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে আশানুরূপ ফল ধারণের জন্য টমেটোটোন নামক হরমোন প্রতি লিটার পানিতে ২০ মিলি মিশিয়ে ফুলে স্প্রে করতে হয়। এভাবে সারা বছর এ জাতের টমেটো চাষ করা যেতে পারে।

বারি টমেটো-৬

বারি টমেটো-৭

বারি টমেটো-৭ (অপূর্ব)

বাছাই প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত 'বারি টমেটো-৭' জাতটি ১৯৯৮ সালে 'অপূর্ব' নামে অনুমোদন করা হয়। ফলের উপরে বোঁটার গোড়ায় তারকার মতো চিহ্ন থাকে। ফলের রং গাঢ় হলদে থেকে কমলা। ফল সামান্য চ্যাপ্টা। প্রতিটি ফলের ওজন ১৪৫-১৫৫ গ্রাম। প্রতি গাছে ৩০-৩২টি ফল ধরে। গাছপ্রতি ফলন ৩.০-৩.৫ কেজি। চারা লাগানোর ৮০-৮৫ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে। এক মৌসুমে ৬-৭ বার ফল সংগ্রহ করা যায়। 'বারি টমেটো-৭' বিটা ক্যারোটিন সমৃদ্ধ। ১০০ গ্রাম টমেটোতে প্রায় ৭ মিলিগ্রাম ক্যারোটিন থাকে। জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল। জীবনকাল ১০০-১১০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ১০০-১০৫ টন হয়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতটি শীত মৌসুমে চাষ করা যায়। পারিবারিক বাগানে চাষের জন্য এ জাত বিশেষ উপযোগী।

বারি টমেটো-৮ (শিলা)

বাছাই প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত 'বারি টমেটো-৮' জাতটি ১৯৯৮ সালে 'শিলা' নামে অনুমোদন করা হয়। জাতটি উচ্চ ফলনশীল এবং গাছ খাটো আকৃতির। ফল বর্গাকৃতি থেকে গোলাকার। ফলের রং হালকা লাল। ফল মাংসল এবং

ফলের ত্বক অত্যন্ত পুরু ও শক্ত। প্রতিটি গাছে ২৫-৩০টি ফল ধরে। ফলের ওজন ১০০-১১৫ গ্রাম। গাছপ্রতি ফলন ২.৫-৩.০ কেজি। চারা লাগানোর ৮০-৮৫ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে। এক মৌসুমে ৪-৫ বার ফল সংগ্রহ করা যায়। এ জাত ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল। সংগৃহীত পাকা ফল ঘরের তাপমাত্রায় ১৫-২০ দিন সংরক্ষণ করা যায়। জীবনকাল ১০০-১১০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৯০-৯৫ টন হয়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতটি শীত মৌসুমে চাষ করা যায়।

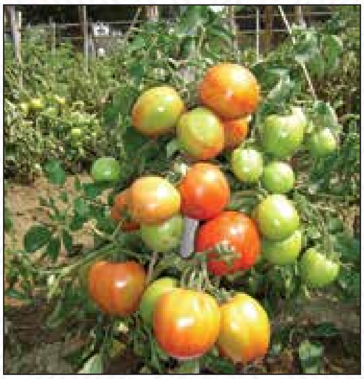

বারি টমেটো-৮ এর ফসল

বারি টমেটো-৯ (লালিমা)

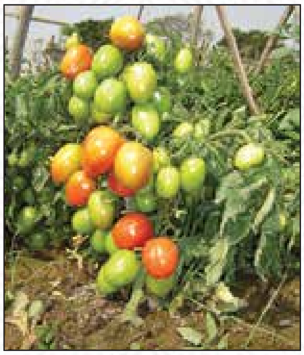

বারি টমেটো-৯ এর ফসল

উদ্ভাবিত 'বারি টমেটো-৯' জাতটি ১৯৯৮ সালে লালিমা নামে অনুমোদন করা হয়। গাছ খাটো ধরনের। ফল ডিম্বাকৃতির। ফলের নিচে সামান্য চোখা। প্রতিটি গাছে ৩২-৩৫টি ফল ধরে। গাছপ্রতি ফলন ২-৩ কেজি। চারা লাগানোর ৭৫-৮০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে। এক মৌসুমে ৩-৪ বার ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক পুরু। জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল। সংগৃহীত ফল ঘরের তাপমাত্রায় ৩ সপ্তাহের অধিক সময় সংরক্ষণ করা যায়। জীবনকাল ৯৫-১০৫ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৮০-৯০ টন হয়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতের চাষ করা যায়।

বারি টমেটো-১০ (অনুপমা)

'বারি টমেটো-১০' একটি উচ্চ ফলনশীল সংকর জাত। গ্রীষ্ম মৌসুমে চাষের উপযোগী করে এ জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতটি ১৯৯৮ সালে 'অনুপমা' নামে অনুমোদন করা হয়। ফল ডিম্বাকৃতির হয় এবং প্রতিটি গাছে ৭৫-৮০টি ফল ধরে। একটি ফলের ওজন ২৫-৩০ গ্রাম। গাছপ্রতি ফলন ২.০-২.৫ কেজি। চারা লাগানোর ৬০ দিরে মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং মাসাধিককাল ফল সংগ্রহ করা চলে। এ জাত উচ্চ তাপ সহনশীল এবং ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল। গ্রীষ্ম মৌসুমে টমেটো উৎপাদনের জন্য হরমোন প্রয়োগের প্রয়োজন নেই তবে হরমোন প্রয়োগে ফলন বাড়ে। টমেটোর ত্বক পুরু ও দৃঢ় বিধায় অধিক কাল সংরক্ষণ করা যায়। এজন্য এ জাতটি দূর-দূরান্তে সরবরাহের উপযোগী। জীবনকাল ৯০-১০০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪০-৫৫ টন। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে জাতটি চাষ করা যায়। এ জাতের টমেটো গ্রীষ্ম মৌসুমে পাওয়া যায় বলে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

বারি টমেটো-১০

বারি টমেটো-১১ (ঝুমকা)

বারি টমেটো-১১ এর ফসল

AVRDC হতে প্রাপ্ত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বারি টমেটো-১১' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। গাছ লম্বাকৃতির ও কম ঝোপালো। ফলের আকার ছোট। ফলের ওজন ৮-১০ গ্রাম। প্রতি গুচ্ছে ১৫-২০টি ফল আঙ্গুরের মত থোকায় থোকায় ধরে। গাছপ্রতি ১৮০-২০০টি ফল ধরে এবং গাছপ্রতি ফলন প্রায় ১ কেজি। চারা লাগানোর ৭০-৭৫ দিন পর ফল পাকতে শুরু করে এবং মাসাধিককাল ফল সংগ্রহ করা চলে। বাংলাদেশের সব অঞ্চলেই এই জাতটি চাষ করা যায়। চৈত্র-কার্তিক মাসে এ জাতের চারা রোপণ করা হয়। জীবনকাল ১০০-১১০ দিন। ফলন শীত মৌসুমে ৩৫-৪৫ টন/হেক্টর এবং গ্রীস্ম মৌসুমে ২৫-২২ টন/হেক্টর। সারা বছর চাষাবাদযোগ্য। ফল অধিক মিষ্টি। সাধারণ তাপমাত্রায় দুই সপ্তাহ ফল সংরক্ষণ করা যায়।

বারি টমেটো-১৪

বারি টমেটো-১৪ এর ফসল

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় আবহাওয়ায় উৎপাদন উপযোগী জাত ২০০৭ সালে অনুমোদিত হয়। আগাম এবং শীত পরবর্তী সময়ের জন্য অনুমোদিত। আকর্ষণীয় লাল মাংসল এবং বড় গোলাকার ফল (৯০-৯৫ গ্রাম)। দীর্ঘ সময় সংগ্রহের উপযোগী (৪৫-৬০ দিন)। অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী। ফলন ৯০-৯৫ টন/হেক্টর।

বারি টমেটো-১৫ এর ফসল

বারি টমেটো-১৫

২০০৯ সালে সারা দেশে চাষপোযোগী জাতটি অনুমোদন পায়। উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন জাত। ফল অনেকটা ডিম্বাকৃতির হয়। ফলে বীজের সংখ্যা অনেক কম। প্রতিটি গাছে গড়ে ৪০-৪৫টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৬৫-৭০ গ্রাম। চারা লাগানোর ৬০-৭০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ২৫-৩০ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক পুরু এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি হলুদ পাতা কোঁকড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল। জীবনকাল ১০০-১১০ দিন। ফলন ৮০-৮৫ টন/হেক্টর।

বারি টমেটো-১৬

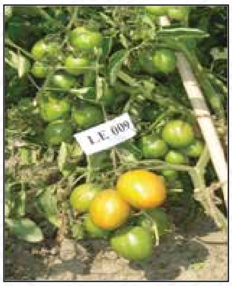

বারি টমেটো-১৬ এর ফসল

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষপোযোগী এ জাতটি ২০১৫ সালে অনুমোদন পায়। উচ্চফলনশীল শীতকালীন জাত। ফল গাঢ় লাল, অনেকটা অর্ধ গোলাকৃতির, তবে ফলে বীজের সংখ্যা অনেক কম। প্রতিটি গাছে গড়ে ৫১-৫৩ টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৭৫-৮০ গ্রাম। চারা লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ২০-২৫ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক পুরু এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংরক্ষণ করা যায়। এ জাতটি হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল। ফলন ৮৫-৯০টন/হেক্টর

বারি টমেটো-১৭ এর ফসল

বারি টমেটো-১৭

উচ্চ ফলনশীল ভাইরাস প্রতিরোধী জাত। এটি গত ২০১৫ সালে মুক্তায়িত হয়। ৪৫-৪৭ দিনে প্রথম ফুল আসে, ফল বড় আকারের লম্বাটে, লাল রঙের, টিএসএস ৪.৪৫%, যুক্ত আট প্রকোষ্ট (locule) বিশিষ্ট ঘন compact মাংসল ফল যার ১০০% ভক্ষণযোগ্য। ফলের গড় ওজন ১৮০-১৯০ গ্রাম। প্রতি গাছে ২৩-২৬ টি ফল ধরে। চারা লাগানোর ৬০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ২০-২৫ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ত্বক পুরু এবং দৃঢ় প্রকৃতির বিধায় অধিককাল সংগ্রহ করা যায়। এ জাতটি ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট এবং হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল।

বারি টমেটো-১৮

বারি টমেটো-১৮ এর ফসল

উচ্চ ফলনশীল এবং ভাইরাসরোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। এ জাতটি ২০১৫ সালে অবমুক্ত করা হয়। প্রতিটি গাছে গড়ে ফলের সংখ্যা ৩৭টি। এতে lycopene এর পরিমাণ বেশি। বীজ বপনের ৮৫-৯০ দিন পর ফসল তোলা যায়। গড় ফলন ৭০-৮০ টন/হেক্টর।

বারি টমেটো-১৯ এর ফসল

বারি টমেটো-১৯

উচ্চ ফলনশীল এ জাত বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ১ম প্রক্রিয়াজাত গুণ সম্পন্ন। এ জাতটি ২০১৫ সালে মুক্তায়িত হয়। ৪৪-৪৫ দিনে প্রথম ফুল আসে, ফল মাঝারি আকারের লম্বাটে, লাল রঙের, যুক্ত তিন প্রকোষ্ট (locule) বিশিষ্ট মাংসল ফল যার ১০০% ভক্ষণযোগ্য। ফলের গড় ওজন ৬০-৬১ গ্রাম। প্রতি গাছে ৫৮-৬২টি ফল ধরে। গড় ফলন প্রায় ৬৫-৬৭ টন/হেক্টর। প্রক্রিয়াজাতকরণ টমেটো জাত হিসেবে এটি অত্যন্ত ভালো।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: টমেটো এদেশে শীতকালীন ফসল। উচ্চ তাপমাত্রা এবং বাতাসের আর্দ্রতা টমেটো গাছে রোগ বিস্তারে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে। আবার উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ফুল ঝরে পড়ে। রাত্রির তাপমাত্রা ২৩° সে. এর নিচে থাকলে তা গাছে ফুল ও ফল ধারণের জন্য বেশি উপযোগী। গড় তাপমাত্রা ২০-২৫° সে. টমেটোর ভাল ফলনের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। আলো-বাতাস যুক্ত উর্বর দোঁআশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। তবে উপযুক্ত পরিচর্যায় বেলে দোঁআশ থেকে এঁটেল দোঁআশ সব মাটিতেই টমেটো ভাল জন্মে। বন্যার পানিতে ডুবে যায় এমন জমিতে এর ফলন সবচেয়ে ভাল হয়। মাটির অম্লতা ৬°- ৭° হলে ভাল হয়। মাটির অম্লতা বেশি হলে জমিতে চুন প্রয়োগ করা উচিত।

জমি তৈরি: টমেটোর ভাল ফলন অনেকাংশেই জমি তৈরির উপর নির্ভর করে। তাই ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মাটির প্রকৃতি ও স্থানভেদে ১ মিটার চওড়া ও ১৫-২০ সেমি উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া নালা করতে হবে যাতে পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধা হয়।

চারা রোপণ

- চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন অথবা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করতে হবে।
- এক মিটার চওড়া বেডে দুই সারি করে চারা লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং সারির উপরে চারা থেকে চারা ৪০ সেমি দূরত্বে লাগাতে হবে।
- বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ জন্য চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে।

বিকেলের পড়ন্ত রোদে চারা রোপণ করাই উত্তম এবং লাগানোর পর গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

সার প্রয়োগ (কেজি / শতাংশে)

সারের নাম	সার দেয়ার সময়	জমির উর্বরা শক্তি		
		কম	মধ্যম	বেশি
ইউরিয়া				
বেছাল		-	-	-
১ম উপরিপ্রয়োগ	চারা লাগানোর ১০ দিন পর	০.৩৬	০.২৪	০.১২
২য় উপরিপ্রয়োগ	চারা লাগানোর ২৫ দিন পর	০.৩৬	০.২৪	০.১২
৩য় উপরিপ্রয়োগ	চারা লাগানোর ৪০ দিন পর	০.৩৬	০.২৪	০.১২
টিএসপি				
বেছাল	জমি তৈরির সময়	০.৯১	০.৬১	০.৩০
এমপি				
বেছাল	শেষ চাষের সময়	০.১৭	০.১১	০.০৬
১ম উপরিপ্রয়োগ	চারা লাগানোর ২৫ দিন পর	০.১৭	০.১১	০.০৬
২য় উপরিপ্রয়োগ	চারা লাগানোর ৪০ দিন পর	০.১৭	০.১১	০.০৬
বোরিক এসিড	জমি তৈরির সময়	০.০৩	০.০২	-
জিপসাম	জমি তৈরির সময়	০.৫৪	০.৩৬	০.১৮
জিংক সালফেট	জমি তৈরির সময়	০.০৩	০.০২	-
গোবর				
বেছাল	জমি তৈরির সময়	৬০	৪০	২০

উৎস: FRG-2018, BARC

পরবর্তী পরিচর্যা

- **সেচ ও নিষ্কাশন:** চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্ম মৌসুমে টমেটো চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে তেমন একটা সেচের প্রয়োজন হয় না। টমেটো গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেচ অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য নালা পরিমিত চওড়া (৩০-৪০ সেমি) এবং এক দিকে মৃদু ঢালু হওয়া বাঞ্ছণীয়।
- **মালচিং:** প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।
- **আগাছা দমন:** টমেটোর জমিকে প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগছামুক্ত রাখতে হবে।
- **সার উপরি প্রয়োগ:** সময়মতো বর্ণিত মাত্রায় প্রয়োজনীয় সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- **বিশেষ পরিচর্যা:** ১ম ফুলের গোছার ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে। গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে।

গ্রীষ্ম ও বর্ষায় চাষ পদ্ধতি

- গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে টমেটো চাষ করার জন্য বারি টমেটো-৪, বারি টমেটো-৫, বারি টমেটো-৬, হরমোন সহযোগে এবং বারি টমেটো-১০, বারি টমেটো-১৩, বারি হাইব্রিড টমেটো-৩, বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, বারি হাইব্রিড টমেটো-৮ এবং বারি হাইব্রিড টমেটো-১০ জাতসমূহ হরমোন ছাড়া অনুমোদন করা হয়েছে।
- পলিথিনের ছাউনিতে এসব জাতের আবাদ করতে হয়। ২৩০ সেমি চওড়া (মাঝে ৩০ সেমি নালা সহ) ২টি বেডে লম্বালম্বিভাবে একটি করে ছাউনির ব্যবস্থা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ছাউনির দুপাশে উচ্চতা ১৩৫ সেমি ও মাঝখানের উচ্চতা ১৮০ সেমি হয়ে থাকে।

গ্রীষ্মকালে টমেটোর ফুটন্ত ফুলে হরমন প্রয়োগ

- চারা লাগানোর পূর্বেই জমিতে নৌকার ছইয়ের আকৃতি করে ছাউনি দিতে হয়। ছাউনির জন্য বাঁশ, স্বচছ পলিথিন, নাইলনের দড়ি ও পাটের সুতলি প্রয়োজন। পলিথিন যাতে বাতাসে উড়ে না যায় সেজন্য ছাউনির উপর দিয়ে উভয় পার্শ্ব থেকে আড়াআড়ি ভাবে দড়ি পেঁচানো হয়ে থাকে।
- পাশাপাশি দুই ছাউনির মাঝে ৫০ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে যাতে ছাউনি থেকে নির্গত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনসহ বিভিন্ন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। জমি থেকে বেডের উচ্চতা ২০-২৫ সেমি হতে হবে। প্রতিটি ছাউনিতে ২টি বেডে ৪টি সারি থাকবে। ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা প্রতি বেডে ২ সারি করে রোপণ করতে হবে।
- গ্রীষ্মকালীন টমেটো গাছে প্রচুর ফুল ধরলেও উচ্চ তাপমাত্রা পরাগায়নে বিঘ্ন ঘটায়। কাজেই আশানুরূপ ফলন পেতে হলে ‘টমাটোটোন’ নামক কৃত্রিম হরমোন ২০ মিলি ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ছোট সিঞ্চনযন্ত্রের সাহায্যে সপ্তাহে দুই বার শুধুমাত্র সদ্য ফোটা ফুলে স্প্রে করতে হয়।
- তবে নুতন উদ্ভাবিত হাইব্রিড জাতসমূহে হরমোন প্রয়োগ ছাড়াই লাভজনক ফলন পাওয়া যায়।

ফসল তোলা (পরিপক্কতা সনাক্তকরণ): ফলের ঠিক নিচে ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই ফল সংগ্রহ করতে হবে বাজার জাতকরণের জন্য। এতে ফল অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বারি হাইব্রিড টমেটো-৪ (গ্রীষ্মকালীন)

গ্রীষ্মকালীন এ সংকর (হাইব্রিড) জাতের ফল আকারে মাঝারী গোল ও আকষর্ণীয় লাল রঙের। ফলের গড় ওজন ৫০ গ্রাম। গাছপ্রতি গড়ে ৩০টি ফল ধরে এবং গাছপ্রতি ফলন প্রায় ১.৫ কেজি। গ্রীষ্ম মৌসুমে ফল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। তবে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে ফল ধারণ প্রায় দ্বিগুণ করা যায় এবং ফলনও অনেক বৃদ্ধি পায়।

বারি হাইব্রিড টমেটো-৪ এর ফসল

চারা লাগানোর ৬০ দিন পর ফল পাকতে শুরু করে এবং ২০-২৫ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ক্ষমতাও ভাল। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে সারা বছর এই জাতটি চাষ করা যায়। তবে গ্রীষ্ম-বর্ষাকালের জন্যই এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্ষাকালে অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন ছাউনিতে এর চাষ করা হয়। জ্যৈষ্ঠ-ভাদ্র মাস পর্যন্ত যে কোন সময় এ জাতের বীজ বপন করা যায়। জীবনকাল প্রায় ৯০ দিন (চারা লাগানোর পর)। ফলন ৪০ টন/হেক্টর।

বারি হাইব্রিড টমেটো- ৫

শীতকালীন হাইব্রিড জাত। বড় চ্যাপ্টা গোলাকৃতির আকর্ষণীয় লাল বর্ণের ফল। প্রতিটি গাছে গড়ে ৩৫-৪০ টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৯৫-১০০ গ্রাম। গাছপ্রতি ফলন গড়ে ৩.৫-৪.০ কেজি। চারা রোপণের ৮০-৯০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে শুরু করে এবং প্রায় ১ মাসব্যাপী ফল সংগ্রহ করা যায়। অধিক সংরক্ষণ গুণসম্পন্ন। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ এবং পাতা হলুদ পাতা কোকড়ানো ভাইরাস রোগের প্রতি সহনশীল।

বারি হাইব্রিড টমেটো-৮ (গ্রীষ্মকালীন)

উচ্চ তাপমাত্রায় ফুল ও ফল ধারণে সক্ষম। আকর্ষণীয় লাল বর্ণ বিশিষ্ট ত্বক এবং শাস। ফল বেশ মাংসল। প্রতিটি গাছে গড়ে ৪০-৪৫টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম। ফলের আকৃতি flattened round ধরনের। ফলন ৩৫-৪০ টন/হেক্টর।

বারি হাইব্রিড টমেটো-৯

উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন জাত। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সংগ্রহযোগ্য (৪৫-৫৫ দিন)। ৪৭-৫০ দিনে প্রথম ফুল আসে, ফল মাঝারী আকারের গোলাকার, লাল রঙের, টিএসএস ৪.০২%, যুক্ত পাঁচ প্রকোষ্ট (locule) বিশিষ্ট মাংসল ফল যার ১০০% ভক্ষণযোগ্য। ফলের গড় ওজন ৯০-৯৫ গ্রাম। প্রতি গাছে ৫০-৫৪ টি ফল ধরে। ফল গোলাকার এবং ফলে বীজের সংখ্যা কম। এ জাতটি টমেটো হলুদ পাতা মোড়ানো ভাইরাস রোগ সহনশীল।

বারি হাইব্রিড টমেটো-৯

বারি হাইব্রিড টমেটো-১০

বারি হাইব্রিড টমেটো-১০

বারি হাইব্রিড টমেটো-১০ জাতটি উচ্চ তাপ সহিষ্ণু উচ্চফলনশীল গ্রীষ্মকালীন হাইব্রিড জাত। জাতটি ২০১৭ সালে চাষাবাদের জন্য মুক্তায়িত হয়।

গাছে আকর্ষণীয় লাল রঙের মাঝারী আকারের ফল ধরে। গাছ প্রতি গড়ে ফলের সংখ্যা ২৪-২৮টি। প্রতি ফলের ওজন প্রায় ৬৮-৭১ গ্রাম। গ্রীষ্ম মৌসুমে ফল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না তবে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে ফলের ধারণ এবং আকার কিছুটা বাড়ে। ভালভাবে চাষাবাদের ব্যবস্থা করলে বীজবপনের ৮০-৯০ দিন পর ফসল তোলা যায়। ফসল তোলার হওয়ার পর প্রায় ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত টমেটো আহরণ করা যায়। জীবনকাল ১১০-১২০ দিন। জাতটি ভাইরাস জনিত রোগ প্রতিরোধী এবং ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগের প্রতি সহনশীল। উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে ফলন গ্রীষ্মকালে হেক্টর প্রতি প্রায় ৪৮-৫১ টন হয়।

বাংলাদেশের সব অঞ্চলে সারা বছর এই জাত টি চাষ করা যায় তবে গ্রীষ্ম বর্ষা কালের জন্যই এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে পলিথিনের ছাউনিতে চাষ করতে হয় এবং বর্ষা মৌসুমে মূল্য বেশি থাকে বলে এ জাতের টমেটো চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

বারি হাইব্রিড টমেটো-১১

গ্রীষ্মকালীন এই হাইব্রিড জাতটি চাষাবাদের জন্য বারি হাইব্রিড টমেটো-১১ হিসেবে ২০১৮ সালে অবমুক্ত হয়। টমেটোর এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল এবং উচ্চ তাপ সহ্য করতে পারে। গাছে আকর্ষণীয় লাল রঙের মাঝারী আকারের Oblong ফল ধরে। প্রতি গাছে ২০-২৫ টি ফল ধরে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৭৫-৮০ গ্রাম। গ্রীষ্ম মৌসুমে ফল উৎপাদনের জন্য কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না তবে হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে ফলের ধারণ এবং আকার কিছুটা বৃদ্ধি পায়। সাধারণত বীজ বপনের

৯০-৯৫ দিন পর থেকে টমেটো পাকতে শুরু করে এবং ফসল তোলা যায়। এ জাতের টমেটো মাসাধিক কাল ধরে সংগ্রহ করা যায়। জীবনকাল ১২০-১৩০ দিন। জাতটি টমেটোর দাগ যুক্ত ঢলে পড়া (TSWV), টমেটোর হলুদ পাতা কুঁকড়ানো ভাইরাস (TYLCV) এবং ঢলে পড়া জনিত রোগের প্রতি সহনশীল। উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে ফলন গ্রীষ্মকালে হেক্টরপ্রতি প্রায় ৪৮-৫০ টন হয়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে সারা বছর এই জাতটি চাষ করা যায় তবে গ্রীষ্ম বর্ষা কালের জন্যই এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। গ্রীষ্মবর্ষা মৌসুমে পলিথিনের ছাউনি তে চাষ করতে হয় এবং বর্ষা মৌসুমে মূল্য বেশি থাকে বলে এ জাতের টমেটো চাষ করে অধিক লাভবান হওয়া যায়।

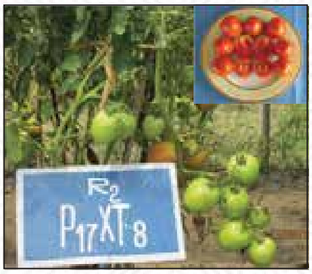

বারি হাইব্রিড টমেটো-১১

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: টমেটো এ দেশে শীতকালীন ফসল তবে কিছু কিছু জাত গ্রীষ্মকালেও চাষ করা যায়। উচ্চ তাপমাত্রা ও শুষ্ক আবহাওয়ায় টমেটোর ফুল ঝরে পড়ে। টমেটোর ভাল ফলনের জন্য তাপমাত্রা ২০-২৫° সে. উত্তম। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি টমেটো চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বারি হাইব্রিড টমেটো-৫, বারি হাইব্রিড টমেটো-৯ শীতকালে ও বারি হাইব্রিড টমেটো-৪, বারি হাইব্রিড টমেটে-৮, বারি হাইব্রিড টমেটো-১০ বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে চাষ উপযোগী।

বীজ বপনের সময় : শীতকালে অক্টোবর-নভেম্বর (আশ্বিন-কার্তিক) এবং গ্রীষ্মকালে এপ্রিল-জুন (বৈশাখ-আষাঢ়)

জমি তৈরি : টমেটোর ভাল ফলন অনেকাংশে জমি তৈরির ওপর নির্ভর করে। তাই ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। মাটির প্রকৃতি ও স্থান এবং রোপণকাল ভেদে ২০-৩০ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে। এত অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতজনিত পানি দ্রুত নিষ্কাশিত হতে পারে এবং প্রয়োজনে সেচ দেয়ার সুবিধা হয়। কম বৃষ্টিপাত এলাকায় বা বর্ষার আগে ও শীতের আগে খোলা মাঠে চাষের ক্ষেত্রে এইভাবে জমি তৈরি করতে হবে।

পলিথিন ছাউনি : ভরা বর্ষা মৌসুমে লাগানো চারার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পরবর্তী সময় ভাল ফলনের নিশ্চয়তার জন্য বেডে বা মিড়িতে নৌকার ছইয়ের আকৃতি করে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ছাউনি দিতে হবে। ২৩০ সেমি চওড়া (মাঝে ৩০ সেমি নালাসহ) দুটি মিড়িতে লম্বালম্বিভাবে ১টি করে ছাউনির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে ছাউনির উচ্চতা হবে দুপাশে ৪.৫ ফুট বা ১৩৫ সেমি ও মাঝখানে ৬ ফুট বা ১৮০ সেমি দু'টি ছাউনির মাঝে অন্তত ৫০ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে যাতে করে ছাউনি থেকে নির্গত বৃষ্টির পানি নিষ্কাশনসহ বিভিন্ন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। পলিথিন ছাউনি লম্বায় জমির আকার আকৃতির ওপর নির্ভর করে কমবেশি হতে পারে কিন্তু চওড়া (বাজারে প্রাপ্ত পলিথিনের সর্বোচ্চ চওড়া অনুযায়ী) ২.৩ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়। ছাউনি ২০ মিটার লম্বা হলে প্রতি হেক্টরে এ ধরনের প্রায় ১৭০টি ছাউনি প্রয়োজন হতে পারে।

বীজ শোধন : কেজিপ্রতি ২ গ্রাম ভিটাভেক্স দিয়ে টমেটোর বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধন করলে বীজবাহিত রোগ হতে রক্ষা পাওয়া যায়।

চারা উৎপাদন : সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য প্রথমে ৫০ গ্রাম পরিপক্ব ও রোগমুক্ত বীজ ঘন করে ৩ মি.× ১মি. আকারের বীজতলায় বুনতে হবে। এই হিসেবে প্রতি হেক্টরে ২০০ গ্রাম (১ গ্রাম প্রতি শতাংশ) বীজ বুনতে হয়। গজানোর ৮-১০ দিন পর চারা দ্বিতীয় বীজতলায় ৪ × ৪ সেমি দূরত্বে স্থানান্তর করতে হবে। এক হেক্টর জমিতে টমেটো চাষের জন্য এইরূপ ২২টি বীজতলার প্রয়োজন হয়।

সার প্রয়োগ : ভাল ফলন পাওয়ার জন্য জমিতে সুষম সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সারের মাত্রা জমির উর্বরতার ওপর নির্ভরশীল। মধ্যম উর্বর জমিতে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করা হয়।

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় দেয়	১ম কিস্তি	উপরি প্রয়োগ ২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
গোবর/কম্পোস্ট	২০০০	২০০০	-		
ইউরিয়া	০.৭৯	-	০.২৭	০.২৭	০.২৭
টিএসপি	০.৭৩	০.৭৩	-	-	-
এমপি	০.৩৭	০.১৯	-	০.১০	০.১০
জিপসাম	০.৩৮	০.৩৮	-	-	-
জিংক সালফেট	০.৩০	০.৩০	-	-	-
বরিক এসিড	০.০৩	০.০৩	-	-	-

উৎস: FRG-2018, BARC)

সারের প্রয়োগ (কেজি/শতাংশ)- নিম্ন উর্বরতাসম্পন্ন জমির জন্য

শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর/কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট, বরিক এসিড এবং অর্ধেক এমপি সার জমিতে ভালভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক এমপি সার দুই কিস্তেতে চারা লাগানোর ২৫ দিন ও ৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে চারা লাগানোর ১০, ২৫ ও ৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগকৃত ইউরিয়া এবং এমপি সার গাছের গোড়ায় ১০-১৫ সেমি দূরে মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণ : চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে বীজতলা থেকে উঠিয়ে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। এক মিটার চওড়া বেডে দুই সারি করে চারা লাগাতে হবে। এক্ষেত্রে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং সারিতে চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ৪০ সেমি। বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। বিকেলের পড়ন্ত রোদে চারা রোপণ করাই উত্তম। লাগানোর পর গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা :

১. **সেচ ও নিষ্কাশন:** চারা রোপণের পর ৩-৪ দিন পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তী সময় প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। টমেটো গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। সেচ অথবা বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের জন্য ৩০-৪০ সেমি চওড়া নালা এবং এক দিকে সামান্য ঢালু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২. **নিড়ানী দেয়া:** প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে।

৩. **আগাছা দমন:** ১ম পুষ্পমঞ্জুরীর ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া নিচের সব পার্শ্বকুশি ছাঁটাই করতে হবে। গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ : ফলের নিচের ফুল ঝরে যাওয়ার পর যে দাগ থাকে ঐ স্থান থেকে লালচে ভাব শুরু হলেই বাজারজাতকরণের জন্য ফল সংগ্রহ করতে হবে। এরূপ ফল সংগ্রহ করলে অনেকদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বেগুন

বেগুন বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় সবজি। সারা বছরই এর চাষ করা যায়। তবে শীত মৌসুমে ফলন বেশি হয়। এ দেশে বহু জাতের স্থানীয় বেগুন রয়েছে। তবে ফলনের দিক থেকে এদের কোনটিই তেমন উচ্চ ফলনশীল নয়। স্থানীয় জাতের ব্যাপক জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়া, সংকরায়ণ ও জিন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বেগুনের ফসল

বেগুনের জাত

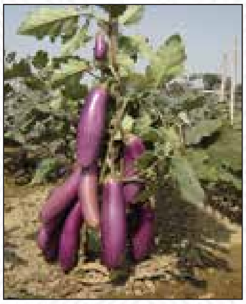

বারি বেগুনের-১ এর ফসল

বারি বেগুন-১ (উত্তরা)

'বারি বেগুন-১' জাতটি ১৯৮৫ সালে উত্তরা নামে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের গাছ খাটো ও ছড়ানো। পাতা ও শাখার রং হালকা বেগুনী। ফল সরু ও লম্বা, ১৮-২০ সেমি ত্বক পাতলা, শাঁস নরম। চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং ৩-৪ মাস পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। প্রতিটি গাছে ৫০-৫৫টি ফল ধরে। গাছে গুচ্ছাকারে ফল ধরে। এ জাতের গাছের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে কম হয়। জীবনকাল ১৬০-১৭০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০-৫৫ টন হয়। শীতকালে বাংলাদেশের সর্বত্র এ জাতের চাষ করা যায়। আগাম জাত হিসেবেও উত্তরা বেগুন চাষ করা যায়।

বারি হাইব্রিড বেগুন-২ (তারাপুরী)

বারি বেগুন-২ এর ফসল

'বারি হাইব্রিড বেগুন-২' একটি উচ্চ ফলনশীল সংকর জাত। ১৯৯২ সালে জাতটি তারাপুরী নামে অনুমোদিত হয়। ফল কালচে বেগুনী রঙের এবং বেলুনাকৃতির। ফলের ত্বক পাতলা, শাঁস নরম। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৪০-৪৫টি। ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ প্রতিরোধী।

এ জাত উচ্চ ফলনশীল। জীবনকাল ১৮০-১৯০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৫৫-৬০ টন হয়। শীতকালে বাংলাদেশে সর্বত্র এ জাতের চাষ করা যায়।

বারি বেগুন-৪ এর ফসল

বারি বেগুন-৪ (কাজলা)

সংকরায়ণ ও পরবর্তী সময়ে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি বেগুন-৪' জাতটি ১৯৯৮ সালে 'কাজলা' নামে অনুমোদন করা হয়। উচ্চ ফলনশীল এ জাতের ফলের আকার মাঝারী লম্বা, রং কালচে বেগুনী ও চকচকে। কাজলা জাতের গাছের আকৃতি মাঝারী ছড়ানো। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৫০-৫৫টি। প্রতি ফলের ওজন ৯০-১০০ গ্রাম।

বীজ লাগানোর ৯০-৯৫ দিন পর ফল ধরে এবং ১৯০ দিন অর্থাৎ আশ্বিন-চৈত্র মাস (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-এপ্রিল) পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। কাজলা বেগুনের ফলন হেক্টরপ্রতি ৫০-৫৫ টন হয়।

বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা)

বারি বেগুন-৫ এর ফসল

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'বারি বেগুন-৫' জাতটি ১৯৯৮ সালে 'নয়নতারা' নামে অনুমোদন করা হয়। এ জাত উচ্চ ফলনশীল। এ জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফল গোলাকৃতি, রং উজ্জ্বল কালচে বেগুনী। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩০-৩২টি এবং প্রতিটি ফলের ওজন ১৫০-১৬০ গ্রাম। এ জাতটি অন্যান্য জাতের তুলনায় আগাম ফলন দেয়। আশ্বিন মাসে (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর) চারা রোপণ করলে চৈত্র মাস (মধ্য-মার্চ থেকে মধ্য-এপ্রিল) পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। এই জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও জলবায়ুতে চাষ করা যায়। ভাদ্র-অগ্রহায়ণ (শীতকাল) মাসে এ জাত রোপণ করা হয়। বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং ১৬০-১৮০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। ফলন ৪৫-৫০ টন/হেক্টর।

বারি বেগুন-৬ এর ফসল

বারি বেগুন-৬

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির ঝোপালো। হালকা সবুজ রঙের ফল ডিম্বাকৃতির ও গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ২০-২২টি, লম্বায় ৮-৯ সেমি এবং ব্যাস ৭-৮ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ২০০-২২৫ গ্রাম।

জাতটি সারা বছর চাষ করা যায় তবে শীতকালে এর ফলন বেশি হয়। এই জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও জলবায়ুতে চাষ করা যায়। এ জাতের রোপণ সময় ভাদ্র-অগ্রহায়ণ (শীতকালে) ও ফাল্গুন-বৈশাখ (গ্রীষ্মকালে)। বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং ১৭০-১৯০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। ফলন ৪৫-৫০ টন/হেক্টর (শীতকালে)।

বারি বেগুন-৭

বারি বেগুন-৭ এর ফসল

উচ্চ ফলনশীল জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফলের আকার লম্বা, চিকন এবং রং চকচকে গাঢ় বেগুনী। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ৩০-৩৫টি ও ফল লম্বায় ২৫-২৭ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ১১০-১২০ গ্রাম। সারা বছর চাষ করা যায় তবে শীতকাল এ জাতটির প্রকৃত মৌসুম। বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়। জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও সব এলাকায় চাষ করা যায়। এ জাতের রোপণ কাল ভাদ্র-অগ্রহায়ণ (শীতকালে) ও ফাল্গুন-বৈশাখ (গ্রীষ্মকালে)। ফলন ৪০-৪৫ টন/হেক্টর (শীতকালে) ও ২৫ টন/হেক্টর (গ্রীষ্মকালে)।

বারি বেগুন-৮ এর ফসল

বারি বেগুন-৮

উচ্চ ফলনশীল গ্রীষ্মকালীন এ জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির। ফলের আকার লম্বাকৃতি, চিকন এবং রং উজ্জ্বল কালচে বেগুনী। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ৩০-৩৫টি ও লম্বায় ২৫-৩০ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ১১৫-১২০ গ্রাম।

জাতটি সারা বছর চাষ করা যায়। দেশের সর্বত্র এটি চাষ করা যায়। ফলন ৪৫-৫০ টন/হেক্টর (শীতকালে) ও ২৫-৩০ টন/হেক্টর (গ্রীষ্মকালে) জাতটি ব্যাক্টেরিয়াজনিত ঢলে পড়া ও কৃমি রোগ প্রতিরোধী।

বেগুন-৯

বারি বেগুন-৯

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির, ঝোপাল ও কিছুটা খাজকাটা পাতা বিশিষ্ট। ডিম্বাকৃতির ও উজ্জ্বল সবুজ রঙের। ফলের নিচের অংশে সাদা সাদা লম্বাটে দাগ থাকে। প্রতি গাছে গড় ফল সংখ্যা ৩০-৩৫টি এবং ফলের গড় ওজন ১৩০-১৪০ গ্রাম। ফলন প্রতি হেক্টরে ৪২-৪৫ টন। এ জাতের বেগুন ঢলে পড়া, কৃমি ও শিকড় পচা রোগ সহনশীল।

বারি বেগুন-১০

বারি বেগুন-১০

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির ঝোপালো। ফলের রং উজ্জ্বল গাঢ় বেগুনী এবং লম্বা নলাকৃতির। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ২৫-৩০টি ও লম্বায় ২৫-৩০ সেমি, প্রতিফলের গড় ওজন ১২০-১৩০ গ্রাম। তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় সারা বছর চাষ করা যায়। তবে শীতকালে ভাল ফলন হয়। প্রতি হেক্টরে ফলন ৪৫-৫০ টন। গ্রীষ্মকালে ফলন ২৫-৩০ টন।

বারি হাইব্রিড বেগুন-৩

বারি হাইব্রিড বেগুন-৩

'বারি হাইব্রিড বেগুন-৩' জাতটি বাংলাদেশে শীতকালে চাষাবাদের উপযোগী। এ জাতটি বাংলাদেশের সব ধরনের মাটিতে ও জলবায়ুতে চাষ করা যায়। এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির, ঝোপালো ও খাঁজকাটা পাতা বিশিষ্ট। বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ শুরু হয় এবং ১৭০-১৮০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। ফল লম্বাটে, নল আকৃতির ও গাঢ় বেগুনী রঙের। প্রতি গাছে গড় ফল সংখ্যা ৫০-৫৫ এবং ফলের গড় ওজন ১০০-১১০ গ্রাম। গড় ফলন ৫৫-৬০ টন/হেক্টর। এ জাতের বেগুন ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।

বারি হাইব্রিড বেগুন-৪

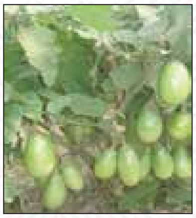

বারি হাইব্রিড বেগুন-৪

এ জাতটির গাছ মাঝারী আকৃতির এবং ঝোপালো প্রকৃতির। 'বারি হাইব্রিড বেগুন-৪' বাংলাদেশে শীতকালে চাষাবাদ উপযোগী। ফল হালকা সবুজ ও ডিম্বাকৃতির। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ৪৫-৫০ এবং ফলের গড় ওজন ১১০-১২০ গ্রাম। গড় ফলন ১৬০-১৮০ টন/হেক্টর। এ জাতের বেগুনের জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন এবং এ জাতের বেগুন ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু : আমাদের দেশের সব রকমের মাটিতে বেগুন চাষ করা যায় এবং ভাল ফলনও দিয়ে থাকে। তবে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটিই এর চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। বেগুনের জন্য দীর্ঘ লম্বা সময়ব্যাপী নিম্ন তাপমাত্রা (১৫-২৫° সে.) সবচেয়ে উপযোগী। উচ্চ তাপমাত্রায় বেগুনের ফুল ও ফল উৎপাদন বিঘ্নিত হয় এবং এসময় অনিষ্টকারী পোকার আক্রমণ বেশি হয়। সে জন্য গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে এর উৎপাদন তত ভাল হয় না। তাই শীতকালই বেগুন চাষের উপযুক্ত সময়। তবে কিছু উচ্চ তাপমাত্রা সহিষ্ণুজাত গ্রীষ্মকালে ভাল ফলন দিয়ে থাকে।

বীজের হার : অঙ্কুরোদ্গমের হার ৮০% বিবেচনায় বীজের পরিমাণ ২০০-২৫০ গ্রাম/হেক্টর

বীজ বাছাই : বেগুনের বীজ বপনের পূর্বে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেয়া প্রয়োজন। ভাল ও বিশুদ্ধ বীজের অভাবে নির্দিষ্ট জাতের গুণাগুণ সম্পন্ন বেগুনের উচ্চ ফলন আশা পাওয়া যায় না। তাই অপুস্ট, ভাঙ্গা ও অন্য শষ্যের বীজ থাকলে তা বাছাই করা জরুরি।

বীজ শোধন : বীজতলায় বপনের পূর্বে বেগুনের বীজকে রাসায়নিক ঔষধ (প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ভিটাভেক্স-২০০ বা ক্যাপটান) ব্যবহার করে ভালোভাবে ঝাকিয়ে বীজ শোধন করা। বীজ শোধনের ফলে বেগুনের এ্যানথ্রাকনোজ, লিফস্পট, ব্লাইট ইত্যাদি রোগ ও বপন পরবর্তী সংক্রামণ রোধ সম্ভব হয়।

বীজতলা তৈরি ও পরিচর্যা :

- দোআঁশ মাটি, বালি ও পচা গোবর সার বা কম্পোস্ট মিশিয়ে বীজতলার মাটি তৈরি করতে হয়।
- বীজতলা সাধারণত এক মিটার চওড়া ও তিন মিটার লম্বা হবে। জমির অবস্থা ভেদে দৈর্ঘ্য বাড়ানো কমানো যেতে পারে।
- বীজতলায় সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য ৫ সেমি দূরত্বে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
- চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দ্বারা অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন।
- মূল জমিতে চারা লাগানোর পূর্বে বীজতলা থেকে তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় ১০-১২ দিনের চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করা হলে চারার শিকড় বিস্তৃত ও শক্ত হয়, চারা অধিক সবল ও তেজী হয়।
- চারা লাগানোর পর হালকা পানি দিতে হবে এবং বৃষ্টির পানি ও প্রখর রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন বা চাটাই দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

বীজতলায় বীজ বপনের সময় : সেপ্টেম্বর (শীতকালে), মার্চ (গ্রীষ্মকালে)

চারার বয়স :

- চারার বয়স ২৫-৩০ দিন অথবা ৪-৬ পাতা বিশিষ্ট হলে জমিতে রোপণ করতে হবে।
- বীজতলা থেকে চারা অত্যন্ত যত্ন সহকারে তুলতে হবে যেন চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এ জন্য চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে। চারা রোপণ করার পর গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।

চারার সংখ্যা : চারার সংখ্যা অনেকাংশেই জমিতে রোপণ দূরত্বের উপর নির্ভর করে। রোপণ দূরত্ব ১২০×৭০ সেমি হলে হেক্টর প্রতি ১১,৯০০ টি চারার প্রয়োজন হয়।

চারা রোপণ দূরত্ব : রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে জাতের উপর। ছড়ানো জাতের জন্য বেশি দূরত্ব প্রয়োজন হয়, খাড়া জন্য কম দূরত্ব প্রয়োজন হয়। সাধারনত ৭০ সেমি প্রশস্ত বেডে এক সারিতে চারা রোপণ করা হয়। দুইটি বেডের মাঝে ৫০ সেমি প্রশস্ত নালা থাকে। সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হবে ৭০ সেমি।

জমি তৈরি : ৪-৫টি চাষ দিয়ে এমন ভাবে জমি তৈরি করতে হয় যাতে জমিতে মাটির ঢেলা না থাকে। বেডে চারা রোপণই উত্তম।

জমির নকশা

বেডের আকার	প্রস্থ	:	৭০ সেমি
	দৈর্ঘ্য	:	জমির দৈর্ঘের উপর নির্ভর করবে
নালার আকার	প্রস্থ	:	৫০ সেমি
	গভীরতা	:	২০ সেমি
সুতরাং	রোপণ দূরত্ব	:	১২০×৭০ সেমি

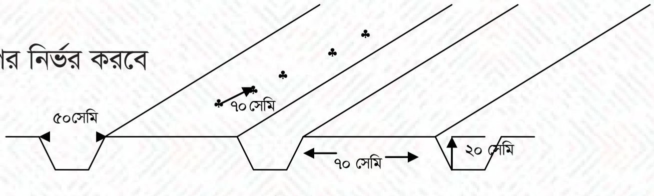

জমি তৈরির নকশা

সারের মাত্রা

সার	পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	শেষ চাষের সময় (কেজি)	গর্তে প্রয়োগ (কেজি)	চারা লাগানোর ১৫ দিন পর	ফুল ধরা আরম্ভ হলে	ফল ধরা আরম্ভ হলে	ফল আহরণের সময়	ফল আহরণের সময়
গোবর/ কম্পোস্ট	১০,০০০	৫,০০০	৫,০০০	-	-	-	-	-
ইউরিয়া	৩০০	-	-	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি
টিএসপি	২৫০	১২৫	১২৫	-	-			-
এমপি	২০০	-	৫০	৪৫.০ কেজি	৫২.৫ কেজি	৫২.৫ কেজি	-	-
জিপসাম	১০০	সব	-	-	-	-	-	-
বোরিক এসিড (বোরন)	১০	সব	-	-	-	-	-	-

সূত্র- FRG-2018/BARC

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

- শেষ চাষের সময় অর্ধেক গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি এবং সবটুকু জিপসাম ও বোরিক এসিড সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- বাকি অর্ধেক গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি এবং ৩৫-৪২.৫ কেজি এমপি সার চারা লাগানার ৭দিন পূর্বে গর্তে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- সম্পূর্ণ ইউরিয়া (৫টি কিস্তিতে) ও বাকি এমপি সার (প্রথম ৩টি কিস্তিতে) যথাক্রমে চারা লাগানো ১৫ দিন পর, ফুল ধরা আরম্ভ হলে, ফল ধরা আরম্ভ হলে, ফল আহরণের সময় ২ বার সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

খুঁটি দেওয়া ও পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করা : গাছে বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঠেকনা দিতে হবে। গাছে ১ম ফুলের ঠিক নিচের কুশিটি ছাড়া সব পার্শ্ব কুশি ছাঁটাই করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা : জমিকে প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিয়ে আগছামুক্ত রাখতে হবে। প্রতিটি সেচের পরে মাটির উপরিভাগের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে মাটিতে পর্যাপ্ত বাতাস চলাচল করতে পারে। প্রয়োজনীয় নিড়ানী দিলে মাটিত শিকড়ের বৃদ্ধি ভাল হয়।

সেচ : চারা রোপণের ৩-৪ দিন পর পর্যন্ত হালকা সেচ ও পরবর্তীতে প্রতি কিস্তি সার প্রয়োগের পর জমিতে সেচ দিতে হয়। গ্রীষ্ম ও শীত মৌসুমে চাষের জন্য ঘন ঘন সেচের প্রয়োজন হয়। বর্ষা মৌসুমে তেমন একটা সেচের প্রয়োজন হয় না।

বেগুন গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। বেডের দুপাশের নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক। খরিফ মৌসুমে জমিতে পানি যাতে না জমে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের জন্য জমির চারপাশে নালা রাখতে হবে।

পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন প্রকার পোকা ও মাকড় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেগুন উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। এদের মধ্যে সাদামাছি, এফিড, থ্রিপস, পাতার হপার পোকা, কাঁটালে পোকা এবং মাকড় অন্যতম।

বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন ব্যবস্থাপনা : কচি ডগা ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। বেগুনের বোঁটার নিচে ছোট ছিদ্র দেখা যায়। আক্রান্ত ফলের ভিতরটা ফাঁপা ও পোকার বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ থাকে।

পোকা আক্রান্ত ডগা ও ফল ধ্বংস করা : কীড়া সমেত আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করা।

সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার : সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার করে পোকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভব।

পরজীবি ও পরভোজী পোকা ব্যবহার করা : ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার পরজীবি পোকা যেমন- *ট্রাথালা ফ্লেভো-অরবিটালিস* ও পরভোজী পোকা যেমন- ম্যনটিড, এয়ার-উইগ, পিঁপড়া, লেডি বার্ড বিটেল, মাকড়সা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বেগুনের জমিতে এরা প্রচুর পরিমাণে ডগা ও ফলছিদ্রকারী পোকাই কেবল ধ্বংস করে না সাথে সাথে অন্যান্য ক্ষতিকারক পোকা যেমন- জ্যসিড, সাদা মাছি ইত্যাদির সংখ্যা স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে সাহায্য করে।

বিষাক্ত কীটনাশকের প্রয়োগ বন্ধ বা সীমিত ব্যবহার : একান্ত প্রয়োজনে কেবলমাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক (ট্রেসার প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি) ব্যবহার করা যেতে পারে।

সাদা মাছি দমন ব্যবস্থাপনা

- বীজতলার চারা সূক্ষ্ম নেটের দ্বারা ঢেকে দিতে হবে। এর ফলে চারাগুলি সাদামাছির আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকবে।
- ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্ট করে ফেলতে হবে এবং আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। নিম বীজ ভিজানো পানি (প্রতি লিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধ ভাঙ্গা নিম বীজ ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে) প্রয়োগ করতে হবে।
- আঠালো হলুদ ফাঁদ (Yellow Sticky Trap) ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রমণের শুরুতে বায়োনিম প্লাস (Azadiractin) @ ১মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হবে।
- আক্রমণের শুরুতে Difenthiuron গ্রুপ এর কীটনাশক @ ১ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হবে অথবা আক্রমণের শুরুতে Chlorfenapyr গ্রুপ এর কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

থ্রিপস দমন ব্যবস্থাপনা

- সঠিকভাবে সেচ প্রদান করতে হবে। কারণ, পোকার রস শোষণের ফলে ক্রমান্বয়ে গাছের কোষ থেকে পানি বের হয়ে পানি শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সেচ বা জমি ভিজিয়ে দিলে মাটিতে বিদ্যমান থ্রিপসের প্রিপিউপা ও পউপা মারা যায়।
- মাঠে অসংগ্রহকৃত গাছ তুলে ফেলতে হবে এবং আগাছা দমন করতে হবে।
- ফসলের ক্ষেতে সাদা আঠালো ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রমণের শুরুতে সাকসেস ২.৫ এস সি (Spinosad) প্রতি লিটার পানিতে ১.২ মিলি মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে অথবা আক্রমণের শুরুতে ইনটিপ্রিড ১০ এস সি (Chlorfenapyr) প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

জাব পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

- সংগ্রহের পর ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্ট করা।
- আঠালো হলুদ ফাঁদ (Yellow Sticky Trap) ব্যবহার করতে হবে।
- বায়োনিম প্লাস (Azadiractin)@ ১ মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হবে।
- সুমিথিয়ন ৫০ ইসি বা ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি বা ফাসটাক ২ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি অথবা এসাটাফ ৭৫ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম বা এডমায়ার ২০০ এসএল প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।

পাতার হপার পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

- ফসলের অবশিষ্টাংশ নষ্ট করা এবং আগাছা পরিষ্কার।
- ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি (৫ গ্রাম/ লিটার) পাতার নিচের দিকে স্প্রে।
- আক্রমণের শুরুতে বায়োনিম প্লাস (Azadiractin)@ ১মিলি/ লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হবে।
- আক্রমণের শুরুতে (Difenthiuron) গ্রুপ এর কীটনাশক @ ১মিলি/ লিটার অথবা ইনটিপ্রিড ১০ এস সি (Chlorfenapyr) প্রতি লিটার পানিতে ১মিলি মিশিয়ে আক্রান্ত পাতায় স্প্রে করতে হবে।

কাঁটালে পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

- আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় ডিমের গাদা, লার্ভা, পিউপা ও পূর্ণবয়স্ক পোকা হাত দ্বারা ধ্বংস করতে হবে।
- ক্ষেত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- জমি, জমির আইল, সেচ নালা আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- আক্রান্ত ফসলে উপরি সেচ প্রয়োগ করতে হবে। ধুলাবালি থাকলে এদের আক্রমণ বেড়ে যায়। ভারী বৃষ্টিপাতে মাইটের আক্রমণ কমে যায়।
- মাকড় নাশক Abamectin (ভার্টিমেক ১.৮ ইসি অথবা Abom ১.৮ ইসি অথবা Ambush ১.৮ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ মিলি অথবা Propargite (Sumite or Omite ৫৭ ইসি) প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন প্রকার রোগের আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিম্নে প্রধান কয়েকটি রোগ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

ডেম্পিং অফ দমন ব্যবস্থাপনা

- বীজ তলায় এ রোগ হয়; প্রতিষেধক হিসেবে মাটিতে কপার বা ডায়থেন এম-৪৫ ১-২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলার মাটি ভাল করে ভিজিয়ে কয়েকদিন পর বীজ বপন করতে হবে।
- বপনের পূর্বে প্রভাক্স, ভিটাভেক্স (২.৫ গ্রাম/ কেজি বীজ) দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে।

কাণ্ড ও ফল পচা (ফমপসিস) দমন ব্যবস্থাপনা

- সুস্থ-রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা।
- ফসল সংগ্রহের পর মুড়ি গাছ না রেখে সমস্ত গাছ, ডালপালা, পাতা ইত্যাদি একত্রে পুড়িয়ে ে ফলা।
- রোগ কাণ্ডে দেখা দিলে গাছের গোড়াসহ মাটি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অটোস্টিন বা নোইন মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

ঢলে পড়া রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- *Ralstonia salanaceanum* নামক ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এ রোগ হয়। আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করা এবং আক্রান্ত জমিতে শস্য পর্যায় (crop rotation) অনুসরণ করতে হবে।
- পরিমাণমতো সেচ দিতে হবে।
- স্টেবল ব্লিচিং আউচার ২০-৩০ কেজি প্রতি হেক্টরে চারা লাগানোর পূর্বে জমিতে প্রযোগ করা।

গুচ্ছপাতা দমন ব্যবস্থাপনা

- মলি বিউটেস দ্বারা এ রোগ হয়। আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধ্বংস করা।
- ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করা।
- ক্ষেতে পাতার হপার পোকার উপস্থিতি দেখা দিলে অনুমোদিত কীটনাশক প্রয়োগ করে তা দমন করা।

স্ক্লেরোটিনিয়া রট দমন ব্যবস্থাপনা

- *Sclerotinia sclerotion* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। সুস্থ বীজতলা হতে চারা সংগ্রহ করা।
- আক্রান্ত গাছ মাটিসহ তুলে নষ্ট করা, গাছের পরিত্যক্ত অংশ ধ্বংস করা।
- আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় রোভরাল (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম) বা ফলিকুর (প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি) স্প্রে করতে হবে।

বিটি বেগুনের জাত

বারি বিটি বেগুন-১ (উত্তরা), বারি বিটি বেগুন-২ (কাজল), বারি বিটি বেগুন-৩ (নয়নতারা) ও বারি বিটি বেগুন-৪ নামের চারটি জাত চাষী পর্যায়ে চাষের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। নিম্নে জাতসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেয়া হলো:

বারি বিটি বেগুন-১

- ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী জাত
- এ জাতটি অনান্য জাতের তুলনায় আগাম ফলন দেয়
- এই জাতটির গাছ ছড়ানো ও ঝোপালো
- ফল লম্বাটে ও ১৮-২০ সেমি লম্বা হয়
- গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৫০-৫৫টি
- প্রতি ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম
- হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০-৫৫ টন

বারি বিটি বেগুন-১

বারি বিটি বেগুন-২

- ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী জাত
- এ জাতটি অন্যান্য জাতের তুলনায় আগাম ফলন দেয়
- ফলের আকার মাঝারি লম্বাকৃতি এবং রং চকচকে কালচে বেগুনী
- গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৪০-৪৫টি
- প্রতি ফলের ওজন ১০০-১২০ গ্রাম
- হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০-৫৫ টন

বারি বিটি বেগুন-২

বারি বিটি বেগুন-৩

- ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী জাত
- জাতটির গাছ খাড়া আকৃতির
- এ জাতটির ফল গোলাকার এবং রং উজ্জ্বল কালচে বেগুনী
- গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ২৫-৩০টি
- প্রতি ফলের ওজন ১৬০-১৮০ গ্রাম
- হেক্টরপ্রতি ফলন ৪৫-৫০ টন

বারি বিটি বেগুন-৩

বারি বিটি বেগুন-৪

- ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকা প্রতিরোধী জাত
- ফল ডিম্বাকৃতি এবং রং হালকা সবুজ
- গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ২০-২৫টি
- প্রতি ফলের ওজন ২২০-২৫০ গ্রাম
- হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০-৫৫ টন

বারি বিটি বেগুন-৪

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: আমাদের দেশের সব রকমের মাটিতে বেগুন চাষ করা যায় এবং ভাল ফলনও দিয়ে থাকে। তবে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। বেলে দোআঁশ বা দোআঁশ মাটিই এর চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। বেগুনের জন্য ১৫° থেকে ২০° সে. তাপমাত্রা সবচেয়ে উপযোগী। উচ্চ তাপমাত্রায় বেগুনের ফুল ও ফল উৎপাদন বিঘ্নিত হয় এবং এসময় অনিষ্টকারী পোকা বিশেষ করে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

চারা উৎপাদন পদ্ধতি: শীতকালীন চাষের জন্য শ্রাবণের মাঝামাঝি থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত চারা উৎপাদনের জন্য বীজতলায় বীজ বপন করা যায়। বেগুন চাষের জন্য চারা উৎপাদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমাদের দেশে চাষী

ভাইয়েরা সাধারণত সরাসরি বীজতলায় বীজ বপন করেন। দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করেন না। এতে বীজের পরিমাণ বেশি লাগে উপরন্তু চারার স্বাস্থ্য ভাল হয়। প্রথমে বীজতলায় ঘন করে বীজ ফেলতে হয়। বীজ গজানোর ১০-১২ দিন পর গজানো চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করতে হয়। এতে চারা সুস্থ ও সবল হয় এবং ফলন ভাল হয়। বীজতলায় মাটি সমপরিমাণ বালি, কমপোস্ট ও মাটি মিশিয়ে ঝুর ঝুর করে তৈরি করতে হয়। প্রতি হেক্টরের জন্য ২০০-২৫৫ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন: বীজতলায় সারি করে বা ছিটিয়ে বীজ বপন করা যায়, তবে সারিতে বপন করা উত্তম। সারিতে বপনের জন্য প্রথমে নির্দিষ্ট দূরত্বে (৫ সেমি) কাঠি বা টাইন দিয়ে ক্ষুদ্র নালা তৈরি করে তাতে বীজ ফেলে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ছোট বীজের বেলায় বীজের দ্বিগুণ পরিমাণ শুকনো ও পরিষ্কার বালু বা মিহি মাটি বীজের সাথে ভালভাবে মিশিয়ে মাটিতে বীজ বপন করতে হয়। শুকনো মাটিতে বীজ বপন করে সেচ দেয়া উচিত নয়, এতে মাটিতে চটা বেঁধে চারা গজাতে ও বাতাস চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। যেসমস্ত বীজের আবরণ শক্ত, সহজে পানি প্রবেশ করে না, সেগুলোকে সাধারণত বোনার পূর্বে ভিজিয়ে নেয়া হয়।

সারিতে বীজতলায় বীজ বপন

বীজতলায় আচ্ছাদন

বীজতলায় আচ্ছাদন: আবহাওয়া এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে বীজতলার উপরে আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে যেন বৃষ্টির পানি ও অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে বীজতলাকে রক্ষা করা যায়। আচ্ছাদন বিভিন্নভাবে করা যায়। তবে কম খরচে বাঁশের ফালি করে বীজতলায় প্রস্থ বরাবর ৫০ সেমি পর পর পুঁতে নৌকার 'ছৈ' এর আকারে বৃষ্টির সময় পলিথিন দিয়ে এবং প্রখর রোদে চাটাই দিয়ে রক্ষা করা যায়।

চারার যত্ন: চারা গজানোর পর থেকে ১০-১২ দিন পর্যন্ত হালকা ছায়া দ্বারা অতিরিক্ত সূর্যতাপ থেকে চারা রক্ষা করা প্রয়োজন। পানি সেচ একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যা তবে বীজতলার মাটি দীর্ঘসময় বেশি ভেজা থাকলে অঙ্কুরিত চারা রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। চারার শিকড় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলে রোদ কোন ক্ষতি করতে পারে না, তখন এটি বরং উপকারী। চরা গজানোর ১০-১২ দিন পর বীজতলায় প্রয়োজন মতো দূরত্ব ও পরিমাণ মত চারা রেখে অতিরিক্ত চারাগুলি যত্ন সহকারে উঠিয়ে দ্বিতীয় বীজতলায় সারি করে রোপণ করলে মূল্যবান বীজের সাশ্রয় হবে।

দ্বিতীয় বীজলায় চারা স্থানান্তরকরণ: জমিতে চারা লাগানোর পূর্বে মূল বীজতলা থেকে তুলে দ্বিতীয় বীজতলায় সবজি চারা রোপণের পদ্ধতি অনেক দেশেই চালু আছে। এ পদ্ধতিকে দ্বিতীয় সবজির চারা স্থানান্তরকরণ পদ্ধতি বলে। দেখা গেছে, ১০-১২ দিনের চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরিত করা হলে কপি গোত্রের সবজি ও টমেটো চারার শিকড় বিস্তৃত ও শক্ত হয়, চারা অধিক সবল ও তেজী হয়। চারা উঠানোর আগে বীজতলায় পানি দিয়ে এরপর সূচালো কাঠি দিয়ে শিকড়সহ চারা উঠাতে হয়। উঠানো চারা সাথে সাথে দ্বিতীয় বীজতলায় লাগাতে হয়। বাঁশের সূচালো কাঠি বা কাঠের তৈরি সূচালো ফ্রেম দ্বারা সরু গর্ত করে চারা গাছ লাগানো হয়। লাগানোর পর হালকা পানি দিতে হবে এবং বৃষ্টির পানি ও রোদ থেকে রক্ষার জন্য পলিথিন ও চাটাই দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।

দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তরযোগ্য চারা

দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর

বীজতলায় চারার রোগ দমন: বীজতলায় বপনকৃত বীজ গজানোর পূর্বে বীজ এবং পরে কচি চারা রোগাক্রান্ত হতে পারে। অঙ্কুরোদগমরত বীজ আক্রান্ত হলে তা থেকে আদৌ চারা গজায় না। গজানোর পর রোগের আক্রমণ হলে চারার কাণ্ড মাটি সংলগ্ন স্থানে পচে গিয়ে নেতিয়ে পড়ে। একটু বড় হওয়ার পর আক্রান্ত হলে চারা সাধারণত মরে না, কিন্তু এদের শিকড় দুর্বল হয়ে যায়। চারা এভাবে নষ্ট হওয়াকে বলে ড্যাম্পিং-অফ। বিভিন্ন ছত্রাক এর জন্য দায়ী। ড্যাম্পিং অফ রোগ বাংলাদেশে চারা উৎপাদনের এক বড় সমস্যা। বীজতলায় মাটি সব সময় ভেজা থাকলে এবং মাটিতে বাতাস চলাচলের ব্যাঘাত হলে এ রোগ বেশি হয়। এ জন্য বীজতলায় মাটি সুনিষ্কাশিত রাখা রোগ দমনের প্রধান উপায়। প্রতিষেধক হিসেবে মাটিতে কপার অক্সিক্লোরাইড বা ডায়থেন এম-৪৫ এক থেকে দুই গ্রাম প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে বীজতলার মাটি ভালকরে ভিজিয়ে কয়েকদিন পর বীজ বপন করতে হবে। প্রোভেক্স ২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজে মিশিয়ে বীজ বপন করবেন।

চারার কষ্ট সহিষ্ণুতা বর্ধন: রোপণের পর মাঠের প্রতিকূল পরিবেশ যেমন- ঠাণ্ডা আবহাওয়া বা উচ্চ তাপমাত্রা, পানির স্বল্পতা, শুষ্ক বাতাস এবং রোপণের ধকল ও রোপণকালীন সময়ে চারার সৃষ্ট ক্ষত ইত্যাদি যাতে সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারে সেজন্য বীজতলায় থাকাকালীন চারাকে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা হয়। যে কোন উপায়ে চারার বৃদ্ধি সাময়িকভাবে কমিয়ে যেমন- বীজতলায় ক্রমান্বয়ে পানি সেচের পরিমাণ কমিয়ে বা দুই সেচের মাঝে সময়ের ব্যবধান বাড়িয়ে চারাকে কষ্ট সহিষ্ণু করে তোলা যায়। কষ্ট সহিষ্ণুতা বর্ধনকালে চারায় শ্বেতসার (কার্বোহাইড্রেট) জমা হয় এবং রোপণের পর এই শ্বেতসার দ্রুত নূতন শিকড় উৎপাদনে সহায়তা করে। ফলে সহজেই চারা রোপণজনিত আঘাত সয়ে উঠতে পারে।

চারা উৎপাদনের বিকল্প পদ্ধতি: প্রতিকূল আবহাওয়ায় বীজতলায় চারা উৎপাদনের জন্য বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে সবজির চারা কাঠের বা প্লাস্টিকের ট্রে, পলিথিনের ব্যাগে, মাটির টবে, গামলায়, থালায়, কলার খোলে উৎপাদন করা যায়। কোন কোন সময় কুমড়া, শিম জাতীয় সবজির চারা রোপণ করার প্রয়োজন দেখা যায়। কিন্তু এসব সবজি রোপণ জনিত আঘাত সহজে কাটিয়ে উঠতে পারে না। ছোট আকারের পলিথিনের ব্যাগে বা উপরে উল্লিখিত অন্যান্য মাধ্যমে এদের চারা উৎপাদন করা উচিত যাতে শিকড়ে মাটিসহ চারা রোপণ করা যায়।

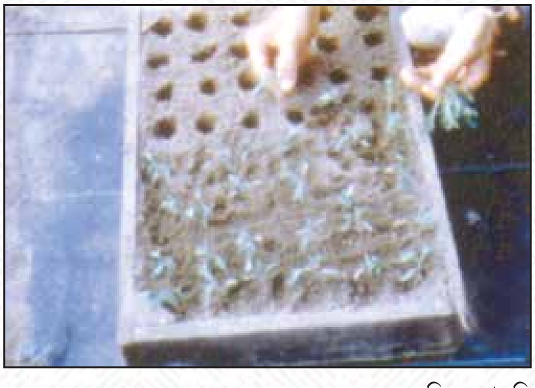

বিকল্প পদ্ধতিতে চারা উৎপাদন

বিটি বেগুন চাষকৃত জমির নকশা: বিটি বেগুন চাষ অন্য সাধারণ বেগুন চাষের ন্যায়। তবে বিটি বেগুন চাষের জমি চার পার্শ্বে ১-২ সারি সাধারণ বেগুনের চারা উদ্বাস্ত ফসল হিসেবে রোপণ করতে হয়। নিম্নে প্রায় ১ বিঘা জমিতে বিটি বেগুন চাষের নমুনা নকশা দেয়া হলো।

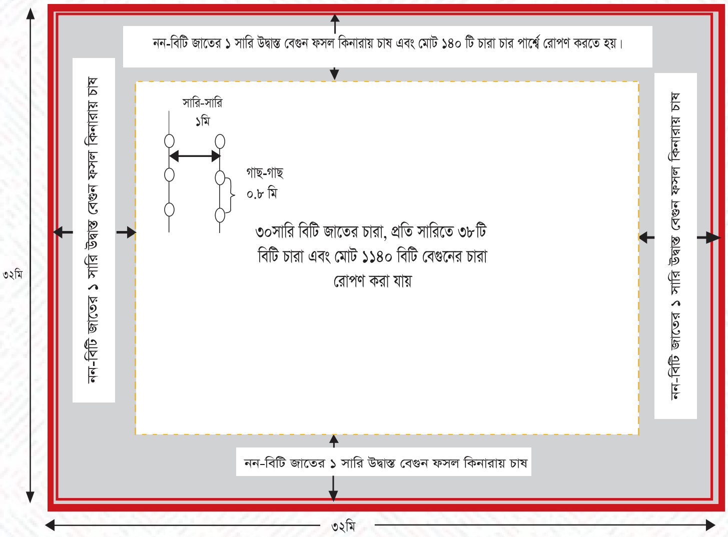

বেডের আকার	প্রস্থ: ৭০ সেমি
	দৈর্ঘ্য: জমির দৈর্ঘ্যের ওপর নির্ভর করবে
দূরত্ব	১০০ x ৮০ সেমি
নালার আকার	প্রস্থ: ৩০ সেমি
	গভীরতা: ২০ সেমি

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ: বেগুন এমন একটি ফসল সার প্রয়োগ ব্যতীত যার সন্তোষজনক উৎপাদন চিন্তা করা যায় না। মাটি থেকে ইহা প্রচুর পরিমাণ খাদ্যোপাদান শোষণ করে। বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্যের অভাব হলে গাছ দ্রুত বাড়ে না এবং পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের স্বল্পতা ফলনের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই বেগুন চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি নিম্নোক্ত পরিমাণ সার ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়।

সারের মাত্রা

সার	পরিমাণ (কেজি/ হেক্টর)	শেষ চাষের সময় (কেজি)	গর্তে প্রয়োগ (কেজি)	চারা লাগানোর ১৫ দিন পর	ফুল ধরা আরম্ভ হলে	ফল ধরা আরম্ভ হলে	ফল আহরণের সময়	ফল আহরণের সময়
গোবর/ কম্পোস্ট	১০,০০০	৫,০০০	৫,০০০	-	-	-	-	-
ইউরিয়া	৩০০	-	-	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি
টিএসপি	২৫০	১২৫	১২৫	-	-			-
এমপি	২০০	-	৫০	৪৫.০ কেজি	৫২.৫ কেজি	৫২.৫ কেজি	-	-
জিপসাম	১০০	সব	-	-	-	-	-	-
বোরিক এসিড (বোরন)	১০	সব	-	-	-	-	-	-

সূত্র- FRG-2018/BARC

সার প্রয়োগ পদ্ধতি

- শেষ চাষের সময় অর্ধেক গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি এবং সবটুকু জিপসাম ও বোরিক এসিড সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- বাকি অর্ধেক গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি এবং ৩৫-৪২.৫ কেজি এমপি সার চারা লাগানার ৭দিন পূর্বে গর্তে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- সম্পূর্ণ ইউরিয়া (৫টি কিস্তিতে) ও বাকি এমপি সার (প্রথম ৩টি কিস্তিতে) যথাক্রমে চারা লাগানো ১৫ দিন পর, ফুল ধরা আরম্ভ হলে, ফল ধরা আরম্ভ হলে, ফল আহরণের সময় ২ বার সমভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ: ৩০-৩৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করা উত্তম। এ সময় প্রতিটি চারার ৫-৬টি পাতা হয়ে থাকে। অনিবার্য কারণে বেগুনের চারা ২ মাস বয়স পর্যন্ত রোপণ করা চলে। রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে জাত ও মাটির উর্বরতার ওপর। সাধারণত ৭০ সেমি প্রশস্ত বেডে এক সারিতে চারা রোপণ করা হয়। দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি প্রশস্ত নালা থাকে। সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৭০-৮০ সেমি রাখতে হয়।

সেচ ব্যবস্থা : বেডের দু'পাশের নালা দিয়ে জমিতে সেচ দেয়া সুবিধাজনক। নালায় সেচের পানি বেশিক্ষণ ধরে রাখা যাবে না, গাছের গোড়া পর্যন্ত মাটি ভিজে গেলে নালার পানি ছেড়ে দিতে হবে। খরিফ মৌসুমে জমিতে পানি যাতে না জমে সেজন্য পানি নিষ্কাশনের জন্য জমির চারপাশে নালা রাখতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: চারা লাগানোর ৫০-৬০ দিন পরই বেগুন তোলার সময় হয়। ৭-১০ দিন পরপর গাছ থেকে ধারাল ছুরির সাহায্যে বেগুন কাটা ভাল।

ফলন: ৩০-৭০ টন/হেক্টর।

পোকামাকড় : বিটি বেগুন ডগা ও ফল ছিদ্রকার পোকা প্রতিরোধী।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা

পাতার হপার পোকা

ক্ষতির লক্ষণ: আক্রান্ত বেগুনের পাতা কিনারা বরাবর উপরের দিকে বেঁকে যায়। পাতার কিনারে হলুদাভ হয়ে যায় অথবা গুছে যাওয়ার মত মনে হয়। পাতার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় বলে পাতা ছোট থেকে যায় এবং মোজাইক ধরনের হলুদ রং পরিলক্ষিত হয়। আক্রান্ত গাছে ফল ধরার সংখ্যা মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে। পাতার হপার পোকা প্রকৃত পক্ষে সারা বছরই বংশ বৃদ্ধি করে থাকে তবে শুষ্ক মৌসুমে এদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই পোকা পাতার নিচের দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে। প্রাপ্ত বয়স হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ক্ষুদ্র নিম্ফসমূহ পাতার নিচ দিক থেকে রস চুষে খায়। এদর জীবনকাল ৫-৭ সপ্তাহ এবং একই মৌসুমে একাধিক প্রজন্ম হয়ে থাকে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- প্রতিরোধী জাত যেমন, বারি বেগুন-৬ বা বিএল ১১৪ চাষ করা।
- নিমতেল ৫ মিলি + ৫ গ্রাম ট্রিকস্ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে স্প্রে করা।
- এককেজি আধা ভাঙ্গা নিমবীজ ২০ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি পাতার নিচের দিকে স্প্রে করা।
- পাঁচ গ্রাম পরিমাণ গুঁড়া সাবান প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে স্প্রে করা।
- আক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতিলিটার পানিতে ২ মিলি পরিমাণ) স্প্রে করা অথবা এডমায়ার ১০০ এমএল (প্রতিলিটার পানিতে ০.২৫ মিলি পরিমাণ) মিশিয়ে স্প্রে করা।

ইপিল্যাকনা বিটল

ক্ষতির লক্ষণ: এই পোকা পাতার শিরাগুলোর মাঝের অংশ খেয়ে ফেলে। মধ্য শিরা বাদে পাতার সমস্ত অংশ খেয়ে ঝাঝরা করে ফেলতে পারে এবং ফলের উপরি ভাগের কিছু অংশ খেয়ে ফেলতে পারে অথবা ছোট ছিদ্র করতে পারে। প্রাপ্ত বয়স্ক ও কীড়া প্রায়শই একই সাথে দেখা যায়। প্রাপ্ত বয়স্ক পোকা সাধারণ লেডি বিটল এর মত দেখা যায় কিন্তু

লেডি বিটল পোকা গাছ বা গাছের পোকা খায় না। ইপিল্যাকনা বিটল ডিম্বাকার এবং পিঠে কাল ফোটাযুক্ত বাদামী রঙের। কীড়ার রং ফ্যাকাশে হলুদ এবং পিঠের উপরিভাগে ও পাশে শাখা প্রশাখাবিশিষ্ট ছোট ছোট কাঁটা দ্বারা আবৃত থাকে। প্রাপ্ত বয়স্ক স্ত্রী ইপিল্যাকনা বিটল বেশির ভাগ সময়ে পাতার নিচের দিকে সিগার আকৃতির হলুদ রঙের ডিম পারে। ডিম ফুটে কাটাযুক্ত হলুদ কীড়া বের হয়ে পাতার নিচের অংশ খাওয়া শুরু করে। ইপিল্যাকনা বিটলের কীড়া ৪টি ধাপ অতিক্রম করে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, পূর্ণাঙ্গ কীড়া ৬ মিমি লম্বা হয়ে থাকে। কালচে রঙের পিউপাসমূহ পাতা অথবা কাণ্ডে থাকতে দেখা যায়। ইপিল্যাকনা বিটলের জীবনচক্র ১৫-২০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং একই মৌসুমে কয়েক প্রজন্ম হয়ে থাকে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- পোকাসহ আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পোকা মেরে ফেলা।
- নিমতেল ৫ মিলি + ৫ গ্রাম ট্রিকস প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে রেখে উক্ত পানি স্প্রে করা।
- এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিমবীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি স্প্রে করা।
- আক্রমণের হার অত্যন্ত বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতিলিটার পানিতে ২ মিলি পরিমাণ) স্প্রে করা।

লাল মাকড়

ক্ষতির লক্ষণ: লাল মাকড় খাওয়া বেগুনের পাতায় হলুদাভ ছোপ ছোপ দাগের সৃষ্টি হয়। যখন এই ধরনের আক্রমণ পাতার নিচের দিকে মাঝখানে বেশি হয় তখন প্রায় সব ক্ষেত্রেই পাতা কুঁকড়ে যেতে দেখা যায়। ব্যাপক আক্রমণের ফলে সম্পূর্ণ পাতা হলুদ ও বাদামী রং ধারণ করে এবং শেষ পর্যন্ত পাতা ঝরে পড়ে। লাল মাকড় পাতার নিচের পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়ে যা খালি চোখে দেখা যায় না। এই ডিম থেকে কমলা রঙের বাচ্চা বের হয়ে পাতার নিচের পৃষ্ঠদেশে খেতে থাকে। এক সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চাগুলো গাঢ় কমলা বা লাল রঙের পূর্ণ মাকড়ে পরিণত হয় যা দেখতে ক্ষুদ্র মাকড়সার মত। এদের পাতার নিচের পৃষ্ঠদেশে চলাফেরা করতে দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- নিমতেল ৫ মিলি + ৫ গ্রাম ট্রিকস্ প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে স্প্রে করা।
- এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিমবীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি পাতার নিচের দিকে স্প্রে করা।
- আক্রমণ তীব্র হলে প্রতিলিটার পানির সাথে মাকড়নাশক (যেমন- ওমাইট ৫৭ তরল ১ মিলিলিটার হারে) পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করে মাকড়ের আক্রমণ প্রতিহিত করা সম্ভব। মাকড়নাশক পাওয়া না গেলে সালফার জাতীয় ছত্রাকনাশক (কুমলাক্স ইত্যাদি) স্প্রে করে মাকড়ের আক্রমণ কমানো সম্ভব। লক্ষ্য রাখতে হবে, মাকড়ের সাথে অন্য পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রথমে মাকড়নাশক ব্যবহার করে অতঃপর কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

কাণ্ড ও ফল পচা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- *Phomopsis Vexans* নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়। সুস্থ ও রোগমুক্ত বীজ ব্যবহার করা।
- সেচ বা বৃষ্টির পর গাছের গোড়ার মাটি আলগা করা।
- প্রতিকেজি বীজে ২ গ্রাম ভিটাভেক্স ২০০ দিয়ে শোধন করা; ৫০° সে. তাপমাত্রার গরম পানিতে ১৫ মিনিট রেখে বীজ শোধন করা।
- রোগ কাণ্ডে দেখা দিলে গাছের গোড়াসহ মাটি প্রতিলিটার পানিতে ২ গ্রাম পরিমাণ অটোস্টিন/নোইন গুলিয়ে ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। বীজ বেগুনে রোগ দেখামাত্র ছত্রাকনাশক স্প্রে করা।
- রোগ হয় এরূপ জমিতে কমপক্ষে ৩ বছর শস্য পর্যায় অনুসরণ করা।
- ফসল সংগ্রহের পর মুড়ি গাছ না রেখে সমস্ত গাছ, ডালপালা, পাতা ইত্যাদি একত্র করে পুড়িয়ে ফেলা।

ঢলেপড়া রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধ্বংস করা।
- রোগ প্রতিরোধী যেমন- বারি বেগুন-৮, বারি বেগুন-১০ প্রভৃতি জাতের চাষ করা।
- বন বেগুন যথা টরভাম বা সিসিম্ব্রিফলিয়ামের সাথে জোড় কলম করা।
- রোগ প্রতিরোধী বারি বেগুন-৮ জাতকেও রুট স্টক হিসেবে ব্যবহার করে জোড় কলম করা যায়।

গুচ্ছপাতা রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

- *Mollicutes/Phytoplama* দ্বারা এ রোগ হয়। আক্রান্ত গাছ দেখলেই প্রাথমিকভাবে তা তুলে ধবংস করা।
- ক্ষেতের আগাছা পরিষ্কার করা।
- ক্ষেতে জ্যাসিড পোকার উপস্থিতি দেখা দিলে কীটনাশক প্রয়োগ করে তা দমন করা।

মুলা

মুলা রবি মৌসুমের একটি প্রধান সবজি। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ টন মুলা উৎপাদিত হয়। দেশে সকল শ্রেণির লোকের নিকট মুলা একটি সমাদৃত সবজি। সালাদ, তরকারি ও ভাজি হিসেবে এর বহুল প্রচলন রয়েছে। মুলার পাতা শাক হিসেবেও খাওয়া যায়। এতে প্রচুর ভিটামিন ‘এ’ রয়েছে।

মুলা ফসল

মুলার জাত

বারি মুলা-১ (তাসাকীসান মুলা)

১৯৮৬ সালে ‘বারি মুলা-১’ জাতটি অনুমোদন করা হয়। মুলা দেখতে ধবধবে সাদা ও বেলুনাকৃতির হয়। পাতায় শুং থাকে না বলে শাক হিসেবে ব্যবহারের জন্য খুবই উপযোগী। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর থেকেই সংগ্রহের উপযোগী হয়। প্রতি মুলার ওজন প্রায় ৯০০-১১০০ গ্রাম। মুলা খেতে সুস্বাদু ও প্রায় ঝাঁঝবিহীন। দেশীয় আবহাওয়ায় এ জাত প্রচুর পরিমাণ বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি মুলার ফলন ৭০-৮০ টন এবং বীজের ফলন ১.০-১.৫ টন হয়।

বারি মুলা-১

বারি মুলা-২ (পিংকী)

বারি মুলা-২

‘বারি মুলা-২’ নামে একটি লালচে রঙের মুলা জাত ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের মুলা নলাকৃতির । এ জাতের মুলার সাধারণত কোন শাখা শিকড় হয় না এবং ভিতরে সহজে ফাঁপা হয় না। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিন পর সংগ্রহের উপযোগী হয় এবং প্রায় ৭৫ দিন পর্যন্ত তা খাওয়ার উপযোগী থাকে। প্রতি মুলার ওজন ৮০০-৯৮৮ গ্রাম। মুলা খেতে সুস্বাদু এবং একটু ঝাঁঝালো। স্থানীয় আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৫৫-৬০ টন এবং ৯০০-১১০০ কেজি বীজ পাওয়া যায়।

বারি মুলা-৩ (দ্রুতি)

‘বারি মুলা-৩’ জাতটি ১৯৯৮ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের মুলার রং সাদা এবং আকৃতি অনেকটা নলাকার। এ জাতের মুলা ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই খাবার উপযুক্ত হয়। এদেশের আবহাওয়ায় দ্রুতি জাতের মুলার বীজ উৎপাদন করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি মুলার ফলন ৪০-৪৫ টন ও ১.২-১.৩ টন বীজ পাওয়া যায়।

বারি মুলা-৩

বারি মুলা-৪

বারি মুলা-৪

মুলা নলাকৃতি ধবধবে সাদা বর্ণের। পাতা খাঁজ কাটা বিশিষ্ট। মুলা লম্বায় ৩০-৩৫ সেমি। প্রতিটি মুলার গড় ওজন ৭০০-৮০০ গ্রাম। জাতটি দেশিয় আবহাওয়ায় ১.২-১.৫ টন/হেক্টর বীজ উৎপন্ন করে। বাংলাদেশের সর্বত্র শীতমৌসুমে এই জাতটি চাষ করা যায়। আশ্বিন-কার্তিক মাসে বীজ বপন করা হয়। জীবনকাল ৬০-৭০ দিন (বীজ বপনের পর) এবং হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৬৫-৭০ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি মুলা চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। অধিক পরিমাণ জৈব সার ও প্রয়োজনীয় রাসায়নিক সার ব্যবহার করে অধিকাংশ উঁচু জমির মাটিতে এর চাষ করা যায়।

বীজের হার ও বীজ বপন: আশ্বিন থেকে কার্তিক মাস (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-নভেম্বর) মুলার বীজ বপন করা যায়। হেক্টরপ্রতি ২.৫-৩.০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। সাধারণত মুলার বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়। কিন্তু বীজ সারিতে বপন করা ভাল। এতে বীজের পরিমাণ কম লাগে এবং পরবর্তী পরিচর্যা করা সহজ হয়।

সার প্রয়োগ: মুলার জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৩০০-৩৫০ কেজি
টিএসপি	২৫০-৩০০ কেজি
এমপি	২১৫-২৩৫ কেজি
গোবর বা কম্পোস্ট	৮-১০ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোস্ট সার সারের এক তৃতীয়াংশ সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া ও এমপি সার সমান অংশে যথাক্রমে বীজ বপনের তৃতীয় ও পঞ্চম সপ্তাহে ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: বীজ বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যে ৩০ সেমি দূরত্বে একটি ভাল গাছ রেখে বাকি গাছ উঠিয়ে ফেলতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে বপনের ৭-১০ দিনের মধ্যেই একটি সেচ দিতে হয়। সাধারণত ২ সপ্তাহ পর পর ২-৩ বার সেচ দিলে মুলার ফলন ভাল হয়। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। এজন্য নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা: শীতকালীন সবজিসমূহের মধ্যে মুলা বাংলাদেশে একটি অন্যতম সবজি। দেশে মুলা উৎপাদনের জন্য বিদেশি বীজের উপর নির্ভর করতে হয়। বাংলাদেশে আবাদকৃত বিদেশি মুলার জাত দ্বিবর্ষজীবী এবং স্থানীয় আবহাওয়ায় মাঠ পর্যায়ে এদের বীজ উৎপাদন হয় না। স্থানীয় আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদনে সক্ষম ‘বারি মুলা- ১,২,৩,৪ নামে ৪ টি এক বর্ষজীবী মুলার জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

মুলার মূল ও পাতা কর্তন পদ্ধতি: মুলার বয়স ৪০-৪৫ দিন হলে জমি থেকে সমস্ত মুলা উঠিয়ে জাতের বিশুদ্ধতা, আকৃতি ইত্যাদি বিবেচনা করে বাছাই করতে হবে। বাছাইকৃত মুলার মূলের এক চতুর্থাংশ ও পাতার দুই তৃতীয়াংশ

কেটে ফেলতে হবে। মূলের কাটা অংশ ডায়াথেন এম-৪৫ (২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে) এর দ্রবণে ডুবিয়ে নিতে হবে। পরে প্রস্তুত করা বেডে সারি পদ্ধতিতে (৬০ × ৪৫ সেমি) মুলা গর্তে স্থাপন করে পাতার নিচ পর্যন্ত মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। এ পদ্ধতিতে পূণরায় রোপণকৃত গাছ থেকে অধিক পরিমাণে বীজ পাওয়া যায়। বীজ-ফসলের জমিতে সর্বদা রস থাকতে হবে। গাছে ফুল আসার পর হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া ও ২০০ কেজি এমপি সার বেড়ে ছিটিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় বীজ-ফসল যাতে মাটিতে পড়ে না যায় সেজন্য ঠেকনা দিতে হবে। মুলার বীজ ফসলে জাব পোকা দেখা দেওয়া মাত্র পিরিমর/জোলন/নগস/ম্যালাথিয়ন ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বপনের পর ৪-৫ মাসের মধ্যেই বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।

বোরন সার প্রয়োগঃ সুষম সারসহ মুলার জমিতে প্রতি হেক্টরে ১০-১৫ কেজি বরিক এসিড/বোরাক্স প্রয়োগ করে মুলার বীজের ফলন বড়ানো যায়।

শিম

শিম সবজি হিসেবে বাংলাদেশের সর্বত্র বাণিজ্যিকভাবে ও বসতবাড়িতে চাষাবাদ হচ্ছে। শিমে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় ক্যালসিয়াম, ভিটামিন 'সি', ও ক্যারোটিন বিদ্যমান। শিমে প্রোটিনের সমৃদ্ধতা এবং আঁশ জাতীয় উপাদান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিম শীতকালীন সবজি হলেও বর্তমানে গ্রীষ্মকালে এর চাষ সম্প্রসারিত হয়েছে।

শিমের শুঁটি

শিমের ফসল

শিমের জাত

বারি শিম -১

'বারি শিম-১' নামে উফশী শিম জাতটি বাছাইয়ের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়।

শিমের বর্ণ সবুজ। প্রতিটি শিম ১০-১১ সেমি লম্বা ও ২.০-২.৫ সেমি প্রশ্বস্ত। প্রতিটি শিমের ওজন ১০-১১ গ্রাম এবং শিমপ্রতি ৪-৫টি বীজ হয়। প্রতি গাছে ৪৫০-৫০০টি শিম ধরে। শিম পাকার পূর্ব পর্যন্ত নরম থাকে এবং খেতে সুস্বাদু।

জাত মাঝারী আগাম। এ জাতটির জীবনকাল ২০০-২২০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ২০-২২ টন ফলন পাওয়া যায়। জাতটি ভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধী। বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলে এ জাতটি চাষ করা যায়।

বারি শিম-১ এর ফসল

বারি শিম-২

বারি শিম-২

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত এ জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়।

প্রতিটি শিম ১০-১৩ সেমি লম্বা ও ১.৫-৩.০ সেমি প্রশ্বস্থ। প্রতি শিমের ওজন ৭-৮ গ্রাম। প্রতিটি শিমে ৪-৫টি বীজ হয়। প্রতিটি গাছে ৩৮০-৪০০টি শিম ধরে। পাকার পূর্ব পর্যন্ত ফল নরম থাকে।

এক মৌসুমে ১৫ থেকে ১৬ বার শিম সংগ্রহ করা যায়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতটি চাষাবাদ করা যায়। জীবনকাল ১৯০-২১০ দিন। ফলন ১২-১৪ টন/হেক্টর।

বারি শিম-৩ (গ্রীষ্মকালীন)

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বারি শিম-৩' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। তাপ অসংবেদনশীল ও দিবস নিরপেক্ষ জাত। বছরের যে কোন সময় চাষ করা যায়। ফুল সাদা রঙের এবং শিম সবুজ বর্ণের। প্রতিটি শিমের ওজন ৬-৭ গ্রাম। প্রতিটি শিমে ৪-৫টি বীজ হয়। গাছপ্রতি ৪৫০-৫০০টি শিম ধরে এবং পাকার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নরম থাকে। খেতে স্বস্বাদু। ১২-১৪ বার শিম সংগ্রহ করা যায়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতটি চাষ করা যায়। গ্রীষ্মকালে চাষ করতে হলে মার্চ মাসে এবং শীতকালের জন্য জুন মাসে বীজ বপন/চারা রোপণ করতে হয়। জীবনকাল ১৫০-১৮০ দিন। ফলন ৯-১০ টন/হেক্টর (গ্রীষ্মকালে) এবং ১৫-১৮ টন/হেক্টর (শীতকালে)।

বারি শিম-৩

বারি শিম-৪ এর ফসল

বারি শিম-৪

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বারি শিম-৪' জাতটি মুক্তায়িত হয়েছে। এটি উচ্চ ফলনশীল শিমের জাত এবং দীর্ঘদিন ব্যাপী সংগ্রহ করা যায়। শিম কাস্তে আকৃতির। ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ সহনশীল জাত।

বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতটি চাষ করা যায়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে এ জাতের বীজ বপন করা যায়। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬-১৮ টন।

বারি শিম-৫

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বারি শিম-৫' জাতটি মুক্তায়িত হয়েছে। এ জাতের গাছ খাটো প্রকৃতির তাই মাচা ছাড়াই ছোট খুঁটি দিয়ে চাষ করা যায়। গাছের উচ্চতা ৩৫-৪৫ সেমি। প্রতি গাছে ৫০-৬০টি শিম পাওয়া যায় এবং শিম ৯-১০ সেমি লম্বা, সবুজ, নরম মাংসল, কম আঁশযুক্ত হয়ে থাকে। লাগানোর ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে ফুল আসতে শুরু করে এবং ৭৫-৮৫ দিন পর্যন্ত শিম সংগ্রহ করা যায়। সারা দেশে সবজি চাষের এলাকায় এ জাতটি চাষ করা যায়। বীজের হার প্রতি হেক্টরে ১২-১৫ কেজি। আশ্বিন মাসে বপন করে কার্তিক মাসে রোপণ করলে ফলন ভাল হয়। রোপণ দূরত্ব ৬০ × ৫০ সেমি। জীবনকাল ৭৫-৮৫ দিন। ফলন ১২-১৪ টন/হেক্টর।

বারি শিম-৫ এর ফসল

বারি শিম-৬

বারি শিম-৬

বাছাই প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত এ জাতের শিম লম্বা, নলডক ধরনের। পডগুলো খুব লম্বা, ২০-২২ সেমি লম্বা ও ১.৭৫-২.২৫ সেমি প্রশস্থ। পডগুলো কাস্তে আকৃতির, নরম মাংসল ও আঁশ বিহীন। গাছপ্রতি পডের সংখ্যা ২৫০-৩০০টি। বীজ সামান্য চ্যাপ্টা, কুচকানো কালচে বাদামী রঙের। জাতটি বাংলাদেশের সকল এলাকায় চাষাবাদ উপযোগী। জীবনকাল ২২০-২৫০ দিন। ফলন ১৭-২০ টন/হেক্টর।

বারি শিম-৭

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বারি শিম-৭' জাতটি অবমুক্ত করা হয়। 'বারি শিম-৭' একটি উচ্চ ফলনশীল গ্রীষ্মকালীন জাত, উচ্চ তাপমাত্রায় ফুল ও ফল ধারণে সক্ষম এবং সারা দেশে চাষ উপযোগী। প্রতি গাছে ৬০০-৭০০টি শিম পাওয়া যায় এবং শিম ৮-১০ সেমি লম্বা, সবুজ, নরম মাংসল, কম আঁশযুক্ত হয়ে থাকে। কিনারাসহ পুরো ফলের ত্বক সবুজ বর্ণ বিশিষ্ট। ফলন ১২-১৩ টন/হেক্টর।

বারি শিম-৭

বারি শিম-৮

বারি শিম-৮

বারি শিম-৮ একটি উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন জাত, সারা দেশে চাষ উপযোগী। এটি অন্যান্য চাষযোগ্য শিমের তুলনায় ২০-৩০ দিন আগে সংগ্রহ করা যায়। শিম নরম, মাংসল ও আঁশ কম। শিম সবুজ লম্বা, কিছুটা বাকানো। বীজ আকারে বড়। হেক্টরপ্রতি গড় উৎপাদন ২০-২২ টন/হেক্টর। পোকামাকড় ও রোগবালাইয়ের আক্রমণ কম হয়।

বারি শিম-৯ (খাইস্যা)

জাতটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বড় ও পুষ্ট বীজ; বীজ গোলাকার এবং রং সাদাটে; ১০০ টি বীজের গড় ওজন ১৩০ গ্রাম এবং ১০০ কেজি শিম থেকে প্রায় ৪৯ কেজি ভক্ষণযোগ্য বীজ (খাইস্যা) পওয়া যায়। গাছের কাণ্ড সরু, নলাকার ও সবুজ বর্ণের এবং প্রধান কাণ্ড কিছুটা দীর্ঘ হওয়ার পরই শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কাণ্ডে কোন আকর্ষী নেই তাই বাউনী পেচিয়ে উপরের দিকে উঠে। ফুল সাদা এবং পাপড়ি মেলার ২-৩ দিন পর ফুল ঝরে পড়ে। সাধারণত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ফুল ধরা শুরু করে তিন মাসাধিক কাল গাছে ফুল থাকে। শিমের শুঁটি চ্যাপ্টা, দৈর্ঘ্যে ৮.৮-৮.৯ সে.মি. ও প্রস্থে ২.০৩-২.২৩ সে.মি. এবং হালকা সবুজ বর্ণের। শিম সংগ্রহকাল সময় মূলত জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। প্রতি গাছে গড়ে ৬৮৫-৭১৫ টি পর্যন্ত শিম পাওয়া যায়।

বারি শিম-৯ এর শুঁটি ও বীজ

বারি শিম-১০ (খাইস্যা)

জাতটির প্রধান বৈশিষ্ট্য এর বড় ও পুষ্ট বীজ; বীজ কিছুটা লম্বাটে এবং রং গোলাপী; ১০০ টি বীজের গড় ওজন ১২৯ গ্রাম এবং ১০০ কেজি শিম থেকে প্রায় ৪৪ কেজি ভক্ষণযোগ্য বীজ (খাইস্যা) পওয়া যায়। গাছের কাণ্ড, শাখা- প্রশাখা, পাতা ও ফুলের বৈশিষ্ট্য বারি শিম-৯ এর অনুরূপ । সাধারণত নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে ফুল ধরা শুরু করে আড়াই মাসাধিক কাল গাছে ফুল থাকে। শিমের শুঁটি লম্বা এবং মাথার দিকে সুচালো, দৈর্ঘ্যে ১১.২-১১.৪ সে.মি. ও প্রস্থে ১.৯৫-২.২২ সে.মি. এবং গাঢ় সবুজ বর্ণের। বীজের আকর্ষণীয় রঙের কারণে এর ভোক্তা চাহিদা বেশি এবং বাজার মূল্যও অধিক যা অন্যান্য দেশি শিমের জাত থেকে একে পৃথক করেছে। শিম সংগ্রহকাল মূলত জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত। প্রতিটি গাছে গড়ে ৫৪৯-৫৭৫ টি পর্যন্ত শিম পাওয়া যায়।

বারি শিম-১০ এর শুঁটি ও বীজ

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু: সব ধরনের মাটিতেই শিম জন্মে। তবে সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি ভাল ফলনের জন্য উপযুক্ত। ফসলের অঙ্গজ বৃদ্ধি ও প্রজনন পর্যায়ের জন্য তাপমাত্রা ও দিবস দৈর্ঘ্য যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। এ সবজির অঙ্গজ বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু এবং দীর্ঘ দিবস প্রয়োজন। আবার প্রজনন ধাপের জন্য নিম্ন তাপমাত্রাসহ হ্রস্ব দিবস প্রয়োজন। লক্ষ্য করা যায় যে, শিম যখনই বপন করা হউক না কেন শীতের প্রভাব না পড়লে পুষ্পায়ন ঘটে না। তবে গ্রীষ্মকালীন জাতগুলো তাপ ও দিবস নিরপেক্ষ হওয়ায় বছরের যে কোন সময় বপন/রোপণ করলে পুষ্পায়ন ঘটে।

জীবনকাল : **আগাম জাত :** ১৩০- ১৬০ দিন (বীজ সংগ্রহ পর্যন্ত)।

নাবী জাত: ১৫০- ২০০ দিন (বীজ সংগ্রহ পর্যন্ত)।

বীজ বপনের সময় : আষাঢ় মাসের মাঝামাঝী থেকে বীজ বপন করা যেতে পারে। তবে আগাম ফসলের জন্য জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝী থেকে আষাঢ়ের মাঝামাঝী (জুন মাস) বীজ বপন করা উত্তম। গ্রীষ্মকালীন জাতগুলো বছরের যে কোন সময় বপন করা যায়। বপনের সময় দূরত্ব এবং বপন পদ্ধতির উপর বীজের হার নির্ভর করে।

বীজের হার: প্রতি হেক্টরে ৭.৫ কেজি, একরে ৩.০ কেজি এবং শতকে ৩০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন।

জমি তৈরি: জমি ৪-৫টি চাষ দিয়ে ঢেলা ভেঙ্গে খুব পরিপাটি করে তৈরি করতে হয়। এর পর সমতল জমিতে সঠিক দূরত্বে উঁচু মাদা তৈরি করে বীজ বপন বা চারা রোপণ করা যায়। তবে সেচ ও পানি নিকাশের সুবিধা এবং পরবর্তী পরিচর্যার সুবিধার জন্য মিড়ি তৈরি করে মিড়িতে বীজ বপন করা সবচেয়ে ভাল। মিড়ি ১৫ থেকে ২৫ সেমি উঁচু এবং ২.৫ মিটার প্রশ্বস্ত হবে। জমির প্রকৃতি এবং কাজের সুবিধা বিবেচনা করে মিড়ির দৈর্ঘ্য ঠিক করতে হয়। সেচ ও পানি নিকাশের সুবিধার জন্য পাশাপাশি দুটি মিড়ির মাঝখানে ৫০ সেমি প্রশ্বস্ত ১৫ থেকে ২৫ সেমি গভীর পিলি রাখতে হয়। ২.৫ মিটার প্রশ্বস্ত মিড়ির উভয় পার্শ্বে ৫০ সেমি করে বাদ দিয়ে ১.৫ মিটার দূরত্বে মিড়ির লম্বালম্বি দু'টি লাইন টেনে নিতে হবে। মিড়ির ২ লাইন বা সারিতে ১.৫ মিটার দূরে দূরে ৩০×৩০×৩০ সেমি সাইজের মাদাতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করে তৈরি করে ফেলতে হবে। এতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ১.৫ মিটার এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব হল ১.৫ মিটার। তাছাড়া ২টি মিড়ির মধ্যে ৫০ সেমি প্রশস্ত পিলি থাকায় পাশাপাশি দু'টি মিড়ির নিকটতম সারি দুটির দূরত্ব হল ১.৫ মিটার। তবে আজকাল ১ মিটার প্রস্থ বেডে ও একক সারি পদ্ধতিতে ১.০-১.৫ মিটার দূরত্বে বীজ বপন/চারা রোপণ করা যায়। উভয় পদ্ধতিতে একক আয়তনের জমিতে সমসংখ্যক গাছ সংকুলান হয়। তবে দ্বিতীয় পদ্ধতিতে গাছের পরিচর্যা ও ফসল উত্তোলন কার্যক্রম পরিচালনা সুবিধাজনক।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: শিম ডাল জাতীয় শস্য। এতে সারের পরিমাণ বিশেষ করে নাইট্রোজেন সারের পরিমাণ কম লাগে।

শিম চাষে হেক্টরপ্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি।

সারের নাম	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	বপন/চারা রোপণের সময় গর্তে প্রয়োগ	গর্তে উপরি প্রয়োগ (বপনের/ রোপণের ৩০ দিন পর)
গোবর	১০ টন	সব	-	-
ইউরিয়া	২৫ কেজি	-	১২.৫	১২.৫
টিএসপি	৯০ কেজি	-	সব	-
এমওপি	৬০ কেজি	-	৩০	৩০
জিপসাম (সালফার সার)	৬০ কেজি	সব	-	-
বোরিক এসিড (বোরন সার)	৫ কেজি	সব	-	-

সার প্রয়োগ পদ্ধতি : শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর সার এবং জিপসাম ও বরিক এসিড সবটুকু ছিটিয়ে জমিতে প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বীজ বপন বা চারা রোপণের ৪-৫ দিন আগেই ইউরিয়া ও এমপি (পটাশ) সারের অর্ধেক এবং টিএসপি সারের সবটুকু একত্রে ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাদার মাটির সাথে (১০ সেমি গভীর পর্যন্ত) কোদালের দ্বারা হালকাভাবে কুপিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বপন/রোপণের ৩০ দিন পর বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ও এমপি সার মাদায় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা:

- বপনকৃত বীজ থেকে চারা বের হওয়ার পর ৮-১০ দিনের মধ্যেই প্রতিটি মাদায় একটি সুস্থ সবল চারা রেখে বাকিগুলি উঠিয়ে ফেলতে হবে।
- দেশি শিমের ক্ষেত সর্বদা আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- গাছ ২৫-৩০ সেমি উঁচু হলেই বাউনী দিতে হবে এবং মাচা তৈরি করে শিম গাছকে তুলে দিতে হবে। তবে চারা গাছ মাচায় উঠা পর্যন্ত গোড়ার দিকে যেন না পেচাতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। গোড়া পেচাতে (Coiling) না দিলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন প্রায় ১০-১৫% বেশি হয়।
- মাটির রস যাচাই করে ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।
- পুরাতন পাতা ও ফুল বিহীন ডগা/শাখা কেটে ফেলতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন: জাতভেদে বীজ বপনের ৯৫-১৪৫ দিন পর শিমের শুঁটি (পড) গাছ থেকে তুলে বাজারজাত করা যেতে পারে। ফুল ফোঁটার ২৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে শিম তোলার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। ৫-৭ দিন অন্তর অন্তর গাছ থেকে শিম তুললে মোট ১৩-১৪ বার গুণগত মানসম্পন্ন শুঁটি (পড) সংগ্রহ করা যায় এবং এতে হেক্টরপ্রতি প্রায় ১৫-২০ টন শিম পাওয়া যায়।

জ্যাক শিম

বারি জ্যাক শিম-১

জ্যাক শিম লেগুমিনোসী গোত্রভুক্ত একটি বারমাসী শিম জাতীয় সবজি। ‘বারি জ্যাক শিম-১’ জাতটি ২০১০ সালে অনুমোদন করা হয়। জ্যাক শিমের (বিন) গাছ তলোয়ার শিমের মত দীর্ঘজীবী ও লতানো নয়। অপেক্ষাকৃত বেগুন গাছের মত খাটো ও ঝোপালো। জ্যাক শিমের পড সবুজ, ঘোড়ার কেশরের মতো বাঁকা বিধায় ঘোড়া শিম নামেও অভিহিত। ২০-২৪ সেমি লম্বা এবং ১.৮-২.২ সেমি প্রশস্থ। ফুল ও ফল ধারণ অনবরত হতে থাকে।

বারি জ্যাক শিম-১

ফুল গোলাপী, থোকায় থোকায় সবুজ শিম ধরে। বীজ সাদা। ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী ও দ্রুত বর্ধনশীল। বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ৬০-৬৫ দিন সময় লাগে। প্রতিটি গাছে শিমের সংখ্যা ৪৫-৫৫টি। প্রতিটি গাছে ১.০-১.৫ কেজি শিম ধরে। ফুলে পরাগায়নের ১০-১২ দিন পর শিমের খাওয়ার উপযোগী হয়। কয়েক দিন বেশি বয়স হলে খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি এই শিমের ফলন ১৪-১৬ টন হয়। জাতটি সারা বছর চাষ করা যায় তবে খরিফ মৌসুমে বেশি ভাল জন্মে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি : উর্বর দোআঁশ বা বেলে-দোআঁশ মাটিতে এর চাষাবাদ ভাল হয়। পাহাড়ের ঢালুতে বা সমতলে সব ধরনের মাটিতে ভাল জন্মে।

বপন পদ্ধতি: সরাসরি জমিতে লাইন করে বীজ বপন করতে হয়। ১.০ মিটার দূরত্বের সারিতে ৭৫ সেমি দূরে দূরে বীজ বপন করতে হয়।

বপনের সময় : সারা বছরই জন্মে কিন্তু খরিফ-২ তে বেশি ফলন দেয়। মার্চ-জুলাই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

সারের পরিমাণ এবং প্রয়োগ পদ্ধতি:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
গোবর	১০ টন
ইউরিয়া	১৫০ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি
এম ও পি	১৫০ কেজি

সারের প্রয়োগ পদ্ধতি: জমি/বেড তৈরির সময় সমুদয় গোবর, টিএসপি, এমপি এবং এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয়। বাকি ইউরিয়া গাছের ৩০ দিন এবং ৪৫ দিন বয়সে গাছের গোড়ায় উপরি প্রয়োগ হিসেবে দিতে হয়।

বীজের হার: ১৮-২০ কেজি/হেক্টর।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: ফসলে ঠিকমত সার প্রয়োগ, আগাছা দমন, পানি সেচ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগবালাই: তেমন কোন রোগবালাই পরিলক্ষিত হয় না।

ঝাড় শিম

ঝাড় শিম একটি পুষ্টিকর সবজি। এর কচি শুঁটি, অপক্ক ও পরিপক্ক বীজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শীতকারে বাংলাদেশে সর্বত্র চাষ করা যায়। পুষ্টিকর সবজি হিসেবে ঝড় শিমের চাহিদা রয়েছে দেশব্যাপী।

ঝাড় শিমের জাত

বারি ঝাড় শিম-১ (ফরাসী শিম)

'বারি ঝাড় শিম-১' জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছ খাটো ও ঝোপালো। শিম সবুজ, কিছুট বাঁকা। এটি লম্বায় ১০-১৩ সেমি এবং চওড়ায় ১.০-১.৫ সেমি হয়। প্রতিটি শিমের ওজন ৫-৬ গ্রাম। ফুল এবং বীজের রং সাদা। থোকায় থোকায় সবুজ শিম ধরে। সারিতে ঘন করে গাছ লাগিয়ে চাষ করা যায়। শীত মৌসুমে বাংলাদেশের সর্বত্র এ জাতটি চাষাবাদ করা যায়। বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ৪০-৪৫ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ১৩-১৪ টন পর্যন্ত হয়।

বারি ঝাড় শিম-১

এ জাতের গাছ খাটো তাই মাচা বা বাউনি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল, কিছুটা ভাইরাস রোগ প্রতিরোধী এবং দ্রুত বর্ধনশীল।

বারি ঝাড় শিম-২

'বারি ঝাড় শিম-২' জাতটি ২০০২ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছ খাটো ও মাঝারী ধরনের ঝোপালো। শিম হালকা সবুজ, নলাকৃতির। এটি লম্বায় ১০-১২ সেমি এবং চওড়ায় ০.৭-০.৮ সেমি হয়। থোকায় থোকায় সবুজ শিম ধরে। প্রতি থোকায় ২-৫টি শিম ধরে ।

বারি ঝাড় শিম-২

সারিতে ঘন করে গাছ লাগিয়ে চাষ করা যায়। শীত মৌসুমে বাংলাদেশের সর্বত্র এ জাতটি চাষাবাদ করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ১২-১৫ টন পর্যন্ত হয়। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি ঝাড় শিম-৩ (খাইস্যা)

বারি ঝাড় শিম-৩

'বারি ঝাড়শিম-৩' (খাইস্যা) জাতটি ২০১০ সালে অনুমোদন করা হয়। এটির পড খাওয়া হয় না, বীজ খাইস্যা হিসেবে খাওয়া হয়। গাছ খাটো ও ঝোপালো। জাতটির ফুল সাদা রঙের। থোকায় থোকায় শিম ধরে। শিম সবুজ, সোজা, ১৪-১৬ সেমি লম্বা এবং ১.০-১.৩ সেমি চওড়া হয়। প্রতি গাছে ৮-১০টি পড বা শিম হয়। প্রতি পডে ৫-৬টি বীজ থাকে। খাওয়ার উপযোগী ১০০ বীজের ওজন ১১০-১১৫ গ্রাম হয়।

বীজগুলো কালচে খয়েরী রঙের। পরিপক্ক বীজ খাইস্যা হিসেবে খাওয়া হয়। চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলে খাইস্যা খুবই জনপ্রিয়। আস্তে আস্তে সারা দেশেই খাইস্যা জনপ্রিয় হচ্ছে।

বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ৭৫-৮০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি খাইস্যা বীজের ফলন ৪.৫-৫ টন হয়। বাংলাদেশে শীতকালে দেশের প্রায় সর্বত্র এ জাত চাষযোগ্য। এ জাতের গাছ খাটো তাই মাচা বা বাউনি দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া ও মাটি: বেলে-দোআঁশ বা দোআঁশ মাটিতে (অম্ল ক্ষারত্ব ৫.৪-৭.৫) ও অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমাত্রায় (১০-২৫° সে.) এ শিম ভাল জন্মে। বাংলাদেশে শীতকালে এ ফসলটি ভালভাবে উৎপাদন করা যায়। এটি দিবস নিরপেক্ষ হলেও খরা ও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত সহ্য করতে পারে না।

বপন পদ্ধতি: সরাসরি জমিতে লাইন করে বীজ বুনতে হয়। ২৫-৩০ সেমি দূরত্বের সারিতে ১২-১৫ সেমি দূরে দূরে বীজ লাগাতে হয়।

বপনের সময়: আমাদের দেশে নভেম্বর মাস 'ঝাড় শিম-৩' (খাইস্যা) বীজ বপনের জন্য সবচেয়ে উত্তম সময়। তবে সুনিষ্কাশিত জমি হলে অক্টোবর মাসে রোপণ করতে পারলে আগাম খাইস্যা শিমের দাম ভাল পাওয়া যায়।

সারের পরিমাণ:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	২০০ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি
এমওপি	১৫০ কেজি
গোবর	৫ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: জমি তৈরির সময় সমুদয় গোবর, টিএসপি, এমপি ও অর্ধেক ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হয়। বাকি ইউরিয়া ১৫ দিন ও ৩০ দিন পর ২ বারে উপরি প্রয়োগ করা হয়।

বীজের হার: ১২০-১২৫ কেজি/হেক্টর।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: ফসলে ঠিকমত সার প্রয়োগ, আগাছা দমন, পানি সেচ ও নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

রোগবালাই: বড় ধরনের কোন পোকা এবং রোগের প্রাদুর্ভাব নেই। জমিতে চারা অবস্থায় ফুটরট রোগ কোন কোন সময় দেখা যায়। বীজ বপনের পূর্বে শোধন করে এবং চারা গাছে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

ঝাড় শিম

ভিটাভেক্স ২০০ প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হারে মিফশয়ে বপন করলে রোগের প্রাদুর্ভাব কমে যায়। আবার চারা অবস্থায় রোগ দেখা দিলে অটোস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিলিয়ে চারার গোড়ার মাটি ভিজিয়ে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়।

মটরশুঁটি

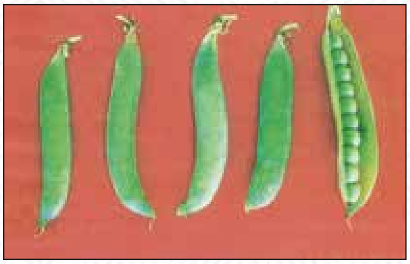

মটরশুঁটি

মটরশুঁটি একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ ও সুস্বাদু শীতকালীন সবজি। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ২০ হাজার হেক্টর (মাঠ ও বাগান ছাড়া) জমিতে চাষাবাদ হয় এবং মোট প্রায় ১৬ হাজার টন শুঁটি উৎপাদিত হয়। বিশেষভাবে শহর অঞ্চলে এ সবজির জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মটরশুঁটির জাত

বারি মটরশুঁটি-১

বারি মটরশুঁটি-১

'বারি মটরশুঁটি-১' নামে এ জাতটি বাছাইকরণ পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত হয় এবং ১৯৯৬ সালে অনুমোদন লাভ করে।

জাতটি উচ্চ ফলনশীল ও রোগ প্রতিরোধী। ফুলের রং সাদা এবং শুঁটি সবুজ। প্রতি শুঁটিতে ৪-৭টি সবুজ বীজ থাকে। শুঁটি বেশ মিষ্টি। প্রতিগাছে ২০-২৫টি শুঁটি ধরে। পরিপক্ক শুকনা বীজ কুঁচকানো ও রং বাদামী।

বপনের ৭০-৭৫ দিনের মধ্যে সবুজ শুঁটি সংগ্রহ করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ১০-১২ টন সবুজ শুঁটি উৎপন্ন হয়। জাতটি ডাউনি মিলডিউ ও পাউডারি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বারি মটরশুঁটি-২

বারি মটরশুঁটি-২

এশীয় সবজি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্রের (AVRDC) সহযোগিতায় প্রাপ্ত এ জাতটি বাছাইকরণ পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত হয় এবং ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়।

শুঁটি হালকা সবুজ। আকৃতি কিছুটা চ্যাপ্টা। শুঁটির আকার ৮ × ২ সেমি। এ জাতের মটরশুঁটি বেশ নরম। অপরিপক্ক বীজসহ সবুজ শুঁটি শিমের মত ভক্ষণযোগ্য। শুঁটি সালাদ হিসেবে বা সিদ্ধ করে খাওয়া যায়। পরিপক্ক শুকনা বীজ গোলাকার ও সবুজ।

এ জাত দ্রুত বর্ধনশীল। বীজ রোপণের ৬৫-৭০ দিনের মধ্যে সবুজ শুঁটি সংগ্রহ করা যায়। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ১২-১৪ টন ফলন পাওয়া যায়। জাতটি পাউডারি মিলডিউ ও ডাউনি মিলডিউ রোগ প্রাতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বারি মটরশুঁটি-৩

বারি মটরশুঁটি-৩

'বারি মটরশুটি-৩' জাতটি বাছাইকরণ পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত হয় এবং ১৯৯৯ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি একটি আগাম জাত যা বপনের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যেই সংগ্রহ করা যায়। পডগুলো হালকা সবুজ রঙের এবং পডে ৫-৭টি বীজ থাকে। বীজ ক্রিসপি এবং মিষ্টি স্বাদ যুক্ত। পরিপক্ক বীজ গোলাকার, হালকা সবুজ। ফলন ৮-৯ টন/হেক্টর।

চিচিঙ্গা

বারি চিচিঙ্গা-১

বারি চিচিঙ্গা-১

'বারি চিচিঙ্গা-১' একটি উচ্চ ফলনশীল জাত এবং সারা দেশে চাষ উপযোগী। প্রতি গাছে ৬৫-৭০টি চিচিঙ্গা পাওয়া যায় এবং প্রতি চিচিঙ্গার গড় ওজন ১৩০-১৪০ গ্রাম হয়ে থাকে। ফল সাধারণত ১৬০-১৭০ দিন পর্যন্ত সংগ্রহ করা যায়। ফলন ২৫-৩০ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

উৎপাদন মৌসুম: এদেশে চিচিঙ্গা প্রধানত খরিফ মৌসুমেই চাষ হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে যে কোন সময় চিচিঙ্গার বীজ বোনা যেতে পারে।

বীজের হার: চিচিঙ্গার জন্য হেক্টরপ্রতি ৪-৫ কেজি (১৬-২০ গ্রাম/শতাংশ) বীজের প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি ও বপন পদ্ধতি:

- খরিফ মৌসুমে চাষ হয় বলে চিচিঙ্গার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে পানি জমার সম্ভাবনা নেই।
- বসতবাড়িতে চাষ করতে হলে দু-চারটি মাদায় বীজ বুনে গাছ বেয়ে উঠতে পারে এমন ব্যবস্থা করলেই হয়।
- বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য প্রথমে সম্পূর্ণ জমি ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হয় যাতে শিকড় সহজেই ছড়াতে পারে। জমি বড় হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে লম্বায় কয়েক ভাগে ভাগ কর নিতে হয়।
- বেডের প্রস্থ হবে ১.০ মিটার এবং দু-বেডের মাঝে ৩০ সেমি নালা থাকবে।
- চিচিঙ্গার বীজ সরাসরি মাদায় বোনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২টি বীজ বপন করতে হবে।
- তাছাড়া পলিব্যাগে (১০×১২ সেমি) ১৫-২০ দিন বয়সের চারা উৎপাদন করে নেওয়া যেতে পারে।
- চিচিঙ্গার জন্য ১.৫ মিটার দূরত্বে মাদা তৈরি করতে হবে।
- চারা গজানোর পর একের অধিক গাছ তুলে ফেলে দিতে হবে।
- বীজের ত্বক শক্ত ও পুরু বিধায় বোনার পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে বীজ তাড়াতাড়ি অঙ্কুরিত হয়।
- মাদায় বীজ বুনতে বা চারা রোপণ করতে হলে অন্তত ১০ দিন আগে মাদায় নির্ধারিত সার প্রয়োগ করে তৈরি করে নিতে হবে। মাদার আয়তন হবে ৪০×৪০×৪০ সেমি।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি:

চিচিঙ্গার জমিতে নিম্ন বর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

(প্রতি শতকে ২০টি মাদা হিসেবে)

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টরপ্রতি)	মোট পরিমাণ (শাতংশ প্রতি)	জমি তৈরির সময় (শাতংশ প্রতি)	মাদাপ্রতি				
				চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
পচা গোবর	২০ টন	৮০ কেজি	৪০ কেজি	২ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	১৮ গ্রাম	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	৫ গ্রাম
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	১০ গ্রাম	১০ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-
দস্তা সার	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৬০ কেজি	২৪০ গ্রাম	-	১২ গ্রাম	-	-	-	-

মাদায় চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে 'জো' এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা:

- সময়মতো নিড়ানি দিয়ে আগাছা সমসময় পরিষ্কার করে সাথে সাথে মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- খরা হলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। পানির অভাব হলে গাছের বৃদ্ধির বিভিন্ন অবস্থায় এর লক্ষণ প্রকাশ পায় যেমন প্রাথমিক অবস্থায় চারার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যাওয়া, পরবর্তীকালে ফুল ঝরে যাওয়া, ফলের বৃদ্ধি বন্ধ হওয়া ও ঝরে যাওয়া ইত্যাদি।
- চিচিঙ্গার বীজ উৎপাদনের সময় খেয়াল রাখতে হবে ফল পরিপক্ক হওয়া শুরু হলে সেচ দেয়া বন্ধ করে দিতে হবে।
- বাউনি দেয়া চিচিঙ্গার প্রধান পরিচর্যা। চারা ২০-২৫ সেমি উঁচু হতেই ১.০-১.৫ মিটার উঁচু মাচা তৈরি করতে হবে এবং বাউনীর ব্যবস্থা করতে হবে। বাউনি দিলে ফলন বেশি ও ফলের গুণগত মান ভাল হয়।
- গাছের গোড়া থেকে ডালপালা বের হলে সেগুলো কেটে দিতে হয় এতে গোড়া পরিষ্কার থাকে, রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উৎপাত কম হয়।
- জুন-জুলাই মাস থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর আর সেচের প্রয়োজন হয় না। জমির পানি নিকাশ নিশ্চিত করার জন্য বেড ও নিকাশ নালা সর্বদা পরিষ্কার করে রাখতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন:

- চারা গজানোর ৬০-৭০ দিন পর চিচিঙ্গার গাছ ফল দিতে থাকে। স্ত্রী ফুলের পরাগায়নের ১০-১৩ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। কচি ও খাওয়ার উপযোগী পুষ্ট অবস্থায় ২-৩ দিন পর পর ফল সংগ্রহ করতে হয়। ফল আহরণ একবার শুরু হলে তা দুই আড়াই মাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।
- উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে চিচিঙ্গার হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন (১০০-১২০ কেজি/শতাংশ) পাওয়া যায়।

অন্যান্য পরিচর্যা

পোকামাকড় ও প্রতিকার

ফলের মাছি পোকা

ক্ষতির ধরন: স্ত্রী মাছি কচি ফলে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়াগুলো ফলের শাঁস খায়, ফল পচে যায় এবং অকালে ঝরে পড়ে।

প্রতিকার: পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ এবং আক্রান্ত অংশ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে। সেক্স ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করে পোকা ভালোভাবে দমন করা যায়। বিষটোপের জন্য থেতলানো ১০০ গ্রাম পাকা মিষ্টি কুমড়ার সাথে ০.২৫ গ্রাম সেভিন ৮৫ পাউডার মিশিয়ে ব্যবহার করতে হয়। বিষটোপ ৩-৪ দিন পরপর পরিবর্তন করতে হয়।

পামকিন বিটল

ক্ষতির ধরন: পূর্ণাঙ্গ পোকা চারা গাছের পাতায় ছিদ্র করে খায়। কীড়া গাছের গোড়ায় মাটিতে বাস করে এবং গাছের শিকড়ের ক্ষতি করে, বড় গাছ মেরে ফেলতে পারে।

প্রতিকার: আক্রান্ত গাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা হাতে ধরে মেরে ফেলা। চারা অবস্থায় ২০-২৫ দিন চারা মশারির জাল দিয়ে ঢেকে রাখা। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সেভিন/কার্বারিন-৮৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। কীড়া দমনের জন্য প্রতি গাছের গোড়ায় ২-৫ গ্রাম বাসুডিন/ডায়াজিনন-১০ জি মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।

এপিল্যাকনা বিটল

ক্ষতির ধরন: পাতায় সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে এবং আক্রান্ত পাতাগুলো বিবর্ণের মত দেখায়, পাতা শুকিয়ে ঝরে পড়ে এবং গাছ পাতাশূন্য হতে পারে।

প্রতিকার: প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম কার্বারিল-৮৫/সেভিন ডব্লিউপি অথবা ২ মিলি সুমিথিয়ন/ফলিথিয়ন-৫০ ইসি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

জাব পোকা

ক্ষতির ধরন: জাব পোকা দলবদ্ধভাবে পাতার রস চুষে খায়। ফলে বাড়ন্ত ডগা ও পাতা হলুদ বর্ণ ধারণ করে, পাতা বিকৃত হয়ে বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং পাতা নিচের দিকে কুঁকড়িয়ে যায়।

প্রতিকার: আক্রান্ত পাতা ও ডগার জাব পোকা হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে। নিম বীজের দ্রবণ (কেজি পরিমাণ অর্ধভাঙ্গা নিমবীজ ১০ লিটার পানিতে ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে) বা সাবান গুলা পানি (প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২ চা চামচ গুঁড়া সাবান মেশাতে হবে) স্প্রে করেও এ পোকার আক্রমণ অনেকাংশে কমানো যায়। লেডীবার্ড বিটলের পূর্ণাঙ্গ পোকা ও কীড়া এবং সিরফিড্ ফ্লাই-এর কীড়া জাব পোকা খেয়ে প্রাকৃতিকভাবে দমন করে। সুতরাং উপরোক্ত বন্ধু পোকাসমূহ সংরক্ষণ করলে এ পোকার আক্রমণ অনেকাংশে কম হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে অথবা পিরিমর ৫০ ডিপি প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রোগবালাই

পাউডারী মিলডিউ বা গাদা গুঁড়া রোগ

ক্ষতির ধরন:

- পাতার উভয় পাশে প্রথমে সাদা সাদা পাউডার বা গুঁড়া দেখা যায়।
- ধীরে ধীরে এ দাগগুলো বড় হয়। ফলে গাছ বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া দাগগুলো বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায়।
- কোন একটি লতার পাতায় আক্রমণ বেশি হলে ধীরে ধীরে সেই লতা ও পরে পুরো গাছই মরে যেতে পারে। এমনিক ফল ঝরে যেতে পারে।
- যদি আগাম চাষ কার হয় তবে এ রোগের লক্ষণ বেশি দেখা যায়।

প্রতিকার:

- এ রোগের প্রতিকারের জন্য আক্রান্ত পাতা ও গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- তাছাড়া ২ গ্রাম থিয়োভিট ৮০ ডব্লিউপি অথবা টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা সালফোলাক্স/কুমুলাস ০.৫ মিলি অথবা ১ গ্রাম ক্যালিক্সিন প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর স্প্রে করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

অ্যানথ্রাকনোজ বা ফলপচা

ক্ষতির ধরন:

- পাতায় গোলাকৃতি দাগ দেখা যায়।
- বৃষ্টিতে পাতার পচন লক্ষ করা যায়।
- প্রথমে ছোট কালো দাগ যার মধ্যাংশ ছত্রাকের জালি ও অণুজীব দ্বারা ঢাকা থাকে।
- আক্রান্ত ফলের বীজও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়। বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়।

প্রতিকার:

- রোগমুক্ত ভাল বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- ঝরণা দিয়ে গাছে পানি বা সেচ দেওয়া যাবে না।
- অনুমোদিত ছত্রাকনাশক অটোস্টিন/নোইন বা একোনাজল আক্রমণের শুরুতেই ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর স্প্রে করে এ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- চিচিঙ্গার বীজ-ফলে অব্যশই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে বীজ রোগমুক্ত রাখতে হবে।

মোজাইক ভাইরাস

ক্ষতির ধরন: পাতায় হলদে ছোপ দেখা দেয় ও পাতা কুকড়ে যায়। ফলে ফলন বহুলাংশে কমে যায়।

প্রতিকার: ভাইরাস দেখা মাত্র আক্রান্ত গাছ ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

ফুলকপির জাত

বারি ফুলকপি-১ (রূপা)

গ্রীষ্মমণ্ডলীয় একটি প্রজাতি থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৯৮ সালে অনুমোদন করা হয়। প্রতিটি ফুলকপির ওজন ৮৫০-১০০০ গ্রাম। ফুলকপি চারদিকে পাতা দ্বারা আংশিক ঢাকা থাকে। এদেশের জলবায়ুতে 'বারি ফুলকপি-১' জাতের বীজ উৎপাদন করা যায়। জীবন কাল ৯৫-১০৫ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-২৮ টন হয়। বীজের ফলন হেক্টরপ্রতি ৪৫৮-৫৫০ কেজি। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

বারি ফুলকপি-১

বারি ফুলকপি-২

বারি ফুলকপি-২ বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত গ্রীষ্মমন্ডলীয় মাঝারি আগাম জাত। প্রতিটি ফুলকপির গড় ওজন ৭৫০-৮০০ গ্রাম। সংগ্রহের সময় কপি মজবুত ও সাদাটে ক্রীম রঙের হয়। বীজ বপন থেকে ৮৫ দিনের মধ্যে ফুলকপি খাওয়ার উপযুক্ত সময়। এ জাতটি দেশের জলবায়ুতে সর্বত্র বীজ উৎপাদনে সক্ষম।

চাষাবাদের উপযোগিতা: জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র শীত মৌসুমে (মাঝারি আগাম) চাষাবাদের উপযোগী।

রোপণ: ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক।

জীবনকাল: ৯৫-১০৫ দিন।

ফলন: ২৫ টন/ হেক্টর এবং বীজ (৪৫০ গ্রাম/ হেক্টর)।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: সেচ ও পানি নিকাশের সুবিধা আছে এমন জমি ফুলকপি চাষের জন্য উপযুক্ত। অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিচর্যায় সব রকমের মাটিতেই ফুলকপির চাষ করা সম্ভব। আগাম ফসলের জন্য দোআঁশ মাটি নির্বাচন করা যেতে পারে। তবে ফুলকপির সফল চাষের জন্য মাটিতে যথেষ্ট জৈব সার থাকা দরকার এবং মাটির অম্লতা (pH) ৬.০ থেকে ৬.৫ হলে ভাল হয়। ফুলকপির বৃদ্ধির জন্য ঠাণ্ডা ও আর্দ্র জলবায়ু উত্তম। ফুলকপি চাষের জন্য সবচেয়ে অনুকূল মাসিক গড় তাপমাত্রা ১৫-২২° সে.।

বীজ বপনের সময় এবং বীজের পরিমাণ: আগাম জাতের ফুলকপির বীজ বপনের উপযুক্ত সময় আগস্ট মাস (মধ্য শ্রাবণ থেকে মধ্য ভাদ্র)। মাঝারি জাতের ফুলকপির বীজ বপন করতে হয় সেপ্টেম্বর মাসে (মধ্য আশ্বিন)। আর নাবি জাতের বীজ অক্টোবর মাস (মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য কার্তিক)। হেক্টরপ্রতি ফুলকপি চাষের জন্য বীজের প্রয়োজন হয় ২০০-২৫০ গ্রাম।

চারা উৎপাদন: ফুলকপি চাষের জন্য চারা উৎপাদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেশে সাধারণত ফুলকপির বীজ সরাসরি বীজতলায় বপন করা হয়। চারাগুলি দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করা হয় না। এতে বীজের পরিমাণ বেশি লাগে। উপরন্তু চারার স্বাস্থ্য ভাল হয় না। অথচ ভাল ফসল পেতে হলে সুস্থ সবল চারা লাগাতে হয়। তাই প্রাথমিকভাবে বীজতলায় ঘন করে বীজ ফেলতে হয়। বীজ গজানোর ১০-১২ দিন পর গজানো চারা দ্বিতীয় বীজতলায় স্থানান্তর করতে হয়। প্রতিটি বীজতলার আকার পাশে ১ মিটার এবং লম্বায় ৩ মিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এতে অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। এক হেক্টর জমির চারা উৎপাদন করতে ২০টি বীজতলার প্রয়োজন হয়। বীজতলার মাটি সমপরিমাণ বালি, মাটি ও কম্পোস্ট মিশিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরি করতে হয়। দ্বিতীয় বীজতলায় চারা স্থানান্তরের ৭/৮ দিন পূর্বে প্রতিটি বীজতলায় ১৫০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম ইউরিয়া ও ১০০ গ্রাম এমপি মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হয়। পরবর্তীতে চারা বৃদ্ধির হার কম হলে প্রতিটি বীজতলায় ৮০-১০০ গ্রাম ইউরিয়া ছিটিয়ে দিতে হবে।

জমি তৈরি: সারা দিন রোদ পায় এমন জমি ফুলকপি চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত। গভীর চাষ দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। এরপর দু'সারিতে চারা রোপণের জন্য ১ মি. চওড়া ১৫ থেকে ২০ সেমি উঁচু মিড়ি (বেড) তৈরি করতে হবে। সেচ ও পানি নিকাশের সুবিধার জন্য মিড়িতে চারা রোপণ করাই ভাল। মিড়ির দৈর্ঘ্য জমির আকৃতি এবং কাজের সুবিধা বিবেচনা করে যত ইচ্ছা করা যেতে পারে। পাশাপাশি দুই মিড়ির মাঝখানে ৩০ সেমি প্রশস্ত এবং ১৫-২০ সেমি গভীর পিলি (নালা) থাকবে। পিলির মাটি তুলেই মিড়ি তৈরি করা হয়। সেচ দেয়া এবং পানি নিকাশের জন্য পিলি অত্যন্ত জরুরি।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

ফুলকপির একরপ্রতি ফলন যথেষ্ট। তাই জমিতে সারের কমতি হলে গাছের বৃদ্ধি আশানুরুপ হয় না এবং পরবর্তীতে ফলন কমে যায়। তাই ফুলকপির জমিতে জৈব এবং রাসায়নিক উভয় প্রকারের সার প্রয়োগ করা উচিত। ফুলকপি চাষের জমি সাধারণত নিন্মোক্ত হারে সার প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়।

হেক্টরপ্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	চারা রোপণের পূর্বে গর্তে প্রয়োগ	প্রথম কিস্তি (রোপণের ১৫ দিন পর)	দ্বিতীয় কিস্তি (রোপণের ৩৫ দিন পর)
গোবর	১০ টন	৫ টন	৫ টন	-	-
ইউরিয়া	১৫০ কেজি	-	-	৭৫ কেজি	৭৫ কেজি
টিএসপি	১৫০ কেজি	৭৫ কেজি	৭৫ কেজি	-	-
এমপি (পটাশ)	১২০ কেজি	-	-	৬০ কেজি	৬০ কেজি
জিপসাম	১০০ কেজি	১০০ কেজি	-	-	
বোরিক এসিড (বোরন)	৩ কেজি	৩ কেজি	-	-	-
এমোনিয়াম মলিবডেট (মলিবডেনাম)	১ কেজি	১ কেজি	-	-	-

চারা রোপণ: বীজ বপণের ৩০-৩৫ দিনের মধ্যেই চারা জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়। এসময় প্রতিটি চারায় ৫-৬টি প্রকৃত পাতা হয়ে থাকে। জমির উর্বরতা এবং গাছের বৃদ্ধির উপর রোপণের দূরত্ব নির্ভর করে। ফুলকপির চারা দু'সারি পদ্ধতিতে রোপণ করা হয়। সাধারণত এক মিটার প্রশস্ত মিড়িতে ৬০ সেমি দূরত্বে দু'সারিতে ৪৫ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করা হয়। রোপণের জন্য চারা একদিন পূর্বে নার্সারি বীজতলা ভালভাবে ভিজিয়ে নিতে হবে। এতে চারা উঠানো সহজ হয় এবং চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ঠাণ্ডার দিনে বা বিকালেই চারা উঠানো এবং রোপণ করা উচিত। কারণ রাতের বেলা চারা ধকল সামলিয়ে উঠতে পারে। রোপণের পরপরই গোড়ায় সেচ দিলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং চারা কম মারা যায়। তবে কিছু সংখ্যক চারা নষ্ট হয়ে থাকে। রোপণের ৭ খেকে ১০ দিনের মধ্যেই অতিরিক্ত চারা রোপণ করে খালি জায়গাগুলি পূরণ করতে হবে।

পরবর্তী পরিচর্যা: রোপনের পর প্রথম ৪-৫ দিন পরপরই সেচ দিতে হবে। পরবর্তীতে ৮-১০ দিন অন্তর বা প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিলেই চলবে। সেচ পরবর্তী জমিতে 'জো' আসলে ফুলকপির স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য চটা ভেঙ্গে দিতে হবে এবং জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। সারের উপরি প্রয়োগ যথাসময়ে করতে হবে। উল্লেখ্য সারের উপরি প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে। পানি সেচ ও নিকাশের জন্য নালা সবসময় পরিষ্কার রাখতে হবে।

ফসল সংগ্রহ : রোপণের পর গাছে যখন ১২ থেকে ১৫টি পাতা হয় তখনই প্রপুস্প মঞ্জুরী দেখা যায়। নাবি জাতসমূহে বা যে সমস্ত জাত দ্বি-বর্ষজীবী সে ক্ষেত্রে ২৫-৩০ পাতা হওয়ার পর প্রপুস্প মঞ্জুরী দেখা যায়। এরপর প্রপুস্পমঞ্জুরী পূর্ণ আকার ধারণ করতে আরও ১৫ দিন সময় লাগে। জাতভেদে রোপণের ৪০-৪৫ দিন পর প্রপুস্পমঞ্জুরী দেখা যায় এবং ৮০-৯০ দিন পর সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। অবশ্য নাবি জাতে বিশেষ করে যেগুলি দ্বি-বর্ষজীবী সে গুলো আরও অনেক বেশি সময় নিয়ে থাকে। ফুলকপির প্রপুস্পমঞ্জুরী একটি নির্দিষ্ট আকার লাভ করার পর দৃঢ়, ঠাসা এবং আকর্ষণীয় অবস্থায় সংগ্রহ করা ভাল। পাতা যাতে ফুলকপির প্রপুস্পমঞ্জুরীকে আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে সেজন্য পাতাসহ ফুলকপি আহরণ বা সংগ্রহ করতে হয়।

ফলন: উপযুক্ত পরিচর্যার মাধ্যমে হেক্টরপ্রতি ২৫ থেকে ৩৫ টন ফুলকপি পাওয়া যায়।

ফুলকপির বীজ উৎপাদন: যে সব ফুলকপির জাত এদেশীয় আবহাওয়ায় উৎপাদন অনুকূল সেসব জাতের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব। তবে ফুলকপি পরপরাগায়িত ফসল। এর বীজ উৎপাদনের জন্য অন্য জাত থেকে কমপক্ষে ১০০০ মিটার প্রাথকীকরণ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। সাধারণত নির্বাচিত সবচেয়ে ভাল ফুলকপিগুলি সংগ্রহ না করে মাঠেই রাখা যেতে পারে। সেখানেই প্রপুস্প মঞ্জুরীগুলি ফুলে পরিণত হবে এবং মার্চ/এপ্রিল মাসে অর্থাৎ চৈত্র মাসেই বীজ সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। এ পদ্ধতিতেই সবচেয়ে বেশি বীজ পাওয়া যায়। যেহেতু নির্বাচিত গাছগুলি ক্ষেতে দূরে দূরে থাকে এগুলি পরিচর্যা ব্যয়সাধ্য হয়ে পড়ে। তাছাড়া জমিও পড়ে থাকে। এসব বিষয় বিবেচনা করে বীজের জন্য নির্বাচিত গাছগুলি পুস্পমঞ্জুরীসহ উঠিয়ে যথাযথ সার এবং যত্নসহকারে তৈরি একটি জায়গায় ৭৫ সেমি দ্ধ ৭৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করা যেতে পারে। স্থানান্তরের সময়ে প্রপুস্পমঞ্জুরীর মধ্যবর্তী অংশ কেটে ফেলতে হয়। এতে বীজের মান উন্নত হয়। মৌমাছি যাতে ভিড়তে পারে সে ব্যবস্থা নিতে হবে এবং এসময় কোন কীটনাশক ছিঠানো ঠিক হবে না।

বাঁধাকপির জাত

বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী)

বারি বাঁধাকপি-১

'বারি বাঁধাকপি-১' জাতটি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৮৫ সালে অনুমোদন করা হয়। জাতটি এদেশে ফুল ও বীজ উৎপাদনে সক্ষম।

বীজ বপনের ১০০-১১০ দিন পরই বাঁধাকপি সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। প্রতিটি বাঁধাকপির ওজন ২.০-২.৫ কেজি। এটি একটি বিশুদ্ধ জাত বলে চাষী নিজেরাই বীজ উৎপাদন করতে পারে।

প্রভাতী জাত থেকে হেক্টরপ্রতি ৪০০-৫০০ কেজি বীজ উৎপাদন করা যায়। জীবন কাল কপি উৎপাদনে ১০০-১১০ দিন এবং বীজ উৎপাদনে প্রায় ১৮০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ৫০-৬০ টন ফলন পাওয়া যায়। দেশের উত্তরাঞ্চলে চাষ করে বীজের ভাল ফলন পাওয়া সম্ভব।

বারি বাঁধাকপি-২

বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত)

এশীয় অঞ্চলের একটি উষ্ণমণ্ডলীয় প্রজাতি থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯৮ সালে তা সারাদেশে চাষের জন্য অনুমোদন করা হয়।

বাঁধাকপি গোলাকার, উপর-নিচ চ্যাপ্টা। পাতার পৃষ্ঠদেশে পাতলা মোমের আবরণের মত বস্তু রয়েছে। প্রতিটি বাঁধাকপির ওজন ২.০-২.৫ কেজি। জাতটি বাংলাদেশের জলবায়ুতেই বীজ উৎপাদন করে।

বীজ বপন থেকে কপি উৎপাদন পর্যন্ত ১০০-১১০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ৫৫-৫৬ টন এবং বীজের ফলন ৫৫০-৬৫০ কেজি পাওয়া যায়। এ জাত বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের উপযোগী।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: প্রায় সব ধরনের মাটিতে বাঁধাকপি জন্মানো যায়। তবে দোআঁশ ও পলি দোআঁশ মাটি উত্তম।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: গভীর চাষ দিয়ে মাটির ঢেলা ভেঙ্গে আগাছা পরিষ্কার করে ভালভাবে বাঁধাকপির জন্য জমি তৈরি করতে হয়।

চারা রোপণ: বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর চারা রোপণের উপযুক্ত হয়। উত্তমরূপে জমি তৈরি করার পর ১৫-২০ সেমি উঁচু ১ মিটার প্রশ্বস্ত বেড তৈরি করতে হয়। পাশাপাশি ২টি বেডের মাঝখানে ৩০ সেমি প্রশস্ত নালা রাখতে হবে। বেডের উপর ৬০ সেমি দূরত্বে ২টি সারি করে সারিতে ৪৫ সেমি দূরে দূরে চারা লাগাতে হয়।

বপনের সময়: ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর) থেকে শুরু করে কার্তিক (মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর) পর্যন্ত বারি বাঁধাকপির চারা রোপণ করা যেতে পারে। অগ্রহায়ণ মাসে (মধ্য-নভেম্বর থেকে মধ্য-ডিসেম্বর) রোপণ করলে মাথা তেমন বাঁধে না ও অকালে ফুল এসে যায়।

সারের পরিমাণ: বাঁধাকপির জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৩০০-৩৫০ কেজি
টিএসপি	২০০-২৫০ কেজি
এমপি	২৫০-৩০০ কেজি
গোবর	৫-১০ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি ও ১০০ কেজি এমপি সার জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ ইউরিয়া ও বাকি এমপি সার ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের ১০, ২৫ এবং মাথা বাঁধার সময় প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ: উচ্চ ফলনের জন্য বাঁধাকপিতে চারা রোপণের ২০-৩০ দিন পর পর ২-৩টি সেচ দিতে হবে।

চীনাকপির জাত

বারি চীনাকপি-১

বারি চীনাকপি-১

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে ‘বারি চীনাকপি-১’ পাতাজাতীয় সবজিটি অনুমোদন করা হয়। এ জাত শীতকালে বাঁধাকপির মত শক্ত কপি উৎপাদন করে। গ্রীষ্মকালেও এ জাতটি শাক হিসেবে চাষাবাদ করা যায়। সালাদ হিসেবে এ সবজির যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে।

জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল এবং স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদনযোগ্য। প্রতিটি কপির ওজন ১.০-১.৫ কেজি। কপি কিছুটা লম্বাকৃতির। এ জাতটি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করতে পারে।

বপনের ৬০-৭০ দিনের মধ্যেই ফসল উঠানো যায়। তবে বীজ উৎপাদনের জন্য ১০৫-১২০ দিন সময় লাগে। রবি মৌসুমে প্রতিটি কপির ওজন ১.০-১.৫ কেজি। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ফলন প্রতি হেক্টরে ৪০-৪৫ টন সবজি এবং প্রতি হেক্টরে ৫০০-৬০০ কেজি বীজ উৎপাদন করা সম্ভব। বাংলাদেশে প্রায় সব এলাকায় শীতকালে এ সবজির চাষ করা যায়। গ্রীষ্মকালে উঁচু ও সুনিষ্কাশিত জমিতে বেড করে ‘বারি চীনাকপি-১’ এর চাষ করা যায়।

লালশাকের জাত

বারি লালশাক-১

বারি লালশাক-১

লালশাকের এ জাতটি ‘বারি লালশাক-১’ নামে ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। পাতা ও কাণ্ড উজ্জ্বল লাল।‘বারি লালশাক-১’ এর পাতার বোঁটা ও কাণ্ড নরম। গাছ উচ্চতায় ২৫-৩৫ সেমি। প্রতিগাছে ১৫-২০টি পাতা থাকে। গাছের ওজন ১০-১৫ গ্রাম। ফুলের রং লাল, বীজ গোলাকার, বীজের উপরিভাগ কালো ও কিছুটা লাল দাগ মিশ্রিত। রান্নার পর শাকের রং গাঢ় লাল হয়। ‘বারি লালশাক-১’ বীজ বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে তোলা যায়। বীজ উৎপাদনের জন্য ১১০-১৩০ দিন সময় লাগে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ১২-১৪ টন হয়। ‘বারি লালশাক-১’ ভিটামিন ‘এ’, ‘বি’, ‘সি’ ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: প্রায় সব ধরনের মাটিতেই সার বছর ‘বারি লালশাক-১’ এর চাষ করা যায়। তবে শীত মৌসুমে লালশাকের ফলন বেশি হয়। গ্রীষ্ম মৌসুমে পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত জমিতে লালাশাক চাষ করা যায়। দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি লালশাকের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি: জমি খুব ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করতে হবে। মাটি ও জমির প্রকার ভেদে ৪টি চাষ ও মই দিতে হয়।

বীজ বপন: লালশাক বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে বপন করা যায়। তবে সারিতে বপন করা সুবিধাজনক। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০ সেমি দিতে হবে। একটি কাঠির সাহায্যে ১.৫-২.০ সেমি গভীর লাইন টেনে বীজ বুনে মাটি সমান করে দিতে হবে।

বপনের সময়: সারা বছরই এ জাতের লালশাক চাষ করা যায়।

বীজের হার: হেক্টরপ্রতি ২.০-২.৫ কেজি।

অন্তবর্তীকালীন পরিচর্যা: বীজ গজানোর ১ সপ্তাহ পর প্রত্যেক সারিতে প্রতি ৫ সেমি অন্তর গাছ রেখে অন্যান্য গাছ তুলে ফেলতে হবে। নিড়ানি দিয়ে জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। জমির উপরিভাগে মাটিতে চটা হলে নিড়ানি দেওয়ার সময় তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

বারি চীনাশাক

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত চীনাশাক জাতটি ১৯৮৪ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি একটি দ্রুত বর্ধনশীল সবুজ পাতাজাতীয় সবজি। সরিষা গোত্রীয় এই সবজি জাতটি এদেশে সারা বৎসর উৎপাদন করা যায়। হালকা সবুজ পাতা অবস্থায় শাক হিসেবে খাওয়া যায়। চীনাশাক ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় জাতটি পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম।

বারি চীনাশাক-১

বীজ লাগানোর ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই শাক হিসেবে উঠানো যায়। সবজি হিসেবে গ্রীষ্মকালে এবং বীজ উৎপাদনের জন্য শীতকালে বীজ বপন করতে হয়। বীজ উৎপাদনের জন্য ৯০-১০৫ দিন সময় লাগে।

উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করে হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন সবুজ পাতা এবং ৭০০-৭৫০ কেজি বীজ পায়া যায়। স্বল্পকালীন, উচ্চ ফলনশীল এবং সারা বছর উৎপাদনযোগ্য এ সবজির চাষ বেশ লাভজনক।

বারি বাটিশাক

বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাটিশাক নামে এ জাতটি ১৯৮৪ সালে অনুমোদন করা হয়। প্রতি গাছে ২০-২৫টি পাতা থাকে। পাতার দৈর্ঘ্য ২২-২৫ সেমি এবং প্রস্থ ১৮-২০ সেমি। পাতা ও পাতার বোঁটা নরম। পাতার রং গাঢ় সবুজ ও বোঁটার রং সাদা।

বারি বাটিশাক-১

স্বল্পকালীন, উচ্চ ফলনশীল এবং সারা বছর চাষোপযোগী। এ জাত স্থানীয় আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করতে পারে। জীবনকাল শাকের জন্য ৪০-৫০ দিন এবং বীজের জন্য ১১০-২০ দিন।

উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে ৪৫-৫৫ টন শাক এবং ৭০০-৮০০ কেজি বীজ পাওয়া যায়। দেশের প্রায় সর্বত্র সারা বছরই এ জাতের সবজি চাষ করা যায়।

বাটিশাক ও চীনাশাক উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: প্রায় সব ধরনের মাটিতেই বাটিশাক ও চীনাশাক চাষ করা যায়। তবে বেলে মাটি ও বেলে দোআঁশ মাটিতে এ ফসল ভাল জন্মে।

জমি তৈরি: তিন থেকে চারবার উত্তমরূপে জমি চাষ করে ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে পারলে ভাল হয়। জমিতে সেচ দেওয়া ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বীজ বপনের সময়: সারা বছরই বাটিশাক ও চীনাশাক চাষ করা যায়। বীজ উৎপাদনের জন্য শীতকালে চাষ করতে হয়।

সারের পরিমাণ: বাটিশাক ও চীনাশাকের জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	২০০-২৫০ কেজি
টিএসপি	১০০-১৫০ কেজি
এমওপি	১৫০-২০০ কেজি
গোবর	১০-১২ টন

উৎপাদন পদ্ধতি: বীজতলায় চারা তৈরি করে অথবা সরাসরি জমিতে বীজ বপন করে চাষ করা যায়। সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রে একটু ঘন করে বীজ বপন করতে হবে। চারা কিছুটা বড় হলে খাওয়া যায়। সব শেষে ২০-২৫ সেমি দূরত্বে একটি করে চারা রেখে দেওয়া হয়। ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই গাছ সংগ্রহের সময় হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: সাফল্যজনকভাবে বাটিশাক ও চীনাশাকের চাষ করতে হলে পরিমিত সেচ জরুরি। প্রয়োজনমত নিড়ানী দিয়ে আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

মিষ্টি কুমড়া শাক উৎপাদন প্রযুক্তি

শাক জাতীয় সবজির মধ্যে মিষ্টি কুমড়া শাক পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়। ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ এই সবজির বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। চাষীগণ মিষ্টি কুমড়া শাক চাষ করে লাভবান হতে পারেন।

মাটি ও জমি নির্বাচন: সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধা আছে এমন জমি মিষ্টি কুমড়া শাক চাষের জন্য ভাল। অবশ্য পয়োজনীয় পরিচর্যার সব রমকের মাটিতেই মিষ্টি কুমড়া শাকের চাষ হতে পারে। তবে সফল চাষের জন্য যথেষ্ট জৈব সার সমৃদ্ধ উর্বর বেলে দোআঁশ মাটিই সর্বোত্তম।

জমি তৈরি: খুব ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। জমির প্রকারভেদে ৫-৬টি চাষ ও মই দিতে হবে।

সার প্রয়োগ:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	২০০ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি
এমওপি	১৭৫ কেজি
গোবর সার	২০-২৫ টন

সমস্ত টিএসপি ও এমওপি সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার চার কিস্তিতে যথাক্রমে ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বার ফসল কাটার পর প্রয়োগ করতে হবে।

বীজ বপন: সারা বছরই মিষ্টি কুমড়া শাকের চাষ করা যায়। সারি থেকে সারি ৫০ সেমি এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ১৫ সেমি রেখে বপন করতে হয়। পার্বত্য অঞ্চলে উক্ত মিষ্টি কুমড়ার বীজে পিঁপড়ার আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই বীজ বপন করার আগে বীজে ৫০ গ্রাম/কেজি সেভিন ৮৫ ডব্লিউ পি মিশিয়ে নিলে ভাল হয়।

পানি সেচ: বর্ষাকালে সাধারণত পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে এক নাগাড়ে বৃষ্টি না হলে ১০-১৫ দিন অন্তর পানি সেচ দেওয়া আবশ্যক। ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের পর সেচ দিতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: চারা গজানোর পর প্রত্যেক সারিতে ১৫ সেমি অন্তর ১টি চারা রাখতে হবে। নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। মিষ্টি কুমড়া শাকের ক্ষেতে চারা অবস্থায় পামকিন বিটল এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ভোরবেলায় আক্রান্ত গাছ থেকে পূর্ণাঙ্গ পোকা হাতে ধরে মেরে ফেলতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: চারা গজানোর ৩০-৪০ দিনের মধ্যে ২.৫-৩ ফুট দীর্ঘ হলে গোড়া থেকে ২-৩টি পর্বসন্ধি রেখে শাক কেটে নিতে হয়। পরবর্তীকালে ঐ পর্বসন্ধি থেকে কুশি ছাড়ার পর ২০-৩০ দিনের মধ্যে তা আবার কাটার উপযুক্ত হয়। এভাবে ৩-৪ বার ফসল তোলা যায়। হেক্টরপ্রতি ফলন ৬০-৭০ টন। উপরি ফলন হিসেবে প্রচুর মিষ্টি কুমড়ার ফুল পাওয়া যায় বাজারে যার ভাল চাহিদা রয়েছে।

গীমাকলমির জাত

বারি গীমাকলমি-১

'বারি গীমাকলমি-১' জাতটি চাষের জন্য ১৯৮৩ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি একটি পাতা জাতীয় গ্রীষ্মকালীন সবজি। পাতার বোঁটা ও কাণ্ড সবুজ, নরম ও রসালো। পাতা ৬-৯ সেমি লম্বা এবং ৫-৮ সেমি প্রস্থ। কলমির ফুল সাদা। বীজের আবরণ শক্ত, বর্ণ ধূসর। ফলে চারটি করে বীজ থাকে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ৪০-৪৫ টন ফলন পাওয়া যায়। বাংলাদেশের সর্বত্র সেচ সুবিধাযুক্ত জমিতে চাষ করা যায়। একবার বীজ বপন করে সারা বছর সবজি সংগ্রহ করা যায়।

বারি গীমাকলমি-১ এর ফসল

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত সব রকমের উর্বর জমি গীমাকলমি চাষের উপযোগী। তবে দোআঁশ বা পলি মাটি বেশি উপযোগী। মাটি ও জমির প্রকাভেদে ৫-৬টি চাষ ও মই দেওয়া প্রয়োজন এবং জমি গভীর করে চাষ করতে হবে।

বপনের সময়: বছরের যে কোন সময়েই চাষ করা যেতে পারে। চৈত্র মাস (মধ্য-মার্চ থেকে মধ্য-এপ্রিল) থেকে শুরু করে শ্রাবণ মাস (মধ্য-জুলাই থেকে মধ্য-আগস্ট) পর্যন্ত লাগানো যেতে পারে।

সারের পরিমাণ: গীমাকলমির জমিতে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১৪০-১৬০ কেজি
টিএসপি	১০০-১২০ কেজি
এমওপি	১০০-১২০ কেজি
গোবর বা কম্পোস্ট	৮-১০ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: ইউরিয়া সার ৩ কিস্তিতে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় বার ফসল কাটার পর প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ: বর্ষাকালে সাধারণত পানি সেচের প্রয়োজন হয় না। তবে এক নাগাড়ে বৃষ্টি না হলে ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর পানি সেচ দেওয়া আবশ্যক।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: চারা গজানোর পর প্রত্যেক বেডে অর্থাৎ প্রতি ১৫ সেমি অন্তর ১টি করে চারা রাখতে হয়। জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

ঢেঁড়সের জাত

বারি ঢেঁড়স-১

'বারি ঢেঁড়স-১' নামে জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের গাছে প্রায় সব পত্রকক্ষেই ফুল ও ফল ধরে। গাছ ২.০-২.৫ মিটার লম্বা হয়। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ২৫-৩০টি।

বীজ বপনের ৪৫ দিনের মধ্যে ফুল ফুটতে শুরু করে। ফল ৫ শিরা বিশিষ্ট, সবুজ এবং ১৪-১৮ সেমি লম্বা। ফুল ফোটার ৫-৬ দিনের মধ্যেই ফল সংগ্রহ করতে হয় এবং পরবর্তীকালে প্রতি ১ দিন অন্তর ফল সংগ্রহ করা যায়। পরিপক্ক এবং শুষ্ক বীজে বাদামী রোমশ আবরণ আছে যা এ জাতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

বারি ঢেঁড়স-১

বীজের রং বাদামী। জীবনকাল বীজ বপন থেকে প্রায় ৫ মাস। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন ১৪-১৬ টন হয়। বাংলাদেশের সর্বত্র সারা বছরই এ জাতের চাষ করা যায়।

বারি ঢেঁড়স-২

বারি ঢেঁড়স-২

উচ্চ ফলনশীল জাত। এটি একটি আগাম জাত (৪০-৪২ দিনে প্রথম ফুল আসে)। ফল মাঝারী আকারের লম্বাটে। সবুজ রঙের, ৫-৬ টি শিরা বিশিষ্ট। ফল নরম, অল্প আঁশযুক্ত যার ১০০% ভক্ষণযোগ্য। ফলের গড় ওজন ১৩-১৬ গ্রাম। প্রতি গাছে ৩২-৩৮ টি ফল ধরে। গড় ফলন প্রায় ১৭-২১ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: ঢেঁড়সের জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রা প্রয়োজন। শুষ্ক ও আর্দ্র উভয় অবস্থায় ঢেঁড়স জন্মানো যায়। সাধারণত খরিফ মৌসুমেই এর চাষ হয়ে থাকে। দোআঁশ মাটি ঢেঁড়সের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট। প্রচুর জৈব সার প্রয়োগ করতে পারলে বেলে ধরণের মাটিতেও এর চাষ করা যায়। মাটি সুনিষ্কাশিত হওয়া প্রয়োজন।

বীজ বপনের সময় ও পরিমাণ: বাংলাদেশে সাধারণত ফেব্রুয়ারি থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত ঢেঁড়স লাগানো হয়। তবে বছরের অন্যান্য সময়ও সীমিতভাবে এর চাষ হয়ে থাকে। প্রতি হেক্টরে বপনের জন্য ৪-৫ কেজি (১২-২০ গ্রাম/শতাংশ) বীজের প্রয়োজন হয়।

জমি নির্বাচন ও তৈরি:

- সেচ ও পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাসহ উচু জমি নির্বাচন করে ৫/৬ বার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে।
- মাঠে সরাসরি বীজ বপনের জন্য এক মিটার প্রস্থ বেড তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি দুটি বেডের মাঝখানে ৩০ সেমি প্রশস্থ নালা রাখতে হবে।
- বেড সাধারণত ১৫-২০ সেমি উঁচু হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি (হেক্টর প্রতি)

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় দেয়	উপরি প্রয়োগ		
			১ম কিস্তি (বীজ বপনের ৩০ দিন পর)	২য় কিস্তি (বীজ বপনের ৫০ দিন পর)	৩য় কিস্তি (বীজ বপনের ৮০ দিন পর)
গোবর/কম্পোষ্ট	১৪ টন	সব	-	-	-
ইউরিয়া	১৫০ কেজি	৭৫ কেজি	২৫ কেজি	২৫ কেজি	২৫ কেজি
টিএসপি	১০০ কেজি	সব	-	-	-
এমওপি	১৫০ কেজি	৭৫ কেজি	২৫ কেজি	২৫ কেজি	২৫ কেজি

বীজ বপনের পদ্ধতি ও দূরত্ব:

- আগাম ফসলের জন্য বীজ ঘন করে বপন করতে হয়।
- এক্ষেত্রে সারি থেকে সারি ৪৫ সেমি এবং সারিতে ৩০ সেমি পর পর লাইনে ৩০ সেমি অন্তর বীজ বপন করা হয়।
- সঠিক মৌসুমের চাষের জন্য অর্থাৎ বৈশাখ মাস থেকে (১৫ এপ্রিলের পর) এক মিটার প্রশস্থ বেডে ৬০ × ৪০ সেমি দুরত্বে দু'সারিতে বীজ বপন করেতে হবে।
- বীজ মাটির ২-৩ সেমি গভীরে বুনতে হয়।
- এক সাথে ২টি বীজ বপন করা ভাল।
- বীজ বপনের পূর্বে ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদ্গম ভাল হয়।
- বপনের পর প্রয়োজনীয় পানি সেচ আবশ্যক।
- চারা গজানোর ৭ দিন পর সুস্থ সবল ১টি গাছ রেখে অতিরিক্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা:

- সময়মত নিড়ানী দিয়ে আগাছা সবসময় পরিষ্কার করে সাথে সাথে মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- খরা হলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে ।

লাউ

লাউ সাধারণত শীতকালে বসতবাড়ির আশেপাশে চাষ করা হয়। তবে এখন গ্রীষ্মকালিন বা সারাবছর উৎপাদনশীল জাত বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত হওয়ায় এখন সারাবছর লাউ উৎপাদিত হচ্ছে। লাউয়ের পাতা ও ডগা শাক হিসেবে এবং ফল তরকারি ও ভাজি হিসেবে খাওয়া যায়।

লাউয়ের জাত

বারি লাউ-১

বারি লাউ-১

'বারি লাউ-১' জাতটি বাছাইয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবন করে ১৯৯৬ সালে সর্বত্র চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়।

পাতা সবুজ ও নরম। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল যথাক্রমে চারা রোপণের ৪০-৪৫ দিন এবং ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে ফুটে।

ফল হালকা সবুজ। লম্বা ৪০-৫০ সেমি, ব্যাস ৪০-৩৫ সেমি। প্রতি ফলের ওজন ১.৫-২.০ কেজি। প্রতি গাছে ১০-১২টি ফল ধরে। চারা রোপণের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল তোলা যায়। লাউ ২-৩ দিন পর পর সংগ্রহ করতে হয়।

গ্রীষ্ম মৌসুমেও 'বারি লাউ-১' উৎপাদন করা যায়। এ জাতটি সারা বছরই চাষ করা যায়। জীবনকাল ১৫০-১৪০ দিন। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ফলন শীতকালে ৪২-৪৫ টন এবং গ্রীষ্মকালে ২০-২২ টন।

বারি লাউ-২

বারি লাউ-২

এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লাউ চালকুমড়া আকারের ও হালকা সবুজ রঙের। ফলটি লম্বায় ১৮-২০ সেমি এবং ব্যাস ১৪-১৫ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ১.৫ কেজি এবং গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ১৫-২০টি । চারা রোপণের ৬৫-৭৫ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়। লাউ কচি অবস্থায় সংগ্রহ করলে পাছপ্রতি ফলের সংখ্যা এবং ফলন বেড়ে যায়। জাতটি মূলত শীত মৌসুমের জন্য। বাংলাদেশের সব এলাকায় এ জাতটি চাষ করা যায়। শীতকালে চাষের জন্য ভাদ্রের প্রথমে আগাম ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। ভাদ্র-অগ্রহায়ণ মাসে এ জাতের চারা রোপণ করতে হয়। জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন। ফলন ৪৫-৫০ টন/হেক্টর।

এ জাতটি স্থানীয় জাতগুলোর তুলনায় উচ্চ ফলনশীল। কৃষক পর্যায়ে জাতের বিশুদ্ধতা ঠিক রাখতে পারলে জাতের উচ্চ ফলনশীলতা বজায় থাকবে। তাছাড়া আকর্ষণীয় আকৃতির কারণে বিদেশে এটি রপ্তানিও করা যাবে।

বারি লাউ-৩

বারি লাউ-৩

এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আগাম জাত হিসেবে চাষ করা যায়। সবুজ রঙের ফলে সাদা দাগ থাকে। গাছপ্রতি গড় ফল সংখ্যা ১৫-১৬টি। এসব ফলের গড় ওজন ২.৫ ২.৭ কেজি। ফল লম্বায় ৩২-৩৪ সেমি এব ব্যাস ১২-১৪ সেমি হয়। চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়।

বাংলাদেশের সব এলাকায় এ জাতটি চাষ করা যায়। আশ্বিন মাসে বীজ বপন এবং ভাদ্র মাস চারা রোপণ করলে ফলন ভাল হয়। জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন। ফলন ৫০-৫৫ টন/হেক্টর।

বারি লাউ-৪

এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাপ সহনশীল এবং গ্রীষ্মকালে চাষ করা যায়। গাঢ় সবুজ রঙের ফলের গায়ে সাদাটে দাগ থাকে। গাছপ্রতি ১০-১২টি ফল পাওয়া যায় এবং ফলের গড় ওজন ২.৫ কেজি। ফল লম্বায় ৪২-৪৫ সেমি এবং ব্যাস ১২-১৩ সেমি। চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। জীবনকাল ১৩০-১৫০ দিন। ফলন ৮০-৮৫ টন/হেক্টর। জাতটি তাপ সহিষ্ণু হওয়ায় গ্রীষ্মকালে চাষ করে কৃষক লাভবান হতে পারে।

বাংলাদেশের সব এলাকায় এ জাতটি চাষ করা যায়। গ্রীষ্মকালে চাষের জন্য ফাল্গুনের শেষে আগাম ফসল হিসেবে চাষ করা যায়। চৈত্র মাসে বীজ বপন করে বৈশাখ মাসে চারা রোপণ করা যায়।

বারি লাউ-৪

বারি লাউ-৫

- ❀ এটি একটি উচ্চফলনশীল জাত এবং ফল দেখতে লম্বা ও বোতল আকৃতির।
- ❀ ফল বড় আকারের (গড় ওজন ১.৯-২.০ কেজি)।
- ❀ ফল গাঢ় সবুজ রঙের এবং ফলের নিচের দিকে সাদা ছিট ছিট দাগ আছে।
- ❀ গাছ প্রতি গড়ে ফলের সংখ্যা ১০-১২টি
- ❀ গড় ফলন প্রায় ৪০-৪৫ টন/হেক্টর।

বারি লাউ-৫

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: বেশি শীতও না, আবার বেশি গরমও না এমন আবহাওয়া লাউ চাষের জন্য উত্তম। বাংলাদেশের শীতকালটা লাউ চাষের জন্য বেশি উপযোগী। তবে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলের তাপমাত্রা শীতকালে কখনও কখনও ১০° সে. এর নিচে চলে যায় যা লাউ চাষের জন্য মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। লাউয়ের ভালো ফলনের জন্য সবচেয়ে অনুকূল তাপমাত্রা হলো দিনের বেলায় ২৫-২৮° সে. এবং রাতের বেলায় ১৮-২০° সে.। মেঘলা আবহাওয়ায় লাউয়ের ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটি লাউ চাষের জন্য উত্তম।

বীজের হার: হেক্টরপ্রতি ২-৩ কেজি (শতাংশ প্রতি ৮-১০ গ্রাম) বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ শোধন: বীজ বাহিত রোগ প্রতিরোধ এবং সবল-সতেজ চারা উৎপাদনের জন্য বীজ শোধন জরুরি। কেজি প্রতি দুই গ্রাম ভিটাভেক্স/ক্যাপটান ব্যবহার করে বীজ শোধন করা যায়।

বীজ বপন ও চারা উৎপাদন:

- ❀ শীতকালে চাষের জন্য আগস্ট - অক্টোবর এবং গ্রীষ্মকালে চাষের জন্য ফেব্রুয়ারি-মে মাসে বীজ বপন করা যায়।
- ❀ লাউ চাষের জন্য চারা নার্সারিতে পলিব্যাগে উৎপাদন করে নিলে ভাল হয়।
- ❀ বীজ বপনের জন্য ৮ × ১০ সেমি বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা যায়।
- ❀ প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে পলিব্যাগে ভরতে হবে।
- ❀ সহজ অংকুরোদগমের জন্য পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘণ্টা অথবা বীজ এক রাত্রি ভিজিয়ে অতঃপর পলিব্যাগে বপন করতে হবে।
- ❀ প্রতি ব্যাগে একটি করে বীজ বুনতে হবে। বীজের আকারের দ্বিগুন মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে।

- বীজ সরাসরি মাদায়ও বপন করা হয়। সেক্ষেত্রে সার প্রয়োগ ও মাদা তৈরির ৪-৫ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ বপন করা যেতে পারে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা:

- নার্সারিতে চারার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে। বেশি শীতে বীজ গজানোর সমস্যা হয়। এজন্য শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।
- চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে।
- পলিব্যাগের মাটি চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- লাউয়ের চারাগাছে 'রেড পামাকিন বিটল' নামে এক ধরনের লালচে পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। এটি দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত গর্তে লাগাতে হবে।

জমি নির্বাচন এবং তৈরি:

- সেচ ও নিকাশের উত্তম সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।
- জমিকে প্রথমে ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন জমিতে কোন ঢিলা এবং আগাছা না থাকে।
- লাউ গাছের শিকড়ের যাথযথ বৃদ্ধির জন্য উত্তমরূপে গর্ত (মাদা) তৈরি করতে হবে।

বেড তৈরি এবং বেড থেকে বেডের দূরত্ব:

- বেডের উচচতা হবে ১৫-২০ সেমি। বেডের প্রস্থ হবে ২.৫ মিটার এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধামতো নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে।
- এরূপ পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি ব্যাসের সেচ নালা থাকবে এবং প্রতি দুবেড অন্তর ৩০ সেমি প্রশস্ত শুধু নিকাশ নালা থাকবে।

মাদা তৈরি এবং বেডে মাদা হইতে মাদার দূরত্ব

- মাদার আকার হবে ব্যাস ৫০-৫৫ সেমি, গভীর ৫০-৫৫ সেমি এবং তলদেশ ৪৫-৫০ সেমি।
- বেডের যে দিকে ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে সেদিকে বেডের কিনারা হইতে ৬০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে।
- একটি বেডের যে কিনারা থেকে ৬০ সেমি বাদ দেয়া হবে, উহার পাশ্ববর্তী বেডের ঠিক একই কিনারা থেকে ৬০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে অনুরূপ নিয়মে মাদা করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সার	সারের পরিমান (হেক্টর প্রতি)	জমি তৈরির সময় দেয়	মাদায় প্রয়োগ				
			চারা রোপনের ৭ দিন পূর্বে	চারা রোপনের ১৫ দিন পর	চারা রোপনের ৩৫ দিন পর	চারা রোপনের ৫৫ দিন পর	চারা রোপনের ৭৫ দিন পর
গোবর	১০ টন	৫ টন	৫ টন	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৫০ কেজি	-	-	৩৭.৫ কেজি	৩৭.৫ কেজি	৩৭.৫ কেজি	৩৭.৫ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৮৭.৫ কেজি	৮৭.৫ কেজি	-	-	-	-
এমপি	১৫০ কেজি	৫০ কেজি	-	২৫ কেজি	২৫ কেজি	২৫ কেজি	২৫ কেজি
জিপসাম	১০০ কেজি	সব	-	-	-	-	-
দস্তা	১২ কেজি	সব	-	-	-	-	-
বোরাক্স	১০ কেজি	সব	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	১২ কেজি	সব	-	-	-	-	-

অর্ধেক গোবর সার, টিএসপি এমওপি এবং সবটুকু জিপসাম, দস্তা, বোরাক্স ও ম্যাগনেসিয়াম সালফেট জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট গোবর এবং টিএসপি চারা লাগানোর ৭ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করতে হবে। উপরি প্রয়োগে ইউরিয়া এবং অবশিষ্ট এমপি সার সমান ৪ কিস্তিতে গাছের গোড়ায় ১০-১৫ সেমি দূরে মাদারমাটির সঙ্গে ভালো ভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারার বয়স: বীজ গজানোর পর ১৬-১৭ দিন বয়সের চারা মাঠে লাগানোর জন্য উত্তম।

চারা রোপণ:

- মাঠে প্রস্তুত মাদাগুলোর মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে, এক কোপ দিয়ে চারা লাগানোর জন্য জায়গা করে নিতে হবে। অতঃপর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি উক্ত জায়গায় লাগিয়ে চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে।
- চারা লাগানোর পর গর্তে পানি দিতে হবে।
- পলিব্যাগ সরানোর সময় এবং চারা রোপণের সময় সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং মাটির দলা না ভাংগে। নতুবা শিকড়ের ক্ষতস্থান দিয়ে ঢলে পড়া রোগের (ফিউজারিয়াম উইল্ট) জীবাণু ঢুকবে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে গাছের বৃদ্ধি দেরিতে শুরু হবে।

পরবর্তী পরিচর্যা

- **সেচ দেওয়া:** লাউ ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। কাজেই সেচ নালা দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। লাউয়ের জমিতে কখনও সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে কিছু পানি গাছের গোড়ায় সেচে দেওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে লাউ ফসলে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে।
- **বাউনি দেওয়া:** লাউয়ের কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। লাউ মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজারমূল্য কমে যায়, ফলে পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কমে যায়। ফলে ফলনও কমে যায়।
- **মালচিং:** প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- **আগাছা দমন:** কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির ঘাস লাউতে 'বোট্ল্ গোর্ড মোজাইক ভাইরাস' নামে যে রোগ হয় তার আবাস স্থল। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। কাজেই চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- **সার উপরি প্রয়োগ:** চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যা

- গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখা (ডালপালা) গুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।
- লাউয়ের পরাগায়ন প্রধাণত মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে বেশি ফল ধরার জন্য হেক্টরপ্রতি ২-৩ টি মৌমাছির কলোনী স্থাপন করা যেতে পারে। বিকেলে হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করেও লাউয়ের ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ফসল তোলা (পরিপক্কতা সনাক্তকরণ)

ফলের ভক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা নিম্নরূপে সনাক্ত করা যায়-

- ফলের গায়ে প্রচুর শুং এর উপস্থিতি থাকবে।
- ফলের গায়ে নোখ দিয়ে চাপ দিলে খুব সহজেই নোখ ডেবে যাবে।
- পরাগায়নের ১২-১৫ দিন পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়।
- ফলের লম্বা বোঁটা রেখে ধারালো ছুরি দ্বারা ফল কাটতে হবে। ফল যত বেশি সংগ্রহ করা হবে ফলনও তত বেশি হবে।

সীতা লাউয়ের জাত

বারি সীতা লাউ-১

বারি সীতা লাউ-১

সীতা লাউ একটি বহুবর্ষজীবী লতানো উদ্ভিদ। 'বারি সীতা লাউ-১' জাতটি ২০১০ সালে অনুমোদন করা হয়। সীতা লাউ বাংলাদেশের স্বল্প পরিচিত সবজিসমূহের অন্যতম। এটির মূল কন্দাল, জাত লম্বালম্বি চার শিরা বিশিষ্ট (4-winged), পাতা উপবৃত্তাকার। ফলের ত্বক হালকা সবুজ ও মসৃণ।

চারা লাগানোর ৫-৬ মাস পর ফুল আসে। ৩০ দিন পর ফল সবজি হিসেবে খাওয়ার উপযোগী হয়। সারা বছর ফল দিতে থাকে। লতানো সবজি বিধায় মাচা বা গাছের সাহায্যে ভর করে জন্মে থাকে।

৫-৭ বছরের প্রতিটি গাছে বছরে ৩০-৪০টি ফল পাওয়া যাবে। প্রতি ফলের দৈর্ঘ্য ১২-১৪ সেমি এবং চওড়া ৮-৯ সেমি হয়। গড়ে প্রতিটি ফলের ওজন ৭৫০ গ্রাম হয়। যেহেতু গাছ ১০-১৫ বছর বেঁচে থাকে এবং ফল দেয় যার জন্য মজবুত মাচা দিতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: উর্বর দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি এবং নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত উর্বর জমি সীতা লাউ চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত। পাহাড়ের ঢালু এবং সমতল সব ধরনের মাটিতেই সীতা লাউ ভাল জন্মে। সীতা লাউ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

উৎপাদন পদ্ধতি: সীতা লাউ বীজ ও শাখা কাটিং এর মাধ্যমে উৎপাদন করা যায়। নার্সারিতে কাটিং এর মাধ্যমে চারা উৎপাদন করে নিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি: জমিতে সারি থেকে সারি ৩ মিটার এবং গাছ থেকে গাছ ৩ মিটার দূরত্ব বজায় রেখে চারা রোপণ করতে হবে।

রোপণের সময়: প্রধানত জুন-জুলাই মাস। তবে সেচের সুবিধা থাকলে বছরে যেকোন সময় রোপণ করা যায়।

সারের পরিমাণ এবং প্রয়োগ পদ্ধতি:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর	প্রতি পিটে
পচা গোবর	১০০০০ কেজি	১০ কেজি
ইউরিয়া	৫০০ কেজি	৫০০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ কেজি	৪০০ গ্রাম
এমওপি	৩০০ কেজি	৩০০ গ্রাম
বোরন	২ কেজি	০২ গ্রাম

সমুদয় গোবর, টিএসপি, অর্ধেক এমপি, বোরন এবং এক পঞ্চামাংশ ইউরিয়া পিট তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি এমওপি এবং ইউরিয়া ৪ কিস্তিতে বছরে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

বীজের হার: ১১১১টি চারা/হেক্টর।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: নিয়মিত আগাছা পরিষ্কার রাখতে হবে। গাছের গোড়ার মাটি মাঝে মধ্যে আলগা (Mulching) করে দিতে হবে। মাদায় রস কমে গেলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। গাছের বাউনির জন্য মাচা দিতে হবে। যেহেতু বহুবর্ষজীবী লতানো উদ্ভিদ তাই মাচা শক্ত ও স্থায়ী অবকাঠামো হলে ভাল হয়।

রোগবালাই: তেমন কোন রোগবালাই সমস্যা নেই।

বিশেষ যত্ন: যেহেতু এই ফসলটি ১০-১৫ বছর বেঁচে থাকে এবং ফল দিতে থাকে সুতরাং মজবুত মাচা তৈরি, প্রুনিং এবং ফলের আকৃতি ঠিক রাখতে কয়েকবার বোরন সার দিতে হবে।

জীবনকাল: ১০-১৫ বছর।

ফল সংগ্রহ ও ফলন: ফুল ফোটার ২৫-৩০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। হেক্টরপ্রতি ৩০-৩৫ টন ফলন পাওয়া যায়।

মিষ্টি কুমড়ার জাত

বারি মিষ্টি কুমড়া-১

আগাম শীতকালীন জাত। ফল উঁচু গোলাকার (High round)। ফলের শাঁস আকর্ষণীয় গাঢ় কমলা রঙের এবং মিষ্টতা বেশি (টিএসএস ১১-১২%) হয়। ফলের গড় ওজন ৪.৫-৫.০ কেজি এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৩৫ টন। জীবনকাল ১৫০-১৬০ দিন।

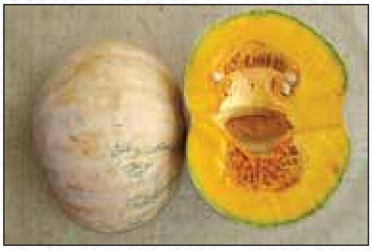

বারি মিষ্টি কুমড়া-১

বারি মিষ্টি কুমড়া-২

বারি মিষ্টি কুমড়া-২

সারা বছর চাষ উপযোগী জাত এবং কাঁচা ফল সবজি হিসেবে ব্যবহারের জন্য উত্তম। ফল চেপ্টা গোলাকৃতি (Flat round)। ফলের শাঁস গাঢ় কমলা রঙের এবং মিষ্টতা বেশি (টিএসএস ১০-১১%) হয়। ফলের গড় ওজন ২.৫-৩.০ কেজি এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-৩০ টন। জীবনকাল প্রায় ৯০-১১০ দিন।

বারি হাইব্রিড মিষ্টিকুমড়া-১

এটি একটি উচ্চফলনশীল জাত। ফল মাঝারী আকারের (গড় ওজন ২.৯ কেজি)। ফল দেখতে গোলাকার-চ্যাপ্টা। ফল কাচা অবস্থায় গাঢ় সবুজ রঙের এবং পাকা অবস্থায় গাঢ় সবুজ দাগ (Patch) যুক্ত গাঢ় বাদামী বর্ণের। এর টিএসএস বা মিষ্টতা (১০%)। গাছ প্রতি গড়ে ফলের সংখ্যা ৮ টি এবং গড় ফলন প্রায় ৩৯.৭ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া :

- মিষ্টি কুমড়ার জন্য প্রায় ১৬০-১৭০ দিনের মত উষ্ণ, প্রচুর সূর্যালোক এবং নিম্ন আর্দ্রতা উত্তম।
- চাষকালীন সময়ে অনুকূল তাপমাত্রা হলো ২০-২৫° সে.।
- চাষকালীন সময়ে উচ্চ তাপমাত্রা ও লম্বা দিন হলে পুরুষ ফুলের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং স্ত্রী ফুলরে সংখ্যা কমে যায়।
- জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটি এর চাষাবাদের জন্য উত্তম তবে চরাঞ্চলে পলি মাটিতে মিষ্টি কুমড়ার ভালো ফলন হয়।

বীজের হার: প্রতি হেক্টরে ৫-৬ কেজি (প্রতি শতাংশে ২০-২৫ গ্রাম) বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন ও চারা উৎপাদন

- শীতকালে চাষের জন্য অক্টোবর - ডিসেম্বর এবং গ্রীষ্মকালে চাষের জন্য ফেব্রুয়ারি-মে মাসে বীজ বপন করা যায়।
- চারা নার্সারিতে পলিব্যাগে উৎপাদন করে নিলে ভাল হয়।
- বীজ বপনের জন্য ৮ × ১০ সেমি বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ ব্যবহার করা যায়।
- প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে পলিব্যাগে ভরতে হবে।
- সহজ অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘণ্টা অথবা শতকরা এক ভাগ পটাশিয়াম নাইট্রেট দ্রবণে বীজ এক রাত্রি ভিজিয়ে অতঃপর পলিব্যাগে বপন করতে হবে।
- প্রতি ব্যাগে একটি করে বীজ বুনতে হবে। বীজের আকারের দ্বিগুন মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে।
- বীজ সরাসরি মাদায়ও বপন করা হয়। সেক্ষেত্রে সার প্রয়োগ ও মাদা তৈরির ৪-৫ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ বপন করা যেতে পারে।

বীজতলায় চারার পরিচর্যা

- নার্সারিতে চারার প্রয়োজনীয় পরিচর্যা নিশ্চিত করতে হবে। শীতকালে চারা উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ গজানোর পূর্ব পর্যন্ত প্রতি রাতে প্লাস্টিক দিয়ে পলিব্যাগ ঢেকে রাখতে হবে এবং দিনে খোলা রাখতে হবে।
- চারায় প্রয়োজন অনুসারে পানি দিতে হবে তবে সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার গায়ে পানি না পড়ে।
- পলিব্যাগের মাটি চটা বাঁধলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- চারাগাছে 'রেড পামাকিন বিটল' পোকার ব্যাপক আক্রমণ হয়। এটি দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।
- চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত মাদায় লাগাতে হবে।

জমি নির্বাচন এবং তৈরি

- সেচ ও নিকাশের উত্তম সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে।
- জমিকে প্রথমে ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন জমিতে কোন ঢিলা এবং আগাছা না থাকে।
- গাছের শিকড়ের যাথযথ বৃদ্ধির জন্য উত্তমরূপে গর্ত (মাদা) তৈরি করতে হবে।

বেড তৈরি

- বেডের উচচতা ১৫-২০ সেমি ও প্রস্থ ২.৫ মি এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধামতো নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে।
- পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে।

মাদা তৈরি

- মাদার ব্যাস ৫০-৫৫ সেমি, গভীরতা ৫০-৫৫ সেমি এবং তলদেশ ৪৫-৫০ সেমি প্রশস্ত হবে ।
- ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা সংলগ্ন বেডের কিনারা হইতে ৫০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে।
- প্রতি বেডে এক সারিতে চারা লাগাতে হবে। সারির অপর পার্শ্বে ২ মিটার খালি জায়গায় লতা বাইবার সুযোগ পাবে।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ প্রদ্ধতি (প্রতি শতকে ৬ টি মাদা হিসেবে)

সারের নাম	মোট সারের পরিমাণ		জমি তৈরির সময়	মাদা প্রতি				
	হেক্টরপ্রতি	শতাংশপ্রতি	শতাংশপ্রতি	চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
পচা গোবর	২০ টন	৮০কেজি	২০ কেজি	১০ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	১৭৫কেজি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	২৫ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-
দস্তা সার	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৬০ কেজি	২৪০ গ্রাম	-	৮ গ্রাম	-	-	-	-

মাদায় চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে "জো" এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারার বয়স : বীজ গজানোর পর ১৬-১৭ দিন বয়সের চারা মাঠে লাগানোর জন্য উত্তম।

চারা রোপণ:

- মাঠে প্রস্তুত মাদাগুলোর মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে, এক কোপ দিয়ে চারা লাগানোর জন্য জায়গা করে নিতে হবে। অতঃপর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি উক্ত জায়গায় লাগিয়ে চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে।
- চারা লাগানোর পর গর্তে পানি দিতে হবে।
- পলিব্যাগ সরানোর সময় এবং চারা রোপণের সময় সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং মাটির দলা না ভাংগে। নতুবা শিকড়ের ক্ষতস্থান দিয়ে ঢলে পড়া রোগের (ফিউজারিয়াম উইল্ট) জীবাণু ঢুকবে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে গাছের বৃদ্ধি দেরিতে শুরু হবে।

পরবর্তী পরিচর্যা

- সেচ দেওয়া: মিষ্টি কুমড়া ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। কাজেই সেচ নালা দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। জমিতে কখনও সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আট্‌কে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে কিছু পানি গাছের গোড়ায় সেচে দেওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে।
- মালচিং: প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- আগাছা দমন: আগাছা অনেক রোগের আবাস স্থল। এছাড়াও আগাছা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। কাজেই চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।
- সার উপরি প্রয়োগ: চারা রোপণের পর মাদা প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উল্লেখ করা আছে তা গাছের গোড়ার কাছাকাছি প্রয়োগ করতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যা

- গাছের গোড়ার দিকে ৪০-৪৫ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখা (ডালপালা) গুলো ধারালো ব্লেড দিয়ে কেটে অপসারণ করতে হবে।
- পরাগায়ন প্রধাণত মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক পরাগায়নের মাধ্যমে বেশি ফল ধরার জন্য হেক্টরপ্রতি ২-৩ টি মৌমাছির কলোনী স্থাপন করা যেতে পারে। হাত দিয়ে কৃত্রিম পরাগায়ন করেও ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ফসল তোলা (পরিপক্কতা সনাক্তকরণ)

মিষ্টি কুমড়ার কাঁচা ফলের ভক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা

কাঁচা ফল পরাগায়ণের ২০-২৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে। তখনও ফলে সবুজ রঙ থাকবে এবং ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাবে। নখ দিয়ে ফলের গায়ে চাপ দিলে নখ সহজেই ভিতরে ঢুকে যাবে।

পাকা ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুসরণ করে মিষ্টিকুমড়ার পূর্ণ পরিপক্কতা নির্ধারণ করা হয়ঃ

- ফলের রঙ হলুদ অথবা হলুদ-কমলা অথবা খড়ের রং ধারণ করবে।
- ফলের বোঁটা খড়ের রঙ ধারণ করবে।
- গাছের ডগা শুকাতে শুরু করবে।

পাকা ফল সংগ্রহকালে বিশেষ সতর্কতা

পাকা ফল সংগ্রহের দুই তিন সপ্তাহ পূর্বে সেচ দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। এতে ফলের সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি হবে।

ঝিঙ্গার জাত

বারি ঝিঙ্গা-১

বারি ঝিঙ্গা-১

আকর্ষণীয় সবুজ রঙের মাঝারী লম্বা ফল। ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ বেশ নরম হয়ে থাকে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ১২৫ গ্রাম। জাতটি ভাইরাসজনিত রোগ সহনশীল। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬-২০ টন।

খরিফ-১ ও খরিফ-২ মৌসুমে এ জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাস বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। ১৭-২০ দিনের চারা মাঠে লাগানো হয়। জীবনকাল ১২০-১৪০ দিন।

বারি ঝিঙ্গা-২

বারি ঝিঙ্গা-২

উচ্চ ফলনশীল এবং রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। আকর্ষণীয় সবুজ রঙের ফলের দৈর্ঘ্য ২৬-২৭ সেমি লম্বা। প্রতিটি গাছে গড়ে ৪৫ টি ফল ধরে। বীজবপনের ৫৫-৬০ দিন পর ফল তোলা যায়। গড় ফলন ২০-৩০ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি : দীর্ঘ সময়ব্যাপী উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া এবং প্রচুর সূর্যালোক থাকে এমন এলাকা ঝিঙ্গা চাষের জন্য উত্তম। সুনিষ্কাশিত উচ্চ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোঁআশ মাটি ঝিঙ্গার সফল চাষের জন্য উত্তম।

বীজ বপনের সময়: ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজ হার: হেক্টর প্রতি ৩-৪ কেজি বা শতাংশ প্রতি ১২-১৫ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।

জমি নির্বাচন এবং তৈরি: ঝিঙ্গা চাষে সেচ ও নিকাশের উত্তম সুবিধাযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সূর্যালোক পায় এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। গাছের শিকড় বৃদ্ধির জন্য জমি এবং গর্ত উত্তমরূপে তৈরি করতে হয়। এ জন্য জমিকে প্রথমে ভাল ভাবে চাষ ও মই দিয়ে এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন জমিতে কোন বড় ঢিলা এবং আগাছা না থাকে।

বেড তৈরি: বেডের উচ্চতা ১৫-২০ সেমি, প্রস্থ ১.২ মিটার এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধামত নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। এরূপ পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে ৬০ সেমি ব্যাসের সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে এবং ফসল পরিচর্যার সুবিধার্থে প্রতি দুবেড পর পর ৩০ সেমি প্রশস্ত নালা থাকবে।

মাদা তৈরি ও চারা রোপণ: মাদার ব্যাস ৫০ সেমি, গভীরতা ৫০ সেমি এবং তলদেশ ৫০ সেমি হবে। ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা সংলগ্ন উভয় বেডের কিনারা হইতে ৬০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতি বেডে এক সারিতে ১৬-১৭ দিন বয়সের চারা লাগাতে হবে।

চারাগুলো রোপণের আগের দিন বিকালে পানি দিয়ে ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। পরের দিন বিকালে চারা রোপণ করতে হবে। মাদাগুলোর মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে, এক কোপ দিয়ে চারা লাগানোর জন্য জায়গা করে নিতে হবে। পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর বেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি নির্দিষ্ট জায়গায় লাগিয়ে চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর গর্তে পানি দিতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি (প্রতি শতকে ১২টি মাদা হিসাবে)

সারের নাম	মোট পরিমাণ (হেক্টরে)	মোট পরিমাণ (শতাংশে)	জমি তৈরির সময় (শতাংশে)	মাদা প্রতি				
				রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	রোপণের ১০-১৫ দিন পর	রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
পচা গোবর	২০ টন	৮০ কেজি	২০ কেজি	৫ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম	১৫ গ্রাম
এমপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	২০ গ্রাম	১৫ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-
দস্তা সার	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৬০ কেজি	২৪০ গ্রাম	-	১০ গ্রাম	-	-	-	-

মাদায় চারা রোপণের পূর্বে সার দেয়ার পর পানি দিয়ে মাদার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। অতঃপর মাটিতে "জো" এলে ৭-১০ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

পরবর্তী পরিচর্যা:

- **সেচ দেওয়া:** ঝিঙ্গা গ্রীষ্মকালে চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয় বলে তখন সবসময় পানি সেচের প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিন্তু ফেব্রুয়ারির শেষ সময় থেকে মে মাস পর্যন্ত খুব শুষ্ক আবহাওয়া বিরাজ করে। তখন অনেক সময় কোন বৃষ্টিই থাকে না। উক্ত সময়ে ৫-৬ দিন অন্তর নিয়মিত পানি সেচের প্রয়োজন হয়।
- **বাউনি দেওয়া:** ঝিঙ্গার কাঙ্ক্ষিত ফলন পেতে হলে অবশ্যই মাচায় চাষ করতে হবে। ঝিঙ্গা মাটিতে চাষ করলে ফলের একদিক বিবর্ণ হয়ে বাজারমূল্য কমে যায়, ফলে পচন ধরে এবং প্রাকৃতিক পরাগায়ন কম হওয়ায় ফলন হ্রাস পায়।
- **মালচিং:** সেচের পর জমিতে চটা বাঁধে। চটা বাঁধলে গাছের শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল ব্যাহত হয়। কাজেই প্রত্যেক সেচের পর হালকা মালচ্ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- **আগাছা দমন:** চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। এছাড়াও গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। ফলে কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়া যায় না।
- **সার উপরি প্রয়োগ:** চারা রোপণের পর গাছ প্রতি সারের উপরি প্রয়োগের যে মাত্রা উলেখ করা আছে তা প্রয়োগ করতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যা: সময়মতো গাছের গোড়ায় শোষক শাখা অপসারণ করলে ফলন বৃদ্ধি পাবে।

ফল ধারণ বৃদ্ধিতে কৃত্রিম পরাগায়ণ

- ঝিঙ্গার পরাগায়ণ প্রধানত মৌমাছির দ্বারা সম্পন্ন হয়। প্রাকৃতিক পরাগায়ণের মাধ্যমে বেশি ফল ধরার জন্য হেক্টর প্রতি তিনটি মৌমাছির কলোনী স্থাপন করা প্রয়োজন।
- এছাড়াও কৃত্রিম পরাগায়ণ করে ঝিঙ্গার ফলন শতকরা ২০-২৫ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ফসল তোলা (ভক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা সনাক্তকরণ)

ভাল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারলে ২-৩ মাসব্যাপী ফল সংগ্রহ করা যায়। ফলের ভক্ষণযোগ্য পরিপক্কতা নিম্নরূপে যাচাই করা হয়-

- ঝিঙ্গার ফল পরাগায়ণের ৮-১০ দিন পর সংগ্রহের উপযোগী হয়।
- ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাবে।

লেটুসের জাত

বারি লেটুস-১

বাছাই প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবিত এটি বাংলাদেশের প্রথম লেটুসের জাত। আকর্ষণীয় সবুজ রঙের পাতা, স্থানীয় আবহাওয়ায় প্রচুর পরিমাণে বীজ উৎপাদনে সক্ষম। লেটুসের পাতায় ৯৪% পানি, ১.৪% আমিষ, ২.৯% শ্বেতসার, ০.২% স্নেহ থাকে। প্রতি ১০০ গ্রামে ৩০০-১৫০০ আন্ত একক ক্যারোটিন, ০.০৯ মিলি গ্রাম থায়ামিন, ০.১২ মিলি গ্রাম রাইবোফ্লাভিন, ০.৪ মিলি গ্রাম নায়াসিন, ১০ মিলি গ্রাম খাদ্য প্রাণ, ৫০ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ২.০ মিলি গ্রাম লোহা আছে।

বারি লেটুস-১

বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতটি চাষ করা যায়। প্রতি গাছের ফলন ৩৫০-৪০০ গ্রাম এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-২০ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

সালাদ হিসেবে ব্যবহার্য যত সবজি আছে তার মধ্যে লেটুসের স্থান উপরে। শীত প্রধান অঞ্চলে এটি দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অংশ। টাটকা অবস্থায় খাওয়া হয় বলে লেটুসের খাদ্য প্রাণ নষ্ট হয় না, পুষ্টির দিক থেকে লেটুস একটি উৎকৃষ্ট সবজি।

জলবায়ু ও মাটি: লেটুস জন্মানোর উপযোগী পারিবেশ অবস্থার সীমানা বেশ বিস্তৃত এবং জাত অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন। অধিকাংশ জাত ১৫-২৫° সে. তাপমাত্রায় ভাল জন্মে। উচ্চতর তাপমাত্রায় পাতা সংখ্যায় কম ও তিক্ত হয়। ২৫° সে. এর উপরে গাছ দ্রুত ফুল উৎপাদন করে। ইউরোপে শীতকালে কাঁচঘরে (Green house) লেটুস জন্মাতে হয়। তাপমাত্রা অধিক প্রখর হলে পাতা পুড়ে (Trip burn) যায়। লেটুসের জন্য সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী (অনুকূল অম্লতা ৫.৮-৬.৬)। বাংলাদেশে কেবল রবি মৌসুমে, বিশেষভাবে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত লেটুসের চাষ করা সম্ভব।

জীবনকাল: ৫০-৫৫ দিন।

চারা উৎপাদন ও বয়স: বীজ তলায় ৫×৫ সেমি দূরত্বে বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। লেটুসের বীজ আলোক সংবেদনশীল। এর বীজ ফটোব্লাস্টিক (Photoblastic)। মাঠে লেটুসের বীজের অঙ্কুরোদগম হার অনেক সময় কম হয়। ১০ পিপিএম GA_3 দ্রবণে বীজ ১২ ঘণ্টা ভিজিয়ে বপন করলে কাঙ্ক্ষিত অঙ্কুরোদম হার পাওয়া যায়। ২০-২২ দিনের চারা বীজ তলায় উৎপাদন করে মূল জমিতে রোপণ করতে হয়।

বীজ বপন পদ্ধতি: বীজ সরাসরি ছিটিয়ে বা চারা রোপণ করে লেটুসের চাষ করা যায়। জাতভেদে ৪০-৪৫ সেমি দূরত্বে সারি করে একটু ঘনভাবে বীজ বোনা যায়। পরবর্তী সময় দুটি গাছের মধ্যে ২৫-৩০ সেমি ব্যবধান থাকে। বৃষ্টির মৌসুম শেষ না হলে এ পদ্ধতি ঝুঁকিপূর্ণ। আগাম মৌসুমে বৃহদাকার জাত চাষ করতে হলে চারা রোপণ উত্তম।

এ পদ্ধতিতে হেক্টরপ্রতি ২০০ গ্রাম বীজ ৩×১ মিটারের ২৫ টি হাপোরে বুনতে হবে। চারার বয়স ৩০-৪০ দিন হলে চারা ৪০-৪৫×২৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে অতি সীমিত আকারে লেটুসের চাষ হয়। এদেশে ক্রিস্পহেড, বাটার হেড ও ঢিলে পাতা শ্রেণির লেটুস জন্মানো হয়।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ পদ্ধতি: লেটুসের জন্য হেক্টরপ্রতি ১০ টন গোবর, ২০০ কেজি ইউরিয়া, ৭৫ কেজি টিএসপি এবং এমওপি সুপারিশ করা হয়। স্বল্পমেয়াদি ফসল বিধায় সব সার ফসল লাগানোর পূর্বে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। তবে পরিস্থিতিভেদে ইউরিয়া এক অংশ উপরি প্রয়োগ করতে হয়। ফসলে নিয়মিত সেচ দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: লেটুসের ফসল সংগ্রহের সুনির্দিষ্ট সময় নেই, মাথা বাঁধার পর সংগ্রহ করতে হবে। ঢিলে পাতা জাত একবারে অথবা নিচের দিক থেকে ক্রমান্বয়ে পাতা সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ফলন: হেক্টরপ্রতি ২০-৩৫ টন।

বরবটির জাত

বারি বরবটি-১

এ জাতের গাছ গাঢ় সবুজ বর্ণের এবং লম্বায় ৪৫ সেমি হয়। প্রতিটি গাছে ৬০-৭০টি বরবটি ধরে এবং পাকার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নরম থাকে, খেতে সুস্বাদু। বীজ বপনের ৬০-৭০ দিন পর থেকে বরবটি সংগ্রহ করা যায়। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতটির চাষ করা যায়। ফাল্গুন-আশ্বিন মাসে এ জাতের বীজ বপন করতে হয়। জীবনকাল ২০০-২২০ দিন হয়। ফলন ১৫-২০ টন/হেক্টর। এ জাতটি পাউডারী ও ডাউনি মিলডিউ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন। অন্যান্য রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ কম হয়।

উচ্চ ফলনশীল বিধায় এর চাষাবাদ অত্যন্ত লাভজনক। এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন থাকে।

বারি বরবটি-১

করলার জাত

বারি করলা-১

ফল গাঢ় সবুজ রঙের। ফল লম্বায় ১৭-১৮ সেমি এবং ব্যাস ৪-৫ সেমি। প্রতি ফলের গড় ওজন ১০০ গ্রাম এবং গাছপ্রতি প্রায় ৩৫-৪০টি ফল ধরে। চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল তোলা যায়। ফলন গড়ে ২৪-২৭ টন/হেক্টর।

বারি করলা-২

এটি একটি উচ্চফলনশীল জাত। গাঁঢ় সবুজ রং ও মাঝারী আকারের (৯৮ গ্রাম) ফল। ফলের গায়ে প্রচুর ছোট ছোট চোখা wart এবং spine দেখা যায়। গাছ প্রতি গড় ফলের সংখ্যা ৩৮ টি এবং গড় ফলন প্রায় ২০-২২ টন/হেক্টর।

বারি করলা-৩

এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। সবুজ রং ও মাঝারী আকারের (৭৭ গ্রাম) ফল। ফলের গায়ে অল্প কিছু ছোট ছোট ভোতা wart দেখা যায়। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৪৫টি এবং গড় ফলন প্রায় ২০-২২ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: উচ্চ আর্দ্র আবহাওয়ায় করলা ভাল জন্মে। পরিবেশগত ভাবে এটি একটি কষ্ট সহিষ্ণু উদ্ভিদ। মোটামুটি শুষ্ক আবহাওয়ায় এটি জন্মানো যায়, তবে বৃষ্টিপাত-এর জন্য খুব ক্ষতিকর নয়। তবে জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে পরাগায়ণ বিঘ্নিত হতে পারে। তাই শীতের দু' এক মাস বাদ দিলে বাংলাদেশে বছরের যেকোন সময় করলা জন্মানো যায়।

উৎপাদন মৌসুম: বছরের যে কোন সময় করলার চাষ সম্ভব হলেও এদেশে প্রধানত খরিফ মৌসুমেই করলার চাষ হয়ে থাকে। ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাসের মধ্যে যে কোন সময় করলার বীজ বোনা যেতে পারে। কেউ কেউ জানুয়ারি মাসেও বীজ বুনে থাকেন কিন্তু এ সময় তাপমাত্রা কম থাকায় গাছ দ্রুত বাড়তে পারে না, ফলে আগাম ফসল উৎপাদনে তেমন সুবিধা হয় না। পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থা করতে পারলে আশাব্যাঞ্জক ফলন পাওয়া যায়।

বীজের হার: করলার জন্য হেক্টরপ্রতি ৬-৭ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি ও বপন পদ্ধতি: খরিফ মৌসুমে করলার জন্য এমন স্থান নির্বাচন করতে হবে যেখানে পানি জমার সম্ভাবনা নেই। বসতবাড়িতে করলার চাষ করতে হলে দু'চারটি মাদায় বীজ বুনে গাছ বেয়ে উঠতে পারে এমন ব্যবস্থা করতে হবে। বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য প্রথমে সম্পূর্ণ জমি ৪-৫ বার চাষ ও মই দিয়ে প্রস্তুত করে নিতে হয় যাতে শিকড় সহজেই ছাড়াতে পারে। জমি বড় হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে নালা কেটে লম্বায় কয়েক ভাগে ভাগ করে নিতে হয়। বেড়ের প্রশস্ততা হবে ১.০ মিটার এবং দু' বেডের মাঝে ৬০ সেমি নালা থাকবে। করলার বীজ সরাসরি মাদায় বোনা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতি মাদায় কমপক্ষে ২টি বীজ বপন করতে হবে অথবা পলিব্যাগে (১০-১৫ সেমি) ১৫-২০ দিন বয়সের চারা উৎপাদন করে নেওয়া যেতে পারে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ (কেজি/হে.): করলার জমিতে হেক্টর ও শতাংশ প্রতি নিম্ন বর্ণিত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সার	সারের পরিমাণ		জমিতে গর্ত তৈরির সময় দেয়		২০ দিন পর/মাদা		৪০ দিন পর/মাদা		৬০ দিন পর/মাদা	
	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে
গোবর	১০ টন	৪০ কেজি	সব	৪০ কেজি	-	-	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৭৩ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-	৫৮ কেজি	২৩৩ গ্রাম	৫৮ কেজি	২৩৩ গ্রাম	৫৭ কেজি	২৩৩ গ্রাম
টিএসপি	১৭৩ কেজি	৭০০ গ্রাম	সব	৩৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-
এমপি	১৪৮ কেজি	৬০০ গ্রাম	৭৪ কেজি	৩০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম	২৪ কেজি	১০০ গ্রাম
জিপসাম	৯৯ কেজি	৪০০ গ্রাম	সব	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-
জিঙ্ক অক্সাইড	১২ কেজি	৫০ গ্রাম	সব	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-
বোরাক্স	কেজি	৪০ গ্রাম	সব	৪০ গ্রাম	-	-	-	-		-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	১২ কেজি	৫০ গ্রাম	সব	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: চারা লাগানোর থেকে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়ায় আগাছা থাকলে তা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয় বলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় না। সেচের পর জমিতে চটা রাঁধলে গাছেল শিকড়াঞ্চলে বাতাস চলাচল ব্যহত হয়। কাজেই প্রত্যেক সেচের পর গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। খরা হলে প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে। পানির অভাবে প্রাথমিক অবস্থায় চারার বৃদ্ধি বন্ধ হয়, পরবর্তীতে ফুলও ঝরে যায়। চারা ২০-২৫ সেমি উঁচু হতেই ১.০-১.৫ মি উঁচু মাচা তৈরি করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: স্ত্রী ফুলের পরাগায়ণের ১৫-২০ দিনের মধ্যে ফল খাওয়ার উপযুক্ত হয়। ফল আহরণ একবার শুরু হলে তা দুমাস পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

চালকুমড়ার জাত

বারি চালকুমড়া-১

উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি লতানো প্রকৃতির এবং পাতা সবুজ রঙের। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল যথাক্রমে রোপণের ৪০-৪৫ দিন এবং ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে ফোটে। সবুজ রঙের ফলের আকৃতি মাঝারী লম্বাকৃতির ১৮-২০ সেমি। গাছপ্রতি ১০-১২টি ফল ধরে এবং প্রতি ফলের ওজন ১-১.২ কেজি। চারা রোপণের ৬৫-৭০ দিনের মধ্যে প্রথম ফল সংগ্রহ করা যায়। চালকুমড়া ২-৩ দিন পর পর সংগ্রহ করতে হয়। চালকুমড়া কচি অবস্থায় যত বেশি সংগ্রহ করা যায় ততো বেশি গাছে ফল ধরে। বারি চালকুমড়া-১ গ্রীষ্ম মৌসুমের জাত। এটি উচ্চ তাপ ও অতি বৃষ্টি সহিষ্ণু এবং এ জাতটি বৃষ্টি প্রবণ এলাকায় চাষ করা যায়।

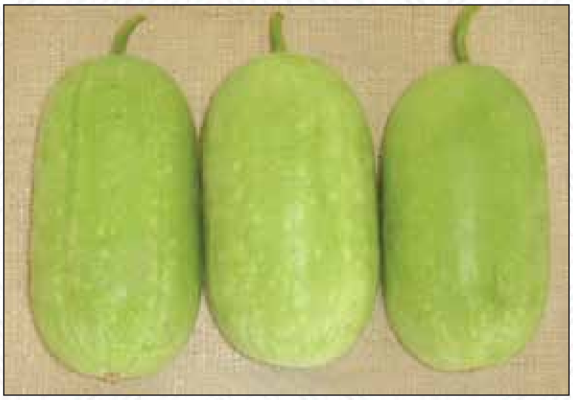

বারি চালকুমড়া-১

বাংলাদেশের সব এলকায় ফাল্গুন মাস থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এ জতটি চাষ করা যায়। ফাল্গুনের মাঝামাঝী সময়ে চারা লাগাতে হয়। জীবনকাল ১২০-১৪০ দিন। ফলন ২৫-৩০ টন/হেক্টর।

পটলের জাত

বারি পটল-১

ফলের আকার মাঝারী, সিলিন্ডারাকৃতি ও দু'প্রান্ত ভোতা। ফলের রং গাঢ় সবুজ, গায়ে ৯-১০টি হালকা সবুজ রঙের ডোরা থাকে। ফল ৯-১০ সেমি লম্বা এবং ব্যাস ৪-৪.৫ সেমি। প্রতিটি ফলের ওজন ৫০ গ্রাম। শাখা কলম লাগাবার ৯০ দিনের মধ্যে ফল সংগ্রহ করা যায়। প্রতি গাছে ৩৮০টি ফল ধরে যার ওজন প্রায় ১৪ কেজি। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৮ টন। এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল, রোগবালাই সহিষ্ণু এবং তাড়াতাড়ি ফলন দেয়।

বারি পটল-১

বারি পটল-২

বারি পটল-২

ফলের আকার বড়, সিলিন্ডারাকৃতি ও দু'প্রান্ত সুচালো। ফলের রং হালকা সবুজ, গায়ে ১০-১১টি সাদা রঙের ডোরা থাকে। ফল ১১-১২ সেমি লম্বা এবং বেড় ৩.৫-৪.০ সেমি। প্রতিটি ফলের ওজন প্রায় ৫৫ গ্রাম। জমিতে শাখা-কলম লাগাবার ৯৫ দিনের মধ্যেই পটল সংগ্রহ করা যায়। প্রতি গাছে সর্বোচ্চ ২৪০টি ফল ধরে যার ওজন প্রায় ১০ কেজি। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০ টন। এ জাতটি থেকে অনেকদিন ফসল সংগ্রহ করা যায়।

হাইব্রিড পটলের জাত

পটল বাংলাদেশের একটি প্রধান সবজি, যা গ্রীষ্মকালীন সবজি চাহিদার অনেকখানি পূরণ করে থাকে। পটলের উৎপত্তিস্থল ভারত উপমহাদেশে এবং বহুকাল থেকে এ অঞ্চলে পটলের চাষ হয়ে আসছে। বাংলাদেশে যে সব এলাকায় পটল বেশি চাষ হয় তার মধ্যে বৃহত্তর রাজশাহী, রংপুর, বগুড়া, পাবনা, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা উল্লেখযোগ্য। পটল একটি দীর্ঘ মেয়াদী ফসল, মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত উৎপাদন করা যায়। ফলে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সবজি সরবরাহে পটল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পটল ভিটামিন এ, সি এবং খনিজ পদার্থের একটি ভাল উৎস।

বারি হাইব্রিড পটল ১

বারি হাইব্রিড পটল-১

উচ্চ ফলনশীল। ফলের রঙ গাঢ় সবুজাভ, সাদা ডোরা আছে। ফলের দৈর্ঘ্য ১৩.০১ সে.মি.। প্রতিটি ফলের ওজন ৬০-৬৫ গ্রাম। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১১২.১৬।

উৎপাদন প্রযুক্তি

চারা উৎপাদন: বীজ, শাখা-কলম এবং কন্দমূল (শিকড়) সব পদ্ধতিতেই পটলের বংশ বিস্তার করা যায়। তবে বাণিজ্যিক চাষের জন্য কাণ্ডের শাখা-কলম ও কন্দমূল ব্যবহার করা ভাল এবং লাভজনক। বীজ তলায় কিংবা সরাসরি জমিতে শাখা-কলম বা কন্দমূল লাগিয়ে চারা উৎপাদন করা যায়। সাধারণত পটলচাষীগণ পুরো কন্দমূল মাদায় রোপণ করেন। কন্দমূল ২-৩টি চোখসহ কেটে মাদায় লাগালে কম কন্দমূল দিয়ে বেশি জমিতে পটল চাষ করা যায়।

রিং পদ্ধতিতে উন্নত শাখা কলম উৎপাদন: ভালো এক বৎসর বয়সী গাছের যে কোন শাখার মাঝামাঝী অংশ থেকে এক মিটার বা দু'হাত লম্বা শাখা দিয়ে রিং বা চুড়ি আকার তৈরি করে পিট বা মাদায় লাগাতে হবে। পটলের শাখা কলম ৫০ পিপিএম ইনডোল বিউটারিক এসিড IBA দ্রবণে ৫ মিনিট ডুবিয়ে রেখে মাদায় বা পিটে লাগালে তাড়াতাড়ি এবং বেশি সংখ্যক মূল গজায়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: জমিতে 'জো' এলে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। বেড পদ্ধতিতে পটল চাষ করলে ফলন ভাল হয় এবং বর্ষাকালে ক্ষেত নষ্ট হয় না। সাধারণত একা একটি বেড ১.২৫ মিটার বা আড়াই হাত চওড়া হয়। বেডের মাঝামাঝী এক মিটার বা দু'হাত পর পর মাদায় চারা রোপণ করতে হয়। এক বেড থেকে আর এক বেডের মাঝে ৭৫ সে.মি. (প্রায় দেড় হাত) নালা রাখতে হবে। সুষ্ঠু পরাগায়ণের জন্য জমিতে অবশ্যই মোট গাছের ১০ ভাগ পুরুষ গাছ জমির সব অংশে সমানভাবে ছড়ানো থাকা প্রয়োজন, অর্থাৎ প্রতি ৯টি স্ত্রী গাছের জন্য একটি পুরুষ গাছ প্রয়োজন।

মাদা বা পিট তৈরি: মাদা বা পিটের আয়তন ৫০ সে.মি. × ৫০ সেমি × ৫০ সেমি (এক হাত করে) দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীর হতে হবে। মাদার মাটি খুড়ে এক পার্শ্বে রেখে তাতে নির্ধারিত মাত্রায় জৈব ও রাসায়নিক সার ভালভাবে মিশিয়ে আবার সার মিশ্রিত মাটি দিয়ে মাদা পূরণ করতে হবে এবং ২-৩ দিন পর তাতে চারা রোপণ করতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ মাত্রা: নিচের তালিকা অনুযায়ী জৈব ও রাসায়নিক সার পটলের জমিতে প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সারের নাম	প্রতি মাদায় সারের পরিমাণ			
	চারা রোপণের সময়	রোপণের ২০ দিন পর (১ম কিস্তি)	রোপণের ৬০ দিন পর (২য় কিস্তি)	রোপণের ৯০ দিন পর (৩য় কিস্তি)
গোবর বা আবর্জনা সার	৩-৪ কেজি	-	-	-
ইউরিয়া	-	২০-২৫ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম
টিএসপি	৫০-৬০ গ্রাম	-	-	-
এমওপি	-	২০-২৫ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম	২০-২৫ গ্রাম

গোবর বা আবর্জনা সার ভালভাবে পচানো প্রয়োজন। পটল দীর্ঘ মেয়াদী সবজি ফসল, এজন্য জুন মাস থেকে ফসল সংগ্রহের পর প্রতি মাসে হেক্টরপ্রতি ১৮ কেজি ইউরিয়া, ২৫ কেজি টিএসপি এবং ১৪ কেজি এমপি সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এতে ফলন বেশি হবে।

মাচা তৈরি ও অন্যান্য পরিচর্যা: পটল একটি লতানো উদ্ভিদ। বাঁশের কাঠির সাহায্যে চারা গাছকে মাচায় তুলে দেয়া হয়। এক মিটার বা দু'হাত উচ্চতার বাঁশের মাচায় পটলের ভাল ফলন পাওয়া যায়। প্রতিবার ফসল সংগ্রহের পর মরা পাতা ও শাখা ছাঁটাই করা প্রয়োজন। এতে ফলধারী নুতন শাখার সংখ্যা বেড়ে যায় এবং ফলন বেশি হয়। সময়মতো সেচ দিয়ে অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ ও নিড়ানী দিতে হবে। যদি জমিতে স্ত্রী গাছের তুলনায় পুরুষ গাছের সংখ্যা কম থাকে তাহলে হাত দিয়ে পরাগায়ণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কৃত্রিম পরাগায়ণ সকাল ৬-৭ টার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। কারণ এ সময় পটলের ফুল পরাগায়ণের জন্য উপযোগী থাকে।

রেটুন (মুড়ি) ফসল: যে সমস্ত ফসল একবার সংগ্রহের পর একই গাছ হতে পরবর্তী বছর পরিচর্যার মাধ্যমে ফলন পাওয়া যায়, সে সমস্ত ফসলকে মুড়ি ফসল বলে। পটল গাছ একাধিক বছর বেঁচে থাকে। সুতরাং একবার লাগানোর পর ২-৩ বছর যাবৎ ফসল সংগ্রহ করা যায়। পটল গাছে প্রথম বছর ফলন কম হয়, দ্বিতীয় বছর ফলন বাড়ে, কিন্তু তৃতীয় বছর থেকে আবার ফলন কমতে থাকে। তাই তিন/চার বছর বেশি সময় ধরে ফলন নেওয়া উচিত নয়।

প্রথম বছর ফসল সংগ্রহের পর নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে মাটির উপরিভাগ বরাবর গাছ কেটে দিতে হবে। জানুয়ারির শেষ সপ্তাহে সেচ প্রয়োগের পর 'জো' অবস্থায় গাছের গোড়ায় মাটি কুপিয়ে অনুমোদিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করতে হবে রেটুন ফসলে আগাম ফলন পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন: কচি অবস্থায় সকাল অথবা বিকালে পটল সংগ্রহ করা উচিত। সাধারণত জাতভেদে ফুল ফোঁটার ১০-১৫ দিনের মধ্যে পটল সংগ্রহের উপযোগী হয়। সপ্তাহে কমপক্ষে একবার ফল সংগ্রহ করা উচিত। জাতভেদে হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-৪০ টন।

পুঁইশাকের জাত

বারি পুঁইশাক-১

চারা অবস্থায় পুরো গাছটাই সবুজ থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে কাণ্ড এবং পাতার শিরা হালকা বেগুনী বর্ণের হয়। পাতা বড়, নরম ও সবুজ বর্ণের হয়। অধিক শাখা-প্রশাখা যুক্ত, ঘন ঘন সংগ্রহোপযোগী উচ্চ ফলনশীল জাত। খরিফ মৌসুমে বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী। চৈত্র-ভাদ্র মাসে রোপণ করা যায়। বপন থেকে সংগ্রহ পর্যন্ত জীবনকাল ৫০-৯০ দিন। ফলন ৬-৭ টন/বিঘা।

এ জাতটি আংশিক ছায়া ও লবণাক্ততা প্রতিরোধী।

বারি পুঁইশাক-১

বারি পুঁইশাক-২

বারি পুঁইশাক-২

স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত এবং নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। চারা অবস্থায় পুরো গাছ সবুজ রঙের থাকে। পাতা বড়, নরম ও সবুজ বর্ণের হয়। মধ্যম শাখা-প্রশাখাযুক্ত, কাণ্ডটি (শাখা) বেশ মোটা ও মাংসল এবং ঘন ঘন পাতা সংগ্রহপযোগী উচ্চ ফলনশীল জাত। খরিফ মৌসুমে বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী। চৈত্র-ভাদ্র মাসে সরাসরি বীজ বপন ও চারা উত্তোলনের মাধ্যমে চাষ করা যায়। বপন থেকে সংগ্রহ পর্যন্ত জীবনকাল ৬০-৯০ দিন। ফলন ৫৮-৬০ টন/হেক্টর।

জাতটি আংশিক ছায়া ও লবণাক্ততা প্রতিরোধী। পাতসহ কাণ্ড কেটে ভক্ষণ ও বাজারে বিক্রি করা যায়।

ডাঁটার জাত

বারি ডাঁটা-১ (লাবণী)

বারি ডাঁটা-১

কাণ্ড খাড়া হালকা বেগুনী রঙের, নরম ও কম আঁশযুক্ত। পাতার নিচের অংশ গাঢ় বেগুনী এবং উপরের অংশ গাঢ় সবুজ রঙের। দ্রুত বর্ধনশীল জাত। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যেই খাওয়ার উপযোগী হয়। বীজ ডিম্বাকৃতি উজ্জ্বল কালো বর্ণের। খরিফ মৌসুমে বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী। চৈত্র-আষাঢ় মাসে বপন করতে হয়। জীবনকাল ৫০-৬০ দিন। ফলন ৫-৬ টন/বিঘা; ৩৫-৪০ টন/হেক্টর।

জাতটি দ্রুত বর্ধনশীল এবং খেতে সুস্বাদু। রোগবালাই প্রতিরোধী।

বারি ডাঁটা-২

বারি ডাঁটা-২

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত কৌলিসম্পদের মূল্যায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত একক গাছ থেকে উদ্ভাবিত। কাণ্ড খাড়া, নিচের দুই তৃতীয়াংশ হালকা বেগুনী এবং উপরের অংশ গাঢ় সবুজ রঙের। কাণ্ড নরম ও কম আঁশযুক্ত। পাতার উপরের অংশ হালকা রঙের। দ্রুত বর্ধনশীল জাত। বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে খাওয়ার উপযোগী হয়। বীজ ডিম্বাকৃতি উজ্জ্বল কালো বর্ণের। খরিফ মৌসুমে বাংলাদেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী। চৈত্র-আষাঢ় মাসে বপন করতে হয়। জীবনকাল শাক হিসেবে: বীজ বোনার ৪০-৪৫ দিন পর্যন্ত। ডাঁটা হিসেবে: বীজ বোনার ৬০-৭০ দিন। বীজের জন্য: বীজ বোনার ১২৫-১৪০ দিন পর্যন্ত। ফলন ৩০-৩২ টন/হেক্টর।

বীজ বপনের ২৫ দিন পর থেকেই খাওয়ার উপযোগী হয় এবং খেতে সুস্বাদু। রোগবালাই প্রতিরোধী।

সবুজ ডাঁটা শাকের জাত

বারি সবুজ ডাঁটা শাক-১

বারি সবুজ ডাঁটা শাক-১ দ্রুত বর্ধনশীল এবং গ্রীষ্মকালে চাষোপযোগী প্রথম পাতা জাতীয় ডাঁটা শাক যা নির্বাচনের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়। বারি ডাঁটা শাক-১ এর পাতার বোঁটা এবং কাণ্ড নরম ও রসালো। গাছ উচ্চতায় ১৫-২০ সেমি। প্রতি গাছে ১৮-২৫ টি পাতা থাকে। পাতা হালকা সবুজ, বোটা ও শিরা হালকা সাদাটে। ফুল হালকা সবুজ, বীজ গোলাকার ও উপরিভাগ কালো।

চাষাবাদ উপযোগিতা: সারা বছর বাংলাদেশের সর্বত্র চাষপোযোগী। তবে গ্রীষ্মকালে এর বৃদ্ধি ও ফলন বেশি হয়।

জীবনকাল: বারি সবুজ ডাঁটা শাক-১ সাধারণত ১৫-৩০ দিনের মধ্যেই উত্তোলন করা যায়। তবে বীজ উৎপাদনের জন্য ৯০-১২০ দিন সময় লাগে।

ফলন: ১৮-২০ টন/হেক্টর।

পোকামাকড় ও রোগবালাই: জাতটি উল্লেখযোগ্য রোগ ও পোকামাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বিশেষ গুণাগুণ: ভিটামিন এ, বি, সি ও ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ যা গ্রীষ্মে কোষ্ঠকাঠিন্য দূরীকরণে খুবই ফলপ্রদ।

মিষ্টি মরিচের জাত

বারি মিষ্টি মরিচ-১

বারি মিষ্টি মরিচ-১

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০১১ সাল বারি মিষ্টি মরিচ-১ জাতটি মুক্তায়িত হয় এবং অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ জাতটি অনেকটা মাঝারী ঝোপালো আকৃতির এবং উচ্চতায় ৭০-৭৫ সেমি হয়। প্রতি গাছে ৭-৯টি ফল ধরে এবং ফলের গড় ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম। বড় আকর্ষণীয় Bell shaped চকচকে সবুজ ফল, পাকলে গাঢ় লাল বর্ণ ধারণ করে। চারা লাগানোর ৬০ দিন পর ফুল আসতে শুরু করে এবং ৩০-৪০ দিন ধরে ফল সংগ্রহ করা যায়। বড় বড় সুপার সপ কিংবা মার্কেটে মিষ্টি মরিচ সাধারণত ক্যাপসিকাম নামে বিক্রয় করা হয়।

ক্যাপসিকাম বাংলাদেশে সবজি চাষের এলাকায় চাষাবাদের উপযুক্ত। মানসম্মত ক্যাপসিকাম উৎপাদনের জন্য ১৬-২৫° সে. তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশ সবচেয়ে উপযোগী। গড়ে তাপমাত্রা ১৬-২১° সে. এর কম বা বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পলিথিন ছাউনি, পলি হাউস, পলি ভিনাল হাউসে গাছ লাগালে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় এবং ফলন আশানুরূপ হয়। আশ্বিন (অক্টোবর) মাসে বীজ বপন করে কার্তিক (নভেম্বর) মাসে চারা রোপণ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। জীবনকাল ১২৫-১৩৫ দিন। ফলন ১৪-১৫ টন/হেক্টর।

বারি মিষ্টি মরিচ-২

বারি মিষ্টি মরিচ-২

সবজি বিভাগ, উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বারি থেকে AVRDC এর কয়েকটি লাইন সংগ্রহ করে। ২০১৫ সালে বারি মিষ্টি মরিচ-২ (BARI Misti Morich-2) জাতটি মুক্তায়িত হয়েছে। এটি ৮০-৯০ গ্রাম ওজনের বড় আকর্ষণীয় Bell shaped ফল। চকচকে সবুজ ফল, পাকলে হলুদ বর্ণ ধারণ করে। অন্যদিকে আমাদের দেশে আবাদকৃত জাতগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে- California Wonder, Tender Bell. (F_1) Yellow Wonder ইত্যাদি। প্রতি বৎসর এগুলোর বীজ আমদানি করতে হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: মানসম্মত ক্যাপসিকাম উৎপাদনের জন্য ১৬ - ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশ সবচেয়ে উপযোগী। রাতের তাপমাত্রা ১৬-২১° সেলসিয়াস এর কম বা বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, ফুল ঝরে পড়ে, ফলন ও মান কমে যায় কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ফলন হয় না। অক্টোবর মাসে বীজ বপন করে নভেম্বরে চারা রোপণ করলে দেখা যায় যে, নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারি পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কারণে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এজন্য গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পলিথিন ছাউনি, পলি হাউস, পলিভিনাইল হাউসে গাছ লাগালে রাতে ভিতরের তাপমাত্রা বাহির অপেক্ষা বেশি থাকে। সুনিষ্কাশিত দো-আঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি মিষ্টি মরিচ চাষের জন্য উত্তম। মিষ্টি মরিচ খরা এবং জলাবদ্ধতা কোনটিই সহ্য করতে পারেনা। মিষ্টি মরিচের জন্য মাটির অম্লক্ষারত্ব ৫.৫-৭.০ এর মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জীবনকাল : জাত ও মৌসুম ভেদে মিষ্টি মরিচের জীবনকাল ১৩০ থেকে ১৫০ দিন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

বীজ বপনের সময় : অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস।

বীজের মাত্রা : প্রায় ১৪০টি বীজ প্রতি এক গ্রাম বীজে থাকে। অঙ্কুরোদগমের হার ৯০% এবং মাঠে বাঁচার হার ৯০% বিবেচনায় প্রতি হেক্টরে বীজের পরিমাণ ২৩০ গ্রাম এবং চারার সংখ্যা ৩০,০০০ প্রয়োজন।

চারা উৎপাদন: প্রথমে বীজগুলো ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সুনিষ্কাশিত উঁচু বীজ তলায় মাটি মিহি করে ১০ × ২ সেমি দূরে দূরে বীজ বপন করে হালকাভাবে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। বীজতলায় প্রয়োজনানুসারে ঝাঝারি দিয়ে হালকা ভাবে সেচ দিতে হবে। বীজ গজাতে ৩-৪ দিন সময় লাগে। বীজ বপনের ৭-১০ দিন পর চারা ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট হলে ৯ × ১২ সেমি আকারের পলি ব্যাগে স্থানান্তর করতে হবে। পটিং মিডিয়াতে ৩:১:১ অনুপাতে যথাক্রমে মাটি, কম্পোস্ট এবং বালি মিশাতে হবে। পরে পলিব্যাগ ছায়াযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করতে হবে, যাতে প্রখর সূর্যালোকে এবং ঝড় বৃষ্টি আঘাত হানতে না পারে।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: চারার রোপণ দূরত্ব জাত ভেদে ভিন্ন হয়। সাধারণত ৩০ দিন বয়সের চারা ৪৫ × ৪৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করা হয়। মাঠে চারা লাগানোর জন্য বেড তৈরি করতে হবে। প্রতিটি বেড প্রস্থে ৭৫ সেমি হতে হবে এবং লম্বায় দুটি সারিতে ২০ টি চারা সংকোলনের জন্য ৯ মিটার বেড হবে। দুটি সারির মাঝখানে ৩০ সেমি ড্রেন করতে হবে। চারা বিকেল বেলা রোপণ করা উত্তম। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ায় পানি দিতে হবে। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা অনেক কমে যায় এ সময় গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। কাজেই গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য নাইলন নেট এবং পলিথিন ছাউনিতে গাছ লাগালে রাতে ভিতরের তাপমাত্রা বাহির অপেক্ষা বেশি থাকে এবং গাছের দৈহিক বৃদ্ধি স্বাভাবিক হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ক্যাপসিকাম চাষে হেক্টরপ্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সার	মোট পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	শেষ চাষের সময় (কেজি/হেক্টর)	পিটে বা গর্তে (কেজি/হেক্টর)	উপরি প্রয়োগ	
				চারা রোপণের ২৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০ দিন পর
গোবর/কম্পোস্ট	১০ টন	৫০০০	৫০০০	-	-
ইউরিয়া	২৫০	-	৮৪	৮৪	৮৪
টিএসপি	৩৫০	৩৫০	-	-	-
এমওপি	২৫০	-	৮৪	৮৪	৮৪
জিপসাম	১১০	১১০	-	-	-
জিঙ্ক সালফেট	৫	৫	-	-	-

জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর, টিএসপি, জিংক সালফেট, জিপসাম এবং ১/৩ ভাগ ইউরিয়া এবং এমওপি পরবর্তীতে দুই ভাগ করে চারা লাগানোর ২৫ এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হব।

সেচ প্রয়োগ: মিষ্টি মরিচ খরা ও জলাবদ্ধাতা কোনটিই সহ্য করতে পারেনা। জমিতে প্রয়োজন মত সেচ দিতে হবে। আবার অতিরিক্ত সেচ দিলে ঢলে পড়া রোগ দেখা দিতে পারে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সে জন্য সুষ্ঠু নিকাশ ব্যবস্থা করতে হবে।

খুঁটি: কোন কোন জাতে ফল ধরা অবস্থায় খুঁটি দিতে হয় যাতে গাছ ফলের ভারে হেলে না পড়ে।

আগাছা দমন: আগাছানাশক বা হাত দিয়ে অথবা নিড়ানী দিয়ে প্রয়োজনীয় আগাছা দমন করতে হবে।

ফসল তোলা: মিষ্টি মরিচের সাধারনত পরিপক্ক সবুজ অবস্থায় লালচে হলদে হওয়ার পূর্বেই মাঠ থেকে উঠানো হয়। সাধারনত সপ্তাহে একবার গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ফল সংগ্রহের পর ঠাণ্ডা অথচ ছায়া যুক্ত স্থানে বাজার জাতকরণের পূর্ব পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ফসল সংগ্রহের সময় প্রতিটি ফলে সামান্য পরিমাণে বোঁটা রেখে দিতে হবে।

ফলন: উত্তম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চাষাবাদ করলে বারি মিষ্টি মরি-২ জাতে ২৫-৩০ টন হেক্টরপ্রতি ফলন পাওয়া সম্ভব।

চিনাল

বারি চিনাল-১

বারি চিনাল-১

উচ্চ ফলনশীল জাত। ফল বড় (১৩৪০ গ্রাম), ফল দেখতে গোলাকার ও আকর্ষণীয়, সোনালী হলুদ রঙের। স্বাদ হালকা মিষ্টি (টিএসএস (৬.৬৭%) ও আঁষবিহীন। বীজ ছোট, খোসা পাতলা, খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৮৫%। গাছ প্রতি ফলের সংখ্যা ৫-৬ টি। গড় ফলন প্রায় ১৯.৪১ টন/ হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: চিনাল (হানিডিউ) গ্রীষ্ম ও অবগ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফসল। এর জন্য মাঝারী বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা বিশিষ্ট দীর্ঘ, উষ্ণ গ্রীষ্মকাল প্রয়োজন। এ গাছ তাপ সহিষ্ণু, যে কোন স্থানে সব ধরনের মাটিতেই এর চাষ করা সম্ভব তবে দাঁড়ানো পানিতে এরা বেঁচে থাকতে পারে না। বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকাসমূহে এ গাছ বেশি চোখে পড়ে। সারা বছর গাছে ফুল আসে এবং ৭০-৮০ দিন পর ফল পাকে।

উৎপাদন মৌসুম: রবি ও খরিফ দুই মৌসুমেই চাষাবাদ করা যায়।

বপনের সময়: সারা বছর চাষ উপযোগী।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
গোবর	১০ টন
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি
এমওপি	১৫০ কেজি

ফলন: ২০-২২ টন/হেক্টর।

পোকামাকড় ও রোগবালাই : জাতটিতে সাধারণ রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ কম। তবে পাতায় অ্যানথ্রাকনোজ এর কিছু আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় যা প্রোভেক্স (@ ৩ গ্রাম/কেজি বীজ) দ্বারা বীজ শোধন বা ব্যাভিস্টিন (০.২%) নামক ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে দমন করা যায়। পাকা ফলে কখনও কখনও মাছি পোকার আক্রমণ দেখা যায় যা ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে সহজেই দমন করা সম্ভব। এছাড়া বন্য সজারু ও শিয়াল কিছুটা সমস্যা সৃষ্টি করে যা জাল দিয়ে ঢেকে বা টিন পিটিয়ে রোধ করা যায়।

ব্রোকলি

ব্রোকলি সরিষা (Brassicaceae) পরিবারের একটি কপি গোত্রভুক্ত সবজি। এটি উদ্ভিদতাত্ত্বিক দিক থেকে ফুলকপির খুব কাছাকাছি ও বর্ষজীবী ফসল। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Brassica oleracea var. italica.*। পুষ্পমঞ্জুরীর বর্ণ মখমলীয় সবুজ এবং প্রাথমিক অবস্থায় বোঁটা মোটা ও মাংসল থাকে এবং এর শাখামঞ্জুরীও ভক্ষণযোগ্য যা মাসাধিক কাল ধরে সংগ্রহ করা যায়। ফসল রোপণ থেকে বীজ সংগ্রহ পর্যন্ত প্রায় ১৩৫-১৪০ দিন সময় লাগে।

বারি ব্রোকলি-১

বারি ব্রোকলি-১

উচ্চ ফলনশীল জাত। গড়ে প্রতিটি বিক্রয়োপযোগী পুষ্পমঞ্জুরীর ওজন ৪৫০ গ্রাম, ব্যাস ১২.৫০ সেমি ও লম্বায় ১৩.৯৩ সেমি । প্রতি হেক্টরে গড় ফলন প্রায় ১২ টন। গাছ উর্দ্ধমুখী, পাতা সুস্পষ্ট খাঁজ বিশিষ্ট ও মখমল সবুজ বর্ণের। চারা রোপণের ৫৩-৫৫ দিনের মাথায় পুষ্পমঞ্জুরী বের হওয়া শুরু হয় যা ১৫ দিনের মাথায় খাদ্যোপযোগী হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় মুক্ত পরাগায়ণের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন সম্ভব (প্রতি হেক্টরে প্রায় ৫৫০-৬০০ কেজি ব্রকলির পুষ্পমঞ্জুরী সংগ্রহের পর কার্তিক অংশের নীচ থেকে ৪-৫টি শাখামঞ্জুরী বের হয়। শাখামঞ্জুরী থেকে উৎপন্ন বীজ পুষ্ট এবং মানে ও গুণে উন্নতর হয়।

মাটি ও আবহাওয়া: ব্রোকলির পরিবেশিক উপযোগিতার সীমা ফুলকপির চেয়ে একটু আলাদা। ব্রোকলির গাছ ১৫ - ২৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সবচেয়ে ভালো জন্মে। সাধারণত মাঝ সেপ্টেম্বর থেকে মাঝ অক্টোবর এর বীজ বপনের সময় যা জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারির দিকে ফলন দেয়। মাঝারী থেকে উচ্চমানের বেলে দোআঁশ মাটি ব্রোকলি চাষের জন্য সর্বোত্তম। যে কোন স্থানে সব ধরনের মাটিতেই এর চাষ করা সম্ভব হলেও দাঁড়ানো পানিতে এরা বেঁচে থাকতে পারে না। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের হিল ভ্যালিতে এর সফল চাষাবাদ সম্ভব।

উৎপাদন মৌসুম: এটি শীতকালীন ফসল।

বীজের হার ও চারা উৎপাদন: চারা তৈরির জন্য ৩ × ১ মিটার আকারের বীজতলা তৈরি করতে হবে। প্রতি হেক্টর জমিতে ব্রোকলি চাষের জন্য ৩০০-৩৫০ গ্রাম বীজ প্রয়োজন। ব্রোকলি চাষের জন্য ৩০ দিন বয়সের চারা লাগাতে

হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি এবং সারিতে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪৫ সেমি হবে।

বপনের সময়: ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর) মাসে বীজ বপন করতে হয় এবং কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত (মধ্য-নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর) জমিতে চারা রোপণ করা যায়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ব্রোকলি চাষের জন্য মাঝারী উর্বর জমিতে হেক্টর প্রতি সার প্রয়োগের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি (কেজি/হেক্টর) নিম্নরূপ:

সারের নাম	মোট পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	শেষ চাষের সময়	চারা রোপণের পূর্বে	চারা রোপণের ১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩৫ দিন পর
গোবর	১৫ হাজার কেজি	অর্ধেক ৭৫০০ কেজি	অর্ধেক ৭৫০০ কেজি	-	-
ইউরিয়া	২৫০ কেজি	-	-	১২৫ কেজি	১২৫ কেজি
এমপি	২০০ কেজি	-	-	১০০ কেজি	১০০ কেজি
টিএসপি	১৫০ কেজি	-	১৫০ কেজি	-	-
পচা খৈল	প্রতি চারায় ৫০ গ্রাম	-	প্রতি পিটে দিতে হবে	-	-
বরিক এসিড	১২ কেজি	সম্পূর্ণ পরিমাণ	-	-	-
মলিবডেনাম	১ কেজি	সম্পূর্ণ পরিমাণ	-	-	-

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর, সমুদয় টিএসপি ও অর্ধেক এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর চারা রোপণের ১ সপ্তাহ পূর্বে মাদায় দিয়ে মিশিয়ে রাখতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে সেচ দিতে হয়। ইউরিয়া ও বাকি অর্ধেক এমওপি সার ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং চারা রোপণের ৩০-৫০ দিন পর বাকি সার ২ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাটির অম্লক্ষারকত্ব (pH) ৫.৫ এর নিচে হলে হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি চুন প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ফলন: ১২-১৫ টন/হেক্টর।

কামরাঙ্গা শিম

বারি কামরাঙ্গা শিম-১

কামরাঙ্গা শিম বা চারকোনা শিমের জাতটি অত্যন্ত পুষ্টিকর ও উন্নতমানের আমিষসমৃদ্ধ একটি সবজি। এর পাতা শাক হিসেবে, শিম সবজি, বীজ ডাল এবং কন্দমূল আলুর মত খাওয়া যায়। এটি উচ্চ ফলনশীল (গড়ে ২০.০ টন/হেক্টর) এবং পোকামাকড় প্রতিরোধী। এর শিম আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের, গড়ে ১৭.৮ সেমি লম্বা, ২.৬৫ সেমি চওড়া, লম্বা প্রতিটি শিমের গড় ওজন ১৫.২ গ্রাম।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: কামরাঙ্গা শিমের গাছের বৃদ্ধির জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশ ভাল। ফুল ধারণের জন্য খাট দিবস (১২ ঘণ্টার কম) এবং মধ্যম তাপমাত্রা (১৮° - ৩২° সে.) প্রয়োজন। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটিতে (পি.এইচ মান ৫.৫-৮.০) এ শিম ভাল জন্মে। মার্চ মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত বীজ বোনা যায়। তবে শ্রাবণ (মধ্য জুলাই-মধ্য আগস্ট) মাসে এক মিটার দূরে সারিতে ৩০ সেমি দূরে দূরে বীজ বপন করলে সবচেয়ে ভাল ফলন পাওয়া যায়। উদ্ভাবিত জাতটি উচ্চফলনশীল, পোকামাকড় ও রোগবালাই সহনশীল। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদের জন্য এ জাতটি উপযোগী।

উৎপাদন মৌসুম: এটি শীতকালীন ফসল।

বপনের সময়: আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে বীজ বপন করতে হয়।

বীজের হার: ৫-৬ কেজি/হেক্টর

সারের পরিমাণ:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
গোবর	৫ টন
ইউরিয়া	১০০ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি
এমওপি	১৫০ কেজি

ফলন: ২০-২১ টন/হেক্টর

পালংশাক

বারি পালংশাক-১

জাতটি উচ্চ ফলনশীল (গড়ে ৪৯ টন/হেক্টর) এ জাতটি পোকামাকড় ও লবণাক্ততা প্রতিরোধী। এর পাতা আকারে বড়, বোঁটা ছোট, পাতা আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের, পাতা নরম, খেতে সুস্বাদু এবং শাকটির পুষ্টি গুণাগুণও অত্যন্ত উচ্চমানের। পাতা ও কাণ্ডে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং ক্যারোটিন রয়েছে। বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর থেকে সংগ্রহ করা যায়। ফুল দেরিতে আসে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: পালংশাক একটি কষ্ট সহিষ্ণু উদ্ভিদ। গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য ১৫-২৫° সে. তাপমাত্রা সবচেয়ে উপযোগী। এ উদ্ভিদ দ্বি-বর্ষজীবী, শীতের আবেশ না পেলে ফুল ধারণ করে না। তবে উচ্চ তাপমাত্রায় জন্মানো শাক স্বাদে ভাল হয় না। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ মাটিতে পালং শাক ভালো জন্মে । খরিফের শেষ ভাগ থেকে পুরো রবি মৌসুমব্যাপী জন্মানো যায়। আগাম হিসেবে আগস্ট মাস থেকে বোনা যেতে পারে। তবে অক্টোবর থেকে জানুয়ারি মাসের মধ্যে বপন করলেও ভাল হয়।

উৎপাদন মৌসুম: এটি শীতকালীন ফসল।

বপনের সময়: অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বীজ বপন করতে হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি (হেক্টর ও শতাংশপ্রতি)

সার	মোট সারের পরিমাণ		জমি তৈরির সময় + গর্তে প্রয়োগ		চারা রোপণের ১০ দিন পর		চারা রোপণের ৩০ দিন পর		চারা রোপণের ৪৫ দিন পর	
	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে	হেক্টরে	শতাংশে
গোবর	১০ টন	৪০ কেজি	৫+৫ টন	২০+২০ কেজি	-	-	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৮০ কেজি	৭০০ গ্রাম	৭৫ কেজি	২৫০ গ্রাম	৩৬ কেজি	১৫০ গ্রাম	৩৬ কেজি	১৫০ গ্রাম	৩৬ কেজি	১৫০ গ্রাম
টিএসপি	১২৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	১২৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	-	-	-	-	-	-
এমওপি	১২৫ কেজি	৫০০ গ্রাম	৫০ কেজি	২০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম	২৫ কেজি	১০০ গ্রাম

ফলন: ৪৫-৫০ টন/হেক্টর

স্কোয়াশের জাত

বারি স্কোয়াশ-১

বারি স্কোয়াশ-১

এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। পরাগায়ণের পর থেকে মাত্র ১৫-১৬ দিনেই ফল সংগ্রহ করা যায়। নলাকার গাঢ় সবুজ বর্ণের ফল। গড় ফলের ওজন ১.০৫ কেজি। প্রতি হেক্টরে গড় ফলন ৪৫ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: স্কোয়াশের জন্য উষ্ণ, প্রচুর সূর্যালোক এবং নিম্ন আর্দ্রতা উত্তম। চাষকালীন সময়ে অনূকুল তাপমাত্রা হলো ২০-২৫° সে। চাষকালীন সময়ে উচ্চ তাপমাত্রা ও লম্বা দিন হলে পুরুষ ফুলের সংখ্যা বেড়ে যায় এবং স্ত্রী ফুলের সংখ্যা কমে যায়। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ বা এঁটেল দোআঁশ মাটি এর চাষাবাদের জন্য উত্তম তবে চরাঞ্চলে পলিমাটিতে স্কোয়াশের ভালো ফলন হয়।

বীজেরহার: প্রতি হেক্টরে ২-৪ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন ও চারা উৎপাদন: শীতকালে চাষের জন্য অক্টোবর - ডিসেম্বর মাসে বীজ বপন করা যায়। চারা নার্সারিতে পলিব্যাগে উৎপাদন করে নিলে ভাল হয়। বীজ বপনের জন্য ৮ × ১০ সেমি বা তার থেকে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগ

ব্যবহার করা যায়। প্রথমে অর্ধেক মাটি ও অর্ধেক গোবর মিশিয়ে মাটি তৈরি করে পলিব্যাগে ভরতে হবে। সহজ অঙ্কুরোদ্‌গমের জন্য পরিষ্কার পানিতে ১৫-২০ ঘণ্টা ভিজিয়ে অতঃপর পলিব্যাগে বপন করতে হবে। প্রতিব্যাগে দুইটি করে বীজ বপন করতে হবে। বীজের আকারের দ্বিগুণ মাটির গভীরে বীজ পুঁতে দিতে হবে। বীজ সরাসরি মাদায়ও বপন করা হয়। সেক্ষেত্রে সার প্রয়োগ ও মাদা তৈরির ৪-৫ দিন পর প্রতি মাদায় ২-৩টি করে বীজ বপন করা যেতে পারে। চারা গজানোর ১০-১২ দিন পর ১টি সুস্থ ও সবল চারা রেখে বাকিগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে। চারার বয়স ১৬-১৭ দিন হলে তা মাঠে প্রস্তুত মাদায় লাগাতে হবে।

বেড তৈরি: বেডের উচচতা ১৫-২০ সেমি ও প্রস্থ ১-১.২৫ মি এবং লম্বা জমির দৈর্ঘ্য অনুসারে সুবিধামতো নিতে হবে। এভাবে পরপর বেড তৈরি করতে হবে। পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝ খানে ৭০ সেমি প্রশস্থ সেচ ও নিকাশ নালা থাকবে।

মাদা তৈরি: মাদার ব্যাস ৫০-৫৫ সেমি, গভীরতা ৫০-৫৫ সেমি এবং তলদেশ ৪৫-৫০ সেমি প্রশস্ত হবে । ৬০ সেমি প্রশস্ত সেচ ও নিকাশ নালা সংলগ্ন বেডের কিনারা হইতে ৫০ সেমি বাদ দিয়ে মাদার কেন্দ্র ধরে ২ মিটার অন্তর অন্তর এক সারিতে মাদা তৈরি করতে হবে। প্রতি বেডে এক সারিতে চারা লাগাতে হবে।

সারের মাত্রা ও প্রয়োগ প্রদ্ধতি

সারের নাম	মোট সারের পরিমাণ		জমি তৈরির সময়	মাদা প্রতি				
	হেক্টরপ্রতি	শতাংশ প্রতি	শতাংশ প্রতি	চারা রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে	চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর	চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর	চারা রোপণের ৫০-৫৫ দিন পর	চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর
পচা গোবর	২০ টন	৮০ কেজি	২০ কেজি	১০ কেজি	-	-	-	-
টিএসপি	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	৩৫০ গ্রাম	৬০ গ্রাম	-	-	-	-
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৭০০ গ্রাম	-	-	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম	৩০ গ্রাম
এমওপি	১৫০ কেজি	৬০০ গ্রাম	২০০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	২৫ গ্রাম	-	-	-
জিপসাম	১০০ কেজি	৪০০ গ্রাম	৪০০ গ্রাম	-	-	-	-	-
দস্তা সার	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	৫০ গ্রাম	-	-	-	-	-
বোরাক্স	১০ কেজি	৪০ গ্রাম	৪০ গ্রাম	-	-	-	-	-
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	১২.৫ কেজি	৫০ গ্রাম	-	৮ গ্রাম	-	-	-	-

চারার বয়স: বীজ গজানোর পর ১৬-১৭ দিন বয়সের চারা মাঠে লাগানোর জন্য উত্তম।

চারা রোপণ: মাঠে প্রস্তুত মাদাগুলোর মাটি ভালোভাবে ওলট-পালট করে, কোদালের এক কোপ দিয়ে চারা লাগানোর জন্য জায়গা করে নিতে হবে। অতঃপর পলিব্যাগের ভাঁজ বরাবর ব্লেড দিয়ে কেটে পলিব্যাগ সরিয়ে মাটির দলাসহ চারাটি উক্ত জায়গায় লাগিয়ে চারপাশে মাটি দিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর গর্তে পানি দিতে হবে। পলিব্যাগ সরানোর সময় এবং চারা রোপণের সময় সাবধান থাকতে হবে যাতে চারার শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং মাটির দলা না ভাঙ্গে। নতুবা শিকড়ের ক্ষতস্থান দিয়ে ঢলে পড়া রোগের (ফিউজেরিয়াম উইল্ট) জীবাণু ঢুকবে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত হলে গাছের বৃদ্ধি দেরিতে শুরু হবে।

পরবর্তী পরিচর্যা

সেচ দেওয়া : স্কোয়াশ ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। কাজেই সেচ নালা দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। জমিতে কখনও সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আট্‌কে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে কিছু পানি গাছের গোড়ায় সেচে দেওয়া যায়। শুষ্ক মৌসুমে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে।

মালচিং : প্রত্যেক সেচের পর হালকা খড়ের মালচ করে গাছের গোড়ার মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। আগাছা অনেক রোগের আবাস স্থল। এছাড়াও আগাছা খাদ্যোপাদান ও রস শোষণ করে নেয়। কাজেই চারা লাগানো থেকে শুরু করে ফল সংগ্রহ পর্যন্ত জমি সবস ময়ই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

বিশেষ পরিচর্যা: সাধারণত স্কোয়াশ উৎপাদনের জন্য ১৬-২৫° সে. তাপমাত্রা ও শুষ্ক পরিবেশ সবচেয়ে উপযোগী। রাতের তাপমাত্রা ১৭-২১° সে. এর কম বা বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত হয়, ফুল ঝরে পড়ে ও ফলন কমে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই ফলন হয়না। অক্টোবর মাসে বীজ বপন করে নভেম্বরে লাগালে দেখা যায় যে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ হতে জানুয়ারি পর্যন্ত রাতের তাপমাত্রা অনেক কমে যায়, ফলে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। এজন্য গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য পলিথিন ছাউনি বা গ্লাস হাউসে গাছ লাগালে রাতে ভিতরের তাপমাত্রা বাহির অপেক্ষা বেশি থাকে।

ফসল তোলা (পরিপক্কতা সনাক্তকরণ): ফল পরাগায়ণের ১০-১৫ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করতে হবে। তখনও ফলে সবুজ রঙ থাকবে এবং ফল মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাবে। নখ দিয়ে ফলের গায়ে চাপ দিলে নোখ সহজেই ভিতরে ঢুকে যাবে।

ফল ফসল

ফল আমাদের দেশে একটি জনপ্রিয় উদ্যানতাত্ত্বিক ফসল। রং, গন্ধ, স্বাদ ও পুষ্টির বিবেচনায় বাংলাদেশের ফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও বৈচিত্র্যময়। ফল বিভিন্ন প্রকার ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের সর্বোত্তম উৎস। ফল রান্না ছাড়া সরাসরি খাওয়া হয় বিধায় এতে বিদ্যমান সবটুকু পুষ্টি গ্রহণ করা যায়। এ ছাড়া বিভিন্ন ফলে রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধকারী উপাদান এন্থোসায়ানিন ও লাইকোপেন। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ফলের অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের মোট চাষভুক্ত জমির মধ্যে ফলের আওতায় প্রায় ১% জমি রয়েছে। অথচ জাতীয় অর্থনীতিতে মোট ফসলভিত্তিক আয়ের ৭.৫% আসে ফল থেকে।

বাংলাদেশ একটি আর্দ্র ও অব-উষ্ণ মণ্ডলীয় দেশ। এখানে আম, কাঁঠাল, কলা, পেঁপে, সফেদা, জাম, লটকন, আনারস, লিচু, লেবু জাতীয় ফল, পেয়ারা, নারিকেল, আমড়া, তেঁতুল, বেল, আতা, শরীফা ইত্যাদি ফল ভাল জন্মে।

পর্যাপ্ত পরিমাণে ফল উৎপাদিত না হওয়ায় এর চাহিদা ও দাম বেশি থাকে। অন্যান্য শস্যের চেয়ে ফলের দাম সাধারণত বেশি হয় বলে ফল চাষীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। যদি সংরক্ষণ ব্যবস্থা উন্নত করা যায় তবে উৎপাদন মৌসুমের পরে সংরক্ষিত ফল অধিক দামে বিক্রি করা সম্ভব। অথবা উদ্বৃত্ত ফল ও ফলজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা সম্ভব। তাই অধিক চাহিদার কারণে দেশে অধিক ফল উৎপাদনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। আশার কথা, সম্প্রতি স্বল্প পরিসরে আম রপ্তানি শুরু হয়েছে।

- আম
- কাঁঠাল
- কলা
- পেঁপে
- আনারস
- পেয়ারা
- কুল
- লিচু
- নারিকেল
- কমলা
- লেবু
- কাগজীলেবু
- মিষ্টি লেবু
- বাতাবিলেবু
- সাতকরা
- আমড়া
- জামরুল
- সফেদা
- কামরাঙ্গা
- তৈকর
- লটকন
- আমলকি
- আঁশফল
- রাম্বুতান
- স্ট্রবেরি
- বিলাতিগাব
- কদবেল
- বেল
- জলপাই
- ড্রাগন ফল
- মাল্টা
- নাশপাতি
- প্যাশন ফল
- তেঁতুল

আম

আম বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও উপাদেয় ফল। আমকে ফলের রাজা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এটি বাংলাদেশের জাতীয় বৃক্ষ। বাংলাদেশে প্রায় সব জেলাতেই আমের চাষ হয়। জলবায়ু ও মাটির অধিক উপযোগিতার কারণে উৎকৃষ্ট মানের আম উৎপাদন প্রধানত বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের জেলাগুলোতে সীমাবদ্ধ ছিল। এ সব অঞ্চলে অনেক পরিবারের আয়ের প্রধান উৎস আম। তবে বর্তমানে চাষোপযোগী উন্নত জাত উদ্ভাবিত হওয়ায় এসব অঞ্চলের বাইরে অন্যান্য জেলাতেও বাণিজ্যিকভাবে আম উৎপাদন শুরু হয়েছে।

ফলসহ আমের গাছ

বর্তমানে বাংলাদেশে আমের মোট উৎপাদন প্রায় ১২.৮৮ লক্ষ মে. টন। স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টিমান ও ব্যবহার বৈচিত্রে আম তুলনাহীন। পাকা আমে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যারোটিন বা ভিটামিন ‘এ’ এবং খনিজ পদার্থ থাকে। ভিটামিন ‘এ’-এর দিক থেকে আমের স্থান পৃথিবীর প্রায় সকল ফলের উপরে।

আমের জাত

বারি আম-১ (মহানন্দা)

বারি আম-১ (মহানন্দা)

বারি আম-১ প্রতি বছর ফল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি জাত। আমের এই আগাম জাতটি বাংলাদেশে চাষ করার জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের আকৃতি মাঝারী। পাতার আকৃতি লম্বাটে।

পুষ্পমঞ্জরীর আকৃতি পিরামিডের মতো। ফল প্রায় গোলাকার। ফলের গড় আকার দৈর্ঘ্য ৭.৬ সেমি, প্রস্থ ৬.৭ সেমি, পুরুত্ব ৫.৯ সেমি। পাকা ফলের রং আকর্ষণীয় হলদে। ফলের ওজন ১৯০-২১০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে, সুগন্ধযুক্ত, মধ্যম রসালো, আঁশহীন ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯%) এবং শাঁস ফলের ৭০%। ফলের খোসা পাতলা ও মসৃণ। প্রতি বছর নিয়মিত ফল দেয়। মাঘ মাসে (মধ্য জানুয়ারি-মধ্য ফেব্রুয়ারি) গাছে ফুল আসে। ফল আহরণের সময় জ্যৈষ্ঠ মাসের ২য় সপ্তাহ (মে মাসের শেষ সপ্তাহ)। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৭০০-৮০০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫ টন। বাংলাদেশে সর্বত্রই মহানন্দা চাষ করা যায়। তবে ফলের বোঁটা শক্ত ও ঝড়ো হাওয়া সহনশীল বিধায় দেশের পূর্বাঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। মহানন্দা রপ্তানিযোগ্য জাত বলে এর বাগান করে বেশি লাভবান হওয়া যায়।

বারি আম-২

বারি আম-২

বারি আম-২ প্রতি বছর ফল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন রঙিন উচ্চ ফলনশীল জাত। দেশের ভিতর থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জাতটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের আম দেখতে খুবই আকর্ষণীয়, ত্বকের রং গাঢ় হলদে। এ জাতের আম কেটে ফালি করে খাওয়া যায়। বারি আম-২ জাতটি মাঝ-মৌসুমী। ফুল আসার সময় ফাল্গুনের ১ম সপ্তাহ (মধ্য-ফেব্রুয়ারি)। ফল আহরণের সময় আষাঢ়ের ১ম সপ্তাহ (জুনের ৩য় সপ্তাহ)।

ফলের আকৃতি উপবৃত্তাকার। ফলের গড় আকার দৈর্ঘ্য ৯.৭৫ সেমি, প্রস্থ ৭.২৫ সেমি এবং পুরুত্ব ৬.১০ সেমি। ফলের ওজন ২৪০-২৬০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে, মধ্যম রসালো, আঁশহীন ও কম মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৭.৫০%) এবং শাঁস ফলের ৬৯%। ফলের খোসা মধ্যম পুরুত্ব ও মসৃণ। হেক্টরপ্রতি ফলন ২২ টন। জাতটি বাংলাদেশে সর্বত্রই চাষের উপযোগী। এটি একটি রপ্তানিযোগ্য জাত।

বারি আম-৩

বারি আম-৩

দেশের আম জগতে বারি আম-৩ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবর্তন। বিদেশ থেকে সংগৃহীত জাতটি বাংলাদেশের জলবায়ুতে উপযোগিতা যাচাইয়ের পর চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়।

গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও খাড়া। পাতার আকৃতি ডিম্বাকার বর্ষাকৃতি, পুষ্পমঞ্জরীর আকৃতি পিরামিডের মতো। ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতির হয়। ফলের গড় আকৃতি দৈর্ঘ্য ৮.৩ সেমি, প্রস্থ ৬.০ সেমি এবং পুরুত্ব ৫.৮ সেমি। পাকলে হলুদাভ সবুজ রঙ ধারণ করে। ফলের ওজন ২১০-২২০ গ্রাম। ফলের শাঁস গাঢ় কমলা রঙের হয়। ফল পাকলে সুস্বাদু, সুগন্ধযুক্ত বেশ মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৩.৪০%) হয়। আঁশহীন, মধ্যম রসালো, শাঁস ফলের ৭১%। ফলের খোসা মধ্যম পুরুত্ব ও মসৃণ।

প্রতি বছর ফলদানকারী নাবী জাত। ফুল আসে ফাল্গুনের দ্বিতীয় সপ্তাহে (ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ), ফল আহরণের সময় আষাঢ়ের ৩য় সপ্তাহ (জুলাইয়ের ১ম সপ্তাহ)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষের উপযোগী।

বারি আম-৪ (হাইব্রিড আম)

বারি আম-৪

দীর্ঘদিন চেষ্টা করে সংকরায়ণের মাধ্যমে বারি আম-৪ নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে। জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য ২০০৩ সালে অনুমোদন লাভ করে।

এটি নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল, মিষ্টি স্বাদের নাবি জাত। ফজলী আম শেষ হওয়ার পর এবং আশ্বিনা আমের সাথে অর্থাৎ মধ্য শ্রাবণ থেকে শ্রাবণের শেষে (জুলাই শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্ট ১ম সপ্তাহ) এ জাতের আম পাকে। বারি আম-৪ এর ফল আকারে বেশ বড় (৬০০ গ্রাম), প্রায় গোলাকৃতি, শাঁস হলদে, খেতে খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৪.৫%)। এ জাতের আম কাঁচা অবস্থাতেও খেতে মিষ্টি। আমের শাঁস দৃঢ় হওয়ায় পাকার পরও বেশ কয়েকদিন ঘরে সংরক্ষণ করা সম্ভব। ফলের শাঁস গাঢ় হলদে বর্ণের, আঁশহীন ও রসালো। আঁটি ছোট ও খোসা পাতলা, শাঁস ফলের ৮০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে চাষের উপযোগী।

বারি আম-৫

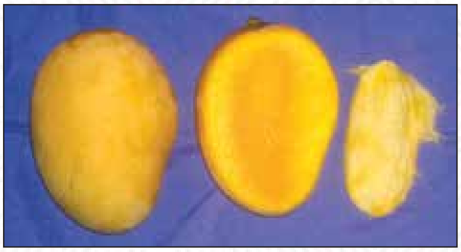

দেশের ভিতর থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জাতটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য ২০১০ সালে বারি আম-৫ নামে অনুমোদন করা হয়। এটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত। আমের আহরণ মৌসুম দীর্ঘায়িত করতে জাতটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

গাছ বড় ও খাড়া। ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে (মে মাসের ৩য় সপ্তাহ) ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল মাঝারী (২৩০ গ্রাম), ডিম্বাকার, উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের ও খেতে মিষ্টি (১৯% ব্রিক্সমান), খাদ্যোপযোগী অংশ ৭০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-২০ টন। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি আম-৬

বারি আম-৬

বারি আম-৬ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনটিস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি মধ্য-মৌসুমী জাত। প্রদর্শনীর মাধ্যমে সংগ্রহ করে নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ২০১০ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এটি নিয়মিত ফলধারী একটি সুস্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ মধ্যম আকৃতির ও মধ্যম খাড়া।

ফাল্গুন মাসে গাছে মুকুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষের দিকে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতির, মধ্যম আকারের, গড় ওজন-২৮০ গ্রাম, লম্বায় ৯.৯ সেমি ও প্রস্থে ৯.৫ সেমি, পুরুত্বে ১১.৩ সেমি, পাকা ফলের রং হলুদাভ সবুজ, চামড়া পাতলা ও শাঁসের রং হলুদ, স্বাদে মিষ্টি (টিএসএস ২১%), শাঁস আঁশবিহীন, আঁটির ওজন ৪০ গ্রাম, খোসার ওজন ৪২ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭২% এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৬ টন।

বারি আম-৭

বারি আম-৭

বারি আম-৭ বিএআরআই উদ্ভাবিত একটি রঙিন মাঝ মৌসুমী জাত। স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন করে ২০১০ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এটি সুস্বাদু, উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফলধারী জাত। অত্যন্ত আকর্ষণীয় রং ও ভালো গুণাবলীর জন্য এ জাতের আম বিদেশে রপ্তানির সুযোগ রয়েছে।

গাছ মধ্যম আকৃতির, মধ্যম ছড়ানো। ফল গোলাকার, আকারে মধ্যম, গড় ওজন ২৯০ গ্রাম, লম্বায় ৯.৫ সেমি ও প্রস্থে ৮.১ সেমি, পুরুত্বে ৬.২ সেমি। পাকা ফলের রং লাল আভাযুক্ত হলুদ ও শাঁসের রং হলুদ। স্বাদ হালকা মিষ্টি (টিএসএস ১৮%), শাঁস হালকা আঁশবিহীন, আঁটির ওজন ৩৩ গ্রাম, খোসার ওজন ৩২ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৭% এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা খুব ভাল (৯-১১ দিন)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি আম-৮

বারি আম-৮

বারি আম-৮ বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি বহুভ্রূণী (পলিএম্ব্রায়োনিক) নাবি জাত। পাহাড়ী এলাকা হতে সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ২০১০ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। এটি সুস্বাদু ও উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলধারী জাত।

গাছ তুলনামূলকভাবে খাটো ও ছড়ানো। প্রতিবছর ফল দেয়, ফল লম্বাটে ডিম্বাকৃতির, আকারে মধ্যম, গড় ওজন ২৭০ গ্রাম, লম্বায় ১১.৩ সেমি ও প্রস্থে ৭.০ সেমি, পুরুত্বে ৬.০ সেমি, পাকা ফলের রং হলুদ, চামড়া পাতলা ও শাঁস কমলা বর্ণের, স্বাদ মিষ্টি (টিএসএস ২২%), শাঁস আঁশবিহীন, আঁটির ওজন ২৬ গ্রাম, খোসার ওজন ৫০ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭০% এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা অন্যান্য জাতের তুলনায় ৫-৭ দিন বেশি, জাতটি পলিএম্ব্রায়োনিক হওয়ায় বীজ থেকে মাতৃ গুণাগুণ সম্পন্ন চারা উৎপাদন করা যায়। দেশের সব এলাকায় এমনকি ঝড় প্রবণ উপকূলীয় অঞ্চলেও চাষোপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি আম-৯ (কাঁচা মিঠা)

বারি আম-৯ (কাঁচা মিঠা)

প্রতি বছর ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল আগাম জাত। নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে ২০১১ সালে জাতটি অবমুক্ত করা হয়। গাছ বড় ও মধ্যম খাড়া। মাঘ মাসে গাছে মুকুল আসে এবং বৈশাখ মাসের শেষভাগে কাঁচা অবস্থায় খাওয়ার জন্য ফল আহরণ উপযোগী হয়।

উপবৃত্তাকার এ ফলের গড় ওজন ১৬৬ গ্রাম, কাঁচা ফলের শাঁস সাদা, আঁশহীন, মধ্যম মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১১%), খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৮%। সাত বছর বয়স্ক গাছে হেক্টরপ্রতি ফলন ১.৩৫ টন। রাজশাহী অঞ্চলের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

বারি আম-১০

উচ্চ ফলনমীল, মাঝ মৌসুমী জাত। প্রতি বছর নিয়মিত ফল ধরে। ১০-১২ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে ২৯০টি ফল ধরে যার ওজন ৭২.৫ কেজি। ফল আঁশবিহীন এবং খুব মিষ্টি (টিএসএস ১৬%)। ফল মাঝারি আকৃতির এবং গড় ওজন ২৫০ গ্রাম। ফল ওভাল আকৃতির এবং পাকা ফল হালকা সবুজ হয়ে থাকে। ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হল জুনের ২য় সপ্তাহ। ফলের শাঁস গাঢ় হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ শতকরা ৬৪ ভাগ। এ জাতের আমে উল্লেখযোগ্য কোন রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

বারি আম-১০

বারি আম-১১

বাংলাদেশের প্রথম অনুমোদিত বারমাসী আমের জাত, যা বছরে তিনবার ফল প্রদান করে। ফাল্গুন, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র মাসে গাছে মুকুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন ও মাঘ মাসের ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল আয়তাকার ও লম্বাটে। ফলের গড় ওজন ৩২০ গ্রাম। ফলের শাঁস কমলা, আঁশবিহীন, রসালো ও সুস্বাদু। টিএসএস ১৮.৫৫%।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দোআঁশ মাটি আম চাষের জন্য উত্তম। উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরি: চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি: সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তাকার এবং পাহাড়ি ভূমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে চাষ করা যায়। এক বছর বয়স্ক সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত কলমের চারা রোপণ করতে হবে।

চারা রোপণের সময়: জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (মধ্য-মে থেকে মধ্য-জুলাই) এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর)।

চারা রোপণের দূরত্ব: ৮ মিটার।

গর্ত তৈরি: গর্তের আকার ১ মি. × ১ মি. × ১ মি.।

সারের পরিমাণ:

সারের নাম	প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ
জৈব সার	২০-৩০ কেজি
টিএসপি	৪৫০-৫৫০ গ্রাম
এমওপি	২০০-৩০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০-২৩০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪০-৬০ গ্রাম

চারা রোপণ: গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর চারার গোড়ায় মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ: চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বয়স ভিত্তিতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০-এর উর্দ্ধে
গোবর (কেজি)	২৬	৩৫	৪৪	৫২	৭০	৮৭
ইউরিয়া (গ্রাম)	৪৩৭	৮৭৫	১৩১২	১৭৫০	২৬২৫	৩৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	৪৩৭	৪৩৭	৮৭৫	৮৭৫	১৩১২	১৭৫০
এমওপি(গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৭	৭০০	৮৭৫	১৪০০
জিপসাম (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৭	৬১২	৭০০	৮৭৫
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১৭	১৭	২৬	২৬	৩৫	৪৪
বরিক এসিড (গ্রাম)	৩৫	৩৫	৫২	৫২	৭০	৮৭

প্রয়োগ পদ্ধতি: বয়স ভেদে নির্ধারিত সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বরিক এসিড এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি সার সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন ফল মটর দানার মতো হয় তখন এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার ফল সংগ্রহের ১ মাস পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, গাছের চারিদিকে গোড়া থেকে কমপক্ষে ১ থেকে ১.৫ মি. দূরে হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বেশি হলে এই দূরত্ব বাড়তে পারে। সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে। এছাড়াও ইউরিয়া ২% (প্রতি ১ লিটার পানিতে ২০ গ্রাম) দ্রবণ ফলের মটরদানা আকৃতি অবস্থায় একবার এবং মার্বেল আকৃতি অবস্থায় আর একবার প্রয়োগে অধিক এবং গুণগতমানসম্পন্ন ফলন পাওয়া যায়।

সেচ প্রয়োগ: চারা গাছের দ্রুত বৃদ্ধির জন্য ঘন ঘন সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় মুকুল বের হওয়ার ৩ মাস আগে থেকে সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে। আমের মুকুল ফোটার শেষ পর্যায়ে ১ বার এবং ফল মটর দানার আকৃতি ধারণ পর্যায়ে আবার ১ বার বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: গাছের প্রধান কাণ্ডটি যাতে সোজাভাবে ১ থেকে ১.৫ মিটার ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখে গাছের গোড়ার অপ্রয়োজনীয় শাখা কেটে ফেলতে হবে। প্রতি বছর বর্ষার শেষে মরা, রোগাক্রান্ত ও দুর্বল ডালপালা কেটে দিতে হয়।

গাছের মুকুল ভাঙ্গন: কলম গাছের বয়স ৩ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ: গাছে কিছু সংখ্যক আমের বোঁটার নিচের ত্বক যখন সামান্য হলুদাভ রং ধারণ করে অথবা আধাপাকা আম গাছ থেকে পড়া আরম্ভ করে তখন আম সংগ্রহ করার উপযুক্ত সময়। গাছ ঝাকী দিয়ে আম না পেড়ে ছোট গাছের ক্ষেত্রে হাত দিয়ে এবং বড় গাছের ক্ষেত্রে জালিযুক্ত বাঁশের সাহায্যে আম সংগ্রহ করা ভালো।

অন্যান্য পরিচর্যা

আমের হপার পোকা ও এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমন

শোষক পোকা (হপার) এবং এ্যানথ্রাকনোজ রোগ আমের প্রধান শত্রু। বিভিন্ন পর্যায়ে এরা আমের ক্ষতি করে থাকে। তবে মুকুল অবস্থায় ক্ষতির মাত্রা সবচেয়ে বেশি। সঠিক দমন ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে শতভাগ ফসল বিনষ্ট হতে পারে। মুকুল আসার সময় শোষক পোকা (হপার) এবং এ্যানথ্রাকনোজ রোগের আক্রমণে ফুল ঝরে যায়।

প্রতিকার: পরাগায়ণ নিশ্চিত করতে হবে। আমের মুকুল এসেছে কিন্তু ফুল ফোঁটার পূর্বেই অর্থাৎ পুষ্পমঞ্জরী ছড়ার দৈর্ঘ্য ৫-১০ সেমি হয় তখন প্রতি লিটার পানিতে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুশ/ফেনম/বাসাথ্রিন) ১০ ইসি ১ মিলি এবং টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে একবার এবং তার একমাস পর আম মটর দানার আকৃতি হলে আরেকবার গাছের পাতা, মুকুল ও ডালপালা ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

এ্যানথ্রাকনোজ রোগাক্রান্ত আম

আমের ভোমরা পোকা দমন

আমের ভোমরা পোকার কীড়া আমের গায়ে ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে শাঁস খায়। সাধারণত কচি আমে ছিদ্র করে এর ভিতরে ঢুকে এবং ফল বড় হওয়ার সাথে সাথে ছিদ্রটি বন্ধ হয়ে যায়। এজন্য বাইরে থেকে আমটি ভাল মনে হলেও ভিতরে কীড়া পাওয়া যায়। একবার কোন গাছে এ পোকার আক্রমণ হলে প্রতি বছরই সে গাছটি আক্রান্ত হয়ে থাকে। ক্রমে ক্রমে পার্শ্ববর্তী গাছসমূহে তা ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত কলমের আম গাছে এ পোকার আক্রমণ কম হয়।

প্রতিকার

- মুকুল আসার পূর্বে পৌষ-মাঘ মাসে সম্পূর্ণ বাগান বা প্রতিটি আম গাছের চারদিকে ৪ মিটারের মধ্যে সকল আগাছা পরিষ্কার করে ভালভাবে মাটি কুপিয়ে উল্টে দিলে মাটিতে থাকা উইভিলগুলো ধ্বংস হয়।
- আম সংগ্রহের পর গাছের সমস্ত পরগাছা ও পরজীবী উদ্ভিদ ধ্বংস করতে হবে।
- ফলের মার্বেল অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড/সিমবুস/ফেনম/ বাসাথ্রিন) ১০ ইসি মিশিয়ে গাছের কাণ্ড, ডাল ও পাতা ভালভাবে ভিজিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

অন্যান্য প্রযুক্তি

অনুন্নত আম গাছকে উন্নত জাতে রূপান্তর

টপ ওয়ার্কিং এর মাধ্যমে অনুন্নত আম গাছকে সহজেই উন্নত জাতে রূপান্তরিত করা যায়। এ জন্য ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে অনুন্নত আম গাছের সমস্ত প্রশাখা কেটে দিতে হবে। জুন-জুলাই মাসে কর্তিত প্রশাখা থেকে উৎপন্ন ডালসমূহে ভিনিয়ার/ক্লেফট পদ্ধতিতে উন্নত জাতের কলম করতে হবে। কলমের নিচ থেকে কুশি বের হলে সেগুলো নিয়মিত অপসারণ করতে হবে। এভাবে ২-৩ বছরের মধ্যে অনুন্নত আম গাছটি উন্নত জাতে রূপান্তরিত হবে।

শোধনকৃত আম *অশোধনকৃত আম*

গরম পানিতে আম শোধন

গাছ থেকে আম সংগ্রহের পর পরই আম ৫২-৫৫° সে. তাপমাত্রায় গরম পানিতে ৫-৭ মিনিট ডুবিয়ে শোধনের মাধ্যমে বোঁটা পচা ও এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমন করে আমের সংরক্ষণকাল অতিরিক্ত এক সপ্তাহ বাড়ানো যায় এবং সংগ্রহোত্তর অপচয় রোধ করা সম্ভব। গরম পানিতে আম শোধনের একটি যন্ত্রও (হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট) উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ যন্ত্রের সাহায্যে পানির তাপমাত্রা ও শোধনের সময় ঠিক রেখে প্রতি ঘণ্টায় ১ টন আম শোধন করা যায়। উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় প্রতি কেজি আমের শোধন খরচ ৪০-৫০ পয়সা।

নিরাপদ, বিষমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি

গুণগত মানসম্পন্ন, নিরাপদ ও বিষমুক্ত ফল উৎপাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ দীর্ঘদিন যাবৎ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। এরই ধারাবাহিকতায় অত্র কেন্দ্র হতে উদ্ভাবন হলো ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তিটি। এই প্রযুক্তিটি বাংলাদেশে একটি নতুন ও সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি হিসেবে মাঠপর্যায়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে। যে সময়ে আমরা চিন্তিত ও আতংকিত ছিলাম ফল বাগানে বালাইনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার নিয়ে এ সময়েই আমবিজ্ঞানিরা উদ্ভাবন করলেন নতুন এই প্রযুক্তির, যা শুধু সাশ্রয়ীই নয় পরিবেশ বান্ধবও বটে। প্রকৃতপক্ষে মাঠ পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে আম উৎপাদন করতে গিয়ে চাষীদের বিভিন্ন সমস্যায় পড়তে হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রোগ, পোকামাকড় ও প্রাকৃতিক কারণে সৃষ্ট সমস্যা। ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজেই সকল সমস্যাগুলোকে সমাধাণ করে ভালোমানের আম উৎপাদন করা যায়। ফ্রুট ব্যাগিং বলতে ফল গাছে থাকা অবস্থায় বিশেষ ধরনের কাগজের তৈরি ব্যাগ দ্বারা ফলকে আবৃত করাকে বুঝায় এবং এর পর থেকে ফল সংগ্রহ করা পযন্ত গাছেই লাগানো থাকবে ব্যাগটি। এই ব্যাগ বিভিন্ন ফলের জন্য বিভিন্ন রং এবং আকারের হয়ে থাকে। তবে আমের জন্য দুই ধরণের ব্যাগ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রঙিন আমের জন্য সাদা রঙের ব্যাগ এবং অন্য সকল আমের জন্য দুই আস্তরের বাদামী ব্যাগ। বর্তমানে আমচাষীরা দুই স্তরের বাদামি ব্যাগ বাণিজ্যিকভাবে আম উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করছেন এবং লাভবান হচ্ছেন। তবে আগাম জাতসমূহে এক স্তরের সাদা রঙের ব্যাগ ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যাগিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত ফলসমূহ নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও রপ্তানি উপযোগী।

ব্যাগিং করার উপযুক্ত সময়: আমের প্রাকৃতিকভাবে ঝরা বন্ধ হলেই ব্যাগিং শুরু করতে হবে। বারি আম-১, গোপালভোগ, খিরসাপাত, ল্যাংড়া, বারি আম-২, বারি আম-৬ এবং বারি আম-৭ জাতের ক্ষেত্রে ব্যাগিং করা হয় ৪০-৫৫ দিন বয়সে। এই সময়ে আম জাতভেদে মার্বেল আকারের বা এর চেয়ে বড় হয়ে থাকে। তবে বারি আম-৩, ৪, ৮, ফজলি, হাড়িভাঙ্গা, আশ্বিনা এবং গৌড়মতি আমের ক্ষেত্রে গুটির বয়স ৬৫ দিন হলেও ব্যাগিং করা যাবে। ব্যাগিং করার পূর্বে অবশ্যই কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক নির্দেশিত মাত্রায় ভালভাবে মিশিয়ে শুধুমাত্র ফলে স্প্রে করতে হবে। ফল ভেজা অবস্থায় ব্যাগিং করা ঠিক নয়। আমের ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিনটি স্প্রে দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন প্রথমবার আম গাছে মুকুল আসার আনুমানিক ১৫-২০ দিন পূর্বে, দ্বিতীয়বার মুকুল আসার পর অর্থাৎ আমের মুকুল যখন ১০-১৫ সেমি লম্বা হবে কিন্তু ফুল ফুটবেনা এবং আম যখন মটর দানারমতো হবে তখন তৃতীয়বার। সুতরাং এর পরপরই আমে স্প্রে করে ব্যাগিং করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ব্যাগিং করার পূর্বেই মরা মুকুল বা পুষ্পমুঞ্জুরীর অংশবিশেষ, পত্র, উপপত্র অথবা এমন কিছু যা ফলের ক্ষতি করতে পারে সেগুলো ছিড়ে ফেলতে হবে।

যে সকল এলাকায় আম বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হয় না বা শুধুমাত্র পারিবারিক চাহিদা পূরণে আম গাছ লাগানো হয়েছে এবং এই সমস্ত গাছে সময়মত স্প্রে করা হয় না বা সেই ধরনের প্রচলন এখনও এলাকায় চালু হয়নি ফলে প্রতি বছরই তাদের গাছে আম ধরে কিন্তু পোকা ও রোগের কারণে অধিকাংশ আম নষ্ট হয়ে যায়। এসব আমগাছে এই প্রযুক্তিটি সবচেয়ে

কার্যকর। এছাড়াও যে সকল এলাকায় বৃষ্টিপাত বেশি হয় এবং আম দেরিতে পাকে সে সকল আমের জাতগুলো বিবর্ণ বা কারো রং ধারণ করতে দেখা যায় এবং মাছি পোকার আক্রমণ দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় নাবীজাত আশ্বিনাতে ১০০ ভাগ আমের মাছি পোকার আক্রমণে নষ্ট হয়ে যায়। যে সমস্ত বাগানে ঘন করে আম লাগানো হয়েছে এবং বর্তমানে গাছের ভিতরে সূর্যের আলো পৌছায়না সে সকল গাছে আমের মাছি পোকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে মাছি পোকা দমনের জন্য যত ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বা প্রচলিত আছে কোনটিতেই এই মাছি পোকাকে শতভাগ দমন করা সম্ভব নয় বরং আক্রমণের হার কিছুটা কমিয়ে রাখা যায়। ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তির মাধ্যমে শতভাগ রোগ ও পোকামাকড় দমন করা যায়। আম রপ্তানির জন্য ভাল মানসম্পন্ন, রঙিন ও রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ মুক্ত আম প্রয়োজন। কিন্তু প্রচলিত পদ্ধতিতে এই তিন বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় ঘটানো সম্ভব নয়। বিভিন্ন আম রপ্তানিকার দেশে বহুল পরিচিত ও ব্যবহৃত পদ্ধতি হচ্ছে ফ্রুট ব্যাগিং প্রযুক্তি। এই প্রযুক্তি দ্বারা সবচেয়ে কম পরিমাণে বালাইনাশক ব্যবহার করে ১০০% রোগ ও পোকামাকড় মুক্ত আম উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়াও ব্যাগিং করা আম সংগ্রহের পর ১০-১৪ দিন পর্যন্ত ঘরে রেখে খাওয়া যায়। সেই সাথে রঙিন, ভাল মানসম্পন্ন নিরাপদ আমও পাওয়া যায়। ব্যাগিং প্রযুক্তি হতে ভাল ফলাফল পাওয়ার জন্য কয়েকটি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই নজর দিতে হবে;

নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাগিং করতে হবে। ব্যাগিং করার পূর্বে আমগুলিকে কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক একত্রে মিশিয়ে শুধুমাত্র ফলে স্প্রে করতে হবে। ব্যাগিং করার কমপক্ষে ২-৩ ঘণ্টা পূর্বে স্প্রে করতে হবে । তবে স্প্রে করার পরের দিনও ব্যাগিং করা যাবে যদি বৃষ্টিপাত না হয়। ফল ভেজা অবস্থায় ব্যাগিং করা উচিৎ নয়। সঠিক নিয়মকানুন ও পদ্ধতি অনুসরণ করে যে সকল চাষী ব্যাগিং করছেন তারা বেশ ভালো অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হচ্ছেন। নিরাপদ, বিষমুক্ত, স্বাস্থ্যসম্মত ও রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনের জন্য ফ্লুট ব্যাগিং প্রযুক্তিটি একটি সহজ, সাশ্রয়ী ও লাভজনক প্রযুক্তি হিসেবে মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছে।

কাঁঠাল

কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। আকারের দিক থেকে কাঁঠাল সবচেয়ে বড় ফল। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কাঁঠালের চাষ হয় তবে ঢাকার উঁচু অঞ্চল, সাভার, ভালুকা, ভাওয়াল ও মধুপুর গড়, বৃহত্তর সিলেট জেলার পাহাড়ি এলাকা, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি এলাকায় সর্বাধিক পরিমাণে কাঁঠাল উৎপন্ন হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কাঁঠালের মোট উৎপাদন ১০.৫ লক্ষ মে. টন। কাঁঠালে প্রচুর শর্করা, আমিষ ও ভিটামিন 'এ' রয়েছে। দামের তুলনায় এত বেশি পুষ্টি উপাদান আর কোন ফলে পাওয়া যায় না। কাঁচা ফল তরকারি, পাকলে ফল হিসেবে এবং বীজ ময়দা ও তরকারি হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বীজ ভেজেও খাওয়া যায়।

কাঁঠালসহ গাছ

কাঁঠালের জাত

বাংলাদেশে যে কাঁঠাল উৎপন্ন হয় শাঁসের বুনট (Flesh texture) অনুযায়ী সেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যেমন- খাজা, আদরসা বা দুরসা ও গালা।

বারি কাঁঠাল-১

বারি কাঁঠাল-১ জাতটি স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে বাংলাদেশে চাষের জন্য ২০০৮ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি একটি আগাম জাত। ফল মধ্য-মে মাসে পরিপক্কতা লাভ করে। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১০০-১২৫টি। এটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছপ্রতি ফলন ১১৮০ কেজি (১১৮ টন/হেক্টর)। মধ্যম আকারের প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৯.৫ কেজি। ফল ডিম্বাকার ও খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫%। ফলের কোষ হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত ও অত্যন্ত রসালো, নরম এবং দুরসা প্রকৃতির ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২২%)। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী।

বারি কাঁঠাল-১

বারি কাঁঠাল-২

বারি কাঁঠাল-২

বারি কাঁঠাল-২ জাতটি স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে বাংলাদেশে চাষের জন্য ২০১১ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল অমৌসুমী জাত। গাছ খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম ঝোপালো। জানুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছপ্রতি ৫৪-৭৯টি ফল ধরে যার ওজন ৩৮০-৫৭৯ কেজি। ফল মাঝারী (৬.৯৫ কেজি) ও দেখতে আকর্ষণীয়। ফলের কোষ হালকা হলুদ বর্ণের, সুগন্ধযুক্ত ও মধ্যম রসালো এবং খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২১%) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৬০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৮-৫৮ টন। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।

বারি কাঁঠাল-৩

বারি কাঁঠাল-৩

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের মধ্য থেকে বাছাই করে মূল্যায়েনের মাধ্যমে বারোমাসি কাঁঠালের জাত বারি কাঁঠাল-৩ উদ্ভাবন করা হয় এবং বাংলাদেশে চাষের জন্য ২০১৪ সালে জাত হিসাবে অনুমোদন করা হয়। বারি কাঁঠাল-৩ নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল বারোমাসি জাত। সেপ্টেম্বর থেকে জুন মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছ খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম ঝোপালো ও ছড়ানো স্বভাবের। গাছ প্রতি ২১৯-২৪৫ টি ফল ধরে যার যার ওজন ১১৮৯-১৩৩২ কেজি। ফল মাঝারী আকারের (৫.৪৩ কেজি) এবং আকর্ষণীয় লালচে সবুজ রঙের। ফলের শাঁস মাঝারী নরম, হালকা হলুদ, মধ্যম রসালো, খুব মিষ্টি (টিএসএস ২৩.৬ %) এবং সুগন্ধযুক্ত। বেটা কেরোটিন সমৃদ্ধ (৩৫.০৬ মিগ্রা/গ্রাম) এবং খাদ্যোপযোগী অংশ ৫২.৫%। সারা বাংলাদেশে সব এলাকায় চাষ করা যায়, তবে পাহাড়ী এলাকায় চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী ।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি ও মাটি: কাঁঠাল গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু ও মাঝারী উঁচু সুনিষ্কাশিত উর্বর জমি কাঁঠালের জন্য উপযোগী। দোআঁশ, বেলে দোআঁশ, এঁটেল ও কাকুরে মাটিতেও এর চাষ করা যায়। অম্লীয় মাটিতে কাঁঠাল গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়।

বংশ বিস্তার: সাধারণত কাঁঠালের বীজ থেকেই চারা তৈরি করা হয়। যদিও এতে গাছের মাতৃ বৈশিষ্ট্য হুবহু বজায় থাকে না তথাপি ফলনে বিশেষ তারতম্য দেখা যায় না। ভাল পাকা কাঁঠাল থেকে পুষ্ট বড় বীজ বের করে ছাই মাখিয়ে ২/৩ দিন ছায়ায় শুকিয়ে বীজতলায় বপন করলে ২০-২৫ দিনে চারা গজাবে। দশ থেকে বার মাসের চারা সতর্কতার সাথে তুলে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে। এছাড়া অঙ্গজ অংশ বিস্তার পদ্ধতি, যেমন- ফাটল কলম (Cleft grafting), চারা কলম (Epicotyle grafting) এবং টিস্যু কালচার পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

চারা রোপণের সময়: চারা বা কলম রোপণের সময় মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য শ্রাবণ (জুন-আগস্ট) মাস।

চারা রোপণের দূরত্ব : গাছ ও সারির দূরত্ব হবে ৮ × ৮ মিটার। হেক্টরপ্রতি গাছের সংখ্যা ১০০টি। চারা কলম রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে ১ × ১ × ১ মিটার গর্ত তৈরি করে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করে গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে।

গর্তে সারের পরিমাণ:

সারের নাম	গর্তপ্রতি সারের পরিমাণ
গোবর/কম্পোস্ট	২০-৩০ কেজি
টিএসপি	৪০০-৫০০ গ্রাম
এমওপি	২৪০-২৬০ গ্রাম

চারা রোপণ ও পরিচর্যা: গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে লাগিয়ে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে এবং খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। প্রয়োজনমতো পানি সেচ ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: ছোট অবস্থায় চারা/কলম লাগানোর পর অপ্রয়োজনীয় ছোট ছোট শাখা প্রশাখা কেটে দিলে কাণ্ড তৈরিতে সহায়ক হয়। বড় গাছের মরা ডাল, ছোট ছোট শাখা প্রশাখা এবং পূর্ববর্তী বছরের ফলের বোঁটার অবশিষ্ট অংশ প্রুনিং করে দিলে ফলন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। বড় ডাল কাটা গাছের জন্য ক্ষতিকর।

কাঁঠাল গাছে সার প্রয়োগ: চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বয়স ভিত্তিতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

কাঁঠাল গাছের বয়স ভিত্তিক সারের পরিমাণ

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১-৩ বছর	২০	৪০০	৪০০	৩৫০	৮০
৪-৬ বছর	২৫	৬০০	৫৫০	৪৫০	১০০
৭-১০ বছর	৩০	৮০০	৭০০	৫৫০	১৩০
১১-১৫ বছর	৪০	১০০০	৯০০	৬৫০	১৬০
১৫ বছরের উর্দ্ধে	৪০-৫০	১২০০	১৬০০	১২৫০	৩০০

প্রয়োগ পদ্ধতি: চারা রোপণের পর থেকে তিন বছর পর্যন্ত গোবর, টিএসপি, জিপসাম, দস্তা সারকে বছরে একবার ব্যবহার করে এবং মোট ইউরিয়া এবং এমওপি সারকে ছয় ভাগে ভাগ করে দুই মাস পর পর প্রয়োগ করলে গাছের দ্রুত বৃদ্ধি হয়ে থাকে। ফলন্ত গাছে তিনবার সার প্রয়োগ করা উচিৎ। প্রথম কিস্তিতে গোবর, টিএসপি, জিপসাম, দস্তা ইত্যাদি সার পূর্ণ মাত্রায় এবং ৫০% ইউরিয়া ও এমওপি সার সেপ্টেম্বর/অক্টোবর মাসে; দ্বিতীয় কিস্তিতে ২৫% ইউরিয়া ও এমওপি সার ফলধারণের পর মার্চ মাসে এবং তৃতীয় কিস্তিতে ২৫% ইউরিয়া ও এমওপি ফল ধারণের ৬০ দিন পর মে মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম পুরুষ ও স্ত্রী পুষ্প মঞ্জরী দেখা দেয়ার সময় ০.২% হারে বোরন স্প্রে করলে সুষম আকারের মান সম্পন্ন ফল পাওয়া যায়।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: ডিসেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত শুকনো মৌসুমে ১৫ দিন অন্তর রূপান্তরিত বেসিন পদ্ধতিতে পানি সেচ দিলে কচি ফল ঝরা কমে, ফলন ও ফলের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। কাঁঠাল গাছ জলাবদ্ধতার প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। স্বল্প সময়ের জলাবদ্ধতায় গাছ মারা যায়। এজন্য বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি দ্রুত নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা আবশ্যক।

ফল ব্যাগিং: গাছে ফল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর নিচের দিকে খোলা পলিথিনের ব্যাগ দ্বারা ঢেকে দিলে ফল ছিদ্রকারী পোকা ও নরম পচা রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং ফলের রং ও আকার আকর্ষণীয় হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

নরম পচা রোগ:

রাইজোপাস আর্টোকারপস নামক ছত্রাকের আক্রমণে কাঁঠালের মুচি বা ফল পচা রোগ হয়ে থাকে। এ রোগের আক্রমণে কচি ফলের গায়ে বাদামী রঙের দাগের সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত আক্রান্ত ফল গাছ হতে ঝরে পড়ে। গাছের পরিত্যক্ত অংশে এ রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে এবং বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে।

নরম পচা রোগাক্রান্ত কাঁঠাল

প্রতিকার

- গাছের নিচে ঝরে পড়া পুরুষ ও স্ত্রী পুষ্প মঞ্জুরী সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- মুচি ধরার আগে ও পরে ১০ দিন পর পর ২/৩ বার ব্যাভিস্টিন/ইন্ডোফিল এম-৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে অথবা ফলিকুর নামক ছত্রাকনাশক ০.০৫% হারে বা ইন্ডোফিল এম-৪৫/রিডোমিল এম জেড-৭৫ প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছে ফুল আসার পর হতে ১৫ দিন অন্তর অন্তর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

গামোসিস

গামোসিস রোগে আক্রান্ত গাছ

এ রোগের প্রভাবে গাছের বাকলে ফাটল ধরে ও ফাটলের স্থান থেকে অবিরত রস ঝরে। কাঠ বেরিয়ে আসে, ক্ষতস্থানে গর্ত হতে থাকে ও পচন ধরে। চারা গাছ সংবেদনশীল বিধায় ধীরে ধীরে মারা যায়।

প্রতিকার

- ক্ষতস্থান বাটাল বা ধারালো ছুরি দিয়ে চেছে (স্ক্রপিং) উক্তস্থানে বর্দোপেস্ট/আলকাতরা লেপন করতে হবে। প্রথমবার দেয়ার পর পরবর্তী দুমাসে আরো দুবার লেপন করা প্রয়োজন।

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা দ্বারা আক্রান্ত কাণ্ড

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা

কাণ্ড ছিদ্রকারী পোকা কাঁঠালের অন্যতম প্রধান শত্রু। এ পোকার কীড়া কাণ্ড ছিদ্র করে গাছের অভ্যন্তরে ঢুকে এবং কাণ্ডের কেন্দ্র বরাবর খেতে খেতে উপরের দিকে উঠতে থাকে। সময়মতো দমন করা না গেলে আক্রান্ত ডাল বা সম্পূর্ণ গাছ মারা যায়।

প্রতিকার

- ছিদ্রের ভিতর চিকন রড ঢুকিয়ে পোকার কীড়া মেরে ফেলতে হবে।
- চিকন রড দিয়ে ছিদ্র পরিষ্কার করে এর অভ্যন্তরে কেরোসিন, পেট্রোল বা উদ্বায়ী কীটনাশক সিরিঞ্জের মাধ্যমে ঢুকিয়ে কাদা বা মোম দিয়ে ছিদ্রপথ বন্ধ করে দিলে অভ্যন্তরে ধুয়া সৃষ্টি হয় এবং পোকা মারা যায়।

ফল ছিদ্রকারী পোকা

এ পোকা কাঁঠালের আর একটি অত্যন্ত ক্ষতিকর পোকা। এ পোকার কীড়া বাড়ন্ত ফলের গা ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং শাঁস খেতে থাকে। আক্রান্ত ফল বেঁকে বা ফেটে যায় এবং বৃষ্টির পানি ঢুকে ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়।

প্রতিকার

ফল ছিদ্রকারী পোকা দ্বারা আক্রান্ত কাঁঠাল

কাঁঠালে বোরনের অভাব জনিত লক্ষণ

- আক্রান্ত পুষ্প মঞ্জরী ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- বাগান সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- বাড়ন্ত ফল নিচের দিকে খোলা পলিথিনের ব্যাগ দ্বারা ঢেকে দিতে হবে।
- ফুল আসার সময় সুমিথিয়ন বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়।

কলা

উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের বিভিন্ন ফলের মধ্যে কলা একটি উৎকৃষ্ট ফল। কলা বাংলাদেশের প্রধান ফল যা সারা বছর পাওয়া যায় এবং সকলেই খাওয়ার সুযোগ পায়। বগুড়া, যশোর, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি এলাকায় ব্যাপকভাবে কলার চাষ হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৪৯ হাজার হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় এবং বার্ষিক মোট উৎপাদন ৮.০৭ লক্ষ মে. টন। কলার হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫.৬০ টন। কলা ক্যালরি, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ ও সুগন্ধী এবং পুষ্টিকর ফল। ফলন অন্যান্য ফল ও ফসল অপেক্ষা অনেক বেশি।

কলা বাগান

ধান, গম ও মিষ্টি আলুর চাষ করে প্রতি হেক্টরে যেখানে ১১.২, ৬.৬ ও ৩৯.৮ লক্ষ কিলো ক্যালরি খাদ্য-শক্তি উৎপন্ন হয় সেখানে কলা থেকে প্রায় ৫০.০ লক্ষ কিলো ক্যালরি পাওয়া যায়। কলার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য যে সারা বছরই উৎপন্ন হয়।

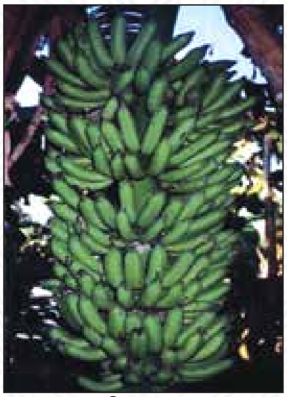

বারি কলা-১

বারি কলা-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০০০ সালে 'বারি কলা-১' নামে একটি উচ্চ ফলনশীল পাকা কলার জাত উদ্ভাবন করেছে।

এ জাতের গাছ খাটো। কাঁদিপ্রতি গড় ফলন ২৫ কেজি। কাঁদিতে ৮-১১টি ফানা থাকে। উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাতের কাঁদিতে ১৫০-২০০টি কলা পাওয়া যায়। পাকা কলা উজ্জ্বল হলুদ রঙের ও খেতে মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৪%)। ফলের গড় ওজন ১২৫ গ্রাম। গ্রীষ্মকালে উচ্চ তাপমাত্রায় পাকা কলা বেশি দিন ঘরে রাখা যায় না। আবার শীতকালে এর সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি। রোপণের ১১-১২ মাসের মধ্যে কলা সংগ্রহের উপযুক্ত হয়।

জাতটি বানচি টপ ভাইরাস ও সিগাটোকা রোগের প্রতি সংবেদনশীল। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০-৬০ টন। দেশের সব এলাকায় চাষোপযোগী।

বারি কলা-২

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পানামা ও সিগাটোকা রোগ প্রতিরোধী এবং উচ্চ ফলনশীল কাঁচকলার এ জাতটি ২০০০ সালে 'বারি কলা-২' নামে উদ্ভাবন করেছে। এটি বিদেশ থেকে সংগৃহীত একটি সংকর জাত (FHIA-03)।

গাছ বেশ মোটা, শক্ত এবং মাঝারী আকারের। এ জাতের গাছে সাকারের সংখ্যা কম (২-৩টি)। রোপণের পর ১১-১২ মাসের মধ্যে ফল আহরণের উপযুক্ত হয়। কলার কাঁদির ওজন ১৫-২০ কেজি। কাঁদিতে কলার সংখ্যা ১০০-১৫০টি। কলা আকারে মাঝারী এবং গাঢ় সবুজ রঙের।

ফল সহজে সিদ্ধ হয় এবং খেতে সুস্বাদু। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫-৪০ টন। দেশের সব এলাকায় চাষোপযোগী।

বারি কলা-২

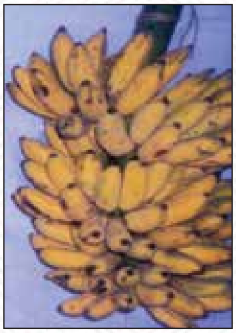

বারি কলা-৩

বারি কলা-৩

বাংলা কলার উচ্চ ফলনশীল জাতটি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ২০০৫ সালে অনুমোদন দেয়া হয়। প্রতি কাঁদিতে ১৪০-১৫০টি কলা হয় যার ওজন ২৩-২৫ কেজি। ফল মধ্যম আকারের (১০০ গ্রাম)। হেক্টরপ্রতি ফলন ৪৫-৫০ টন। পাকা ফল হলুদ রঙের, সম্পূর্ণ বীজহীন, শাঁস আঠালো, মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২৫.৫%) এবং খেতে সুস্বাদু।

ফল পাকার পরও ৫ দিন পর্যন্ত ঘরে রেখে খাওয়া যায়। জাতটি রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। দেশের সর্বত্র চাষোপযোগী।

বারি কলা-৪

পার্বত্য এলাকা থেকে নির্বাচিত চাপা কলার একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। জাতটি সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ২০০৬ সালে মুক্তায়ন করা হয়। প্রতি কাঁদিতে ফলের সংখ্যা প্রায় ১৭৮টি যার ওজন প্রায় ১৯ কেজি। ফল মাঝারী আকারের গড় ওজন ৯৫-১০০ গ্রাম।

পাকা ফল হলদে রঙের সম্পূর্ণ বীজ বিহীন এবং টক মিষ্টি (বিক্সমান ২০%) স্বাদের। হেক্টরপ্রতি ফলন ৪০-৪৫ টন। রোগ ও পোকামাকড় সহনশীল। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি কলা-৪

বারি কলা-৫

উচ্চফলনশীল কাঁচা কলার জাত। গাছ বেশ মোটা, শক্ত এবং মাঝারী আকারের। এ জাতের কলার কাঁদির ওজন ২০ কেজি। কলা মাঝারী (৯৫ গ্রাম), গাঢ় সবুজ রঙের, সহজে সিদ্ধ হয় এবং ক্ষেতেও ভাল। খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৬২%। এ জাতের গাছ পানামা ও সিগাটোকা রোগ প্রতিরোধী। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি কলা-৫

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: পর্যাপ্ত রোদযুক্ত ও পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সম্পন্ন উঁচু জমি কলা চাষের জন্য উপযুক্ত। উর্বর দোআঁশ মাটি কলা চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি ও গর্ত খনন: জমি ভালভাবে গভীর করে চাষ করতে হয়। দেড় থেকে দুই মিটার দূরে দূরে ৬০ × ৬০ × ৬০ সেমি আকারের গর্ত খনন করতে হয়। চারা রোপণের মাসখানেক আগেই গর্ত খনন করতে হয়। গর্তে গোবর ও টিএসপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে।

রোপণের সময়: কলার চারা বছরে ৩ মৌসুমে রোপণ করা যায়।

প্রথম রোপণ: আশ্বিন-কার্তিক (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-নভেম্বর)।

দ্বিতীয় রোপণ: মাঘ-ফাল্গুন (মধ্য-জানুয়ারি থেকে মধ্য-মার্চ)।

তৃতীয় রোপণ: চৈত্র-বৈশাখ (মধ্য-মার্চ থেকে মধ্য-মে)।

চারা রোপণ: রোপণের জন্য অসি তেউড় (Sword sucker) উত্তম। অসি তেউড়ের পাতা সরু, সুচালো। অনেকটা তলোয়ারের মত, গুড়ি বড় ও শক্তিশালী এবং কাণ্ড ক্রমশ গোড়া থেকে উপরের দিকে সরু হয়। তিন মাস বয়স্ক সুস্থ সবল তেউড় রোগমুক্ত বাগান থেকে সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত খাটো জাতের গাছের ৩৫-৪৫ সেমি ও লম্বা জাতের গাছের ৫০-৬০ সেমি দৈর্ঘ্যের তেউড় ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া টিস্যু কালচার চারা ব্যবহার করা হলে বাড়তি কিছু সুবিধা পাওয়া যায়।

কলা গাছে সার প্রয়োগ: চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। বয়স ভিত্তিতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

সারের নাম	গাছ প্রতি সারের পরিমাণ
গোবর	১০ কেজি
ইউরিয়া	৫০০ গ্রাম
টিএসপি	৪০০ গ্রাম
এমওপি	৬০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	১.৫ গ্রাম
বরিক এসিড	২.০ গ্রাম

প্রয়োগ পদ্ধতি: সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বরিক এসিড এবং অর্ধেক এমওপি সার গর্ত তৈরির সময় মাটির সাথে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও বাকি অর্ধেক এমওপি সার চারা রোপণের ২ মাস পর থেকে ২ মাস পর পর ৩ বারে এবং ফুল আসার পর আরও একবার গাছের চর্তুদিকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হয়। সার দেয়ার সময় জমি হালকাভাবে কোপাতে হবে যাতে শিকড় কেটে না যায়। জমির আর্দ্রতা কম থাকলে সার দেয়ার পর পানি সেচ দেয়া একান্ত প্রয়োজন।

পরিচর্যা: চারা রোপণের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা না থাকলে তখনই সেচ দেওয়া উচিত। এ ছাড়া, শুষ্ক মৌসুমে ১৫-২০ দিন অন্তর সেচ দেওয়া দরকার। বর্ষার সময় কলা বাগানে যাতে পানি জমতে না পারে তার জন্য নালা থাকা আবশ্যক। মোচা আসার পূর্ব পর্যন্ত গাছের গোড়ায় কোন তেউড় রাখা উচিত নয়। মোচা আসার পর গাছপ্রতি মাত্র একটি তেউড় বাড়তে দেয়া ভাল।

ফসল সংগ্রহ: ঋতুভেদে রোপণের ১০-১৩ মাসের মধ্যে সাধারণত সব জাতের কলাই পরিপক্ক হয়ে থাকে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করলে কলার গায়ের শিরাগুলো তিন-চতুর্থাংশ পুরো হলেই কাটতে হয়। তাছাড়াও কলার অগ্রভাগের পুষ্পাংশ শুকিয়ে গেলে বুঝতে হবে কলা পুষ্ট হয়েছে। সাধারণত মোচা আসার পর ফল পুষ্ট হতে ২১/২- ৪ মাস সময় লাগে। কলা কাটানোর পর কাঁদি শক্ত জায়গায় বা মাটিতে রাখলে কলার গায়ে কালো দাগ পড়ে এবং কলা পাকার সময় দাগওয়ালা অংশ তাড়াতাড়ি পচে যায়।

অন্যান্য পরিচর্যা

কলার পানামা রোগ ব্যবস্থাপনা

এটি একটি ছত্রাকজনিত মারাত্মক রোগ। এ রোগের আক্রমণে প্রথমে বয়স্ক পাতার কিনারা হলুদ হয়ে যায় এবং পরে কচি পাতাও হলুদ রং ধারণ করে। পরবর্তী সময় পাতা বোঁটার কাছে ভেঙ্গে গাছের চতুর্দিকে ঝুলে থাকে এবং মরে যায়। কিন্তু সবচেয়ে কচি পাতাটি গাছের মাথায় খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অবশেষে গাছ মরে যায়। কোন কোন সময় গাছ লম্বালম্বিভাবে ফেটেও যায়। অভ্যন্তরীণ লক্ষণ হিসেবে ভাসকুলার বান্ডেল হলদে-বাদামী রং ধারণ করে।

কলার পানামা রোগাক্রান্ত বাগান

প্রতিকার

- আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত গাছের তেউড় রোপণ করা যাবে না।
- রোগ প্রতিরোধী জাতের চাষ করতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে ৩-৪ বছর কলা চাষ করা যাবে না।

কলার সিগাটোকা রোগ দমন

এ রোগের আক্রমণে প্রাথমিকভাবে ৩য় বা ৪র্থ পাতায় ছোট ছোট হলুদ দাগ দেখা যায়। ক্রমশ দাগগুলো বড় হয় ও বাদামী রং ধারণ করে। এভাবে একাধিক দাগ মিলে বড় দাগের সৃষ্টি করে এবং তখন পাতা পুড়ে যাওয়ার মত দেখায়।

কলার সিগাটোকা রোগাক্রান্ত পাতা

প্রতিকার

- আক্রান্ত পাতা কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি টিল্ট ২৫০ ইসি অথবা ১ গ্রাম অটোস্টিন মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর গাছে স্প্রে করতে হবে।

কলার বানচি-টপ ভাইরাস রোগ ব্যবস্থাপনা

এ রোগের আক্রমণে গাছের বৃদ্ধি হ্রাস পায় এবং পাতা গুচ্ছাকারে বের হয়। পাতা আকারে খাটো, অপ্রশস্ত এবং উপরের দিকে খাড়া থাকে। কচি পাতার কিনারা উপরের দিকে বাঁকানো এবং সামান্য হলুদ রঙের হয়। অনেক সময় পাতার মধ্য শিরা ও বোঁটায় ঘন সবুজ দাগ দেখা যায়। পাতার শিরার মধ্যে ঘন সবুজ দাগ পড়ে।

কলার বানচি-টপ ভাইরাস রোগাক্রান্ত গাছ

প্রতিকার

- আক্রান্ত গাছ গোড়াসহ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- জীবাণু বহনকারী 'জাব পোকা' কীটনাশক যেমন ম্যালাথিওন গ্রুপের ঔষধ দ্বারা দমন করতে হবে।

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা কলার কচি পাতায় হাটাহাটি করে এবং সবুজ অংশ নষ্ট করে। ফলে সেখানে অসংখ্য দাগের সৃষ্টি হয়। অতিরিক্ত আক্রমণে গাছ দুর্বল হয়ে যায়। কলা বের হওয়ার সময় হলে পোকা মোচার মধ্যে ঢুকে কচি কলার উপর হাঁটাহাটি করে এবং রস চুষে খায়। ফলে কলার গায়ে বসন্ত রোগের দাগের মত দাগ হয়। এসব দাগের কারণে কলার বাজার মূল্য কমে যায়।

বিটল পোকা

বিটল পোকা আক্রান্ত কলা

প্রতিকার

- পোকা-আক্রান্ত মাঠে বার বার কলা চাষ করা যাবে না।
- কলার মোচা বের হওয়ার সময় ছিদ্রবিশিষ্ট পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার করে এ পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।
- প্রতি ১ লিটার পানিতে ১ গ্রাম সেভিন ৮৫ ডব্লিউ পি মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২ বার গাছের পাতার উপরে ছিটাতে হবে। ম্যালাথিয়ন বা ডায়াজিনন ৬০ ইসি বা লিবাসিড ৫০ ইসি ২ মিলি হারে ব্যবহার করতে হবে।

পেঁপে

পেঁপে বিশ্বের অন্যতম প্রধান ফল। বাংলাদেশেও পেঁপে খুবই জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। পেঁপের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত এটা স্বল্পমেয়াদী, দ্বিতীয়ত ইহা কেবল ফল নয় সবজি হিসেবেও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে, তৃতীয়ত পেঁপে অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং ঔষধী গুণসম্পন্ন। বৃহত্তর রাজশাহী, পাবনা ও যশোরে উৎকৃষ্ট মানের পেঁপে উৎপন্ন হয়। এদেশে বর্তমানে প্রায় ১.৬ হাজার হেক্টর জমিতে পেঁপের চাষ হয় এবং এর মোট উৎপাদন প্রায় ২১.৬ হাজার টন। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৭ টন।

আমের পরই ভিটামিন 'এ' এর প্রধান উৎস হল পাকা পেঁপে। কাঁচা পেঁপেতে প্রচুর পেপেইন নামক হজমকারী উপাদান থাকে।

পেঁপেসহ গাছ

পেঁপের জাত

শাহী পেঁপে

শাহী পেঁপে

রাজশাহী অঞ্চল হতে সংগৃহীত স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পেঁপের উন্নত জাত 'শাহী পেঁপে' উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি ১৯৯২ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত হয়। শাহী পেঁপে একটি এক লিঙ্গিক জাতের পেঁপে। স্ত্রী ও পুরুষ ফুল আলাদা গাছে ধরে। স্ত্রী গাছের প্রতিটি পত্র কক্ষের একটি বোঁটায় ৩টি করে স্ত্রী ফুল আসে। অপর পক্ষে পুরুষ গাছে লম্বা বোঁটায় একসঙ্গে অনেক পুরুষ ফুল ধরে। গাছ হালকা সবুজ বর্ণের। তবে পাতার রং গাঢ় সবুজ। চারা লাগানোর ৩-৪ মাস পর ফুল আসে। কাণ্ডের খুব নিচু হতে ফল ধারণ শুরু হয়। ফুল আসার ৩-৪ মাস পর পাকা পেঁপে সংগ্রহ করা যায়। জাতটি দেশের সর্বত্রই চাষোপযোগী।

গাছের উচ্চতা ১৬০-২০০ সেমি, পাতার সংখ্যা ১৭-২০টি, পাতার বোঁটার দৈর্ঘ্য ২৪-২৮ সেমি, পাতার দৈর্ঘ্য ২৩-২৭ সেমি এবং প্রস্থ ২৪-২৮ সেমি। ফলের আকার ডিম্বাকৃতির, প্রতিটি ফলের ওজন ৮৫০-৯৫০ গ্রাম, ফলের দৈর্ঘ্য ১৩-১৫ সেমি ও প্রস্থ ৯-১১ সেমি। ফলে শাঁসের পুরুত্ব ২ সেমি, শাঁসের রং গাঢ় কমলা, ফলপ্রতি বীজের সংখ্যা ৫০০-৫৩০টি, সদ্য সংগৃহীত বীজের ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম, শুকনা শত বীজের ওজন ১.০-১.২ গ্রাম। বীজ ডিম্বাকৃতির এবং বীজের রং ভেলভেট কালো হয়।

জাতটি প্রায় সারা বছরই ফল দিয়ে থাকে এবং রোপণের ৮-৯ মাসের মধ্যে পাকা ফল পাওয়া যায়। হেক্টরপ্রতি ফলন ৪০-৬০ টন। উৎকৃষ্ট মানের সবজি হিসেবে সারাদেশে কাঁচা ফলের চাহিদা আছে। তাই শাহী পেঁপের চাষ অত্যন্ত লাভজনক।

ফলসহ শাহী পেঁপের গাছ

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: সুনিষ্কাশিত, উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। উপযুক্ত পরিচর্যার দ্বারা প্রায় সব ধরনের মাটিতেই পেঁপের চাষ করা যায়। তবে উচ্চ জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম।

বীজের হার: দুই মিটার দূরে দূরে সারি করে প্রতি সারিতে ২ মিটার দূরত্বে চারা রোপণ করলে ১ হেক্টর জমিতে ২৫০০ গাছের জন্য ৭৫০০ চারার প্রয়োজন হয়। সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১৪০-১৬০ গ্রাম বীজ দিয়ে প্রয়োজনীয় চারা তৈরি করা যায়।

চারা তৈরি: বীজ থেকে বংশ বিস্তার করা হয়। পলিথিন ব্যাগে চারা তৈরি করলে রোপণের পর চারা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৫ × ১০ সেমি আকারের ব্যাগে সমপরিমাণ বালি, মাটি ও পচা গোবরের মিশ্রণ ভর্তি করে ব্যাগের তলায় ২-৩টি ছিদ্র করতে হবে। তারপর এতে সদ্য সংগৃহীত বীজ হলে ১টি এবং পুরাতন হলে ২-৩টি বীজ বপন কতে হবে। একটি ব্যাগে একের অধিক চারা রাখা উচিত নয়। ২০-২৫ দিন বয়সের চারায় ১-২% ইউরিয়া স্প্রে করলে চারার বৃদ্ধি ভাল হয়।

জমি নির্বাচন ও তৈরি: পেঁপে গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না। তাই পেঁপের জন্য নির্বাচিত জমি হতে হবে জলাবদ্ধতামুক্ত এবং সেচ সুবিধাযুক্ত। জমি বার বার চাষ ও মই দিয়ে উত্তম রূপে তৈরি করতে হবে। দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবিধার্থে বেড পদ্ধতি অবলম্বন করা উত্তম। পাশাপাশি দুটি বেডের মাঝে ৩০ সেমি চওড়া এবং ২০-২৫ সেমি গভীর নালা থাকবে। নালাসহ প্রতিটি বেড ২ মিটার চওড়া এবং জমি অনুযায়ী লম্বা হবে।

গর্ত তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে বেডের মাঝ বরাবর ২ মিটার দূরত্বে ৬০ × ৬০ × ৪৫ সেমি আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্ত প্রতি ১৫ কেজি পচা গোবর, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম, ২০ গ্রাম বরিক এসিড এবং ২০ গ্রাম জিংক সালফেট সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মেশাতে হবে। সার মিশ্রিত মাটি দ্বারা গর্ত পূরণ করে সেচ দিতে হবে।

বীজ বপন ও চারা রোপণের সময়: আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) এবং পৌষ (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) মাস পেঁপের বীজ বপনের উত্তম সময়। বপনের ৪০-৫০ দিন পর চারা রোপণের উপযোগী হয়।

চারা রোপণ: চারা লাগানোর পূর্বে গর্তের মাটি উলট-পালট করে নিতে হয়। প্রতি গর্তে ৩০ সেমি দূরত্বে ত্রিভুজ আকারে ৩টি করে চারা রোপণ করতে হয়। বীজ তলায় উৎপাদিত চারার উন্মুক্ত পাতাসমূহ রোপণের পূর্বে ফেলে দিলে রোপণকৃত চারার মৃত্যু হার কমবে এবং চারা দ্রুত প্রতিষ্ঠিত হবে। পলিব্যাগে উৎপাদিত চারার ক্ষেত্রে পলিব্যাগটি খুব সাবধানে অপসারণ করতে হবে যাতে মাটির বলটি ভেঙ্গে না যায়। পড়ন্ত বিকাল চারা রোপণের সর্বোত্তম সময়। রোপণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে চারার গোড়া যেন বীজতলা বা পলিব্যাগে মাটির যতটা গভীরে ছিল তার চেয়ে গভীরে না যায়।

গাছে সার প্রয়োগ: ভাল ফলন পেতে হলে পেঁপেতে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। উপরি হিসেবে গাছপ্রতি ৪৫০-৫০০ গ্রাম ইউরিয়া এবং ৪৫০-৫০০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের এক মাস পর হতে

প্রতি মাসে গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম ইউরিয়া ও ৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছে ফুল আসার পর এই মাত্রা দ্বিগুন করতে হবে। মাটিতে রস না থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

পরিচর্যা: পেঁপের জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বর্ষা মৌসুমে আগাছা দমন করতে গিয়ে মাটি যাতে বেশি আলগা হয়ে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

পানি সেচ ও নিকাশ: শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজন অনুযায়ী পানি সেচ দিতে হবে। সেচে ও বৃষ্টির পানি যাতে জমিতে জমে না থাকে সে জন্য পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে।

অতিরিক্ত গাছ অপসারণ: চারা লাগানোর ৩-৪ মাস পর গাছে ফুল আসলে প্রতি গর্তে একটি করে সুস্থ সবল স্ত্রী গাছ রেখে বাকিগুলো তুলে/কেটে ফেলতে হবে। তবে সুষ্ঠু পরাগায়ণ ও ফল ধারণের জন্য বাগানের বিভিন্ন স্থানে কমপক্ষে শতকরা ৫টি পুরুষ গাছ থাকা অপরিহার্য।

ফল পাতলাকরণ: পেঁপের অধিকাংশ জাতের ক্ষেত্রে একটি পত্রকক্ষ থেকে একাধিক ফুল আসে এবং ফল ধরে। ফল কিছুটা বড় হওয়ার পর প্রতি পত্রকক্ষে সবচেয়ে ভাল ফলটি রেখে বাকিগুলো ছিঁড়ে ফেলতে হবে। দ্বিতীয় বা তার পরবর্তী বছরে যে পেঁপে হয় সেগুলো খুব ঠাসাঠাসি অবস্থায় থাকে। ফলে ঠিকমতো বাড়তে পারে না এবং এদের আকৃতি নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ছোট ফলগুলো ছাঁটাই করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

চারা ঢলে পড়া (ড্যাম্পিং অফ) ও কাণ্ড পচা রোগ দমন

পেঁপের ঢলে পড়া রোগে বীজতলায় প্রচুর গাছ মারা যায়। তাছাড়া এ রোগের জীবাণুর আক্রমণে বর্ষা মৌসুমে কাণ্ড পচা রোগও হয়ে থাকে। *পিথিয়াম এ্যাফানিডারমাটাম* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। বর্ষা মৌসুমে ঢলে পড়া রোগের প্রকোপ খুব বেশি দেখা যায়। বৃষ্টির পানিতে অথবা সেচের পানিতে এ রোগের জীবাণু ছড়ায়।

প্রতিকার

- এ রোগ প্রতিকারের তেমন সুযোগ থাকে না। তাই প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা উত্তম।
- আশ্বিন (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে বীজতলা তৈরি করতে হলে বীজ বপনের পূর্বে বীজতলার মাটি ভালভাবে শুকানোর ব্যবস্থা করতে হবে।
- সিকিউর নামক ছত্রাকনাশক ২-৩ গ্রাম প্রতি কেজি বীজের সাথে মিশিয়ে শোধন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- জমি তৈরির পর ৬ সেমি পুরু করে শুকনো কাঠের গুঁড়া বা ধানের তুষ বীজতলায় বিছিয়ে পোড়াতে হবে। পরে মাটি কুপিয়ে বীজ বপন করতে হবে।
- বীজতলায় হেক্টরে ৫ টন হারে আধাপচা মুরগির বিষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে। বীজ বপনের পূর্বে ১৫-২১ দিন জমিতে বিষ্ঠা পচানোর পর বীজ বপন করলে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়।
- প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে সিকিউর মিশিয়ে ড্রেঞ্চিং করে এ রোগের বিস্তার কমানো যায়।
- চারা লাগানোর ৩ সপ্তাহ পূর্বে হেক্টরপ্রতি ৩ টন আধা পচা মুরগির বিষ্ঠা অথবা ৩০০ কেজি খৈল জমিতে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশাতে হবে। এতে কাণ্ড পচা রোগের উপদ্রব কম হবে।

মিলি বাগ

সাম্প্রতিক সময়ে মিলি বাগ পেঁপের একটি মারাত্মক পোকা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। আক্রান্ত পাতা ও ফলে সাদা পাউডারের মত আবরণ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছের পাতা ও ফলে শুঁটি মোল্ড রোগের সৃষ্টি হয়। আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে গাছ মারা যেতে পারে।

প্রতিকার

- আক্রমণের প্রথম দিকে পোকাসহ আক্রান্ত পাতা/কাণ্ড সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে অথবা পুরাতন টুথ ব্রাশ দিয়ে আঁচড়িয়ে পোকা মাটিতে ফেলে মেরে ফেলতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম সাবান পানি অথবা এডমায়ার ২০০ এমএল ০.২৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

মিলি বাগ আক্রান্ত গাছ

আনারস

বাণিজ্যিক ফল হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে আনারস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আনারস একটি পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ফল। বাংলাদেশে প্রায় ১৪.৪ হাজার হেক্টর জমিতে আনারসের চাষ হয় এবং মোট উৎপাদন ২ লক্ষ ১২ হাজার মেট্রিক টন। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৪-১৫ টন। সিলেট, মৌলভীবাজার, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং টাঙ্গাইল জেলায় আনারসের ব্যাপক চাষ হয়। ঢাকা, নরসিংদী, কুমিল্লা, দিনাজপুর জেলাতেও আনারসের চাষাবাদ হয়ে থাকে। মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল ও টাঙ্গাইলের মধুপুর এলাকায় আনারস একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। আনারস ভিটামিন ‘এ’, ‘বি’, ও ‘সি’ এর একটি উত্তম উৎস।

আনারস

আনারসের জাত

হানিকুইন

পাকা আনারসের শাঁস হলুদ বর্ণের হয়। চোখ সুচালু ও উন্নত। গড় ওজন ১ কেজি। পাতা কাঁটা বিশিষ্ট ও পাটল বর্ণের। হানিকুইন সবচেয়ে মিষ্টি আনারস। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন। সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ জাতের আনারস বেশি চাষ হয়। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

হানিকুইন জাতের আনারস

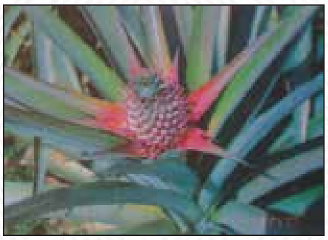

জায়েন্ট কিউ জাতের আনারস

জায়েন্ট কিউ (কেলেঙ্গা)

বাংলাদেশে আবাদকৃত আনারসের মধ্যে জমি এবং উৎপাদনের দিক থেকে জায়েন্ট কিউ জাতটির অবস্থান সবার উপরে। পাকা আনারস সবুজাভ ও শাঁস হালকা হলুদ। চোখ প্রশস্ত ও চ্যাপ্টা। গড় ওজন ২ কেজি। গাছের পাতা সবুজ, প্রায় কাঁটাবিহীন। ফল খেতে টক-মিষ্টি স্বাদের। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৪০ টন। সিলেট, মৌলভীবাজার ও টাঙ্গাইল জেলায় এ জাতের আনারস বেশি চাষ হয়।

ঘোড়াশাল

পাকা আনারস লালচে এবং ঘিয়ে সাদা হয়। চোখ প্রশস্ত এবং গড় ওজন ১.২৫ কেজি। পাতা কাঁটাবিশিষ্ট, চওড়া ঢেউ খেলানো থাকে। ঢাকা ও নরসিংদী জেলায় এ জাতটির চাষ সীমাবদ্ধ। সঠিক পরিচর্যার অভাব এবং অন্যান্য ফসলের চাপে এ জাতের আওতাধীন জমি দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে।

জলঢুপি

পাকা আনারস লালচে ও ঘিয়ে সাদা রঙের হয়ে থাকে এবং চোখ প্রশস্ত। গড় ওজন ১.০-১.৫ কেজি। পাতা কাঁটা বিশিষ্ট, চওড়া ও ঢেউ খেলানো থাকে। জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ উপযোগী।

জলঢুপি জাতের আনারস

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জমি তৈরি: দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি বেশ উপযোগী। ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে ও জমি সমতল করতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি কোন স্থানে জমে না থাকতে পারে। জমি থেকে ১৫ সেমি উঁচু এবং ১ মিটার প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হবে। এক বেড থেকে অপর বেডের মাঝে ৪০-৫০ সেমি নালা রাখতে হবে।

চারা রোপণ: মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাস) আনারসের চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তাছাড়া সেচের সুবিধা থাকলে মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি মাস) পর্যন্ত চারা লাগানো যায়। ১ মিটার প্রশস্ত বেডে দুই সারিতে চারা রোপণ করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৩০-৪০ সেমি রাখতে হবে।

সারের পরিমাণ:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গাছ
পচা গোবর	২৯০-৩১০ গ্রাম
ইউরিয়া	৩০-৩৬ গ্রাম
টিএসপি	১০-১৫ গ্রাম
এমওপি	২৫-৩৫ গ্রাম
জিপসাম	১০-১৫ গ্রাম

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: গোবর, জিপসাম ও টিএসপি সার বেড তৈরির সময় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও পটাশ সার চারা রোপণের ৪-৫ মাস পর থেকে শুরু করে ৫ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। সার বেডে ছিটিয়ে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

পরিচর্যা: শুষ্ক মৌসুমে আনারস ক্ষেতে সেচ দেওয়া খুবই প্রয়োজন। বর্ষা মৌসুমে অতি বৃষ্টির সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমে না থাকে সে জন্য নালা কেটে পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। চারা বেশি লম্বা হলে ৩০ সেমি পরিমাণ রেখে আগার পাতা সমান করে কেটে দিতে হবে। আনারসের জমি সর্বদা আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন।

ফল সংগ্রহ: সাধারণত চারা রোপণের ১৫-১৬ মাস পর মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসে আনারস গাছে ফুল আসে এবং মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুন থেকে আগস্ট) মাসে আনারস পাকে।

ফলন: প্রতি হেক্টর জমিতে হানিকুইন আনারস ২৫-৩০ টন এবং জায়েন্ট কিউ ৩০-৪০ টন হয়।

হরমোন প্রয়োগে সারা বছর আনারস উৎপাদন প্রযুক্তি

বাংলাদেশে যে পরিমাণ আনারস উৎপাদিত হয় তার অধিকাংশই মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুন থেকে আগস্ট) মাসের মধ্যে আহরিত হয়ে থাকে। এ সময়ে অন্যান্য ফল যেমন- আম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, জাম প্রভৃতি ফলেরও মৌসুম। কাজেই এ সময় আনারসের দাম কমে যায়। এমনকি এক সময়ে প্রচুর পরিমাণ আনারস পাকার ফলে এবং বৃষ্টির দিনে পরিবহনের অভাবে অনেক ফল পচে যায়। বছরের অন্যান্য সময়ে এর চাহিদা বেশি থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন না থাকাতে তা দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। ফলে দামও বেড়ে যায়। এতে অমৌসুমে জনসাধারণ আনারস খেতে পারে না। হরমোন প্রয়োগে সারা বছর আনারস উৎপাদন করে এ সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে। এছাড়া আনারসের জমিতে সব গাছে এক সাথে ফুল/ফল আসে না। যার দরুণ দীর্ঘদিন যাবৎ জমি আটকে থাকে। এতে জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায় ও ফসলের উৎপাদন খরচ বেড়ে যায়। হরমোন প্রয়োগে প্রায় শতভাগ গাছে একসাথে

ফুল আসে। হানিকুইন জাতের আনারস একটি রপ্তানিযোগ্য ফল। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী এক কেজি অথবা অর্ধ কেজি ওজনের ফল উৎপাদন করা আবশ্যক। চারার নয় মাস বয়স অথবা ২২ পাতা পর্যায়ে হরমোন প্রয়োগ করা হলে ফল হবে আধা কেজি ওজনের। আবার চারার ১৩ মাস বয়স অথবা ২৮ পাতা পর্যায়ে হরমোন প্রয়োগ করা হলে ফল হবে এক কেজি ওজনের।

হরমোন প্রয়োগ পদ্ধতি

আনারস চারা রোপণের ৯-১৩ মাস পর প্রতি মাসে বৃষ্টিহীন দিনে ক্রমানুসারে ইথ্রেল ৫০০ পিপিএম বা ক্যালসিয়াম কার্বাইড ১০,০০০ পিপিএম (বা ১%) দ্রবণ প্রতি গাছে ৫০ মিলি পরিমাণে সকালে গাছের কাণ্ডে ঢেলে দিতে হবে। হরমোন প্রয়োগের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি হলে এর কার্যকারিতা কমে যায়। সারা বছর আনারস পেতে হলে জমিকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করে প্রতি মাসেই এক একটি ব্লকে আনারস চারা রোপণ করতে হয় অথবা একবার রোপণ করে ৩-৪টি ব্লকে ভাগ করে ক্রমান্বয়ে প্রতিমাসে হরমোন প্রয়াগ করা যেতে পারে। হরমোন প্রয়োগের ২০-৪০ দিন পর গাছে ফুল আসে এবং ৫-৬ মাস পর ফল আহরণ করা যায়।

আনারস বাগান

মুকুট ব্যবস্থাপনা

ফলের মুকুট থাকা আবশ্যক। কিন্তু বৃহৎ মুকুট বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে রপ্তানির ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। ফুল আসার ৬৫-৭৫ দিন পর মুকুটের কেন্দ্রীয় মেরিস্টেম লোহার তৈরি অগারের সাহায্যে অপসারণ করা হলে ফলের বৃদ্ধি ব্যাহত না করে মুকুট ক্ষুদ্র থাকবে।

পেয়ারা

পেয়ারা ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ফল। বাংলাদেশের সর্বত্র কম বেশি এ ফল জন্মে থাকে। তবে ইতোপূর্বে পেয়ারার বাণিজ্যিক চাষ পিরোজপুর জেলার স্বরূপকাঠি, চট্টগ্রাম জেলার কাঞ্চননগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মুকুন্দপুর প্রভৃতি এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে উন্নত জাত যেমন- কাজী পেয়ারাসহ 'বারি পেয়ারা-২', 'বারি পেয়ারা-৩' এবং 'বারি পেয়ারা-৪' উদ্ভাবিত হওয়ার পর দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে পেয়ারার চাষ হচ্ছে।

পেয়ারা

বাংলাদেশে বর্তমানে পেয়ারার মোট উৎপাদন ২ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন। বহুবিধ গুণাগুণের সমন্বয়ের জন্য পেয়ারাকে নিরক্ষীয় এলাকার আপেল বলা হয়। টাটকা ফল হিসেবে খাওয়া ছাড়াও এ থেকে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে জ্যাম, জেলী, জুস প্রভৃতি খাদ্য তৈরি হয়। বর্তমানে আমাদের দেশে বিদেশি ফলের পাশাপাশি পেয়ারার ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

পেয়ারার জাত

কাজী পেয়ারা

কাজী পেয়ারা নামক জাতটি বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভাবন করে ১৯৮৫ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছ আকারে মধ্যম। বীজের গাছ লাগানোর এক বছরের মধ্যে ফল দিতে শুরু করে। এ জাতটি বছরে দু'বার ফল দেয়। প্রথমবার মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-বৈশাখ (মার্চ-এপ্রিল) মাসে ফুল আসে এবং মধ্য-আষাঢ় থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুলাই-আগস্ট) মাসে পাকে। দ্বিতীয়বার মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে ফুল আসে এবং মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে পাকে। ফল আকারে বেশ বড়। ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম। পরিপক্ক ফল

কাজী পেয়ারা

হলুদাভ সবুজ এবং ভিতরের শাঁস সাদা। প্রতি ফলে ৩৪০-৩৬০টি বীজ থাকে, বীজ বেশ শক্ত। হাজার বীজের ওজন ৩.৫-৪.০ গ্রাম।

কাজী পেয়ারা খেতে কচকচে (ব্রিক্সমান ৮-১৩%)। ফল ৭-১০ দিন সাধারণ তাপমাত্রায় ঘরে সংরক্ষণ করা যায়। কাজী পেয়ারার প্রতি ১০০ গ্রাম খাদ্যোপযোগী অংশে ২১০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৮ টন।

বারি পেয়ারা-২

বারি পেয়ারা-২

'বারি পেয়ারা-২' নামে উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয় এবং ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছ ছাতাকৃতি, পাতার অগ্রভাগ সুচালো। জাতটি বর্ষাকালে ও শীতকালে ২ বার ফল দেয়। তবে সঠিক পরিচর্যা (বিশেষ করে ফল পাতলা করা ও সার প্রয়োগ) করা হলে প্রায় সারা বছর ফল দিতে পারে। ফল আকারে বেশ বড়, ওজন ৩৫০-৪০০ গ্রাম ও গোলাকার। পরিপক্ক ফল হলুদাভ সবুজ এবং ভিতরের শাঁস সাদা হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০ টন। প্রতি ফলে ৩৩০-৩৫০টি বীজ থাকে যার ওজন প্রায় ৫ গ্রাম। পেয়ারা খেতে কচকচে, সুস্বাদু ও মিষ্টি (১০% ব্রিক্সমান)।

বারি পেয়ারা-৩

বারি পেয়ারা-৩

স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৩ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট হতে 'বারি পেয়ারা-৩' নামে একটি জাত জাতীয় বীজ বোর্ডের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়।

এটি লাল শাঁস বিশিষ্ট পেয়ারার প্রথম অনুমোদিত জাত। ফলের আকার ৬.৭৫ × ৭.১০ সেমি। ফলের গড় ওজন ১৮০ গ্রাম এবং টিএসএস ৮%। ফলের গাত্র মসৃণ, পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় হলদে সবুজ, শাঁস লাল, বীজ মধ্যম। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২২ টন।

বারি পেয়ারা -৪

বারি পেয়ারা- ৪

উচ্চফলনশীল, বীজবিহীন, এবং অমৌসুমী জাত। গাছ খর্বাকৃতির, মধ্যম ছড়ানো ও ঝোপালো। ফল সংগ্রহের উপযোগী সময় সেপ্টেম্বর - অক্টোবর। পরিপক্ক ফলের রং হলুদাভ সবুজ। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ২৮৪ গ্রাম। ফলের শাঁস সাদা, কচকচে, সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ৯.৫%) ও দীর্ঘ সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন।

পেয়ারার উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটিঃ পেয়ারা উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফল। প্রায় সব রকমের মাটিতেই পেয়ারার চাষ করা যায়, তবে জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটি থেকে ভারী এঁটেল মাটি যেখানে পানি নিষ্কাশনের বিশেষ সুবিধা আছে সেখানে পেয়ারা ভাল জন্মে। ৪.৫-৮.২ অম্লক্ষারত্বের মাটিতে পেয়ারা ভালো হয়।

বংশ বিস্তারঃ বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা সবচেয়ে সহজ। অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করলে সে গাছের পেয়ারা মাতৃ গাছের পেয়ারা হতে পার্থক্য হয় না। তাই ফল উৎপাদনের জন্য বীজের চারা এবং বীজ উৎপাদনের জন্য (মাতৃ গাছ) অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করাই উত্তম। অঙ্গজ পদ্ধতির মধ্যে গুটি কলমই বহুল প্রচলিত।

গর্ত তৈরি ও চারা/কলম রোপণ: এক বছর বয়সের চারা বা কলম সাধারণত ৪ মিটার দূরে দূরে লাগানো হয়। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পেয়ারার চারা/কলম লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই পেয়ারার চারা/কলম রোপণ করা চলে। চারা লাগাবার জন্য ৬০ × ৬০ × ৪৫ সেমি আকারের গর্ত করে প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি পচা গোবর অথবা আবর্জনা পচা সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে গর্ত ভর্তি করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। চারা/কলম রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি পুনরায় উলটপালট করে এর ঠিক মাঝখানে খাড়াভাবে চারাটি লাগিয়ে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হয়। চারা রোপণের পর শক্ত খুঁটি পুঁতে খুঁটির সাথে চারাটি বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে চারার কোন ক্ষতি না হয়। প্রয়োজনবোধে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: প্রতিবছর ফেব্রুয়ারি, মে ও সেপ্টেম্বর মাসে তিন কিস্তিতে গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে। সার একেবারে গাছের গোড়ায় না দিয়ে যতদূর পর্যন্ত গাছের ডালপালা বিস্তার লাভ করে সে এলাকার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। নিচের ছকে বিভিন্ন বয়সের গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেখানো হলো।

সারের নাম	গাছের বয়স		
	১-২ বছর	৩-৫ বছর	৬ বছর বা তদুর্দ্ধ
গোবর (কেজি)	১০-১৫	২০-৩০	৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০
এম পি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২৫০-৪০০	৫০০

সার প্রয়োগের পর ও খরার সময় বিশেষ করে গাছে গুটি আসার সময় পানি সেচ অত্যাবশ্যক। গাছের গোড়া থেকে মাঝে মাঝে আগাছা পরিষ্কার করা ও গোড়ার মাটি ভেঙ্গে দেয়া দরকার।

সেচ ব্যবস্থাপনা: পেয়ারার চারা রোপণের সময় যদি গর্তের মাটি শুকনো থাকে তাহলে চারা গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে পানি দিতে হবে। বৃদ্ধির প্রাথমিক অবস্থায় পেয়ারা গাছে বছরে ৮-১০ বার পানি সেচের প্রয়োজন। ফলন্ত গাছে শুষ্ক মৌসুমে অর্থাৎ ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত প্রতি ১০-১৫ দিন পর পর পানি সেচের ব্যবস্থা করলে ফল ঝরা হ্রাস পাবে এবং সাথে সাথে বড় আকারের ফল ও বেশি ফলন পাওয়া যায়। গোড়ায় পানি জমে গেলে ও ঠিকমত নিষ্কাশন না হলে গাছ মরে যেতে পারে।

বিশেষ ব্যবস্থাপনা

অঙ্গ ছাঁটাই: অঙ্গ ছাঁটাই বলতে মরা, রোগাক্রান্ত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করা বুঝায়। রোপণকৃত চারা বা কলমের সুন্দর কাঠামো দেওয়ার নিমিত্ত মাটি থেকে ১.০-১.৫ মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫টি ডাল রেখে গোড়ার দিকের সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। বয়স্ক গাছের ফল সংগ্রহের পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে অঙ্গ ছাঁটাই করা হয়। অঙ্গ ছাঁটাই করলে গাছে নতুন ডালপালা গজায় এবং তাতে প্রচুর ফল ধরে।

ডাল নুয়ে দেয়া: পেয়ারার খাড়া ডালে নতুন শাখা ও ফল কম হয়। এজন্য খাড়া ডাল ওজন অথবা টানার সাহায্যে নুয়ে দিলে প্রচুর সংখ্যক নতুন শাখা গজায়। এতে ফলন ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

ফল পাতলাকরণ: গাছে প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে। ফল আকারে বেশ বড় হওয়ায় গাছের পক্ষে সব ফল ধারণ করা সম্ভব নয়। ফলের ভারে গাছের ডালপালা ভেঙ্গে যায় এবং ফল আকারে ছোট ও নিম্নমানের হয়। এমতাবস্থায়, গাছকে দীর্ঘদিন ফলবান রাখতে ও মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে ফল ছোট থাকা অবস্থায় (মার্বেল অবস্থা) ৫০-৬০% ফল পাতলা করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে। গাছের বৃদ্ধির জন্য ১ম বছর ফল না রাখাই ভাল, দ্বিতীয় বছর অল্প সংখ্যক ফল রাখা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গাছের অবস্থা বিবেচনা করে ফল রাখতে হবে। পরিকল্পিত উপায়ে ফুল বা ফল ছাঁটাই করে প্রায় সারাবছর 'কাজী পেয়ারা' ও 'বারি পেয়ারা-২' জাতের গাছে ফল পাওয়া সম্ভব।

ফল ঢেকে দেওয়া (Fruit bagging): পেয়ারা ছোট অবস্থায় ব্যাগিং করলে রোগ, পোকা, পাখি, বাদুর, কাঠবিড়ালী ইত্যাদির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। ব্যাগিং করা ফল অপেক্ষাকৃত বড় আকারের এবং আকর্ষণীয় হয়। ব্যাগিং বাদামী

কাগজ বা ছোট ছিদ্রযুক্ত পলিথিন দিয়ে করা যেতে পারে। ব্যাগিং করলে সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রশ্মি লাগে না বিধায় ফলে কোষ বিভাজন বেশি হয় এবং ফল আকারে বড় হয়। ব্যাগিং করার পূর্বে অবশ্যই প্রতি লিটার পানির সাথে ০.৫ মিলি হারে টিল্ট ২৫০ ইসি মিশিয়ে সমস্ত ফল ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

পেয়ারার এ্যানথ্রাকনোজ রোগ দমন

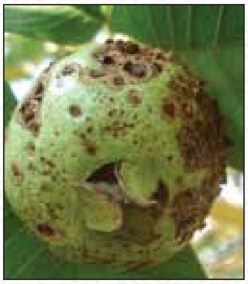

এ্যানথ্রাকনোজ রোগাক্রান্ত ফল

পেয়ারা গাছের পাতা, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা এ রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। *কলিটোট্রিকাম গ্লয়োসপিরিডিস* নামক ছত্রাক পেয়ারার এ্যানথ্রাকনোজ রোগের কারণ। প্রথমে পেয়ারার গায়ে ছোট ছোট রঙের দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে পেয়ারার গায়ে ক্ষতের সৃষ্টি করে। আক্রান্ত ফল পরিপক্ক হলে অনেক সময় ফেটে যায়। তাছাড়া এ রোগে আক্রান্ত ফলের শাঁস শক্ত হয়ে যায়। গাছের পরিত্যক্ত শাখা-প্রশাখা, ফল এবং পাতায় এ রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে। বাতাস ও বৃষ্টির মাধ্যমে পেয়ারার এ্যানথ্রাকনোজ রোগ ছড়ায়।

প্রতিকার

- গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- গাছে ফল ধরার পর টপসিন-এম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর অন্তর ৩-৪ বার ভালভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

উইল্ট বা ঢলে পড়া রোগ দমন

ফিউজেরিয়াম নামক মাটি বাহিত ছত্রাকের আক্রমণে এ সমস্যা হয়। প্রথমে পাতা হলুদ হয়ে আসে এবং পরে শুকিয়ে যায়। এভাবে পাতার পর শাখা-প্রশাখা এবং ধীরে ধীরে সমস্ত গাছই ৮-১০ দিনের মধ্যে নেতিয়ে মারা যায়।

প্রতিকার

- এ রোগের কোন প্রতিকার নেই। তাই একে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে হবে।
- মাঠে/বাগানে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন আদিজোড় যেমন- এল ৪৯ ও পলি-পেয়ারার সাথে কলম করে এ রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা যায়।
- বাগানের মাটিতে অম্লত্বের পরিমাণ কমানোর জন্য চুন প্রয়োগ করতে হবে।

উইল্ট রোগে আক্রান্ত গাছ

সাদা মাছি পোকা দমন

সাদা মাছি আক্রান্ত পাতা

সাধারণত শীতকালে এদের আক্রমণে পাতায় সাদা সাদা তুলার মত দাগ দেখা যায়। এরা পাতার রস শুঁষে গাছকে দুর্বল করে। রস শোষণের সময় পাতায় মধু সদৃশ বিষ্ঠা ত্যাগ করে যার উপর শুঁটিমোল্ড নামক ছত্রাক জন্মে। এতে পাতার খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়।

প্রতিকার

- আক্রান্ত পাতা ও ডগা ছাঁটাই করে ধ্বংস করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম সাবান বা ২ মিলি রগর/রক্সিয়ন ৪০ ইসি মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

কুল

কুল

স্বাদ ও পুষ্টিমূল্যের বিচারে কুল বাংলাদেশের একটি উৎকৃষ্ট ফল। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কুলের চাষ হয় তবে রাজশাহী, কুমিল্লা, খুলনা, বরিশাল, ময়মনসিংহে উৎকৃষ্ট জাতের কুল চাষ হয়।

বাংলাদেশে কুলের মোট উৎপাদন প্রায় ৯০ হাজার টন। উল্লেখ্য কুল যখন পাকে তখন অন্যান্য অনেক ফলই পাওয়া যায় না। কুল বিভিন্ন খনিজ দ্রব্য এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি' এর একটি ভাল উৎস।

কুল সাধারণত পাকা ও টাটকা অবস্থায় খাওয়া হয়। কুল দিয়ে সুগন্ধি চাটনি, আচার ও অন্যান্য মুখরোচক খাবারও তৈরি করা যায়।

কুলের জাত

বারি কুল-১

বারি কুল-১

'বারি কুল-১' নামে জাতটি বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয় এবং ২০০৩ সালে অনুমোদিত হয়। এটি নারিকেলী কুল জাত নামে পরিচিত। দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে, বিশেষত রাজশাহী ও খুলনা এলাকায় চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত জাত।

ফল আকারে মাঝারী, ওজন ২৩ গ্রাম ও লম্বা। কুল খেতে খুব মিষ্টি, কচকচে ও সুস্বাদু। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৯২% এবং টিএসএস ১২.৮%। বীজ ছোট এবং বীজের অগ্রভাগ সুচালো। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন প্রায় ১০-১৫ টন।

বারি কুল-২

বারি কুল-২

'বারি কুল-২' নামে এ জাতটি বাছাই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্ভাবিত একটি উচ্চ ফলনশীল জাত হিসেবে ২০০৩ সালে অনুমোদন লাভ করে। উত্তরাঞ্চলে চাষাবাদের জন্য উত্তম। তবে দেশের অন্যত্র চাষ করা যায়।

ফল আকারে বেশ বড় ও ডিম্বাকৃতির (Oval shaped), খেতে সুস্বাদু। ফলের খোসা পাতলা, পাকার পর হলুদাভ সবুজ রং ধারণ করে। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৯১% এবং ব্রিক্সের পরিমাণ ১১.৫%। বীজের আকার ছোট এবং ডিম্বাকৃতির। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১৮-২০ টন।

বারি কুল-৩

বারি কুল-৩

উচ্চ ফলনশীল জাতটি বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'বারি কুল-৩' নামে নির্বাচন করে ২০০৯ সালে মুক্তায়ন করা হয়। এর গাছ খাটো ও ছড়ানো প্রকৃতির। ডাল অল্প কাঁটা বিশিষ্ট। ফল আহরণের সময় মধ্য-মাঘ। হেক্টরপ্রতি ফলন ২২-২৫ টন। ফল বড়, প্রায় গোলাকার ও হলুদাভ সবুজ বর্ণের । প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৭৫ গ্রাম, বীজ ছোট। ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৬%। শাঁস সাদা, কচকচে, কষ্টিভাব বিহীন, রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ১৪%)। জাতটি সমগ্র বাংলাদেশে চাষোপযোগী। কুলের উৎপাদন, অমৌসুমে ফলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে এবং ভিটামিন 'সি' এর ঘাটতি হ্রাসে জাতটি ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারবে।

বারি কুল-৪

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই করে মূল্যায়েনের মাধ্যমে 'বারি কুল-৪' জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০১৫ সালে জাত হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়।

বারি কুল-৪

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী নাবী জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম ছড়ানো। ভাদ্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং ফাল্গুন মাসের শেষার্ধ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। পাকা ফল দেখতে আকর্ষণীয় হলুদাভ সবুজ বর্ণের ও দু'প্রান্ত ভোঁতা । ফল ডিম্বাকৃতি এবং খোসা পাতলা, গড় ওজন ৩৬ গ্রাম খেতে কচকচে, রসালো এবং মিষ্টি (বিক্সমান ১৫%) ও সুস্বাদু। বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৯৬%। গাছ প্রতি ফলন ২০০ থেকে ২২০ কেজি।

বারি কুল-৫

বারি কুল-৫

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম বাছাই ও মূল্যায়নের মাধ্যমে বারি কুল-৫ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০১৭ সালে বাংলাদেশে চাষের জন্য জাত হিসেবে অনুমোদন দেয়া হয়।

বারি কুল-৫ একটি উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী টক কুলের জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম ছড়ানো। ভাদ্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং ফাল্গুন মাসের শেষার্ধ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। পাকা ফল দেখতে আকর্ষণীয় হলুদাভ সবুজ বর্ণের ও দু'প্রান্ত ভোঁতা। ফল ডিম্বাকৃতি এবং খোসা পাতলা, গড় ওজন ১৬ গ্রাম খেতে কচকচে, রসালো এবং টক-মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৮%) স্বাদযুক্ত। বীজ ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৮৬%। টাটকা ফল হিসাবে খাওয়া ছাড়াও শুকিয়ে সংরক্ষণ আর চার তৈরিতে ব্যবহার করা যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ু কুল চাষের জন্য সর্বোত্তম। এতে কুলের ফলন ও গুণগতমান দুই-ই ভাল হয়। তবে কুলের পরিবেশ উপযোগিতা ব্যাপক বিধায় আর্দ্র ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সফলভাবে এর চাষ করা সম্ভব। উঁচু সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ অথবা দোআঁশ মাটি কুল চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে সব ধরনের মাটিতেই কুলের চাষ করা যায়। অন্যান্য প্রধান ফল ও ফসলের জন্য উপযোগী নয় এ ধরনের অনুর্বর জমিতে এমনকি উপকূলীয় লবণাক্ত জমিতেও সন্তোষজনকভাবে কুলের চাষ করা সম্ভব।

বংশ বিস্তার: দু'ভাবে বংশ বিস্তার করা যায়, বীজ থেকে এবং কলম তৈরি করে। কলমের চারা উত্তম কারণ এতে বংশগত গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে। বীজ থেকে চারা পেতে হলে বীজকে ভিজা গরম বালির ভেতর দেড় থেকে দুই মাস রেখে দিলে চারা তাড়াতাড়ি গজাবে, না হলে ৬-৮ সপ্তাহ সময় লেগে যাবে। অন্যদিকে, কলমের চারা পেতে হলে নির্বাচিত স্থানে বীজ বপন ও চারা তৈরি করে তার উপর 'বাডিং' এর মাধ্যমে কলম করে নেয়াই শ্রেয়। বলয় (Ring), তালি (Patch) অথবা T-বাডিং যে কোন পদ্ধতিতেই বাডিং করা যায়। তালি, চোখ কলম অপেক্ষা সহজ। বাডিং করার জন্য চারার রুটস্টক বয়স ৩ মাস থেকে ১ বছর পর্যন্ত হতে পারে। মধ্য-চৈত্র থেকে বৈশাখ (এপ্রিল-মে) বাডিং করার উপযুক্ত সময়। এক্ষেত্রে সায়ন (Scion) সংগ্রহের উদ্দেশে নির্বাচিত জাত এবং রুটস্টক উভয়েরই পুরানো ডাল-পালা ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাসে ছাঁটাই করে দিতে হয়। অতঃপর নতুন শাখাকে বাডিং-এর কাজে লাগাতে হয়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: বাগান আকারে গাছ লাগাতে হলে গভীরভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিত। এতে দীর্ঘজীবী আগাছা দমন হবে। বাড়ির আশে-পাশে, পুকুর পাড়ে কিংবা রাস্তার ধারে গাছ লাগালে চাষ না দিয়ে সরাসরি গর্ত করে কুলের চারা লাগানো যায়। চারা লাগানোর জন্য ৫-৬ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটির আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২৫ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি এবং ২৫০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি কোদাল দিয়ে উলট-পালট করে নিতে হবে। রোপণের পর চারাটিকে একটি শক্ত খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং গোড়ায় পানি দিতে হবে ।

সার প্রয়োগ: সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও অধিক ফলনশীলতার জন্য গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ অপরিহার্য। সারের মাত্রা নির্ভর করে গাছের বয়স ও মাটির উর্বরতার উপর। বিভিন্ন বয়সের গাছে সারের মাত্রা। এছাড়া, অঞ্চলভিত্তিক যেসব সারের অধিক ঘাটতি রয়েছে সে সব সারও প্রয়োগ করতে হবে। উল্লিখিত সার সমান দুই কিস্তিতে জ্যৈষ্ঠ এবং আশ্বিন মাসে প্রয়োগ করতে

হবে। সার মাটির সাথে ভালভাবে মেশাতে হবে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে। বাড়ির আঙ্গিনা, পুকুর বা রাস্তার ধারে লাগানো গাছে শাবল দ্বারা গর্ত করে তাতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। গাছের গোড়া থেকে কতটুকু দূরে এবং কতদূর পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা যাবে তা নির্ভর করে গাছের বয়সের উপর। সাধারণত পূর্ণ বয়স্ক গাছের গোড়া থেকে ১-১.৫ মিটার দূর থেকে শুরু করে ৩.৫ মিটার পর্যন্ত সার প্রয়োগ করা হয়।

গাছের বয়স	গাছপ্রতি সারের পরিমাণ			
	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২ বছর	১০	৩০০	২৫০	২৫০
৩-৪ বছর	১৫	৫০০	৪০০	৪০০
৫-৬ বছর	২০	৭৫০	৭০০	৭০০
৭-৮ বছর	২৫	১০০০	৮৫০	৮৫০
৯ বা তদুর্ধ্ব	৩০	১২৫০	১০০০	১০০০

পানি সেচ ও পরিচর্যা: শুষ্ক মৌসুমে বিশেষত চারা গাছে এবং বয়স্ক গাছে ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় অগ্রহায়ণ-পৌষ মাসে সেচ দিলে ফলন ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। চাষ দিয়ে বা কোদাল দিয়ে কুপিয়ে কুল বাগানের আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

ডালপালা ছাঁটাই: নতুন রোপণকৃত বা কলমকৃত গাছে আদিজোড় হতে উৎপাদিত কুঁশি ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছটির অবকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে গোড়া থেকে ১ মিটার উঁচু পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা চলবে না। এক থেকে দেড় মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫টি শাখা রাখতে হবে যাতে গাছটির সুন্দর একটি কাঠামো তৈরি হয়। কুল গাছে সাধারণত চলতি বছরের নতুন গজানো প্রশাখায় ভাল ফল ধরে। এজন্য প্রতিবছর ফল আহরণের পরপরই ডাল ছাঁটাই আবশ্যক। চারা রোপণের বা কুঁড়ি সংযোজনের পর ৩/৪ বছর মধ্যম ছাঁটাই অর্থাৎ শুধুমাত্র প্রশাখা এবং শাখার মাথার দিক থেকে ৫০-৬০ সেমি পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে। গাছ কাঙ্ক্ষিত আকারে আসার পর এক বছর বয়সী ডাল গোড়ার দিকে ২০-৩০ সেমি পরিমাণ রেখে সম্পূর্ণ ডাল ছেঁটে দিতে হবে। এছাড়া মরা, দুর্বল, রোগাক্রান্ত এবং এলোমেলোভাবে বিন্যস্ত ডালও ছেঁটে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ: জাত অনুসারে মধ্য-পৌষ থেকে মধ্য-চৈত্র (জানুয়ারি থেকে মার্চ) মাসের মধ্যে ফল পাওয়া যায়। সঠিক পরিপক্ক অবস্থায় ফল সংগ্রহ করা খুবই গুরত্বপূর্ণ। অপরিপক্ক ফল আহরণ করা হলে তা কখনই কাঙ্ক্ষিত মানসম্পন্ন হবে না। অতিরিক্ত পাকা ফল নরম এবং মলিন বর্ণের হয়ে যায়। এতে ফলের সংরক্ষণ গুণ কমে যায় এবং ফল দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। ফল যখন হালকা হলুদ বা সোনালী বর্ণ ধারণ করবে এবং এর গন্ধ ও স্বাদ কাঙ্ক্ষিত অবস্থায় পৌঁছবে তখন কুল সংগ্রহ করতে হবে। সংগ্রহকালে যাতে ফলের গায়ে ক্ষত না হয় এবং ফল ফেটে না যায় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সকাল বা বিকেলের ঠাণ্ডা আবহাওয়া ফল আহরণের জন্য অধিক উপযোগী।

অন্যান্য পরিচর্যা

কুল গাছের পাউডারী মিলডিউ রোগ দমন

কুলের পাউডারী মিলডিউ একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগের আক্রমণে ফলন হ্রাস পায়। আয়ডিয়াম প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। গাছের পাতা, ফুল ও কচি ফল পাউডারী মিলডিউ রোগে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত ফুল ও ফল গাছ হতে ঝরে পড়ে। গাছের পরিত্যক্ত অংশ এবং অন্যান্য পোষক উদ্ভিদে এ রোগের জীবাণু বেঁচে থাকে এবং বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। উষ্ণ ও ভেজা আবহাওয়ায় বিশেষ করে মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

প্রতিকার

গাছে ফুল দেখা দেয়ার পর থিওভিট, কুমুলাস ডিএফ নামক ছত্রাক নামক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট ২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি মিশিয়ে ১০- ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

লিচু

লিচু গন্ধ ও স্বাদের জন্য দেশ-বিদেশে বেশ জনপ্রিয়। বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলায় বেশি পরিমাণে লিচু উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে লিচুর মোট উৎপাদন ৯০ হাজার টন। লিচু টিনজাত করে সংরক্ষণ করা যায়।

লিচু

লিচুর জাত

বারি লিচু-১

'বারি লিচু-১' উচ্চ ফলনশীল জাতটি চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি একটি আগাম জাত। স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ফল ডিম্বাকার এবং রং লাল। ফলের ওজন প্রায় ১৮-২০ গ্রাম, দৈর্ঘ্য ৩.৫ সেমি এবং প্রস্থ ৩.১ সেমি হয়ে থাকে। ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৬৫.৩%। প্রতি গাছে ৮-১০ হাজার ফল উৎপাদিত হতে পারে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন। সাধারণত মধ্য-মাঘ মাসে (জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ) কুঁড়ি আসতে শুরু করে এবং মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে ফল আহরণ শেষ হয়ে যায়। দেশের উত্তরাঞ্চলে এ জাতটি চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

বারি লিচু-১

বারি লিচু-২

বারি লিচু-২

'বারি লিচু-২' নামে উচ্চ ফলনশীল নাবী জাতটি বাংলাদেশে ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের আকৃতি মাঝারী। পাতা বর্শাকৃতির, পুষ্পমঞ্জরী পিরামিড আকৃতির ও ফল গোলাকার। ফলের গড় আকৃতি দৈর্ঘ্য ৩.৪ সেমি এবং প্রস্থ ৩.০ সেমি। পাকা ফলের রং গোলাপী লাল। প্রতিটি ফলের ওজন ১৪-১৭ গ্রাম, ফলের শাঁস মাংসল, রসালো, মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৬.১%) এবং শাঁস ফলের ৬৫-৭০%। বীজ অপেক্ষাকৃত বড়। প্রতিবছর নিয়মিত ফল দেয়। ফুল মাঘের মাঝামাঝী (ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহ) সময়ে আসে। জ্যৈষ্ঠের (জুন প্রথম সপ্তাহ) শেষ থেকে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহে (মধ্য-জুন) ফল পাকে। পূর্ণ বয়স্ক প্রতিটি গাছের ফলের সংখ্যা ২৩০০-২৭০০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫-৬ টন। জাতটি বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে চাষের উপযোগী। লিচু উৎপাদনের মৌসুম খুবই সংক্ষিপ্ত। তাই লিচুর উৎপাদন মৌসুমকে দীর্ঘায়িত করার জন্য গুরুত্বসহকারে জাতটি প্রবর্তন করা হয়েছে।

বারি লিচু-৩

'বারি লিচু-৩' জাতটি বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ১৯৯৬ সালে মুক্তায়ন করা হয়। 'বারি লিচু-৩' মাঝ মৌসুমী জাত, নিয়মিত ফল ধরে। গোলাপের সুঘ্রাণ বিশিষ্ট অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার ফল উৎপাদনকারী এ জাতটি বসত ভিটায় লাগানোর জন্য অত্যন্ত উপযোগী। গাছের আকৃতি মাঝারী। পাতা খর্বাকার বর্শাকৃতির হয়। পুষ্পমঞ্জরী পিরামিড আকৃতির, ফল হৃদপিন্ডাকার হয়। ফলের আকৃতি দৈর্ঘ্য ৩ সেমি ও প্রস্থ ৩.৩ সেমি। পাকলে হলদে সবুজ ছোপসহ লাল রং ধারণ করে। ফলের ওজন ১৭-১৯ গ্রাম। ফলের শাঁস মাংসল রসালো ও খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯%)।

বারি লিচু-৩

শাঁস ফলের ৭৫-৭৭%, বীজ ক্ষুদ্রাকার এবং মাঘের মাঝামাঝী (ফেব্রুয়ারি) সময় ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝী (জুন) সময় ফল পাকে। প্রতিটি গাছের ফলের সংখ্যা ১৬০০-২০০০টি এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ৫-৬ টন। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্রই চাষের উপযোগী।

বারি লিচু-৪

বারি লিচু-৪

'বারি লিচু-৪' জাতটি বাংলাদেশে চাষের জন্য ২০০৮ সালে অনুমোদন করা হয়। এটি একটি মাঝ মৌসুমী জাত। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ফুল আসে এবং জুন মাসে ফল পরিপক্কতা লাভ করে। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৫,০০০টি। ইহা একটি উচ্চ ফলনশীল উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন জাত। গাছপ্রতি ফলন ১৩০ কেজি এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন। বৃহদাকার ও গাঢ় লাল বর্ণের প্রতিটি ফলের গড় ওজন ২৭ গ্রাম। ফল অতি ক্ষুদ্র বীজ সম্পন্ন ও মাংসল। শাঁস অত্যন্ত মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২২%), রসালো ও সুগন্ধযুক্ত। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৭৮%। জাতটি বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য উপযোগী।

বারি লিচু-৫

উচ্চ ফলনশীল নাবি জাত। প্রতিবছর ফল ধরে। ১৫ বছর বয়সের প্রতিটি গাছে ৩৪,০০টি ফল ধরে যার ওজন ৭৩.৮ কেজি। ফল খুব মিষ্টি (টিএসএস ১৭.৫%)। ফল মাঝারি আকৃতির এবং গড় ওজন ২১.৭৯ গ্রাম। ফল ওভাল আকৃতির এবং পাকা ফল গাঢ় লাল রঙের হয়ে থাকে। ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময় হল জুনের ৩য় সপ্তাহ। ফলের শাঁস সাদা রঙের হয়ে থাকে। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ শতকরা ৭০ ভাগ। বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের জন্য উপযোগী। এ জাতের লিচুতে উল্লেখযোগ্য কোন রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

বারি লিচু-৫

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: গভীর, নিকাশযুক্ত, উর্বর বেলে অথবা দোআঁশ মাটি লিচু চাষের জন্য উত্তম।

জমি তৈরি: উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

রোপণ প্রণালী: সমতল ভূমিতে- বর্গাকার ও পাহাড়ী ভূমিতে- কন্টুর পদ্ধতি।

চারা নির্বাচন: এক থেকে দুই বছর বয়স্ক সুস্থ ও সবল গুটি কলমের চারা বাছাই করতে হবে।

চারা রোপণের সময়: জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় (মধ্য-মে থেকে মধ্য-জুলাই) এবং ভাদ্র-আশ্বিন (মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-অক্টোবর) মাস।

চারা রোপণের দূরত্ব: ৮ মিটার।

গর্ত তৈরি: গর্তের আকার ১ × ১ × ১ মিটার।

গর্তে সারের পরিমাণ: চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্ত তৈরি করে প্রতি গর্তে নিম্নরূপ সার প্রয়োগ করতে হবে। গর্তে কিছুটা পুরাতন লিচু বাগানের মাটি মিশিয়ে দিলে চারার অভিযোজন দ্রুত বৃদ্ধি হবে।

সারের নাম	সারর পরিমাণ/গর্ত
টিএসপি	৫০০ গ্রাম
এমওপি	৪০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০-৩০০ গ্রাম
জিংক সালফেট	৪০-৬০ গ্রাম
জৈব/গোবর	২০-২৫ কেজি

চারা রোপণ: গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর চারাটি গোড়ার মাটির বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর পানি, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হল:

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)			
	১-৪	৫-১০	১১-২০	২০ এর উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	১০	২০	৩০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০	৮০০	১২০০	২০০০
টি এস পি (গ্রাম)	৪০০	১২০০	২০০০	৩০০০
এমওপি (গ্রাম)	৩০০	৮০০	১২০০	১৫০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১০	২০	৩০	৫০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার শুরুতে (ফল আহরণের পর), দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার শেষে (আশ্বিন-কার্তিক মাসে) এবং শেষ কিস্তি গাছে ফুল আসার পর প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ ও নিকাশ: চারা গাছের বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোঁটা পর্যায়ে একবার, ফল মটর দানার মত হলে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আর একবার মোট তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া একান্ত দরকার। অপরদিকে, বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি জমে না থাকে তার জন্য পানি নিকাশের ব্যবস্থা নিতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: পূর্ণ বয়স্ক গাছে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের জন্য ফল সংগ্রহের পর অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। ফল সংগ্রহের সময় লিচুর মাকড় আক্রান্ত ডাল ভেঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

গাছের মুকুল ভাঙ্গন: কলমের গাছের বয়স ৪ বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মুকুল ভেঙ্গে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ: ফল পাকার সময় খোসা আকর্ষণীয় খয়েরী, লাল বা সবুজ মিশ্রিত লাল রং ধারণ করে ও খোসার কাটাগুলি চ্যাপ্টা হয়ে সমান হয়ে যায়। মঞ্জরীর গোড়া থেকে পাতাসহ ডাল ভেঙ্গে থোকায় থোকায় লিচু সংগ্রহ করা হয়। বৃষ্টির পর পরই গাছ থেকে ফল সংগ্রহ করা উচিত নয়। কারণ এতে ফল পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফল সংগ্রহের সময় ফলবান ও ফল বিহীন বিশেষ করে লিচু মাকড়াক্রান্ত পাতাসহ ডাল ভেঙ্গে দিতে হয়। যথাযথ পরিচর্যা পেলে লিচু গাছ ১০০ বছর পর্যন্ত লাভজনক ফল দিতে পারে। একটি পূর্ণ বয়স্ক লিচু গাছ থেকে বছরে ৫০০০-১০০০০ (১০০-১৫০ কেজি) লিচু সংগ্রহ করা যায়।

অন্যান্য প্রযুক্তি

লিচু রপ্তানির জন্য এর গুণগতমান ভালো হওয়া দরকার। সেজন্য উৎপাদন এবং শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি যথাযথ ব্যবহার করা দরকার। নিচে রপ্তানির জন্য উৎপাদন ও শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি দেয়া হলো।

লিচু উৎপাদন প্রযুক্তি: বোরন ও দস্তার অভাব থাকলে অন্যান্য অনুমোদিত সারের সাথে প্রতিটি গাছে ২০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট এবং ১০ গ্রাম বরিক এসিড (লিচুর আঁটি শক্ত হওয়ার পর্যায়ে) গাছের গোড়ায় মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ফেব্রুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত নিয়মিত রিং বেসিন পদ্ধতিতে গাছের গোড়ায় সেচ দিতে হবে। লিচুর পোকা দমনের জন্য ফল মটর দানার আকার হলে নাইলনের তৈরি জাল দিয়ে লিচুর গোছা বেঁধে দিতে হবে।

সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি: লিচু পাকার পর পাতা ও বোঁটাসহ সম্ভব হলে কাচি বা সিকেচার দিয়ে কেটে সংগ্রহ করে একটি ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। নষ্ট ও কাঁচা লিচু বাদ দিয়ে ভালো মানের ফল গোছা আকারে ঝুড়িতে যথেষ্ট পরিমাণ পাতা দিয়ে রাখতে হবে। এরপর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোল্ড স্টোরেজের প্যাকিং কক্ষে আনতে হবে।

রপ্তানিযোগ্য লিচু

এখানে আর একবার ফল বাছাই করতে হবে। ফলের সাথে ৫ থেকে ১০ মিলিমিটার বোঁটা রেখে ছিদ্রযুক্ত পলিইথাইলিন ব্যাগে করোগেটেড ফাইবার কার্টুনে ভরে ১৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ও ৯৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ২৪ ঘণ্টা রাখতে হবে। এভাবে ১ কেজি লিচুর জন্য ৪টি ব্যাগের প্রয়োজন। তারপর কার্টুনগুলো ঠাণ্ডাযুক্ত গাড়িতে করে রপ্তানির জন্য বিমানবন্দরে পাঠাতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

ফল ছিদ্রকারী পোকা

লিচুর ভিতরে ফল ছিদ্রকারী পোকা

ফল ছিদ্রকারী পোকা লিচুর অন্যতম প্রধান শত্রু। ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় পূর্ণ বয়স্ক পোকা ফলের বোঁটার কাছে খোসার নিচে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে বোঁটার নিকট দিয়ে ফলের ভিতরে ঢুকে বীজ খেতে থাকে। এতে অনেক অপরিপক্ক ও পরিপক্ক ফল ঝরে যায়। এছাড়া, বীজ খাওয়ার দরুণ করাতের গুড়ার মত পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং বোঁটার কাছে জমে থাকে। এতে ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে এবং বাজার মূল্য হ্রাস পায়।

দমন ব্যবস্থা

বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আক্রান্ত ফল বাগান থেকে কুড়িয়ে মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। এ পোকা দমনের জন্য রিপকর্ড/সিমবুশ/সুমিসাইডিন/ ডেসিস প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ফলের মার্বেল অবস্থা থেকে শুরু করে ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে ফল সংগ্রহের অন্তত ১৫ দিন পূর্বে শেষ স্প্রে করতে হবে।

লিচুর মাইট বা মাকড়

লিচু গাছের পাতা, ফুল ও ফলে এর আক্রমণ দেখা যায়। আক্রান্ত পাতা কুঁকড়িয়ে যায় এবং এর নিচের দিকে লাল মখমলের মত হয়ে যায় এবং দুর্বল হয়ে মরে যায়। আক্রান্ত ডালে ফুল, ফল বা নতুন পাতা হয় না এবং আক্রান্ত ফুলে ফল হয় না।

মাইট আক্রান্ত লিচুর পাতা

দমন ব্যবস্থা

ফল সংগ্রহের সময় মাকড় আক্রান্ত পাতা ডালসহ ভেঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। মাকড় নাশক ভারটিম্যাক প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি পরিমাণ মিশিয়ে নতুন পাতায় ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বাদুর

লিচুর প্রধান শত্রু বাদুর। এরা পরিপক্ক ফলে আক্রমণ করে। ফল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অবস্থায় এক রাতের অসাবধানতায় এরা সমস্ত ফল বিনষ্ট করে ফেলতে পারে। মেঘলা রাতে বাদুরের উপদ্রব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।

দমন ব্যবস্থা

বাদুর তাড়ানোর জন্য রাতে পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত গাছ জালের সাহায্যে ঢেকে দিয়েও বাদুরের আক্রমণ রোধ করা যায়। বাগানে গাছের উপর দিয়ে শক্ত ও চিকন সুতা বা তার টাঙ্গিয়ে রাখলে বাদুরের চলাচল বাঁধাগ্রস্ত হয়।

নারিকেল

নারিকেলসহ গাছ

নারিকেল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল। ব্যবহার বৈচিত্র্যে এটি একটি অতুলনীয় উদ্ভিদ। নারিকেল গাছের প্রতিটি অঙ্গই কোন না কোন কাজে লাগে। খাদ্য-পানীয় থেকে শুরু করে গৃহ নির্মাণের সরঞ্জাম, পশু খাদ্য ইত্যাদি উপকরণ নারিকেল গাছ থেকে পাওয়া যায়। এজন্য নারিকেল গাছকে স্বর্গীয় বৃক্ষ বলা হয়।

বাংলাদেশের সব জেলাতেই নারিকেল জন্মায়। তবে উপকূলীয় জেলাসমূহে এর উৎপাদন বেশি। বাংলাদেশে বর্তমানে নারিকেলের বার্ষিক উৎপদান ৩ লক্ষ ৮১ হাজার টন। বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট নারিকেলের ৩৫-৪০% ডাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের শাঁসে স্নেহ জাতীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে। ডাবের পানিতে যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ রয়েছে। খাবার স্যালাইনের বিকল্প হিসেবে ডাবের পানি অত্যন্ত কার্যকরী।

নারিকেলের জাত

বারি নারিকেল-১

বারি নারিকেল-১

দেশীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতটি নির্বাচন করা হয়। নারিকেলের জাত হিসেবে 'বারি নারিকেল-১' বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে অনুমোদিত হয়। গাছ মধ্যম আকৃতির এবং সারা বছর ফল ধরে। পূর্ণ বয়স্ক প্রতিটি গাছে ফলের সংখ্যা ৬৫-৭৫টি। ফল ডিম্বাকার এবং পরিপক্ক ফলের ওজন ১২০০-১৩০০ গ্রাম। প্রতিটি নারিকেলের খোসার ওজন ৪০০-৫০০ গ্রাম। পানির পরিমাণ ২৭০-২৯০ মিলি। শাঁসের ওজন ৩৭০-৩৯০ গ্রাম এবং শাঁসের পুরুত্ব ৯-১১ মিমি। তেলের পরিমাণ ৫৫-৬০%। এ জাতটি কাণ্ড ঝরা রোগ সহনশীল। জাতটি দেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।

বারি নারিকেল-২

বারি নারিকেল-২

বিদেশ থেকে প্রবর্তিত 'বারি নারিকেল-২' জাতটি বাংলাদেশে ১৯৯৭ সালে অনুমোদিত হয়। নারিকেলের এটি একটি উচ্চ ফলনশীল জাত যা সারা বছর ফল দেয়। পূর্ণ বয়স্ক গাছে গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৬৫-৭৫টি। ফলের আকৃতি প্রায় ডিম্বাকার। প্রতিটি ফলের ওজন ১.৫-১.৭ কেজি ও পানির পরিমাণ ৩৩০-৩৪৫ মিলি। ফলে শাঁসের পুরুত্ব ১০-১২ মিমি। তেলের পরিমাণ ৫০-৫৫%। পাতার দাগ রোগ সহনশীল। বাংলাদেশের সর্বত্রই চাষের উপযোগী। তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য এ জাত বেশি উপযোগী।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: নারিকেল গাছের জন্য নিকাশযুক্ত দোআঁশ থেকে বেলে দোআঁশ মাটি উত্তম।

রোপণের সময়: মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-আশ্বিন (জুন থেকে সেপ্টেম্বর) মাস।

রোপণের দূরত্ব: ৬ × ৬ মিটার হিসেবে হেক্টরপ্রতি ২৭৮টি চারার প্রয়োজন হয়।

গর্তের পরিমাপ: ১ × ১ × ১ মিটার।

সারের পরিমাণ: নিম্নরূপ হারে গর্তে সার প্রয়োগ করতে হয়

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গর্ত
টিএসপি	২৫০ গ্রাম
এমওপি	৪০০ গ্রাম
গোবর	২০-৩০ কেজি
জিংক সালফেট	১০০ গ্রাম
বরিক এসিড	৫০ গ্রাম

চারা রোপণ ও পরিচর্যা: গর্তের মাঝখানে নারিকেল চারা এমনভাবে রোপণ করতে হবে যাতে নারিকেলের খোসা সংলগ্ন চারার গোড়ার অংশ মাটির উপরে থাকে। চারা রোপণের সময় মাটি নিচের দিকে ভালভাবে চাপ দিতে হয় যাতে চারাটি শক্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। রোপণের পর চারায় খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং পানি দিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: নারিকেল গাছে প্রচুর সারের প্রয়োজন হয়। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হয়। অন্যান্য সারের তুলনায় নারিকেল গাছে পটাশ জাতীয় সারের মাত্রা বেশি লাগে। এ সারের অভাবে ফল দেরিতে আসে, ফুল ঝরে যায় ও রোগের প্রকোপ বাড়ে। প্রতি বছর নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০ এর উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	১০	১৫	২০	২৫	৩০	৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২০০	৪০০	৮০০	১০০০	১২০০	১৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	১০০	২০০	৪০০	৫০০	৬০০	৭৫০
এমওপি(গ্রাম)	৪০০	৮০০	১৫০০	২০০০	২৫০০	৩০০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩৫০	৪০০	৫০০
জিংক সালফেট(গ্রাম)	৪০	৬০	৮০	১০০	১৫০	২০০
বরিক এসিড (গ্রাম)	১০	১৫	২০	৩০	৪০	৫০

দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তিতে অর্ধেক সার মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) মাসে এবং দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকি অর্ধেক সার মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে গাছের গোড়া থেকে চতুর্দিকে ১.০ মিটার জায়গা বাদ দিয়ে ১.০-২.৫ মিটার দূর পর্যন্ত মাটিতে ২০ -৩০ সেমি গভীরে প্রয়োগ করতে হবে। সার দেয়ার পর মাটি কুপিয়ে দিতে হবে। এ সময় মাটিতে রস কম থাকলে অবশ্যই সেচ দেয়া প্রয়োজন। বেশি বৃষ্টিপাত বা বেশি শুষ্কতার সময় সার প্রয়োগ ঠিক হবে না।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: নারিকেল ফসলের উপর সেচ ও নিষ্কাশনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষালব্ধ ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে সঠিকভাবে সেচ দিলে ফলন ৭৫% পর্যন্ত বেড়ে যায়। শুষ্ক মৌসুমে ১০-১৫ দিন পর পর এবং গাছে সার প্রয়োগের পর পানি সেচ দিতে হবে। বেসিন এবং প্লাবন এ দুই পদ্ধতির সাহায্যে সেচ প্রদান করা যায়। তবে প্লাবন পদ্ধতিতে ফলন ভাল হয়। বর্ষা মৌসুমে গাছের গোড়ায় যেন পানি দাঁড়াতে না পারে তার জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা দরকার।

গাছ পরিষ্কার করা বা ঝুড়ানো: নারিকেল গাছের তাজা পাতা কাটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। গাছের পাতা হলুদ হয়ে শুকিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ঝরে পড়বে। তবে গাছের মাথায় অতিরিক্ত ময়লা-আবর্জনা জমলে বা গণ্ডার পোকায় আক্রান্ত হলে তা অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। আমাদের দেশে নারিকেল উৎপাদিত এলাকায় বছরে একবার নারিকেল গাছ পরিষ্কার করার প্রচলন রয়েছে এবং অনেকেই তা আবশ্যক মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে অনভিজ্ঞ লোক দ্বারা গাছ পরিষ্কার করা হলে তা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ফল সংগ্রহ: ফুল ফোটার ১১-১২ মাস পর ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ডাব হিসেবে খাওয়ার জন্য ৫-৭ মাস বয়সী ফল সংগ্রহ করা হয়। সারা বছরই কম বেশি নারিকেল সংগ্রহ করা যায়। তবে বছরে দু'বার (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ) এবং (ভাদ্র-কার্তিক) মাসে বেশির ভাগ গাছ থেকে নারিকেল সংগ্রহ করা হয়। নারিকেল পরিপক্ক হলে বাদামী রং ধারণ করে এবং ঝাঁকি দিলে পানি নড়ে।

অন্যান্য পরিচর্যা

বাড রট/কুঁড়ি পচা

ফাইটোফথোরা নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে কচি পাতা প্রথমে বিবর্ণ হয়ে যায় ওপরে বাদামী বর্ণ ধারণ করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে ভিতর থেকে বাইরের দিকে বয়স্ক পাতা একের পর এক আক্রান্ত হতে থাকে। আক্রান্ত পাতা আস্তে আস্তে মারা যায় ও এক সময় কেন্দ্রস্থলের সকল পাতার বোঁটা আলগা হয়ে ঝুলে পড়ে। এ অবস্থা গাছটিকে কেন্দ্রস্থলে পাতাশূণ্য মনে হয়।

কুঁড়ি পচা রোগাক্রান্ত নারিকেল গাছ

প্রতিকার

রোগের প্রাথমিক অবস্থায় প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ গ্রাম সিকিউর মিশিয়ে কুঁড়ির গোড়ায় স্প্রে করলে সুফল পাওয়া যায়। এ রোগে আক্রান্ত মৃত প্রায় গাছকে কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ফল পচা রোগ

এ রোগের কারণে অপরিপক্ক বা কচি ফল পচে যায়। রোগের আক্রমণের ফলে গোড়ার দিক বিবর্ণ হয়ে যায়। পরবর্তী সময় বাদামী রং ধারণ করে এবং ফলের গায়ে সংক্রমিত স্থানে ছত্রাকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

প্রতিকার

প্রতিলিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ইন্ডোফিল এম-৪৫ বা ম্যানকোজেব মিশিয়ে আক্রান্ত ফলে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। রোগের আক্রমণ রোধ করতে হলে গাছ পরিষ্কার রাখতে হবে।

পাতার ব্লাইট/দাগ পড়া

এ রোগের আক্রমণে পাতায় ধুসর বাদামী বর্ণের কিনারাসহ হলুদ বাদামী বর্ণের দাগ দেখা যায়। দাগগুলো ডিম্বাকার ও এক সেমি লম্বা। পরবর্তী সময়ে দাগগুলো ধূসর বর্ণের হয় ও পাতার শিরার সমান্তরাল প্রসারিত হতে থাকে এবং সবশেষে সব দাগগুলো একত্রিত হয়ে পুরো পাতাটাই ছেয়ে ফেলে। চারা এবং ছোট গাছ এ রোগের প্রতি বেশি সংবেদনশীল।

প্রতিকার

পরিমিত সার প্রয়োগ করলেও যথা সময়ে সেচ এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে রোগের আক্রমণ কম হয়। আক্রান্ত গাছে অটোস্টিন/কার্বেন্ডাজিম প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

রস ঝরা/স্টেম ব্লিডিং

গাছের আক্রান্ত অংশ দিয়ে লালচে বাদামী বর্ণের রস নির্গত হয়। যে স্থান দিয়ে রস গড়িয়ে নামে সে স্থানে রস ঝরার দাগ শুকিয়ে কালো হয়ে যায়। সংক্রমণ স্থানের বাকলও শুকিয়ে কালো হয়ে যায় এবং ভিতরে গভীর গর্তের সৃষ্টি করে।

প্রতিকার

এ রোগে আক্রান্ত হলে আক্রান্ত অংশ ভালভাবে ছুরি দিয়ে চেঁছে তুলে ফেলে বোর্দো পেস্টের প্রলেপ লাগিয়ে দিতে হবে। গাছে গর্ত হয়ে গেলে পিচ বা সিমেন্ট দ্বারা গর্ত পূরণ করে দিতে হবে।

গণ্ডার পোকা

পূর্ণ বয়স্ক পোকা গাছের মাথার পাতার কচি অগ্রভাগ ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে এবং কচি নরম শাঁস খেয়ে ফেলে। আক্রান্ত গাছের নতুন পাতা যখন বড় হয় তখন পাতার আগা কাঁচি দিয়ে কাটার মত দেখায়। কোন কোন সময় পাতার মধ্য শিরাটিও কাটা পড়ে যায়। ফলে পাতাটি ভেঙ্গে পড়ে। আক্রমণ তীব্র হলে নতুন পাতা বের হতে পারে না। এতে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যায় এবং এক পর্যায়ে গাছ মারা যায়। গাছের নিচে বা আশে পাশে গোবরের ঢিবি থাকলে এ পোকা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার

আক্রান্ত গাছের ছিদ্র পথে লোহার শিক ঢুকিয়ে সহজেই পোকা বের করা যায়। ছিদ্র পথে সিরিঞ্জ দিয়ে কীটনাশক প্রবেশ করালে পোকা মারা যাবে। এরপর ছিদ্রটি পুডিং বা কাদা মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। এ পোকাগুলো পচা আবর্জনা, গোবর, মরা কাঠের গুঁড়িতে প্রজনন ঘটায় ও ডিম পাড়ে। তাই এ সকল প্রজননস্থল ধ্বংস করতে হবে।

বন্ধ্যা বা চিটা নারিকেল সৃষ্টি হওয়া

অনেক সময় নারিকেল গাছে বন্ধ্যা বা শাঁসবিহীন ফল উৎপাদিত হয়। বন্ধ্যা ফলের বাইরের খোসা ও খোল স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠে কিন্তু ভিতরের পানি বা শাঁস থাকে না এবং কোন ভ্রূণ থাকে না। কখনও শুধু পানি থাকে কিন্তু শাঁস থাকে না। আবার কখনও আংশিক শাঁস থাকে কিন্তু পানি থাকে না। একে চিটা নারিকেল বলা হয়।

প্রতিকার

বরিক এসিড (৫০ গ্রাম/গাছ) ও এমোনিয়াম মলিবডেট (১০ গ্রাম/গাছ) গাছে প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায়। সুষম সার ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়।

নারিকেলের মাকড় দমন পদ্ধতি

প্রথমধাপ: আক্রান্ত গাছের ২ থেকে ৬ মাস বয়সের সকল কচি ডাব কেটে নামিয়ে গাছ তলাতেই আগুনে ঝলসাতে হবে (ভাদ্র-আশ্বিন, মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর মাস)।

দ্বিতীয়ধাপ: ডাব নামানোর পর ঐ সব গাছে যে কোন মাকড় নাশক, যেমন ওমাইট-৫৭ ইস' ১.৫ মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছের কচি পাতা সহ, কাঁদি সংলগ্ন এলাকায় ভাল করে স্প্রে করতে হবে। এই সঙ্গে আশে-পাশের কম বয়সি গাছের কচি পাতায় একইভাবে মাকড়নাশক স্প্রে করতে হবে (ভাদ্র-আশ্বিন, মধ্য অক্টোবর থেকে মধ্য নভেম্বর মাস)।

তৃতীয়ধাপ: প্রথমবার স্প্রে করার পর গাছে নতুন ডাবের বয়স দু'মাস হলে, পূর্বেরমতো একইভাবে একই মাত্রায় মাকড়নাশক স্প্রে করতে হবে। একই সঙ্গে নবীন গাছেও পূর্বের মত মাকড়নাশক প্রয়োগ করতে হবে (ফাল্গুন-চৈত্র, মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য মার্চ মাস)।

কমলা

লেবুজাতীয় ফলের মধ্যে বাংলাদেশে কমলা সবচেয়ে জনপ্রিয়। এটি সুমিষ্ট, সুগন্ধযুক্ত ও ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪২৭ হেক্টর জমিতে কমলার চাষ হয় এবং এর মোট উৎপাদন ৩৩৭২ টন। সিলেট, মৌলভীবাজার, পঞ্চগড় ও পার্বত্য জেলাসমূহে কমলা ভাল জন্মে।

কমলার জাত

বারি কমলা-১

'বারি কমলা-১' জাতটি স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ১৯৯৬ সালে চাষের জন্য অনুমোদন করা হয়।

'বারি কমলা-১' মাঝারী আকৃতির খাড়া গাছ। পাতা মাঝারী, বল্লাকৃতির। পাতার বোঁটার সাথে ক্ষুদ্র উইং থাকে। এটি একটি নিয়মিত আগাম ফল প্রদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত (গাছপ্রতি ৩০০-৪০০টি ফল ধরে)। ফল বড়, ওজন ১৮০-২০০ গ্রাম ও প্রায় গোলাকৃতির হয়। পাকার পর হলদে রং ধারণ করে। ফলের খোসা ঢিলা, ফল রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ১০.২% এবং এসিড ১.১৯%)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড় জেলায় চাষোপযোগী।

বারি কমলা-১

বারি কমলা-২

বারি কমলা-২

বাংলাদেশের ফলের ক্ষেত্রে এটি একটি নতুন সংযোজন। এ কমলা গাছ মধ্যম আকৃতির এবং প্রতিবছর নিয়মিত ফল ধরে। ফল ৭-১২ সেমি আকৃতির প্রায় গোলাকার এবং ফলের গড় ওজন ৩৮ গ্রাম। সম্পূর্ণ পাকা অবস্থায় ফল ও ফলের শাঁস গাড় হলুদ রঙের হয়ে থাকে। ফলের খোসা ঢিলা, শাঁস রসালো ও খুব মিষ্টি (টিএসএস ১২%)। বীজ খুব ছোট আকৃতির। এ জাতের কমলা গাছে উল্লেখযোগ্য কোন রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হয় না।

বারি কমলা-৩

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছটির পাতা তুলনামূলকভাবে বড় ও ঝোপালো। ফল গোলাকার ও বড় (গড় ওজন ১৭০ গ্রাম), দেখতে উজ্জ্বল কমলা বর্ণের। ফল পাকার পর হলুদ থেকে গাঢ় কমলা রং ধারণ করে। ফল সাধারণত এককভাবে ধরে। ফলের খোসা ঢিলা, শাঁস রসালো ও মিষ্টি (টিএসএস ১১.৫%)। ফলের অভ্যন্তরে ১০-১১টি খণ্ড বিদ্যমান এবং খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৭৯.৮% ।

বারি কমলা-৩

উৎপাদন প্রযুক্তি

চারা উৎপাদন: যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতেই কমলার বংশ বিস্তার করা যায়। কমলার বীজ থেকে চারা উৎপাদন করা যেতে পারে। কমলার বীজ থেকে একাধিক চারা পাওয়া যায়, যার মধ্যে একটি যৌন ও বাকিগুলো অযৌন। তুলনামূলকভাবে সতেজ ও মোটা চারাসমূহ অযৌন চারা বা নিউসেলার চারা হিসেবে পরিচিত। গুটি কলম, চোখ

কলম ও জোড় কলম এর মাধ্যমে অযৌন চারা উৎপাদন করা যায়। কমলা উৎপাদনের জন্য রোগ প্রতিরোধী আদিজোড়ের উপর কলমকৃত অযৌন চারা উত্তম।

জমি তৈরি: জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। সমতল ভূমিতে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে কোদালের সাহায্যে জমি তৈরি করতে হবে। জমি তৈরির পর উভয় দিকে ৪-৫ মিটার দূরত্বে ৬০ × ৬০ × ৬০ সেমি আকারে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের মাটি তুলে পাশে রেখে দিতে হবে। বর্ষার পূর্বে গর্ত মাটি দিয়ে ভর্তি করে রাখতে হবে। কমলা চাষের নির্বাচিত জমি পাহাড়ি হলে সেখানে ৩০-৫০ মিটার দূরত্বে ২-৪টি বড় গাছ রাখা যেতে পারে। তবে বড় গাছ কাটলে শিকড়সহ তুলে ফেলতে হবে। তারপর পাহাড়ের ঢাল অনুসারে নকশা তৈরি করে নিতে হবে।

মাদা তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৪-৫ মিটার দূরত্বে ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি × ৭৫ সেমি মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫ কেজি পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি এবং ২৫০ গ্রাম চুন গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা রোপণ পদ্ধতি ও সময়: সমতল ভূমিতে বর্গাকার কিংবা ষড়ভুজাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে কলম রোপণ করতে হবে। চারা কলম রোপণের পর হালকা ও অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল। বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ বৈশাখ (মে-জুন) মাস কমলার চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে সেচের ব্যবস্থা থাকলে যে কোন মৌসুমে কমলার চারা লাগানো যায়।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা: সুস্থ সতেজ ১.০-১.৫ বছর বয়সের চারা/কলম সংগ্রহ করে গর্তের মাঝখানে এমনভাবে রোপণ করতে হবে যেন চারার গোড়ার মাটির বলটি ভেঙ্গে না যায়। চারা রোপণের পর গাছের গোঁড়ার মাটি ভালভাবে চেপে দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের পর চারা যাতে হেলে না পড়ে সে জন্য শক্ত খুটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মতো, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	১০	২০০	১০০	১৫০
৩-৪	১৫	৩০০	১৫০	২০০
৫-১০	২০	৫০০	৪০০	৩০০
১০ এর অধিক	৩০	৬৫০	৫০০	৫০০

উপরোল্লিখিত সারের অর্ধেক ফল সংগ্রহের পর অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে এবং বাকি অর্ধেক ফল মার্বেল আকার ধারণ করার পর অর্থাৎ এপ্রিল মাসে প্রয়োগ করতে হবে। ফলবান গাছের ডালপালা যে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তার নিচের জমি কোদাল দিয়ে হালকা করে কুপিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত গাছের গোড়ার ৩০ সেমি এলাকায় কোন সক্রিয় শিকড় থাকে না, তাই সার প্রয়োগের সময় এই পরিমাণ স্থানে সার প্রয়োগ করা উচিত নয়।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: বয়স্ক গাছে খরা মৌসুমে ২-৩টি সেচ দিলে কমলার ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। ফলের বাড়ন্ত অবস্থায় সেচ দিলে ফলের আকার বড় ও রসযুক্ত হয়। গাছের গোড়ায় পানি জমলে মাটি বাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তাই অতিরিক্ত পানি নালার মাধ্যমে নিষ্কাশন করে দিতে হবে।

ডালপালা ছাঁটাইকরণ: কমলা গাছের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালগুলিতে ফল বেশি

ধরে। কাণ্ডের এক মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাই করার পর ডালের কাটা অংশে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে।

আগাছা দমন: আগাছা কমলা গাছের বেশ ক্ষতি করে। গাছের গোড়ায় যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। গাছের উপরে পরগাছা ও লতাজাতীয় আগাছা থাকলে তা দূর করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও সংগ্রহোত্তর পরিচর্যা: ফল ভালভাবে পাকার পর অর্থাৎ কমলা বর্ণ ধারণ করলে সংগ্রহ করতে হবে। এতে ফলের মিষ্টতা বৃদ্ধি পায়। গাছ হতে ফল সংগ্রহ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ফলগুলোতে যাতে আঘাত না লাগে। তাজা ফল হিমাগারে সংরক্ষণ করলে ১০° সে. তাপামাত্রায় ও ৮০-৯০% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় ২ মাস পর্যন্ত এবং ৫.৬° সে. তাপমাত্রায় ৩ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। তাজা ফল সংগ্রহের পর ১৩ শতাংশ তরল মোমের আবরণ দিয়ে সাধারণ তাপমাত্রায়ও ২৫ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

অন্যান্য পরিচর্যা

লিফ মাইনার পোকা

এটি লেবু জাতীয় ফসলের অন্যতম মারাত্মক শত্রু। সাধারণত গ্রীষ্ম ও শরৎকালে গাছে নতুন পাতা গজালে এ পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। এ পোকার কীড়াগুলো পাতার উপত্বকের ঠিক নিচের সবুজ অংশ খেয়ে আকা-বাঁকা সুড়ঙ্গের মত সৃষ্টি করে। পরবর্তী সময়ে পাতার কিনারার দিক মুড়ে পুত্তলীতে পরিণত হয়। আক্রমণের মাত্রা তীব্র হলে গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় ও বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে ঝরে পড়ে। আক্রান্ত পাতায় ক্যাঙ্কার রোগ হয়। গাছ দুর্বল হয়ে যায় ও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

লিফ মাইনার পোকা

প্রতিকার

- পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় লার্ভাসহ আক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ০.২৫ মিলি এডমায়ার ২০০ এমএল বা ২ মিলি কিনালাক্স ২৫ ইসি মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার কচি পাতায় স্প্রে করতে হবে।

ফলের মাছি পোকা

পূর্ণাঙ্গ পোকা আধা পাকা ফলের ভিতরে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে লার্ভা বা কীড়া বের হয়ে ফলের শাঁস খেতে থাকে। পরবর্তী সময়ে আক্রান্ত স্থানে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মে। আক্রান্ত ফল পচে যায় এবং খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে।

ফলের মাছি পোকা

প্রতিকার

আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে বা মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। ফল পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে ফল সংগ্রহ করতে হবে। সেক্স ফেরোমন ফাঁদ দ্বারা পূর্ণাঙ্গ পুরুষ পোকা মারা যেতে পারে। আগস্ট মাস থেকে ফল সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত বাগানে ১০ মিটার অন্তর এ ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে।

ড্যাম্পিং অফ

লেবুজাতীয় ফলের নার্সারির জন্য এটি একটি মারাত্মক রোগ। বীজ গজানোর পূর্বে বা পরে উভয় সময়েই এ রোগের আক্রমণ হতে পারে। এ রোগের আক্রমণে চারা গোড়ার দিকে পচে যায় এবং চারা মরে যায়। বর্ষা মৌসুমে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়।

ড্যাম্পিং অফ রোগে আক্রান্ত চারা

প্রতিকার

বীজতলায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচ দেয়া যাবে না এবং দ্রুত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। বীজতলায় ঘন করে চারা লাগানো যাবে না।

গ্রিনিং

কমলা ও মাল্টা জাতীয় গাছের গ্রিনিং একটি মারাত্মক ব্যাক্টেরিয়াজনিত রোগ। সাধারণত রোগাক্রান্ত গাছের পাতা দস্তার অভাবজনিত লক্ষণের ন্যায় হলদে ভাব ধারণ করে। পাতার শিরা দুর্বল হওয়া, পাতা কিছুটা কোঁকড়ানো ও পাতার সংখ্যা কমে আসা, গাছ ওপর থেকে নিচের দিকে মরতে থাকা ও ফলের সংখ্যা কমে যাওয়া হলো এ রোগের প্রধান লক্ষণ। এ রোগ সাইলিডবাগ নামক এক প্রকার পোকা দ্বারা সংক্রমিত হয়। রোগাক্রান্ত গাছ থেকে ডাল নিয়ে জোড় কলম, শাখা কলম বা গুটি কলম করলে নতুন গাছেও এ রোগ দেখা দেয়।

প্রতিকার

মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত প্রতি মাসে একবার সুমিথিয়ন ৫০ ইসি প্রয়োগ করে এ রোগ বিস্তারকারী সাইলিডবাগ দমন করতে হবে। আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। বাগানের সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে গাছকে সুস্থ ও সবল রাখতে হবে।

গামোসিস

ফাইটোফথোরা নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। রোগাক্রান্ত গাছের কাণ্ড ও ডাল বাদামী বর্ণ ধারণ করে। আক্রান্ত ডালে লম্বালম্বি ফাটল দেখা দেয় এবং ফাটল থেকে আঠা বের হতে থাকে। আক্রান্ত ডালের পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং ডাল উপর দিক থেকে মরতে থাকে। কাণ্ড বা ডালের সম্পূর্ণ বাকল রিং আকারে নষ্ট হয়ে গাছ মারা যায়। মাটিতে অতিরিক্ত পানি জমে গেলে এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। গাছের শিকড় ও গোড়ার বাকল ফেটে ক্ষতের সৃষ্টি হলে ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়ে এ রোগের জীবাণু প্রবেশ করে।

গামোসিস রোগাক্রান্ত কাণ্ড

প্রতিকার

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন আদিজোড়/রুট স্টক যেমন- রংপুর লাইম, রাফ লেমন, ক্লিওপেট্রা ম্যান্ডারিন, কাটা জামির প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে। পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করা এবং গাছকে সবল ও সতেজ রাখা। মাটি স্যাঁত স্যাঁতে হতে না দেয়া এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি সেচ না দেয়া। আক্রান্ত স্থান ছুরি দ্বারা চেছে বর্দোপেস্ট এর প্রলেপ দেয়া (১০০ গ্রাম তুঁতে ও ১০০ গ্রাম চুন আলাদা পাত্রে গুলিয়ে পরিমিত পানিতে মিশিয়ে বর্দোপেস্ট তৈরি করতে হবে)।

ক্যাঙ্কার

এটি একটি ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ। কমলা ও অন্যান্য লেবু জাতীয় ফলের কচি বাড়ন্ত কুঁড়ি, পাতা ও ফলে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়। আক্রান্ত পাতার উভয় পাশে খসখসে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষত অংশের চতুর্দিকে গোলাকার হলুদ কিনারা দেখা যায়। পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়ে এবং আক্রান্ত ডগা উপর দিক থেকে মরতে থাকে। ফলের উপর আক্রমণ বেশি হলে ফল ফেটে যায় ও ঝরে পড়ে। ঘন ঘন বৃষ্টি হলে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত বাতাস জনিত কারণে ও লিফ মাইনার পোকার আক্রমণে গাছের ফল ও পাতায় যে ক্ষতের সৃষ্টি হয় তার ভিতর দিয়ে জীবাণু প্রবেশ করে এ রোগের সৃষ্টি করে।

প্রতিকার

বৃষ্টির মৌসুম আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই বর্দোমিক্সার বা কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউপি অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রয়োগ করতে হবে এবং সমগ্র বর্ষা মৌসুমে প্রতি মাসে একবার উল্লিখিত ছত্রাকনাশকগুলোর যে কোন একটি স্প্রে করতে হবে। আক্রান্ত ফল ও পাতা কেটে ফেলতে হবে এবং বাগানে জমে থাকা আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। লিফ মাইনার নামক পোকা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে। যে অঞ্চলে বাতাস বেশি হয় সেখানকার বাগানের চারদিকে বাতাস প্রতিরোধক গাছ লাগাতে হবে।

ডাইব্যাক বা আগা মরা রোগ

কমলা গাছের জন্য এটি অত্যন্ত জটিল এবং মারাত্মক রোগ। বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। সাধারণত রোগাক্রান্ত দুর্বল গাছ এবং মাটিতে রস ও খাদ্যোপাদানের স্বল্পতার জন্য এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরে যায় ও আগা থেকে ডালপালা শুকিয়ে নিচের দিকে আসতে থাকে এবং আস্তে আস্তে পুরো গাছটিই মরে যায়।

ডাইব্যাক রোগাক্রান্ত গাছ

প্রতিকার

পরিচর্যার মাধ্যমে গাছকে সবল ও সতেজ রাখা যায়। মরা ডাল ২.৫ সেমি সবুজ অংশসহ কেটে ফেলা এবং কর্তিত অংশে বর্দোপেস্ট লাগাতে হবে। বছরে ২/১ বার গাছে কুপ্রাভিট ৫০ ডব্লিউপি অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করা প্রয়োজন।

ফলের খোসা মোটা ও রস কম

জাতগত বৈশিষ্ট্যের কারণে, দস্তা বা ফসফরাসের ঘাটতি হলে এবং পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই ফল সংগ্রহ করা হলে এ সমস্যা হয়।

প্রতিকার

সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম জিঙ্ক অক্সাইড অথবা ৫ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ৩-৪ বার পাতায় ও ফলে স্প্রে করতে হবে। অনুমোদিত জাতের চাষ করতে হবে।

লেবু

লেবু

লেবু বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও সমাদৃত ফল এবং দেশের সর্বত্রই এর চাষ হয়। বাংলাদেশে লেবুর মোট উৎপাদন প্রায় ৭০ হাজার টন। লেবু বাংলাদেশের সিলেট, পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও মৌলভীবাজারে বেশি জন্মে। এ ছাড়া ঢাকার ধামরাই ও মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া উপজেলায় প্রচুর পরিমাণে লেবু উৎপন্ন হয়। লেবু ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল।

লেবুর জাত

বারি লেবু-১ (এলাচী লেবু)

'বারি লেবু-১' জাতটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংগৃহীত ৩০টি জাতের মধ্য থেকে বাছাই করা হয়েছে। এ জাতের লেবু 'এলাচী মসলা' এর মত গন্ধযুক্ত বিধায় এর নাম এলাচী লেবু। এদেশে চাষাবাদের জন্য জাতটিকে ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়।

এলাচী লেবুর গাছ, পাতা ও ফল আকারে বড়। এলাচী লেবুর গাছে সময়মতো ও পরিমাণমত সার ও পানি দিলে বছরে ২ বার ফল দিতে পারে। ফল জুলাই-আগস্ট (মধ্য-আষাঢ় থেকে মধ্য-ভাদ্র) মাসে খাওয়ার উপযুক্ত হয়। একটি গাছে ১০০-১৫০টি ফল ধরে। ফল ডিম্বাকার। প্রতিটি ফলের ওজন ২৫০-২৭০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫ টন।

বারি লেবু-১

ত্বক অমসৃণ ও পুরু, প্রায় ০.৭ সেমি। ফলে বীজের সংখ্যা ১০০-১১০টি। ফলে রস ২৫%, রসে ৫.৩% এসিড এবং ৩২ মিলি গ্রাম/১০০ গ্রাম ভিটামিন রয়েছে। এলাচী লেবু বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদ করা সম্ভব। তবে পাহাড়ি বৃষ্টিবহুল এলাকায় ফলন বেশি হয়।

বারি লেবু-২

বারি লেবু-২

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে জাত মূল্যায়নের মাধ্যমে 'বারি লেবু-২' জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ১৯৯৭ সালে অনুমোদন দেয়া হয়। এটি প্রায় সারা বছর ফল উৎপাদনকারী উচ্চ ফলনশীল জাত।

পাতা ছোট আকৃতির ও সবুজ। নিয়মিত ফল ধরে। ফল প্রায় গোলাকৃতির হয়। টিএসএস ৭.৩০%। প্রতিটি ফলের ওজন ৭৫-৮৫ গ্রাম। ফলের আকার ৬ × ৫ সেমি, বহিরাবরণ মসৃণ, খোসার পুরুত্ব ০.৩০ সেমি এবং বীজের সংখ্যা ৪০-৫০টি। ফলের স্বাদ মাঝারী টক, রসের পরিমাণ খুব বেশি, ৩১-৩৪%। রসে ৭.২% এসিড এবং ৮৪ মিলি গ্রাম/১০০ গ্রাম ভিটামিন রয়েছে।

বীজের রং সাদাটে এবং লম্বা। প্রতি গাছে ১৮০-১৯০টি ফল ধরে। 'বারি লেবু-২' সমগ্র বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ১২ টন।

বারি লেবু-৩

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত লেবুর জার্মপ্লাজম মূল্যায়নের মাধ্যমে বাছাইকৃত জাত 'বারি লেবু-৩' নামে ১৯৯৭ সালে অনুমোদন দেয়া হয়। পাতা ছোট আকৃতির ও সবুজ। নিয়মিত ফল ধরে।

বারি লেবু-৩

ফল গোলাকার। ফলের গড় ওজন ৫০-৬০ গ্রাম। ফলের আকার মাঝারী (৫.৩ × ৫.২ সেমি), বহিরাবরণ খুবই মসৃণ, খোসার পুরুত্ব ০.৩০ সেমি এবং বীজের সংখ্যা ১৮-২২টি। ফলের স্বাদ হালকা টক, রসের পরিমাণ খুব বেশি (৩৭.৭%), রসে ৬.৮% এসিড ও ৬২ মিলি গ্রাম/১০০ গ্রাম ভিটামিন 'সি' রয়েছে। বীজের রং হালকা বাদামী থেকে সাদাটে।

বীজ লম্বাটে। সাত বছর বয়স্ক গাছে ২০০-২২০টি ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০ টন। এ জাতের লেবু বর্ষাকালে ভাল হয়। 'বারি লেবু-৩' জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষাবাদের জন্য উপযোগী।

বারি লেবু-৪

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের মধ্য থেকে বাছাই করে মূল্যায়নের মাধ্যমে 'বারিলেবু-৪' জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০১৭ সালে জাত হিসাবে অনুমোদন দেয়া হয়।

সারাবছর ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত । গাছ ঝোপালো স্বভাবের। পাতা মাঝারী, উপবৃত্তাকার, পত্রফলকের অগ্রভাগ ভোতা ও গাঢ় সবুজ বর্ণের। ফুল সাদা, ফল গোলাকার ও মাঝারী (প্রতি ফলের গড় ওজন ৮২ গ্রাম), ফল দেখতে হালকা সবুজ বর্ণের এবং ফল সাধারণত একক এবং গুচ্ছাকারে ধরে। ফলের অভ্যন্তরে ১২ টি খণ্ড বিদ্যমান, টিএসএস ৫.৩৫% এবং খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৭০%। ফলে ৩-৪ টি বীজ থাকে। এই জাতটি প্রায় ৮ থেকে ১০ দিন পর্যন্ত জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে। জাতটি সাইট্রাস জাতীয় ফলের অন্যতম প্রধান রোগ ক্যাঙ্কারসহ অন্যান্য রোগ ও পোকামাকড় সহিষ্ণু।

বারি লেবু-৪

বারি লেবু-৫

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম বাছাই ও মূল্যায়নের মাধ্যমে বারি লেবু-৫ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০১৮ সালে বাংলাদেশে চাষের জন্য জাত হিসাবে অনুমোদন করা হয়। বারি লেবু-৫ উচ্চ ফলনশীল, নিয়মিত ফলদানকারী কলম্বো লেবুর জাত। দ্রুতবর্ধনশীল, ঝোপালো স্বভাবের, মাঝারী থেকে অত্যাধিক শাখা সমৃদ্ধ । পাতা বড়, উপবৃত্তাকার, পত্রফলকের অগ্রভাগ সূঁচালো ও গাঢ় সবুজ বর্ণের। ফুল সাদা, ছোট, উভয়লিঙ্গি, পাঁচ (৫) পাপড়ি বিশিষ্ট। ফল ডিম্বাকৃতি, আকারে বড় (গড় ওজন ২৬৮ গ্রাম) ও লম্বাটে, ফলত্বক অসমান, বিশেষ সুগন্ধ যুক্ত, থোকাকারে ধরে। ফল দেখতে উজ্জ্বল ও সবুজ বর্ণের। এ জাতের লেবুর খোসাও ভক্ষণযোগ্য এবং তিতা বিহীন। খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৮২% এবং টিএসএস ৭%। প্রতিটি ফলে ১০ থেকে ৩৫ টি বীজ থাকে । বীজ সুচালো ও গোলাকার। কলম্বো লেবু বিদেশে রপ্তানিযোগ্য একটি সম্ভাবনাময় ফল।

বারি লেবু-৫

জারা লেবু

বারি জারা লেবু-১

বারি জারা লেবু-১ নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল **জাত**। স্হানীয়ভাবে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের মধ্য থেকে বাছাই করে মূল্যায়েনের মাধ্যমে বারি বাতাবিলেবু-৬ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং জাতটি বাংলাদেশে চাষ করার জন্য ২০১৮ সালে অনুমোদন করা হয় ।

বারি জারা লেবু-১

এই জাতটির গাছ দ্রুতবর্ধনশীল, ঝোপালো স্বভাবের মাঝারী থেকে অত্যাধিক শাখা সমৃদ্ধ বৃক্ষ। পাতা বড়, উপবৃত্তাকার, পত্রফলকের অগ্রভাগ গোলাকৃতি ও গাঢ় সবুজ বর্ণের। ফুল সাদা, ছোট, পুরুষ ও উভয়লিঙ্গিক, পাঁচ (৫) পাপড়ি বিশিষ্ট। ফুলে ৫ টি বৃত্যাংশ বিদ্যমান। ফল তুলনামূলকভাবে বড় (গড় ওজন ৮৮২ গ্রাম), লম্বাকৃতি ও একক ভাবে ধরে। ফল দেখতে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের। ফলত্বক অসমান ও অমসৃণ, বিশেষ সুগন্ধ যুক্ত। এ জাতের লেবুর খোসা পুরু ও ভক্ষণযোগ্য। ফলের অভ্যন্তরে ১২টি খণ্ড বিদ্যমান, খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৭০% এবং টিএসএস ৬.৭২%। ফলে বীজ বিদ্যমান। বীজ সুচালো ও গোলাকার। কলম্বো লেবু বিদেশে রপ্তানিযোগ্য একটি সম্ভাবনাময় ফল।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: লেবু হালকা দোআঁশ ও নিষ্কাশন সম্পন্ন মধ্যম অম্লীয় মাটিতে ভাল হয়।

মাদা তৈরি: চারা রোপণ করার ১৫-২০ দিন পূর্বে ২.৫ × ২.৫ বা ৩ × ৩ মিটার দূরত্বে ৬০ × ৬০ × ৬০ সেমি আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি ও ২০০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে। এই হিসেবে প্রতি হেক্টর জমিতে ১,১১১-১,৬০০টি চারা দরকার হয়।

রোপণ পদ্ধতি: লেবুর চারা সারি করে বা বর্গাকার প্রণালীতে লাগালে বাগানে আন্তঃপরিচর্যা ও ফল সংগ্রহ সহজ হয়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে আড়াআড়ি ভাবে লাইন বা সারি করে চারা লাগালে মাটি ক্ষয় কম হয়।

রোপণ সময়: মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময় তবে যদি সেচ সুবিধা থাকে তাহলে সারা বছরই চারা লাগানো যায়।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা: মাদা তৈরি করার ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। চারা গর্তের ঠিক মাঝখানে খাড়াভাবে লাগাতে হবে এবং চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হয়। তারপর চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং চারার গোড়ায় ঝাঝড়ি দিয়ে পানি দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি চারায় পৃথকভাবে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: চারা লাগানোর পর ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিতভাবে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

গাছের বয়স (বছর)	সারের নাম ও পরিমাণ			
	পচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	১৫	২০০	২০০	২০০
৩-৫	২০	৪০০	৩০০	৩০০
৬ এবং তদুর্ধ্ব	২৫	৫০০	৪০০	৪০০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে গাছের গোড়া হতে কিছু দূরে ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে ডিবলিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ), দ্বিতীয় কিস্তি মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে এবং তৃতীয় কিস্তি মাঘ-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

অঙ্গ ছাঁটাই: গাছের গোড়ার দিকে জল-শোষক শাখা বের হলেই কেটে ফেলতে হবে। এছাড়া, গাছের ভিতরের দিকে যে সব ডালাপালা সূর্যালোক পায় না সেসব দুর্বল ও রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখা নিয়মিত ছাঁটাই করে দিতে হবে। মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়। ছাঁটাই করার পর কর্তিত স্থানে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে যাতে ছত্রাক আক্রমণ করতে না পারে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: খরা মৌসুমে ২-৩ বার সেচ প্রয়োগ করা দরকার। জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সেজন্য নালা করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

লেবুর প্রজাপতি পোকা

এ পোকার কীড়া পাতা খেয়ে ফেলে। এজন্য ফলন ও গাছের বৃদ্ধি ব্যবহত হয়।

প্রতিকার

- ডিম ও কীড়াযুক্ত পাতা সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুঁতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- সুমিথিয়ন ৫০ ইসি/লিবাসিড ৫ ইসি ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

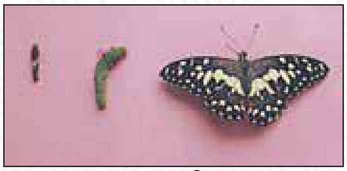

লেবুর প্রজাপতি পোকা

কাগজীলেবু

কাগজী লেবু (*Citrus aurantifolia*) একটি জনপ্রিয় লেবু জাতীয় ফল। এটি Rutaceae পরিবারভুক্ত একটি চিরহরিৎ দ্রুতবর্ধনশীল গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। স্বাদ, গন্ধ, পুষ্টিমান এবং ঔষধি গুণাগুণের ভিত্তিতে লেবু জাতীয় ফলের মধ্যে কাগজী লেবু অন্যতম। কাগজী লেবু প্রধানত ভিটামি সি, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন সমৃদ্ধ। গরমের দিনে তৃষ্ণা নিবারণের ক্ষেত্রে কাগজী লেবুর 'সরবত' অদ্বিতীয় পানীয়। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায় এর কাগজী লেবুর চাষ হলেও পাহাড়ী এলাকাসহ রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, যশোর ও চট্টগ্রাম জেলায় এই লেবু বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দেশে কাগজী লেবুর অত্যাধিক চাহিদা এবং এই লেবু সারা বছরব্যাপী উৎপাদিত হয় বিধায় কাগজী লেবু এদেশে একটি সম্ভাবনাময় ফসল হিসেবে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

কাগজী লেবুর জাত

বারি কাগজীলেবু-১

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের মধ্য থেকে বাছাই করে মূল্যায়েনের মাধ্যমে বারি কাগজীলেবু-১' জাতটি উদ্ভাবন করা এবং ২০১৮ সালে জাত হিসাবে অনুমোদন করা হয়।

বারি কাগজীলেবু-১

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ ঝোপালো স্বভাবের, পাতা ছোট, উপবৃত্তাকার, পত্রফলকের অগ্রভাগ সূঁচালো ও গাঢ় সবুজ বর্ণের। ফুল সাদা, ছোট, উভয়লিঙ্গিক, পাঁচ (৫) পাপড়ি বিশিষ্ট্য। ফল আকারে বড় (প্রতি ফলের গড় ওজন ৮২ গ্রাম), ও উপবৃত্তাকার। ফল দেখতে উজ্জ্বল সবুজ বর্ণের, সাধারণত গুচ্ছাকারে ধরে। ফল ফলের অভ্যন্তরে ১১-১২ টি খণ্ড বিদ্যমান, খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৫৭% এবং টিএসএস ৭.৩৫%। ভিটামিন সি : ৬৫ মিলি. গ্রাম/১০০ গ্রাম । ফলে ১৫-২২ টি পর্যন্ত বীজ বিদ্যমান। কাগজী লেবুর জাতটিতে প্রধান প্রধান রোগ ও পোকা-মাকড় এর আক্রমণ অত্যন্ত কম। সাইট্রাস জাতীয় ফলের অন্যতম প্রধান রোগ ক্যাংকার ও গামোসিস রোগ সহিষ্ণু ।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: কাগজী লেবু উষ্ণ ও অবগ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের ফসল। সাধারণত উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে কাগজী লেবু ভাল জন্মে। গভীর দোআঁশ মাটি কাগজী লেবু চাষের জন্য সর্বোত্তম। তবে কাগজী লেবু গাছ রোদ্রজ্জ্বল পরিবেশে ও সুনিষ্কাশ সম্পন্ন মধ্যম অম্লীয় মাটিতে ভাল হয়। এটি পাহাড়ী এলাকাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য। অতিরিক্ত আর্দ্র পরিবেশ কাগজী লেবুর জন্য ক্ষতিকর। সাধারণভাবে ২৫° থেকে ৩০° সে. তাপমাত্রায় এটির দৈহিক বৃদ্ধি সবচেয়ে ভাল হয়, ১৩° সে., এর নিচে এবং ৪০° সে. এর উপরে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ব্যাহত হয়।

জমি নির্বাচন ও তৈরি: রোদযুক্ত সুনিষ্কাশিত উঁচু জমি অথবা পুকুর, রাস্তা বা পাহাড়ের ঢাল লেবু চাষের জন্য উত্তম। বাণিজ্যিকভাবে চাষ করতে হলে জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভাল ভাবে পরিস্কার করে জমি তৈরি করতে হয়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে ঢালের অবস্থান বুঝে আগাছা পরিস্কার করার পর নির্দিষ্ট দুরত্বে গর্ত করে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ করতে হবে। এখানে সমতল ভূমির মতো জমি চাষ দেয়ার প্রয়োজন নেই। চারা রোপণ করার ১৫-২০ দিন পূর্বে ৩ মিটার × ৩ মিটার দূরত্বে ৮০ সে.মি. × ৮০ সে.মি. × ৮০ সে.মি. আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি গোবর অথবা জৈব সার, ৩০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ২০০ গ্রাম জিপসাম ও ৩০ গ্রাম বোরণ সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে। তবে মাটি অধিক অম্লীয় হলে হেক্টর প্রতি ১ টন অথবা গর্ত প্রতি ১.৫ কেজি ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে। উল্লিখিত রোপণ দূরত্ব হিসাবে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ১১০০ টি চারা দরকার।

রোপণ পদ্ধতি ও রোপণ সময়: কাগজী লেবুর চারা সারি করে বা বর্গাকার প্রণালীতে লাগালে বাগানে আন্তঃপরিচর্যা ও ফল সংগ্রহ সহজ হয়। পাহাড়ী ঢালু জমিতে ঢালের আড়াআড়ি সারি করে চারা লাগালে মাটি ক্ষয় কম হয়। জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময় তবে সেচ সুবিধা থাকেলে সারা বছর চারা লাগানো যায়।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা: মাদা তৈরি করার ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। চারা গর্তের ঠিক মাঝখানে খাড়াভাবে লাগাতে হবে এবং চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হয়। তারপর চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং চারার গোড়ায় ঝাঝড়ি দিয়ে পানি দিতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটি চারায় পৃথকভাবে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: চারা লাগানোর পর ভাল ফলন পেতে হলে নিয়মিতভাবে সময়মতো সার প্রয়োগ করতে হবে। নিম্নে বয়স অনুপাতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হল।

গাছেরবয়স (বছর) সারের নাম ও পরিমাণ

গাছের বয়স (বছর)	সারের নাম ও পরিমাণ						
	পচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)	জিংক সালফেট (গ্রাম)	বোরন সার (গ্রাম)
১-২	১৫	২০০	২০০	২০০	২০	৫	৫
৩-৫	২০	৪০০	৩০০	৩০০	৫০	৮	১০
৬ এবং তদুর্ধ	২৫	৫০০	৪০০	৪০০	৭০	১০	১৫

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে গাছের গোড়া হতে ৬০ সেমি দূরে ছিটিয়ে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ডিবলিং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথম কিস্তি মাঘ-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে যখন ফল ধরা শুরু হয়, দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে বৈশাখ থেকে জ্যৈষ্ঠ (মে-জুন) মাসে, এবং তৃতীয় কিস্তি মধ্য ভাদ্র থেকে মধ্য কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর পরই একটু হালকা পানি সেচ দিতে হবে যাতে করে সার মাটির সাথে মিশে যেতে পারে।

আগাছা দমন: গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিষ্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে ১ মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

পানি ও সেচ নিষ্কাশন: চারা রোপণের পর ঝরণা দ্বারা বেশ কিছু দিন পর্যন্ত পানি সেচ দিতে হবে। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে কাগজী লেবু বাগানে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য বৃষ্টি ও সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: গাছের গোড়ার দিকে জল-শোষক শাখা বের হলেই কেটে ফেলতে হবে। এছাড়া গাছের ভিতরের দিকে যে সব ডালাপালা সুর্যালোক পায়না সেসব দুর্বল ও রোগাক্রান্ত শাখা প্রশাখা নিয়মিত ছাটাই করে দিতে হবে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়। ছাঁটাই করার পর কর্তিত স্থানে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে যাতে ছত্রাক আক্রমণ করতে না পারে।

অনিষ্টকারী পোকামাকড় - রোগ বালাই ও দমন ব্যবস্থা

পাতার সুড়ঙ্গ পোকা (সাইট্রাস লিফমাইনার)

এ পোকার ক্ষুদ্র কীড়া পাতার উপত্বকের ঠিক নিচে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ তৈরি করে পাতায় ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। এতে করে পাতা কুঁকড়ে বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে ঝরে যায় এবং গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এ পোকা ক্যাংকার রোগ ছড়ায়।

দমন ব্যবস্থা: গাছে নতুন পাতা গজানোর সময় অথবা যখনই এ পোকার আক্রমণ দেখা যাবে তখন ইমিটাফ ২০ এসএল প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি. লি. হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

সাইলিড বাগ: সাইলিড বাগ সকল প্রকার লেবু জাতীয় ফসলের একটি প্রধান সমস্যা। পূর্ণবয়স্ক সাইলিড বাগ সাধারণত ৪৫° কোণে পাতার উপর বসে পাতার রস চুষে খায় এবং পাতার উল্টো পাশে ডিম পাড়ে। সাইলিড বাগ দ্বারা প্রধানত লেবু জাতীয় ফসলের গ্রীনিং রোগ ছড়ায়।

দমন ব্যবস্থা: এ পোকার আক্রমণ দেখা গেলে সাথে সাথেই ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের যেকান কীটনাশক যেমন ইমিটাফ ২০ এসএল প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি. লি. হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

লেবুর প্রজাপতি পোকা: এ পোকার কীড়া পাতা খেয়ে ফেলে। এজন্য ফলন ও গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

দমন ব্যবস্থা: ডিম ও কীড়াযুক্ত পাতা সংগ্রহ করে মাটির নিচে পুঁতে বা পুড়ে ফেলতে হবে। সুমিথিয়ন ৫০ ইসি অথবা লিবাসিড ৫ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

পাতা মোড়ানো পোকা: আগস্ট থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত এ পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়। বয়স্ক ও চারা উভয় প্রকার গাছই এ পোকা দ্বারা আক্রান্ত হয়। পোকার কীড়াগুলি চারা ও বয়স্ক গাছের কঁচি পাতা মুড়িয়ে তার ভিতর অবস্থান করে এবং পাতা খেয়ে ক্ষতি সাধন করে।

দমন ব্যবস্থা: এ পোকার আক্রমণ বেশি হলে সুমিথিয়ন ৫০ ইসি. প্রতি লিটার পানিতে ১ মি.লি মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ১-২ বার গাছে স্প্রে করতে হবে। এছাড়া ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে প্রধানত গাছের নতুন কুঁড়ি এবং পাতায় জাব পোকার আক্রমণ দেখা যেতে পারে। এতে করে আক্রান্ত নতুন কুঁড়ি এবং পাতা কুঁকড়ে গিয়ে গাছের ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে আক্রমণ বেশি হলে ইমিটাফ ২০ এসএল ০.৫ মি. লি. হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

আগা মরা (ডাইব্যাক): আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরে যায় ও আগা থেকে ডালপালা শুকিয়ে নিচের দিকে আসতে থাকে এবং আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ গাছটিই মরে যায়।

প্রতিকার: পরিচর্যার মাধ্যমে গাছকে সবল ও সতেজ রাখতে হবে। আক্রান্ত ডালের ২.৫ সেমি সবুজ অংশসহ কেটে কর্তিত অংশে বর্দোপেস্ট লাগাতে হবে। আক্রান্ত গাছে বছরে দু'একবার কপার সমৃদ্ধ ছত্রাকনাশক যেমন কুপ্রাভিট-৫০ ডব্লিউ পি অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

গামোসিস: এ রোগের আক্রমণে গাছের কাণ্ড, ডাল বাদামি রং এর হয়ে যায় ও ডালে লম্বালম্বি ফাটল দেখা দেয় এবং ফাটল থেকে আঠা বা কস বের হতে থাকে।

প্রতিকার: আক্রান্ত ডাল কেটে ফেলে অথবা আক্রান্ত অংশ চেচে ফেলে আলকাতরা অথবা বর্দোপেস্ট (১০০ গ্রাম কপার সালফেট বা তুঁতে, ১০০ গ্রাম চুন ১ লিটার পানিতে গুলিয়ে তৈরি করতে হবে) লাগাতে হবে। পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে এবং সেচের পানি যাতে গাছের গোড়ায় জমে না থাকে ও গাছের গোড়ার বাকল স্পর্শ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ক্যাংকার: এ রোগের আক্রমণে কচি পাতা, শাখা ও ফলে ধূসর বা বাদামি রংয়ের গুটি বসন্তের মত দাগ পড়ে। লিফ মাইনার পোকার দ্বারা এ রোগ সংক্রমিত হয় এবং ঘন ঘন বৃষ্টি হলে এ রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার: আক্রান্ত ডগা ও শাখা ছাঁটাই করতে হবে এবং কাটা অংশে আলকাতরা অথবা বর্দোপেস্ট এর প্রলেপ দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন কুপ্রাভিট-৫০ ডব্লিউ পি অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর স্প্রে করতে হবে। এছাড়া যেহেতু লিফ মাইনার পোকার দ্বারা এ রোগ ছড়ায় সেহেতু ক্ষত সৃষ্টিকারী এই লিফ মাইনার পোকা দমন করার জন্য ইমিটাফ ২০ এসএল প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মি. লি. হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করে করতে হবে।

ফল সংগ্রহ ও সংগ্রোহত্তর পরিচর্যা

সারা বছরই কাগজী লেবু উৎপন্ন হয় তবে কাগজী লেবুর ফুল আসার প্রধান মৌসুম হল জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি মাস এবং তা থেকে এপ্রিল হতে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা হয়। আবার অনেক সময় জুন-জুলাই মাসেও কিছু ফুল আসে এবং তা থেকে সেপ্টেম্বর হতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। ফলের ত্বক তুলনামূলকভাবে মসৃণ ও ফলের রং গাঢ় সবুজ হতে কিছুটা হালকা হয়ে আসলে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ফল সংগ্রহ করার পর প্রথমে বাছাই এর মাধ্যমে ভাল ও ত্রুটিপূর্ণ (বাজারজাতকরণের অনুপযোগী) ফলগুলো আলাদা করা হয়। তারপর ভাল ফলগুলো গ্রেডিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সাইজ অনুপাতে ভাগ করে বাজারজাত করা হয়।

মিষ্টি লেবুর জাত

বারি মিষ্টি লেবু-১

মিষ্টি লেবু কমলা, মাল্টা ও বাতাবি লেবুর মতই একটি মিষ্টি পাল্পযুক্ত লেবু জাতীয় ফল। বিদেশে মিষ্টি লেবুর রস ফল প্রক্রিয়াজাত কারখানায় ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ‘বারি মিষ্টি লেবু-১’ নামে ২০১৩ সালে মিষ্টি লেবুর একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে।

বারি মিষ্টি লেবু-১

এ জাতের পাকা ফল দেখতে আকর্ষণীয় সবুজ এবং খেতে সুস্বাদু। বেশ রসাল এবং ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ। জাতটি নিয়মিত ফলদানকারী এবং উচ্চ ফলনশীল। গাছ খাটো, ছড়ানো ও অত্যধিক ঝোপালো।

মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র পর্যন্ত গাছে ফুল আসে এবং আশ্বিন কার্তিক মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল গোলাকার, মাঝারী আকৃতির (১৪০-১৫০ গ্রাম)। ফলের দৈর্ঘ্য ৮ সেমি এবং প্রস্থ ৭ সেমি। ফলের খোসা মধ্যম পুরু ও শাঁসের সাথে সংযুক্ত। শাঁস হলুদাভ, রসালো ও সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ৭.৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫-৬০%। গাছপ্রতি ৩০০-৫৮০টি ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫-৪০ টন। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী ও পঞ্চগড়সহ দেশের সব অঞ্চলের জন্য উপযোগী।

জলবায়ু ও মাটি: শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু মিষ্টি লেবু চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত মিষ্টি লেবুর ফলের গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলের স্বাদ উন্নত মানের হয়। আর্দ্র জলবায়ুতে রোগ ও ক্ষতিকর পোকার উপদ্রব বেশি হয়। মিষ্টি লেবু গাছ আলো পছন্দ করে এবং ছায়ায় গাছের বৃদ্ধি ও ফলের গুণগত মান কমে যায়। সব ধরনের মাটিতে জন্মালেও সুনিষ্কাশিত, উর্বর, মধ্যম থেকে হাল্কা দোআঁশ মাটি মিষ্টি লেবু চাষের জন্য উত্তম। মধ্যম অম্ল থেকে সামান্য ক্ষারীয় মাটিতে মিষ্টি লেবু জন্মে তবে ৪.০-৯.৫ অম্লতায় (P^H) ভাল জন্মে। মিষ্টি লেবু দীর্ঘমেয়াদী জলাবদ্ধতা মোটেও সহ্য করতে পারে না।

বংশ বিস্তার: কলমের মাধ্যমে মিষ্টি লেবুর বংশ বিস্তার করা হয়। পরিপক্ক ফলের বীজ সংগ্রহ করে কয়েক দিনের মধ্যেই নার্সারিতে স্থাপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। বীজের চারায় মাতৃ গাছের গুণাগুণ বজায় থাকে না বিধায় কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করাই উত্তম। কলমের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করলে মাতৃগুণাগুণও ঠিক থাকে ও দ্রুত ফল ধরে। এছাড়া রোগ প্রতিরোধী ও বলিষ্ঠ শিকড় সমৃদ্ধ আদিজোড়ের উপর কলম করার ফলে গাছের জীবনকাল ও ফলন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

জোড় কলম: গ্রাফটিং-এর জন্য প্রথমে রুটস্টক (আদিজোড়) উৎপাদন করতে হবে। রুটস্টক হিসেবে বাতাবিলেবু, রাফলেমন, কাটা জামির, রংপুর লাইম প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। অতঃপর কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ হতে সায়ন (উপজোড়) সংগ্রহ করে রুটস্টকের উপর স্থাপন করে মিষ্টি লেবুর গ্রাফটিং তৈরি করা হয়। রুটস্টক হিসেবে ১.০ হতে ১.৫ বছর বয়সের সুস্থ, সবল ও সোজাভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত চারা নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত মাতৃগাছ হতে সায়ন তৈরির জন্য দুটি চোখসহ ৫-৬ সেমি লম্বা ও ৮-৯ মাস বয়সের শাখা সংগ্রহ করতে হবে। মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে থেকে আগস্ট) মাস পর্যন্ত গ্রাফটিং করা যায়। ভিনিয়ার ও ক্লেফট গ্রাফটিং উভয় পদ্ধতিতেই মিষ্টি লেবুর কলম তৈরি করা যায়। সাধারণত কলম করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে রুটস্টক ও সায়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং সায়নের চোখ ফুটে

কুশি বের হয়। কলম হতে একাধিক শাখা বের হলে সুস্থ সবল ও সোজাভাবে বেড়ে উঠা ডালটি রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলতে হবে। আদিজোড় থেকে উৎপন্ন কুশি নিয়মিতভাবে অপসারণ করতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি: সারাদিন রোদ পড়ে এবং বৃষ্টির পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারী উঁচু জমি মিষ্টি লেবু চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত জমিটি পর্যায়ক্রমিক চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। জমি থেকে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং আশে পাশে উঁচু গাছ থাকলে তার ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়: সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভুজী পদ্ধতিতে এবং পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর পদ্ধতিতে চারা/কলম রোপণ করা হয়। সাধারণত মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে-আগস্ট) মাসের মধ্যে মিষ্টি লেবুর চারা লাগানো উত্তম। তবে পানি সেচ নিশ্চিত করা গেলে বছরের অন্যান্য সময়ও কলম লাগানো যেতে পারে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা: গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করতে হবে। রোপণের পরপর খুটি দিয়ে কলমটি খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমতো পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মত, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হলো।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিংক সালফেট (গ্রাম)	বরিক এসিড (গ্রাম)
১-২	১০-১২	২০০-৩০০	১০০-১৫০	১০০-১৫০	১০	১০
৩-৪	১২-১৫	৩০০-৪৫০	১৫০-২০০	১৫০-২০০	১৫	১২
৫-৭	১৫-১৮	৪৫০-৬০০	২০০-৩০০	২০০-২৫০	২০	১৫
৮-১০	১৮-২০	৬০০-৭০০	৩০০-৪৫০	২৫০-৩০০	২৫	১৮
১০ এর অধিক	২০-২৫	৭৫০	৫০০	৪৫০	৩০	২২

প্রতিবছর মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মার্চ), বর্ষার পূর্বে মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) এবং বর্ষার পর মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষার আগে ও পরে দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা ভালো।

আগাছা দমন ও মালচ প্রয়োগ: বর্ষার শেষে সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে বিভিন্ন লতাপাতা বা খড় দ্বারা বৃত্তাকারে মালচ করে দিলে আগাছা দমনসহ শুষ্ক মৌসুমে আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয়। সাধারণত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে সম্পূর্ণ বাগানে হালকা চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: ভাল ফলনের জন্য খরার সময় বা শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত সেচ দেয়া একান্ত দরকার। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সে জন্য দ্রুত পানি নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: মিষ্টি লেবু গাছের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানের পর ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালগুলিতে কম বেশি ধরে। কাণ্ডের ১ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাই করার পর ডালের কাটা অংশে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে। এছাড়া, পানি তেউড় বা Water sucker উৎপন্ন হওয়ামাত্র কেটে ফেলতে হবে। মরা, শুকনা এবং রোগ ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

ফল পাতলাকরণ ও ব্যাগিং: 'বারি মিষ্টি লেবু-১' এর গাছে প্রতিবছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে। সমস্ত ফল রাখা হলে ফল আকারে ছোট ও নিম্ন মানের হয়। এজন্য প্রতি পুষ্প মঞ্জরীতে সুস্থ ও সতেজ দেখে দু'টি করে ফল রেখে বাকিগুলো ছোট থাকা অবস্থায়ই (মার্বেল অবস্থা) ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বা দ্বিতীয় বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে।

গাছের বৃদ্ধির জন্য ১ম বছর ফল না রাখাই ভাল, দ্বিতীয় বছর অল্প সংখ্যক ফল রাখা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গাছের অবস্থা বিবেচনা করে ফল রাখতে হবে। ফলের বর্ণ সবুজ হওয়ায় পাখি ও পোকার আক্রমণ কম হয়। তবে পরিপক্কতার পূর্বে ব্যাগিং করলে অবাঞ্ছিত পোকামাকড়ের আক্রমণ রোধ করা যায়।

বাতাবিলেবু

ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ ফল বাতাবিলেবু বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাবনাময় ফসল। দেশের সব এলাকাতেই এর চাষ হয় তবে সিলেটে বেশি হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে বাতাবিলেবুর মোট উৎপাদন প্রায় ৬৫ হাজার মে. টন।

বাতাবিলেবুর গাছ

বাতাবিলেবুর জাত

বারি বাতাবিলেবু-১

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত বাতাবিলেবুর জার্মপ্লাজম মূল্যায়ন করে 'বারি বাতাবিলেবু-১' জাতটি ১৯৯৭ সালে অনুমোদন করা হয়। এ জাতের পাতা বড় আকৃতির গাঢ় সবুজ। নিয়মিত ফল ধরে। ফলের আকৃতি প্রায় গোলাকার (টিএসএস ৯.২০%)। ফলের ওজন ৯০০-১,১০০ গ্রাম। ফলের আকার মাঝারী। ফলের কোষ সংখ্যা ১৩-১৪টি। ভক্ষণযোগ্য অংশ ৪৫%। খোসার পুরুত্ব ২.০-২.৫ সেমি।

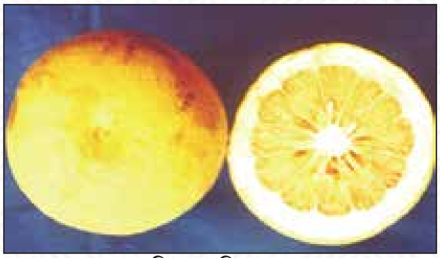

বারি বাতাবিলেবু-১

ফল সুস্বাদু ও সামান্য তিতা, বেশ রসালো, শাঁসের রং লালচে, মিষ্টতা মাঝারী। শাঁস বেশ নরম। পাকা ফলর রং হলুদ। বীজের রং বাদামী এবং আকৃতি চ্যাপ্টা। প্রতি গাছে ৪৫-৫৫টি ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৪-১৬ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি বাতাবিলেবু-২

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত বাতাবিলেবুর জার্মপ্লাজম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে একটি উন্নত জাত 'বারি বাতাবিলেবু-২' ১৯৯৭ সালে অনুমোদন করা হয়। গাছের আকৃতি ছাতার মতো। পাতা গাঢ় সবুজ, ডানাযুক্ত বৃত্তাকার। টিএসএস ১১.৩৫%। মোট এসিড ১.০৫%। ফলের ওজন ৭৫০-৭৮০ গ্রাম। ফলের আকার ১১.০০ × ১২.৩০ সেমি। ফলের কোষ সংখ্যা ১৩-১৫টি, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৪০% এবং খোসার পুরুত্ব ১.২-১.৪ সেমি। বীজের সংখ্যা ১১০-১২০টি। ফল সুস্বাদু, বেশ রসালো, শাঁসের রং লালচে এবং বেশ মিষ্টি। শাঁস নরম এবং পাকা ফলের রং হলুদ। বীজের রং বাদামী, আকৃতি চ্যাপ্টা। প্রতি গাছে ৪০-৫০টি ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১২-১৪ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি বাতাবিলেবু-২

বারি বাতাবিলেবু-৩

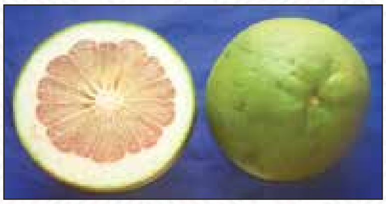

বারি বাতাবিলেবু-৩

অভ্যন্তরীণ জরিপের মাধ্যমে দেশের উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উন্নত জাত বারি 'বাতাবিলেবু-৩' ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়।

গাছের আকার মাঝারী, পাতা গাঢ় সবুজ ও হৃদপিণ্ডাকার ডানাযুক্ত। প্রতিবছর নিয়মিত ফল ধরে। ফল উপবৃত্তাকার ও মাঝারী ধরনের। ফলের ওজন ১,০০০-১,১৫০ গ্রাম। পাকা ফলের খোসা হলদে বর্ণের, পাতলা (১.২৫-১.৩০ সেমি পুরু) যা খুব সহজেই শাঁস থেকে ছাঁড়ানো যায়। প্রতি ফলে কোষের সংখ্যা ১৪-১৫টি।

ফলের শাঁস অত্যন্ত রসালো, নরম, মিষ্টি, সম্পূর্ণ তিতাবিহীন, গোলাপী বর্ণের এবং খেতে সুস্বাদু। টিএসএস (ব্রিক্সমান) ৮.৬% ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৫৫-৬০%, গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১০০-১১০টি, প্রতি ফলে বীজের সংখ্যা ৭০-৭৫টি। বীজ হালকা বর্ণের ও চ্যাপ্টা আকৃতির। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি বাতাবিলেবু-৪

বারি বাতাবিলেবু-৪

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি 'বারি বাতাবিলেবু-৪' নামে ২০০৪ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

গাছের আকৃতি ছাতার মতো। পাতা গাঢ় সবুজ, ডানাযুক্ত বৃত্তাকার। গাছে নিয়মিত ফল ধরে। ফলের আকৃতি গোলাকার, মাঝারী ধরনের। টিএসএস ১১.৬%। মোট এসিড ০.৬০%। ফলের ওজন ৮৫০-১,১০০ গ্রাম। ফলের কোষ সংখ্যা ১২-১৪টি।

ফল সুস্বাদু, বেশ রসালো, শাঁসের রং সাদা এবং বেশ মিষ্টি। কোন তিতাভাব নেই। পাকা ফলের রং হলুদাভ। প্রতিটি গাছে ৪০-৫০টি ফল ধরে। এটা একটি নাবী জাত। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-২০ টন। দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী।

বারি বাতাবিলেবু-৫

বারি বাতাবিলেবু-৫

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছটির পাতা তুলনামূলকভাবে অনেক বড় ও ঝোপালো। ফলের গোলাকার ও বড় (ফলের গড় ওজন ৮৭৫ গ্রাম)। ফল দেখতে উজ্জ্বল হলুদ বর্ণের এবং টিএসএস ৯.০৫%। ফল সাধারণত একক ভাবে ধরে। ফলের অভ্যন্তরে ১৩-১৪টি খণ্ড বিদ্যমান এবং খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৬৬.২৬%। আট বছর বয়সী প্রতিটি গাছে গড় ফলের সংখ্যা ১৮টি এবং ফলন ১৬.০৪ কেজি এবং ১০.০৩ টন/হেক্টর/বছর।

বারি বাতাবিলেবু-৬

বারি বাতাবিলেবু-৬

বারি বাতাবিলেবু-৬ নিয়মিত ফলদানকারী একটি উচ্চ ফলনশীল **জাত**। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের মধ্য থেকে বাছাই করে মূল্যায়নের মাধ্যমে বারি বাতাবিলেবু-৬ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং জাতটি বাংলাদেশে চাষ করার জন্য ২০১৮ সালে অনুমোদন করা হয়।

গাছ মাঝারী ও ছড়ানো স্বভাবের। এর পাতা বড় ও পাতার বোঁটা চওড়া পাখা সম্বলিত, পত্রফলকের অগ্রভাগ সূঁচালো ও গাঢ় সবুজ বর্ণের। ফুল দেখতে সাদা রঙের এবং এককভাবে ধারণ করে। ফল আহরণের সময় অক্টোবর থেকে নভেম্বর। ফল উপ-বৃত্তাকার, পাকা ফলের রং সবুজাভ হলুদ এবং ফলের গড় ওজন ১ কেজি। শাঁস আকর্ষণীয় লাল, খুব রসালো, নরম, সুস্বাদু ও সম্পূর্ণ তিতাবিহীন। ফলের কোষ খুব সহজে আলাদা করা যায়। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৭% ও টিএসএস ৮.৫%। বীজ সাধারণত লম্বাটে এবং বোটার দিকে সরু।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: সুনিষ্কাশিত গভীর, হালকা, দোআঁশ মাটি লেবু চাষের জন্য উত্তম। মধ্যম অম্লীয় মাটিতে বাতাবিলেবু ভাল জন্মে।

জমি নির্বাচন ও তৈরি: পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সম্পন্ন উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি বাতাবিলেবু চাষের জন্য উত্তম। জমি নির্বাচনের পর জমি চাষ দিয়ে আগাছামুক্ত করে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করা প্রয়োজন।

কলম তৈরি ও নির্বাচন: পার্শ্বকলম ও গুটি কলমের মাধ্যমে বাতাবিলেবুর কলম তৈরি করা যায়। সাধারণত ৮-১০ মাস বয়সের বাতাবিলেবুর চারা বাডিং ও গ্রাফটিংয়ের জন্য আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। রোপণের জন্য সোজা ও দ্রুত বৃদ্ধি সম্পন্ন কলম নির্বাচন করতে হবে।

রোপণের সময়: মধ্য জ্যৈষ্ঠ-মধ্য আশ্বিন (জুন-সেপ্টেম্বর) মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে অধিক বৃষ্টিপাতের সময় কলম রোপণ না করাই ভাল। সেচ সুবিধা থাকলে সারা বছরই বাতাবিলেবুর চারা/কলম রোপণ করা চলে।

গর্ত তৈরি: কলম রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৬ × ৬ মিটার দূরত্বে ৬০ × ৬০ × ৫০ সেমি আকারের গর্ত করে কয়েকদিন উন্মুক্ত অবস্থায় রেখে দিতে হয়। কলম রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্তপ্রতি ১৫-২০ কেজি পচা গোবর, ৩০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০-৩০০ গ্রাম এমওপি ও ২০০ গ্রাম জিপসাম সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

কলম রোপণ: গর্তে সার প্রয়োগের ১৫-২০ দিন পর গোড়ার মাটিসহ নির্ধারিত কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করা হয়। রোপণের পর হালকা পানি সেচ, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ

সার	গাছের বয়স			
	১-২ বছর	৩-৪ বছর	৫-১০ বছর	১০ বছরের উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	৭-১০	১০-১৫	২০-২৫	২৫-৩০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৭৫-২২৫	২৭০-৩০০	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০
টিএসপি (গ্রাম)	৮০-৯০	১৪০-১৭০	৪০০-৪৫০	৪৫০-৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৪০-১৬০	৪০০-৫০০	৫০০-৫৫০	৬০০-৬৮০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: সার একেবারে গাছের গোড়ায় না দিয়ে যত দূর পর্যন্ত ডালপালা বিস্তার লাভ করে সে এলাকায় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। উল্লিখিত সার ৩ কিস্তিতে ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি), মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) ও মধ্য আশ্বিন থেকে মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ ও নিকাশ: ফুল আসা ও ফল ধরার সময় পানির অভাব হলে ফল ঝরে পড়া ও সূর্য পোড়া দাগ দেখা যায়। তাই শুষ্ক মৌসুমে ২১ দিন পর পর ২-৩টি সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সে জন্য পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

অঙ্গ ছাঁটাই: নতুন রোপণকৃত গাছে আদিজোড় হতে উৎপাদিত কুশি ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছটির অবকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে গোড়া থেকে ১ মিটার উঁচু পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা চলবে না। এক থেকে ১.৫ মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫টি শাখা রাখতে হবে যাতে গাছটির সুন্দর একটি কাঠামো তৈরি হয়। প্রতি বছর ফল সংগ্রহের পর মরা, পোকা-মাকড় ও রোগাক্রান্ত ডাল ছাঁটাই করতে হয়। ডাল ছাঁটাইয়ের পর কর্তিত স্থানে অবশ্যই বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ: ফল কিছুটা হলদে বর্ণ ধারণ করলে মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক (সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর) ফল সংগ্রহ করা যায়। বাতাবিলেবু পাকার পরও দীর্ঘ দিন গাছে সংরক্ষণ (Tree storage) করা যায়।

সাতকরা

সাতকরা (*Citrus macroptera*) একটি লেবু জাতীয় অপ্রধান ফল। অপ্রধান হলেও সিলেট অঞ্চলে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয়। কমলালেবু ও লেবুর মত এর রস বা শাঁস খাওয়া হয় না। ফলের খোসা বিভিন্ন ধরনের রান্নায় তরকারী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। খোসার সুগন্ধ রান্নার মান বৃদ্ধি করে থাকে। খোসা দিয়ে উৎকৃষ্ট মানের আচার তৈরি হয়। সাতকরা ইংল্যান্ডে রপ্তানি হয়। প্রবাসী সিলেটবাসীরাই এ ফলের সবচেয়ে বড় ভোক্তা।

সাতকরার জাত

বারি সাতকরা-১

বারি সাতকরা-১

স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৪ সালে বারি সাতকরা-১ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। এটি উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম ছড়ানো ও মধ্যম ঝোপালো। চৈত্র-বৈশাখ মাসে গাছে ফুল আসে এবং শীতের প্রারম্ভে (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর) ফল পাকতে শুরু করে। ফল মধ্যম আকারের (৩৩০ গ্রাম) কমলালেবুর মত চ্যাপ্টা। পাকা ফল হালকা হলুদ বর্ণের। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলাসমূহে চাষ উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০ টন।

জলবায়ু ও মাটি: যথেষ্ট বৃষ্টিপাত হয় এমন আর্দ্র ও উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলে সাতকরা ভাল জন্মে। উর্বর, গভীর সুনিষ্কাশিত এবং মৃদু অম্লভাবাপন্ন বেলে দোআঁশ মাটি সাতকরা চাষের জন্য উত্তম। এঁটেল মাটির পানি নিষ্কাশন ক্ষমতা কম হওয়ায় সাতকরা চাষের অনুপযোগী। সাতকরা উৎপাদনের জন্য বার্ষিক ১৫০০-২৫০০ মিলি মিটার বৃষ্টিপাত এবং ২৫-৩০° সে. গড় তাপমাত্রা উপযোগী। সাতকরা চাষের জন্য মাটির অম্লত্ব মান ৫.৫-৬.০।

বংশ বিস্তার: বীজ এবং অঙ্গজ দুই ভাবেই সাতকরার বংশ বিস্তার হয়। অঙ্গজ উপায়ে জোড় কলম (ভিনিয়ার ও ক্লেফট গ্রাফটিং) ও কুঁড়ি সংযোজন (টি-বাডিং) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি: সাতকরার জন্য উর্বর, গভীর, সুনিষ্কাশিত এবং মৃদু অম্লভাবাপন্ন বেলে দোআঁশ মাটি সম্বলিত উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। তৈরির পূর্বে জমি হতে আগাছা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গাছপালা অপসারণ করতে হবে। সমতল ভূমিতে আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে এবং পাহাড়ি অঞ্চলে কোদালের সাহায্যে জমি তৈরি করতে হবে। পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড়ের ঢালে ধাপ বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারের বেড তৈরি করে সাতকরার চারা লাগাতে হবে।

গর্ত তৈরি, চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা: রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৫-৬ মিটার দূরত্বে ৭৫ × ৭৫ × ৭৫ সেমি মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি এবং ২৫০ গ্রাম চুন গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে পানি দিতে হবে। গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে ১ বছর বয়সের নির্বাচিত চারাটি সোজাভাবে লাগিয়ে গোড়ার মাটি সামান্য চেপে দিতে হয় এবং লাগানোর পরপরই খুঁটি ও পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ এবং ভাদ্র-আশ্বিন মাস সাতকরার চারা/কলম রোপণের উপযুক্ত সময়।

ডাল ছাঁটাই: নতুন রোপণকৃত গাছে আদিজোড় হতে উৎপাদিত কুঁশি ভেঙ্গে দিতে হবে। গাছটির অবকাঠামো মজবুত করার লক্ষ্যে গোড়া থেকে ১ মিটার উঁচু পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা চলবে না। এক থেকে দেড় মিটার উপরে বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ৪-৫টি শাখা রাখতে হবে যাতে গাছটির সুন্দর একটি কাঠামো তৈরি হয়। প্রতি বছর ফল সংগ্রহের পর মরা, পোকা-মাকড় ও রোগাক্রান্ত ডাল ছাঁটাই করতে হয়। ডাল ছাঁটাইয়ের পর কর্তিত স্থানে অবশ্যই বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে।

সার প্রয়োগ: গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মতো, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। সাতকরার জন্য প্রতি বছর পচা গোবর, ইউরিয়া, টিএসপি এবং এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেয়া হলো:

সার	গাছের বয়স			
	১-২ বছর	৩-৪ বছর	৫-১০ বছর	১০ বছরের উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	৭-১০	১০-১৫	২০-২৫	২৫-৩০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৭৫-২২৫	২৭০-৩০০	৫০০-৬০০	৬০০-৭০০
টিএসপি (গ্রাম)	৮০-৯০	১৪০-১৭০	৪০০-৪৫০	৪৫০-৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৪০-১৬০	৪০০-৫০০	৫০০-৫৫০	৬০০-৬৮০

সার একেবারে গাছের গোড়ায় না দিয়ে যত দূর পর্যন্ত গাছের ডালপালা বিস্তার লাভ করে সে এলাকায় মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। উল্লিখিত সার ৩ কিস্তিতে ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি), মধ্য বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) ও মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-কার্তিক (অক্টোবর) মাসে প্রয়োগ করতে হয়।

আগাছা দমন: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখা দরকার, বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে হালকাভাবে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন: বয়স্ক গাছে খরা মৌসুমে ২-৩টি সেচ দিলে সাতকরার ফলন ও গুণগত মান বৃদ্ধি পায়। গাছের গোড়ায় পানি জমলে মাটি বাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। তাই অতিরিক্ত পানি নালার মাধ্যমে নিষ্কাশন করে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ: পরিপক্ক হলে সাতকরা হালকা সবুজ বর্ণ ধারণ করে এবং এর খোসা তুলনামূলকভাবে মসৃণ হয়ে আসে। গাছ হতে ফল সংগ্রহ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে ফলগুলোতে যাতে আঘাত না লাগে।

আমড়া

আমড়া একটি জনপ্রিয় ও উপাদেয় ফল। বাংলাদেশে দুই প্রজাতির আমড়া পাওয়া যায়। যেমন, বিলাতি আমড়া (Golden apple) ও দেশি আমড়া (Hogplum)। বিলাতি আমড়া দেশের প্রায় সব স্থানেই কম বেশি জন্মে তবে বরিশাল অঞ্চলে এর চাষ বেশি হয়। আমড়া একটি পুষ্টি সমৃদ্ধ ফল। আমড়াতে প্রতি ১০০ গ্রাম ভক্ষণযোগ্য অংশে ৮৩ ভাগ পানি, ১.১ গ্রাম আমিষ, ১৫.০ গ্রাম শ্বেতসার, ০.১০ গ্রাম স্নেহ, ৮০০ মাইক্রোগ্রাম ক্যারোটিন, ০.২৮ মিলিগ্রাম থায়াসিন, ০.০৪ মিলিগ্রাম রাইবোফ্লাবিন, ৯২ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি, ৫৫ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম এবং ৩.৯ মিলিগ্রাম লৌহ থাকে।

বিলাতি আমড়া কাঁচা খাওয়া হয়। এটি খেতে টক-মিষ্টি স্বাদের হয়ে থাকে। বিলাতি এবং দেশি ২ ধরনের আমড়া থেকেই সুস্বাদু আচার, চাটনী ও জেলী তৈরি করা হয়।

ফলসহ আমড়া গাছ

আমড়ার জাত

বারি আমড়া-১ (বারমাসি আমড়া)

প্রায় সারা বছর ফল ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন বারি আমড়া-১ একটি নতুন জাতের আমড়া। বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। এ জাতের আমড়ায় মধ্য-ফাল্গুন (মার্চ-এপ্রিল) থেকে ফুল আসা আরম্ভ হয় এবং মধ্য-কার্তিক (নভেম্বর) মাস পর্যন্ত ক্রমাগত ফুল আসে।

মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) মাস ব্যতিরেখে বছরের দশ মাসেই গাছে ফুল বা ফল পাওয়া যায়।

বারি আমড়া-১ জাতের আমড়ায় ১ বছর বয়সের গাছে ফুল ও ফল আসতে দেখা যায় এবং বয়স বাড়ার সাথে সাথে ফলন বৃদ্ধি পায়। এর গাছ বামন আকৃতির হয়। ফল ছোট (৬০ গ্রাম), ডিম্বাকার, দৈর্ঘ্য ৫.৫ সেমি, প্রস্থ ৪.৫ সেমি। ফলের শাঁস হালকা-সাদা, মধ্যম রসালো ও টক-মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৭.০%)। ফলের খোসা পাতলা ও মসৃণ। বীজ ছোট, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৩%। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৫-১৭ টন। দেশের সব এলাকায় চাষোপযোগী।

বারি আমড়া-১

বারি আমড়া-২

বারি আমড়া-২

দেশের উপকূলীয় অঞ্চল থেকে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারি আমড়া-২ জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০০৭ সালে অবমুক্ত করা হয়। জাতটি উচ্চ ফলনশীল এবং প্রতি বছর ফল প্রদান করে। গাছ লম্বাকৃতির, ফল বড়, অত্যন্ত সুস্বাদু (ব্রিক্সামান ৯%) এবং ফলের গড় ওজন ৯৫-১০০ গ্রাম। এর খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৬০ শতাংশ। হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১৬-১৮ টন। জাতটি দেশের উপকূলীয় এলাকায়

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু: গভীর, সুনিষ্কাশিত, উর্বর দোআঁশ মাটি আমড়া চাষের জন্য উত্তম। আমড়া চাষে উঁচু ও মাঝারী উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। গ্রীষ্ম মন্ডলীয় জলবায়ুতে আমড়া ভাল হয়। বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু আমড়া চাষের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।

বংশ বিস্তার: বীজ বা কলমের মাধ্যমে আমড়ার বংশ বিস্তার করা হয়। পরিপক্ক আমড়া বীজ থেকে শাঁস ছাড়িয়ে নিয়ে বালিতে রোপণ করতে হয়। চারা গজানোর পর ছোট অবস্থায় চারাগুলো তুলে কম্পোস্ট ও ভিটি বালি মিশ্রিত অন্য টবে স্থানান্তর করতে হয়। একটি বীজ থেকে এক বা একাধিক চারা হতে পারে। কম্পোস্ট ও ভিটিবালি মিশ্রিত টবে একবারে বীজ লাগিয়েও এই চারা উৎপাদন করা যায়। তবে এক্ষেত্রে চারার অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা কমে যায়। বীজের চারাতেও বংশগত গুণাগুণ ঠিক থাকে। কলমের মাধ্যমেও আমড়ার বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রে দেশি আমড়ার চারা রুটস্টক হিসেবে ব্যবহার করে ক্লেফট পদ্ধতিতে আমড়ার কলম করা হয়।

জমি তৈরি: ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল ও আগাছমুক্ত করে নিতে হবে। চারা রোপণের জন্য সমতল ভূমিতে বর্গাকার, আয়তাকার বা কুইনকান্স এবং পাহাড়ি জমিতে কন্টুর বা ম্যাথ পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। আমড়া চারা রোপণের জন্য ৬০ × ৬০ × ৬০ সেমি গর্ত করে ২০ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ৫০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে। বৃষ্টির মৌসুমের প্রারম্ভে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস (এপ্রিল-মে) চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। তবে অন্য সময়ও চারা লাগানো যায়। বারি আমড়া-১ জাতের আমড়া বামন আকৃতির হওয়ায় ৪-৫ মিটার দূরত্বে লাগানো উত্তম। গর্ত তৈরির ১৫-৩০ দিন পর চারার গোড়ার বলসহ গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা রোপণের পর হালকা সেচ, খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ: আমড়া গাছে বছরে ২ বার সার প্রয়োগ করা উচিত। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (এপ্রিল-মে) এবং ২য় কিস্তি বর্ষার শেষে মধ্য-শ্রাবণ থেকে মধ্য-ভাদ্র (আগস্ট- সেপ্টেম্বর) দিতে হবে। মাটিতে 'জো' অবস্থায় সার প্রয়োগ করতে হয়। গাছের বৃদ্ধির সাথে সারের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১-২ বছর	৫-১০	১০০	১৫০	১০০	৫০
৩-৪ বছর	১০-১৫	১৫০	২০০	১৫০	৬০
৫-৬ বছর	১৫-২০	২০০	২৫০	২০০	৭৫
৭-১০ বছর	২০-২৫	২৫০	৩০০	২৫০	৯০
১০ বছর তদুর্ধ্ব	২৫-৩০	৩০০	৩৫০	৩০০	১০০

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: দুই-তিন মাস অন্তর ৪ কিস্তিতে (বৈশাখ, আষাঢ়, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ) উপরোক্ত সার প্রয়োগ করতে হবে। বারি আমড়া-২ এর ক্ষেত্রে সারের পরিমাণ দ্বিগুণ হবে এবং বছরে দুই কিস্তিতে (বৈশাখ ও অগ্রহায়ণ) সার প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: গাছের বৃদ্ধির জন্য শুকনা মৌসুমে সেচ প্রয়োগ করা উত্তম। ফলন্ত গাছের বেলায় আমড়ার ফুল ফোঁটার শেষ পর্যায়ে এবং মটর দানার সময়ে একবার, স্প্রিংকলার বা বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে। গাছে সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ প্রয়োগ করা হলে সুফল পাওয়া যায়।

ফুল ও ফল ছাঁটাই: ১-২ বছর পর্যন্ত গাছে কোন ফল না রাখাই উত্তম। তাই এ সময় ফুল ধারণ করলেও ফুল ফেলে দেয়া হলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। ২ বছর পর গাছে প্রচুর পরিমাণ ফল হয়। বারি আমড়া-১ এর গাছে ফলের আধিক্য থাকে বলে ২০-৩০% ফল ছাঁটাই করে ফেলা উচিত। এতে গাছের অন্যান্য ফলের বৃদ্ধি বেশি হয় এবং ফলের গুণগত মানও উন্নত হয়।

ফল সংগ্রহ: খাওয়ার জন্য পুষ্ট ফল গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়। ফল পুষ্ট হলে আমড়ার রং সবুজ এবং গায়ে হালকা বাদামী প্যাচ সৃষ্টি হয়। চারা তৈরির জন্য আমড়া গাছে পাকিয়ে নেয়াই উত্তম। পাকা হালকা হলুদ রং ধারণ করে। পুষ্ট ফলের বীজ থেকেও চারা তৈরি করা যায়।

অন্যান্য পরিচর্যা

হগপাম বিটল পোকা দমন

এ পোকা কচি পাতা খেয়ে গাছকে পত্রশূণ্য করে ফেলে। ফলে গাছ দুর্বল হয়ে যায় এবং ফলন কমে যায়। এ পোকার গায়ে লালচে ফোঁটারমতো দাগ দেখা যায়। এপ্রিল-আগস্ট পর্যন্ত এ পোকার প্রাদুর্ভাব বেশি থাকে।

হগপাম বিটল পোকা

প্রতিকার

- পোকার সংখ্যা কম হলে হাত দিয়ে ধরে মেরে ফেলা যায়।
- কীড়া অবস্থায় গুচ্ছাকারে থাকার সময় পাতাসহ সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
- আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে সুমিথিয়ন ৫০ ইসি অথবা রগর ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে এই পোকা দমন করা যায়।

জামরুল

জামরুল বেশ রসালো এবং হালকা মিষ্টি স্বাদযুক্ত ফল। গ্রীষ্মকালে এর কদর বেশি। এটি একটি ভিটামিন বি-২ সমৃদ্ধ ফল। জামরুল বহুমূত্র রোগীর তৃষ্ণা নিবারণে উপকারী।

ফলসহ জামরুল গাছ

জামরুলের জাত

বারি জামরুল-১

বারি জামরুল-১

বারি জামরুল-১ জাতটি প্রতি বছর ফলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। এ জাতটি বাংলাদেশে চাষের জন্য ১৯৯৭ সালে অনুমোদিত হয়। এ জাতের পাকা ফল দেখতে আকর্ষণীয় মেরুন বর্ণের এবং খেতে সুস্বাদু। এ জাতের জামরুল আঁশবিহীন ও মধ্যম রসালো।

ফুল আসার সময় মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-চৈত্র (ফেব্রুয়ারি-মার্চ) এবং ফল আহরণের সময় মধ্য-চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাস। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ১১০০-১৪০০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। ফল চুঙ্গাকৃতির হয়। ফলের ওজন ৩৪-৪৫ গ্রাম। ফলের শাঁস সবুজাভ সাদা। প্রায় আঁশহীন, মধ্যম মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৬.৫%), শাঁস ফলের ৯৭%। ফলের ত্বক মসৃণ। বীজ খুব ছোট ও হালকা। জামরুলের এ জাতটি সারা দেশে চাষের জন্য উপযোগী।

বারি জামরুল-২

বারি জামরুল-২

অধিকাংশ জামরুল বছরে একবার ফল প্রদান করে থাকে। কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম জামরুলের একটি নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে জাতটি বছরে তিনবার ফল প্রদান করে থাকে যা ‘বারি জামরুল-২’ নামে জাতীয় বীজবোর্ড কর্তৃক নিবন্ধন প্রাপ্ত হয়েছে। ‘বারি জামরুল-২’ নিয়মিত প্রচুর ফল উৎপাদনকারী উন্নত জাত। গাছ মাঝারী, অত্যধিক ঝোপালো এবং বছরে ৩ বার ফল দেয়। মধ্য-ফাল্গুন, মধ্য-বৈশাখ এবং আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে ‘বারি জামরুল-২’ হতে ফল আহরণ করা যায়।

ফল চুঙ্গাকৃতির, পাকা ফল আকর্ষণীয় মেরুন বর্ণের এবং খেতে সুস্বাদু, রসাল ও মিষ্টি (বিক্সমান ৭%)। ফলের গড় ওজন ৪০ গ্রাম, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৮%। গাছপ্রতি ২,০০০-২,৫০০টি ফল হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন। জাতটি দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

বারি জামরুল-৩

বারি জামরুল-৩

নিয়মিত ফলদানকারী, উচ্চফলনশীল জাত। পরিপক্ক ফলের রং আকর্ষণীয় লালচে খয়েরী। ফল ঘণ্টাকৃতি, ফলের শাঁস আটশাটে, সাদা, কচকচে, খেতে খুবই মিষ্টি, বিক্সমান ১২%। ফল সংগ্রহের সময় এপ্রিল - মে। প্রতিটি ফলের গড় ওজন ৫৯ গ্রাম, ফলন ৬.৬ টন/হেক্টর।

উৎপাদন প্রযুক্তি

চারা তৈরি: সাধারণত শাখা কলম ও গুটি কলমের মাধ্যমে জামরুলের বংশ বিস্তার করা হয়।

চারা রোপণ: মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-আষাঢ় (জুন) মাসে ১ × ১ × ১ মিটার গর্ত করে তা ৩ সপ্তাহ উন্মুক্ত রাখতে হবে। তার পর ১০-১৫ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম এমওপির মিশ্রণ প্রতি গর্তে প্রয়োগ করতে হবে এবং চারা লাগাতে হবে। সাধারণত বাড়ির আঙ্গিনায় ২/১টি জামরুলের চারা লাগানো হয়। চারা ৫-৬ মিটার দূরে লাগাতে হবে।

সারের পরিমাণঃ বয়স বাড়ার সাথে সাথে প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে।

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-৩	১৫-২০	২০০-২৫০	২০০-২৫০	২০০-২৫০
৪-৭	৪৫-৬০	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০
৭-১০	৭০-৮০	৮০০-১০০০	৮০০-১০০০	৮০০-১০০০

সার প্রয়োগঃ সবটুকু সার দুই ভাগ করে মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-আষাঢ় (মে-জুন) ও মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-কার্তিক (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) মাসে ২ বার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের চতুর্দিকে বৃত্তাকার নালা করে নালায় সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর নালা মাটি দিয়ে ভরাট করতে হবে।

পরিচর্যাঃ বছরে ২ বার গাছের গোড়ার মাটি হালকাভাবে কুপিয়ে দিতে হবে। কলমের গাছের নিচের দিকের কিছু শাখা-প্রশাখা কেটে দিতে হবে। খরা মৌসুমে গাছে ২-৩ বার সেচ দেওয়া ভাল।

সফেদা

সফেদা বাংলাদেশের একটি সুস্বাদু সমৃদ্ধ ফল। বাংলাদেশে সর্বত্রই এ ফল জন্মায় তবে বৃহত্তর বরিশাল, খুলনা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় সফেদার চাষ বেশি হয়। সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে অতি সহজেই এদেশে সফেদার ব্যাপক চাষ করা সম্ভব। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ এবং ভিটামিটন 'এ' ও 'সি' এর একটি ভাল উৎস হচ্ছে সফেদা।

সফেদার জাত

বারি সফেদা-১

বারি সফেদা-১ উচ্চ ফলনশীল ও নিয়মিত ফলধারী জাতটি বাংলাদেশে চাষের জন্য ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। দেশিয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতটি নির্বাচন করা হয়। ফল দেখতে গোলাকার চ্যাপ্টা। আকারে বেশ বড়। প্রতিটি ফলের ওজন ৮০-৯০ গ্রাম। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৯০-৯৫%। ফলে টিএসএস এর পরিমাণ ১৪-১৬%। বীজের বর্ণ কালচে তামাটে, ডিম্বাকৃতির, তবে অঙ্কুরোদগমের দিকের মাথাটা কিছুট সরু। গাছপ্রতি বাৎসরিক ফলন ১১০-১২০ কেজি। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

বারি সফেদা-১

কম বেশি সারা বছরই ফল ধরে। তবে ফুল ধরা ও ফল সংগ্রহের প্রাচুর্যতা বিবেচনায় সারা বছরকে দুটি মৌসুমে ভাগ করা যায়- (১) মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-বৈশাখ (সেপ্টেম্বর-এপ্রিল) এবং (২) মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য-ভাদ্র (এপ্রিল-আগস্ট) মাস। প্রধানত চট্টগ্রাম এলাকায় জাতটি ভাল জন্মে। তবে অন্যান্য এলাকাতেও এর চাষ করা যায়।

বারি সফেদা-২

বারি সফেদা-২ উচ্চ ফলনশীল জাতটি বাংলাদেশের মধ্য-অঞ্চলে বিশেষত ঢাকা, টাঙ্গাইল, গাজীপুর ও নরসিংদী এলাকায় চাষাবাদের জন্য ২০০৩ সালে অবমুক্ত করা হয়। দেশের মধ্য অঞ্চলসহ অন্যান্য এলাকাতেও এর চাষ করা যেতে পারে। সফেদার এ জাতটিতে নিয়মিত পৌষ থেকে বৈশাখ মাস (মধ্য-ডিসেম্বর থেকে মধ্য-এপ্রিল) পর্যন্ত সর্বাধিক ফল সংগ্রহ করা যায়। তবে বছরের অন্য সময়েও কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায়। ভাদ্র থেকে কার্তিক মাসের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য ফলন পাওয়া যায়। জাতটি দেশিয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়।

বারি সফেদা-২

ফল দেখতে গোলাকার। আকারে মাঝারী। প্রতিটি ফলের ওজন ৭০-৮০ গ্রাম। পাকা ফলের শাঁস লালচে-বাদামী বর্ণের, মোলায়েম, খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু, ব্রিক্সমান ১৮%। ফলের খাদ্যোপযোগী অংশ ৮১.০%। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২২ টন।

বারি সফেদা-৩

ফল প্রদর্শনীর মাধ্যমে সণাক্তকৃত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৯ সালে বারি সফেদা-৩ নামে সফেদার নিয়মিত ফলধারী উচ্চ ফলনশীল এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। গাছ মাঝারী, মধ্যম খাড়া ও অধিক শাখা প্রশাখা সমৃদ্ধ। গাছপ্রতি গড়ে ১৮০০টি ফল ধরে যার ওজন ২০০-২২৫ কেজি। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৩৫ টন। জাতটি বছরে দুইবার ফল দেয় যা কার্তিক ও মাঘ মাসে আহরণোপযোগী হয়। ফল বেশ বড় (১১৭ গ্রাম), গোলাকৃতির ও বাদামী বর্ণের। শাঁস নরম, ধূসর বর্ণের, খুব রসালো ও মিষ্টি (গড় ওজন টিএসএস ২৩%) এবং সুগন্ধযুক্ত। ফলের ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯১%। সারাদেশে চাষোপযোগী জাতটি অমৌসুমে দেশি ফলের প্রাপ্যতা বৃদ্ধিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

বারি সফেদা-৩

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন: উঁচু নিকাশযুক্ত বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি সফেদা চাষের জন্য বেশি উপযোগী। তবে অন্যান্য উঁচু জমিতেও চাষ করা যায়।

কলম উৎপাদন: গ্রাফটিং এর মাধ্যমে সফেদার কলম তৈরি করে নিতে হবে। 'খিরণী' গাছের বীজ থেকে উৎপাদিত চারাকে সফেদার 'রুটস্টক' হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

কলম রোপণ: বাগান আকারে চাষের জন্য ৬ × ৬ মিটার হিসেবে রোপণের দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। এ হিসেবে হেক্টরপ্রতি চারা লাগবে ২৭৮টি। চারা লাগানোর ১০-১৫ দিন আগে নিয়ম অনুযায়ী গর্ত তৈরি করে নির্ধারিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের পরিমাণ:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/গর্ত
টিএসপি	২৫০-৩০০ গ্রাম
এমওপি	২৪০-২৫০ গ্রাম
গোবর	১০-১৫ কেজি

কলম লাগানোর ১০-১৫ দিন আগে গর্তে সার ও মাটি মিশিয়ে রাখতে হবে। লাগানোর পরে চারায় প্রথম ২-৩ দিন প্রয়োজনমতো পানি দিতে হবে এবং খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

গাছের বয়স অনুসারে সারের পরিমাণ

সারের নাম	গাছের বয়স				
	১-৩ বছর	৪-৭ বছর	৮-১০ বছর	১১-১৫ বছর	১৫ বছর এর ঊর্ধ্বে
গোবর/কম্পোস্ট (কেজি)	২০	২৫	৩০	৪০	৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১০০-২০০	৩০০-৫০০	৬০০-৭০০	৮০০-৯০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৫০০	৭০০	৮০০
এমপি (গ্রাম)	১৫০	৩০০-৫০০	৬০০-৭০০	৮০০-৯০০	১০০০
জিপসাম (গ্রাম)	৫০	১০০	২০০	৩০০	৪০০

প্রয়োগ পদ্ধতি: উল্লিখিত পরিমাণ সার সমান তিন কিস্তিতে যথাক্রমে মার্চ, জুন ও সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। গোবর বা কম্পোস্ট সার মার্চ ও সেপ্টেম্বরে দুই কিস্তিতে দেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।

পানি সেচ: সফেদা গাছ খরা সহ্য করতে পারে। তবে বেশি খরার সময় প্রয়োজনীয় সেচ দিলে ফলন ভাল হয়।

কামরাঙ্গা

অম্লমধুর স্বাদযুক্ত এবং ভিটামিন 'এ' ও 'সি' সমৃদ্ধ ফল কামরাঙ্গা আমাদের দেশে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ফল। দেশের সর্বত্র বাড়ির আঙ্গিনায় ২/১টি কামরাঙ্গা গাছ দেখা যায়। গাজীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ঢাকা, সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় কামরাঙ্গা বেশি উৎপন্ন হয়।

কামরাঙ্গা গাছ

কামরাঙ্গা ফল হতে জ্যাম, জেলী, মোরব্বা, চাটনি, আচার ইত্যাদি তৈরি করা হয়। কামরাঙ্গা একটি রপ্তানিযোগ্য ফল হওয়ায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে।

মাটি ও জলবায়ু : যে কোন প্রকার মাটিতে এর চাষ করা যায়। তবে সুনিষ্কাশিত গভীর দোআঁশ মাটি কামরাঙ্গা চাষের জন্য উত্তম। উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু কামরাঙ্গা চাষের জন্য উপযোগী। বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের আবহাওয়ায় কামরাঙ্গা চাষ করা সম্ভব। তবে দেশের পাহাড় অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কামরাঙ্গা চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। এদের কিছুটা ঠাণ্ডা সহ্য করার ক্ষমতা আছে।

কামরাঙ্গার জাত

বারি কামরাঙ্গা-১

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম খাড়া ও ঝোপালো। বছরে তিনবার ফল দেয় (জুলাই-আগস্ট, নভেম্বর-ডিসেম্বর এবং ফেব্রুয়ারি)। ফল মাঝারী (গড় ওজন ৯৭ গ্রাম), লম্বাটে, রং হালকা হলুদ, শাঁস সাদা, রসালো, কচকচে মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৭.৫%) এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৯%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৫ টন। সমগ্র দেশে চাষোপযোগী এবং জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বারি কামরাঙ্গা-১

বারি কামরাঙ্গা-২

বারি কামরাঙ্গা-২

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী, মধ্যম খাড়া ও মধ্যম ঝোপালো। বছরে তিনবার ফল দেয় (জানুয়ারি, জুলাই, এবং অক্টোবর)। ফল মাঝারী (গড় ওজন ১০০ গ্রাম), ডিম্বাকৃতির ও রং হালকা হলুদ। শাঁস সাদা, রসালো, কচকচে ও মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৮.০%)। এবং ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯৯%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫৩ টন। সমগ্র দেশে চাষোপযোগী এবং জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

বংশ বিস্তার: বীজ ও অঙ্গজ পদ্ধতিতে কামরাঙ্গার বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। বীজের গাছে মাতৃ গাছের গুণাগুণ পুরোপুরি বজায় থাকে না। বীজের গাছে ফল দিতে ৩-৪ বছর সময় লাগে। অঙ্গজ পদ্ধতিতে তৈরি কলমের গাছে মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে এবং লাগানোর পরবর্তী বছর থেকেই ফল দিতে শুরু করে। বীজ থেকে চারা তৈরি করে ১০-১২ মাস বয়স্ক সুস্থ সবল চারার উপর ৫-৬ মাস বয়স্ক উপজোড় ভিনিয়ার বা ফাটল পদ্ধতির মাধ্যমে কলম করা হয়। সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাস কলম করার উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়স্ক কলমের চারা জমিতে রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি : বর্ষায় পানি দাঁড়ায় না এমন উঁচু এবং মাঝারী উঁচু জমি কামরাঙ্গার জন্য নির্বাচন করতে হবে। উন্মুক্ত বা আংশিক ছায়াযুক্ত স্থানে কামরাঙ্গা চাষ করা যায়। বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতিঃ সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তাকার এবং পাহাড়ী ভূমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে চারা রোপণ করা হয়।

রোপণের সময়ঃ চারা বা কলম রোপণের উপযুক্ত সময় মধ্য-জ্যৈষ্ঠ থেকে মধ্য-ভাদ্র (জুন-সেপ্টেম্বর) মাস। তবে সেচ সুবিধা থাকলে আশ্বিন- কার্তিক (অক্টোবর) মাস পর্যন্ত চারা/কলম রোপণ করা যেতে পারে।

গর্ত তৈরিঃ রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ × ৭ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি ও ১০০ গ্রাম জিপসাম সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে পরিমাণমতো পানি দিতে হবে এবং এ অবস্থায় ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতিঃ গর্তের মাঝখানে চারা বসিয়ে গোড়ার মাটি একটু উঁচু করে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর একটা শক্ত কাঠির সঙ্গে বেঁধে দিতে হবে। তারপর সেচ দিতে হবে।

সার প্রয়োগ

সারের নাম	গাছের বয়স বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ			
	১-৩ বছর	৪-৬ বছর	৭ - ১০ বছর	১০ বছরের উর্ধ্বে
জৈব সার (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-৩০	৩০-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০-৪০০	৪০০-৬০০	৬০০-৮০০	৮০০-১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২৫০-৩০০	৩০০-৪০০	৪০০-৫০০	৫০০-৬০০
এমওপি (গ্রাম)	২৫০-৩০০	৩০০-৪০০	৪০০-৪৫০	৪৫০-৫০০

উল্লিখিত সার ২ কিস্তিতে প্রথমবার বর্ষার আগে ও দ্বিতীয়বার বর্ষার শেষের দিকে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর প্রয়োজনে পানি সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগঃ চারা রোপণের পর ১ মাস নিয়মিত সেচ প্রদান করতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে এবং ফল ধরার পর প্রতি ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার সেচ দিলে ফল ঝরার মাত্রা কমে এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। বর্ষা মৌসুমে বাগানে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণঃ রোপণকৃত চারা/কলমকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য এর গোড়ার দিকের ডাল ছাঁটাই করতে হবে। প্রধান কাণ্ডটিতে মাটি থেকে কমপক্ষে ১ মিটারের মধ্যে কোন ডাল রাখা চলবে না। এ ছাড়া শীতকালীন ফল সংগ্রহের পর মচকানো, মরা, রোগাক্রান্ত, পোকাক্রান্ত ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে।

ফল সংগ্রহঃ পুষ্ট, রং উজ্জ্বল ও হালকা হলুদ হলেই ফল সংগ্রহ করতে হয়। গাছে ঝাকি দিয়ে ফল আহরণ করা যাবে না এবং আহরণ কালে ফল যাতে মাটিতে না পড়ে এবং কোনভাবে আঘাতপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে সতর্ক নজর রাখতে হবে। বৃষ্টির পরপরই ফল সংগ্রহ করা ঠিক নয়। হাত দিয়ে বা জাল লাগানো কোটার সাহায্যে খুব সাবধানে ফল সংগ্রহ করতে হবে। সংগৃহীত ফল সরাসরি রোদে না রেখে ছায়ায় রাখতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

এ্যানথ্রাকনোজ রোগ

এ্যানথ্রাকনোজ রোগাক্রান্ত পাতা

এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। পাতা, ফুল ও ফলে এ রোগ হতে পারে। প্রথমে ছোট ছোট বাদামী রঙের দাগের মাধ্যমে এ রোগের শুরু হয় এবং আস্তে আস্তে এ দাগগুলো বড় হয়ে কালো বর্ণ ধারণ করে এবং আক্রান্ত স্থান পচে যায়। আক্রান্ত পাতা, ফুল ও ফল ঝরে যেতে পারে।

প্রতিকার

আক্রান্ত পাতা, ফুল ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। রোগের লক্ষণ দেখা দিলে অটোস্টিন অথবা নোইন ৫ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর ২/৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বাকল ও ডাল ছিদ্রকারী পোকা

এ্যানথ্রাকনোজ রোগাক্রান্ত ফল

কামরাঙ্গার ক্ষতিকর পোকাসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম। এ পোকা গাছের বাকল ও ডাল ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে। তাছাড়া কখনও কখনও এরা প্রশাখার কর্তিত অংশ দিয়েও ডালের ভিতর প্রবেশ করে। এ পোকার কীড়া রাতের বেলায় গাছের বাকল খেয়ে গাছের খাদ্য চলাচলে ব্যাঘাত ঘটায়। আক্রমণ বেশি হলে পুরো গাছটাই এক সময় শুকিয়ে মারা যায়। গাছে এ পোকার উপস্থিতি খুব সহজেই ডালের গায়ে ঝুলে থাকা কাঠের গুঁড়া-মিশ্রিত মলের ছোট ছোট দানা দ্বারা চিহ্নিত করা সম্ভব। দিনের বেলায় কীড়া গর্তের মধ্যে লুকিয়ে থাকে এবং রাতের বেলা সচল হয়।

প্রতিকার

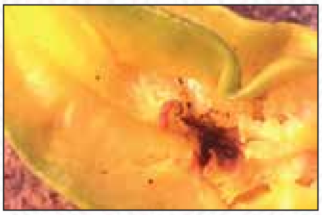
ফল ছিদ্রকারী পোকা আক্রান্ত ফল

ডালের গায়ে ঝুলে থাকা কাঠের গুঁড়া মিশ্রিত মল পরিষ্কার করতে হবে ও কাণ্ডের ভিতরের পোকা বের করে মেরে ফেলতে হবে। ডালের গর্তের মধ্যে কেরোসিন বা পেট্রোল অথবা ন্যাপথোলিন প্রবেশ করিয়ে কাদা মাটি দ্বারা ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। মার্শাল-২০ ইসি অথবা রগর/রকসিয়ন-৪০ ইসি জাতীয় কীটনাশক ২ মিলি প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছে এক সপ্তাহ পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে। পোকায় খাওয়া বাকল চেঁছে কপার জাতীয় ছত্রাকনাশকের প্রলেপ দিতে হবে।

ফল ছিদ্রকারী পোকা

টক জাতের কামরাঙ্গায় এ পোকার আক্রমণ কম হলেও বারি কামরাঙ্গা-১, বারি কামরাঙ্গা-২ ও অন্যান্য মিষ্টি জাতে মাঝে মাঝে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়। এ পোকা ফলের গায়ে ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে উৎপন্ন শুককীট ফলের শাঁস খেয়ে ভিতরে ঢুকে। এতে ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

প্রতিকার

আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে কীড়াসহ মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। বাগান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আলোক ফাঁদ ব্যবহার করেও এদের দমন করা যায়। ফল ধরার পর সুমিথিয়ন/লেবাসিড ২ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণি

টিয়া পাখি কামরাঙ্গার প্রধান শত্রু। এরা যতটুকু ফল খায় তার চেয়ে অনেক বেশি নষ্ট করে। ফল সামান্য বড় হওয়ার পর থেকেই টিয়া পাখির আক্রমণ শুরু হয়।

প্রতিকার

গাছকে জাল দ্বারা ঢেকে অথবা টিন পিটিয়ে শব্দ সৃষ্টির মাধ্যমে টিয়া পাখির আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করতে হবে।

তৈকর

তৈকর দেশের একটি আদি ফল। বাংলাদেশের সিলেট জেলায় তৈকরের চাষ হয় এবং এ অঞ্চলে ফলটির যথেষ্ট চাহিদাও রয়েছে। বাংলাদেশের অন্যান্য জেলায়ও এ ফলের চাষ সম্ভব। ফল উপ-বৃত্তাকার ও বড়। কাঁচা ও পাকা ফলের রং যথাক্রমে সবুজ এবং হলুদ। তৈকরের ঔষধী গুণাগুণ রয়েছে। তৈকর সিলেট জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে এযাবত উৎপাদিত হয়ে আসছে। এটি একটি অপ্রধান টক জাতীয় ফল যা তরকারীতে এবং আচার, জ্যাম, জেলী তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

ফলসহ তৈকর গাছ

তৈকরের জাত

বারি তৈকর-১

বারি তৈকর-১

বারি তৈকর-১ জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। বছরে ২ বার ফল দেয়। গাছ পিরামিড আকৃতির, বড় এবং গাছে সারা বছর বড় বড় সবুজ পাতা থাকে। প্রথমবার ফুল আসে মধ্য-শ্রাবণ থেকে মধ্য-আশ্বিন (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে এবং দ্বিতীয়বার ফুল আসে মধ্য-মাঘ থেকে মধ্য-ফাল্গুন (ফেব্রুয়ারি) মাসে। প্রথমবার ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় মধ্য-কার্তিক থেকে মধ্য-পৌষ (নভেম্বর-ডিসেম্বর) মাসে এবং দ্বিতীয়বার ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় মধ্য-চৈত্র থেকে মধ্য জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাসে। ফল চ্যাপ্টা-গোলাকৃতির, আকারে বড় (৭০০-৭৫০ গ্রাম)। প্রতিটি ফলের দৈর্ঘ্য ১০.৩ সেমি এবং প্রস্থ ৯.২ সেমি। কচি ফলের রং সবুজ, পাকা ফলের রং হলুদ। ফলপ্রতি বীজের সংখ্যা ৪-৭টি। ফলের স্বাদ যথেষ্ট টক। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৩০০-৩৫০টি। হেক্টরপ্রতি ফলন ৭০-৭৫ টন। বৃহত্তর সিলেট জেলায় চাষের জন্য উপযোগী। জাতটি রপ্তানিযোগ্য।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: বেলে দোআঁশ থেকে পলি দোআঁশ মাটি তৈকর চাষের জন্য উত্তম। সিলেটের পাহাড়ি অঞ্চলের নিকাশযুক্ত অম্লীয় মাটি তৈকর উৎপাদনের জন্য সর্বোত্তম।

গর্ত তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৬ × ৬ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি ও ১০০ গ্রাম জিপসাম সার ভালোভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে। হেক্টরপ্রতি ২৭৮টি চারা বা গুটির প্রয়োজন হবে।

চারা রোপণ: গর্ত তৈরির কমপক্ষে ১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে। চারাটি গর্তে সোজা করে লাগাতে হবে। লাগানোর পর ঝর্ণা দিয়ে পানি সেচ, খুঁটি ও বেড়া দিতে হবে।

সার প্রয়োগ: গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মতো, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়সভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল:

গাছের বয়স (বছর)	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২	৫-১০	২০০-৩০০	২০০-৩০০	২০০-৩০০
৩-৪	১০-১৫	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০
৫-১০	২০-২৫	৪৫০-৬০০	৪৫০-৬০০	৪৫০-৬০০
১০-১৫	২৫-৩০	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০
১৫ এর অধিক	৩০-৪০	১০০০	১০০০	১০০০

উল্লিখিত সার প্রতি বছর সমান তিন কিস্তিতে বর্ষার আগে ও বর্ষার পরে এবং শীতের পরে গাছে প্রয়োগ করতে হবে। গাছের ডালপালা যে পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে তার নিচের জমি কোদাল দিয়ে হালকা করে কুপিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত গাছের গোড়ার এক মিটার এলাকায় কোন সক্রিয় শিকড় থাকে না, তাই সার প্রয়োগের সময় এই এলাকায় সার প্রয়োগ করা উচিত নয়। পাহাড়ী অঞ্চলে ডিবলিং পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করা হলে ভূমি ক্ষয় হ্রাস পাবে।

সেচ প্রয়োগ: শুকনা মৌসুমে ১৫ দিন অন্তর পানি সেচ দেয়া উত্তম। পাহাড়ী অঞ্চলে বর্ষার শেষে মালচিং করা যেতে পারে। এতে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। মনে রাখতে হবে, সার প্রয়োগের পর পানি সেচ অত্যন্ত জরুরি । জমিতে 'জো' না থাকলে ফুল আসার পর ও ফল মটর দানার সময় গাছে অবশ্যই পানি সেচ দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ: বছরে সাধারণত ২ বার ফল সংগ্রহ করা হয়। পরিপক্ক অবস্থায় ফলের রং হলদে হয়।

লটকন

লটকন বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত অপ্রধান ফল। প্রধান কাণ্ড ও ডালপালা থেকে সরাসরি ফুলের মঞ্জরী বের হয়। ছড়া জাতীয় মঞ্জরীতে এক লিঙ্গিক ফুল উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্ত্রী ও পুরুষ গাছ আলাদা। নরসিংদী, গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নেত্রকোণা ও সিলেট এলাকায় উল্লেখযোগ্যভাবে এর চাষাবাদ হয়। বিভিন্ন দেশে সীমিত আকারে লটকন রপ্তানি হচ্ছে।

ফলসহ লটকন গাছ

লটকনের জাত

বারি লটকন-১

লটকন বাংলাদেশে অত্যন্ত মধুর স্বাদযুক্ত একটি সুপরিচিত ফল। স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৮ সালে বারি লটকন-১ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৮ টন। ফল গোলাকৃতির, রং হালকা হলুদ থেকে বাদামী বর্ণের, শাঁস নরম, রসালো ও সুগন্ধযুক্ত। ফলের গড় ওজন ১৫ গ্রাম। এতে ৪-৫টি কোষ থাকে। টিএসএস ১২.০০-১২.৫% জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষোপযোগী।

বারি লটকন-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: সুনিষ্কাশিত প্রায় সব ধরনের মাটিতেই লটকনের চাষ করা যায়। তবে বেলে দোআঁশ মাটি লটকন চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। লটকন গাছ স্যাঁত স্যাঁতে ও আংশিক ছায়াযুক্ত পরিবেশে ভাল জন্মে কিন্তু জলাবধদ্ধতা সহ্য করতে পারে না।

জমি তৈরি : চাষ ও মই দিয়ে জমি সমতল এবং আগাছামুক্ত করে নিতে হবে।

গর্ত তৈরি : চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ × ৭ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। মাটি শুকনা হলে গর্তে পানি দিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে। এভাবে ১০-১৫ দিন গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। তারপর ভালভাবে আবার কুপিয়ে চারা/কলম লাগাতে হবে।

চারা রোপণ: গর্ত করার ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগাতে হবে। চারা লাগানোর পরপরই পানি ও খুঁটি দিতে হবে। প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

রোপণের সময়: বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষের দিকে অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসেও গাছ রোপণ করা যেতে পারে।

সার প্রয়োগ: প্রত্যাশিত ফলন ও গুণগত মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে লটকন গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হল:

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)			
	১-৪	৫-১০	১১-১৫	১৫ এর উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	১০	২০	৩০	৩০-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০	৫০০	৮০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৪০০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	২০০	৩০০	৪০০	৫০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০

গাছের গোড়ার ০.৫-১.০ মিটার দূর থেকে যতটুকু জায়গায় দুপুর বেলা ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় সার ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে অথবা চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে রস কম থাকলে সার প্রয়োগের পরপরই পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে (১ম কিস্তি ফল সংগ্রহের পরপর, ২য় কিস্তি বর্ষার শেষে এবং ৩য় কিস্তি শীতের শেষে) প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সেচ প্রয়োগ: চারা রোপণের প্রথমদিকে ঘন ঘন সেচ দেয়া দরকার। ফল ধরার পর শুকনো মৌসুমে শীতের শেষে গাছে ফুল আসার পর ২/১টি সেচ দিতে পারলে ফলের আকার বড় হয় ও ফলন বাড়ে।

ডাল ছাঁটাই: গাছের মরা ডাল এবং রোগ ও পোকা আক্রান্ত ডাল ছাঁটাই করে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ: শীতের শেষে গাছে ফুল আসে এবং জুলাই-আগস্ট মাসে ফল পাকে। ফলের রং হালকা হলুদ থেকে ধূসর বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়।

ফলন: কলমের গাছে সাধারণত ৪ বৎসর বয়স থেকে ফল আসা শুরু হয় এবং সাধারণত ২০-২৫ বছরের গাছে সর্বোচ্চ ফলন হয়ে থাকে। অবস্থাভেদে গাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে গাছপ্রতি ৪ কেজি থেকে ১২০/১৩০ কেজি পর্যন্ত ফলন হয়ে থাকে।

অন্যান্য পরিচর্যা

ফল ছিদ্রকারী পোকা

ফল ছোট অবস্থায় যখন ফলের খোসা নরম থাকে তখন এই পোকা ফলের খোসা ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। পরবর্তীকালে ডিম থেকে কীড়া উৎপন্ন হয় এবং ফল পাকলে ফলের নরম শ্বাস খেয়ে থাকে।

পোকা আক্রান্ত ফল

প্রতিকার

- আক্রান্ত ফল পোকাসহ নষ্ট করে ফেলতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে পারফেকথিয়ন বা লেবাসিড ৫০ ইসি মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার ফল ছোট থাকা অবস্থায় গাছে স্প্রে করতে হবে।

চেফার বিটল

এই পোকা পাতার নিচে ডিম পাড়ে এবং ডিম থেকে কীড়া উৎপন্ন হওয়ার পর কীড়া পাতা খেয়ে ছিদ্র করে ফেলে এবং আস্তে আস্তে সমস্ত পাতা খেয়ে জালের মতো করে ফেলে।

চেফার বিটল

প্রতিকার

সুমিথিয়ন/ডেবিকুইন ৪০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করে এ পোকা দমন করা যায়।

স্কেল পোকা

এই পোকা প্রথমে পাতার নিচে ডিম পাড়ে। ডিম থেকে বাচ্চা বের হলে এরা পাতার রস শোষণ করে খেতে থাকে। আস্তে আস্তে এরা কচি ডালেও আক্রমণ করে অবশেষে সমস্ত গাছকে মেরে ফেলে।

প্রতিকার

এই পোকার আক্রমণ দেখা যাওয়া মাত্র ব্রাশ দিয়ে ঘষে মেরে ফেলতে হবে অথবা সাবানের পানি দিয়ে স্প্রে করলেও প্রাথমিকভাবে দমন করা যায়। আক্রমণ বেশি হল ট্রেসার/০.২ এমএল/লিটার) অথবা ফিপ্রোনিল (১ এমএল/লিটার) অথবা একতারা (০.৫ গ্রাম/লিটার) হারে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

এ্যানথ্রাকনোজ

কলেটোট্রিকাম *সিডি* নামক ছত্রাক লটকনের এ্যানথ্রাকনোজ রোগের কারণ। গাছের পাতা, কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও ফল এ রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। ফলের গায়ে ছোট ছোট কাল দাগ এ রোগের প্রধান লক্ষণ। ফল শক্ত, ছোট ও বিকৃত আকারের হতে পারে। ফল পাকা শুরু হলে দাগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে থাকে এবং ফলটি ফেটে বা পচে যেতে পারে।

প্রতিকার

- গাছের নিচে ঝরে পড়া পাতা ও ফল সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- গাছে ফল ধরার পর টপসিন- এম অথবা নোইন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম অথবা টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

হঠাৎ করে গাছ মারা যাওয়া (উইল্ট)

ফিউজেরিয়াম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ সমস্যা হয়। প্রথমে পাতা হলুদ হয়ে আসে এবং পরে শুকিয়ে যায়। এভাবে পাতার পর শাখা-প্রশাখা এবং ধীরে ধীরে সমস্ত গাছ ৮-১০ দিনের মধ্যে নেতিয়ে পড়ে ও মারা যায়।

প্রতিকার

এ রোগের কোন প্রতিকার নেই। তবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো নেয়া হলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

- দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় বর্দোমিক্সার অথবা কুপ্রাভিট অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- বাগানের মাটির অম্লত্ব কমানোর জন্য জমিতে চুন প্রয়োগ করতে হবে (২৫০-৫০০ গ্রাম/গাছ)।
- রোগ প্রতিরোধী আদিজোড়ের উপর কলম করতে হবে।

আমলকি

আমলকি একটি অবহেলিত কিন্তু মূল্যবান ফল। রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও সিলেট এলাকায় আমলকির চাষ বেশি হয়। আমলকি ভিটামিন 'সি' ও 'ক্যালসিয়াম' সমৃদ্ধ ফল। এ ফলে যে পরিমাণ ভিটামিন 'সি' আছে অন্য কোন ফলে তা নেই। জনসাধারণের ভিটামিন 'সি' এর ঘাটতি বিবেচনা করে এ ফলের প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া উচিত। দেশের প্রতিটি বসতবাড়িতে একটি আমলকি গাছ থাকা আবশ্যক। আমলকি চাষাবাদের মাধ্যমে দৈনন্দিন ভিটামিন 'সি' এর চাহিদা মেটানো সম্ভব। তাই এ ফলের বাণিজ্যিক চাষের গুরুত্ব রয়েছে।

আমলকি

মাটি ও জলবায়ু : আমলকি গ্রীষ্ম ও অব-গ্রীষ্ম মণ্ডলীয় অঞ্চলের ফল। এর জন্য নাতি দীর্ঘ ঠাণ্ডা, শুষ্ক তুষারপাতমুক্ত শীতকাল, উচ্চ বৃষ্টিপাত ও আর্দ্রতা বিশিষ্ট দীর্ঘ উষ্ণ শীতকাল প্রয়োজন। আমলকি একটি কষ্ট সহিষ্ণু উদ্ভিদ। জলবায়ু কিছুটা শুষ্ক হলেও গাছের কোন ক্ষতি হয়না। সুনিষ্কাশিত সব ধরনের মাটিতেই আমলকির চাষ করা যায়। তবে চুন সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটিতে আমলকি ভাল হয়।

পুষ্টিমান ও ঔষধি গুণ: আমলকির ফল টাটকা অবস্থাতেই খাওয়া হয়। আমলকির রস যকৃত, পেটের পীড়া, হাঁপানি, কাশি, বহুমুত্র, অজীর্ণ ও জ্বর রোগে বিশেষ উপকারী। পাতার রস আমাশয় প্রতিষেধক ও বল বর্ধক। আমলকি রসের শরবত জন্ডিস, বদহজম ও কাশির জন্য উপকারী। ইউনানী শাস্ত্রে ঔষধ তৈরিতে আমলকির ব্যবহার প্রচলিত আছে। খাদ্যোপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম আমলকিতে রয়েছে (জলীয় অংশ ৯১.৪%), খনিজ ০.৭ গ্রাম, আঁশ ৩.৪ গ্রাম, আমিষ ০.৯ গ্রাম, চর্বি ০.১ গ্রাম, শর্করা ৩.৫ গ্রাম, ক্যালসিয়াম ৩৪ মিলিগ্রাম, লৌহ ১.২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন 'বি-১' ০.০২ মিলিগ্রাম, ভিটামিন 'বি-২' ০.০৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন 'সি' ৪৬৩ মিলিগ্রাম এবং খাদ্যশক্তি ১৯ কিলো-ক্যালরি।

আমলকির জাত

বারি আমলকি-১

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ বড়, খাড়া ও অল্প ঝোপালো। পৌষ ও বৈশাখ মাসে গাছে ফুল আসে এবং জ্যৈষ্ঠ ও অগ্রহায়ণ মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল বড় (৩০ গ্রাম), চ্যাপ্টা, ও হালকা সবুজ।

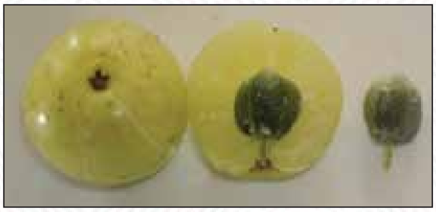

বারি আমলকি-১

শাঁস সাদা, মধ্যম রসালো, কচকচে, অল্প কষ্টিভাব সম্বলিত এবং সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ১২.০)। উচ্চ ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ। ভক্ষণযোগ্য অংশ ৯২%। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৬.৪ টন। সমগ্র দেশে চাষোপযোগী।

বংশ বিস্তার: যৌন ও অযৌন উভয় পদ্ধতিতেই আমলকির বংশ বিস্তার করা যায়। বীজ থেকে উৎপাদিত চারায় মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে না এবং গাছের বৃদ্ধি ধীর গতি সম্পন্ন হয়। এজন্য কলমের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা ভাল। কলমের গাছে দ্রুত ফল ধরে। কলম করার জন্য আমলকির বীজ থেকে উৎপাদিত চারা আদি-জোড় এবং উন্নতমানের গাছের শাখা উপ-জোড় হিসেবে ব্যাবহার করা হয়। ফেব্রুয়ারি, মে-জুন এবং অক্টোবর মাসে ১৩ থেকে ১৪ মাস বয়সের চারার সাথে এক থেকে দেড় মাস বয়স্ক আমলকির ডাল ফাটল কলম পদ্ধতিতে জোড়া লাগাতে হবে। কলম করার পর উপ-জোড়ের শুকিয়ে যাওয়া রোধ করার জন্য পলিথিন কাগজের ঢাকনা দিতে হবে। কলম টিকে গেলে ঢাকনা খুলে দিতে হবে। কলমটি নার্সারিতে স্থাপনের পর পানি সেচ, আগাছা দমন, সার প্রয়োগ এবং জোড়স্থানের নিচ থেকে গজানো কুঁশি ভাঙ্গাসহ অন্যান্য পরিচর্যা সঠিকভাবে করতে হবে। এভাবে উৎপাদিত রোগমুক্ত ১.০-১.৫ বছর বয়সী কলমের চারাকে রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি তৈরি: আমলকির জন্য সুনিষ্কাশিত এবং মাঝারী বা উঁচু জমি নির্বাচন করতে হবে। বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করতে হবে।

রোপণের সময় : বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে বর্ষার শেষে অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে গাছ লাগানো যায়। অতিরিক্ত বর্ষায় চারা রোপণ না করাই ভাল।

গর্ত তৈরি: রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ × ৭ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১০-১৫ কেজি জৈব সার, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি ও ২০০ গ্রাম জিপসাম সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও চারা রোপণ: সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা আয়তকার কিংবা ত্রিভুজাকার প্রণালীতে আমলকির চারা লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর রোপণ প্রণালী অবলম্বন করতে হবে। গর্ত ভর্তি করার ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে নির্বাচিত চারাটা সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চেপে দিতে হবে এবং লাগানোর পর পরই বাঁশের খুঁটি, বেড়া ও পানি সেচ দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ: আমলকি গাছে আশানুরূপ গুণগত মানসম্পন্ন ফল পেতে চাইলে নিয়মিত সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। নিম্নের ছকে বয়স ভিত্তিক সারের পরিমাণ দেয়া হলো:

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১-২ বছর	৫-১০	২০০	১০০	১০০	৫০
৩-৫ বছর	১০-১৫	৩০০-৫০০	২০০-৩০০	২০০-৩০০	১০০
৬-১০ বছর	১৫-২০	৪০০-৭০০	৩০০-৫০০	৩০০-৫০০	২০০
১১-১৫ বছর	২০-২৫	৮০০-১০০০	৫০০-৮০০	৫০০-৮০০	৪০০
১৫ বছর এর ঊর্দ্ধে	৩০-৪০	১৫০০	১০০০	১০০০	৫০০

উল্লিখিত সার সমান দুই ভাগ করে বর্ষার প্রারম্ভে ও শেষে গাছের গোড়া থেকে কিছুটা দূরে যতটুকু জায়গায় দুপুর বেলা ছায়া পড়ে ততটুকু জায়গায় ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের পরে প্রয়োজনে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা দমন: আমলকি বাগান সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের তলায় বা চারিদিকে যাতে আগাছা জন্মাতে না পারে সেজন্য বর্ষার শুরুতে এবং শেষে জমিতে চাষ দিতে হবে অথবা কোদাল দ্বারা কুপিয়ে দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমতো সেচ দেয়া দরকার। এছাড়া খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ দেয়া ভালো।

ডাল ছাঁটাইকরণ: চারা বা কলম রোপণের পর গাছকে সুন্দর একটি কাঠামো দেয়ার জন্য গোড়ার দিকের সমস্ত ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে। এছাড়া বর্ষার শেষে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত, ভাঙ্গা ও দুর্বল ডাল পালা ছাঁটাই করতে হবে।

ফল সংগ্রহ: ডালপালায় ঝাকুনি দিয়ে ফল মাটিতে ফেললে ফল আঘাত প্রাপ্ত হয়ে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তবে গাছের নিচে জাল ধরে শাখায় ঝাকুনি দিয়েও ফল সংগ্রহ করা যায়। সমস্ত ফল একসাথে পরিপক্ক হয় না। তাই ২/১ দিন পরপর ফল সংগ্রহ করতে হয়। সংগ্রহের সাথে সাথেই ফল বাজারজাত করতে হবে, কেননা সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে সংগৃহীত ফলে ভিটামিন 'সি' এর পরিমাণ কমতে থাকে।

অন্যান্য পরিচর্যা

মরিচা রোগ: এ রোগের আক্রমণে পাতা ও ফলে মরিচা দাগ পড়ে। এতে গাছের ফলন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ফলের গুণগতমান বিনষ্ট হয় ও বাজার মূল্য কমে যায়।

প্রতিকার: প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ইন্ডোফিল এম-৪৫ মিশিয়ে স্প্রে করলে এ রোগ দমন করা যায়।

আঁশফল

আঁশফল আমাদের দেশে একটি বিদেশি ফল। আঁশফল লিচু পরিবারভুক্ত একটি ফল। স্বাদে, গন্ধে, পুষ্টিতে লিচুর সমতুল্য হওয়া সত্ত্বেও ফলটি এ দেশে তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে আঁশফল বেশ জনপ্রিয়। উন্নত গুণগত মানসম্পন্ন জাত না থাকায় ফলটি সর্বমহলে তেমন পরিচিত হয়ে ওঠেনি। ফল আকারে ছোট এবং খেতে সুস্বাদু। দেশের সর্বত্রই এর চাষ সম্ভব। আঁশফলে প্রচুর পরিমাণে শর্করা ও ভিটামিন 'সি' রয়েছে।

আঁশফলের জাত

বারি আঁশফল-১

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৯৭ সালে বারি আঁশফল-১ জাতটি আমাদের দেশে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেয়া হয়। এটি একটি বহু বর্ষজীবী বৃক্ষ। উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মাঝারী খাড়া প্রকৃতির ও মধ্যম ঝোপালো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল ছোট (গড় ওজন ৩.৫ গ্রাম), গোলাকার, বাদামী রঙের, শাঁস সাদা, কচকচে এবং স্বাদ খুব মিষ্টি (ব্রিক্সমান ২০-২৫%)। খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৫-৬০%। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষ যোগ্য। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩-৪ টন। ফুল আসে মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মার্চ) মাসে এবং মধ্য-শ্রাবণ থেকে মধ্য-ভাদ্র (আগস্ট) মাসে ফল পাকে। জাতটি দেশের সর্বত্রই ভাল জন্মে।

বারি আঁশফল-১

বারি আঁশফল-২

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফল বিভাগ বারি আঁশফল-২ নামে আঁশফলের একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। নিয়মিত ফলধারী জাতটি বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্বাচন করে ২০০৯ সালে মুক্তায়ন করা হয়। ফল গোলাকৃতির, বেশ বড় (৯ গ্রাম), শাঁস সাদা, আংশিক কচকচে, রসালো, খুব মিষ্টি (টিএসএস ২৫%)। বীজ ছোট, খোসা পাতলা, ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৩%। দেশের মধ্য, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে চাষোপযোগী জাতটি ফলের আহরণ মৌসুম দীর্ঘায়িত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে।

বারি আঁশফল-২

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন: আঁশফল চাষের জন্য দোআঁশ মাটি উত্তম।

চারা উৎপাদন: গ্রাফটিং ও গুটি কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করা যায়।

গর্ত তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৫ × ৫ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার আকারের গর্ত করতে হবে। গর্তের উপরের মাটির সাথে ১৫-২০ কেজি জৈব সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে তাতে পানি দিতে হবে।

চারা রোপণ: বাগানে রোপণের দূরত্ব ৫ × ৫ মিটার রাখতে হবে। এ হিসেবে হেক্টরপ্রতি চারা লাগবে ৪০০টি।

সারের পরিমাণ: গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চ ফলন পেতে হলে আঁশফলে নিয়মিত সার প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। গাছের বয়স বাড়ার সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। নিম্নের ছকে গাছের বয়স ভিত্তিক সারের পরিমাণ দেয়া হলো।

গাছের বয়স	জৈব সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিপসাম (গ্রাম)
১-২ বছর	৫-১০	১৫০-২৫০	১৫০	১৫০	৫০
৩-৪ বছর	১০-১৫	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০	৩০০-৪৫০	১০০
৫-৬ বছর	১৫-২০	৫০০-৬০০	৪৫০-৬০০	৪৫০-৬০০	২০০
৭-১০ বছর	২০-২৫	৭৫০-১০০০	৬০০-৭৫০	৬০০-৭৫০	৩০০
১১ বছর বা তদুর্ধ্ব	২৫-৩০	১০০০-১২০০	৭৫০-৯০০	৭৫০-৯০০	৪০০

উল্লিখিত সার তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম বার ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মুকুল আসার পর ২য় বার জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বীজের রং ধারণ পর্যায়ে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল সংগ্রহের পর ৩য় বার সার প্রয়োগ করতে হয়।

সেচ প্রয়োগঃ খরার সময় পানি সেচের প্রয়োজন হয়। অতিবৃষ্টির সময় পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

রাম্বুতান

রাম্বুতান আকর্ষণীয়, অত্যন্ত সুস্বাদু ও রসালো ফল। সাদা, স্বচ্ছ, মিষ্টি স্বাদ ও গন্ধযুক্ত শাঁস এ ফলের ভক্ষণীয় অংশ। গায়ে লাল ও নরম কাঁটা থাকার কারণে এদের লিচু থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখায়। মালেশিয়া ও ইন্দোনেশিয়াতেই এদের উৎপত্তিস্থল এবং দক্ষিণ চীন, ইন্দোচীন ও ফিলিপাইন পর্যন্ত এটি বিস্তৃত।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহ (যেখানে শীতের প্রকূপ তুলনামূলকভাবে কম) রাম্বুতান চাষের জন্য অধিক উপযোগী।

রাম্বুতান ফল

পুষ্টিমান

রাম্বুতান 'শর্করা' ও ভিটামিন 'সি' সমৃদ্ধ একটি ফল। আহার উপযোগী প্রতি ১০০ গ্রাম ফলে (জলীয় অংশ ৮২.১%, প্রোটিন ০.৯%, ফ্যাট ০.১%, ০.০৩% আঁশ, ০.০৫% ম্যালিক এসিড, ০.৩১% সাইট্রিক এসিড), ২.৮ গ্রাম গ্লুকোজ, ৩.০ গ্রাম ফ্রুকটোজ, ৯.৯ গ্রাম সুক্রোজ, ২.৮ গ্রাম ফাইবার, ৭০ মিলি গ্রাম ভিটামিন সি, ১৫ মিলি গ্রাম ক্যালসিয়াম, ০.১-২.৫ মিলি গ্রাম লৌহ, ১৪০ মিলি গ্রাম পটাসিয়াম, ও ১০ মিলি গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়।

রাম্বুতানের জাত

বারি রাম্বুতান-১

বারি রাম্বুতান-১

বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত জাতটি ২০১০ সালে বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য বারি রাম্বুতান-১ নামে অনুমোদন দেয়া হয়। নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ বড় ও ঝোপালো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে, চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফল ধরে। শ্রাবণ মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়, ফল ডিম্বাকৃতির, আকারে বড় (৫০ গ্রাম)। পাকা ফলের রং আকর্ষণীয় লালচে খয়েরি। ফলের গায়ের কাঁটা (স্পাইনলেট) বেশ লম্বা ও নরম। শাঁস পুরুত্ব, মাংসল, সাদা, নরম, রসালো সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৯%)। বীজ ছোট ও নরম, খাদ্যোপযোগী অংশ ৫৮%। বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন।

জলবায়ু ও মাটি: রাম্বুতান উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু পছন্দ করে। রাম্বুতান ফলের গাছ ২২-৩৫° সে. তাপমাত্রা ও ২০০০ থেকে ৩০০০ মিমি বার্ষিক বৃষ্টিপাত পছন্দ করে। এঁটেল দোঁআশ মাটি রাম্বুতান চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। তবে উর্বর, সুনিষ্কাশিত পলিমাটি ও দোআঁশ মাটিতেও রাম্বুতান সাফল্যজনকভাবে চাষ করা যায়। সুনিষ্কাশিত উচ্চ জৈব পদার্থ সম্বলিত মাটিতে গাছের মূলের বৃদ্ধি ও বিকাশ ভাল হয়। মাটির অম্ল/ক্ষারত্ব (pH ৫.০-৬.৫) রাম্বুতানের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। রাম্বুতান স্বল্পমেয়াদী জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারলেও দীর্ঘস্থায়ী জলাবদ্ধতায় গাছ মারা যায়।

বংশ বিস্তার: অঙ্গজ উপায়ে অথবা বীজের মাধ্যমে রাম্বুতানের বংশ বিস্তার হয়ে থাকলেও মাতৃ গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার উত্তম। কুঁড়ি সংযোজন ও গুটিকলম পদ্ধতিতে রাম্বুতানের বংশ বিস্তার করা হয়। ১-২ বৎসর বয়সী শাখা থেকে সুপ্ত কুঁড়ি সংগ্রহ করে ৮-১২ মাস বয়সের রুটস্টক সংযোজন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া গুটি কলম পদ্ধতিতে সফলতার হার বেশি এবং শ্রমসাধ্য। ১০০০-১৫০০ পিপিএম ঘনত্বের আইবিএ ব্যবহার করে গুটি কলমের মাধ্যমেও সফলভাবে রাম্বুতানের বংশ বিস্তার করা যায়।

জমি তৈরি: রাম্বুতানের জন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারী উঁচু উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে। পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। মাদা তৈরির পূর্বে জমি থেকে বহুবর্ষজীবী আগাছা বিশেষ করে উলুঘাস সমূলে অপসারণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি: সমতল ভূমিতে বর্গাকার কিংবা ষড়ভুজাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে কলম রোপণ করতে হবে। কলম রোপণের পর হালকা ও অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো।

রোপণের সময়: মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর কলম রোপণের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি: উভয় দিকে ৮-১০ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার আকারের গর্ত করে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। কলম রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২৫-৩০ কেজি পচা গোবর, ৫০০ গ্রাম টিএসপি, ৩০০ গ্রাম এমওপি, ২০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে পানি সেচ দিতে হবে।

চারা রোপণ: গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারাটি সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে লাগিয়ে কলমের চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে এবং খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে যাতে বাতাসে চারার গোড়া নড়ে না যায়। রোপণের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে। এরপর নিয়মিত পানি সেচ ও প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ: বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিম্নরূপ:

গাছের বয়স	গাছপ্রতি সারের পরিমাণ			
	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২ বছর	১০-১৫	২০০	২৫০	১৫০
২-৪ বছর	১৫-২০	৩০০	৪৫০	৩০০
৫-৭ বছর	২০-২৫	৪৫০	৭৫০	৪৫০
৮-১০ বছর	২৫-৩০	৭৫০	১২০০	৬০০
১০-১৫ বছর	৩০-৪০	১২০০	১৫০০	৭৫০
১৫ বছরের উর্ধ্বে	৪০-৫০	১৫০০	২০০০	১০০০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি ফল আহরণের পর (ভাদ্র মাসে), দ্বিতীয় কিস্তি শীতের প্রারম্ভে (কার্তিক মাসে) এবং শেষ কিস্তি গাছে ফল আসার পর (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে) প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে সার প্রয়োগের পর সেচ প্রদান করতে হবে।

আগাছা দমন: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখা প্রয়োজন। বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: রাম্বুতান গাছ খরা সংবেদনশীল। চারার বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোটা পর্যায়ে একবার, ফল মটর দানার মতো হলে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আরও একবার মোট তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া ভাল। বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে তার জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া ফুল আসার ৬-৮ সপ্তাহ আগে সামান্য পানির কষ্ট/পীড়ন দিলে আগাম ও অধিক ফুল ফুটতে দেখা যায়।

ডাল ও মুকুল ছাঁটাইকরণ: রাম্বুতান গাছকে সধারণত লম্বা ও খাড়াভাবে বাড়তে দেখা যায়। তাই প্রথম দিকেই গাছের সঠিকভাবে প্রুনিং করা জরুরি। ফল সংগ্রহের পরপর ফলের বোটা গোড়া থেকে কেটে দিতে হবে তাতে গাছের নতুন কুঁড়িগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। মৃত, রোগাক্রান্ত এবং লকলকে ডালপালাগুলো নিয়মিত অপসারণ করতে হবে। কলমের ক্ষেত্রে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রথম ৩-৪ বছর পর্যন্ত মুকুল আসলে তা কেটে দিতে হবে।

ফল সংগ্রহ : সাধারণত ফল ও স্পাইনলেটের রং লালচে বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ক ফলে মিষ্টতা ও অন্যান্য গুণাবলী পরিপক্ক ফলের তুলনায় অনেক কম থাকে। ভাল বাজার মূল্য পাওয়ার জন্য ফল লালচে খয়েরী বর্ণ ধারণ করার ১০-১২ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা ভাল। গাছে ফল অতিরিক্ত পাকিয়ে সংগ্রহ করলে এরিল শুকিয়ে শক্ত হয় এবং ফলের সুগন্ধ ও স্বাদ কমে যায়।

স্ট্রবেরি

স্ট্রবেরি একটি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। মৃদু শীত প্রধান দেশে এটি স্বল্প মেয়াদী ফল হিসেবে চাষ হয়। আকর্ষণীয় রং, গন্ধ ও উচ্চ পুষ্টিমানের জন্য স্ট্রবেরি অত্যন্ত সমাদৃত। এতে প্রচুর ভিটামিন 'সি' ছাড়াও পর্যাপ্ত পরিমাণে অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। ফল হিসেবে সরাসরি খাওয়া ছাড়াও বিভিন্ন খাদ্যের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ বৃদ্ধিতেও স্ট্রবেরি ব্যবহৃত হয়।

ফলসহ স্ট্রবেরি গাছ

স্ট্রবেরির জাত

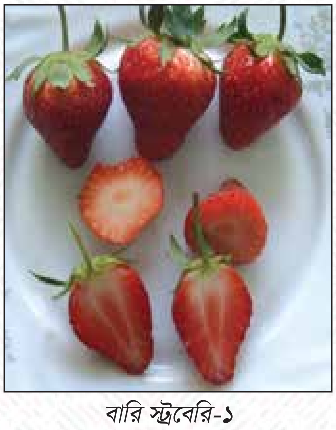

বারি স্ট্রবেরি-১

বারি স্ট্রবেরি-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারি স্ট্রবেরি-১ নামে একটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে। জাতটি ২০০৮ সালে অবমুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছের গড় উচ্চতা ৩০ সেমি এবং বিস্তার ৪৫-৫০ সেমি। নভেম্বরের মাঝামাঝী সময়ে গাছে ফুল আসতে শুরু করে এবং ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। গাছপ্রতি গড়ে ৩২টি ফল ধরে যার মোট গড় ওজন ৪৫০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন। হৃৎপিণ্ডাকৃতির ফল ক্ষুদ্র থেকে মধ্যম আকারের যার গড় ওজন ১৪ গ্রাম। পাকা ফল আকর্ষণীয় টকটকে লাল বর্ণের। ফলের ত্বক নরম ও ঈষৎ খসখসে। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। স্ট্রবেরির বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সুগন্ধযুক্ত ফলের স্বাদ টক-মিষ্টি (টিএসএস-১২%)। জাতটি পর্যাপ্ত সরু লতা ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশ বিস্তার সহজ।

বারি স্ট্রবেরি-২

বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী একাট উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছপ্রতি গড়ে ৩৭টি ফল ধরে যার মোট গড় ওজন ৭৪১ গ্রাম। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। মধ্য ডিসেম্বর থেকে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়। ফল দেখতে আকর্ষণীয় গাঢ় লাল রঙের, তুলনামূলক দৃঢ়, আকারে বেশ বড়, প্রান্তভাগ চ্যাপ্টা, রসালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (টিএসএস ৮%)। ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন

বারি স্ট্রবেরি-২

সি' বিদ্যমান (৭৬ মি. গ্রা./১০০ গ্রাম)। ফল ২-৩ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়। জাতটি পর্যাপ্ত সরুলতা (রানার) ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশবিস্তার সহজ।

বারি স্ট্রবেরি-৩

বাংলাদেশের সর্বত্র চাষোপযোগী একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ প্রতি গড়ে ৩৯ টি ফল ধরে যার মোট গড় ওজন ৭৭০ গ্রাম। ফলের শতভাগ ভক্ষণযোগ্য। ফল দেখতে আকর্ষণীয় লাল রঙের, লম্বা মোচাকৃতি, আকারে বেশ বড়, ফল তুলানামূলক দৃঢ়, প্রান্তভাগ সরু, রসালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি। ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি' বিদ্যমান (৭২ মি. গ্রা./১০০ গ্রাম)। ফল ২-৩ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা ডায়। জাতটি পর্যাপ্ত সরু লতা (রানার) ও চারা উৎপাদন করে বিধায় এর বংশ বিস্তার সহজ।

বারি স্ট্রবেরি-৩

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: স্ট্রবেরি মূলত মৃদু শীত প্রধান অঞ্চলের ফসল। কিন্তু গ্রীষ্মায়িত জাত কিছুটা তাপ সহিষ্ণু। দিন ও রাতে যথাক্রমে ২০-২৬° ও ১২-১৬° সে. তাপমাত্রা গ্রীষ্মায়িত জাতসমূহের জন্য প্রয়োজন। ফুল ও ফল আসার সময় শুষ্ক আবহাওয়া আবশ্যক। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় রবি মৌসুম স্ট্রবেরি চাষের উপযোগী। বৃষ্টির পানি জমে না এ ধরনের উর্বর দোআঁশ থেকে বেলে-দোআঁশ মাটি স্ট্রবেরি চাষের জন্য উত্তম।

চারা উৎপাদন: স্ট্রবেরি রানারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করে থাকে। তাই পূর্ববর্তী বছরের গাছ নষ্ট না করে জমি থেকে তুলে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে রোপণ করতে হবে। উক্ত গাছ হতে উৎপন্ন রানারে যখন শিকড় বের হবে তখন তা কেটে ৫০ ভাগ গোবর ও ৫০ ভাগ পলিমাটিযুক্ত পলিথিন ব্যাগে লাগাতে হবে এবং হালকা ছায়াযুক্ত নার্সারিতে সংরক্ষণ করতে হবে। অতিরিক্ত বৃষ্টির হাত হতে চারাকে রক্ষার জন্য বৃষ্টির মৌসুমে চারার উপর পলিথিনের ছাউনি দিতে হবে। রানারের মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা হলে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। তাই জাতের ফলন ক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখার জন্য টিস্যু কালচারের মাধ্যমে উৎপাদিত চারা ব্যবহার করা উত্তম।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: স্ট্রবেরি উৎপাদনের জন্য কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে উত্তমরূপে জমি তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের জন্য বেড পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এ জন্য ১ মিটার প্রশস্ত এবং ১৫-২০ সেমি উঁচু বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে ৪০-৫০ সেমি নালা রাখতে হবে। প্রতি বেডে ৫০-৬০ সেমি দূরত্বে দুই সারিতে ৩০-৪০ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আশ্বিন মাস (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর) স্ট্রবেরির চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

সার প্রয়োগ: গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চফলন পেতে হলে স্ট্রবেরির জমিতে হেক্টরপ্রতি নিম্নলিখিত পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	হেক্টরপ্রতি পরিমাণ
পচা গোবর	৩০ (টন)
ইউরিয়া	২৫০ (কেজি)
টিএসপি	২০০ (কেজি)
এমওপি	২২০ (কেজি)
জিপসাম	১৫০ (কেজি)

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম ও অর্ধেক পরিমাণ এমওপি সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও অবশিষ্ট এমওপি সার চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ১৫-২০ দিন অন্তর ৪-৫ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন: জমিতে রসের অভাব দেখা দিলে প্রয়োজন মতো পানি সেচ দিতে হবে। স্ট্রবেরি জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই বৃষ্টি বা সেচের অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: সরাসরি মাটির সংস্পর্শে এলে স্ট্রবেরির ফল পচে নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর স্ট্রবেরির বেড খড় বা কাল পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খড়ে যাতে উঁই পোকার আক্রমণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রতি লিটার পানির সাথে ৩ মিলি ডার্সবান-২০ ইসি ও ২ গ্রাম অটোস্টিন ডিএফ মিশিয়ে ঐ দ্রবণে খড় শোধন করে নিলে তাতে উঁই পোকার আক্রমণ হয় না এবং দীর্ঘ দিন তা অবিকৃত থাকে। জমি সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া হতে নিয়মিতভাবে রানার বের হয়। উক্ত রানারসমূহ ১০/১৫ দিন পর পর কেটে ফেলতে হবে। রানার কেটে না ফেললে গাছের উৎপাদন হ্রাস পায়।

ফল সংগ্রহ: ভাদ্র মাসের মাঝামাঝী (অক্টোবরের শুরু) সময়ে রোপণকৃত বারি স্ট্রবেরি-১ এর ফল সংগ্রহ পৌষ মাসে শুরু হয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চলে। ফল পেকে লাল বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হয়। স্ট্রবেরির সংরক্ষণ কাল খুবই কম বিধায় ফল সংগ্রহের পর পরই তা টিস্যু পেপার দিয়ে মুড়িয়ে প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা ডিমের ট্রেতে এমনভাবে সংরক্ষণ করতে হবে যাতে ফল গাদাগাদি অবস্থায় না থাকে। ফল সংগ্রহের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারজাত করতে হবে। স্ট্রবেরির সংরক্ষণ গুণ ও পরিবহন সহিষ্ণুতা কম হওয়ায় বড় বড় শহরের কাছাকাছি এর চাষ করা উত্তম।

হেক্টরপ্রতি ৩৫-৪০ হাজার চারা রোপণ করা যায়। প্রতি গাছে ২৫০-৩০০ গ্রাম হিসেবে বারি স্ট্রবেরি-১ এর ফলন হেক্টরপ্রতি ১০-১২ টন।

স্ট্রবেরি বাগান

মাতৃ গাছ রক্ষণাবেক্ষণ: স্ট্রবেরি গাছ প্রখর সৌর-তাপ এবং ভারী বর্ষণ সহ্য করতে পারে না। এজন্য মার্চ-এপ্রিল মাসে হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। নতুবা ফল আহরণের পর মাতৃ গাছ তুলে টবে রোপণ করে ছায়ায় রাখতে হবে। ফল আহরণ শেষ হওয়ার পর সুস্থ-সবল গাছ তুলে পলিথিন ছাউনির নিচে রোপণ করলে মাতৃ গাছকে খরতাপ ও ভারী বর্ষণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা যায়। মাতৃ গাছ থেকে উৎপাদিত রানার পরবর্তী সময়ে চারা হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

পাতায় দাগ পড়া রোগ

কোন কোন সময় ছত্রাকজনিত রোগের পাতায় বাদামী রঙের দাগ পরিলক্ষিত হয়। এ রোগের আক্রমণ হলে ফলন এবং ফলের গুণগত মান হ্রাস পায়।

দাগ পড়া রোগে আক্রান্ত পাতা

প্রতিকার

সিকিউর নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করে সুফল পাওয়া যায়।

ফল পচা রোগে আক্রান্ত স্ট্রবেরি

ফল পচা রোগ

এ রোগের আক্রমণে ফলের গায়ে জলে ভেজা বাদামী বা কালো দাগের সৃষ্টি হয়। দাগ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ফল খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে যায়।

প্রতিকার

ফল পরিপক্ক হওয়ার পূর্বে নোইন ৫০ ডব্লিওপি অথবা অটোস্টিন নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৮-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ভারটিসিলাম উইল্ট রোগ

উইল্ট রোগে আক্রান্ত স্ট্রবেরি গাছ

এ রোগে আক্রান্ত গাছ হঠাৎ করে দুর্বল ও বিবর্ণ হয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে গাছ বাদামী বর্ণ ধারণ করে এবং মারা যায়। সাধারণত জলাবদ্ধতাসম্পন্ন জমিতে এ রোগের আক্রমণ বেশি হয়।

প্রতিকার

জমি শুষ্ক রাখতে হবে। পলিথিন মাল্‌চ ব্যবহার করলে তা তুলে ফেলতে হবে। কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক যেমন- বর্দোমিক্সার (১ঃ১ঃ১০) ৮-১০ দিন পরপর ২-৩ বার গাছের গোড়া ও মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে।

নেট দিয়ে ঘেরা স্ট্রবেরি বাগান

পাখি

বুলবুলি পাখি স্ট্রবেরির সবচেয়ে বড় শত্রু। ফল আসার পর সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই পাখির উপদ্রব শুরু হয়।

প্রতিকার

ফল আসার পর সম্পূর্ণ বেড জাল দ্বারা ঢেকে দিতে হবে যাতে পাখি ফল খেতে না পারে।

ভাইরাস

ভাইরাস রোগের আক্রমণে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা এবং গুণগত মান হ্রাস পেতে থাকে। সাদা মাছি এ ভাইরাস রোগ ছড়ায়।

প্রতিকার

এডমায়ার ২০০ এসএল নামক কীটনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ০.২৫ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করে সাদা মাছি দমন করলে ভাইরাস রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।

মাইট

স্ট্রবেরি চারা গাছ

মাইটের আক্রমণে স্ট্রবেরির ফলন ক্ষমতা ও গুণগত মান মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এদের আক্রমণে পাতা তামাটে বর্ণ ধারণ করে ও পুরু হয়ে যায় এবং আস্তে আস্তে কুচকে যায়। গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়।

প্রতিকার

ভারটিমেক ১৮ ইসি নামক মাকড়নাশক প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

বিলাতি গাব

গাছসহ বিলাতি গাব

বিলাতি গাব একটি বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ। গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলের সুন্দর ও সুস্বাদু ফলগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, পিরোজপুর এবং পাহাড়ী এলাকায় বিলাতী গাব গাছ দেখা যায়। বিলাতি গাবের গাছ মাঝারী থেকে উঁচু বৃক্ষ, ফল গোলাকার। বিলাতি গাব অনেকেই যত্ন সহকারে লাগিয়ে থাকেন। ফল হিসেবে দেশের সব এলাকায় এটি সমভাবে পরিচিত নয়। এর স্বাদ গন্ধ ও পুষ্টিমান সম্পর্কে সর্বমহলে ধারণার অভাব থাকায় সম্ভাবনাময় এ ফলটি তেমন বিস্তার লাভ করেনি। বিলাতি গাবের ত্বক রেশমী লোমে আবৃত, রং বাদামী থেকে উজ্জ্বল লাল। ফলের শাঁস সাদাটে, আঠালো ও সুস্বাদু। পুরুষ ও স্ত্রী ফুল আলাদা গাছে হয়।

বিলাতি গাবের জাত

বারি বিলাতি গাব-১

দেশিয় জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে দীর্ঘদিন পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারি বিলাতি গাব-১ নামক জাতটি নির্বাচন করা হয়। সারা দেশে চাষাবাদের জন্য ২০১১ সালে জাতটি অনুমোদন করা হয়।

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ খাড়া, চির সবুজ ও অত্যধিক ঝোপালো। মাঘ-ফাল্গুন মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। গাছপ্রতি ৩৭২টি ফল ধরে যার ওজন ১২১ কেজি। ফল বড় (৩২৫ গ্রাম), গোলাকার ও আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল বর্ণের। ফলের শাঁস ধূসর বর্ণের, আঠালো, সুগন্ধযুক্ত এবং মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৫%)। ফলপ্রতি ৩-৪টি বীজ থাকে, বীজ ছোট, খোসা পাতলা, খাদ্যোপযোগী অংশ ৭২%। হেক্টরপ্রতি ফলন ৩০-৩৫ টন। দেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য।

বারি বিলাতি গাব-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: গ্রীষ্ম ও অব-গ্রীষ্ম মণ্ডলের উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া বিলাতি গাব চাষের জন্য উপযোগী। প্রায় সব ধরনের মাটিতে বিলাতি গাব গাছ সহজেই হতে পারে, তবে উর্বর মাটিতে বিলাতি গাব ভাল হয়। অনুর্বর মাটিতেও বিলাতি গাব ভাল ফলন দিতে সক্ষম। বিলাতি গাব গাছ অত্যন্ত কষ্ট সহিঞ্চু এবং অনেকটা বিনা যত্নেই ভাল ফলন দিয়ে থাকে। এরা যেমন খরা সহ্য করতে পারে তেমনি গোড়ায় দীর্ঘদিন পানি জমে থাকলেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

বংশ বিস্তার: বীজের মাধ্যমে সাধারণত বিলাতি গাবের বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। বীজাবরণ বেশ শক্ত বিধায় পরিপক্ক ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করে ২৪-৩০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদ্গম ত্বরান্বিত হয়। বীজ দ্বারা বংশ বিস্তার করা হলে মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থকে না বিধায় অযৌন পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করা উত্তম। অঙ্গজ উপায়ে গুটি কলম এবং এক বছর বয়স্ক বিলাতি গাবের চারার উপর ভিনিয়ার/ক্লেফট পদ্ধতিতে সহজেই বিলাতি গাবের কলম করা যায়। বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাস কলম করার উপযুক্ত সময়।

রোপণ পদ্ধতি: সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভুজ প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিলাতি গাবের চারা রোপণ করা যায়।

মাদা তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৬.০ মিটার দূরত্বে ১ × ১ × ১ মিটার মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫-২০ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২০০ গ্রাম টিএসপি এবং ২৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি: এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা/কলম রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমতো পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ

প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে:

সার	গাছের বয়স			
	১-৩ বছর	৪-৭ বছর	৮-১০ বছর	১০ বছর এর উর্ধ্বে
গোবর/কম্পোস্ট সার (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-২৫	২৫-৩০
ইউরিয়া (গ্রাম)	২০০-৩০০	৩০০-৪৫০	৫০০-৮০০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০

সবটুকু সার তিন ভাগ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন ও মাঘ-ফাল্গুন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমতো সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ দিলে ফল ঝরা কমে, ফলন বৃদ্ধি পায় এবং ফলের আকার ও অন্যান্য গুণাগুণ ভাল হয়।

ডাল ছাঁটাইকরণ: চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে রাখতে হবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

ফল সংগ্রহ: শীতের শেষে গাছে ফুল আসে এবং বর্ষার শেষভাগে শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল পাকে। ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির সাথে সাথে হালকা লাল থেকে উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে। পরিপক্ক ফল হাত দিয়ে কিংবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটা দিয়ে সংগ্রহ করতে হয়।

কদবেল

বারি কদবেল-১

নিয়মিত প্রচুর ফল প্রদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ মাঝারী, ছড়ানো আকৃতির ঝোপালো। মধ্য বৈশাখ থেকে আষাঢ় মাসে গাছে ফুল আসে এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ফল আহরণ করা যায়। ফল গোলাকৃতির, আকারে বড় এবং পাকা ফল সবুজাভ বাদামী বর্ণের। ফলের শাঁস গাঢ় বাদামী ও মধ্যম রসালো, আঁশের পরিমাণ কম, স্বাদ টক-মিষ্টি (ব্রিক্সমান ১৮.৬৭%)। ফলের ওজন ৩৪৪ গ্রাম, খাদ্যোপযোগী অংশ ৬৯.১৫%। গাছপ্রতি ২০০০-২৫০০টি ফল হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন। জাতটি দেশের সর্বত্র চাষের উপযোগী।

বারি কদবেল-১

বংশ বিস্তার

যৌন ও অযৌন দুই উপায়েই কদবেলের বংশ বিস্তার করা সম্ভব। বাংলাদেশে সাধারণত বীজ দিয়েই কদবেলের বংশ বিস্তার করা হয়। পর-পরাগায়িত বলে বীজের গাছে মাতৃ গাছের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে না। এজন্য উৎকৃষ্ট জাতের চারা উৎপাদন করতে চাইলে গুটি কলম অথবা কুঁড়ি সংযোজন/জোড় কলম পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। জুন-জুলাই মাসে ১ বা ২ বছরের চারা আদিজোড় হিসেবে ব্যবহার করে এর উপর তালি কলম (Patch budding) অথবা ভিনিয়ার/ফাটল কলমের মাধ্যমে সফলভাবে বংশ বিস্তার করা যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি: পূর্ণ রৌদ্রযুক্ত স্থানে কদবেলের চাষ করা উচিত। কদবেল চাষের জন্য বর্ষার পানি জমে না এমন জমি নির্বাচন করতে হবে। এর শিকড় মাটির খুব বেশি গভীরে প্রবেশ করে না তাই জমিতে পানির তল খুব বেশি নিচে

থাকা ক্ষতিকর। বাগান আকারে কদবেল আবাদের জন্য সমস্ত আগাছা, মোথা ও পুরাতন গাছের গুঁড়ি উপড়ে ফেলতে হবে। উত্তমরূপে চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করার পর নির্দিষ্ট স্থানে চারা রোপণের জন্য গর্ত তৈরি করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি, রোপণের সময় ও দূরত্ব: কদবেল গাছ বাগান আকারে করতে চাইলে বর্গাকার পদ্ধতি অনুসরণ করা ভাল। উঁচু নিচু পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর রোপণ প্রণালী অবলম্বন করা যেতে পারে। বর্ষার প্রারম্ভে অর্থাৎ বৈশাখ-আষাঢ় (মে- জুলাই) মাস কদবেলের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বর্ষায় চারা রোপণ না করা ভাল। তবে বর্ষার শেষের দিকে ভাদ্র-আশ্বিন মাসেও গাছ লাগানো চলে। বাগান আকারে কদবেলের চাষ করতে চাইলে ৬ মিটার × ৬ মিটার দূরত্বে এক বছর বয়সী চারা/কলম রোপণ করা উচিত।

মাদা তৈরি: চারা/কলম রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। প্রতি গর্তে ১০-১৫ কেজি গোবর সার, ২৫০ গ্রাম টিএসপি ও ২৫০ গ্রাম এমওপি সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে সেচ দিতে হবে। মাটিতে সার মিশানোর পূর্বে সম্ভব হলে গর্তের মধ্যে কিছু খড়কুটো ও কাঠের গুঁড়া দিয়ে পুড়িয়ে নিলে উইপোকা ও রোগ জীবাণুর আক্রমণ রোধ হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা: গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে ঠিক খাড়াভাবে চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের সময় মাটি নিচের দিকে ভালভাবে চাপ দিতে হয় যাতে চারাটি শক্তভাবে দাড়িয়ে থাকতে পারে। চারাটি একটি বা দুটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গরু ছাগলের উপদ্রব থেকে চারাকে রক্ষার জন্য বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। চারা রোপণের পর প্রয়োজনীয় সেচের ব্যবস্থা নিতে হবে। এমতাবস্থায় মালচিং দিলে খুবই ভাল হয়।

ডাল ছাঁটাইকরণ: সাধারণভাবে কদবেলের চারা/কলমের মধ্যে ছোট অবস্থায় ঝোপালো হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। রোপণের পর গোড়ার দিকে ১.০-১.৫ মিটার পর্যন্ত সমস্ত ডাল ছাঁটাই করতে হবে। এর ওপর থেকে চতুর্দিকে ছড়ানো ৪-৫টি ডাল রেখে দিতে হবে যাতে গাছটির একটি সুন্দর কাঠামো তৈরি হয়। ফল সংগ্রহ শেষ হলে গাছের ছোট ছোট ডালপালা ছেটে দেয়া দরকার।

গাছে সার প্রয়োগ: গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হল:

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)			
	১-৪	৫-১০	১১-১৫	১৫ এর উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-৩০	৩০-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	১৫০-৩০০	৪৫০-৬০০	৬০০-৭৫০	১০০০
টিএসপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪৫০	৫০০
এমওপি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪৫০	৫০০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার প্রারম্ভে (বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে), দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার শেষে (ফল আহরণের পর) এবং শেষ কিস্তি শীতের শেষে (মাঘ-ফাল্গুন মাসে) প্রয়োগ করতে হবে। সারগুলো একত্রে মিশিয়ে গাছের চারদিকে (গোড়া থেকে ০.৫-১.০ মিটার জায়গা ছেড়ে দিয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এলাকা পর্যন্ত) ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর সার ছিটানো জায়গার মাটি কুপিয়ে সারগুলো মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: চারা রোপণের পর ঘন ঘন সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকনো মৌসুমে পানি সেচ দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহ: ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে এবং শীতের প্রারম্ভে অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ফল পাকতে শুরু করে। আমাদের দেশে সাধারণত অপরিপক্ক ফল আহরণ করে কয়েকদিন রোদে রেখে পাকানো হয়। এতে ফলের কাঙ্ক্ষিত স্বাদ ও গন্ধ পাওয়া যায় না এবং অনেক ফল নষ্ট হয়। ফল পরিপক্ক হলে এর ত্বক ধুসর মলিন বর্ণ ধারণ করে এবং ফলের বোঁটা আলগা হয়ে যায়। সামান্য ঝাকুনিতেই ফল ঝরে পড়ে। গাছে ঝাকি দিয়ে ফল আহরণ করা উচিৎ নয়। এতে অনেক ফল বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ফেটে নষ্ট হয়।

বেল

বেল (Rutaceae) পরিবারভুক্ত একটি দীর্ঘজীবী উদ্ভিদ। গাছ ঝোপালো স্বভাবের। পাতা যৌগিক, ওভেট, পত্রফলকের অগ্রভাগ সুঁচালো ও গাঢ় সবুজ বর্ণের। পত্র ঝরার সময় হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করে। ফুল দেখতে সাদা রঙের এবং সবসময় গুচ্ছাকারে জন্মে। ফুলে ৫টি করে মঞ্জরীপত্র, বৃত্তাংশ ও পাপড়ি বিদ্যমান। ফল অ্যাম্ফিসারকা জাতীয় এবং বহুজীবী। ফল তুলনামূলকভাবে মাঝারি আকৃতির। বীজ সাধারণত গোলাকার এবং সাদা রঙের হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Aegle marmelos*। বেল উষ্ম ও অবউষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদ। জাতটি পাহাড়ী এলাকাসহ বাংলাদেশের সর্বত্র চাষযোগ্য ও খরা সহিষ্ণু। বর্তমানে বেল বাংলাদেশের সর্বত্র জন্মে। এ ফলটি কাঁচা পাকা অবস্থাতেই খাওয়া যায়। তবে পাকা বেল সরবত তৈরিতে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। কাঁচা বেল পুড়ে খাওয়া হয়।

বারি বেল-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি বেল-১ নামে বেলের একটি জাত উদ্ভাবন করেছে। ফল মাঝারী আকারের। গড় ওজন ৯০০ গ্রাম। ফলের শীর্ষ গর্তের মত। রঙ হলুদাকার। স্থানীয় জাতের বেলের (৬৬.০%) তুলনায় বারি বেল-১ এর খাদ্যোপযোগী অংশ বেশি (৭৮.১%)। ফলের শাঁসের ব্রিক্সমান-৩৫% এবং তিতাবিহীন। ফলে বীজের সংখ্যা কম এবং প্রতিটি ফলে গড়ে ৯১টি বীজ পাওয়া যায়, ওজন ৯০০ গ্রাম।

বারি বেল-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

ক্রেফট গ্রাফটিং বা ফাটল কলমের সাহায্যে কলমের চারা তৈরি করা হয়। সাধারণত মে মাসের মাঝামাঝী সময়ে ৬০ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় গর্ত করতে হবে। গর্ত করার সময় গর্তের উপরের অর্ধেক অংশের মাটি এক পার্শ্বে এবং নিচের অংশের মাটি অন্য পার্শ্বে রাখতে হবে। গর্ত থেকে মাটি উঠানোর ১০ দিন পর্যন্ত গর্তটিকে রৌদ্রে শুকাতে হয়। এরপর প্রতি গর্তে ১০ কেজি গোবর সার ও ১৫০ গ্রাম টিএসপি উপরের অংশের মাটির সাথে মিশিয়ে মাটি উলট-পালট করে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাটের সময় উপরের অর্ধেক অংশের মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট না করা হলে প্রয়োজনে পার্শ্ব থেকে উপরের মাটি গর্তে দিতে হবে। তবে গর্তের নিচের অংশের মাটি দিয়ে গর্ত ভরাট না করা উত্তম। কলমের চারাটি জুন-জুলাই মাসে নির্ধারিত গর্তে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর কলমের চারাটি সোজা করে খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং বৃষ্টি না হলে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। কলমের চারা সংগ্রহ করে সারি থেকে সারি ও চারা থেকে চারা ৫ মিটার দূরত্বে গর্ত করে রোপণ করা হয়। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বৃদ্ধি করতে হবে। গাছের বয়স ১-২ বছর হলে পচা গোবর সার/আবর্জনা পচা সার ১৫ কেজি, ইউরিয়া সার ২৫০ গ্রাম, টিএসপি সার ২০০ গ্রাম, এমওপি সার ১৫০ গ্রাম, জিপসাম ১০০ গ্রাম, জিংক সালফেট ২০ গ্রাম এবং বোরিক এসিড বা পাউডার ১৫ গ্রাম প্রতিটি গাছের জন্য বছরে একবার প্রয়োগ করতে হবে। কারণ ফল সংগ্রহ করার পরপরই গাছে নতুন পাতা আসবে এবং ফুল আসা শুরু করবে। গ্রাফটিং এর গাছ সাধারণত ৫-৬ বছর পর ফল দিয়ে থাকে।

পোকা-মাকড় ও রোগবালাই দমন ব্যবস্থাপনা

বারি বেল-১ এ পোকা মাকড়ের উপদ্রব কম। জাতটি চাষাবাদে তেমন কোন বালাইনাশকের প্রয়োজন পড়ে না। তবে লেপিডোপটেরা পোকা বেলের পাতা খায়। নতুন পাতা বের হলে সাইপারমেথ্রিন, কার্বারিল, ইমিডাকোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক নির্দেশিত মাত্রায় মাত্র একবার ব্যবহার করলে পোকাটির আক্রমণ থেকে বেলের পাতাকে রক্ষা করা যাবে।

জলপাই

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি জলপাই-১ নামে একটি জাত উদ্ভাবন করেছে, এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল-

বারি জলপাই-১

উচ্চ ফলনশীল নিয়মিত ফলদানকারী জাত। গাছ মধ্যম আকৃতির, ছড়ানো ও কিছুটা ঝোপালো। কার্তিক মাসের শেষার্ধ থেকে পৌষ মাসের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ফল আহরণ করা যায়। ফল তুলনামূলকভাবে বড় (গড় ওজন ৪৬.৩৩ গ্রাম), পাকা ফলের রঙ হালকা সবুজ, শাঁস সাদা, এবং মধ্যম টক (ব্রিক্সমান ৬.২০%)। বীজ খুব ছোট, খাদ্যোপযোগী অংশ ৮৪.৯৯%। বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষযোগ্য। গাছপ্রতি ১,৯০০-২,০০০টি ফল ধরে যার গড় ওজন ১২৫ কেজি।

বারি জলপাই-১

বংশ বিস্তার

বীজের মাধ্যমে সাধারণত বংশ বিস্তার করা হয়ে থাকে। বীজাবরণ খুব শক্ত বিধায় বীজ ২৪-৩০ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। বীজ থেকে উৎপাদিত চারায় মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে না এবং এতে ফল আসতেও অধিক সময় লাগে। পক্ষান্তরে কলমের চারায় মাতৃ গাছের গুণাগুণ অক্ষুণ্ন থাকে এবং এতে তাড়াতাড়ি ফল আসে। সাধারণত ১২-১৩ মাস বয়সের আদিজোড়ের সাথে ৩-৪ মাস বয়সের উপজোড় ভিনিয়ার/ফাটল পদ্ধতিতে কলম করা হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ বা মে- জুন মাস কলম করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত চারা রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি: বন্যার পানি দাঁড়ায় না এমন ধরনের উঁচু বা মাঝারী উঁচু জমি জলপাইয়ের জন্য নির্বাচন করতে হবে। বাগান আকারে চাষ করার ক্ষেত্রে চাষ ও মই দিয়ে ভালভাবে জমি তৈরি করতে হবে। দীর্ঘজীবী আগাছা বিশেষ করে উলু ঘাস সমূলে অপসারণ করতে হবে।

চারা রোপণের সময়: মে-অক্টোবর মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে পানি সেচের সুব্যবস্থা থাকলে সারা বছরই চারা রোপণ করা যেতে পারে।

গর্ত তৈরি: কলম রোপণের অন্তত ১৫-২০ দিন পূর্বে ৭ মিটার × ৭ মিটার দূরত্বে ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত করে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। কলম রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে গর্তপ্রতি ১৫-২০ কেজি পচা গোবর, ৩০০-৪০০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০-৩০০ গ্রাম এমওপি, ২০০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা: গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারাটি গর্তের ঠিক মাঝখানে এমনভাবে বসাতে হবে যেন চারার গোড়া ঠিক খাড়া থাকে এবং কোনভাবে আঘাত পাবার সম্ভাবনা না থাকে। চারা রোপণের পরপর পানি দিতে হবে এবং খুঁটি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে । তারপর ১-২ দিন অন্তর পানি দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

বেল গাছে সার প্রয়োগ: গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হলো:

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)			
	১-৪	৫-১০	১১-১৫	১৫ এর উর্দ্ধে
গোবর (কেজি)	১০-১৫	১৫-২০	২০-৩০	৩০-৪০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৩০০	৭৫০	১০০০	১২০০
টিএসপি (গ্রাম)	৩০০	৪৫০	৯০০	১২০০
এমওপি (গ্রাম)	৩০০	৪৫০	৬০০	৭৫০
জিপসাম (গ্রাম)	১০০	২০০	২৫০	৩০০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি চৈত্র-বৈশাখ মাসে (ফল আহরণের পর), দ্বিতীয় কিস্তি ফল বাড়ন্ত পর্যায়ে (আষাঢ়-শ্রাবন মাসে) এবং শেষ কিস্তি আশ্বিন-কার্তিক মাসে প্রয়োগ করতে হবে। সারগুলো একত্রে মিশিয়ে গাছের চারদিকে গোড়া থেকে ০.৫-১.০ মিটার জায়গা ছেড়ে দিয়ে শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত এলাকা পর্যন্ত ছিটিয়ে দিতে হবে। এরপর সার ছিটানো জায়গার মাটি কুপিয়ে সারগুলো মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ রস না থাকলে সার প্রয়োগের পর অবশ্যই সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ ও পানি নিষ্কাশন: যেহেতু জলপাই গাছ শুকনো আবহাওয়া ও খরা সহ্য করতে পারে, সেজন্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, মাটি ও গাছের বয়সের উপর ভিত্তি করে সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। শীতকালে ৪-৫ সপ্তাহ ও গরমকালে ২-৩ সপ্তাহ পর পর সেচ দিলে ভাল হয়। ফল ধরার পর কমপক্ষে দুবার সেচ দিতে হবে। বর্ষা মৌসুমে গাছের গোড়ায় যাতে জলবদ্ধতা না হয় সে জন্য দ্রুত পানি নিষ্কশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে।

পুষ্টি ঘাটতিজনিত সমস্যা

বোরনের অভাব: বোরনের অভাবে ফলের গায়ে দাদের মত খসখসে দাগ পড়ে। এত ফলের উজ্জ্বলতা নষ্ট হয় এবং বাজার মূল্য হ্রাস পায়।

প্রতিকার: বর্ষার শেষের দিকে সার প্রয়োগের সময় গাছপ্রতি ৫০ গ্রাম হারে বরিক এসিড বা ১০০ গ্রাম হারে বোরাক্স প্রয়োগ করতে হবে। ফলন্ত গাছে ০.২% হারে বরিক এসিড স্প্রে করলেও উপকার পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহ: বর্ষার প্রারম্ভে এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল আসে এবং শীতের পূর্বে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ফল পরিপক্ক হয়। পাকার পরও ফল সবুজ থাকে। তাই ফলের আকার বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করে ফল সংগ্রহ করতে হবে। ডালপালায় ঝাকুনি দিয়ে ফল মাটিতে ফেললে ফল আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। তবে গাছের নিচে জাল ধরে শাখায় ঝাকুনি দিয়েও ফল সংগ্রহ করা যায়। ভাল যত্ন নিলে পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে প্রতি বছর ২০০-২৫০ কেজি ফল পাওয়া যায়।

ড্রাগন ফল

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে অনেক দেশের ন্যায় সম্প্রতি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি ড্রাগন ফল-১ নামে ড্রাগন ফলের একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে।

বারি ড্রাগন ফল-১ এর গাছ ও ফল

বারি ড্রাগন ফল-১

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। বারি উদ্ভাবিত ড্রাগন ফলের জাতটি সুস্বাদু এবং এ থেকে প্রচুর সংখ্যক ফল আহরণ করা যায়। ফলের আকার বড় (৩৭৫.১১ গ্রাম), পাকা ফলের খোসা লাল। শাঁস গাঢ় গোলাপী রঙের, রসালো এবং টিএসএস ১৩.২২%। খাদ্যোপযোগী অংশ ৮১%। বীজসমূহ খুব ছোট কালো ও নরম। ফলে বেটা কেরোটিন ১২.০৬ মিলিমাইক্রো গ্রাম/১০০ গ্রাম এবং ভিটামিন সি ৪১.২৭ মি. গ্রাম/১০০ গ্রাম থাকে। তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৯ থেকে ১৫টি এবং ফলন ৩.২২ কেজি/গাছ/বছর এবং ২০.৬ টন/হেক্টর/বছর।

বংশ বিস্তার: অঙ্গজ উপায়ে অথবা বীজের মাধ্যমে ড্রাগন ফলের বংশ বিস্তার হয়ে থাকলেও মাতৃ গুণাগুণ বজায় রাখার জন্য অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার কাম্য। বীজ দিয়ে সহজে এ ফলের বংশ বিস্তার করা যেতে পারে। তবে এতে ফল ধরতে একটু বেশি সময় লাগে এবং হুবহু মাতৃ বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে না। সেজন্য কাটিং এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার করা উত্তম। কাটিং এর সফলতার হার প্রায় শতভাগ এবং ফলও তাড়াতাড়ি ধরে। কাটিং থেকে উৎপাদিত একটি গাছে ফল ধরতে ১২-১৮ মাস সময় লাগে সাধারণত ছয় থেকে এক বছর বয়স্ক গাঢ় সবুজ শাখা হতে ২০ থেকে ৩০ সেমি লম্বা টুকরা কাটিং হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কাটিং ৫০ ভাগ পচা গোবর ও ৫০ ভাগ ভিটি বালুর মিশ্রণ দ্বারা পূর্ণ ৮ × ১০ ইঞ্চি আকারের পলি ব্যাগে স্থাপন করে ছায়া যুক্ত স্থানে রেখে দিতে হবে। ৩০ থেকে ৪৫ দিন পরে কাটিং এর গোড়া

থেকে শিকড় এবং কাণ্ডের প্রান্ত থেকে নতুন কুশি বেরিয়ে আসবে। তখন এটা মাঠে লাগানোর উপযুক্ত হবে। তবে উপযুক্ত পরিবেশ ও প্রয়োজন অনুযায়ী কাটিংকৃত কলম সরাসরি মূল জমিতেও লাগানো যায়।

জমি নির্বাচন ও তৈরি: ড্রাগন ফল চাষের জন্য সুনিষ্কাশিত উঁচু ও মাঝারী উঁচু উর্বর জমি নির্বাচন করতে হবে। পর্যায়ক্রমিক কয়েকটি চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। মাদা তৈরির পূর্বে জমি থেকে বহুবর্ষজীবী আগাছা বিশেষ করে উলুঘাস সমূলে অপসারণ করতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও রোপণের সময়: সমতল ভূমিতে বর্গাকার কিংবা ষড়ভুজাকার এবং পাহাড়ী জমিতে কন্টুর পদ্ধতিতে কাটিং ড্রাগন ফল রোপণ করতে হবে। কাটিং রোপণের পর হালকা ও অস্থায়ী ছায়ার ব্যবস্থা করতে পারলে ভাল। মধ্য এপ্রিল থেকে থেকে মধ্য অক্টোবর ড্রাগন ফল রোপণের উপযুক্ত সময়।

মাদা তৈরি: উভয় দিকে ২.৫-৩ মিটার দূরত্বে ১.৫ মিটার × ১.৫ মিটার × ১ মিটার আকারের গর্ত করে উন্মুক্ত অবস্থায় রাখতে হবে। গর্ত তৈরির ২০-২৫ দিন পর প্রতি গর্তে ২৫-৩০ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি, ১৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের অভাব থাকলে পানি সেচ দিতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর প্রতি গর্তে ৫০ সে.মি. দূরত্বে ৪টি ড্রাগন ফলের চারা রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের ১ মাস পর থেকে ১ বছর পর্যন্ত ৩ মাস অন্তর প্রতি গর্তে ১০০ গ্রাম ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে।

চারা রোপণ ও পরিচর্যা: গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর প্রতি গর্তে ৫০ সেমি দূরত্বে ৪ টি চারা সোজাভাবে গর্তের মাঝখানে লাগিয়ে চারার চারদিকের মাটি হাত দিয়ে চেপে ভালভাবে বসিয়ে দিতে হবে। রোপণের পরপরই পানি সেচ দিতে হবে। এরপর নিয়মিত পানি সেচ ও প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ড্রাগন ফলের গাছ লতানো এবং ১.৫ থেকে ২.৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এ জন্য গাছের সাপোর্টের জন্য চারা চরটির মাঝখানে ৪ মিটার লম্বা সিমেন্টের খুটি এমনভাবে পুতে দিতে হবে যাতে করে মাটির উপরে ৩ মিটার অবশিষ্ট থাকে। চারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে নারিকেলের রশি দিয়ে সিমেন্টের খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। গাছ বড় হলে কাণ্ড থেকে শিকড় বের হয়ে খুঁটিকে আকড়ে ধরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। প্রতিটি খুঁটির মাথায় একটি মটর সাইকেলের পুরাতন টায়ার মোটা তারের সাহায্যে আটকিয়ে দিতে হবে এবং গাছের মাথা ও অন্যান্য ডগা টায়ারের ভিতর দিয়ে বাহিরের দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এইরূপ ঝুলন্ত ডগায় ফল ধরার পরিমাণ বেশি হয়।

গাছে সার প্রয়োগ: বয়স বাড়ার সাথে সাথে গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিম্নরূপ:

গাছের বয়স	মাদাপ্রতি সারের পরিমাণ/বছর			
	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-৩ বছর	৪০-৫০	৩০০	২৫০	২৫০
৩-৬ বছর	৫০-৬০	৩৫০	৩০০	৩০০
৬-৯ বছর	৬০-৭০	৪০০	৩৫০	৩৫০
১০ বছরের উর্দ্ধে	৭০-৮০	৫০০	৫০০	৫০০

উল্লিখিত সার সমান তিন কিস্তিতে ফেব্রুয়ারি, জুন ও অক্টোবর মাসে প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পর প্রয়োজনে সেচ প্রদান করতে হবে।

আগাছা দমন: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত রাখা দরকার, বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে কোদাল দ্বারা কুপিয়ে বা চাষ দিয়ে আগাছা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: ড্রাগন ফল গাছ খরার ও জলাবদ্ধতার প্রতি খুব সংবেদনশীল। চারার বৃদ্ধির জন্য শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পরপর সেচ দিতে হবে। ফলন্ত গাছের বেলায় সম্পূর্ণ ফুল ফোটা পর্যায়ে একবার, ফল মটর

দানার মত হলে একবার এবং এর ১৫ দিন পর আর এক বার মোট তিনবার সেচের ব্যবস্থা করতে হবে। সার প্রয়োগের পর সেচ দেয়া ভাল। বর্ষার সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে থাকে তার জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। এ ছাড়া ফুল আসার ৬-৮ সপ্তাহ আগে সামান্য পানির কষ্ট/পীড়ন দিলে আগাম ও অধিক ফুল ফুটতে দেখা যায়।

প্রুনিং ও ট্রেনিং: ড্রাগন ফল দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং মোটা শাখা (ডগা) তৈরি করে। একটি এক বছরের গাছ ৩০টি পর্যন্ত শাখা তৈরি করতে পারে এবং ৪ বছর বয়সী একটি ড্রাগন ফলের গাছ ১৩০টি পর্যন্ত প্রশাখা তৈরি করতে পারে। তবে শাখা-প্রশাখা উৎপাদন উপযুক্ত ট্রেনিং ও ব্যবস্থাপনার উপর নির্ভর করে। একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, বাংলাদেশের ১২-১৮ মাস পর একটি গাছ ফল ধারণ করে। ফল সংগ্রহের পর ৪০-৫০ টি প্রধান শাখায় প্রত্যেকটিতে ১/২ টি সেকেন্ডারি শাখা অনুমোদন করা হয়। তবে এ ক্ষেতের টারসিয়ারি ও কোয়াটরনারি প্রশাখা কে অনুমোদন করা হয় না। ট্রেনিং এবং প্রুনিং এর কার্যক্রম দিনের মধ্য ভাগে করা ভালো। ট্রেনিং ও প্রুনিং করার পর অবশ্যই যে কোন ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে। অন্যথায় বিভিন্ন প্রকার রোগ বালাই আক্রমণ করতে পারে।

ফল সংগ্রহ ও ফলন: গোলাকার থেকে ডিম্বাকার উজ্জ্বল গোলাপী থেকে লাল রঙের ফল। যার ওজন ২০০-৭০০ গ্রাম। এ ফলগুলো ৭-১০ সেমি চওড়া এবং ৮-১৪ সেমি লম্বা হয়। ভিতরের পাল্প সাদা, লাল, হলুদ ও কালো রঙের হয়। পাল্পের মধ্যে ছোট ছোট কালো নরম অনেক বীজ থাকে। এই বীজগুলো দাঁতের নিচে পড়লে সহজেই গলে যায়। এ ফলগুলো হালকা মিষ্টি। এর মিষ্টতা (টি.এস.এস./ব্রিক্স ১৬-২৪%) ফলগুলো দেখতে ড্রাগনের চোখের মতো রঙ ও আকার ধারণ করে। ফলটির সামনের শেষের দিকে হালকা গর্তের মতো থাকে। এ ফলের চামাড়ার উপরে আনারসের মতো স্কেল থাকে। পূর্ণ বয়স্ক একটি গাছে ২৫-৩০টি পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২৫ টন।

সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা: ড্রাগন ফল নন ক্লাইমেটারিক ফল হওয়ায় সংগ্রহোত্তর ইথিলিন উৎপাদন ও শ্বসনের হার কম থাকে। এই কারণে ফল পরিপক্ক অবস্থায় সংগ্রহ করতে হয়। সাধারণত ফল ও স্পাইনলেটের রঙ লালচে বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হবে। অপরিপক্ক ফলে মিষ্টতা ও অন্যান্য গুণাবলী পরিপক্ক ফলের তুলনায় অনেক কম থাকে। ভাল বাজারমূল্য পাওয়ার জন্য ফল লালচে বর্ণ ধারণ করার ৫-৭ দিনের মধ্যে সংগ্রহ করা ভাল। গাছে ফল অতিরিক্ত পাকিয়ে সংগ্রহ করলে ফলের চাসরা ফেটে যেতে পারে এবং ফলের সংরক্ষণকাল ও স্বাদ কমে যায়। অধিক পরিপক্ক ফল খুব দ্রুত আর্দ্রতা হারায় এবং নষ্ট হতে থাকে।

মাল্টা

মিষ্টি কমলা বা Sweet orange (*Citrus sinensis*) বাংলাদেশে মাল্টা নামে পরিচিত। কমলার সাথে এর মূল পার্থক্য হ'ল কমলার খোসা ঢিলা কিন্তু মাল্টার খোসা সংযুক্ত (টাইট)। সাইট্রাস ফসলের মধ্যে মাল্টা অন্যতম জনপ্রিয় ফল। বিশ্বের সর্বমোট উৎপাদিত সাইট্রাস ফলের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হচ্ছে মাল্টা। ভিয়েতনাম, উত্তর পশ্চিম ভারত ও দক্ষিণ চীন মাল্টার আদি উৎপত্তি স্থান। তবে বর্তমানে এই ফলটি বিশ্বের উষ্ণ ও অব-উষ্ণমণ্ডলীয় এলাকায় বেশি চাষাবাদ হচ্ছে। বাংলাদেশেও এই ফলটির ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং দিন দিন এর জনপ্রিয়তা বেড়েই চলেছে। কমলার তুলনায় এর অভিযোজন ক্ষমতা অধিক হওয়ায় পাহাড়ী এলাকা ছাড়াও দেশের অন্যান্য এলাকায় সহজেই এটি চাষ করা যাচ্ছে। উন্নত জাত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশে এর উৎপাদন বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব।

ফলসহ মাল্টা গাছ

জলবায়ু ও মাটি: কম বৃষ্টিবহুল সুনির্দিষ্ট গ্রীষ্ম ও শীতকাল অর্থাৎ শুষ্ক ও উষ্ণ জলবায়ু মাল্টা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। বায়ুমণ্ডলের আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত মাল্টার ফলের গুণাগুণকে প্রভাবিত করে। বাতাসের অধিক আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপ্রবন এলাকায় মাল্টা ফলের খোসা পাতলা হয় এবং ফল বেশি রসালো ও নিম্নমানের হয়। শুষ্ক আবহাওয়ায় ফলের স্বাদ উন্নত মানের হয়। আর্দ্র জলবায়ুতে রোগ ও ক্ষতিকর পোকার উপদ্রব বেশি হয়। মাল্টা গাছ আলো পছন্দ

করে এবং ছায়ায় গাছের বৃদ্ধি ও ফলের গুণগত মান কমে যায়। সব ধরনের মাটিতে জন্মালেও সুনিষ্কাশিত, উর্বর, মধ্যম থেকে হাল্কা দোআঁশ মাটি মাল্টা চাষের জন্য উত্তম। মধ্যম অম্ল থেকে সামান্য ক্ষারীয় মাটিতে মাল্টা জন্মে, তবে ৫.৫-৬.৫ অম্লতায় (pH) ভাল জন্মে। মাল্টা জলাবদ্ধতা মোটেও সহ্য করতে পারে না এবং উচ্চমাত্রার তাপ ও লবণের প্রতি সংবেদনশীল।

মাল্টার জাত

বাংলাদেশের বাজারে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত সবুজ ও কমলা বর্ণের মাল্টা ব্যাপক হারে বিক্রি হতে দেখা যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বারি মাল্টা-১' নামে ২০০৩ সালে মাল্টার একটি উন্নত জাত উদ্ভাবন করেছে। এ জাতের পাকা ফল দেখতে আকর্ষণীয় সবুজ এবং খেতে সুস্বাদু। জাতটির বৈশিষ্ট্য নিম্নে দেয়া হলো।

বারি মাল্টা-১

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ খাটো, ছড়ানো ও অত্যধিক ঝোপালো। মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য চৈত্র পর্যন্ত সময়ে গাছে ফুল আসে এবং কার্তিক মাসে ফল আহরণ উপযোগী হয়। ফল গোলাকার, মাঝারী আকৃতির (১৫০ গ্রাম)। ফলের দৈর্ঘ্য ৭ সেমি এবং প্রস্থ ৫ সেমি। পাক ফলের রং সবুজ। ফলের পুষ্প প্রান্তে পয়সা সাদৃশ সামান্য নিচু বৃত্ত বিদ্যমান। ফলের খোসা মধ্যম পুরো ও শাসের সাথে সংযুক্ত। শাঁস হলুদাভ, রসালো, খেতে মিষ্টি ও সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ৭.৮%)। গাছপ্রতি ৩০০-৪০০টি ফল ধরে। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০ টন। বৃহত্তর সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পঞ্চগড়সহ দেশের সব অঞ্চলে চাষের জন্য উপযোগী।

বারি মাল্টা-১

বংশ বিস্তার: বীজ ও কলমের মাধ্যমে মাল্টার বংশ বিস্তার করা যায়। পরিপক্ক ফলের বীজ সংগ্রহ করে কয়েক দিনের মধ্যেই নার্সারিতে স্থাপন করে চারা উৎপাদন করা হয়। তবে বীজের চারা আমাদের দেশের মাটি ও আবহাওয়ার সাথে সমন্বয় করে বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। তাই কলমের মাধ্যমে চারা তৈরি করাই উত্তম। তাছাড়া কলমের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করলে সেটার মাতৃগুণাগুণও ঠিক থাকে এবং দ্রুত ফল ধরে। এ ছাড়া রোগ প্রতিরোধী ও বলিষ্ঠ শিকড় সমৃদ্ধ আদিজোড়ের উপর কলম করার ফলে গাছের জীবনকাল ও ফলন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

জোড় কলম: গ্রাফটিং এর জন্য প্রথমে রুটস্টক (আদিজোড়) উৎপাদন করতে হবে। রুটস্টক হিসেবে বাতাবিলেবু, রাফলেমন, কাটা জামির, রংপুর লাইম প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। অতঃপর কাঙ্ক্ষিত মাতৃগাছ হতে সায়ন (উপজোড়) সংগ্রহ করে রুটস্টকের উপর স্থাপন করে মাল্টার গ্রাফটিং তৈরি করা হয়। রুটস্টক হিসেবে ১.০ হতে ১.৫ বছর বয়সের সুস্থ, সবল ও সোজাভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত চারা নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত মাতৃগাছ হতে সায়ন তৈরির জন্য দুটি চোখসহ ৫-৬ সেমি লম্বা ও ৮-৯ মাস বয়সের ডাল সংগ্রহ করতে হবে। মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে থেকে আগস্ট) মাস পর্যন্ত গ্রাফটিং করা যায়। ভিনিয়ার ও ক্লেফট গ্রাফটিং উভয় পদ্ধতিতেই মাল্টার কলম তৈরি করা যায়। সাধারণত কলম করার ১০-১৫ দিনের মধ্যে রুটস্টক ও সায়নের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং সায়নের চোখ ফুটে কুঁশি বের হয়। কলম হতে একাধিক ডাল বের হলে সুস্থ সবল ও সোজাভাবে বেড়ে উঠা ডালটি রেখে বাকিগুলো কেটে ফেলতে হবে। আদিজোড় থেকে উৎপন্ন কুশি নিয়মিতভাবে অপসারণ করতে হবে।

বারি মাল্টা-২

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে সংগৃহীত জার্মপ্লাজমের মধ্য থেকে বাছাই করে মূল্যায়নের মাধ্যমে 'বারিলেবু-৪' জাতটি উদ্ভাবন করা হয় এবং ২০১৭ সালে জাত হিসাবে অনুমোদন করা হয়।

বারি মাল্টা-২

বারি মাল্টা -২ একটি নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। ফল আহরণের সময় সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর। গাছ দ্রুতবর্ধনশীল, ঝোপালো স্বভাবের। পাতা উপবৃত্তাকার, পত্রফলকের অগ্রভাগ সূঁচালো ও গাঢ় সবুজ বর্ণের। ফুল সাদা, ছোট, উভয়লিঙ্গিক, পাঁচ (৫) পাপড়ি বিশিষ্ট। অনেকগুলো ফুল সাইম সাদৃশ্য পুষ্প মঞ্জুরীতে সাজানো থাকে। ফুলে ৫ টি

বৃত্যাংশ বিদ্যমান। ফল উপবৃত্তাকার ও তুলনামুলকভাবে বড় (প্রতি ফলের গড় ওজন ১৭৯ গ্রাম), ফলের উপরিভাগ মসৃণ, দেখতে সবুজ বর্ণের এবং টিএসএস ৭.৫%। ফল সাধারণত গুচ্ছাকারে ধরে। ফলের অভ্যন্তরে ১০-১১ টি খণ্ড বিদ্যমান এবং খাদ্যোপযোগী অংশ প্রায় ৭২.৯৫%। ফলে ১১-১২ টি পর্যন্ত বীজ বিদ্যমান।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জমি নির্বাচন ও তৈরি: সারাদিন রোদ পড়ে এবং বৃষ্টির পানি জমে না এমন উঁচু বা মাঝারী-উঁচু জমি মাল্টা চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে। নির্বাচিত জমিটি পর্যায়ক্রমিক চাষ ও মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে। জমি থেকে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং আশে পাশে উঁচু গাছ থাকলে তার ডালপালা ছেঁটে দিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি: সমতল ভূমিতে বর্গাকার বা ষড়ভুজী পদ্ধতিতে এবং পাহাড়ী এলাকায় কন্টুর পদ্ধতিতে চারা/কলম রোপণ করা হয়। সাধারণত মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-ভাদ্র (মে থেকে আগস্ট) মাসের মধ্যে মাল্টা চারা লাগানো উত্তম। তবে পানি সেচ নিশ্চিত করা গেলে বছরের অন্যান্য সময়ও চারা লাগানো যেতে পারে।

মাদা তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ৪.০ মিটার দূরত্বে ৭৫ × ৭৫ × ৭৫ সেমি মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ১৫ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ৩-৫ কেজি ছাই, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমওপি সার এবং ২৫০ গ্রাম চুন গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ: গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে রোপণ করতে হবে। রোপণের পর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমতো পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ: গাছের যথাযথ বৃদ্ধির জন্য সময়মতো সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণ বাড়াতে হবে। বয়স ভেদে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হলো।

গাছের বয়স (বছর)	গোবর সার (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	জিংক সালফেট (গ্রাম)	বরিক এসিড (গ্রাম)
১-২	১০-১২	২০০-৩০০	১০০-১৫০	১০০-১৫০	১০	৫
৩-৪	১২-১৫	৩০০-৪৫০	১৫০-২০০	১৫০-২০০	১৫	৮
৫-৭	১৫-১৮	৪৫০-৬০০	২০০-৩০০	২০০-২৫০	২০	১০
৮-১০	১৮-২০	৬০০-৭০০	৩০০-৪৫০	২৫০-৩০০	২৫	১২
১০ এর অধিক	২০-২৫	৭৫০	৫০০	৪৫০	৩০	১৫

প্রতিবছর মধ্য-ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মার্চ) বর্ষার পূর্বে মধ্য-বৈশাখ থেকে মধ্য-জ্যৈষ্ঠ (মে) এবং বর্ষার পর মধ্য-ভাদ্র থেকে মধ্য-আশ্বিন (সেপ্টেম্বর) মাসে তিন কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। তবে সেচের ব্যবস্থা না থাকলে বর্ষার আগে ও পরে দুই কিস্তিতে সার প্রয়োগ করা ভাল।

আগাছা দমন: বর্ষার শেষে সার প্রয়োগের পর গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে বিভিন্ন লতাপাতা বা খড় দ্বারা বৃত্তাকারে মালচ করে দিলে আগাছা দমনসহ শুষ্ক মৌসুমে আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয়। সাধারণত বর্ষার শুরুতে ও বর্ষার শেষে সম্পূর্ণ বাগানে হালকা চাষ দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

সেচ প্রয়োগ: ভাল ফলনের জন্য খরার সময় বা শুষ্ক মৌসুমে নিয়মিত সেচ দেয়া একান্ত দরকার। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় যাতে পানি না জমে সে জন্য দ্রুত পানি নিষ্কাশনের বন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: মাল্টা গাছের জন্য ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে পারে। কারণ পার্শ্ব ডালগুলিতে ফল বেশি ধরে। কাণ্ডের এক মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সব ডাল ছাঁটাই করতে হবে। ডাল ছাঁটাই করার পর ডালের কাটা অংশে বর্দোপেস্টের প্রলেপ দিতে হবে। এছাড়া পানি তেউড় বা Water sucker উৎপন্ন হওয়ামাত্র কেটে ফেলতে হবে। মরা, শুকনা এবং রোগ ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

ফল পাতলাকরণ ও ব্যাগিং: বারি মাল্টা-১ এর গাছে প্রতিবছর প্রচুর সংখ্যক ফল আসে। সমস্ত ফল রাখা হলে ফল আকারে ছোট ও নিম্নমানের হয়। এজন্য প্রতি পুষ্প মঞ্জরীতে সুস্থ ও সতেজ দেখে দু'টি করে ফল রেখে বাকিগুলো ছোট থাকা অবস্থায়ই (মার্বেল অবস্থা) ছাঁটাই করা দরকার। কলমের গাছ প্রথম বা দ্বিতীয় বছর থেকে ফল দিতে শুরু করে। গাছের বৃদ্ধির জন্য ১ম বছর ফল না রাখাই ভাল, দ্বিতীয় বছর অল্প সংখ্যক ফল রাখা যেতে পারে। এভাবে পর্যায়ক্রমে গাছের অবস্থা বিবেচনা করে ফল রাখতে হবে। ফলের বর্ণ সবুজ হওয়ায় পাখি ও পোকার আক্রমণ কম হয়। তবে পরিপক্কতার পূর্বে ব্যাগিং করলে অবাঞ্ছিত পোকা মাকড়ের আক্রমণ রোধ করা যায়।

ফল সংগ্রহ: ফল পূর্ণতা প্রাপ্তির সাথে সাথে ফলের গাঢ় সবুজ বর্ণ হালকা সবুজ বা ফ্যাকাশে সবুজ হতে থাকে। বারি মাল্টা-১ সেপ্টেম্বর, অক্টোবর মাসে আহরণ করা হয়। পরিপক্ক ফল হাত অথবা জালিযুক্ত বাঁশের কোটার সাহায্যে সংগ্রহ করা হয়। ফল সংগ্রহের পর আঘাতপ্রাপ্ত ও নষ্ট হওয়া ফলগুলো আলাদা করতে হবে। ভাল মানের ফলগুলো প্রয়োজনে গ্রেডিং করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

নাশপাতি

নাশপাতি

নাশপাতি মূলত শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল। তবে এর কোন কোন প্রজাতি বা জাত অপেক্ষাকৃত উচ্চ তাপমাত্রায়ও জন্মানো যায়। এটি বিদেশি ফল হলেও আমাদের দেশে কম বেশি সবাই ফলটির সাথে পরিচিত। বিদেশ থেকে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে নাশপাতি আমদানি করা হয়। দেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে এ ফলের চাষ করা সম্ভব।

নাশপাতির জাত

বারি নাশপাতি-১

বারি নাশপাতি-১ এর ফল

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট 'বারি নাশপাতি-১' নামে নাশপাতির একটি জাত ২০০৩ সালে অবমুক্ত করেছে। নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। নাশপাতির গাছ খাড়া ও অল্প ঝোপালো। চৈত্র মাসে গাছে ফুল আসে এবং শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফল আহরণ করা যায়। ফলের গড় ওজন ১৩৫ গ্রাম, আকার ৮.৪০ সেমি × ৫.৬৩ সেমি। ফল বাদামী রঙের, ফলের উপরিভাগের ত্বক সামান্য খসখসে। শাঁস সাদাটে, খেতে কচকচে ও সুস্বাদু (ব্রিক্সমান ১০%)। গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ৬০-৭০টি। জাতটি চট্টগ্রাম ও পার্বত্য জেলাসমূহে চাষ উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ৬-৭ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: সাধারণভাবে নাশপাতিকে শীতপ্রধান অঞ্চলের ফল হিসেবে গণ্য করা হয়। যেকোন ধরনের সুনিষ্কাশিত মাটিতে নাশপাতি চাষ করা যায়। তবে উর্বর, সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি উত্তম। নাশপাতি চাষের জন্য সূর্যালোক প্রয়োজন। শুষ্ক গরম বায়ু নাশপাতির জন্য ক্ষতিকর। মাটির পিএইচ মান ৫.৫-৭.৫ উত্তম। নাশপাতি গাছ লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে না।

বংশ বিস্তার: স্টেম কাটিং বা শাখা কর্তন ও গুটি কলমের মাধ্যমে নাশপাতির বংশ বিস্তার করা যায়। বর্ষাকাল কলম করার উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়স্ক পেন্সিল আকৃতির ডাল কলমের জন্য নির্বাচন করা হয়। ছিদ্রযুক্ত পলিথিনে কলম স্থাপন করে নার্সারিতে ঝাঝরী দিয়ে পানি দেয়াসহ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করলে এক বছরের মধ্যে চারা রোপণের উপযোগী হয়।

জমি তৈরি: সুনিষ্কাশিত উঁচু জমি যেখানে কখনই পানি দাঁড়ায় না নাশপাতির জন্য এরকম জমি উত্তম। পাহাড়ের হালকা ঢালু জমিতে নাশপাতি ভাল জন্মে। জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হয়।

চারা রোপণ করার জন্য ৭৫ × ৭৫ × ৭৫ সেমি আকারের গর্ত করে প্রতি গর্তে ১৫ কেজি পচা গোবর, ২৫০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম এমওপি ও ২০ গ্রাম বরিক এসিড মিশ্রিত করে ১৫/২০ দিন রেখে দিয়ে তারপর চারা লাগাতে হবে।

রোপণ ও পরিচর্যা: সাধারণত সমতল ভূমিতে বর্গাকার এবং পাহাড়ের ঢালে কন্টুর রোপণ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময়। তবে সেচ সুবিধা থাকলে সারা বছরই চারা লাগানো যায়। সারি থেকে সারি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪ মিটার। এ হিসেবে প্রতি হেক্টর জমিতে ৬২৫টি চারা দরকার হয়। মাদা তৈরি করার পর তাতে ১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম লাগাতে হয়। গর্তের ঠিক মাঝখানে চারা লাগাতে হবে তারপর খুঁটি দিয়ে চারাটি বেঁধে দিতে হবে যাতে হেলে না পড়ে। চারা লাগানোর পর চারার গোড়ায় ঝাঝরী দিয়ে পানি দিতে হবে। প্রয়োজনে বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ: বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ নিচে দেয়া হলো।

গাছের বয়স	পচা গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)	বরিক এসিড (গ্রাম)
১-২ বছর	১০	২০০	২৫০	২০০	২০
৩-৫ বছর	১৫	৫০০	৪০০	৪০০	৩০
৬-৯ বছর	২০	৭৫০	৫০০	৬০০	৪০
১০ বছর ও তদুর্ধ্ব	৩০	১০০০	৭৫০	৮০০	৪০

উল্লিখিত সার সমান দুই ভাগ করে বর্ষার আগে একভাগ ও বর্ষার পর বাকি একভাগ প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগ করার সময় ঠিক মধ্য দুপুরে গাছের ছায়া গোড়ার চারদিকে যতটুকু জায়গায় বিস্তৃত হয় এবং গাছের গোড়া থেকে ০.৫ থেকে ১.০ মিটার জায়গা খালি রেখে সেই পরিমাণ জায়গায় ছিটিয়ে কোদাল দিয়ে হালকা করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। পাহাড়ের ঢাল বেশি হলে ঢালের উপরের দিকে গাছের গোড়া থেকে ৪০ সেমি দূরে ১ মিটার এর মধ্যে চোখা মাথা খুঁটির সাহায্যে গর্ত করে সার প্রয়োগ করে গর্তের মুখ মাটি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। সার প্রয়োগ করার পর প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।

আগাছা দমন: গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিষ্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে ১ মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন: চারা রোপণের পর ঝরনা দিয়ে বেশ কিছু দিন পর্যন্ত সেচ দিতে হয়। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে সেচ দেয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সে জন্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: গাছের উচ্চতা ৪০-৫০ সেমি হলে ডগা ভেঙ্গে দিতে হবে। পরের বছর পার্শ্ব শাখা ২০-২৫ সেমি রেখে কেটে দিতে হবে। গাছের গোড়ার দিকে জল/শোষক শাখা বের হলে কেটে ফেলতে হবে। গাছ বড় হলে ডালগুলো ভূমির দিকে বাঁকা করে দিলে বেশি ফলন পাওয়া যায়।

ডাল নুয়ে দেয়া: নাশপাতির খাড়া ডালে নতুন শাখা ও ফল কম হয়। এ জন্য খাড়া ডাল ওজন অথবা টানার সাহায্যে নুয়ে দিলে প্রচুর সংখ্যক নতুন শাখা গজায়। এতে ফলন ও ফলের গুণগত মান বৃদ্ধি পায়।

ফল সংগ্রহ ও ফলন: মার্চ-এপ্রিল মাসে গাছে ফুল আসে। জুলাই মাসের শেষ পক্ষে ফল সংগ্রহের উপযুক্ত সময়। ফল অতি সাবধানে সংগ্রহ করা প্রয়োজন যাতে মাটিতে না পড়ে। কারণ আঘাতপ্রাপ্ত ফল সংরক্ষণ করা যায় না। ফল সংগ্রহের পর সংরক্ষণের জন্য ভালভাবে বাছাই করা দরকার যাতে কোনরূপ ত্রুটিযুক্ত ফল না থাকে। তারপর কাগজ বা কাঠের বাক্সে করে বাজারজাত করা উত্তম। এভাবে ১০-১২ দিন পর্যন্ত ফল সংরক্ষণ করা যায়। গাছের বয়স ও আকারভেদে নাশপাতির ফলনে তারতম্য ঘটে। একটি পূর্ণ বয়স্ক গাছ থেকে ২০ - ৪০ কেজি পর্যন্ত ফল সংগ্রহ করা যায়।

প্যাশন ফল

প্যাশন ফল বাংলাদেশে একটি অপ্রচলিত বা স্বল্প পরিচিত ফল। অনেকের কাছে এটি ট্যাং ফল নামে পরিচিত। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল, সিলেট, টাঙ্গাইল এবং রাজশাহী অঞ্চলে ইহা কম বেশি দেখা যায়। তবে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে আদিবাসীদের বসতবাড়িতে স্বল্পপরিসরে অনেকটা অযত্নে ও অবহেলায় ফলটির আবাদ লক্ষ্য করা যায়। ঝুমকো লতার সমগোত্রীয় প্যাশন ফলের গাছ দীর্ঘ প্রসারী এবং বহুবর্ষজীবী। ফলের ভিতর গাত্রে অসংখ্য হলুদাভ, রসপূর্ণ থলে (Juice sac) থাকে, এগুলি ভক্ষণযোগ্য অংশ। টাটকা ফল হিসেবে খাওয়ার চেয়ে প্যাশন ফলের তৈরি শরবত বেশি উপাদেয়। বাংলাদেশের পাহাড়ী এলাকায় এবং সিলেট ও টাঙ্গাইল অঞ্চলে প্যাশন ফল চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।

প্যাশন ফলের জাত

বারি প্যাশন ফল-১

বিদেশ থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম মূল্যায়ন শেষে 'বারি প্যাশন ফল-১' নামে উন্নত জাতটি ২০০৩ সালে মুক্তায়ন করা হয়।

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। গাছ দীর্ঘ প্রসারী, বহুবর্ষজীবী এবং কাষ্ঠল লতা জাতীয়। পাকা ফল দেখতে হলুদ রঙের এবং গাত্র খুবই মসৃণ। ফল উপবৃত্তাকার, আকার ৬.৮ × ৬.৩ সেমি। ফলের গড় ওজন ৬৮ গ্রাম এবং প্রতি ফল থেকে ৩০ গ্রাম জুস আহরণ করা যায়। জুসের রং হলুদ, টক-মিষ্টি স্বাদের (ব্রিক্সমান ১৪%)। এ জাতটি পার্বত্য জেলাসমূহে চাষাবাদের উপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ৫-৬ টন। জাতটি *ফিউজেরিয়াম* উইল্ট ও নেমাটোড রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।

বারি প্যাশন ফল-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: সাধারণভাবে প্যাশন ফলকে উষ্ণ ও অব-উষ্ণ অঞ্চলের ফল হিসেবে গণ্য করা হয়। অধিক উষ্ণতা ও শৈত্য কোনটাই এ ফলের জন্য ভাল নয়। বৃষ্টিপাত ফুলের পরাগায়ণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। যে কোন ধরনের সুনিষ্কাশিত মাটিতে প্যাশন ফলের চাষ করা যায়। তবে উর্বর, সুনিষ্কাশিত দোআঁশ মাটি উত্তম। প্যাশন ফল জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। মাটির ক্ষারত্ব (pH) ৫.৫-৭.৫ উত্তম। ক্ষারত্ব ৫.৫ এর নিচে হলে চুন প্রয়োগ করা অত্যাবশ্যক। প্যাশন ফল লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে না।

বারি প্যাশন ফল-১

বংশ বিস্তার: বীজ দ্বারা সহজেই প্যাশন ফলের বংশ বিস্তার করা যায়। তবে বীজ থেকে উৎপাদিত চারায় মাতৃ গাছের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ থাকে না বিধায় অঙ্গজ পদ্ধতিতে বংশ বিস্তার করা উত্তম। স্টেম কাটিং বা শাখা কর্তনের মাধ্যমে প্যাশন ফলের অঙ্গজ বংশ বিস্তার করা যায়। এক থেকে দেড় বছর বয়সী শাখা নির্বাচন করে তা থেকে ২০-৩০ সেমি লম্বা করে কেটে একেকটি শাখা কলম তৈরি করা হয় যাতে অন্তত ২-৩টি পর্বসন্ধি (নোড) থাকে। কাটিং এর নিচের পর্ব হতে ১-২ সেমি নিচে তেরসা কাট দিয়ে এর নিচের পর্বসহ একেকটি কাটিং পৃথক পৃথক পলিব্যাগের মাটিতে ৪৫° কোণ করে পুঁতে চারা তৈরি করা হয়। কাটিং দ্বারা চারা তৈরির উপযুক্ত সময় হচ্ছে জুন-আগস্ট মাস।

জমি তৈরি: সুনিষ্কাশিত উঁচু জমিতে যেখানে কখনই পানি দাঁড়ায় না প্যাশন ফলের জন্য এরকম জমি উত্তম। জমি গভীরভাবে চাষ দিয়ে আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করে জমি তৈরি করতে হয়। চারা রোপণ করার জন্য ৪৫ × ৪৫ × ৪৫ সেমি গর্ত করে প্রতি গর্তে ১০ কেজি জৈব সার, ২০০ গ্রাম টিএসপি, ২০০ গ্রাম এমওপি সার মিশ্রিত করে ১৫/২০ দিন রেখে দিয়ে তারপর চারা লাগাতে হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা: বাণিজ্যিকভাবে প্যাশন ফল সারি করে লাগাতে হয়। সাধারণত জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত চারা লাগানোর উত্তম সময় তবে যদি সেচ সুবিধা থাকে তাহলে সারা বছর চারা লাগানো যায়। সারি থেকে সারি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪ মিটার। এই হিসেবে প্রতিহেক্টর জমিতে ৬২৫টি চারা/কলম দরকার হয়। মাদা তৈরির

১৫-২০ দিন পর চারা বা কলম গর্তের ঠিক মাঝখানে লাগাতে হয়। রোপণের পর হাত দিয়ে আলতোভাবে মাটি চারার গোড়ার চারদিকে বসিয়ে দিতে হবে। তারপর খুঁটি দিয়ে চারাটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে যাতে হেলে না পড়ে। চারা লাগানোর পরপরই চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে এবং বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সার প্রয়োগ: নিচে বয়স অনুপাতে গাছপ্রতি সারের পরিমাণ দেওয়া হলো।

গাছের বয়স	গোবর (কেজি)	ইউরিয়া (গ্রাম)	টিএসপি (গ্রাম)	এমওপি (গ্রাম)
১-২ বছর	৬	১৫০	১৫০	১৫০
৩-৫ বছর	৮	৩০০	৩০০	৩০০
৬-৯ বছর	১০	৪৫০	৪৫০	৪৫০
১০ বছর ও তদুর্ধ্ব	১৫	৬০০	৪৫০	৬০০

উল্লিখিত সার সমান ৩ কিস্তিতে শীতের শেষে (ফেব্রুয়ারি), বর্ষার আগে (এপ্রিল-মে) ও বর্ষার শেষে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) গাছের গোড়া থেকে সামান্য দূরে প্রয়োগ করে হালকা করে কুপিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।

আগাছা দমন: গাছের পর্যাপ্ত বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য সবসময় জমি পরিষ্কার বা আগাছামুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে গাছের গোড়া থেকে চারদিকে এক মিটার পর্যন্ত জায়গা সবসময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ও নিষ্কাশন: চারা রোপণের পর বেশ কিছু দিন পর্যন্ত নিয়মিত সেচ দিতে হয়। সর্বোচ্চ ফলনের জন্য ফুল আসা ও ফলের বিকাশের সময় মাটিতে পর্যাপ্ত আর্দ্রতা থাকা আবশ্যক। এ জন্য খরা মৌসুমে প্যাশন ফলে সেচ দেওয়া প্রয়োজন। বর্ষাকালে গাছের গোড়ায় যাতে পানি জমতে না পারে সেজন্য নিষ্কাশনের সুবন্দোবস্ত করতে হবে।

ডাল ছাঁটাইকরণ: গাছের গোড়া থেকে ১.৫- ২.০ মিটার পর্যন্ত কোন ডালপালা রাখা হয় না তাই এ সমস্ত ডালা সব সময় কেটে দেওয়া ভাল। যেহেতু নতুন শাখায় বেশি ফুল ও ফল উৎপন্ন হয় তাই প্রতি বছর নিয়মিত কিছু শাখা প্রশাখা কেটে দিলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে পুরাতন ও মরা ডাল কেটে দিতে হয়। শীতকালই ডাল ছাঁটাইকরণের উপযুক্ত সময়।

মাচা তৈরি: লতা জাতীয় গাছ হওয়ায় প্যাশন ফলে মাচা দেয়া আবশ্যক। প্যাশন ফল বাণিজ্যিকভাবে চাষের জন্য বিভিন্ন ধরনের মাচা তৈরি করা হয়ে থাকে। জিআই তার দিয়ে স্থায়ীভাবে মাচা তৈরি করা যায়। তবে অস্থায়ীভাবে বাঁশ দ্বারাও মাচা তৈরি করা যায়। চারা লাগানোর পর যখন চারা বাড়তে শুরু করে অর্থাৎ ৩-৪ মাস পর মাচা তৈরি করতে হয় যাতে গাছের লতা সহজেই মাচায় উঠতে পারে। মাচার উচ্চতা ১.৫ মিটার হলে ভাল হয় যাতে সহজে ফল আহরণ করা যায় ও অন্যান্য পরিচর্যা করতে সুবিধা হয়। প্রতি ১/২ সারিতে ১টি করে মাচা তৈরি করা যায়।

ফল সংগ্রহ: প্যাশন ফলে ফুল আসার প্রধান মৌসুম হল মার্চ মাস এবং তা থেকে জুলাই-আগস্ট মাসে ফল আহরণ করা হয়। আবার অনেক সময় আগস্ট মাসেও কিছু ফুল আসে তা থেকে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে ফল আহরণ করা যায়। ফল সংগ্রহ করার পর প্রথমে সর্টিং এর মাধ্যমে ভাল ও ত্রুটিপূর্ণ (বাজারজাতকরণের অনুপযোগী) ফলগুলো আলাদা করা হয়। তারপর ভাল ফলগুলো গ্রেডিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সাইজ অনুপাতে ভাগ করে বাজারজাত করা হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

মাছি পোকা দমন: ফলের মাছি পোকা বা ফ্রুট ফ্লাই অনেক সময় কচি ফলের গায়ে ছিদ্র করে ডিম পাড়ে এবং তাতে ফল কুচকে যায় ও অপরিপক্ক অবস্থায় ফল ঝরে পড়ে। সেক্স ফেরোমন ফাদ ব্যবহার করে মাছি পোকা সাফল্যজনক ভাবে দমন করা যায়।

উডিনেস (Woodiness) রোগ দমন: অনেক সময় উডিনেস (Woodiness) নামক একটি রোগ নাশপাতি গাছে দেখা যায় যা কিউকাম্বার মোজাইক ভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হয়। এ রোগ আক্রান্ত পাতা বিবর্ণ হয়ে আকারে ছোট হয়। ফলের খোসা মোটা ও শক্ত হয় এবং অল্প পাল্প উৎপন্ন হয়। জাব পোকা (Aphid) দ্বারা এ রোগ ছড়ায়। এ রোগের প্রতিকারের জন্য বাহক পোকা দমন করতে হয়।

তেঁতুল

আমাদের দেশে অপ্রধান ফলের মধ্যে তেঁতুল অন্যতম। ছোট বড় সকলের কাছে বেশ জনপ্রিয়, বিশেষ করে আচার এর জন্য তেঁতুলের কদর বেশি। দেশে তেঁতুলের মোট উৎপাদন প্রায় ১০ হাজার টন। টক এবং মিষ্টি দুই ধরনের স্বাদের তেঁতুল রয়েছে। তবে দেশে উৎপাদিত তেঁতুলের অধিকাংশই টক শ্রেণির। পাকা ফল টাটকা অবস্থায় খাওয়া ছাড়াও চাটনি, সস, শরবত, আচার প্রভৃতি মুখরোচক খাবার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

তেঁতুলের জাত

বারি তেঁতুল-১

নিয়মিত ফলদানকারী উচ্চ ফলনশীল জাত। 'বারি তেঁতুল-১' জাতটি বিদেশ হতে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবন করে ২০০৯ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন করা হয়। গাছ মাঝারী, মধ্যম ঝোপালো ও ছড়ানো। এপ্রিল-মে মাসে গাছে ফুল আসে এবং মার্চ মাসে ফল সংগ্রহের উপযোগী হয়। ফল মাঝারী (৩২ গ্রাম)। শাঁস নরম, আঠালো এবং মিষ্টি (ব্রিক্সমান ৭৫%)। খাদ্যপযোগী অংশ ৫৩%। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন।

বারি তেঁতুল-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

তেঁতুল আমাদের দেশে অত্যন্ত সুপরিচিত একটি ফল হলেও মিষ্টি তেঁতুল ততোটাই অপরিচিত। তেঁতুলের নাম শোনা মাত্রই সবার কাছে একটি টক স্বাদের ফলের কথা মনে পড়ে যায়। কিন্তু এই তেঁতুলটি সম্পূর্ণ মিষ্টি স্বাদযুক্ত একটি ফল। ২০০৯ সালে পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি 'বারি তেঁতুল-১' নামে একটি মিষ্টি তেঁতুলের জাত উদ্ভাবন করেছে। এই মিষ্টি তেঁতুলের উৎপত্তিস্থল থাইল্যান্ড। ১৯৯৯ সালে প্রথম খাগড়াছড়িতে এর গাছ লাগানো হয় এবং ২০০৭ সালে এটি প্রথম ফল দেয়। মিষ্টি তেঁতুল লিগিউমিনোসী (Leguminosae) পরিবারভুক্ত উদ্ভিদ। খাদ্যমানের দিক থেকেও এটি একটি অত্যন্ত সুস্বাদু ও পুষ্টিমান সমৃদ্ধ ফল। প্রতি ১০০ গ্রাম মিষ্টি তেঁতুলে ৭০ গ্রাম ক্যালরি, ১৪.৭ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৮৬৭ আই.ইউ ভিটামিন 'এ', ৪২৯ মি. গ্রাম ক্যালসিয়াম, ৪৪ মি. গ্রাম ভিটামিন 'সি', ২.৩ গ্রাম প্রোটিন ও ৬.৩ গ্রাম আঁশ পাওয়া যায়। তদুপরি মিষ্টি তেঁতুলে রোগবালাই ও পোকার আক্রমণ তুলনামূলকভাবে অনেক কম এবং এর চাষাবাদ সহজ হওয়ায় বাংলাদেশে বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে এর চাষাবাদের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। মিষ্টি তেঁতুলের বাজার মূল্য ও চাহিদা খুব বেশি। তাই বাংলাদেশে এর চাষাবাদ ও প্রচার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা দরকার।

জলবায়ু ও মাটি: মিষ্টি তেঁতুল মৃদু উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে ভাল জন্মে। তবে সুনিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকলে ভারী বৃষ্টিপাতযুক্ত স্থানেও হয়। উঁচু, উর্বর, গভীর সুনিষ্কাশিত এবং মৃদু অম্লভাবাপন্ন বেলে দোআঁশ মাটিতে ভাল হয়। মিষ্টি তেঁতুলের জন্য সর্বোচ্চ ৪৬ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা এবং বাৎসরিক ৫০০-১৫০০ মি.মি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। মিষ্টি তেঁতুল সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় ১,০০০ মি. উচ্চতা পর্যন্ত জন্মে। সাধারণত এ গাছ মৃদু অম্ল ও ক্ষারযুক্ত মাটি সহ্য করতে পারে। কিন্তু বেলে দোআঁশ মাটিতেও ভাল হয়।

বংশ বিস্তার: বীজ এবং অঙ্গজ দুই ভাবেই মিষ্টি তেঁতুলের বংশ বিস্তার করা সম্ভব।

বীজ দ্বারা: পরিপক্ক বীজ বীজতলায় চারা তৈরি করে বংশ বিস্তার করা যায়। এক্ষেত্রে বীজ গজানোর জন্য এক সপ্তাহ সময় লাগে। মিষ্টি তেঁতুলের বীজ ভালভাবে শুকিয়ে রাখলে কয়েক মাস পর্যন্ত এর সজীবতা বজায় থাকে। কিন্তু বংশ বিস্তারের জন্য সংগৃহীত বীজ একটি উৎকৃষ্ট মানসম্পন্ন গাছ থেকে নির্বাচিত হওয়া উচিত। বীজ থেকে প্রাপ্ত গাছের গুণাগুণ মাতৃগাছের মত না হওয়ায় এবং ফলন দেরিতে হওয়ায় এ পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই পরিহার করা হয়। বীজ থেকে প্রাপ্ত গাছ ৭-৮ বছরে ফল দেয়।

অঙ্গজ বংশ বিস্তার: মিষ্টি তেঁতুলের ক্ষেত্রে অঙ্গজ উপায়ে বংশ বিস্তার করে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব। অঙ্গজ উপায়ে উৎপাদিত গাছে মাতৃগাছের গুণাগুণ বজায় থাকে। এক্ষেত্রে গুটি কলম ও গ্রাফটিং এর মাধ্যমে ভাল ফল পাওয়া যায়। এরকম গাছ থেকে ৩-৪ বছরের মধ্যেই ফল পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এই সব পদ্ধতির ক্ষেত্রে গাছের কাণ্ডটি নির্বাচনের পূর্বে খুব ভাল করে খেয়াল করতে হবে যে, তা যেন রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়।

লেয়ারিং (Layering): বর্ষাকাল গুটি কলম করার উপযুক্ত সময়। এক বছর বয়স্ক পেন্সিল আকৃতির ডাল গুটি কলমের জন্য নির্বাচন করা হয়। শাখার অগ্রভাগ থেকে ৩০-৪০ সেমি দূরে পর্বসন্ধি থেকে ১ সেমি নিচে ৩-৪ সেমি জায়গা জুড়ে

শাখার চতুর্দিকের বাকল তুলে ফেলা হয়। তারপর ক্ষতস্থানে লালচে স্তর (ক্যাম্বিয়াম) চাকু দ্বারা ভালভাবে চেঁছে তুলে ফেলা হয়। ক্যাম্বিয়াম স্তর না তুলে ফেলা হলে এতে শিকড় গজায় না। এরপর ক্ষতস্থানের অগ্রবর্তী নিকটতম পর্বসন্ধিসহ ক্ষতস্থানটিকে শিকড় মাধ্যম (অর্ধেক মাটি, অর্ধেক গোবর ও পানির মিশ্রণে তৈরি পেস্টের মতো) দ্বারা আবৃত করে সাদা পলিথিন কাগজ দ্বারা পেঁচিয়ে চিকন সুতলি দ্বারা বেঁধে দিতে হবে। এ কলম করার ৪-৮ সপ্তাহের মধ্যে এতে শিকড় গজায়। শিকড় গজানোর পর গুটির ১-২ সেমি নিচে ২-৩ ধাপে কলমটিকে কেটে মাতৃগাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কিছু পাতা ফেলে দিয়ে ছিদ্রযুক্ত পলিথিনে কলম স্থাপন করে নার্সারিতে ঝাঁঝড়ি দিয়ে পানি দেয়াসহ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করলে এক বছরের মধ্যে চারা রোপণের উপযোগী হয়।

গ্রাফটিং: গ্রাফটিং বলতে বুঝায় একটি কাঙ্ক্ষিত গাছের একটি কাণ্ড বা মুকুল কেটে নিয়ে অপর একটি গাছে (রুটস্টক) প্রতিস্থাপন করা। তারপর প্রতিস্থাপিত কাণ্ডটি অথবা মুকুলটি রুটস্টকের সাথে সফলভাবে জোড়া লেগে গেলেই গ্রাফটিং সফলভাবে শেষ হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। গ্রাফটিং করার সময় সাধারণত একটি অধিক কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন গাছ থেকে কাণ্ড বা কুঁড়ি সংগ্রহ করে অপর একটি সাধারণ রুটস্টকে সংযোজন করা হয়। গ্রাফটিং ফল ধারণের সময় কমিয়ে আনে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

মিষ্টি তেঁতুলের গুটি কলম

গ্রাফটিং এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহ হলো:

- একটি পরিষ্কার ও ধারালো কাঁচি
- পলিথিন ট্যাপ (১.৫-২ সেমি চওড়া ও মোটামুটি ৩০-৪০ সেমি লম্বা যা একটি সাধারণ পরিষ্কার প্লাস্টিক ব্যাগ থেকে কেটে সংগ্রহ করেও কাজ চালানো সম্ভব যদি বাডিং ট্যাপ না থাকে।

ক্লেফট গ্রাফটিং বা ফাটল জোড়কলম: বসন্ত ও শরৎকাল এ কলম করার সবচেয়ে উপযোগী সময়। বিশেষত বসন্তের শুরুতে যখন গাছের সুপ্ততা ভেঙ্গে আসতে থাকে তখনই এ কলম করা হয়। এ কলম তৈরির জন্য সাধারণত ২.৫-১০ সেমি ও ব্যাসের আদিজোড় নির্বাচন করা হয়ে থাকে। নির্বাচিত আদিজোড়ের মসৃণ শাখাবিহীন স্থানে ধারালো ছুরি দ্বরা আনুভূমিকভাবে কেটে সেখানে লম্বাভাবে ৫-৭.৫ সেমি গভীর করে ফাটাতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হয় যেন ফাটানো কাজটি খাড়াভাবে হয়। উপজোড় প্রস্তুতের জন্য সাধারণত ২-৩টি কুঁড়িযুক্ত ৭.৫-১০ সেমি দীর্ঘ উপজোড় শাখা নির্বাচন হয়। নির্বাচিত উপজোড়ের নিচের প্রান্তে তির্যক কর্তনের মাধ্যমে একটি গোজের মত তৈরি করা হয়। অপেক্ষাকৃত বড় আদিজোড় অর্থাৎ ২.৫ সেমি ব্যাসের চেয়ে বেশি ব্যসযুক্ত আদিজোড়ের জন্য একটি উপজোড় গোজের পরিবর্তে দুটি গোজ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রতিটি গোজকেই ফাটলের যে কোন একপাশে বা কিনারে স্থাপন করা হয়। যদি এ ফাটলের মধ্যে উপজোড় গোজ শক্ত বা আঁটোসাঁটো হয়ে না বসে তবে সংযোগস্থান শক্ত করে বেঁধে আটোঁসাঁটো করা হয় এবং সংযোগ স্থান গ্রাফটিং মোম দ্বারা এমনভাবে আবৃত করা হয় যাতে ভিতরে কোন পানি ঢুকতে না পারে। এছাড়া সমস্ত কলমটিকে একটি পলিথিন দ্বারা আবৃত রাখলেও কলমের মধ্যে সহজে পানি ঢুকতে পারে না।

চারা রোপণের সময়: চারা রোপণ জুন-নভেম্বর মাসে করতে হবে। অতঃপর চারা প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়মিত পানি সেচ দিতে হবে। তবে আষাঢ়-ভাদ্র (মধ্য জুন-মধ্য সেপ্টেম্বর) মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

জমি প্রস্তুত ও গর্ত তৈরি: গর্ত তৈরির পূর্বে জায়গাটির আগাছা ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় গাছপালা অপসারণ করতে হবে। তারপর কোদালের সাহায্যে গর্ত তৈরি করতে হবে। গর্তের আকার হতে হবে ১ মি. × ১ মি. × ১ মি.।

গর্তে সার প্রয়োগ:

সারের নাম	সারের পরিমাণ
পচা গোবর	২০-২৫ কেজি
টিএসপি	৪০০-৫০০ গ্রাম
এমপি	৫০০-৬০০ গ্রাম
জিপসাম	২০০-৩০০ গ্রাম
জিঙ্ক সালফেট	৪০-৬০ গ্রাম

উল্লিখিত সার গর্তের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করে ১০-১৫ দিন রেখে দিতে হবে। মাটিতে রসের পরিমাণ কম থাকলে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হবে।

চারা রোপণের দূরত্ব: ১০ মি. × ১০ মি.।

চারা রোপণ: সুস্থ সতেজ এক বছর বয়সী চারা গর্তের মাঝখানে এমনভাবে রোপণ করতে হবে যেন চারার গোড়াটি মাটির বল ভেঙ্গে না যায়। চারা রোপণের পর গাছের গোড়ার মাটি ভালভাবে চেপে দিয়ে হালকা সেচ দিতে হবে। রোপণের পর চারা যাতে হেলে না পড়ে সে জন্য শক্ত কাঠি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে এবং চারায় বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

আগাছা ব্যবস্থাপনা: চারা অবস্থায় গাছের চারদিকের আগাছা অবশ্যই পরিষ্কার করা উচিত। অন্তত চার বছর পর্যন্ত আগাছা ব্যবস্থাপনা করা উচিত যাতে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত না হয়। বাণিজ্যিকভাবে যে সব বাগান করা হয় বিশেষ করে সেসব ক্ষেত্রে যদি আন্তঃফসল হিসেবে কোন গাছ না থাকে তাহলে আগাছা দমন অত্যন্ত জরুরি। এতে বাগানের মাটিতে সঠিক পরিমাণে আর্দ্রতা ধরে রাখা সম্ভব।

আন্তঃফসল: গাছ লাগানোর প্রথম চার বছর পর্যন্ত বাগানে আন্তঃফসল করা যায়। এ ক্ষেত্রে আন্তঃফসল হিসেবে সাধারণত বাদাম, শাকসবজি, বরবটি, মুগডাল, ফেলন, স্বল্পমেয়াদী দানা জাতীয় শস্য, আদা ও হলুদ চাষ করা যেতে পারে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন: মিষ্টি তেঁতুল একটি খরা সহনশীল গাছ। প্রাপ্ত বয়স্ক বা প্রতিষ্ঠিত তেঁতুল গাছে পানি প্রয়োগের তেমন একটা প্রয়োজন হয় না। কিন্তু চারা অবস্থায় মাটির আর্দ্রতার বিশেষ প্রয়োজন হয় বলে ভালভাবে চারা প্রতিষ্ঠার জন্য নার্সারিতে প্রতি ২ সপ্তাহ অন্তর অন্তর পানি দিতে হয়। পানি সব সময় বিকেলে দিতে হয়। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত পানি সেচ দিলে গাছের গোড়ায় পানি আটকে চারা মারাও যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা করতে হবে যাতে অতিরিক্ত পানি নালার মাধ্যমে নিষ্কাশন করা যায়।

পরবর্তী পরিচর্যা

ছাঁটাইকরণ: চারা গাছের ডাল ছাঁটাই অপরিহার্য। গাছ লাগানোর পর থেকে ফল ধরার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীরে ডাল ছেঁটে গাছকে নির্দিষ্ট আকার দিতে হবে যাতে গাছ চারিদিকে ছড়াতে না পারে। তারপর নির্দিষ্ট আকার প্রাপ্তির পর থেকে শুধুমাত্র শুকনা ও মরা পাতা এবং ডাল কাটতে হবে।

রোগ ও পোকার আক্রমণ

মিষ্টি তেঁতুল গাছে রোগ ও পোকামাকড়ের তেমন উপদ্রব লক্ষ্য করা যায় না। তবে মাঝে মাঝে ফল ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

ফল ছিদ্রকারী পোকা দমন

- ফল সংগ্রহ করার পর পর মৃত, অর্ধমৃত, শুকনা ডালপালা ছাঁটাই করে দিতে হবে।
- পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ করতে হবে।
- ফল ধরার পর আক্রমণ শুরু হলে আক্রমণের শুরতেই প্রতিলিটার পানিতে ৫০ গ্রাম আধা ভাঙ্গ নিমের বীজ সারারাত ভিজিয়ে রেখে সকাল বেলা পুরো গাছে স্প্রে করতে হবে।
- তারপরও আক্রমণ দেখা গেলে সুমিথিয়ন ৫০ইসি ২ মিলি হারে প্রতিলিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফুল আসার সময়: এপ্রিলের শেষের দিকে সাধারণত মিষ্টি তেঁতুল গাছে ফুল আসে।

ফল সংগ্রহ: মিষ্টি তেঁতুলের ফল সংগ্রহের উপযোগী হয় বসন্তের শেষ দিকে এবং গ্রীষ্মের শুরতে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)।

ফলের পরিপক্কতা ও ফলন: মিষ্টি তেঁতুলের সব ফল (পড) একসাথে পরিপক্ক হয় না। তাই হারভেস্টও করতে হয় আলাদা আলাদা সময়ে। সাধারণত গাছ থেকে ফল পাড়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি পডের বাইরের রং যেন বাদামী বর্ণের হয়। সুষ্ঠুভাবে পরিপক্ক ফলের ভিতরের পাল্প আঠালো ও বাদামী বা গাঢ় বাদামী রঙের হয় এবং বীজগুলো শক্ত ও চকচকে হয়। আরও একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সম্পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় মিষ্টি তেঁতুলের পডের বহিঃত্বক খুব সহজেই হাত দিয়ে চাপ দিয়ে ভাঙ্গ যায় এবং চাচ দিলে একটি মচমচে শব্দ হয়। আর পডের ভিতরের পাল্প শুকিয়ে সামান্য কুঁচকে যায়।

ফল সংগ্রহের উপায়/কৌশল: গাছ থেকে পাকা অবস্থায় মিষ্টি তেঁতুল সংগ্রহের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায় হলো মই দিয়ে গাছে উঠে একটি একটি করে পাড়া যাতে এর বাইরের ত্বক ভেঙ্গে না যায়। কারণ মিষ্টি তেঁতুলের শেলফ লাইফ মোটামুটিভাবে পুরোটাই নির্ভর করে এর বহিঃত্বক বা খোসার ওপর। কারণ বহিঃত্বক ভেঙ্গে গেলে পড খুব তাড়াতাড়ি ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং উপযুক্ত বাজার মূল্য পাওয়া যায় না।

ফুল ফসল

আমাদের দেশে ফুলের গবেষণা একটি নতুন অধ্যায়। যদিও বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন ফুলের উন্নয়নে গবেষণা বৃদ্ধির মাধ্যমে উৎপাদন ও বাণিজ্য অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। বিশ্ববাজারে বর্তমানে প্রায় ৬০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ফুল বাণিজ্য হচ্ছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ৫০০ কোটি টাকার ফুল বেচা-কেনা হয় এবং এর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফুল বিভাগ ফুলের জাত উদ্ভাবন, বীজ/কাটিং এর মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, ফুল সতেজ রাখার সঠিক পদক্ষেপসমূহ এবং উৎপাদনের উন্নত কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা করে থাকে।

- গ্লাডিওলাস
- অর্কিড
- চন্দ্রমল্লিকা
- রজনীগন্ধা
- জারবেরা
- এ্যানথুরিয়াম
- ডালিয়া
- লিলি
- এলপিনিয়া
- গাঁদা

গ্লাডিওলাস

বারি গ্লাডিওলাস-১

বারি গ্লাডিওলাস-১

বারি গ্লাডিওলাস-১ জাতটি বাংলাদেশের জলবায়ুতে চাষের জন্য ২০০৩ সালে অনুমোদন করা হয়। জাতটি বর্ষজীবী এবং গাছের উচ্চতা মাঝারী (৫০ সেমি) ও বেশ শক্ত। ফুলের বোঁটা লম্বা ও অধিক ফ্লোরেট সমৃদ্ধ। লাল রঙের দুটি পাঁপড়িতে হলুদ ছোপ থাকে। সাধারণত পানিতে ফুলের স্থায়িত্বকাল ৭-৮ দিন। ফ্লোরেটের সংখ্যা ৯-১০টি। ফুলের আকার দৈর্ঘ্য ১০ সেমি এবং প্রস্থ ৮ সেমি। করমের সংখ্যা ২-৩টি এবং করমেলের সংখ্যা ২৫-৩০টি ।

বারি গ্লাডিওলাস-২

আমাদের দেশের জলবায়ুতে সহজে আবাদযোগ্য বারি গ্লাডিওলাস-২ জাতটি ২০০৩ সালে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। এ জাতের গাছ বর্ষজীবী, উচ্চতা মাঝারী ও গাছ বেশ শক্ত। লম্বা বোঁটাসম্পন্ন ফুলে গাঢ় মেজেন্টা রঙের অনেকগুলি ফ্লোরেট থাকে। প্রতি ফ্লোরেটের দুটি পাঁপড়িতে ক্রিম রঙের ছোপ দেখা যায় এবং অন্যান্য পাঁপড়িতে সাদা স্ট্রাইপ থাকে। প্রতিটি ফুলের ব্যাস ৯.০-১০.০ সেমি হয়ে থাকে। সাধারণত পানিতে এ ফুল ৯ থেকে ১০ দিন তাজা থাকে।

বারি গ্লাডিওলাস-২

বারি গ্লাডিওলাস-৩

বারি গ্লাডিওলাস-৩

এটি একটি কন্দ জাতীয় ফুল। সারা বছর এর চাষাবাদ করা যায়, বাজারে চাহিদা আছে এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ জাতের কাটফ্লাওয়ারের তুলনা নেই। এ গাছের পাতা তরবারীর মত। করম রোপণের উপযুক্ত সময় হচ্ছে মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর। ফুলের রং সাদা এবং ৯.১-৯.৩ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। স্পাইকপ্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা প্রায় ১৩-১৪টি। সাধারণত স্পাইকের নিচের দিক থেকে ১-২টি ফ্লোরেট উন্মুক্ত হওয়া শুরু হলে স্পাইক কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। হেক্টরপ্রতি ১.৭৫-২.০০ লক্ষ ফুলের স্টিক পাওয়া যায়। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন থাকে।

বারি গ্লাডিওলাস-৪

বারি গ্লাডিওলাস-৪

কন্দজাতীয় এ ফুলটি সোর্ড লিলি নামে পরিচিত। এ গাছের পাতা তরবারীর মতো এবং দু'সারিতে পরপর বিপরীত দিকে অবস্থান করে। গ্লাডিওলাস বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। সারা বছর এ ফুলের চাষাবাদ করা যায়। ফুলের রং গাঢ় গোলাপী এবং প্রায় ৯.১-৯.২ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। স্পাইক ৭০-৭৫ সেমি লম্বা এবং ফ্লোরেটের সংখ্যা প্রায় ১২-১৩ টি। ফুলের সজীবতা ৮-৯ দিন। জীবনকাল প্রায় ১৪৫-১৫৫ দিন। গড় ফলন প্রায় ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর। জাতটি ২০০৯ সালে অবমুক্ত করা হয়।

বারি গ্লাডিওলাস-৫

এটি একটি কন্দ জাতীয় হলুদ রঙের ফুল। তাপ সহনশীল হওয়ায় সারা বছর চাষ করা যায়। সারা দেশে চাষ উপযোগী, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চলে। পুষ্পদণ্ড প্রায় ৮০-৮২ সেমি। স্পাইক প্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা প্রায় ১১-১২টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৭-৮ দিন। ফলন প্রায় ২ লক্ষ স্টিক /হেক্টর। জাতটি ২০০৯ সালে অবমুক্ত করা হয়।

বারি গ্লাডিওলাস-৫

বারি গ্লাডিওলাস-৬

বারি গ্লাডিওলাস-৬

এটি একটি কন্দ জাতীয় ফুল। এ গাছের পাতা তরবারীর মতো। সারাবছর এ ফুলের চাষাবাদ করা যায়। ফুলের রং আকর্ষণীয় নীল এবং প্রায় ৯.০-৯.১ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। স্পাইক ৭০-৮০ সেমি লম্বা এবং ফ্লোরেটের সংখ্যা প্রায় ১০-১১ টি। ফুলের সজীবতা প্রায় ৮-৯ দিন। গড় ফলন প্রায় ১,৯০,০০০স্টিক/হেক্টর। জাতটি ২০১৬ সালে অবমুক্ত করা হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় এ ফুল ভাল জন্মে। সাধারণত ১৫-২৫° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এর অংগজ বৃদ্ধি ও ফুল উৎপাদনের জন্য উপযোগী। গ্লাডিওলাস দৈনিক ৮-১০ ঘণ্টা আলো পছন্দ করে। তাই রৌদ্রজ্জ্বল জায়গা ও সে সাথে ঝড়ো বাতাস প্রতিহত করার ব্যবস্থা আছে এমন স্থান এ ফুল চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত। সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাটি গ্লাডিওলাস চাষের জন্য উত্তম। মাটির pH মান ৬-৭ এর মধ্যে থাকা উচিত।

বংশ বিস্তার: বীজ, কর্‌ম এবং কর্‌মেলের মাধ্যমে গ্লাডিওলাসের বংশবিস্তার করা যায়। সাধারণভাবে চাষের জন্য 'কর্‌ম' রোপণ করা হয়।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হয়। শেষ চাষ দেয়ার সময় হেক্টরপ্রতি ১০ টন গোবর সার, ৩৭৫ কেজি টিএসপি, ৩০০ কেজি এমওপি, ১২ কেজি বরিক এসিড, ৮ কেজি জিংক সালফেট ও ১০০ কেজি জিপসাম সার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দেয়া উচিত। ৩০০ কেজি ইউরিয়া এর অর্ধেক কর্‌ম রোপণের ২০-২৫ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক পুষ্পদণ্ড বের হওয়ার সময় উপরি প্রয়োগ করা উচিত।

কর্‌ম রোপণ: অক্টোবর-নভেম্বর মাসে জমি তৈরির পর ৫.০-৫.৫ সেমি ব্যাসের রোগমুক্ত কর্‌ম মাটির ৬-৭ সেমি গভীরতায় রোপণ করা উচিত।

রোপণ দূরত্ব: সারি থেকে সারি ২০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছ ২০ সেমি।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: গ্লাডিওলাসের ক্ষেত আগাছামুক্ত রাখতে হয়। শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনমতো সেচ দেয়া উচিত। প্রতি সেচের পর জমিতে 'জো' আসলে নিড়ানী দিয়ে জমি আলগা করে দিতে হয়। প্রথমবার ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার পর সেচ দিতে হয় এবং পরে মাটিতে 'জো' আসলে মাটি ঝুরঝুরে করে দুই সারির মাঝখানের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হয়। এতে করে গাছগুলো সোজা থাকে।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থা: গ্লাডিওলাস ফুলে সাধারণত ফিউজেরিয়াম উইল্ট ও করম পচা রোগ দেখা যায়।

ফিউজেরিয়াম উইল্ট: রোগাক্রান্ত করম ও মাটি দ্বারা এ ছত্রাক রোগ ছড়ায়। এ রোগে পাতার আগা প্রথমে হলদে হয় এবং পরবর্তীতে বাদামী থেকে ধূসর হয়ে বক্রাকৃতির হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ গাছ আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। করমে গাঢ় বাদামী থেকে লালচে বাদামী গভীর ক্ষত সৃষ্টি হয়। বেশি আক্রান্ত করম গুদামে শুকিয়ে যায় এবং লাগানোর পর গাছ গজায় না।

এ রোগ দমনে সুস্থ রোগমুক্ত করম ব্যবহার করা উচিত। করম গুদামজাতকরণ এবং লাগানোর পূর্বে অটোস্টিন (০.২%) দ্বারা ১৫-৩০ মিনিট শোধন করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। উপকারী ছত্রাক ট্রাইকোডারমা স্পোর সাসপেনশন (3×10^4 cfu/ml) ব্যবহার করা যেতে পারে।

করম পচা রোগ: আঘাতপ্রাপ্ত অংশ দিয়ে এ রোগের জীবাণু করমে অনুপ্রবেশ করে। হিমাগারে রোগাক্রান্ত করমের উপর কালো/বাদামী/হলুদ বর্ণের মোল্ড বা ছাতার মত আবরণ তৈরি হয়। করম তোলা ও নাড়া-চাড়া করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন করম আঘাতপ্রাপ্ত না হয়। আর্দ্র বা উচ্চ তাপমাত্রায় করমকে সংরক্ষণ করা উচিত নয়।

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থা: গ্লাডিওলাস ফুলে পোকার আক্রমণ খুব বেশি দেখা যায় না, কিন্তু ক্ষেত্র বিশেষে নিম্নবর্ণিত পোকাগুলির আক্রমণ দেখা দিতে পারে।

থ্রিপস: এটি অতি ক্ষুদ্র পোকা যা সাধারণত খালি চোখে দেখা যায় না। এ পোকা পাতা, স্পাইক ও ফুলের রস শোষণ করে যার ফলে আক্রান্ত পাতায় রূপালী ও বাদামী রঙের লম্বা দাগ দেখা যায় এবং পাতা শুকিয়ে যায়। স্পাইক ও ফুলে আক্রমণের ফলে স্পাইকের ফুল ভালভাবে ফুটতে পারে না এবং ফুলে সাদা বা বাদামী ফুসকুড়ি দাগ দেখা যায় যাতে পাঁপড়ি বিবর্ণ হয়ে যায় এবং ফুলের বাজার মূল্য কমে যায়।

এ পোকা দমন করার জন্য জমিতে সাদা রঙের আঁঠালো ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে ফিপ্রনিল গ্রুপের কীটনাশক (অ্যারোনিল ৫০ এসসি/ফোকাস ৫০ এসসি) ১.০ মিলি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করা উচিত।

জাব পোকা: এ পোকা কচি পাতা, নতুন স্পাইক ও ফুলের কুঁড়িতে আক্রমণ করে রস চুষে খায়। ফলে আক্রান্ত পাতা ও স্পাইক কুঁকড়ে যায় এবং বিকৃত হয়। ফুলের কুঁড়ি এবং ফুলও বিকৃত হয় এবং ভালভাবে ফুটতে পারে না।

এদের দমনে প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্ত পাতা বা ফুল ছিড়ে ফেলে পোকাসহ ধ্বংস করা উচিত। হলুদ রঙের আঁঠালো ফাঁদ ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া যায়। তাছাড়া সাবান গুঁড়া ৫ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যেতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে ডাইমেথয়েট জাতীয় কীটনাশক (পারফেকথিয়ন/সানগর/টাফগর ৪০ ইসি) ২.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর ২-৩ বার স্প্রে করা উচিত।

ফুল সংগ্রহ: সাধারণত স্পাইকের নিচের দিক থেকে ১-২টি ফ্লোরেট উন্মুক্ত হওয়া শুরু হলে স্পাইক কাটার উপযুক্ত সময় হয়েছে বলে ধরে নেয়া হয়। ফুল সংগ্রহের পরপরই বালতি ভর্তি পানিতে সোজা করে ডুবিয়ে রেখে পরে নিম্ন তাপমাত্রায় (৬-৭° সেন্টিগ্রেড) সংরক্ষণ করা উত্তম। ফুলের স্পাইক কাটার সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন গাছের গোড়ায় ৪-৫ টি পাতা থাকে। তা না হলে করম পুষ্ট হবে না।

করম তোলা ও সংরক্ষণ: ফুল ফোটা শেষ হলে পাতা হলুদ হয় এবং গাছ মারা যায়। এসময় গাছের গোড়া খুঁড়ে সাবধানে 'করম' গুলি সংগ্রহ করা দরকার। খেয়াল রাখতে হবে যেন 'করম' কেটে অথবা আঘাত প্রাপ্ত না হয়। বড় ও ছোট 'করম' গুলোকে বাছাই করে আলাদা করার পর ছায়ায় শুকানো উচিত। সাধারণত মার্চ-এপ্রিল মাসে 'করম' তোলা হয়। সংরক্ষণকালে পচন এড়ানোর জন্য করম গুলোকে ০.২% অটোস্টিন দ্রবণে ৩০ মিনিট শোধন করে শুকিয়ে নেয়া উচিত। এরপর শুকানো 'করম' গুলি ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগে ভরে ঘরের শুকনো ও ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করা ভাল। সবচেয়ে ভাল হয় যদি এগুলোকে ঠাণ্ডা গুদামে সংরক্ষণ করা যায়। পরবর্তীতে সময়মতো এ সকল করম গুদাম থেকে বের করে বংশবিস্তারের কাজে ব্যবহার করা হয়।

অর্কিড

বারি অর্কিড-১

বারি অর্কিড-১ স্থানীয় প্রজাতির বৃহদাকার বিরুৎ শ্রেণির অর্কিড। এ প্রজাতি সিলেট ও মধুপুর অঞ্চলে সীমিত আকারে পাওয়া যায়। এ জাতটিকে ২০০৩ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়। ফুলের স্টিক এক মিটার পর্যন্ত হতে

পারে। এতে ১০ থেকে ১৮টি ফ্লোরেট এবং ফুলের ব্যাস সাধারণত ১০-১৫ সেমি এর বেশি হয়। ফুলটি খুবই সুগন্ধী। পাঁপড়িগুলির বাইরের দিক Creamy white এবং ভিতরের দিক Reddish brown golden yellow. এ ফুলটি সাধারণত পানিতে ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত তাজা থাকে।

বারি অর্কিড-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

ছায়াযুক্ত সুনিষ্কাশিত কিন্তু স্যাঁতস্যাঁতে জমিতে চাষ করা যায়। সাধারণত একই জমিতে দীর্ঘদিন এ ফুলের চাষ অব্যাহত রাখা যায়। প্রখর সূর্যালোকে এ ফুল ভাল হয় না। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষের জন্য জমিতে শেডনেট দিয়ে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হয় যাতে ৪০-৬০% সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে। টবে চাষের ক্ষেত্রে বড় গাছের নিচে এ ফুলের চাষ করা যেতে পারে এবং জাতটি বহুবর্ষজীবী।

সাকার উৎপাদন ও বংশ বিস্তার: গাছের ফুল শেষে বা ফুল কাটার পর প্রতিটি গাছ থেকে পার্শ্বীয়ভাবে সাকার বের হয়। এই সাকারসমূহ গাছে লাগানো অবস্থায় যখন শিকড় বের হয় তখনই গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মূল জমিতে লাগানো যেতে পারে। এছাড়া কেটে ফেলা ফ্লাওয়ার স্টিকের ফুল শেষ হয়ে গেলে তা থেকেও চারা উৎপাদন করা যেতে পারে। এজন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়।

জমি তৈরি ও রোপণ পদ্ধতি: বিভাজন প্রক্রিয়ায় গাছ থেকে সাকার সংগ্রহ করে অথবা টিস্যু কালচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চারা তৈরি করে জমিতে লাগাতে হবে। পচা গোবর/কম্পোস্ট, নারিকেলের ছোবরা, ধানের তুষ ও বেলে দোআঁশ মাটির সমপরিমাণ মিশ্রণের মাধ্যমে বেড তৈরি করতে হবে। সাকার লাগানোর সময় সারি থেকে সারি ৩০-৪০ সেমি. এবং গাছ থেকে গাছে ২৫-৩০ সেমি দূরত্ব রাখতে হবে। সাকার লাগানোর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিকড়গুলো পুরোপুরি মাটির নিচে থাকে।

সার প্রয়োগ: ইউরিয়া, টিএসপি ও এমওপি সমৃদ্ধ ২০:২০:২০ মিশ্র সার বেশ উপযোগী। সার পানিতে গুলিয়ে সপ্তাহে এক বা দু'দিন গাছে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার সময় গাছের পাতা যেন ভালভাবে ভিজে যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: মাটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রস থাকতে লাগানোর পর হালকা সেচ দিতে হয় যাতে সাকারগুলো মাটিতে লেগে যায়। পরবর্তী সময়ে আবহাওয়ার অবস্থা বুঝে সেচ দিতে হবে। এছাড়াও ফুল চাষের জন্য বাতাসের অপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬০% বজায় রাখতে হলে স্প্রিংকলার দিয়ে মাঝে মাঝে Misting করতে হবে। জমিতে দাঁড়ানো পানি এ ফসলের জন্য ক্ষতিকর।

রোগ ও পোকা দমন: এ ফুলটিতে সাধারণত রোগ বা পোকার আক্রমণ কম দেখা যায়। তবে ভাইরাস রোগের ক্ষেত্রে আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ফুলের কুঁড়ির কীড়া দমনের জন্য কোন সিস্টেমিক বালাইনাশক অনুমোদিত প্রয়োগ মাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে। পাতায় দাগ দেখা দিলে অটোস্টিন ০.১% ১৫ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফুল সংগ্রহ: সাকার থেকে গাছ লাগানোর এক বছরের মধ্যেই ফুল আসে। অপরদিকে টিস্যু কালচার থেকে প্রাপ্ত চারা থেকে ফুল পেতে কমপক্ষে ১৮ মাস সময় লাগে। বাণিজ্যিক চাষের ক্ষেত্রে ফ্লাওয়ার স্টিকের এক বা দুটি ফুল ফোটার সাথে সাথে কাটতে হবে। বাগানে বা টবে সৌখিন চাষের ক্ষেত্রে ফুল কাটার প্রয়োজন নেই। এ ক্ষেত্রে গাছে প্রায় ২৫-৩০ দিন পর্যন্ত ফুল টিকে থাকে।

ফুল আসার সময়: ফাল্গুন-চৈত্র মাস (মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য এপ্রিল)

ফলন/হেক্টর:

প্রথম বছর:	৬,০০০ স্টিক
দ্বিতীয় বছর:	৮,০০০ স্টিক
তৃতীয় বছর:	১০,০০০ স্টিক

এ ছাড়া প্রতি বছর গাছ থেকে চারা রেখে ২-৫টি সাকার সংগ্রহ করা সম্ভব।

চন্দ্রমল্লিকা

বারি চন্দ্রমল্লিকা- ১

বারি চন্দ্রমল্লিকা-১ একটি শীতকালীন মৌসুমী ফুলের জাত। গাছ মাঝারী আকৃতির এবং উচ্চতা ৩০-৩৫ সেমি। পাতা হালকা সবুজ এবং সব অঞ্চলে জাতটি চাষের উপযোগী। তবে উঁচু, সুনিষ্কাশিত বেলে-দোআঁশ মাটিতে ভাল জন্মে। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। ২০-২৫ দিনের চারা মাঠে বা পটে লাগানো হয়। ডিসেম্বরে ফুল আসতে শুরু করে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকে। ফুলের রং হলুদ এবং 'এনিমোন' প্রকৃতির। প্রতি গাছে ৩০-৩৫টি ফুল উৎপাদিত হয়। ফুলের সজীবতা ৯-১০ দিন থাকে। রোগবালাই সহিষ্ণু তবে প্রয়োজনে পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

বারি চন্দ্রমল্লিকা-১

বারি চন্দ্রমল্লিকা-২

বারি চন্দ্রমল্লিকা-২

দেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী শীতকালীন মৌসুমী ফুলের জাত। গাছের গড় উচ্চতা ৪০ সেমি। পাতার রঙ হালকা সবুজ। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। ২০-২৫ দিনের চারা মাঠে বা পটে লাগানো হয়। ডিসেম্বরে ফুল আসতে শুরু করে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকে। গাছপ্রতি গড়ে ৩৫-৪০টি ফুল ধরে। ফুলের রং সাদা এবং ৭ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। ফুলের সজীবতা ১২-১৪ দিন। রোগবালাই সহিষ্ণু তবে প্রয়োজনে পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।

বারি চন্দ্রমল্লিকা-৩

শীতকালীন মৌসুমী ফুলের মধ্যে চন্দ্রমল্লিকা অন্যতম। পট প্লান্ট হিসেবে এর ব্যবহার সর্বাধিক। গাছের গড় উচ্চতা ৩৫ সেন্টিমিটার। পাতার রং হালকা সবুজ। ফুলের রং মেজেন্টা। প্রতি গাছে ২০-২৫ টি ফুল উৎপাদিত হয় । পটে ফুলের স্থায়িত্ব প্রায় ১০-১২ দিন থাকে।

বারি চন্দ্রমল্লিকা-৩

বারি চন্দ্রমল্লিকা-৪

বারি চন্দ্রমল্লিকা-৪

এটি সর্বত্র চাষ উপযোগী শীতকালীন মৌসুমী ফুল। পট প্লান্ট হিসেবে ব্যবহার সর্বাধিক তবে কাট-ফ্লাওয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গাছের গড় উচ্চতা ৪০ সেন্টিমিটার। পাতার রং হালকা সবুজ। ফুলের রং টকটকে লাল। প্রতি গাছে ২০-২৫ টি ফুল উৎপাদিত হয়। পটে ফুলের স্থায়িত্ব প্রায় ১০-১২ দিন থাকে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: চন্দ্রমল্লিকা তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা আবহাওয়া এবং রৌদ্রজ্জ্বল জায়গা পছন্দ করে। বাংলাদেশে শীতকালই এ ফুল চাষের উত্তম সময়। জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ সুনিষ্কাশিত দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি এ ফুল চাষের জন্য উপযোগী। মাটির pH মান ৬.০-৭.০ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চারা তৈরি: বীজ, সাকার ও শাখা কলম থেকে চন্দ্রমল্লিকার চারা তৈরি করা যায়। বীজ থেকে চারা করলে তা থেকে ভাল মানের ফুল পাওয়া যায় না এবং ফুল পেতে অনেক দিন সময় লাগে। সেক্ষেত্রে শাখা কলম/সাকার থেকে চারা তৈরি করে জমিতে লাগালে এ সমস্যা থাকে না। সাধারণত বাণিজ্যিকভাবে চন্দ্রমল্লিকার চাষ করতে হলে সাকার থেকে চারা তৈরি করা উত্তম। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের দিকে ফুল দেয়া শেষ হলে গাছগুলোকে মাটির উপর থেকে ১৫-২০ সেমি রেখে কেটে দেয়া হয়। কিছুদিন পর গাছের গোড়া থেকে সাকার বের হতে থাকে। এ সাকারগুলি ৫-৭ সেমি লম্বা হলে মাতৃগাছ থেকে আলাদা করে টবে/বীজতলায় লাগাতে হবে। টবে লাগানোর ক্ষেত্রে প্রথমে সাকারগুলি থেকে গোড়ার পাতা ছাটাই করে ১০ সেমি ব্যাসের ছোট টবে লাগাতে হবে। টবের মিশ্রণে থাকবে ১ ভাগ বালি, ১ ভাগ মাটি, ১ ভাগ পাতাপচা সার ও সামান্য কাঠের ছাই। এগুলো ভালভাবে মিশিয়ে টব ভর্তি করে সাকার লাগানো হলে তিন থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে শিকড় আসা শুরু হয়।

এপ্রিল-মে মাসের শেষ দিকে শিকড়সহ চারা দ্বিতীয়বারের মতো ১৫ সেমি ব্যাসের টবে স্থানান্তর করতে হয়। এ পর্যায়ে টবের মিশ্রণে থাকবে ১ ভাগ বালি, ১ ভাগ মাটি, ২ ভাগ পাতাপচা সার, ১/৪ ভাগ কাঠের ছাই এবং ১ টেবিল চামচ হাড়ের গুঁড়া।

তৃতীয় বা শেষ বারের মতো চারাগুলিকে ২৫-৩০ সেমি ব্যাসের বড় টবে স্থানান্তর করতে হয়। এ পর্যায়ে টবের মিশ্রণে থাকবে ১ ভাগ বালি, ১ ভাগ মাটি, ২ ভাগ পাতা পচা সার, ১/৪ ভাগ কাঠের ছাই এবং ২ টেবিল চামচ হাড়ের গুঁড়া। জুন-জুলাই মাসে ছোট ছোট চারাগুলিকে কড়া রৌদ্র ও অতিরিক্ত বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে হয় এবং টবগুলিকে এমন জায়গায় রাখতে হবে যেন যথেষ্ট পরিমাণ আলো-বাতাস পায়।

চারা রোপণ: জমি কিংবা টবে চারা রোপণের উপযুক্ত সময় হচ্ছে অক্টোবর-নভেম্বর। জমিতে ৩০ × ২০ সেমি অন্তর অন্তর চন্দ্রমল্লিকা রোপণ করা উত্তম।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

মাঠে বা জমিতে: জমি তৈরির পর হেক্টরপ্রতি ৮-১০ টন পচা গোবর, ৩৭৫ কেজি টিএসপি, ২৭০ কেজি এমওপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ৩২০ কেজি ইউরিয়া সারের অর্ধেক ১৬০ কেজি চারা রোপণের ১ মাস পর গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য এবং বাকি অর্ধেক ১৬০ কেজি ফুলের কুঁড়ি আসার সময় উপরি প্রয়োগ করা উচিত।

পটে বা টবে: পটে জন্মানোর জন্য ২ ভাগ মাটি, ২ ভাগ গোবর সার, ১ ভাগ পাতা পচা সার ও ১ ভাগ হাড়ের গুঁড়ার সাথে ৩ গ্রাম টিএসপি, ৩ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ এর মিশ্রণ ব্যবহার করা উত্তম। ৮ গ্রাম ইউরিয়া সারের অর্ধেক সাকার/কাটিং রোপণের ২৫-৩০ দিন পর গাছের দৈহিক বৃদ্ধির সময় এবং বাকি অর্ধেক ফুলের কুড়ি আসার সময় উপরি প্রয়োগ করা উচিত।

শাখা ভাঙ্গা: কাণ্ডের আগার অংশ কেটে ফেলাকে শাখা ভাঙ্গা বা পিনচিং বলে। সাধারণত চারা লাগানোর ২৫-৩০ দিন পর পিনচিং করলে গাছটি ঝোপালো হয় এবং অধিক ফুল পাওয়া যায়।

কুঁড়ি অপসারণ: অনাকাঙ্ক্ষিত অপরিপক্ক ফুলের কুঁড়ি অপসারণ কার্যক্রমকে কুঁড়ি অপসারণ বলা হয়। মুকুট কুঁড়িগুলিকে রেখে অবশিষ্ট কুঁড়িগুলি অপসারণ করলে বড় আকারের ফুল পাওয়া যায়।

ঠেস দেয়া: চন্দ্রমল্লিকার ফুল সাধারণত ডালপালার তুলনায় ভারী ও বড় হয়। তাই গাছের গোড়া থেকে কুঁড়ি পর্যন্ত একটা শক্ত কাঠি পুঁতে দিতে হয়। এতে ফুল নুয়ে পড়বে না। চারা লাগানোর সময় কাঠি একবারই পুঁতে দেয়া ভাল। এজন্য জাত বুঝে চন্দ্রমল্লিকা গাছের উচ্চতা অনুযায়ী বাঁশের কাঠি চারার গোড়া থেকে একটু দূরে পুঁতে দিতে হবে। একবারে গোড়ায় পুঁতলে বা গাছ বড় হয়ে যাওয়ার পর পুঁতলে অনেক সময় শিকড়ের ক্ষতি হতে পারে, এমনকি শিকড়ে ক্ষত সৃষ্টি হলে রোগ জীবাণু ক্ষতের মাধ্যমে গাছে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

সেচ: চন্দ্রমল্লিকার চারা লাগানোর পর হালকা সেচ দিতে হবে। চন্দ্রমল্লিকা গাছ কখনো বেশি পানি সইতে পারেনা। তাই পানি এমনভাবে দিতে হবে যেন গোড়ায় বেশিক্ষণ পানি জমে না থাকে। চারা রোপণের পূর্বে এবং পরে প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পরিমাণমত পানি সেচ দেয়া জরুরি।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থা: চন্দ্রমল্লিকা ফুলে সাধারণত পাউডারী মিলডিউ ও পাতায় দাগ পড়া রোগ দেখা যায়।

পাউডারী মিলডিউ: এ রোগ হলে গাছের পাতার উপর সাদা থেকে ধূসর গুঁড়ার মতো আবরণ পড়ে এবং আস্তে আস্তে পাতা কুকড়িয়ে বিকৃতাকার হয়ে যায়। বেশি আক্রমণে পাতা শুকিয়ে গাছ মারা যায়। গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এ রোগ দমনে মাঠে যথাযথ রোপণ দূরত্ব অনুসরণ করে গাছের জন্য পর্যাপ্ত আলো বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাছাড়া এ রোগ দমনে আক্রমণের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে অটোস্টিন (০.২%) বা সালটাফ (০.২%) ৭-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

রাস্ট: এ রোগের আক্রমণে পাতার নিচের দিকে বাদামী ফুসকুড়ি সৃষ্টি হয় এবং পাতার উপরের দিকে হলদে সবুজ দাগ দেখা দেয়। মারাত্মক আক্রমণে পাতার অধিকাংশ এলাকা নষ্ট হয়ে পাতা ঝরে পড়তে পারে এবং সে ক্ষেত্রে ফুল উৎপাদন ব্যাপকহারে হ্রাস পায়।

এ রোগ দমনে আক্রান্ত পাতা আপসারণ করতে হবে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদও কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া ফলিকিউর (০.১%) স্প্রে করা যেতে পারে।

পাতায় দাগ পড়া: এ রোগের আক্রমণে প্রথমে নিচের পাতায় হলদে দাগ পড়ে এবং আক্রমণের মাত্রার উপর নির্ভর করে বাদামী থেকে কালো দাগে পরিণত হয়। এ রোগ দমনে অটোস্টিন বা বেনলেট (০.১%) স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

গ্রে মোল্ড: এ রোগের আক্রমণে ফুলের পাঁপড়ি, পাতা এমনকি কাণ্ডেও বাদামী পানি ভেজা দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছে ধূসর থেকে বাদামী পাউডারের মত আস্তরণ পড়ে। দীর্ঘকালীন আর্দ্র ও মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়া এ রোগ বিস্তারে খুবই সহায়ক।

এ রোগ দমনে যথাযথ রোপণ দূরত্ব অনুসরণ করে গাছকে পর্যাপ্ত আলো বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সে সাথে রোভরাল (০.২%) স্প্রে করা যেতে পারে।

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থা: চন্দ্রমল্লিকা ফুলে সাধারণত জাব পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

জাবপোকা: এ পোকা খুব ছোট আকৃতির, নরম ও কালো-সবুজ বর্ণের। শীতকালে এর প্রকোপ খুব বেড়ে যায়। এ পোকা গাছের পাতা, ডগা এবং ফুল থেকে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে। আক্রান্ত নতুন কুঁড়ি ও পাতা কুঁকড়ে যায়। এ পোকা দমনে প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্ত পাতা বা ফুল ছিঁড়ে ফেলে পোকাসহ ধ্বংস করা উচিত। হলুদ রঙের আঁঠালো ফাঁদ ব্যবহার করেও ভাল ফল পাওয়া যায়। সাবান গুঁড়া ৫ গ্রাম/লিটার হারে পনিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যেতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে ডাইমেথয়েট জাতীয় কীটনাশক (পারফেকথিয়ন/সানগর/টাফগর ৪০ ইসি) ২.০ মিলি./লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ফুল সংগ্রহ: চন্দ্রমল্লিকা ফুল কুড়ি অবস্থায় তুললে ফুটে না। বাইরের পাঁপড়িগুলো সম্পূর্ণ খুলে গিয়েছে এবং মাঝের পাঁপড়িগুলো ফুটতে শুরু করেছে এমন অবস্থায় ধারালো ছুরি দিয়ে খুব সকালে অথবা বিকেলে দীর্ঘ বোঁটাসহ ফুল তোলা উচিৎ।

ফলন: গাছ প্রতি গড়ে বছরে ২০-২৫ টি ফুল পাওয়া যায়।

রজনীগন্ধা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফুল বিভাগ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, নার্সারি ও বিদেশ হতে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০১৬ সালে 'বারি রজনীগন্ধা-১' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদ উপযোগী।

রজনীগন্ধার জাত

বারি রজনীগন্ধা-১

এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল এবং ফুলের রং সম্পূর্ণ সাদা। সুগন্ধি ফুল ও কাট ফ্লাওয়ার হিসেবে রজনীগন্ধার এ জাতটি খুবই জনপ্রিয়। পুষ্পদণ্ড প্রায় ৭৫ সেমি এবং স্পাইক প্রতি ফ্লোরেটের সংখ্যা ৩০-৩২ টি। প্রায় সারা বছর এ ফুল ফোটে তবে খরিফ মৌসুমে বেশি ভাল হয়। ফুলদানীতে এ ফুল প্রায় ৭-৮ দিন সজীব থাকে। জাতটি ২০১১ সালে অবমুক্ত করা হয়।

বারি রজনীগন্ধা-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি

রজনীগন্ধা উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া পছন্দ করে, এ জন্য আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে এ ফুলের চাষ করা হয়। এ ফুলের সফল চাষের জন্য গড় তাপমাত্রা ২০-৩৫° সেন্টিগ্রেড ও আর্দ্র আবহাওয়ার প্রয়োজন হয়। সুনিষ্কাশিত, জৈবপদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ মাটি রজনীগন্ধা চাষের জন্য উত্তম।

বংশ বিস্তার

রজনীগন্ধার বংশ বিস্তার কন্দের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। প্রতিটি গাছের গোড়ায় পেঁয়াজের মত যে বস্তু পাওয়া যায় তাকে কন্দ বলে। পুরাতন গাছের গোড়ায় ঝাড় আকারে অনেক কন্দ থাকে। মাঝের কন্দটি বড় হয়। সাধারণত মাঝারী থেকে বড় আকারের কন্দ বংশ বিস্তারের জন্য ব্যবহার করা হয়। বড় ধরনের কন্দ থেকে স্বাস্থ্যবান গাছ হয় ও গাছে তাড়াতাড়ি ফুল আসে কিন্তু ছোট কন্দ থেকে দুর্বল প্রকৃতির গাছ হয় ও দেরিতে ফুল আসে।

জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ

জমি ৪-৫ বার চাষ দিয়ে ভালভাবে তৈরি করতে হয়। শেষ বার চাষের সময় হেক্টরপ্রতি উর্বরতা ভেদে ৯-১০ টন গোবর, ২৫০ কেজি টিএসপি ও ২৪০ কেজি এমওপি সার মাটির সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে দেয়া উচিত। কন্দ রোপণের ৩ সপ্তাহ পর যখন নতুন গাছের বৃদ্ধি শুরু হয় তখন হেক্টরপ্রতি ৩০০ কেজি ইউরিয়া সার এর অর্ধেক ১৫০ কেজি প্রথম উপরি প্রয়োগ এবং বাকি অর্ধেক ১৫০ কেজি সার পুষ্পদণ্ড বের হওয়ার সময় দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ হিসেবে জমিতে দেয়া হয়।

কন্দ রোপণ

বাঁছাইকৃত কন্দগুলি মার্চ-এপ্রিল মাসে জমিতে লাগানো উচিত। লাগানোর সময় কন্দের পুরানো শিকড়গুলি কেটে দেয়া উচিত। সাধারণভাবে ভাল ফুল পাওয়ার জন্য লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৩০ সেমি এবং প্রতি লাইনে কন্দ থেকে কন্দের দূরত্ব ২০ সেমি বজায় রাখা ভাল। প্রতিটি কন্দ সোজা করে ৭-১০ সেমি মাটির গভীরে পুঁতে দিতে হয়। কন্দ রোপণের পর প্লাবন সেচ দিয়ে সম্পূর্ণ মাঠ ভিজিয়ে দেয়া উচিত।

অন্তর্বর্তী পরিচর্যা

রজনীগন্ধার ক্ষেত আগাছা মুক্ত রাখা উচিত। সেজন্য নিড়ানী দিয়ে আগাছা তুলে দিলে মালচিং এর কাজও সে সাথে হয়ে যায়। শুকনো মৌসুমে প্রয়োজন মত সেচ এবং বর্ষাকালে অতিরিক্ত পানি সুনিষ্কাশনের জন্য ড্রেন করে দেয়া উচিত। গাছের গোড়া থেকে শুকনো বা মরা পাতা সরিয়ে ফেলা উচিত। শীতকালে গাছের উপরের অংশ সম্পূর্ণ ভাবে কেটে দেয়া ভাল।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থা

কাণ্ড পচা রোগ: এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ। এ ছত্রাকের সংক্রমণ প্রথমে গাছের মূলে শুরু হয় এবং পরে গোড়ায় ক্ষতি করে। আক্রান্ত গাছের পাতা প্রথমে হলুদ হয়ে নুয়ে পড়ে এবং পরে শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার: এ রোগ দমনে অটোস্টিন (০.২%) ১০ দিন পর পর ৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

এফিড বা জাব পোকা : এ পোকা রজনীগন্ধা গাছের কচি পাতা, ফুল-কুড়ি ও ফুলের রস চুষে খায়। এ পোকার আক্রমণ বেশি হলে গাছ খাটো হয়ে যায়।

প্রতিকার: জাবপোকা চোখে পড়লে মেরে ফেলতে হবে। ক্ষেতে বন্ধু পোকা যেমন লেডি বার্ড বিটলের সংখ্যা বাড়াতে হবে। জাবপোকার আক্রমণ বেশি হলে ফাইফানন ৫৭ ইসি অথবা রগর ৪০ ইসি (১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে) অথবা এডমায়ার-২০ এস এল ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর নিয়মিত গাছে স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

মিলিবাগ বা ছাতরা পোকা : রজনীগন্ধা গাছে ছাতরা পোকার আক্রমণ দেখা যায়। সাদা রঙের মোমের মত নরম দেহের ছাতরা পোকারা গাছ থেকে রস চুষে খায়। ফলে কুঁড়ি ফোটে না এবং ফুল শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার: আক্রমণ কম হলে টুথ ব্রাশ দিয়ে পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। বাগান বা টব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে নিম তেল ৫ মিলি + ৫ মিলি ট্রিক্স প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফুল সংগ্রহ: রজনীগন্ধার একই ক্ষেত থেকে পরপর ২ বছর ফুল উৎপাদন করা যায়। রজনীগন্ধা ফুল লম্বা ডাটার মাথায় মঞ্জুরী আকারে হয়। মঞ্জুরীর নিচের দুটি কুড়ি যখন দুধের মত সাদা রং ধারণ করে এবং ২-১ দিনের মধ্যে ফুটে যাবে এমনটি বোঝা যায় তখন ধারালো ছুরি দিয়ে রজনীগন্ধার ষ্টিক কেটে এনে বালতি ভর্তি ঠাণ্ডা পানিতে ঘণ্টা খানেক রেখে প্রয়োজনমতো ব্যবহার করা যেতে পারে।

ফলন: হেক্টরপ্রতি প্রায় ৪,৫০,০০০ - ৫,০০,০০০ টি ফুলের স্টিক পাওয়া যায়।

জারবেরা

বারি জারবেরা-১

বারি জারবেরা-১

জারবেরা দ্রুত বর্ধনশীল বহুবর্ষজীবী হার্ব জাতীয় উদ্ভিদ। গাছ রোমাবৃত (Hairy) এবং ২৫-৩০ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। জারবেরা কাণ্ডহীন, পাতা গাঢ় সবুজ বর্ণের এবং পাতার কিনারা খাঁজযুক্ত। ফুলের রং গাঢ় লাল, কেন্দ্র হালকা সবুজাভ এবং ৯.৫-১০ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জারবেরা সারা বছর চাষ করা যায়, তবে অক্টোবর-নভেম্বর মাস চারা লাগানোর সর্বোত্তম সময়। চারা লাগানোর পর থেকে ৯০-১০০ দিনের মধ্যে ফুল আসে। প্রতি ঝাড়ে এক বছরে ২০-২৫টির মত ফুল ফোঁটে এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ৯-৯.৫ লক্ষ ফুলের স্টিক। ফুলের সজীবতা থাকে ৮-৯ দিন।

বারি জারবেরা-২

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। পাতার রং হালকা সবুজাভ এবং গভীর খাঁজযুক্ত। গাছ কাণ্ডহীন, রোমাবৃত এবং ৩০-৩৫ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। ফুলের রং সাদা এবং ৯-৯.৫ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। প্রতিটি পুষ্পদণ্ডের ওজন প্রায় ১৪-১৫ গ্রাম। বাংলাদেশের সব অঞ্চলে এ জাতটি চাষ করা যায়।

বারি জারবেরা-২

নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সারা বছর চারা লাগানো যেতে পারে। তবে শীত মৌসুম অর্থাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাস চারা লাগানোর সর্বোত্তম সময়। চারা লাগানোর পর থেকে ৮০-৯০ দিনের মধ্যে ফুল আসে। প্রতি ঝাড়ে এক বছরে ২২-২৫টির মত ফুল জন্মায় এবং হেক্টরপ্রতি ফলন ৯.৫-১০ লক্ষ ফুলের স্টিক।

উৎপাদন প্রযুক্তি

উপযুক্ত মাটি: সুনিষ্কাশিত, উর্বর দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি জারবেরা চাষের জন্য উত্তম। মাটির pH মান ৫.৫ থেকে ৭.০ এর মধ্যে থাকা উচিত।

বীজের মাধ্যমে: বীজের মাধ্যমে জারবেরার বংশবৃদ্ধি করা যায়। এ পদ্ধতিতে উৎপাদিত গাছে মাতৃগাছের সকল গুণাবলি বজায় থাকে না, তবে পদ্ধতিটি সহজ।

ডিভিশন: মাতৃগাছের ক্লাম্প বিভক্ত করে বংশবৃদ্ধি করা যায়। এজন্য মাঠের সুপ্রতিষ্ঠিত ও পরিপূর্ণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গাছগুলিকে ছোট ছোট ভাগে ধারালো ছুরি দিয়ে ভাগ করা হয়। উক্ত সাকার গুলির পাতা ও শিকড় হালকা প্রুনিং করে পরবর্তীতে নতুন বেডে লাগানো হয়।

মাইক্রোপ্রোপাগেশন: বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের ক্ষেত্রে উপরের পদ্ধতি দুটি খুব উপযোগী নয়। অল্প সময়ে প্রচুর সংখ্যায় রোগমুক্ত চারা পাওয়ার জন্য টিসুকালচার পদ্ধতিটি উত্তম। এ জন্য প্রথমে সঠিক জাত নির্বাচন করতে হবে। পরে ঐ গাছের কাণ্ডের বর্ধিত অগ্রাংশ (growing shoot tips), ফুল কুড়ি (Flower bud), পাতা (Leaf) ইত্যাদিকে এক্সপ্লান্ট (Explants) হিসেবে নিয়ে বার বার সাব-কালচার (Sub-culture) করে অসংখ্য চারা উৎপাদন করা সম্ভব।

চাষাবাদ

জমি তৈরি : জমিতে পরিমাণমতো জৈব সার দিতে হবে। তারপর ৪০-৪৫ সেমি গভীর করে আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি ভাবে পরপর কয়েকটি চাষ দিয়ে জমিটি ঝুরঝুরা (fine tilth) করে তৈরি করতে হবে।

বেড তৈরি: জারবেরার জন্য বেডের উচ্চতা ২০ সেমি এবং প্রশস্ততা ১.০-১.২ মি হলে ভাল হয়। জমিতে যেন পানি জমে না থাকে সেজন্য দুই বেডের মধ্যবর্তী ৫০ সেমি পানি নিষ্কাশন নালা থাকতে হবে। সাধারণত একবার লাগিয়ে পর্যায়ক্রমে ২ বৎসর ফুল আহরণ করা হয় বলে জমি ও বেড তৈরির সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

চারা লাগানো: বেড তৈরি হলে জাত ও এর বৃদ্ধির ধরন বুঝে সাকারগুলি ৫০ × ৪০ সেমি দূরে দূরে লাগাতে হয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৪০ সেমি। চারাগুলি এমনভাবে মাটিতে স্থাপন করতে হবে যেন চারার ক্রাউন (Crown or Central growing point) মাটির (Surface level) উপরে থাকে। ক্রাউন মাটির নিচে গেলে গোড়া পচা (Foot rot) রোগ সংক্রমণের সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়।

লাগানোর সময় : নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সারা বছর চারা লাগানো যেতে পারে তবে শীত মৌসুম অর্থ্যাৎ অক্টোবর-নভেম্বর মাস চারা লাগানোর সর্বোত্তম সময়।

পানি দেয়া: জারবেরার শিকড় গভীরে প্রবেশ করে বিধায় বার বার হালকা স্প্রিংকলার (Sprinkler) সেচের পরিবর্তে প্লাবন সেচ (Flood Irrigation) দেয়া উত্তম। পানি সেচের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয়। কারণ জারবেরা ক্ষেতে জলাবদ্ধতা মাটিবাহিত রোগ সংক্রমণ ত্বরান্বিত করে। আবার মাটিতে পানির অভাব হলে গাছ ঢলে (Wilting) পড়ে, সেক্ষেত্রে ফুলের পুষ্পদণ্ড ছোট হয়ে যায়।

সার প্রয়োগ: বেড তৈরি হলে চারা লাগানোর কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে বেডের প্রতি ১০ বর্গ মিটারের জন্য ৬০ কেজি পচা জৈব সার, ১.৫ কেজি ইউরিয়া অথবা ১ কেজি এমোনিয়াম সালফেট, ২.৫ কেজি ট্রিপল সুপার ফসফেট, ৫০০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ ও ৫০০ গ্রাম ম্যাগনেশিয়াম সালফেট প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। জারবেরার বেড তৈরির সময় সারের যে বেসাল ডোজ দেয়া হয় তার পাশাপাশি নিম্নলিখিত মাত্রায় পুষ্টি সরবরাহ করতে হবে। চারা রোপণের প্রথম ২-৩ সপ্তাহ গাছে কোন সার প্রয়োগ করা যাবে না। জারবেরা বেডের প্রতি ১০ বর্গ মিটার জমিতে গাছের চারপাশে ২৫০ গ্রাম ক্যালসিয়াম এমোনিয়াম নাইট্রেট এবং ১৫০ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ প্রতি ১৫ দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। ১২ সপ্তাহ পর থেকে গাছে ফুল আসা শুরু হলে এনপিকে (NPK) (১৫:২০:৩০) প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম মিশিয়ে ২-৪ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিদিন জমিতে প্রয়োগ করলে ভাল মানের বেশি ফুল পাওয়া যায়।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থা

গোড়া পচা: এটি একটি মাটিবাহিত রোগ। এ রোগের ফলে গাছের গোড়ার অংশ কাল রং ধারণ করে পচে যায় এবং আস্তে আস্তে ঢলে পড়ে। রিডোমিল গোল্ড অথবা ডায়থেন এম-৪৫ (০.২%) নামক ছত্রাক নাশক ব্যবহারে ভাল ফল পাওয়া যায় অথবা টপসিন (০.২%) ব্যবহার করেও এ রোগ দমন করা যায়।

ক্রাউন রট: এটি মাটি বাহিত ছত্রাক জনিত রোগ। এ রোগ হলে গাছের গোড়ার অংশ কালো বর্ণ ধারণ করে, পচে যায় এবং আস্তে আস্তে ঢলে পড়ে। মাটিতে জলাবদ্ধতা থাকলেও চারা রোপণের প্রারম্ভিক অবস্থায় এ রোগ বেশি দেখা যায়।

বেডে যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত সেচের পানি না জমে এবং গাছের মুকুট বা পাতা যেন মাটির সংস্পর্শে না আসে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাছাড়া টপসিন-এম (০.২০%) অথবা ব্লিটক্স (০.১%) মাটিতে প্রয়োগ করে (প্রতি গাছে ৫০-১০০ মিলি) এ রোগ দমন করা যায়।

পাউডারী মিলডিউ: এটি একটি ছত্রাক জনিত রোগ। পাতা ও ফুলে সাদা পাউডারের আস্তরণ পড়ে। মারাত্মক আক্রমণে পাতা কুঁকড়ে যায়। এ রোগ সাধারণত মাঝারী তাপমাত্রা, দীর্ঘ সময় উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় বেশি দেখা যায়। এ রোগের আক্রমণে গাছ দ্রুত আক্রান্ত হয় এবং শুকিয়ে মারা যায়। বাতাসে এ রোগের জীবাণু ছড়ায়।

এ রোগ দমনে আক্রমণের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে থিওভিট (০.২%) বা টিল্ট (০.০৫%) বা সালফোলাক (০.২%) ১০ দিন পর পর দুবার স্প্রে করা প্রয়োজন।

পোকা মাকড় ও দমন ব্যবস্থাপনা

সাদা মাছি: সাদা মাছি গাছের বিভিন্ন অংশের রস চুষে মারাত্মক ক্ষতি করে। এ মাছির মাধ্যমে ভাইরাস সংক্রমণও হয়। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পর থেকে এসাটাফ ৭৫ (এসপি) ও কুমুলাস ডি এফ একসংগে মিশিয়ে ২ গ্রাম করে প্রতি লিটার পানিতে দিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করা যেতে পারে।

মাকড় বা মাইট: শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়ায় জারবেরা গাছে মাইটের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। এ পোকা পাতার নিচের রস চুষে খায় এতে পাতার নিচে বাদামী দাগ পড়ে এবং আস্তে আস্তে পাতা শুকিয়ে যায়। ফুলের পাঁপড়িতেও কিছু জাল বোনার মত আবরণ দেখা যায়। ফলে ফুল বিকৃতি হয় এবং বাজার মূল্য কমে যায়। নিম তেল ৫ মিলি + ৫ মিলি ট্রিক্স ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আক্রমণ বেশি হলে ওমাইট বা ভার্টিমেক ১.৫ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১৫ দিন অন্তর পাতার উল্টো পৃষ্ঠে ২-৩ বার স্প্রে করলে কার্যকরী ফল পাওয়া যায়।

ফুল তোলা: পূর্ণ বিকশিত জারবেরা ফুলের বাহিরের দু'সারি ডিস্ক ফোরেট পুষ্পদণ্ডের সাথে সমকৌনিক অবস্থানে আসলে ফুল তোলা হয়। কর্তনের সময় পুষ্পদণ্ড যথাসম্ভব লম্বা রেখে ফুল সংগ্রহ করা হয়। ধারালো চাকু দ্বারা তেরছা ভাবে কেটে খুব সকালে বা বিকালে ফুল তোলা উত্তম। ফুল কাটার পর পুষ্পদণ্ড এক ইঞ্চি পানিতে ডুবিয়ে রাখতে হবে। পানির সংগে অল্প চিনি এবং কয়েক ফোঁটা লেবুর রস মিশিয়ে দিলে ফুল বেশি দিন সতেজ থাকে।

এ্যানথুরিয়াম

বারি এ্যানথুরিয়াম-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাঁছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারি এ্যানথুরিয়াম-১ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। এ্যানথুরিয়াম এ্যারেসী (Araceae) পরিবারভুক্ত বহুবর্ষজীবী কাণ্ডহীন হারবেসিয়াস জাতীয় বাহারী পাতা ও ফুলের গাছ। এ গাছের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হল স্প্যাথ (Spathe)। স্প্যাথ আসলে পাতার পরিবর্তিত রূপ। গাঢ় লাল রঙের

স্প্যাথ ও হলুদাভ রঙের স্প্যাডিক্স এ জাতটির বৈশিষ্ট্য। পাতা গাঢ় সবুজ, হৃদয়াকৃতির ভেলভেটী পাতায় শিরাগুলি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। ছোট সাকার/চারা লাগালে ফুল আসতে ৯-১০ মাস সময় লাগে। ফুলের সজীবতা ২০ দিন পর্যন্ত থাকে। বছরে একটি ঝাড় থেকে ৫-৬টি ফুল পাওয়া যায় এবং হেক্টরপ্রতি পুষ্পদণ্ডের সংখ্যা ৩ লাখের মতো।

বারি এ্যানথুরিয়াম-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়াঃ এ্যানথুরিয়াম উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া উপযোগী। সাধারণত সব জাতের এ্যানথুরিয়াম ছায়াযুক্ত স্থানে ভাল জন্মায়। অর্থাৎ উজ্জ্বল সূর্যালোক থেকে আচ্ছাদনের মাধ্যমে (Shade net ব্যবহার করে) ৪০-৫০% কর্তন করে ছায়া প্রদান করলে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয় তথা ভাল মানের ফুল পাওয়া যায়। উল্লেখ্য প্রখর সূর্যালোকে পাতা হলুদাভ হয়ে যায়। সাধারণত যে সমস্ত এলাকায় রাত্রিকালীন তাপমাত্রা ১৮-২০° সে. এবং দিবাভাগের তাপমাত্রা ২৭-৩০° সে. বিরাজমান থাকে সে সমস্ত এলাকা এ্যানথুরিয়াম চাষের জন্য উত্তম। নিম্ন তাপমাত্রা ফুল উৎপাদন নিরুৎসাহিত করে।

বৃদ্ধি মাধ্যমঃ সাকার লাগানোর জন্য নারিকেলের ছোবড়া, নারিকেল ছোবড়ার গুঁড়া, কাঠের গুঁড়া, ধানের তুষ স্তরে স্তরে বিছিয়ে এ্যানথুরিয়াম চাষের উপযোগী মাধ্যম তৈরি করা হয়। পটে জন্মানোর জন্য এককভাবে নারিকেলের ছোবড়া বা ছোবড়ার গুঁড়া ব্যবহার করা যেতে পারে।

বংশ বিস্তারঃ সাধারণত মাতৃগাছ থেকে সাকার পৃথক করে এ্যানথুরিয়ামের বংশবৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে এ প্রক্রিয়াটি খুবই শ্লথ গতির। তাই দ্রুত গতিতে বংশবৃদ্ধির জন্য টিস্যুকালচার প্রক্রিয়া ব্যবহার করা উত্তম। যে সমস্ত এ্যানথুরিয়াম জাত সাধারণত সাকার উৎপাদনে দুর্বল তাদের ক্ষেত্রে টপ কাটিং করলে সাকার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদিত স্বাস্থ্যবান এবং প্রচুর শিকড় সমৃদ্ধ গাছের গোড়া থেকে সামান্য উপরে কেটে দিলেই ২/৩ মাসের মধ্যে পাশ থেকে ২/৩ টি করে সাকার বের হবে।

লাগানোর সময়ঃ সারা বছর সাকার বা টিস্যু কালচারের চারা লাগানো যায়। তবে জুলাই-আগস্ট মাস সর্বোত্তম।

চারা রোপণ ও দূরত্বঃ ৮০ সেমি প্রশস্ত বেডে ৪০ × ৩০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করলে প্রতি হেক্টর জমিতে প্রায় ৬০,০০০ চারা রোপণ করা যায়।

সার প্রয়োগঃ চারা রোপণের ২-৩ মাস পর হতে তরল সার ১০-১৫ দিন অন্তর অন্তর প্রয়োগ করলে ভালমানের ফুল পাওয়া যায়। এছাড়া চারা প্রতি ১০ গ্রাম করে ইউরিয়া, ট্রিপল সুপার ফসফেট ও মিউরেট অব পটাশ এর প্রতিটি ২০-২৫ দিন পর পর ফুল আসা পর্যন্ত প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পরিচর্যাঃ চারা রোপণের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে ফুল আসতে থাকে। প্রথম অবস্থায় ছোট ফুল কেটে দিতে হবে তা হলে পরবর্তীতে ফুল বড় হবে। মাঝে মাঝে গাছের নিচের পাতা কেটে ফেলতে হবে। তা হলে ফুলের সংখ্যা বেশি হবে। বাণিজ্যিক চাষাবাদে সাকার রোপণের পরে বেডের ২-২.৫ মিটার উপর দিয়ে ৪০-৫০ শতাংশ সূর্যালোক কর্তন করে এমন সেড নেট অবশ্যই স্থাপন করা দরকার।

রোগবালাই

পাতায় দাগঃ যে সমস্ত রোগ দেখা যায়, তার মধ্যে পাতায় দাগ উল্লেখযোগ্য। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হয়। আক্রান্ত গাছের পাতা ও স্প্যাডিক্সে ছোট ছোট দাগ পরিলক্ষিত হয় এবং পরে লম্বাকৃতি ধারণ করে এবং পচনের সৃষ্টি হয়। ছত্রাকনাশক অটোস্টিন বা নোইন ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-৮ দিন পর পর স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ব্যাকটেরিয়াল ব্লাইট: *Xanthomonas campestris* pv. *diffenbachia* নামক ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে এ্যানথুরিয়াম ব্লাইট রোগ হয়। এ রোগের জীবাণু পাতার স্টোমাটা (Stomata) কিংবা ক্ষতের মাধ্যমে উদ্ভিদের ভিতরে প্রবেশ করে। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এ রোগের প্রকোপ বেশি হয়। রোগের লক্ষণ হিসেবে পাতার নিচের দিকে মার্জিনের আশে পাশে খুবই হালকা হলুদাভ রং পরিবৃত্ত অবস্থায় অসম (Irregular) পানি ভেজা (Water soaked) দাগ পরিলক্ষিত হয়। আক্রমণ তীব্রতর হলে আক্রান্ত স্থানের টিস্যু মারা যায় ও বাদামী রং ধারণ করে এবং বাদামী দাগের চারিদিকে হলুদ বর্ণের রিং এর মতো তৈরি হয়। আক্রান্ত পাতা কেটে বাদ না দিলে অন্যান্য অংশও আক্রান্ত হতে পারে। কাণ্ড আক্রান্ত হলে উক্ত স্থান কালো হয়ে যায় এবং কাণ্ডের মাধ্যমে পানি ও খাদ্যবস্তু (Nutrients) সরবরাহ বাঁধাগ্রস্থ হয়। ফলশ্রুতিতে পাতা আগাম হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং ফ্যাকাশে রঙের ফুল উৎপাদিত হয়।

পোকামাকড়: মাঝে মধ্যে মাইট এবং মিলিবাগের আক্রমণ দেখা যায়। মাইট দমনের জন্য সালফোটক্স বা ওমাইট বা ভার্টিমেক ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে এবং মিলিবাগের জন্য সুমিথিয়ন ২ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-৮ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

ফুল সংগ্রহ: স্প্যাথের উপর দণ্ডায়মান স্প্যাডিক্সের গোড়া থেকে সত্যিকার ফুল ধারণ শুরু হয় এবং পর্যায়ক্রমে উপরে যেতে থাকে। পরিপক্কতা লাভের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম চলে। ফুলের পরিপক্কতা হলে উপরিভাগ সাদা রং ধারণ করে। সুতরাং স্প্যাডিক্সের প্রায় অর্ধেক অংশ সাদা রং ধারণ করলেই এ্যানথুরিয়াম ফুল এর পরিপক্কতা হয়েছে বলে মনে করা হয় এবং ফুল সংগ্রহ করার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়। ধারালো চাকুর সাহায্যে এ্যানথুরিয়াম ফুল কেটে আকার ও আকৃতি অনুযায়ী এবং জাত ভেদে বাছাই করে নিতে হয়।

ফুলের আয়ুষ্কাল: কক্ষ তাপমাত্রায় বেশি দিন সতেজ-সজীব থাকার ব্যাপারে এ্যানথুরিয়াম ফুল বিখ্যাত। ফুলের স্প্যাথের পুরুত্ব এবং পুষ্প দণ্ডের দৃঢ়তা এ্যানথুরিয়াম ফুল বেশি দিন টিকে থাকার প্রধান কারণ।

ডালিয়া

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফুল বিভাগ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, নার্সারি ও পার্শ্ববর্তী দেশসমূহ হতে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৯ সালে 'বারি ডালিয়া-১' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদ উপযোগী।

বারি ডালিয়া-১

এটি একটি কন্দজাতীয় ফুল। পট প্লান্ট হিসেবে ব্যবহার বেশি তবে কাট-ফ্লাওয়ার হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। গাঢ় লাল এবং সাদা মিশ্রণের ফুল এ জাতটির বৈশিষ্ট্য। গাছ প্রতি ফুলের সংখ্যা প্রায় ১৪-১৫ টি। পটে ফুলের স্থায়ীত্ব ৮-৯ দিন থাকে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: ডালিয়া চাষের জন্য উর্বর ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত জমি প্রয়োজন। অবশ্যই প্রচুর সূর্যালোক থাকতে হবে। বাংলাদেশে শীতকালই এ ফুল চাষের উত্তম সময়। মাটির pH মান ৬.০-৬.৫ ও আবহাওয়া ঠাণ্ডা হলে ভাল।

চারা তৈরি: জুলাই- আগস্ট মাসে কন্দমূল বা কাটিং থেকে চারা তৈরির উপযুক্ত সময়।

চারা রোপণ: কন্দমূল বা কাটিং থেকে উৎপন্ন চারা ২০-২৫ দিন পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে রোপণের উপযোগী হয়

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

শাখা ভাঙ্গা: কাণ্ডের আগার অংশ কেটে ফেলাকে শাখা ভাঙ্গা বা পিনচিং বলে। সাধারণত ৩-৬টি শাখা রেখে দিলে গাছটি ঝোপালো হয় এবং অধিক ফুল পাওয়া যায়।

কুঁড়ি অপসারণ: অনাকাঙ্ক্ষিত অপরিপক্ক ফুলের কুঁড়ি অপসারণ কার্যক্রমকে কুঁড়ি অপসারণ বলা হয়। মুকুট কুঁড়িগুলিকে রেখে অবশিষ্ট কুঁড়িগুলি ছিড়ে দিলে বড় আকারের ফুল পাওয়া যায়।

ঠেকা দেয়া: ডালিয়ার ফুল শাখার তুলনায় বড় ও ভারী হয় বলে কাঠি দিয়ে ঠেকা দিতে হয়।

সার প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা

মাঠে বা জমিতে: জমি তৈরির পর হেক্টরপ্রতি ১০ টন পচা গোবর সার, ২৬০ কেজি টিএসপি এবং ১০০ কেজি এমওপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা/কন্দ রোপণের ১ মাস পর গাছের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য ১৬০ কেজি ইউরিয়া এবং ১০০ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করা উচিত। ফুলের কুড়ি আসার পর পরই একই নিয়মে ১৬০ কেজি ইউরিয়া সার আবার উপরি প্রয়োগ করা উচিত।

পটে বা টবে: পটে জন্মানোর জন্য ২ ভাগ মাটি, ২ ভাগ গোবর সার, ১ ভাগ পাতা পচা সার ও ১ ভাগ হাড়ের গুঁড়ার সাথে ৫ গ্রাম টিএসপি, ৫ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ এর মিশ্রণ ব্যবহার করা উত্তম। ১০ গ্রাম ইউরিয়া সারের অর্ধেক কন্দ/চারা রোপণের ২৫-৩০ দিন পর গাছের দৈহিক বৃদ্ধির সময় একবার এবং বাকি অর্ধেক ফুলের কুঁড়ি আসার সময় উপরি প্রয়োগ করা উচিত।

অন্যান্য পরিচর্যা

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থা

পাতায় দাগ পড়া

এ রোগের আক্রমণে প্রথমে নিচের পাতায় হলদে দাগ পড়ে এবং আক্রমণের মাত্রার উপর নির্ভর করে বাদামী থেকে কালো দাগে পরিণত হয়। এ রোগ দমনে অটোস্টিন বা বেনলেট (০.১%) স্প্রে করতে হবে।

পাতায় দাগ পড়া

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থা

জাবপোকা

ডালিয়ার সবচেয়ে বড় শত্রু জাবপোকা। এ পোকা গাছের পাতা, ডগা এবং ফুল থেকে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি কর। আক্রান্ত নতুন কুঁড়ি ও পাতা কুঁকড়ে যায়। এ পোকা দমনে প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্ত পাতা বা ফুল ছিঁড়ে ফেলে পোকাসহ ধ্বংস করা উচিত। হলুদ রঙের আঁঠালো ফাঁদ ব্যবহার করেও ভাল ফল পাওয়া যায়। সাবান গুঁড়া ৫ গ্রাম/লিটার হারে পনিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যেতে পারে। আক্রমণ বেশি হলে ডাইমেথয়েট জাতীয় কীটনাশক (পারফেকথিয়ন/সানগর/ টাফগর ৪০ ইসি) ২.০ মিলি/লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

জাবপোকা

থ্রিপস

এ পোকা খুব ছোট ও বাদামী বা কালো রঙের। এরা সাধারণত গাছের বর্ধনশীল অংগ যেমন কঁচি পাতা ও ফুলের কুঁড়ি থেকে রস শোষণ করে যার ফলে কুঁড়ি ফোঁটে না বা অংশিকভাবে ফোঁটে এবং পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। এরা পাতার এপিডার্মাল স্তর থেকেও রস চুষে খায়। এ পোকা দমনে জমিতে সাদা রঙের আঁঠালো ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া নিম তেল ৫ মিলি + ৫ মিলি ট্রিক্স প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। আক্রমণ বেশি হলে ফিপ্রনিল গ্রুপের কীটনাশক (অ্যারোনিল ৫০ এসসি/ফোকাস ৫০ এসসি) ১.০ মিলি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন অন্তর ২-৩ বা স্প্রে করতে হবে।

ফুল সংগ্রহ: সাধারণত চারা লাগানোর ৭০-৮০ দিন পর ফুল সংগ্রহ করা যায়। তবে পূর্ণ প্রস্ফুটিত অবস্থায় ফুল সংগ্রহ করা উচিত।

ফলন: গাছ প্রতি গড়ে বছরে ১৪-১৫ টি ফুল পাওয়া যায়।

লিলি

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফুল বিভাগ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, নার্সারি হতে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৯ সালে 'বারি লিলি-১' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদ উপযোগী।

বারি লিলি-১

এটি একটি কন্দজাতীয় গ্রীষ্মকালীন ফুল। ফুলের রং গাঢ় লাল এবং প্রায় ১২.০-১২.৫ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট। প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ৫-৬ টি। পটে এ ফুলের স্থায়ীত্ব ৫-৬ দিন থাকে।

বারি লিলি-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

পট নির্বাচন: ২৫-৩০ সেমি মাটির পটে গাছের দৈহিক বৃদ্ধি ও ফুল ভাল মানের হয়।

চারা রোপণ: বাল্ব সাধারণত মে-জুন মাসে লাগাতে হয়।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সার প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা:

বেডে: বেড তৈরির পর হেক্টরপ্রতি ৫ টন পচা গোবর সার, ১৫০ কেজি টিএসপি ও ১২৫ কেজি এমওপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাল্ব রোপণের ৩ সপ্তাহ পর যখন নতুন গাছের বৃদ্ধি শুরু হয় তখন হেক্টরপ্রতি ১৫০ কেজি ইউরিয়া সার এর অর্ধেক ৭৫ কেজি প্রথম উপরিপ্রয়োগ এবং বাকি অর্ধেক ৭৫ কেজি পুষ্পদণ্ড বের হওয়ার সময় উপরিপ্রয়োগ করা উচিত।

পটে: পটে জন্মানোর জন্য ২ ভাগ মাটি, ২ ভাগ গোবর সার ও ১ ভাগ পাতাপচা সারের সঙ্গে ৩ গ্রাম টিএসপি, ৪ গ্রাম মিউরেট অব পটাশ এর মিশ্রণ ব্যবহার করা উত্তম। বাল্ব রোপণের ৪০-৫০ দিন পর হতে ২ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রতি ১ মাস পর পর ফুল আসা পর্যন্ত উপরি প্রয়োগ করা উচিত।

অন্যান্য পরিচর্যা

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থা

পাতায় দাগ পড়া

এ রোগের আক্রমণে প্রথমে নিচের পাতায় হলদে দাগ পড়ে এবং আক্রমণের মাত্রার উপর নির্ভর করে বাদামী থেকে কালো দাগে পরিণত হয়। এ রোগ দমনে অটোস্টিন বা বেনলেট (০.১%) স্প্রে করতে হবে।

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থা

এ ফুলে পোকামাকড় দ্বারা তেমন কোন আক্রমণ হয় না বললেই চলে।

ফুল সংগ্রহ: সাধারণত চারা লাগানোর ৮০-৯০ দিন পর ফুল সংগ্রহ করা যায়।

ফলন: গাছ প্রতি গড়ে বছরে ৫-৬ টি ফুল পাওয়া যায়।

এলপিনিয়া

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফুল বিভাগ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, নার্সারি হতে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৯ সালে 'বারি এলপিনিয়া-১' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদ উপযোগী।

বারি এলপিনিয়া

বারি এলপিনিয়া-১

এটি একটি কন্দজাতীয় গ্রীষ্মকালীন ফুল। কাট-ফ্লাওয়ার হিসেবে এ ফুলের ব্যবহার বেশি। গাঢ় লাল রঙের ১৭.০-১৮.০ সেমি লম্বা মঞ্জুরী বিশিষ্ট ফুল। প্রতি গাছে ফুলের সংখ্যা প্রায় ১০-১২ টি। ফুলের সজীবতা থাকে ১২-১৪ দিন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

উপযোগী এলাকা: সারা দেশে চাষ উপযোগী, তবে গাজীপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী এলাকায় ভাল জন্মে।

স্থান নির্বাচন: আধো আলোছায়া এরূপ স্থান ফুল চাষের জন্য নির্বাচন করা উচিত। প্রয়োজনে ৩০-৪০% সূর্যালোক কাট করে এমন সেডনেট ব্যবহার করা ভাল। এছাড়া উপযুক্ত বায়ু চলাচল এবং পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

রোপণের সময়: সারা বছর রাইজোম রোপণ করা যায় তবে জুন-জুলাই মাস সর্বোত্তম।

সার প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা

বেডে: বেড তৈরির পর হেক্টরপ্রতি ৫ টন পচা গোবর সার, ৮০ কেজি টিএসপি ও ১০০ কেজি এমওপি সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। রাইজোম রোপণের ১ মাস পর যখন নতুন গাছের বৃদ্ধি শুরু হয় তখন হেক্টরপ্রতি ১০০ কেজি ইউরিয়া সার এর অর্ধেকটা প্রথম উপরিপ্রয়োগ এবং বাকি অর্ধেক স্পাইক বের হওয়ার সময় উপরিপ্রয়োগ করা উচিত।

অন্যান্য পরিচর্যা

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থা

এ ফুলে রোগবালাই দ্বারা তেমন কোন আক্রমণ হয় না বললেই চলে।

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থা

মিলি বাগ

এলপিনিয়া ফুলে সাদা রঙের মোমের মত নরম দেহের মিলিবাগ ফুল থেকে রস চুষে খায়। ফলে ফুল শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার: আক্রমণ কম হলে টুথ ব্রাশ দিয়ে পোকা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। বাগান বা টব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে নিম তেল ৫ মিলি + ৫ মিলি ট্রিক্সপ্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ফুল সংগ্রহের সময়: রাইজোম লাগানোর প্রায় ৮-১০ মাস পর ফুল আসে। পুষ্পমঞ্জুরী পূর্ণ প্রষ্ফুটিত অবস্থায় সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

ফলন: গাছ প্রতি গড়ে বছরে ৫-৬ টি ফুল পাওয়া যায়।

গাঁদা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্রের ফুল বিভাগ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল, নার্সারি হতে জার্মপ্লাজম সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৯ সালে 'বারি গাঁদা-১' জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি বাংলাদেশের সর্বত্র চাষাবাদ উপযোগী।

বারি গাঁদা-১

বারি গাঁদা-১

আকর্ষণীয় কমলা রঙের ফুল। লুজ ফুল হিসেবে সাধারণত ব্যবহৃত হয়। গাছগুলো ৬০-৯০ সেমি উচ্চতা বিশিষ্ট হয়। হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ৭-৮ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

উপযোগী এলাকা: বাংলাদেশের সর্বত্র এটি জনপ্রিয় হলেও নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়, যেমন- যশোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে গাঁদা ফুলের বাণিজ্যিক চাষাবাদ হচ্ছে।

বংশ বিস্তার: বীজ এবং কাণ্ড কাটিং এর মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। বীজ হতে উৎপাদিত গাছ স্বাস্থ্যবান, লম্বা ও অধিক ফলনশীল হয়। কাটিং এর মাধ্যমে সহজে এবং জাতের গুণাগুণ অক্ষুন্ন রেখে গাঁদার বংশ বিস্তার করা যায়।

গাঁদা ফুল চাষের উপযোগী আবহাওয়া: গাঁদা ফুল চাষের জন্য মৃদু আবহাওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের আবহাওয়ায় সারা বছর গাঁদা ফুলের চাষ করা যায়। আফ্রিকান গাঁদা দীর্ঘ দিবস ও স্বল্প তাপমাত্রায় (১৫-২১ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) উত্তম ফুল দেয়। তাপমাত্রা খুব বেশি হলে গাছের বৃদ্ধি কমে যায়, ফুলের আকার ছোট হয় এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়। আফ্রিকান গাঁদার চেয়ে ফরাসী গাঁদার প্রতিকুল আবহওয়াতে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতা বেশি। আবহাওয়া জনিত কারণে শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে গাঁদা ফুলের ফলন কম হয়।

রোপণের সময়: জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে বীজ তলায় এ বীজ বপন করতে হয়। সাধারণত ৩-৪ পাতা বিশিষ্ট ২৫-৩০ দিনের চারা ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের মধ্যে মাঠে লাগাতে হয়।

সার প্রয়োগ ও ব্যবস্থাপনা: গাঁদার জমি চূড়ান্তভাবে তৈরির সময় হেক্টরপ্রতি ১০ টন পচা গোবর, ১৭৫ কেজি টিএসপি ও ১৫০ কেজি এমওপি সার উত্তমরূপে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর হেক্টরপ্রতি ২০০ কেজি ইউরিয়ার অর্ধেক উপরি প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক ফুল আসার আগে প্রয়োগ করতে হবে।

রোগবালাই ও দমন ব্যবস্থা

পাতার দাগ

পাতার উপর বাদামী-ধূসর রঙের দাগ পড়ে। অতি আক্রমণে পাতা শুকিয়ে যেতে পারে, গাছ দুর্বল হয়। এ রোগ দমনে ৪ গ্রাম ট্রাইকোডারমা/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর স্প্রে করা যেতে পারে। অটোস্টিন বা বেনলেট (০.১%) রোগ দেখামাত্র ১৫ দিন পর পর তিনবার স্প্রে করতে হবে।

ফুল পচা

ফুলের পাঁপড়িতে ধূসর রঙের দাগ হয়। ফুল পচে যায়। পাঁপড়ির ভাঁজে ছত্রাকের অসংখ্য স্পোর দেখা যায় ও পুরো ফুলটি কাল হয়ে পচে যায়। রুভরাল (০.২%) নামক ছত্রাকনাশক ১০ দিন পর পর স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

গ্রে মোল্ড

এ রোগের আক্রমণে ফুলের পাঁপড়ি, পাতা এমনকি কাণ্ডেও বাদামী পানি ভেজা দাগ দেখা যায়। আক্রান্ত গাছে ধূসর থেকে বাদামী পাউডারের মতে আস্তরণ পড়ে। এ রোগ দমনে যথাযথ রোপণ দুরত্ব অনুসরণ করে গাছকে পর্যাপ্ত আলো বাতাস সরবরাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই সাথে ক্যাপটান (০.১%) বা থিরাম ৭৫ (০.৩%) স্প্রে করা যেতে পারে।

পোকামাকড় ও দমন ব্যবস্থা

লাল মাকড়

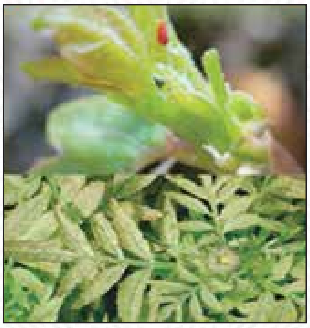

- শুষ্ক মৌসুমে অর্থাৎ নভেম্বর হতে এপ্রিল মাস পর্যন্ত লাল মাকড়ের আক্রমণ বেশি হয়।
- বৃষ্টি শুরু হলে লাল মাকড়ের প্রকোপ কমতে থাকে।
- অতিরিক্ত বৃষ্টির সময় মাকড়ের আক্রমণ খুব কম দেখা যায়।
- লাল মাকড়ের আক্রমণে পাতা বিবর্ণ হয়।
- গাছ মাকড়ের জালে ঢেকে যায় এবং শেষে মারা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- শুকনো মৌসুমে গাছের পাতার নিচের দিকে ৩-৪ দিন পর পর পানি স্প্রে করতে হবে।
- মাকড়ের আক্রমণ বেশি হলে শুকনো মৌসুমে ভার্টিমেক ১.৮ ইসি (১ মিলি/লিটার পানিতে) অথবা মেজিস্টার ১০ ইসি (২ মিলি/লিটার পানিতে) গাছে ৭-১৫ দিন ছিটাতে হবে।

পাতা খেকো লেদা পোকা

- তাপমাত্রা কম থাকলে ছায়ায় বসে এ পোকার কীড়া কাণ্ড, পাতা খেয়ে ফেলে
- আবহাওয়াজনিত কারণে এ পোকার আক্রমণের তারতম্য ঘটে

দমন ব্যবস্থাপনা

- পাতা খেকো লেদা পোকার কীড়া মেরে ফেলতে হবে।
- জমিতে ডাল পুতে পাখি বসার ব্যবস্থা করতে হবে।
- জমিতে পোকার আক্রমণ বেশি হলে স্প্যানোস্যাড ৪৫ এসসি/ট্রেসার (১ মিলি/লিটার) পানিতে পাশিয়ে গাছে ছিটাতে হবে।

মিলি বাগ বা ছাতরা পোকা

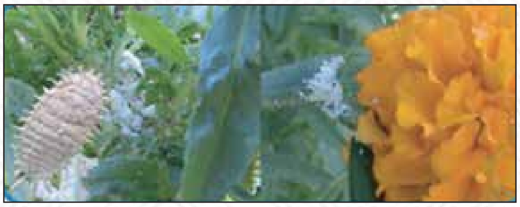

- এ পোকা গাছের রস চুষে খেয়ে গাছ দুর্বল করে ফেলে।
- ছত্রাকের আশ্রয় হিসেবে কাজ করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- এ পোকার আক্রমণ দেখা গেলে এডমায়ার ২০ এস.এল (১.২ মিলি/লিটার পানিতে) অথবা রগর ৪০ এল (১.২ মিলি/লিটার পানিতে) অথবা ম্যালাটাফ ৫৭ ইসি (২ মিলি/লিটার পানিতে) অথবা ফাইফানন ৫৭ ইসি ২ মিলি/লিটার পানিতে) ৭-১৫ দিন পর পর গাছে স্প্রে করতে হবে।

ফুল সংগ্রহের সময়ঃ ফুল আকারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে অল্প বোঁটা রেখে কাঁচি দিয়ে ফুল কাটাই উত্তম, এতে ফুল বেশিক্ষণ তাজা থাকে।

নন-কমোডিটি প্রযুক্তি

গ্লাডিওলাস কর্মের সুপ্তাবস্থা ভাংগা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ বাংলাদেশে গ্লাডিওলাস অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাটফ্লাওয়ার। গ্লাডিওলাস ফুলের কর্ম সাধারণত ৩-৪ মাস সুপ্তাবস্থায় থাকে। এ ফুলের কর্ম জমি থেকে তোলার পর ৪৫ দিন সংরক্ষণ করা হয়। এরপর কর্মগুলি ১০০ পিপিএম BA দ্বারা ৫ মিনিট ভিজিয়ে ১ দিন ছায়ায় রেখে জমিতে লাগালে কর্মের সুপ্তাবস্থা ভেঙ্গে ১০০% চারা গজায় এবং গাছ, করম ও করমেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে গ্লাডিওলাস আগাম চাষ করা যায়। এ ক্ষেত্রে কৃষকের সময় বাঁচে ও বংশবিস্তারক উপাদান কর্ম ও কর্মেল বৃদ্ধির ফলে কৃষক লাভবান হয়।

টিস্যুকালচার পদ্ধতির মাধ্যমে ডেনড্রোবিয়াম অর্কিডের বংশবৃদ্ধি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ অধিক পরিমাণে চারা উৎপাদনের জন্য টিস্যুকালচার পদ্ধতি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ পদ্ধতিতে মাতৃ গাছের সদৃশ, জীবাণুমুক্ত ও একই বয়সের সমআকৃতির চারা অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যায়। ইনভিট্রো কালচারের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক Shoot জন্মানোর জন্য ডেনড্রোবিয়ামের কচি কাণ্ড এক্সপ্লান্ট হিসেবে নিয়ে গঝ মিডিয়ামের সাথে ১.০ মিগ্রা./লিটার TDZ এর মিশ্রণে ভাল ফল দেয়; অপরপক্ষে ১/২ গ্রাম মিডিয়ামের সাথে ১.০ মিগ্রা./লিটার IBA উল্লেখিত Shoot গুলিতে শিকড় গজানো এবং বৃদ্ধির জন্য উপযোগী। মাটির পটে কোকোডাস্ট

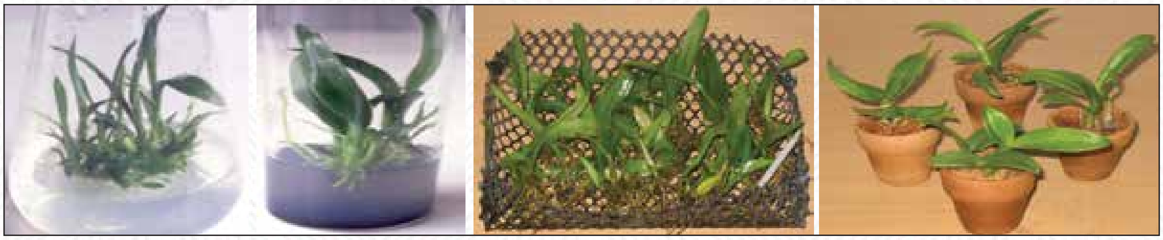

Multiple shoots | Rooting | Acclimatization | Plantlet establishment

মিডিয়াতে অর্কিডের অণুজীব বা চারা ভালভাবে জন্মায়। এতে কৃষক কাঙ্ক্ষিত জাতের অধিকসংখ্যক রোগমুক্ত অর্কিড চারা পাওয়ার নিশ্চয়তা পাবে।

টিস্যুকালচার পদ্ধতির মাধ্যমে জারবেরার বংশবৃদ্ধি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: অল্প সময়ে অধিক সংখ্যক রোগমুক্ত জারবেরার চারা তৈরির জন্য টিস্যুকালচার একটি মানসম্মত পদ্ধতি। টিস্যুকালচার পদ্ধতিতে গাছের যে কোন অংশ যেমন কাণ্ড, শীর্ষমুকুল, পাতা বা অফসেট থেকে কাঙ্ক্ষিত গাছ তৈরি করা যায়। জারবেরা ফুলের কচি বাড (Bud) বা ক্যাপিচুলাম MS মিডিয়ামের সাথে ২.০ মিগ্রা. BAP এর মিশ্রণে অধিক সংখ্যক কাণ্ড বা স্যুট তৈরি করে। অন্য দিকে ১/২ MS মিডিয়ামের সাথে ০.৫ মিগ্রা./লিটার IAA এর মিশ্রণ উল্লেখিত Shoot গুলিতে অধিক পরিমাণে শিকড় গজানো এবং বৃদ্ধির জন্য উপযোগী। নিয়ন্ত্রিত ইনভিট্রো পরিবেশে সারা বছর জারবেরার চারা তৈরি করা যায়। তবে কোকোডাস্ট মিডিয়াতে জারবেরা ফুলের অণুজীব বা চারা নভেম্বর মাসে ভাল জন্মে। এতে কৃষক আগাম ফুল পায়। ফলে নববর্ষ, একুশে ফেব্রুয়ারি, ভালবাসা দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদিতে কৃষক লাভবান হয়।

Multiple shoots

Root induction

Plantlet establishment

ফ্লাট জোড় কলম পদ্ধতিতে ক্যাকটাসের বংশবৃদ্ধি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: কিছু কিছু ক্যাকটাসে ক্লোরোফিল বা সবুজ কণিকা থাকে না। সেজন্য এ ধরনের ক্যাকটাসে ক্লোরোফিলযুক্ত অন্য জাতের ক্যাকটাসের সাথে জোড় কলম বাঁধলে সহজে বংশবৃদ্ধি করা যায় তথা শোভাময়ী ক্যাকটাসের সৃস্টি হয়। জোড়া লাগানোর পর এ ধরেনের ক্যাকটাস প্রায় ৫-৬ বছর বাঁচে। ক্যাকটাসের আদিজোড়ের (রুটষ্টক) বয়স ৫-৬ মাস হলে জোড় কলমের জন্য উপযুক্ত হয়। ফ্লাট জোড় কলম পদ্ধতিতে রুটস্টক ও সায়নের মাথা ফ্লাট করে কেটে সায়নের কাটা প্রান্ত রুটস্টকের কাটা প্রান্তে ভালভাবে বসিয়ে রাবার ব্যান্ড বা স্কসটেপ দ্বারা আটকে দিতে হয়। রুটস্টক ও সায়নের সম্মিলন স্থানে (জোড়া) যেন পানি না লাগে সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়। জুন-জুলাই মাসে ফ্লাট জোড় কলমে সাফল্যের হার বেশি এবং অধিক পরিমাণে অফসুট উৎপাদিত হয়। টবে বা ঝুলানো ঝুড়িতে জন্মানোর জন্য এ ধরনের গ্রাফটেড ক্যাকটাস খুবই উপযোগী। সহজে ও অল্প সময়ে এ ধরনের শোভাবর্ধক গ্রাফটেড ক্যাকটাস তৈরি করা যায় যা থেকে অধিক মূল্য পাবার সুযোগ আছে এবং এতে করে কৃষক বা নার্সারিম্যান লাভবান হবে।

আফ্রিকান ভায়োলেট এর পটিং মিডিয়া নির্ধারণ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: অল্প জায়গা, স্বল্প সময় এবং উৎপাদন পদ্ধতি সহজতর হওয়ায় শহর অঞ্চলে আফ্রিকান ভায়োলেট ফুলের চাষ বেশ জনপ্রিয়। তবে টবে বা বাড়ির ছাদে এ ধরনের বাহারী ফুলের চাষে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে উর্বর মাটি। ১০ বা ১২ ইঞ্চি মাটির পটে ভালভাবে পচানো মুরগির বিষ্ঠা বা পচা গোবর, বেলে দোআঁশ মাটি এবং কোকোডাষ্ট ১ঃ১ঃ২ অনুপাতে মিশিয়ে মিডিয়া বা মাধ্যম তৈরি করা হয়। প্রতি পটের মিডিয়ায় ১০ গ্রাম টিএসপি ও ৫ গ্রাম এমওপি সার ভালভাবে মিশিয়ে কয়েকদিন অপেক্ষা করার পর গাছ লাগাতে হয় এবং পট প্রতি ৮ গ্রাম ইউরিয়া সারের অর্ধেক

আফ্রিকান ভায়োলেট

চারা লাগানোর ৩০ ও ৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। রুটিং হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে সারা বছর আফ্রিকান ভায়োলেটের বংশ বিস্তারক উপাদান তৈরি করা যায়। এতে ফুলের বংশ বিস্তারক উপাদান বৃদ্ধি পাবে এবং নার্সারিম্যান বা সৌখিন ফুলচাষী উপকৃত হবে।

পাতা কলমের সাহায্যে সাকুলেন্ট (লাভ প্লান্ট, লিপষ্টিক প্লান্ট, আফ্রিকান ভায়োলেট) এর বংশবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: কলম বা ডিভিশনের মাধ্যমে সাধারণত সাকুলেন্টের বংশ বিস্তার করা হয়। উদ্ভিদের অযৌন অঙ্গ থেকে একটি অংশ কেটে আলাদা করে যথোপযুক্ত পরিবেশে রাখলে তা থেকে অবিকল মাতৃগাছের মত নতুন, স্বয়ংসম্পূর্ণ উদ্ভিদ পাওয়া যায়। কেটে নেয়া অংশকে বলা হয় কলম। অধিকাংশ উদ্ভিদের কাণ্ডের শাখা থেকে কলম নেয়া হয়, তবে কিছু ক্ষেত্রে পাতার কলম দিয়ে বংশবিস্তার সম্ভব। পাতা কলমের মাধ্যমে চারা উৎপাদন করলে মাতৃগুণাগুণ ঠিক থাকে ও অধিক সংখ্যক বংশবিস্তারক উপাদান তৈরি হয়। কলম থেকে চারা উৎপাদনের সাফল্য ও দ্রুততা নির্ভর করে কলম নেবার সময়, কলম রাখার পরিবেশ ও উদ্ভিদের রকমের উপর। কোন কোন উদ্ভিদের কলম অতি সহজেই শিকড় উৎপাদন করে। কলম নেয়ার পর যাতে এটা দ্রুত না শুকায় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এজন্য বৃষ্টির মৌসুম কলম নেয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত সময় যখন বাতাসের আর্দ্রতা বেশি থাকে। যেসব উদ্ভিদের কলমে সহজে শিকড় গজায় না সেগুলোর গোড়ার দিক অক্সিন জাতীয় হরমোনের দ্রবণে চুবিয়ে নিলে দ্রুত শিকড় গজায়। এ উদ্দেশ্যে সুস্থ্য লাভ প্লান্ট, লিপস্টিক প্লান্ট ও আফ্রিকান ভায়োলেটের পাতা ২০০-৩০০ মিগ্রা/লিটার IBA দ্রবণে ৫ মিনিট চুবানোর পর বাতাসে শুকিয়ে জীবাণুমুক্ত কোকোডাষ্ট মিডিয়াতে লাগালে ৩-৪ মাসের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে নতুন গাছের জন্ম হয়। রুটিং হরমোন প্রয়োগের মাধ্যমে সারা বছর লাভ প্লান্ট, লিপষ্টিক প্লান্ট ও আফ্রিকান ভায়োলেটের বংশবিস্তারক উপাদান তৈরি করা যায়। জুন-জুলাই মাস পাতা কলমের জন্য উপযোগী। এতে প্রচুর সংখ্যায় গাছ উৎপাদিত হবে এবং নার্সারিম্যান বা সৌখিন ফুলচাষী উপকৃত হবে।

লাভ প্লান্ট

লিপষ্টিক প্লান্ট

আফ্রিকান ভায়োলেট

গ্লাডিওলাসের বংশবিস্তারক উপাদান উৎপাদন প্রযুক্তি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: সাধারণত করম্ ও করমেল দ্বারা গ্লাডিওলাস ফুলের বংশ বিস্তার করা হয়। তবে গাছ প্রতি গ্লাডিওলাস ফুলে করম উৎপাদন সংখ্যা খুবই কম। জাত ভেদে ২-৩টি করম উৎপাদিত হয়। করম্ খাড়াভাবে কেটে দুই ভাগে ভাগ করে প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম ব্যাভিস্টিন মিশিয়ে ১/২ ঘণ্টা করমের টুকরাগুলি ডুবিয়ে ১ দিন ছায়ায় রেখে জমিতে লাগালে গাছের বৃদ্ধি ভাল হয়, কাট-করম থেকে অধিক সংখ্যাক চারা উৎপন্ন হয় এবং করম্ ও করমেলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে গ্লাডিওলাসের ফলন বৃদ্ধি পায় এবং কৃষক লাভবান হবে।

আস্ত করম্

অর্ধেক করম্

অধিক চারা

অধিক সংখ্যক বংশবিস্তারক উপাদান

গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা ও জারবেরা ফুলের হাইড্রোপনিক চাষ

গাঁদা

চারার বয়স যখন ৪-৫ সপ্তাহ তখন গাঁদা ফুলের চারা রোপণ করার উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের পর দ্রবণের pH মাত্রা ৫.৫-৬.২ এর মধ্যে এবং EC মাত্রা ১.০-১.৫ এর মধ্যে রাখা দরকার। গাছে ফুল আসা শুরু হলে EC মাত্রা বাড়িয়ে

১.৫-২.০ এর মধ্যে রাখতে হবে। মাঝে মাঝে গাছের নিচের দিকের বয়স্ক পাতাগুলি কেটে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর গাছ যাতে পর্যাপ্ত আলো পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। গাছে বেশি ফুল পেতে চাইলে পিনচিং পদ্ধতিতে গাছের ডগা কেটে দিতে হবে। এতে গাছে শাখা-প্রশাখার সংখ্যা বাড়ে ও ফুল বেশি হয়। সাধারণত চারা লাগানোর ৫০-৬০ দিনের মধ্যে ফুল আসে। প্রতিটি গাছ থেকে ১৫-২০ টি ফুল পাওয়া যায়।

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে গাঁদা চাষ

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে চন্দ্রমল্লিকা চাষ

চন্দ্রমল্লিকা

এ পদ্ধতিতে সাধারণত অক্টোবর মাসের মাঝামাঝী সময় চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারার বয়স যখন ৩-৪ সপ্তাহ কিংবা চারা যখন ২-৩ পাতা অবস্থায় আসে তখন একই পদ্ধতিতে চন্দ্রমল্লিকার চারা রোপণ করতে হয়। চন্দ্রমল্লিকা অম্ল (এসিড) পছন্দকারী ফুল শস্য বিধায় এর pH মান ৫.৫-৬.৫ এর মাঝামাঝী রাখতে হয়। গাছের দৈহিক বৃদ্ধির পর্যায়ে EC এর মান ১.০-১.৫ এবং ফুল আসার সময় তা বাড়িয়ে ১.৫-২.০ dS/m এর মধ্যে রাখতে হবে। গাছে বেশি ফুল পেতে চাইলে পিনচিং পদ্ধতিতে গাছের ডগা কেটে দিতে হবে। এতে গাছে ডালপালা ও ফুল বেশি হয়। গাছের বৃদ্ধির পর্যায়ে উপর থেকে সুতা বা শক্ত রশি ঝুলিয়ে গাছকে সোজা ও খাড়া রাখতে হয়। সাধারণত চারা লাগানোর ৫০-৬০ দিনের মধ্যে ফুল আসে। প্রতিটি গাছ থেকে ২০-২৫ টি ফুল পাওয়া যায়।

জারবেরা

হাইড্রোপনিক পদ্ধতি হলো নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পানিতে গাচের অত্যাবশ্যক উপাদান সরবরা করে ফসল উৎপাদন। উন্নত বিশ্বের অনে দেশে যেমন- আমেরিক, ইরোরোপের দেশসমূহ, জাপান, তাইওয়ান, চীন থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া এবং মধ্য-প্রাচ্যের দেশসমূহ বাণিজ্যিকভাবে হাইড্রোপনিক পদ্ধতির মাধ্যমে জারবেরা ফুল উৎপাদন করে থাকে।।

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে জারবেরা চাষ

এ পদ্ধতিতে সারাবছরই পলিটানেল, নেট হাউজ বা গ্রীন হাউজে জারবেরা ফুল উৎপাদন করা সম্ভব এবং হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত জারবেরা ফুল চাষে তেমন কোন রোগ-পোকা মাকড়ের আক্রমণ নেই বললেই চলে। এ জন্য হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে সাধারণত কোন কীটনাশক বা ছত্রাক নাশক ব্যবহার করা হয় না। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ফুল বিভাগ হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে পানির মধ্যে গাছের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যোপাদানসমূহ সরবরাহ করে জারবের ফুল সাফল্যজনকভাবে উৎপাদন করছে।

বারি জারবেরা-২

হাইড্রোপনিক পদ্ধতিতে যে কোন জাতের জারবেরা ফুলের চাষ করা যায়। টিস্যু কালচার জারবেরা চারা সাধারণত সেপ্টেম্বর-অটোবর মাসে রোপণ করা হয়। একটি গাছ ২০-২৫ সেমি লম্বা এবং গাছে প্রায় ৮-১০টি ফুল হয়। প্রতিটি ফুল প্রায় ১০ সেমি আকারের হয়। ফুল ধরা থেকে শুরু করে প্রায় ১৫-২০ দিন ফুলের স্থায়ীত্ব থাকে এবং জারবেরা ফুল ইৎপাদনের জন্য pH ৫.৫-৬.০ এবং EC ১.০-১.৫ dS/m থাকা অবশ্যক।

জারবেরা পাতায় GA_3 প্রয়োগের মাধ্যমে ফুলের গুণগত মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি

জারবেরা অ্যাসটারেসী পরিবারভুক্ত উচ্চমূল্যের একটি আকর্ষণীয় ফুল। চাহিদার দিক দিয়ে এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে এ ফুলের জুড়ি নেই। সারা বছরই বাজারে এর চাহিদা থাকে এবং বিভিন্নভাবে এ ফুল ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। তন্মধ্যে কাটফ্লাওয়ার হিসেবে ফুলদানীর জন্য এটি অনন্য। প্রটেকটিভ চাষাবাদের মাধ্যমে উন্নত মানের জারবেরা ফুল সারা বছর পাওয়া যায়।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

জারবেরা পাতায় ১০০ পিপিএম ঘনত্বের GA_3 ২ বার প্রয়োগের মাধ্যমে ফুলের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য গুলো যেমন আগাম ফুল ফোটা, গাছের দৈর্ঘ্য, গাছ প্রতি ফুলের সংখ্যা, বাজারযোগ্য ফুলের স্টিকের সংখ্যা, ফুলের সজীবতা বৃদ্ধি ইত্যাদি অর্জিত হয়। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ চারা লাগানোর উপযুক্ত সময়। চারা গুলোকে ৫০ সেমি. × ৪০ সেমি দূরত্বে রোপণ করতে হবে। হেক্টরপ্রতি জমিতে ৫ টন গোবর, ৫০০ কেজি কোকোডাস্ট, ৩২০ কেজি ইউরিয়া, ৩০০ কেজি এমওপি, ৩৭৫ কেজি টিএসপি, ১২ কেজি বোরিক এসিড, ১০০ কেজি জিপসাম ও ১২ কেজি জিংক সালফেট প্রয়োগ করতে হবে। টিএসপি, এমওপি, কোকোডাস্ট, ফসফরাস, বোরিক এসিড, জিপসাম, জিংক সালপেট বেসাল ডোজ হিসেবে দিতে হবে। ইউরিয়া সার চারা লাগানোর ৩০ ও ৬০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। গ্রোথ হরমোন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমন দিন বাছাই করতে হবে যেদিন বা যার পরদিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম থাকে। এ ক্ষেত্রে লাগানো চারার বয়স যথাক্রমে ২৫, ৫০ দিন হলে ১০০ পিপিএম GA_3 এর জলীয় দ্রবণ পাতায় স্প্রে করতে হবে।

জারবেরা ও গোলাপ ফুলের পোকা মাকড় দমন ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ

- জারবেরার ক্ষতিকারক পোকামাকড়ের মধ্যে মাইট এবং গোলাপের লেদা পোকা উল্লেখযোগ্য। পোকামাকড় আক্রান্ত জারবেরা ও গোলাপের গুণগতমান খারাপ হয়, সর্বোপরি ফলন ও বাজার মূল্য কমে যায়।
- ভারটিমেক বা ওমাইট ১.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর জারবেরা পাতার উল্টা পৃষ্ঠে ২-৩ বার স্প্রে করলে মাইট বা মাকড়সার হাত থেকে জারবেরা গাছকে রক্ষা করা যায় ও গুণগত মানের ফুল পাওয়া যায়।
- প্রোক্লেইম ০.৫ SG @ ১ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে গোলাপ গাছে স্প্রে করলে গোলাপ ফুলের লেদা পোকা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ও ফলন বেশি হয়। এতে ফুল চাষীরা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

গ্লাডিওলাসে ফিউজেরিয়াম উইল্ট রোগ ব্যবস্থাপনা

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ এটি গ্লাডিওলাসের একটি মারাত্মক রোগ। *Fusarium oxysporum* নাম ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগটি হয়ে থাকে এবং আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে গ্লাডিওলাস ফুলের চাষ বাধাগ্রস্থ হয়। রোগাক্রান্ত করম ও মাটি দ্বারা সাধারণত এ ছত্রাক রোগ ছড়ায়। এ রোগে পাতার আগা প্রথমে হলদে হয়, পরবর্তীতে বাদামী রং ধারণ করে, ফুলের রং ফ্যাকাশে হয় এবং বেশি আক্রমণে সম্পুর্ণ গাছ মারা যায়। শস্য পর্যায় অবলম্বন করলে এ রোগের প্রকোপ অনেকখানি কমে যায়। এ রোগ দমনে সুস্থ রোগমুক্ত করম এবং উপকারী ছত্রাক ট্রাইকোডারমা স্পোর সাসপেনশন (3×10^8 cfu/ml) ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া অটোস্টিন ১ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে লাগানোর পূর্বে করম্ শোধন করে, প্রতি এক মাস অন্তর ৩ বার গাছের গোড়ায় মাটি উত্তোলনের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি আর একবার করম উত্তোলন করে সংরক্ষণের পূর্বে আগের নিয়েমে করমগুলি শোধনের মাধ্যমেও এ রোগ অনেকাংশে দমন করা যায়।

গ্লাডিওলাস, জারবেরা এবং রজনীগন্ধা ফুলের সজীবতা বৃদ্ধিকরণ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য:

- গ্লাডিওলাস ফুলের স্টিক ৪% সুক্রোজ এর সাথে ২০০ পিপিএম হাইড্রোক্সিকুইনোলিন সালফেট এবং ২০ পিপিএম সাইট্রিক এসিড দ্রবনে রাখলে ফুলের সজীবতা প্রায় ১০-১২ দিন থাকে
- জারবেরা ফুলের স্টিক ৩% সুক্রোজের সাথে ২০০ পিপিএম হাইড্রোক্সিকুইনোলিন সালফেট এবং ৩০ পিপিএম সাইট্রিক এসিড দ্রবণে রাখার পর ফুলের সজীবতা প্রায় ১২-১৪ দিন পর্যন্ত থাকে
- রজনীগন্ধ্যা সিংগেল ফুলের সজীবতা বৃদ্ধির জন্য ২% সুক্রোজের সাথে ৩০০ পিপিএম হাইড্রোক্সিকুইনোলিন সালফেট এবং ৩০ পিপিএম সাইট্রিক এসিড কার্যকরী

হাইড্রোক্সিকুইনোলিন

ইকেবানা কলাকৌশল

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য:

কম ফুল ও বাহারী পাতা দিয়ে ফুলদানিতে ফুল সাজাবার প্রক্রিয়া এখন একটি শৈল্পিক কৌশল। জাপানী ভাষায় এটাকে বলা হয় 'ইকেবানা' এবং নার্সারিতে আয়ের উৎস হিসেবে এর গুরুত্ব অপরিসীম।

ইকেবানা কলাকৌশল

মসলা ফসল

বাংলাদেশে মসলা খুবই জনপ্রিয়। প্রধান প্রধান মসলার মধ্যে পেঁয়াজ, মরিচ, রসুন, হলুদ, ধনিয়া, আদা, গোলমরিচ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব মসলার আবাদী জমির পরিমাণ ৩.৮৭ লক্ষ হেক্টর এবং উৎপাদন ১২.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন। দেশে প্রতি বৎসর ব্যবহৃত মসলার বড় অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। বারি উদ্ভাবিত উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে মসলার ফলন অনেকাংশে বাড়ানো সম্ভব।

- পেঁয়াজ
- মরিচ
- মৌরি
- রসুন
- হলুদ
- ধনিয়া
- গোলমরিচ
- আদা
- দারুচিনি
- তেজপাতা
- একাঙ্গী
- চিভ
- কালোজিরা
- মেথী
- আলুবোখারা
- পান

পেঁয়াজ

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট চাহিদার তুলনায় পেঁয়াজের বেশ ঘাটতি রয়েছে। প্রতি বছর পেঁয়াজ আমদানি করে এ ঘাটতি পূরণ করা হয়। বারি উদ্ভাবিত উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করে পেঁয়াজের ফলন বাড়ানো সম্ভব। পেঁয়াজ একদিকে একটি মসলা এবং অপরদিকে একটি সবজিও বটে। বাংলাদেশে পেঁয়াজের চাষ সাধারণত রবি মৌসুমে সীমাবদ্ধ থাকে। তবে সম্প্রতি খরিফ মৌসুমে আবাদ উপযোগী পেঁয়াজের ৩টি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। আশা করা যায়, এসব জাতের ব্যাপক চাষাবাদের মাধ্যমে পেঁয়াজের ঘাটতি অনেকাংশে পূরণ করা সম্ভব হবে। পেঁয়াজের পাতা ও ডাঁটা ভিটামিন 'সি' ও 'ক্যালসিয়াম' সমৃদ্ধ। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১ লক্ষ ১৭ হাজার হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষা করা হয় এবং মোট উৎপাদন প্রায় ৫ লক্ষ ৩০ হাজার মেট্রিক টন।

পেঁয়াজ ফসল

পেঁয়াজের জাত

বারি পেঁয়াজ-১ (রবি)

বাছাইকরণের মাধ্যমে বারি পেঁয়াজ-১ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। ১৯৯৬ সালে জাতটি চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

জাতটির কন্দের আকার চ্যাপ্টা ও গোলাকার। গাছ উচ্চতায় ৫০-৫৫ সেমি। জাতটির কন্দ অধিক ঝাঁঝযুক্ত এবং প্রতি গাছে ১০-১২টি পাতা হয়। প্রতি কন্দের ওজন প্রায় ৩০-৪০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ১২-১৬ টন। হেক্টরপ্রতি বীজের ফলন ৬০০-৬৫০ কেজি।

বারি পেঁয়াজ-১

বারি পেঁয়াজ-১ জাতের পেঁয়াজের সংরক্ষণ ক্ষমতা বেশি। জাতটি বাংলাদেশের আবহাওয়ায় বীজ উৎপাদন করতে সক্ষম। বারি পেঁয়াজ-১ পার্পল ব্লচ ও স্টেমফাইলাম রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বারি পেঁয়াজ-২ (খরিফ)

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাছাইকরণ পদ্ধতিতে বারি পেঁয়াজ-২ নামে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। এই জাতটি ২০০০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

জাতটি বিশেষভাবে খরিফ মৌসুমে অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে চাষোপযোগী স্বল্প সময়ের ফসল। এটি দেখতে গোলাকার আকৃতির এবং রং লালচে বর্ণের। গাছের উচ্চতা ৩৫-৪৫ সেমি এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন ৩৫-৫৫ গ্রাম হয়ে থাকে। আগাম

চাষের জন্য মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বীজ তলায় বীজ বপন করা যায় এবং এপ্রিল মাসে ৪০-৪৫ দিন বয়সের চারা মাঠে রোপণ করা যায়। নাবী চাষের জন্য জুন-জুলাই মাসে বীজ তলায় বীজ বপন করা হয়। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৮-২২ টন।

বারি পেঁয়াজ-২

বারি পেঁয়াজ-৩ (খরিফ)

বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বাছাইকরণ পদ্ধতিতে বারি পেঁয়াজ-৩ জাত উদ্ভাবন করা হয়। এই জাতটি ২০০০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

এই জাতটি বিশেষভাবে খরিফ মৌসুমে চাষ উপযোগী ও স্বল্প সময়ের ফসল। এটি দেখতে গোলাকার আকৃতির এবং রং লালচে বর্ণের। গাছের গড় উচ্চতা ৩৫-৫০ সেমি এবং প্রতিটি কন্দের গড় ওজন ৪৫-৬৫ গ্রাম।

নাবিতে বীজ বপনের জন্য মধ্য-জুন থেকে মধ্য-জুলাই মাস উপযুক্ত সময় এবং মধ্য-আগস্ট থেকে মধ্য-সেপ্টেম্বর মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। আগাম চাষে বীজ বপনের উপযুক্ত সময় হচ্ছে মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চের প্রথম সপ্তাহ এবং এপ্রিল মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

বারি পেঁয়াজ-৩

বারি পেঁয়াজ-৪

বারি পেঁয়াজ-৪ জাতটি ২০০৮ সালে মুক্তায়িত একটি উচ্চ ফলনশীল শীতকালীন পেঁয়াজ। আকৃতি গোলাকার, রং ধূসর লালচে বর্ণের এবং ঝাঁঝযুক্ত। গাছের গড় উচ্চতা ৫০-৬০ সেমি এবং প্রতিটি গাছে ১০-১২টি পাতা হয়। প্রতিটি বাল্বের গড় ওজন ৬০-৭০ গ্রাম। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৭-২২ টন।

বারি পেঁয়াজ-৪

বারি পেঁয়াজ-৫

বারি পেঁয়াজ-৫ গ্রীষ্মকালে চাষের উপযোগী স্বল্প-সময়ের ফসল। এটি সারা বছরব্যাপী আবাদ করা যেতে পারে। আকৃতি চ্যাপ্টা গোলাকার এবং রং লালচে বর্ণের। গাছের গড় উচ্চতা ৪৫-৫৫ সেমি এবং প্রতিটি বাল্বের গড় ওজন ৫৫-৭০ গ্রাম হয়ে থাকে। বীজ বপন থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত প্রায় ৯৫-১১০ দিন সময় লাগে। হেক্টরপ্রতি ফলন ১৮-২০ টন।

বারি পেঁয়াজ-৫

শীতকালীন পেঁয়াজ উৎপাদন

জমি তৈরি: রোপণের ৩-৪ সপ্তাহ পূর্বে হালকা গভীর (১৫-২০ সেন্টিমিটার) করে ৪-৫ টি চাষ ও মই দিতে হবে। পেঁয়াজের শিকড় মাটিতে ৫-৭ সেন্টিমিটারের মধ্যে বেশি নিচে যায় না বলে জমি গভীর করে চাষের প্রয়োজন হয় না। আগাছা বেছে, মাটির ঢেলা ভেঙ্গে ঝুরঝুরে ও সমান করে জমি তৈরি করে পেঁয়াজ লাগাতে হবে।

বারি পেঁয়াজ-৪

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

মাটিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে চাষ করলে পেঁয়াজ বেশ বড় ও ভারী হয় এবং অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। মাটির অবস্থাভেদে সারের মাত্রা নির্ভর করে। সাধারণত মধ্যম উর্বর জমির জন্য হেক্টর প্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি নিচে দেয়া হলো:

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা হিসেবে পার্শ্ব প্রয়োগ	
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি
গোবর/কম্পোস্ট	৫ টন	সব	–	–
ইউরিয়া	২৪০ কেজি	৮০ কেজি	৮০ কেজি	৮০ কেজি
টিএসপি	২৬০ কেজি	সব	–	–
এমওপি	১৫০ কেজি	৭৫ কেজি	৩৭.৫ কেজি	৩৭.৫ কেজি

শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি, ১/৩ ভাগ ইউরিয়া ও ১/২ ভাগ এমওপি সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হয়। বাকি ২/৩ ভাগ ইউরিয়া এবং ১/২ ভাগ এমওপি সমান ভাগে যথাক্রমে চারা রোপণের ২৫ এবং ৫০ দিন পর দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। শল্ককন্দ বা সরাসরি বীজ বপনের ক্ষেত্রেও এ নিয়ম অনুসরণ করতে হয়।

বপন সময়: অক্টোবরের শেষ থেকে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে বীজ যথাক্রমে সরাসরি ক্ষেতে অথবা বীজতলায় বীজ বপন করতে হয়। বারি পেঁয়াজ-৫ শীতকালে চাষ করা যাবে।

বপন/রোপণ পদ্ধতি: পেঁয়াজের ক্ষেতে (১) সরাসরি বীজ বপন, (২) ছোট শল্ককন্দ সরাসরি জমিতে রোপণ এবং (৩) বীজতলায় চারা তৈরি করে এই তিন পদ্ধতিতে পেঁয়াজ বপন/রোপণ করা হয়। উল্লিখিত প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বীজ হার বেশি ও ফলন মাঝারী পর্যায়ে হয় বলে তেমন লাভ জনক হয় না। বীজ হতে চারা তৈরি করে রোপণ করলেই ফলন বেশি হয়। বীজ শোধন করে নিলে বীজবাহিত রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

বীজতলার পরিচর্যা: বীজ বপনের পরপরই বীজতলার চারিদিকে সেভিন ৮৫ ছিটিয়ে দিতে হবে যাতে পিঁপড়া বীজ নিয়ে যেতে না পারে। এছাড়া ছাই ও কেরোসিন ছিটিয়ে পিঁপড়া দমন করা যায়। প্রয়োজন অনুসারে ১-২ দিন অন্তর হালকা সেচ দিতে হবে। চারা ছোট অবস্থায় বীজতলায় আগাছা জন্মে। আগাছাসমূহ পরিষ্কার করে দিতে হবে। বীজ বপনের ১০-১২ দিনের মধ্যে ডায়াথেন এম-৪৫ ২ গ্রাম/লিটার হারে এবং চারা গজানোর ২০-২৫ দিনের মধ্যে রোভরাল ২ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

চারা রোপণ: উৎপন্ন চারা জমিতে রোপণ করলে কন্দ বড় হয় এবং ফলন বেশি হয়। পেঁয়াজের জন্য প্রস্তুতকৃত জমিতে মাঝে মাঝে নালা রেখে ছোট ছোট ব্লকে ভাগ করা হয়। ব্লকে ৪০-৪৫ দিন বয়সের সুস্থ চারা, সারি ১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে, চারা ৫ সেন্টিমিটার দূরে ও ৩-৪ সেন্টিমিটার গভীর গর্তে ১টি করে রোপণ করতে হবে। কন্দ গঠন শুরু হওয়া চারা রোপণ করা যাবে না। চারা রোপণের পর সেচ দিতে হবে।

কন্দ লাগানোর পদ্ধতি: সমতল জমিতে টানা লাঙ্গল দিয়ে ১৫-২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে অগভীর নালা/সারি করে হাত দিয়ে ১০-১৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে পেঁয়াজের ছোট ছোট কন্দ লাগানো হয়। কন্দ লাগানোর পরই জমিতে সেচ দেওয়া আবশ্যক। এতে ৫-৭ দিন পর চারা বের হয়ে আসে। ২-৩ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট পূর্ববর্তী বছরের সুস্থ ও পরিপক্ক কন্দ বীজ হিসেবে নিতে হবে। পেঁয়াজ পাতা ও পেঁয়াজ কলি উৎপাদনের জন্য মাঝারী ও বড় আকারের কন্দ লাগানো যেতে পারে এবং এতে তাড়াতাড়ি (লাগানোর ৩৫-৮০ দিন পর) পেঁয়াজ পাতা ও কলি উৎপন্ন হয়।

ফসলের আন্তঃপরিচর্যা: পেঁয়াজ রোপণ এবং সেচের পর জমিতে প্রচুর আগাছা জন্মাতে পারে। আগাছা জমির রস ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে পেঁয়াজের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। এই জন্য ২-৩ বার বা ততোধিক নিড়ানী দিয়ে জমি আলগা ও আগাছামুক্ত করা দরকার। এতে কন্দ ভালোভাবে গঠিত হয় ও ফলন বাড়ে। পেঁয়াজের সমগ্র জীবনচক্রে হেক্টরপ্রতি ৩০০ মিলিলিটার পানির প্রয়োজন হয়। এজন্য ৮ থেকে ১০ বার সেচ দিতে হবে। চারা মাটিতে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জমিতে আর্দ্রতার অবস্থার উপর ভিত্তি করে সেচ দিতে হবে। কন্দ গঠিত হয়ে গেলে সেচ কম লাগে। পেঁয়াজ পরিপক্ক হলে ফসল উঠানোর এক মাস পূর্বে সেচ দেওয়া বন্ধ করে দিতে হবে, না করলে পেঁয়াজের গুণাগুণ ও সংরক্ষণ ক্ষমতা হ্রাস পায়।

ফসল সংগ্রহ: পেঁয়াজ পরিপক্ক হলে, গাছের সবুজ পাতা ক্রমশ হলদে হয়ে যায় এবং ৫০% পাতা গলার অংশে নরম হয়ে নুয়ে পড়ে। রোপণের ৯০ থেকে ১২০ দিন পর শীতকালীন পেঁয়াজ তোলার উপযুক্ত হয়।

ফলন: সঠিক সময়ে বীজ বোনা ও চারা রোপণ, বীজ হিসাবে কন্দ অথবা আদর্শ চারা নির্বাচন, সঠিক জাত, সেচ ও সার প্রয়োগ এবং মাটির প্রকৃতি ইত্যাদির উপর পেঁয়াজের ফলন নির্ভর করে। সেচ ও সার প্রয়োগে চাষ করলে হেক্টরপ্রতি ১৮-২০ টন ফলন পাওয়া যায়। সরাসরি বীজ বপন করে চাষ করার চেয়ে পেঁয়াজের চারা রোপণ করলে ২০-২৫ শতাংশ ফলন বেশি হয়।

সংরক্ষণ: ছায়াযুক্ত স্থানে ৮-১০ সেন্টিমিটার উঁচু করে ৮-১০ দিন রাখলে পেঁয়াজ শুকিয়ে যায়। বাছাই এবং গ্রেডিং করার পর র‍্যাক, ঘরের সিলিং অথবা উঁচু ঘরে আলো ও বাতাস চলাচলের সুবিধা যুক্ত শুকনা মেঝেতে বা তৈরিকৃত বাশেঁর মাচায় পেঁয়াজ ছড়িয়ে সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণাগারের পেঁয়াজ মাঝে মাঝে উল্টে পাল্টে পরীক্ষা করে পচা ও অঙ্কুরিত পেঁয়াজ বেছে ফেলতে হবে।

গ্রীষ্ম/খরিফ পেঁয়াজ উৎপাদন

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বারি পেঁয়াজ-৫ গ্রীষ্ম/খরিফ মৌসুমে আবাদের জন্য মুক্তায়িত করেছে। এর উৎপাদন প্রযুক্তি নিম্নে দেয়া হল।

মাটি: উঁচু, সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত বেলে দোআঁশ বা পলিযুক্ত মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উত্তম।

বারি পেঁয়াজ-৫

বীজ বপন ও চারা রোপণ: সাধারণত চারা তৈরি করেই বারি পেঁয়াজ-৫ চাষ করা হয়। বীজ বপনের সময় অত্যাধিক রোদ ও বৃষ্টি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য পলিথিন/চাটাই ব্যবহার করা যেতে পারে এবং অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রখর রোদ ও বৃষ্টির সময় বীজতলা ঢেকে রাখতে হবে, অন্য সময় বীজতলা উন্মুক্ত রাখতে হবে। প্রথম দিকে খরার কারণে জমিতে রসের অভাব থাকে বলে বীজ তলায় ঘন ঘন সেচ দিয়ে গজানোর পূর্ব পর্যন্ত (৫-৬ দিন) ঢেকে রাখতে হয়।

আগাম চাষ: মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য জুন পর্যন্ত বীজতলায় বীজ বপন করা যায়। তবে মার্চ মাস পর্যন্ত চারা উৎপাদন করা উত্তম। অতঃপর ৪০-৪৫ দিনের চারা মূল জমিতে রোপণ করতে হয়।

নাবি চাষ: নাবি চাষের ক্ষেতে জুলাই থেকে আগস্ট মাসে বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে। পরবর্তীতে ৪০-৪৫ দিনের চারা মূল জমিতে রোপণ করতে হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: সফলভাবে খরিফ পেঁয়াজ চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি প্রয়োজনীয় জৈব ও অজৈব সারের পরিমাণ নিম্নরুপ:

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ
গোবার	৫ টন	সব
ইউরিয়া	১৫০ কেজি	সব
এমওপি	১৭৫ কেজি	সব
টিএসপি	২০০ কেজি	সব
জিপসাম	১১০ কেজি	সব
জিংক অক্সাইড	৩ কেজি	সব

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিঙ্ক অক্সাইড ও আগাম চাষের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া চারা রোপণের ২০-২৫ দিন পর পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। নাবি চাষের জন্য ১/৩ ভাগ ইউরিয়া অন্যান্য সারের সাথে শেষ সেচ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ২/৩ ভাগ ইউরিয়া যথাক্রমে ২০-২৫ দিন ও ৫০-৫৫ দিন পর পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে সারের পার্শ্ব প্রয়োগের পরপরই সেচ দিতে হবে।

পরিচর্যা: পেঁয়াজের চারা রোপণের পর একটি প্লাবন সেচ অবশ্যই দিতে হবে। মাটিতে চটা বাঁধলে কন্দের বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। অতএব মাটির 'জো' আসার সাথে সাথে চটা ভেঙ্গে দিতে হয় ও আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। নিড়ানীর সাথে সাথে ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে গাছের গোড়া ঢেকে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: পেঁয়াজের গাছ পরিপক্ক হলে এর গলার দিকের টিস্যু নরম হয়ে যায়। বারি পেঁয়াজ-৫ এর চারা থেকে কন্দের পরিপক্কতা হওয়া পর্যন্ত আগাম চাষের ক্ষেত্রে মাত্র ৬০-৭০ দিন এবং নাবি চাষের ক্ষেত্রে ৯৫-১১০ দিন দরকার হয়। পাতা ও শিকড় কেটে শীতল ও ছায়াময় স্থানে ৮-১০ দিন রেখে কিউরিং করতে হবে। বর্ষাকালীন ফসল বিধায় উত্তোলনকৃত পেঁয়াজ ২-৩ দিন এমনভাবে রেখে শুকাতে হবে যাতে কন্দে সরাসরি রোদ না লাগে। এরপর বাছাই ও গ্রেডিং করার পর বাঁশের মাচা, ঘরের সিলিং, প্লাস্টিক বা বাঁশের র‍্যাক অথবা ঘরের পাকা মেঝেতে শুষ্ক ও বায়ু চলাচল যুক্ত স্থানে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা যায়। তবে গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজে আর্দ্রতার পারিমাণ বেশি থাকে বলে ইহা এক মাসের বেশি সংরক্ষণ করা যাবে না।

পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন

আবহাওয়া: যদিও বিভিন্ন আবহাওয়ায় পেঁয়াজ বীজের চাষ হতে দেখা যায়। তবে যে সমস্ত স্থানে খুব বেশি ঠাণ্ডা বা গরম পড়ে না এবং অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হয় না সে সব স্থানে পেঁয়াজ এবং বীজ খুব ভাল হয়। যেখানে বছরে ৭৫ থেকে ১০০ সেমি বৃষ্টিপাত হয় সে সব স্থানে পেঁয়াজ ভাল হয়। দিনের আলো, তাপমাত্রা, মাটির রস পেঁয়াজের বীজ গঠন ও ফলনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। প্রচুর দিনের আলো, অনধিক উত্তাপ ও মাটিতে প্রয়োজনীয় রস থাকলে পেঁয়াজ ও বীজের ফলন খুব ভাল হয়। ছোট অবস্থায় যখন পেঁয়াজের পাতা বাড়তে থাকে তখন ১৫° সে. তাপমাত্রা ও ৯-১০ ঘণ্টা দিনের আলো থাকলে পেঁয়াজ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং পরে ১০-১২ ঘণ্টা দিনের আলো ও ২১° সে. তাপমাত্রা এবং গড় আর্দ্রতা ৭০% থাকলে পেঁয়াজের কন্দ ভালভাবে বাড়ে। বীজ উৎপাদনের জন্য পুষ্পায়নের সময় মোটামুটি ঠাণ্ডা তাপমাত্রা প্রয়োজন হয়। এ অবস্থায় ৪.৫ থেকে ১৪° সে তাপমাত্রায় প্রতিটি কন্দে অধিক সংখ্যক ফুল ও পুষ্ট বীজ গঠিত হয় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। এই ঠাণ্ডা তাপমাত্রা উৎপাদন মৌসুমে বিশেষ করে জানুয়ারী - ডিসেম্বর মাসে বিদ্যমান থাকে। পুষ্পায়ন পর্যায়ে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল দিনের আলোয় পরাগায়নের জন্য অধিক সংখ্যক পরগায়নকারী পোকা সক্রিয় থাকে। বীজ সংগ্রহ, কিউরিং ও থ্রেসিং এর সময় উষ্ণ এবং শুষ্ক আবহাওয়াও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

মাটি: সব রকম মাটিতেই পেঁয়াজ বীজের চাষ হতে দেখা যায়। তবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থাযুক্ত গভীর, ঝুরঝুরে হালকা দোআঁশ বা পলি যুক্ত মাটি পেঁয়াজ বীজ চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। হালকা বেলে-দোআঁশ মাটিতে এঁটেল মাটির চেয়ে অনেক আগে পেঁয়াজের পরিপক্কতা আসে। হালকা মাটিতে উপযুক্ত পরিমাণে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করে চাষ করলে পেঁয়াজ বেশ বড় ও ভারী হয় এবং সেগুলো অনেক দিন সংরক্ষণ করা যায়। পরবর্তীতে উক্ত কন্দ থেকে উন্নত পুষ্ট, সজীব ও নিরোগ বীজ পাওয়া যায়। এঁটেল মাটি শক্ত হয়ে যায় বলে পেঁয়াজের কন্দ ভালভাবে বাড়তে পারে না ফলে পুষ্পদণ্ডও সঠিক ভাবে বাড়তে পারে না। ফলে ফলন কম হয়। অধিক অম্ল বা ক্ষার মাটিতে পেঁয়াজ আস্তে আস্তে বাড়ে, ছোট হয় এবং ফসলের পরিপক্কতা দেরিতে হয়। মাটির পি এইচ ৫.৮-৬.৮ থাকলে পেঁয়াজের কন্দ ও বীজের ফলন ভাল হয়। যে সব জমিতে পানি জমে সে সমস্ত জমিতে পেঁয়াজ বীজ মোটেও ভাল হয় না।

বীজ উৎপাদন পদ্ধতি: বীজের ফলন যতগুলো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল তার মধ্যে বীজ উৎপাদন পদ্ধতি অন্যতম। দুটি মৌলিক পদ্ধতির মাধ্যমে পেঁয়াজ বীজ উৎপাদন করা যায়

- বীজ থেকে বীজ এবং
- কন্দ থেকে বীজ : উন্নত ও অধিক ফলনের জন্য কন্দ থেকে বীজ উৎপাদন পদ্ধতি সবচেয়ে উপযোগী হওয়ায় আমাদের দেশে সাধারণত কন্দ থেকে বীজ উৎপাদন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

কন্দ থেকে বীজ উৎপাদন

মাতৃকন্দ সংগ্রহ: সাধারণত উৎপাদিত পেঁয়াজ ফসল থেকে মাতৃকন্দ সংগ্রহ করা হয়। বীজ উৎপাদনের জন্য ৪-৬ সেমি ব্যসের কন্দ উপযুক্ত। বীজের বিশুদ্ধতার জন্য কন্দ উৎপাদন মৌসুমে সতর্কতার সহিত অস্বাভাবিক পত্রগুচ্ছ, রোগাক্রান্ত পেঁয়াজ গাছ ক্ষেত থেকে তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। পরিপক্ক পেয়াজ কন্দ, চিকন গলা এবং রোগ মুক্ত পেঁয়াজের মাতৃকন্দ সংগ্রহ করতে হবে।

মাতৃ কন্দ সংরক্ষণ: পেঁয়াজ কন্দ উত্তোলনের পর এর পাতা ও শিকড় কেটে ৭-১০ দিন বায়ু চলাচল সুবিধা যুক্ত শীতল ও ছায়াময় স্থানে শুকিয়ে নিতে হবে। এরপর যথারীতি মাতৃকন্দের জন্য বাছাই ও শ্রেণিবিন্যাস করে ঠাণ্ডা ও বায়ুময় গুদামে সংরক্ষণ করতে হবে। মাতৃকন্দ রোপণের পূর্ব পর্যন্ত আলো বাতাসময় শীতল স্থানে মাচা তৈরি করে মাচায় ছড়িয়ে সংরক্ষণ করা যেতে পারে। মাঝে মাঝে পচা বা শুকনা পেঁয়াজ বেছে সরিয়ে ফেলতে হবে। পেঁয়াজের মাতৃকন্দ সংরক্ষণের জন্য হিমায়নযন্ত্রে ৪.৫ সে থেকে ১৪ সে. তাপমাত্রা উপযোগী তবে ১১ সে তাপমাত্রা ও ৬৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

রোপণ মৌসুম: পেঁয়াজের রোপণ সময়ের উপর বীজ উৎপাদনের অনেক প্রভাব রয়েছে। বেশি আগাম অর্থাৎ অক্টোবরের মাঝামাঝি পেঁয়াজ রোপণ করলে পুষ্পদণ্ডে প্রতি কদমে ফুলের সংখ্যা অনেক কম হয়। আবার ডিসেম্বর মাসে রোপণ করলে গাছের বৃদ্ধি কম হয়। কন্দে কম সংখ্যক ফুল আসে এবং পার্পল ব্লচ রোগ ও থ্রিপস পোকার প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া বিলম্বে রোপণ করলে বীজ ফসল কাল বৈশাখী ঝড় ও শীলা বৃষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই

অক্টোবরের শেষ ও নভেম্বর মাসের প্রথম হতে মাঝামাঝি পেঁয়াজের মাতৃকন্দ রোপণের উপযুক্ত সময়। এ সময়ে পেঁয়াজ কন্দ রোপণ করলে উক্ত বীজ ফসল খুব ভাল ফলন দেয়।

মাতৃকন্দ নির্বাচন: শীতকালীন অথবা গ্রীষ্মকালীন ফসল থেকে বীজ ফসলের জন্য উপযুক্ত পরিপক্ক ও রোগমুক্ত পেঁয়াজের মাতৃকন্দ নির্বাচন করা প্রয়োজন। পেঁয়াজের আকার ছোট হলে গাছ দুর্বল হয়। ফুলদণ্ড চিকন ও হালকা হয় এবং সহজেই বাতাসে ভেঙ্গে পড়ে। তাছাড়া উক্ত ফুল দণ্ডের কদমে ফুল কম ধরে ও ছোট হয় এবং বীজের ফলনও খুব কম হয়। বারি পেঁয়াজ-১ জাতের ৩০-৩৫ গ্রাম ওজনের কন্দ এবং তার ব্যাস যদি ৪.০ সেমি হয় তাহলে সবচেয়ে বেশি বীজ উৎপন্ন হয়। তবে ৩০-৩৫ গ্রাম অপেক্ষা বারি পেঁয়াজ ২, ৩ ও ৪ জাতের ৪০-৪৫ গ্রাম ওজনের কন্দ থেকে সর্বাধিক পরিমাণ বীজ উৎপাদন হয়। অন্য একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে ৪০ গ্রাম ওজনের কন্দ এবং তার ব্যাস যদি ৩ -৪ সেমি হয় সেক্ষেত্রে ভাল ফলন পাওয়া যায়। আমাদের দেশে উৎপাদিত কন্দসমূহের ব্যাসের ভিত্তিতে তিন ভাগে ভাগ করা হয় যথা-১) বড় আকারের কন্দ যার ডায়ামিটার ৩.৮ সেমি ২) মধ্যম আকারের কন্দ যার ব্যাস ২.৫ সেমি, এবং ৩) ছোট আকারের কন্দ যার ব্যাস ১.৮ সেমি। এদের মধ্যে মধ্যম আকারের মাতৃকন্দ অর্থাৎ ২.৫ থেকে ৩.৭ সেমি ব্যাস বিশিষ্ট কন্দ থেকে লাভজনকভাবে বীজ উৎপাদন সম্ভব হয়।

জমি তৈরি: বীজ উৎপাদনের জন্য জমি ভালভাবে প্রস্তুতকরা দরকার যাতে মাটি নরম ও ঝুরঝুরে হয়। পেঁয়াজের শিকড় মাটিতে ৫-৭ সেমি এর মধ্যে বেশি থাকে বলে জমি খুব গভীর করে চাষের প্রয়োজন হয় না। সাধারণত ৪-৫ টি চাষ ও মই দিয়ে আগাছা বেছে মাটি ঝুরঝুরে করতে হবে। পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের জমিতে ১০ মি × ১.৫ মি আকারের বেড করা প্রয়োজন। তিন বেড পরপর গভীর পানি নিষ্কাশনের জন্য নালা রাখতে হবে। ভেজা মাটিতে পেঁয়াজ রোপণ করলে পচন রোগ হওয়ায় সম্ভাবনা থাকে আবার জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রস না থাকলে গাছ সন্তোষজনকভাবে বাড়তে পারে না।

মাতৃকন্দ শোধন: কার্বনডাজিম গ্রুপের (আটোষ্টিন/গোল্ডাজিন) বা প্রোভেক্স ২০০ জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে মাতৃকন্দ শোধন করতে হবে। প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম ব্যাভিষ্টিন ও ২.৫ গ্রাম প্রভেক্স-২০০ দ্বারা কন্দ ১০-১৫ মিনিট চুবিয়ে রেখে শোধন করতে হবে।

মাতৃকন্দ রোপণ: বড় আকারের জমিকে ছোট ছোট ব্লকে ভাগ করে প্রত্যেক ব্লকের চারিদিকে পানি প্রবাহের জন্য নালা থাকা আবশ্যক। সারি করে মাতৃ কন্দ রোপণ করা উত্তম। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২০-২৫ সেমি এবং কন্দ থেকে কন্দের দূরত্ব ১৫ সেমি হওয়া প্রয়োজন। সারি থেকে সারির দূরত্ব খুব কাছাকাছি হলে অধিক ফলন পাওয়া সম্ভব কিন্তু ছত্রাক রোগের আক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি থাকে। নিদিষ্ট দূরত্বে ছোট লাঙ্গল অথবা রডের টাইন দ্বারা ৫-৬ সেমি গভীর নালা টেনে উক্ত নালায় পেঁয়াজের মাতৃকন্দ রোপণ করে পার্শ্ববর্তী মাটি দ্বারা মাতৃ কন্দ ঢেকে দেওয়া আবশ্যক। অল্প গভীরে রোপণ করা কন্দ থেকে পেঁয়াজের ফুলদণ্ড বড় হলে বৃষ্টি বা সেচের পানিতে মাটি সরে গিয়ে গাছ পড়ে যায়।

মাতৃকন্দ বীজের পরিমাণ: বীজ উৎপাদনের জন্য আমাদের দেশে স্পেসিং ও মাতৃকন্দের আকারের উপর ভিত্তি করে এক হেক্টর জমিতে ৩,০০০-৫,০০০ কেজি মাতৃকন্দের প্রয়োজন হয়।

বীজ উৎপাদন মাঠের স্বতন্ত্রীকরণ: পেঁয়াজ সাধারণত পর পরাগায়িত উদ্ভিদ, সেজন্য প্রতিবেশি পেঁয়াজ ক্ষেত থেকে পরাগায়িত পোকা ও বাতাসের মাধ্যমে পরাগায়িত হয়ে এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লোপ পেতে পারে। দুটি ভিন্ন জাতের পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের জন্য স্বাতন্ত্রীকরণ দূরত্ব ১,০০০ মি. হওয়া বাঞ্ছনীয়। বীজের বিশুদ্ধতার জন্য এটি অপরিহার্য।

অনাকাঙ্ক্ষিত পেঁয়াজ গাছ উত্তোলন: পেঁয়াজের ফুল ফোটার পূর্বেই রোগাক্রান্ত চিকন বা সরু পুষ্পদণ্ডসহ অপুষ্ট পেঁয়াজ গাছ ক্ষেত থেকে তুলে তা ধ্বংস করতে হবে। উন্নত মানের বীজ উৎপাদনের জন্য এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে। গাছের বৃদ্ধির দুই পর্যায়ে (দৈহিক বৃদ্ধির পর্যায় ও ফুল ফোটার সময়) এই কাজটি করতে হবে।

রোপণ পূর্ব ঠাণ্ডা শোধন: রোপণের পূর্বে ১২-২০° সে. তাপমাত্রায় মাতৃকন্দসমূহ ৩০ দিন যাবত যদি ঠাণ্ডা শোধন করা হয় তাহলে ঠাণ্ডা আবেশ তাড়াতাড়ি পুষ্পায়নে প্ররোচিত করার মাধ্যমে ফুল ফোটাকে ত্বরান্বিত করে ফল ধারণ এবং অধিক ফলন নিশ্চিত করে। তবে শোধন করা পেঁয়াজ ১২-১৫ দিন স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রেখে তারপর রোপণ করতে হবে।

সার ও সেচ প্রয়োগ: পেঁয়াজের বীজ ফসলের সময়কাল দীর্ঘ, ১৫০-১৬৫ দিন। সে জন্য বীজ উৎপাদনে সারের প্রয়োজন অনেক বেশি। নিম্নে হেক্টরপ্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি উল্লেখ করা হলো।

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা হিসেবে পার্শ্ব প্রয়োগ		
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
গোবার	১০ টন	সব			
টিএসপি	২৭৫ কেজি	সব			
এমওপি	১৫০ কেজি	৫০ কেজি	৩৪ কেজি	৩৩ কেজি	৩৩ কেজি
ইউরিয়া	২৫০ কেজি	৭০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি	৬০ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি	সব			
জিংক অক্সাইড	৩ কেজি	সব			
বোরিক এসিড	৫ কেজি	সব			

জমিতে শেষ চাষের পূর্বে সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক ও বোরন সার ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর ইউরিয়া ও এমওপি সার যথাক্রমে শেষ চাষে, প্রথম কিস্তি গাছের বয়স ২৫-৩০ দিন, ২য় কিস্তি গাছের বয়স ৫০-৫৫ দিন এবং ৩য় কিস্তির গাছের বয়স ৭০-৭৫ দিন হলে উপরের ছকে উল্লেখিত পরিমাণ মতো প্রয়োগ করতে হবে।

মাধ্যমিক পরিচর্যা: গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য পেঁয়াজ বীজ ফসলে পানি সেচ অত্যাবশ্যক। পেঁয়াজ বীজ উৎপাদনের মৌসুমে সাধারণত বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। তাই জমির অবস্থা দেখে পানি সেচ দেওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া প্রত্যেক কিস্তিতে পানি সেচের পরদিন সার দেয়া দরকার। সেচের পর মাটির 'জো' দেখে নিড়ানী দিয়ে মাটি আলগা করে দিতে হবে। পেঁয়াজের বীজ ফসল আগাছামুক্ত রাখা এবং পেঁয়াজের পুষ্পদণ্ড যাতে বাতাসে ভেঙ্গে না পড়ে, সেজন্য ঠেকনার ব্যবস্থা করতে হবে। রোগ বালাই ও পোকা মাকড় দমনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে হবে।

পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের বর্ডার ফসলের প্রভাব: পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন সম্পূর্ণভাবে পলিনেটরদের মুভমেন্ট/ভিজিট এর উপর নির্ভর করে। কারণ পেঁয়াজ পরপরাগায়িত ফসল। পেঁয়াজের পলিনেশন প্রটেনড্রাই প্রকৃতির, তাই পেঁয়াজে পরপরাগায়ণ হয়। এই পরপরাগায়ণ ১০০ ভাগ বিভিন্ন পোকা যেমন- মাছি, হাউজফ্লাই, বোল্লাই, সিরফিড ফ্লাই ইত্যাদি দ্বারা হয়ে থাকে। পেঁয়াজের ফুল সাদা হওয়ায় ফুল ফোটার সময় অনেকক্ষেত্রে পলিনেটিং পোকার ভিজিট কম হয়। সেক্ষেত্রে পেঁয়াজের সাথে মৌরী, ধনিয়া, শালুক ইত্যাদি চাষ করে পলিনেটিং পোকাকে পেঁয়াজের পরাগায়ণে আকৃষ্ট করা যেতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, ১০ সারি পেঁয়াজের পর ২ সারি মৌরী, শালুক, ধনিয়া চাষ করলে পেঁয়াজের পলিনেশনকারী পোকার ভিজিট বৃদ্ধির কারণে পেঁয়াজের সীড সেট ভাল হয় এবং বীজের ফলন বৃদ্ধি পায়। শালুক ও মৌরী পেঁয়াজ রোপণের দিনেই বপন করতে হবে। ধনিয়া, পেয়াজ রোপণের ২০-২২ দিন পর বপন করতে হবে।

বীজ সংগ্রহ, শুকানো ও সংরক্ষণ: বৃষ্টি শুরু হওয়ার আগে বীজ সংগ্রহ করলে বীজের গুণগত মান ভাল হয়। পেঁয়াজের বীজ পরিণত হলে ফুলের মুখ ফেটে যায় এবং কালো বীজ দেখা যায়। শতকরা ২০-২৫ ভাগ কদমের (umbel) মুখ ফেটে কালো বীজ দেখা গেলে উহা সংগ্রহ করা প্রয়োজন। একই সময়ে পেঁয়াজের সব পুষ্পদণ্ডের বীজ পরিপক্ক হয় না বিধায় ২-৩ বার বীজ তোলা হয়। কদমের নিচ থেকে কদমের পুষ্পদণ্ডের ৫-৭ সেন্টিমিটার অংশসহ পরিপক্ক কদমগুলো তুলে নিতে হয়। এগুলো কয়েকদিন রোদে ভালভাবে শুকানোর পর ঘষে খোসা থেকে বীজ আলাদা করে পরিষ্কার করা হয়। জাত ভেদে প্রতি হেক্টরে প্রায় ৬০০-১২০০ কেজি পর্যন্ত বীজ উৎপাদন সম্ভব হয়। সংগৃহীত বীজ আরো ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে বীজের আর্দ্রতা ৬-৭% এ কমিয়ে ও ঠাণ্ডা করে বায়ুনিরোধক পলিথিন ব্যাগে ভরে সিল করে টিন অথবা প্লাস্টিকের পাত্রে ভরে শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

পেঁয়াজের রোগ ও তার প্রতিকার

পেঁয়াজ বাংলাদেশের একটি অর্থকরী মসলা ফসল ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ভোগ্যপণ্য। প্রতিদিনের রান্নায় ইহা আমরা ব্যবহার করে থাকি। এ ছাড়াও পেঁয়াজে অনেক ঔষধি গুণ রয়েছে। দেশের চাহিদার তুলনায় এ ফসলের উৎপাদন নিতান্তই কম। উৎপাদন কম হওয়ার জন্য রোগবালাই একটি প্রধান কারণ। পেঁয়াজে পার্পল ব্লচ, কাণ্ড পচা, স্মাট, গুদামজাত ইত্যাদি রোগ দেখা যায়। এই রোগসমূহ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে ফলন অনেকাংশে বৃদ্ধি পাবে। তাই পেঁয়াজের কয়েকটি মারাত্মক রোগের লক্ষণ, কারণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

পার্পল ব্লচ/বেগুনী দাগ রোগ (Purple Blotch)

রোগের জীবাণু : *Alternaria porri* (বীজবাহিত)

আক্রমণের সময় : চারা অবস্থা হতে বীজ সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত

রোগের উপযোগী আবহাওয়া

- জমিতে অত্যাধিক আগাছা থাকা
- অধিক তাপমাত্রা ২৮-৩০° সে. ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০-৯০%
- পেঁয়াজের পাতা অধিক সময় পর্যন্ত ভেজা থাকা

রোগের লক্ষণ

- প্রথমে পাতা ও বীজবাহী কাণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি ভেজা বাদামী বা হলুদ রঙের দাগ সৃষ্টি হয়।
- দাগগুলি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে বড় দাগে পরিণত হয়।
- দাগের মধ্যবর্তী অংশ প্রথমে লালচে বাদামী ও পরবর্তীতে কালো বর্ণ ধারণ করে এবং দাগের কিনারা বেগুনী বর্ণ ধারণ করে।
- আক্রান্তপাতা উপরের দিক হতে ক্রমান্বয়ে মরে যেতে থাকে। ব্যাপকভাবে আক্রান্ত পাতা ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে হলদে হয়ে মরে যায়।
- বীজবাহী কাণ্ডের গোড়ায় আক্রান্ত স্থানের দাগ বৃদ্ধি পেয়ে হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে।
- এ রোগের আক্রমণের ফলে বীজ অপুষ্ট হয় এবং ফলন হ্রাস পায়।

পার্পল ব্লচ/বেগুনী দাগ রোগে আক্রান্ত পেঁয়াজ গাছ

প্রতিকার

- সুস্থ, নীরোগ বীজ ও চারা ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রান্তগাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোভরাল বা প্রোভেক্স-২০০ নামক ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজের সাথে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম রোভরাল/২ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড/২ গ্রাম মেনকোজেব মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার গাছে স্প্রে করতে হবে। বীজ পেঁয়াজের ক্ষেত্রে একই ছত্রাকনাশক একই পরিমাণে ১০-১২ দিন পর পর ৫-৬ বার স্প্রে করতে হবে।

আইরিশ ইয়েলো স্পট

রোগের জীবাণু: Iris Yeccow Spot Virus এর আক্রমণে এই রোগ হয়। Thrips এই রোগের বাহক।

রোগের লক্ষণ

- থ্রিপ্‌স এর আক্রমণের কারণে পাতা সাদা ফ্যাকাশে হতে পারে ।
- আক্রান্ত পাতার বৃদ্ধি হ্রাস পায় ও আক্রান্ত স্থান হীরার মতো বা চোখের মতো দেখতে মনে হয়।
- আক্রান্ত স্থানের মাঝের অংশ সাদা ও চতুর্দিকে ক্লোরোটিক/ হালকা সবুজ হতে পারে ।
- অত্যাধিক আক্রান্ত পাতা গুলো দেখতে ধুসর রঙের মতো লাগে ও অবশেষে পাতা উপর হতে নিচের দিকে মারা যায়।

প্রতিকার

- মাটিতে পরিমাণমতো আর্দ্রতা রাখা দরকার।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে থ্রিপস এর সংখ্যা বৃদ্ধির পেতে থাকে ফলে রোগের আক্রমণ বেশি হয়। এজন্য থ্রিপ্‌সকে দমন করার জন্য কীটনাশক (ইমিডক্লোরোপিড গ্রুপের যেমন : এডমায়ার, গেইন, ইমিটাফ, কনফিডর @০.০৫%) ৭-১০ দিন পর পর ৩-৪ বার (কন্দ উৎপাদনের জন্য)/ ৪-৫ বার (পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের জন্য) স্প্রে করতে হবে।

আইরিশ ইয়েলো স্পট রোগে আক্রান্ত পেঁয়াজ গাছ

পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ/বেগুনী দাগ রোগ ও আইরিশ ইয়েলো স্পট রোগের মধ্যে পার্থক্য: অনেক সময় পেঁয়াজের পার্পল ব্লচ/বেগুনী দাগ রোগ ও আইরিশ ইয়েলো স্পট রোগ সনাক্তকরণে সমস্যা হয়ে পড়ে। দুটি রোগের সনাক্তকরণ লক্ষণ প্রায় কাছাকাছি। নিম্নে রোগ দুটির সনাক্তকরণের পার্থক্য নিম্নরূপ:

পেয়াজের পার্পল ব্লচ/বেগুনী দাগ রোগ	আইরিশ ইয়েলো স্পট রোগ
দাগের মধ্যবর্তী অংশ প্রথমে লালচে বাদামী ও পরবর্তীতে কালো বর্ণ ধারণ করে এবং দাগের কিনারা বেগুনী বর্ণ ধারণ করে।	আক্রান্ত লেসনগুলোর মাঝের অংশ সাদা, চতুর্দিকে ক্লোরোটিক/ হালকা সবুজ হতে পারে ও এর পরের অংশ হালকা সাদা বর্ণের হয়। কখনো বেগুনী বর্ণ থাকবে না।
দাগগুলো চোখ আকৃতির হয় হয় না।	দাগগুলো চোখ আকৃতির হয় ।

স্টেমফাইলিয়াম লিফ ব্লাইট (Stemphylium leaf blight)

রোগের জীবাণু: *Stemphylium sp.* নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়।

পেঁয়াজের আক্রান্ত অংশ: পাতা, কাণ্ড, ফুলকা ও বীজ

আক্রমণের সময়: চারা অবস্থা হতে বীজ সংগ্রহের পূর্ব পর্যন্ত

রোগের উপযোগী আবহাওয়া

- জমিতে অত্যাধিক আগাছা থাকা
- অধিক তাপমাত্রা ২৮-৩০° সে ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০-৯০%
- পেঁয়াজের পাতা অধিক সময় পর্যন্ত ভেজা থাকা

রোগের লক্ষণ

- প্রথমে পাতা ও পাতার কিনারায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানি ভেজা হালকা বাদামী বা হলুদ রঙের দাগ সৃষ্টি হয়।
- দাগগুলি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে বড় দাগে পরিণত হয় ও পাতাকে পুড়িয়ে ফেলে।
- দাগের মধ্যবর্তী অংশ প্রথমে লালচে বাদামী এবং পরবর্তীতে কালো বর্ণ ধারণ করে ।
- আক্রান্তপাতা উপরের দিক হতে ক্রমান্বয়ে কালো হয়ে মরে যেতে থাকে এবং পাতার উপরের অংশে ছত্রাকের ফ্রুটিং বডি দেখা যাবে ।
- এ রোগের আক্রমণের ফলে বীজ অপুষ্ট হয় এবং ফলন হ্রাস পায়।

স্টেমফাইলিয়াম লিফ ব্লালাইট রোগে আক্রান্ত পেঁয়াজ গাছ ও পুস্পমুঞ্জরি

প্রতিকার

- সুস্থ, নীরোগ বীজ ও চারা ব্যবহার করতে হবে ও আক্রান্তগাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোভরাল বা প্রোভেক্স নামক ছত্রাক নাশক প্রতি কেজি বীজের সাথে ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম মেনকোজেব/২ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড/২ গ্রাম রোভরাল মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার গাছে স্প্রে করতে হবে। বীজ পেঁয়াজের ক্ষেত্রে একই ছত্রাকনাশক একই পরিমাণে ১০-১২ দিন পর পর ৫-৬ বার স্প্রে করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানির সাথে এমিস্টারটপ ১ মিলি/ তারেদ ০.৭৫ মিলি/ প্রোটেক ২ মিলি ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।

পেঁয়াজ পচা (Bulb Rot)

রোগের জীবাণু: স্কেলেরোসিয়াম রলফ্ছি (*Sclerotium rolfsii*) /ফিউজেরিয়াম (*Fusarium* sp.)/বটরাইটিশ (*Botrytis* sp.) নামকছত্রাক (মাটি বাহিত) দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে ।

স্কেলেরোসিয়াম ও ফিউজেরিয়াম দ্বারা আক্রান্তগাছের মধ্যে পার্থক্য:

স্কেলেরোসিয়াম দ্বারা আক্রান্ত গাছ	ফিউজেরিয়াম দ্বারা আক্রান্ত গাছ
Scheroliam selfies দ্বারা আক্রান্তগাছ হাত দিয়ে টান দিলে পেঁয়াজসহ খুব সহজেই মাটি থেকে উঠে আসে।	(Fusarium oxysporum f. sp. cepae) দ্বারা আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং টান দিলে সহজেই উঠে আসে না।
আক্রান্তস্থানে সরিষার দানার মতো বাদামী রঙের গোলাকার ছত্রাক জীবাণু স্কেলেরোসিয়া দেখা যায়।	আক্রান্তস্থানে সরিষার দানার মতো বাদামী রঙের গোলাকার ছত্রাক জীবাণু স্কেলেরোসিয়া দেখা যায় না।

পেঁয়াজ পচা/Bulb Rot

প্রতিকার

- সুস্থ ও রোগমুক্ত বীজ ও চারা রোপণ করতে হবে।
- আক্রান্তগাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- পানি নিষ্কাশনের জন্য ভাল ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন
- রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রোভেক্স-২০০/নোইন বা অটোস্টিন / রোভরাল প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম মিশিয়ে গাছের গোড়ায় ৭-১০ দিন পর পর ২- ৩ বার প্রয়োগ করতে হবে।

রোগের নাম: কাণ্ড ও কন্দ কৃমি (Stem and bulb Nematode)

রোগের জীবাণু: *Ditylenchus dipsaci* নামক নেমাটোডের (মাটি বাহিত) আক্রমণে পেঁয়াজের এই রোগ হয় ।

রোগের বিস্তার: মাটি, পানি ও কৃষি যন্ত্রপাতির মাধ্যমে ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ

- কচি চারার বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, রং ফ্যাকাশে হয় এবং বীজপত্র ফুলে উঠে ।
- পাতায় হালকা হলুদ-বাদামী বর্ণের স্পট দেখতে পাওয়া যায়, পাতা খাটো ও পুরুত্ব বিশিষ্ট হয় এবং কাণ্ড মোটা হয়।
- আক্রান্ত পেঁয়াজের চামড়া নরম, হালকা ধূসর রঙের হয় ও পেঁয়াজের বাল্বের ওজন কম হয়।
- ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ হয় ফলে নোংরা ও পচা গন্ধ পাওয়া যায়।

চিত্র : কৃমি আক্রান্ত পেঁয়াজ গাছ

প্রতিকার

- পেঁয়াজ রোপণ/বপনের পূর্বে কমপক্ষে ২০-২৫ দিন পূর্বে বিঘা প্রতি ৩০০-৩২৫ কেজি মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করতে হবে।
- পেঁয়াজ রোপণ/বপনের পূর্বে শেষ চাষের সময় বিঘা প্রতি ৪-৪.৫ কেজি ফুরাডান ৫ জি মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

এস্টার ইয়েলো

রোগের জীবাণু: AsterYellows Phytoplasma এস্টার ইয়েলো রোগের প্রধান কারণ। এস্টার ইয়েলো হপার এই জীবাণু বহন করে। রোগের উপযোগী আবহাওয়া জমিতে অত্যাধিক পরিমাণে আগাছা থাকা ও সাথী বা আন্তঃ ফসল হিসেবে থ্রিপস আকর্ষণীয় (Thrips attractive crop) ফসল চাষ করা।

রোগের লক্ষণ

- কন্দ ফসলে নতুন পাতার গোড়ায় হলুদ ও সবুজ স্ট্রিক দেখতে পাওয়া যাবে।
- পাতাগুলো সমান্তরাল হয়ে পেঁচিয়ে থাকে।
- অত্যন্ত আক্রান্ত আম্বেলগুলি ফেটে যেতে পারে।

প্রতিকার

- জীবাণুমুক্ত পেয়াজের বাল্ব ও চারা বপণ করা ও ফসলকে আগাছামুক্ত রাখা।
- সাথী বা আন্তঃফসল হিসেবে কোন থ্রিপ্স আকর্ষণীয় (Thrips attractive crop) ফসল চাষ না করা ।
- আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি লিটার পানির সাথে সাকসেস/জাদিদ/ এডমায়ার/ইমিটাফ/ট্রেসার ০.৫ মিলি মিশিয়ে বিকালে (৫.০০ টার পর) ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

এস্টার ইয়েলো রোগে আক্রান্ত পেঁয়াজ গাছ

পেঁয়াজের গুদামজাত রোগ

সচরাচর গুদামজাত অবস্থায় পেঁয়াজের পচন দেখা যায়। এগুলো হলো নরম পচন (*Erwinia* sp.) কালো পচন (*Aspergillus niger*), শুকনা পচন (*Fusarium* sp.) রোগ।

রোগের লক্ষণ

- নরম পচা রোগ হলে পেঁয়াজ পচে খুব নরম হয় এবং পেঁয়াজ হতে দুর্গন্ধ পাওয়া যায়।
- কালো পচা রোগ হলে পেঁয়াজের খোসা বা কেমড়ার উপরে কালো পাউডারের মতো স্পোস দেখতে পাওয়া যাবে।
- কালো রং এর স্পোর গুলো মাঝে মাঝে ভিতরে ও দেখতে পাওয়া যায়।

পেঁয়াজের গুদামজাত রোগ

পেঁয়াজের পোকা-মাকড় ব্যবস্থাপনা

থ্রিপস্

আক্রান্ত হওয়ার পর্যায়- সাধারণত কচি চারা গাছ ও চারা রোপণের ১০-৩০ দিনের মধ্যে এই পোকা পেঁয়াজ গাছকে আক্রমণ করে।

- ক্ষতির ধরন- থ্রিপস্ আক্রমণে ৫০% পযন্ত ফসলের ক্ষতি হতে পারে। আক্রান্ত পাতায় প্রথমে দাগ পড়ে , পরবর্তীতে হালকা সাদা বর্ণ ধারণ করে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বীজ উৎপাদন বাধাগ্রস্থ হয় ও বীজের সজীবতা নষ্ট হয়। সাধারণত জানুয়ারি-এপ্রিল মাসে এদের আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়।

থ্রিপস্ আক্রান্ত গাছ

দমন ব্যবস্থা

- আঠালো সাদা ফাঁদ (প্রতি হেক্টরে ৪০টি) ব্যবহার করে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা।
- আধা ভাঙ্গা নিম বীজের (৫০ গ্রাম এক লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভেজানোর পর মিশ্রনটি ছাঁকতে হবে) নির্যাস আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করে এই পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- আন্তঃফসল হিসাবে পেঁয়াজের সঙ্গে গাজর (রেপিলেন্ট ক্রপ) চাষ করে।
- আক্রমণ বেশি হলে ফিপ্রোনিল (রিজেন্ট/এসেন্ড/গুলি/অন্য নামের) বা ডাইমেথয়েট (বিস্টারথোয়েট/টাফগর/অন্য নামে) ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে বা সাকসেস ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলি হারে স্প্রে করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- চারা রোপণের ১০-৩০ দিনের মধ্যে তিন বার ১০ দিন অন্তর অন্তর এই পোকা দমনের জন্য প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ মিলি এ্যাডমায়ার/টিডো/গেইন ঔষধ প্রতি ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হয়।

এফিড বা জাব পোকা

- আক্রান্ত হওয়ার পর্যায়- পেঁয়াজ গাছের কচি ও বয়স্ক পাতায় আক্রমণ করে।
- ক্ষতির ধরন- জাব পোকা দলবদ্ধভাবে পেঁয়াজ পাতার রস চুষে খায়, ফলে গাছ দুর্বল ও হলুদাভ হয়ে যায়। জাব পোকার মলদার দিয়ে যে তরল পদার্থ বের হয় তাকে হানি ডিউ বলে যা পাতায় আটকে গেলে সুটি মোল্ড নামক কালো ছত্রাক জন্মায়। ফলে গাছের সবুজ অংশে সালোকসংশ্লেষণ ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।

দমন ব্যবস্থা

- আঠালো হলুদ ফাঁদ (প্রতি হেক্টরে ৪০টি) ব্যবহার করে।
- আধা ভাঙ্গা নিম বীজের (৫০ গ্রাম এক লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভেজানোর পর মিশ্রণটি ছাঁকতে হবে) নির্যাস আক্রান্তগাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করে এই পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বন্ধু পোকাসমূহ (লেডীবার্ড বিটলের পূর্ণাঙ্গ ও কীড়া এবং সিরফিড ফ্লাই) প্রকৃতিতে লালন।
- আক্রমণ বেশি হলে স্বল্পমেয়াদী বিষক্রিয়ার ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি (ফাইফানন/সাইফানন/অন্য নামের) ১০ মিলি অথবা কুইনালফস ২৫ ইসি (করলার/একালার/কিনালার/অন্য নামের) বা ডাইমেথয়েট (বিস্টারথোয়েট/টাফগর/অন্য নামে) বা কেরাতে ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে বা সাকসেস ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলি হারে স্প্রে করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

আম্বেল ছিদ্রকারী পোকা

- আক্রান্ত হওয়ার পর্যায়- সাধারণত পেঁয়াজের ফুল ফোটার সময়।
- ক্ষতির ধরন- পেঁয়াজের ফুল ফোটার সময় এরা আম্বেল-এর উপরের অংশে আক্রমণ করে ও ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে এবং আম্বেল-এর ভিতরের অংশ খেতে থাকে। ছিদ্র করার কারণে পেঁয়াজের ফুল নেতিয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে শুকিয়ে যায়।

দমন ব্যবস্থা

- শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।
- পোকার দৃশ্যমান বড় কীড়াগুলোকে হাত বাছায় এর মাধ্যমে সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
- জমিতে পোকা খাদক পাখি যেমন শালিক, ফিঙ্গে এসবের বসার সুবিধার জন্য ডালপালা পুতে দিতে হবে । এ পাখি কীড়াগুলোকে খেয়ে পোকার সংখ্যা করাতে সাহায্য করে।
- গাছে ফুল আসতে শুরু করলে আম্বেল ছেদক পোকার ডিম ধ্বংসকারী পরজীবী বা কীড়া ধ্বংসকারী পরজীবী ক্ষেতের মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে ছেড়ে পোকার সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে।
- পেঁয়াজের সাথে বিভিন্ন ফসল যেমন- ধনিয়া, তিসি, সরিষা, কুসুমফুল আন্তঃফসল হিসাবে চাষ করলে আম্বেল ছেদক পোকার আক্রমণ উল্লেখযোগ্যভাবে করে যায়।
- আক্রমণ তীব্র হলে কুইনালফস ২৫ ইসি (দেবীকুইন/কিনালার/করলার) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে বা সাকসেস ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলি হারে স্প্রে করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

পাতা পেঁয়াজ

বিশ্বে শুধুমাত্র পাতা ব্যবহারের জন্য অনেক প্রজাতির পেঁয়াজের গাছ চাষ করা হয়ে থাকে। তবে বাংলাদেশে পাতা খাওয়ার জন্য Japanese bunching onion (*Allium fistulosum*) নামের প্রজাতিটি চাষ করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যকে রুচিকর সুগন্ধপূর্ণ করার মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য পাতা পেঁয়াজ খাদ্যাদিতে মেশানো হয়। বিভিন্ন প্রকার সুপের স্বাদ বাড়ানোর জন্য ও সালাদ তৈরি করতে এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মূলছাড়া গাছের সমস্ত অংশ (*Tops and long leaf base*) সালাদ বা সবজির সাথে খাওয়া হয়।

পাতা পেঁয়াজের জাত

বারি পাতা পেঁয়াজ-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত বারি পাতা পেঁয়াজ-১ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ সালে অনুমোদিত হয়েছে। এ জাতটির একটি গাছ থেকে অনেকগুলি কুশি (Tiller) উৎপাদন হয়ে থাকে। সাধারণ পেঁয়াজের মত বাল্ব হয় না। বাল্বের স্থানে balanced predostem উৎপন্ন হয়। এর গাছের উচ্চতা ৪৩-৬০ সেমি, প্রতিটি গাছ ৬-৮টি কুশি উৎপাদন করে যার প্রতিটিতে ১০-১২টি আকর্ষণীয় গাঢ় সবুজ রঙের পাতা থাকে। পাতা ব্যাস ১.৬-১.৮ সেমি হয়ে থাকে। এ জাতটি একবার রোপণ করে নভেম্বর পর্যন্ত ৩-৪ বার পাতা সংগ্রহ করা যায়। বারি পাতা পেঁয়াজ-১ এর হেক্টরপ্রতি পাতার ফলন ১৪-১৫ টন এবং বীজের ফলন ৮০০-১,০০০ কেজি। এদেশের আবহাওয়ায় ভালভাবে খাপ খাওয়ানো এ জাতটিতে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের উপদ্রব নাই।

মাঠে পাতা পেঁয়াজ (বামে) ও সংগ্রহকৃত পাতা পেঁয়াজ (ডানে)

উৎপাদন পদ্ধতি

আবহাওয়া ও মাটি: পাতা পেঁয়াজ ঠাণ্ডা ও গরম উভয় তাপমাত্রায় জন্মাতে পারে। তবে ঠাণ্ডা থেকে মধ্যম তাপমাত্রা বিরাজমান দেশেই বেশি ভাল হয়ে থাকে। পাতা পেঁয়াজ সকল ধরনের মাটিতে জন্মে থাকে তবে বেলে-দোআঁশ ও পলি-দোআঁশ মাটিতে ভাল ফলন দিয়ে থাকে। মাটি pH ৫.৮-৬.৫ থাকা ভাল। মাটিতে প্রচুর পরিমাণে জৈব পদার্থ থাকা ভাল। পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা বাঞ্চনীয়।

বংশ বিস্তার: বীজ বা কুশি (tiller) এর মাধ্যমে বংশ বিস্তার হয়। তবে বীজের মাধ্যমেই বেশি হয়ে থাকে। প্রতি হেক্টর জমির জন্য ৫-৬ কেজি বীজের প্রয়োজন।

বীজ বপন ও চারা উত্তোলন: জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসে বীজতলায় বীজ বপন করা হয়। বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে পরে ১২ ঘণ্টা শুকনা ন্যাকড়া করে বেধে রেখে দিলে বীজের অঙ্কুর বাহির হয়। বীজতলায় পচা গোবর সার দিয়ে ঝুরঝুরে করে তৈরি করা হয়। বিভিন্ন ধরনের পোকা ও কৃমি দমনের জন্য বীজতলায় ফুরাডান ব্যবহার করাই ভাল। পরে বীজতলায় বীজ বপন করে হাত দিয়ে বীজতলায় চাপ দিতে হয়। বীজতলায় আগাছা নিড়ানো সহ অন্যান্য পরিচর্যা করা হয়। চারা উত্তোলন করতে ৪৫-৫০ দিন সময় লাগে।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: জমিতে ৩-৪টি চাষ মই দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হয়। চাষের আগে প্রয়োজনীয় পরিমাণ পচা গোবর সার দিতে হয়। চারা ১৫ × ১০ সেমি দূরত্ব বজায় রেখে রোপণ করা হয়। চারা একটু গভীরে লাগানো ভাল। মাঝে মাঝে পেঁয়াজের গোড়ার মাটি তুলে দিতে হয়।

সার প্রয়োগ: পাতা পেঁয়াজের জীবনকাল দীর্ঘ (১৫০-১৬৫) দিন। সেজন্য সারের প্রয়োজন অনেক বেশি। হেক্টরপ্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি:

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষে	পরবর্তী পরিচর্যা হিসেবে প্রয়োগ		
			১ম	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
গোবর	১০ টন	সব	-	-	-
টিএসপি	২৭৫ কেজি	সব	-	-	-
এমওপি	১৫০ কেজি	৫০	৩৪	৩৩	৩৩ কেজি
ইউরিয়া	২৫০ কেজি	৭০	৬০	৬০	৬০ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি	সব	-	-	-
জিংক অক্সাইড	৩ কেজি	সব	-	-	-
বোরিক এসিড	৫ কেজি	সব	-	-	-

জমিতে শেষ চাষের পূর্বে সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক ও বোরন সার ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। এরপর ইউরিয়া ও এমপি সার যথাক্রমে শেষ চাষে, প্রথম কিস্তি গাছের বয়স ২৫-৩০ দিন, ২য়

কিস্তির গাছের বয়স ৫০-৫৫ দিন এবং ৩য় কিস্তি গাছের বয়স ৭০-৭৫ দিন হলে উপরের ছকে উল্লেখিত পরিমাণমতো সার প্রয়োগ করতে হবে।

আগাছা নিড়ানো ও পানি সেচ: আগাছা দেখা দিলে নিড়ানী দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। আগাছা নিড়ানো ও গোড়ায় মাটি দেওয়া ৩-৪ বার প্রয়োজন হতে পারে। সার প্রয়োগের পরপর বা অন্য কোন সময় পানি দরকার হলে জমিতে সেচ দিতে হবে। জমিতে অতিরিক্ত পানি জমতে দেওয়া যাবে না।

রোগ বালাই দমন: পাতা পেঁয়াজ পার্পল ব্লচ ও অন্যান্য ব্লাইট রোগের প্রতিরোধী। তবে কোন রোগ দেখা দিলে রিডোমিল গোল্ড/ডায়থেন এম-৪৫/রোভরাল এর যে কোন একটি বা একাধিক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ২-৩ বার ১৫ দিন পরপর স্প্রে করা যেতে পারে। থ্রিপ্‌স পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। আগাছা পরিষ্কার, আবর্জনা আগুনে পোড়া, শস্য আবর্তন করা উত্তম। পোকা দমনের জন্য সর্বশেষে ম্যালাথিয়ন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন: পাতা পেঁয়াজ সংগ্রহকালীন সময় মাটির উপরের সম্পূর্ণ অংশ সবুজ ও সতেজ থাকতে হবে। বাজারজাত করার জন্য হাত দিয়ে সমস্ত গাছটি টেনে তুলতে হয়। তুলে মূল কেটে পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। ২০-২৫ দিন পরপর মাটির উপরের অংশ কেটে খাওয়া যায়। পাতা পেঁয়াজ সংগ্রহের সাথে সাথেই বাজার জাত করা উচিত। ছোট ছোট আটি বেধে বাজারে বিক্রয় করা যায়। মূল ব্যতীত সমস্ত গাছের ওজন হেক্টরপ্রতি ২০-২৫ টন যার মধ্যে খাদ্যোপযোগী পাতা ১০-১২ টন থাকে।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ: বীজ যখনই বপন করা হউক না কেন ডিসেম্বর মাসে পাতা পেঁয়াজের ফুল আসে। ফুল আসার সময় হেক্টর প্রতি অতিরিক্ত ১০০ কেজি করে ইউরিয়া এবং পটাস সার প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত জুন-জুলাই মাসে বীজ মাড়াই করা যায়। সকল আম্বেলের বীজ একসাথে পরিপক্ক হয় না। তাই কয়েক দিন পরপর পরিপক্ক আম্বেল সংগ্রহ করা হয়। একটি আম্বেলের মধ্যে শতকরা ১৫-২০টি ফল ফেটে কালো বীজ দেখা গেলে আম্বেলটি কেটে বা ভেঙ্গে সংগ্রহ করতে হবে। এভাবে মাঠে ঘুরে ঘুরে আম্বেল সংগ্রহ করতে হবে। মাঠে সমস্ত আম্বেল সংগ্রহ করতে ৩-৪ দিন লাগতে পারে। বীজ আম্বেল সংগ্রহ করার পর রোদে শুকিয়ে হালকা লাঠি দ্বারা পিটিয়ে বীজ বাহির করতে হবে। পরে বীজ রোদে ভালভাবে শুকিয়ে ছিদ্রবিহীন পলিথিন বা টিনের পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। হেক্টরপ্রতি ১,০০০-১,২০০ কেজি বীজ উৎপাদন হয়ে থাকে।

পাতা পেঁয়াজের কুশি (বামে) ও মাঠে বীজ উৎপাদন (ডানে)

মরিচ

মরিচ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। আমাদের দেশে মূলত মরিচ মসলা ফসল হিসেবে পরিচিত। কাঁচা ও পাকা উভয় অবস্থাতেই এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। পুষ্টিমানে কাঁচা মরিচ ভিটামিন এ ও সি সমৃদ্ধ। দৈনন্দিন রান্নায় রং, রুচি ও স্বাদে ভিন্নতা আনার জন্য মরিচ একটি অপরিহার্য উপাদান। আমাদের দেশে সাধারণত মরিচ ছাড়া কোন তরকারি রান্না চিন্তা করা হয় না। এছাড়া বিভিন্ন খাবারের স্বাদ বাড়ানোর জন্য মরিচের সসের অনেক চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া এর ঔষধি গুণাগুণও রয়েছে। আমাদের দেশে মরিচের চাহিদা ২.৯৫ লাখ মেট্রিক টন কিন্তু উৎপাদন হয় ২.৭৩ লাখ মেট্রিক টন।

মরিচের জাত

বারি মরিচ-১

মরিচের এ জাতটি ২০০১ সালে অবমুক্ত হয়। জাতটির গাছ খাটো, ঝোপালো, উচ্চতা ৩০-৩৫ সেমি এবং পার্শ্ব বিস্তৃতিতে ৫৫-৬০ সেমি।

প্রতি গাছে ৪০০-৫০০টি মরিচ ধরে। মরিচের ত্বক পুরু। গাছপ্রতি ৭০০-৭৫০ গ্রাম কাঁচা মরিচ পাওয়া যায়। কাঁচা এবং পাকা মরিচের ঝাল সহনীয়। জাতটি সারা বছর চাষোপযোগী। হেক্টরপ্রতি ফলন ১০-১২ টন কাঁচা মরিচ এবং ২.৫-৩ টন শুকনা মরিচ।

এছাড়া দেশের স্থানীয় জাতগুলোর মধ্যে শেরপুরের বালুঝরি, মানিকগঞ্জের বিন্দু, কুমিলার ইরি মরিচ, মিঠা মরিচ, বালুঝুরি, নরসিংদীর বাওয়া, বালিঝুরি মরিচ, পাবনার হলেন্দার, বিন্দু মরিচ, কুষ্টিয়ার গোলমরিচ, আলমডাঙ্গা মরিচ, মাগুরার টেঙ্গাখালি, জামালপুরি, মাঠউবদা (মোটা জাত, কালোজাত, সাদা জাত) মরিচ, বগুড়ার তরনি, নয় মাইল, ঝালশুকা এবং বগুড়া দীঘলা উল্লেখযোগ্য।

বারি মরিচ-১

বারি মরিচ-২

বাংলাদেশে রবি ও খরিফ-১ মৌসুমে মরিচ সহজলভ্য হলেও খরিফ-২ (জুলাই-অক্টোবর) মৌসুমে বাজারে মরিচের স্বল্পতা ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই এই সময়ে মরিচের দাম বেশি থাকে। বর্ষা ও শীত মৌসুমের পূর্বে এই সময়টিতে মরিচের উৎপাদন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক মসলা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণের নিরলস প্রচেষ্টায় ৭টি মরিচের জার্মপ্লাজম কেন্দ্রের গবেষণা মাঠে ৫-৬ বছর যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে C0445 জার্মপ্লাজমটি নির্বাচন করা হয় এবং মসলা গবেষণা কেন্দ্রের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও উপকেন্দ্রে দুই বছর পরীক্ষণের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। পরবর্তীতে এটি বারি মরিচ-২ নামে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ সালে মুক্তায়িত হয়। জাতটি দেশে কাঁচা মরিচের মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে।

বারি মরিচ-২

এটি একটি গ্রীষ্মকালীন জাতের মরিচ। গাছ লম্বা ও ঝোপালো। উচ্চতা ৮০-১১০ সেমি, গাছের পাতার রং হালকা সবুজ। গাছে প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৭টি, প্রতি গাছে মরিচের সংখ্যা গড়ে ৪৫০-৫০০টি (গড়ে ওজন ১১০০ গ্রাম)। প্রতিটি মরিচের ফলের দৈর্ঘ্য ৭.০-৭.৫ ও প্রস্থ ০.৭-১.০ সেমি, ওজন গড়ে ২.৫ গ্রাম। জাতটির ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৪.৫ গ্রাম। এই জাতের মরিচের ত্বক পুরু। কাঁচা অবস্থায় মরিচের রং হালকা সবুজ এবং পাকা অবস্থায় লাল রঙের হয়ে থাকে। কাঁচা মরিচ সংগ্রহের পর ৫-৭ দিন পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যবহার উপযোগী থাকে। এ জাতের মরিচের জীবনকাল প্রায় ২৪০ দিন (মার্চ-অক্টোবর)। হেক্টরপ্রতি ফলন ২০-২২ টন (সবুজ অবস্থায়)।

আধুনিক পদ্ধতিতে বারি মরিচ-২ এর উৎপাদন কলাকৌশল

চাষের মৌসুম: আগেই বলা হয়েছে এটি একটি গ্রীষ্মকালীন জাতের মরিচ। মার্চ- এপ্রিল মাসে (মধ্য চৈত্র থেকে মধ্য বৈশাখ) জমিতে এ মরিচের চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। মে মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত এ জাতের মরিচের চারা জমিতে রোপণ করা যেতে পারে।

চারা উৎপাদন পদ্ধতি: বারি মরিচ-২ এর চারা উৎপাদন করে মূল জমিতে রোপণ করা হয়। এ জন্য মার্চ মাসে বীজ তলায় বীজ বপন করতে হবে। চারার গুণাগুণ ফলনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। একারণে উত্তম চারা উৎপাদনে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি যেখানে পানি মোটেও দাঁড়ায় না, যথেষ্ট আলো বাতাস পায়, নিকটে পানি সেচের উৎস রয়েছে এবং আশে পাশে সোলানেসী পরিবারের কোন উদ্ভিদ নাই এরূপ জমি বীজতলা তৈরির জন্য উত্তম।

প্রতিটি বীজ তলার আকৃতি ৩মি × ১মি হওয়া বাঞ্চনীয়। এ ধরনের প্রতিটি বীজ তলায় ১৫ গ্রাম হারে বীজ সারিতে বপন করতে হবে। ভাল চারার জন্য প্রথমে বীজতলার মাটিতে প্রয়োজনীয় কম্পোস্ট সার এবং কাঠের ছাই মিশিয়ে ঝুরঝুরা করে নিতে হয়। বীজ বপনের ৫-৬ ঘণ্টা পূর্বে প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম হারে প্রোভেক্স বা অটোস্টিন মিশিয়ে শোধন করে নিতে হবে। শোধিত বীজ তৈরিকৃত বীজতলায় ৪-৫ সেমি দূরে দূরে সারি করে ১ সেমি গভীরে সরু দাগ টেনে ঘন করে বপন করতে হয়। বীজ বপনের পর বীজ তলায় যাতে পোকামাকড় চারা ক্ষতিগ্রস্ত না করতে পারে, সেজন্য প্রতি লিটার পানিতে

২ গ্রাম হারে সেভিন পাউডার মিশিয়ে মাটিতে স্প্রে করতে হবে। অতিবৃষ্টি বা খরা থেকে চারা রক্ষা করার জন্য বাঁশের চাটাই, পলিথিন বা নেট দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিতে হবে। বাঁশের চাটাই বা পলিথিন সকাল, বিকাল বা রাতে সরিয়ে দিতে হবে। নেট ব্যবহারে বিভিন্ন শোষক পোকা চারাকে আক্রমণ করতে পারে না এবং নেটের উপর দিয়ে হালকা সেচ দিলে চারা ভাল থাকে। ৫-৭ দিনের মধ্যে বীজ গজায়। চারা ৩-৪ সেমি হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা পাতলা করা হয়। খাটো, মোটা কাণ্ড ও ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট ৩০-৩৫ দিন বয়সের উৎকৃষ্ট চারা মূল জমিতে রোপণ করার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়।

জমি প্রস্তুত ও বেড তৈরি: মরিচের জমিতে ৪-৫টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে গভীরভাবে চাষ করে মাটি ঝুরঝুরা করে নিতে হবে। জমি থেকে আগাছা ও পূর্ববর্তী ফসলের আবর্জনা ইত্যাদি সরিয়ে ফেলতে হবে। চারা রোপণের জন্য ১.২ মি. প্রস্থ বিশিষ্ট প্রয়োজন মতো লম্বা ৩০ সেমি উচ্চতার বেড তৈরি করতে হবে। পানি সেচ নিষ্কাশনের জন্য দুই বেডের মাঝে ৪০-৫০ সেমি প্রশস্ত নালা রাখতে হবে।

বীজ হার ও রোপণ দূরত্ব: বারি মরিচ-২ এর চারা তৈরির জন্য হেক্টরপ্রতি ৫০০-৮০০ গ্রাম বীজ দরকার হয়। সঠিক সারি ও রোপণ দূরত্ব অবলম্বন করা হলে বিভিন্ন অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব। সারি থেকে সারি ৬০ সেমি ও গাছ থেকে গাছ ৫০ সেমি দূরত্বে চারা রোপণ করতে হবে। এভাবে রোপণ করলে হেক্টরপ্রতি প্রায় ৩৩,৩৩৩টি গাছ পাওয়া যাবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: মাটির প্রকৃতি, উর্বরতা ইত্যাদির উপর নির্ভর করে সারের মাত্রা ভিন্ন হয়। বারি মরিচ-২ এর জন্য হেক্টরপ্রতি কম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের পরিমাণ নিম্নের ছকে দেয়া হলো:

সারের নাম	হেক্টর প্রতি পরিমাণ	শেষ চাষের সময়	কিস্তিতে সার প্রয়োগ (কেজি)		
			১ম	২য়	৩য়
কম্পোস্ট	৫ টন	সব	-	-	-
ইউরিয়া	২১০ কেজি	-	৭০	৭০	৭০
টিএসপি	৩৩০ কেজি	সব	-	-	-
এমওপি	২০০ কেজি	৬৫ কেজি	৪৫	৪৫	৪৫
জিপসাম	১১০ কেজি	সব	-	-	-

শেষ চাষের সময় কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম এমওপি সার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। তারপর চারা রোপণের ২৫, ৫০ ও ৭০ দিন পর পর্যায়ক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় কিস্তিতে ইউরিয়া ও এমপি সার ছকে উল্লেখিত পরিমাণে পার্শ্ব প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

সেচ: চারা রোপণ করার পর অবস্থা বুঝে হালকা সেচ প্রয়োগ করতে হবে, যাতে চারা সতেজ থাকে এবং মাটিতে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে। যেহেতু বারির এ জাতটি, খরিফ-২ মৌসুমে চাষ হয়, তাই অন্যান্য মরিচের মত বেশি সেচ প্রয়োজন হয় না। তবে অবস্থা ভেদে ৩-৪টি সেচ প্রয়োজন হতে পারে।

আগাছা দমন: আগাছা জমি থকে খাদ্য, আলোবাতাস ও স্থান দখল করে মরিচ গাছকে দুর্বল করে ফেলে। তাছাড়া আগাছা বিভিন্ন রোগ ও পোকা-মাকড়ের আবাসস্থল হিসাবে কাজ করে। এতে ফসল সহজেই রোগ ও পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হয় ও ফলন হ্রাস পায়। তাই মরিচের জমিতে গাছের মধ্যে খাদ্যোপাদান, আলো বাতাস ইত্যাদি বণ্টনের প্রতিযোগিতা মুক্ত রাখার জন্য আগাছা দমন করতে হবে। চারা রোপণের ১৫, ৩০, ৪৫ ও ৬০ দিন পরপর নিড়ানী দিয়ে আগাছা দমন করতে হবে।

মাটি তোলা: ভাল ফসলের জন্য সার প্রয়োগের পর ৩-৪ বার দুই সারির মাঝের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হয়। এতে গাছের গোড়া শক্ত হয় এবং পানি নিষ্কাশনের সুবিধা হয় ।

খুঁটি প্রদান: অধিক উচ্চতা, ফলনের ভার, ঝড় বা অতিবৃষ্টির কারণে গাছ হেলে পড়ে। ফলে মরিচের গুণাগুণ হ্রাস পায়। তাই হেলে পড়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য খুঁটি প্রদান করা হয়। গাছের পাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতে প্লাস্টিকের সুতলী দিয়ে গাছ বেঁধে দিতে হবে।

ফসল ও বীজ সংগ্রহ: চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর মরিচ ফল উত্তোলন করা হয়। বারি মরিচ-২ এর জীবনকাল দীর্ঘ হওয়ায় প্রায় ৮-১০ বার ফসল উত্তোলন করা হয়। উত্তম বীজের জন্য বড়, পুষ্ট ও সম্পূর্ণ পাকা মরিচ নির্বাচন করতে হবে। বর্ষাকালে মরিচ শুকানো খুবই কষ্টকর। এজন্য পাকা মরিচ দুই ফালি করে কেটে বীজ বের করে নিয়ে শুকানো যেতে পারে।

বীজ সংরক্ষণ: মরিচের বীজ বিভিন্ন ধরনের বায়ুরোধী পাত্র, পলিথিন বা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল প্যাকেটে সংরক্ষণ করা যায়। ডাবল পলিথিনের ছোট ছোট প্যাকেটের (২৫০-৫০০ গ্রাম বীজ) মধ্যে ৫-৬ টুকরো শুকনো কাঠ কয়লা রেখে প্যাকেটের খোলামুখ বায়ুরোধী করে বীজ সংরক্ষণ করা যেতে পারে। কাঠকয়লার টুকরা প্যাকেটের বা পাত্রের ভিতরের আর্দ্রতা শোষণ করে নেয়। বীজ সংরক্ষণের জন্য অপেক্ষাকৃত ছোট আকৃতির বায়ুরোধী পাত্র বা পলিথিন প্যাকেট ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত।

দূরবর্তী স্থানে কাচা মরিচ পরিবহনের ক্ষেত্রে ছিদ্রযুক্ত বাঁশের ঝুড়ি এবং চটের ব্যাগ ব্যবহার করলে মরিচ ভাল থাকে। মরিচ শুকানোর পরে ছায়াযুক্ত স্থানে ঠাণ্ডা করে সংরক্ষণ করতে হবে।

বারি মরিচ-৩

সাধারণত পাকা মরিচকে শুকিয়ে শুকনা মরিচ করা হয়। আমাদের দেশে শুকনা মরিচের চাহিদা ব্যাপক। শীতকালে এই মরিচের চাষ করা হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র হতে বারি মরিচ-৩ নামে শীতকালীন একটি জাত উদ্ভাবিত হয়েছে। এটা ক্ষুধাবর্ধক, বায়ুনাশক, হজমকারক ইত্যাদি গুণাবলীসম্পন্ন। প্রায় সব অঞ্চলেই শুকনা এর চাষাবাদ হয়। তবে চরাঞ্চালে শুকনা মরিচের উৎপাদন বেশি হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন চর শুকনা এলাকায় মরিচ প্রধান কৃষি ফসল হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মরিচের চাষ হয়ে থাকে। এক পরিসংখ্যানে জানা যায়, এদেশে রবি মৌসুমে ৭৫,০০০ হেক্টর জমিতে এবং খরিফ মৌসুমে ৭,০০০ হেক্টর জমিতে মরিচের চাষ হয় এবং উৎপাদন যথাক্রমে ৪৫,০০০ টন ও ৪,২০০ টন। বাংলাদেশের অনেক কৃষক শুধুমাত্র মরিচ উৎপাদন করে জীবন নির্বাহ করে থাকে।

বারি মরিচ-৩ এর বৈশিষ্ট্য

বারি মরিচ-৩

- গাছ লম্বা, ঝোপালো ও প্রচুর শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হয়।
- শীতকালে চাষ করা যায়।
- গাছের উচ্চতা ৭০-৮০ সেমি।
- প্রতি গাছে গড়ে পাকা মরিচের সংখ্যা ৬০-৭০টি এবং গড় ফলন ১৮০-২০০ গ্রাম।
- মরিচের রং হালকা সবুজ।
- ১,০০০ বীজের ওজন ৪-৪.৫ গ্রাম।
- জীবনকাল ১৮০-২১০ দিন।
- ফলন ৮-১০ টন/হে. (পাকা মরিচ) ও বীজের ওজন ৪০০-৫০০ কেজি/হেক্টর।
- ৪ কেজি টোপা মরিচ (Red Ripe Chilli) থেকে ১ কেজি শুকনা মরিচ পাওয়া যায়।
- এ জাতটি ২০১৩ সালে অবমুক্তি হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: পানি নিষ্কাশনে সুবিধাযুক্ত বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটিতে মরিচ চাষ করা হয়। তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ উর্বর দোআঁশ মাটি চাষাবাদের জন্য উত্তম। সব মাটিতে মরিচের চাষ করা গেলেও ক্ষারীয় মাটিতে ফলন ভাল হয় না। মাটির পিএইচ ৬.০-৭.০ হলে মরিচের উৎপাদন ভালো হয়। বন্যা বিধৌত পলি এলাকায় মাঝারী ও উঁচু জমি যেখানে বর্ষার পর ভাদ্র (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) মাসে 'জো' আসে সেখানে মরিচ ভালো হয়। মরিচ উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ভাল জন্মে। সাধারণত ২০- ২৫° সে. তাপমাত্রা মরিচ চাষের জন্য উপযোগী। সর্বনিম্ন ১০° সে. এবং সর্বোচ্চ ৩৫° সে. তাপমাত্রায় মরিচের গাছের বৃদ্ধিতে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা যায়। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হলে মরিচ গাছের পাতা ঝরে যায় এবং গাছ পচে যায়। পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল-দোআঁশ মাটিতে মরিচ চাষ করা যায়। তবে জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দোআঁশ বা পলি দোআঁশ মাটি চাষাবাদের জন্য উত্তম। মাটি অতিরিক্ত ভিজা থাকলে ফুল ও ফল ঝরে পরে। মাটির pH ৬.৫-৭.০ হলে মরিচের ফলন ভাল হয়।

বপন/রোপণ সময়: বারি মরিচ-৩ এর জন্য সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত বীজ তলায় বীজ বপন করতে হবে। মূল জমিতে সেপ্টেম্বর মাসে বীজ বপন করতে হবে এবং অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত মূল জমিতে চারা রোপণের উপযুক্ত সময়।

বীজহার ও রোপন পদ্ধতি: বারি মরিচ-৩ এর বীজ ১.০-১.৫ কেজি/হে. সারিতে বপন ও ২.০-৩.০ কেজি/হে. ছিটিয়ে রোপণের জন্য দরকার। প্রতি হেক্টর জমিতে ৪০,০০০ চারা প্রয়োজন।

মরিচের বীজ শোধন: বীজ তলায় বীজ বপনের আগে মরিচের বীজকে শোধন করে নিতে হবে এতে করে চারা অবস্থায় রোগ-বালাই কম হবে।

- অটোস্টিন বা প্রোভেক্স জাতীয় ছত্রাকনাশক দিয়ে বীজ শোধন করা যায়। প্রতি লিটার পানিতে ২.০ গ্রাম অটোস্টিন ও ২.৫ গ্রাম প্রভেক্স-২০০ দ্বারা বীজ শোধন করতে হবে
- বীজ বপনের পূর্বে মরিচ বীজ উপরে উল্লেখিত ছত্রাক নাশক দ্বারা ৩০ (ত্রিশ) মিনিট ভিজিয়ে রেখে ছায়াযুক্ত স্থানে ১০-১৫ মিনিট শুকাতে হবে
- বীজশোধনের কাজে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ও শোধিত বীজ ব্যবহারে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- বীজ শোধনের ফলে বীজ বাহিত রোগ সংক্রমণ থেকে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

বীজ তলা তৈরি: বারি মরিচ ৩-এর চারা উৎপাদন করে মূল জমিতে রোপণ করার ক্ষেত্রে উত্তম চারা উৎপাদনে বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। অপেক্ষাকৃত উঁচু জমি যেখানে পানি দাড়ায় না, যথেষ্ট আলো বাতাস পায়, পানি সেচের উৎস রয়েছে এবং আশে পাশে সোলানেসী পরিবারের কোন উদ্ভিদ নাই এরূপ জমি বীজতলা তৈরির জন্য উত্তম। প্রতিটি বীজ তলার আকৃতি ৩ মি. x ১ মি. হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ ধরনের প্রতিটি বীজ তলায় ১৫ গ্রাম হারে বীজ সারিতে বপন করতে হবে। ভাল চারার জন্য প্রথমে বীজতলার মাটিতে প্রয়োজনীয় কম্পোস্ট সার এবং ছাই মিশিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। শোধিত বীজ তৈরিকৃত বীজতলায় ৪-৫ সেমি দূরে দূরে সারি করে ১ সেমি গভীরে সরু দাগ টেনে ঘন করে বপন করতে হবে।

চারার পরিচর্যা: বীজ বপনের পর বীজতলায় বীজ যাতে পোকামাকড় দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেজন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম সেভিন মিশিয়ে মাটিতে দিতে হয়। বীজ বপনের পর অতিবৃষ্টি বা প্রখর রোদ থেকে রক্ষা পেতে বাঁশের চাটাই বা পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢেকে দিতে হবে। বাঁশের চাটাই বা পলিথিন সকাল, বিকাল বা রাতে সরিয়ে নিতে হবে। চারা গজানোর সাথে সাথে ইনসেক্ট প্রুফ নেট দিয়ে চারা ঢেকে দিতে হবে। এই নেট রোদ, বৃষ্টি এবং ভাইরাস বহনকারী বিভিন্ন পোকামাকড় থেকে চারাকে রক্ষা করবে। বীজ বোনার পর চারা বের না হওয়া পর্যন্ত নেটের উপর ঝরনা দিয়ে সেচ দেয়া আবশ্যক। ৫-৭ দিনের মধ্যে বীজ গজায়। চারা ৩-৪ সেমি হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে চারা পাতলা করা হয়। বীজতলায় আগাছা গজালে ১-২ বার নিড়ানী দিয়ে আগাছা বেছে মাটি আলগা করে দিলে চারা ভাল হয়। চারা তোলার আগের দিন বীজতলায় সেচ দিলে মাটি নরম হয়। এতে শিকড়ের ক্ষতি না করে সহজেই চারা তোলা যায় এবং চারা সহজেই জমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। চারার বয়স ৩০-৩৫ দিন হলে জমিতে লাগানোর উপযোগী হয়। খাট, মোটা কাণ্ড ও ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট চারা লাগানোর জন্য ভাল। সারি থেকে সারি ৫০ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছ ৫০ সেন্টিমিটার দূরত্বে রোপণ করতে হবে। চারা রোপণের মুহুর্তে পানি সেচ দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে মাটিতে সহজে গাছ নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

জমি তৈরি: শীতকালীন মরিচের জন্য প্রথমে জমিকে চারিদিক দিয়ে আইলের অতিরিক্ত অংশ কেটে নিতে হবে। তারপর ৪-৬টি গভীর চাষ ও মই দিতে হবে। জমিতে শেষ চাষের পর মই দিয়ে সমান করে আগাছা বেছে ফেলে দিতে হবে। মাটির ঢিলা ভেঙ্গে মাটি ঝুরঝুর ও সমতল করে নিতে হবে। জমি তৈরিতে শেষ চাষের আগে জৈব এবং রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে। এরপর বেড তৈরি করতে হবে। বেড চওড়ায় ১ মিটার হলে ভাল হয়। তবে দৈর্ঘ্য জমির আকার অনুসারে হলে ভাল হয়। বেডের উচ্চতা ১০-১৫ সেমি হতে হয়। পাশাপাশি দুটো বেডের মাঝখানে ৪০-৫০ সেমি প্রশস্ত এবং ১০ সেমি গভীরতা বিশিষ্ট নালা পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার্থে রাখতে হয়।

সার ব্যবস্থপনা ও প্রয়োগ পদ্ধতি: নিম্নোক্ত হারে জমিতে সার প্রয়োগ করতে হবে-

সারের নাম	হেক্টর প্রতিপরিমাণ	শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ	সারের উপরি প্রয়োগ (কেজি)		
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
গোবর/কম্পোস্ট	১০ টন	সম্পূর্ণ	-	-	-
ইউরিয়া	২১০ কেজি	-	৭০	৭০	৭০
টিএসপি	৩০০ কেজি	সম্পূর্ণ	-	-	-
এমওপি	২০০ কেজি	৫০ কেজি	৫০	৫০	৫০
জিপসাম	১১০ কেজি	সম্পূর্ণ	-	-	-
জিংক বা দস্তা	১ কেজি	সম্পূর্ণ	-	-	-
বোরন সার	১.৫ কেজি	সম্পূর্ণ	-	-	-

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর বা কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, জিংক, বোরন এবং এমওপি ৫০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে। বাকি এমপি এবং ইউরিয়া সার তিন কিস্তিতে বীজ গজানোর ২৫, ৫০ এবং ৭৫ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত সকাল বেলা কিংবা বিকাল বেলা জমিতে সার প্রয়োগ করতে হয়। জমিতে সেচ দেওয়ার পর পানি বের করে দিয়ে অর্থাৎ জমিতে সেচ দেওয়ার পর যখন কোন পানি জমিতে জমে না থাকে সে সময় ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। কারণ সেচের পর জমিতে সার প্রয়োগ করলে সার তাড়াতাড়ি মাটির সাথে মিশে যায়। এভাবে সার প্রয়োগ করলে সারের অপচয় কম হয়। তবে এমওপি সেচের পূর্বে গাছের গোড়া থেকে ১০-১৫ সেমি দূরে প্রয়োগ করে নিড়ানী দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

হরমোন প্রয়োগ: প্ল্যানোফিক্স নামক হরমোন প্রয়োগে দেখা গেছে মরিচের ফুল কম ঝরে এবং ফলন বাড়ে। এক মিলিলিটার প্ল্যানোফিক্স ৪.৫ লিটার পানিতে মিশিয়ে সমস্ত গাছের উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। ফুল আসলে প্রথমবার এবং ২০-২৫ দিন পর দ্বিতীয়বার প্রয়োগ করতে হবে। এক হেক্টর জমিতে প্রায় ৫০০ লিটার মিশ্রণের প্রয়োজন হয়।

নিড়ানী: জমিতে আগাছার পরিমাণের উপর নির্ভর করে নিড়ানী দিতে হবে। যদি আগাছা বেশি থাকে তাহলে নিড়ানী বেশি দিতে হবে। অর্থাৎ জমিতে কোনক্রমেই আগাছা রাখা যাবে না।

সেচ: মাটিতে অতিরিক্ত আর্দ্রতা মরিচ সহ্য করতে পারে না আবার বেশি সেচ প্রয়োগ করলে গাছ লম্বা হয় ও ফুল ঝড়ে যায়। জমির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে ৩/৪টি সেচ দিতে হবে। ফুল আসার সময় এবং ফল বড় হওয়ার সময় জমিতে পরিমানমতো আর্দ্রতা রাখতে হবে।

মালচিং: সেচের পর মাটিতে চটা বাঁধলে নিড়ানী দিয়ে ভেঙ্গে দিতে হবে তাতে শিকড় প্রয়োজনীয় বাতাস পায় এবং গাছের বৃদ্ধি তরান্বিত হয়।

মাটি তোলা: ভাল ফসলের জন্য ৩-৪ বার দুই সারির মাঝের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হয়। সার প্রয়োগের পর পরই মাটি তুলে দিতে হয়। এতে গাছের গোড়া শক্ত হয় এবং পানি নিষ্কাশনের সুবিধা হয়।

খুঁটি প্রদান: অধিক উচ্চতা, ফলনের ভার, ঝর বা অতি বৃষ্টি কারণে গাছ হেলে। ফলে মরিচের গুণাগুণ হ্রাস পায়। প্রায় হেলে পড়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য খুঁটি প্রদান করা হয়। গাছের পাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতে প্লাস্টিকের সুতলী দিয়ে গাছ বেধে দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: মরিচ পাকা অবস্থায় তোলা হয়। বীজ বপনের ৬০-৬৫ অথবা চারা লাগানোর ৩৫-৪০ দিন পর গাছে ফুল ধরতে শুরু করে, ৫৫-৬০ দিনের মধ্যে ফল ধরে এবং ৭৫ থেকে ৯০ দিনের মধ্যে ফল পাকতে আরম্ভ করে। সাধারণত কৃষকের প্রথম বারের সংগৃহীত ফসল কাচা মরিচ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরের মরিচ পাকা (লাল রং) হিসেবে সংগ্রহ করা হয়। লম্বা, উজ্জল লাল বর্ণ, চকচকে, পাতলা মসৃণ ত্বক এবং বেশি ঝাঁঝের পাকা মরিচ (যা পরবর্তীতে শুকানো হয়) মসলা হিসাবে অধিক জনপ্রিয়। মরিচের ফুল ফোটা, ফল ধরা, রং ধারণ ইত্যাদি তাপমাত্রা, মাটির উর্বরতা এবং ভালো জাতের উপর নির্ভর করে। উষ্ণ তাপমাত্রায় ফল তাড়াতাড়ি পাকে এবং ঠাণ্ডায় ফল পাকতে দেরি হয়। অনুকূলে আবহাওয়া বিরাজ করলে এর স্বাভাবিক উৎপাদন কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে পারে। পাকা মরিচ সাধারণত ৩-৫ পর্যায়ে তুলতে হয়। বোঁটাসহ মরিচ তুলতে হয়। কারণ বোটা ছাড়া মরিচ তাড়াতাড়ি সজিবতা হারায় ও সহজে রোগাক্রান্ত হয়। শুকনো মরিচের জন্য আধাপাকা মরিচ তুললে মরিচের রং ও গুণগতমান নষ্ট হয়ে যায়।

শুকানো: পাকা মরিচ পাকা মেঝে বা মাটিতে পলিথিনের উপরে অথবা পাকা বাড়ীর ছাদে ৫-৮ সেন্টিমিটার পুরু করে বিছিয়ে সূর্যের আলোতে শুকানো হয়। তবে গবেষণায় দেখা গেছে যে, সরাসরি সূর্যের আলো মরিচে "হোয়াইট প্যাচ" সৃষ্টি করে যা মরিচের গুণগত মান নষ্ট করে। সাধারণত ২২-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা মরিচ শুকানোর জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। সব মরিচের রং সমভাবে ঠিক রেখে শুকানোর জন্য এবং যাতে মোল্ড/ছত্রাক জন্মাতে না পারে সে জন্য মাঝে মাঝে রৌদ্রের মধ্যে মরিচ নেড়ে দিতে হবে। ভালভাবে না শুকালে মরিচের রং, ঝাঝ এবং চকচকে ভাব নষ্ট হয়ে যায়। ভাল বীজ উচ্চ অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা, উজ্জল রং, উন্নত পুষ্টিমান, অণুজীবের আক্রমণ এবং আফলাটক্সিন এর হাত হতে মরিচকে রক্ষার জন্য শুকনো মরিচের আর্দ্রতা ৮-১০% মধ্যে রাখতে হবে। শুকানোর সময় রোগে আক্রান্ত এবং রং নষ্ট হয়ে যাওয়া মরিচ বেছে ফেলে দিতে হবে। সাধারণত ১০০ কেজি পাকা মরিচ শুকিয়ে ২৫-৩৫ কেজি (১ কেজি পাকা মরিচ শুকালে ২৫০-৩০০ গ্রাম) শুকনো মরিচ পাওয়া যায়। সোলার ড্রায়ার এর সাহায্যও মরিচ শুকানো যায়। ৮ ফুট লম্বা ৪ ফুট চওড়া এবং ৪ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট হার্ডবোর্ড, কাঁচ ও তারের জাল দিয়ে ৩-৪ স্তর বিশিষ্ট সোলার ড্রায়ার তৈরি করে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে মরিচ শুকানো যায়। এতে মরিচের রং ভাল থাকে।

সংরক্ষণ: দূরবর্তী স্থানে কাচা মরিচ পরিবহনের ক্ষেত্রে ছিদ্রযুক্ত বাঁশের ঝুড়ি এবং চটের ব্যাগ ব্যবহার করলে মরিচ ভাল থাকে। মরিচ শুকানোর পরে ছায়াযুক্ত স্থানে ঠাণ্ডা করে সংরক্ষণ করতে হবে।

মরিচের রোগ ও তার প্রতিকার

মরিচের ঢলে পড়া রোগ

রোগের জীবাণু: *Fusarium oxysporum f.sp. capsici, Sclerotium sp.* (Soil borne fungi) and *Ralstonia solanacearum* নামক জীবাণুর আক্রমণে মরিচের ঢলে পড়া রোগ হয়।

রোগের বিস্তার: ছত্রাক প্রধানত মাটি বাহিত এবং অন্যান্য শস্য আক্রমণ করে। মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণ আর্দ্রতা থাকলে এ রোগের ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। পানি সেচের মাধ্যমে আক্রান্ত ফসলের জমি হতে সুস্থ ফসলের মাঠে বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ

- ছত্রাক গাছের নিচের দিকে কাণ্ডে আক্রমণ করে এবং গাঢ় বাদামী ও দাবানো ক্যাংকার সৃষ্টি করে।
- ক্রমে এই ক্যাংকারজনিত দাগ কাণ্ডের গোড়াকে চর্তুদিক হতে বেস্টন করে ফেলে।
- গাছের অগ্রভাগের পাতা হলুদ হয়ে যায়, পরে সমস্ত গাছ হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
- স্যাঁতসেতে মাটিতে কাণ্ডের গোড়া সাদা অথবা নীলাভ ছত্রাক স্পোর দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ে।
- গাছ লম্বালম্বিভাবে ফাটালে ভাসকুলার বান্ডল বিবর্ণ দেখা যাবে।
- রোগের অনুকূল অবস্থায় ১০-১৫ দিনের মধ্যে গাছ সম্পূর্ণরূপে ঢলে পড়ে, কিন্তু প্রতিকুল অবস্থায় ২-৩ মাস সময় লাগতে পারে।
- ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আক্রান্ত হলে আক্রান্ত অংশ হতে ধারালো ছুরি দ্বারা কেটে গ্লাসভর্তি পরিষ্কার পানিতে ডুবালে গ্লাসের উপরের অংশের পানিতে ঘন/পাতলা সাদা রঙের পদার্থ (Ooze) পড়তে দেখা যায় ।

রোগের প্রতিকার:

- সুস্থ ও সবল ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রোভেক্স-২০০ বা অটোস্টিন (প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম) দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গাছের পরিত্যক্ত অংশ, আগাছা ও আশেপাশের ধুতুরা জাতীয় গাছ একত্র করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

ঢলে পড়া রোগ আক্রান্ত মরিচ গাছ

- রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

আগা মরা/ ক্ষত/ ফল পচা (Die back/Anthracnose/fruit rot)

রোগের কারণ: কোলেটোট্রিকাম ক্যাপসিসি (*Colletotrichum capsici*) নামক ছত্রাক।

রোগের বিস্তার: বীজ, বিকল্প পোষক এবং গাছের পরিত্যক্ত অংশের মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। আর্দ্র আবহাওয়া ও অধিক বৃষ্টিপাত এ রোগ বিস্তারে সহায়তা করে।

রোগের লক্ষণ

- মরিচ গাছের নতুন ডগা, ডাল, ফুলের কুঁড়ি ও ফল এ রোগে আক্রান্ত হয়।
- এ রোগের আক্রমণে গাছের আক্রান্ত অংশ যেমন পাতা, কাণ্ড ও ফল ক্রমশ উপর হতে মরতে থাকে এবং গাছ ফ্যাকাশে বর্ণ ধারণ করে।
- গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ফল ধারণ ক্ষমতা কমে যায়।
- ফলের উপর গোলাকার কালো বলয় বিশিষ্ট গাঢ় ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ইহা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে ফলকে পচিয়ে দেয়।
- আক্রান্ত ফল ঝরে পড়ে।
- ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হলে গাছ দ্রুত মরে যায়।
- মরা অথবা শুকনা কালো পচার মত রঙ ধারণ করে।

রোগের প্রতিকার

আগা মরা/ ক্ষত/ ফল পচা রোগে আক্রান্ত মরিচ গাছ ও মরিচ

- সুস্থ ও সবল ফল থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- প্রোভেক্স-২০০ বা অটোস্টিন (প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম) দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- পানি নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।
- গাছের পরিত্যক্ত অংশ, আগাছা ও আশেপাশের ধুতুরা জাতীয় গাছ একত্র করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে।
- রোগ দেখা দেয়ার সাথে সাথে প্রতি লিটার পানিতে টিল্ট ২৫০ ইসি ০.৫ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

চুয়ানিফোরাপাতা পচা (*Choaniphora leaf rot*)

রোগের কারণঃ চুয়ানিফোরা (*Choanephora cucurbitarum*) নামক ছত্রাক।

রোগের বিস্তারঃ উচ্চ তাপমাত্রা ও স্যাতস্যাতে আবহাওয়ায় (কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া) এ রোগ হয়ে থাকে। বায়ু দ্বারা রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

রোগের লক্ষণ

চুয়ানিফোরা রোগে আক্রান্ত মরিচ গাছ

- চারা ও বয়স্ক গাছের শাখা-প্রশাখা, পাতা, ফুল-ফল আক্রান্ত হয়।
- প্রথমে পাতায় পানি ভেজা দাগ হয়। পাতা দ্রুত পচতে থাকে।
- আক্রমণ গাছের আগা থেকে নিচের দিকে নামতে থাকে।
- আক্রান্ত গাছের পাতা ও ডাল কালো রঙের হয়ে থাকে।
- রোগের প্রকোপ বেশি হলে এবং অনুকূল আবহাওয়ায় ৫-৭ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছটি মারা যায়।
- সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করলে আগা ও ডালে ছত্রাকের সাদা বর্ণের মাইসেলিয়াম খালি চোখে দেখা যায়।
- ফলনের প্রচুর ক্ষতি হয়। ১০০% পর্যন্ত ফলনের ক্ষতি হতে পারে।

রোগের প্রতিকার

- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- জমিতে অতিরিক্ত সেচ দেয়া যাবে না।
- গাছ আক্রান্ত হওয়া মাত্রই অটোস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে।

ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতায় দাগ (Baeterial leaf spot)

রোগের কারণঃ জ্যানথোমোনাস ক্যামপেস্ট্রিস পিভি. ভেরিকেটোরিয়া (Xanthomonas campestrispv. vericatoria) নামক ব্যাকটেরিয়া।

রোগের বিস্তারঃ ব্যাকটেরিয়া শীতকালে মাটিতে থাকে। ইহারা পোকামাকড়, কৃষি যন্ত্রপাতি, শ্রমিক ও বৃষ্টির পানির মাধ্যমে ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ

- গাছের পাতার নিচে প্রথমে ছোট গোলাকার থেকে অসমান পানি ভেজার মতো ক্ষতদাগ দেখতে পাওয়া যায়।
- স্পটগুলো ফুলে ওঠে এবং এর কেন্দ্র কালো রং ধারণ করে।
- পাতা শুকিয়ে গাছ মারা যায়।
- সবুজ ফল আক্রান্ত হয় এবং এগুলো বাদামী হতে কালো হয়।

ব্যাকটেরিয়া জনিত পাতায় দাগ রোগে আক্রান্ত মরিচ গাছ

রোগের প্রতিকার

- সুস্থ ও রোগ মুক্ত গাছ হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- নিড়ানীর সময় যেন গাছ ক্ষত না হয় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ উঠিয়ে ফেলতে হবে।
- এক লিটার পানির মধ্যে ৩ গ্রাম কপার অক্সিক্লোরাইড (কুপ্রাভিট) মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।
- রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এক লিটার পানিতে সানভিট বা কুপ্রাভিট ৭ গ্রাম হারে মিশিয়ে গাছে ৭-১০ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

পাতা কুঁকড়ানো (Leaf curl)

রোগের জীবাণু: এক প্রকার ভাইরাস (Nicotiana virus-10) দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে।

রোগের বিস্তার: বাহক পোকা (সাদা মাছি) ও পোষক উদ্ভিদের মাধ্যমে ছড়ায়।

রোগের লক্ষণ

- আক্রান্ত গাছের পাতা কুঁকড়ে যায় এবং স্বাভাবিক পাতার তুলনায় পুরু হয়।
- পাতাগুলো ছোট গুচ্ছাকৃতির হয়।
- গাছের বৃদ্ধি কমে যায়।
- গাছের পর্বগুলি কাছাকাছি হয় (পর্ব দৈর্ঘ্য কমে যায়) ও গাছ খর্বাকৃতি হয়ে পড়ে।
- গাছে অতিরিক্ত ডালপালা জন্মায় ও ঝোপের মত হয়।

পাতা কুকড়ানো (Leaf curl) রোগে আক্রান্ত মরিচ গাছ

- ফল ধারণ ক্ষমতা কমে যায় এবং ফল আকারে ছোট ও কুঁকড়ানো হয়।

রোগের প্রতিকার

- সুস্থ গাছ থেকে পরবর্তী মৌসুমের জন্য বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- রোগাক্রান্ত চারা কোন অবস্থাতেই লাগানো যাবে না।
- চারা অবস্থায় বীজ তলা মশারীর নেট দ্বারা ঢেকে রাখতে হবে।
- রোগাক্রান্ত গাছ ও আশেপাশের পোষক উদ্ভিদ তুলে ধ্বংস করতে হবে।

মরিচকে এই রোগ হতে মুক্ত রাখতে হলে নিয়মিতভাবে ৭-১০ দিন দিন পর পর কীটনাশক ও মাকড়নাশক (থিওভিট/ভার্টিমেক/ওমাইট) সমস্ত গাছে স্প্রে করতে হবে।

মরিচের পোকা-মাকড় ব্যবস্থাপনা

১) কাটুই পোকা

- আক্রান্ত হওয়ার পর্যায়- জমিতে চারা রোপণের পর পরই এই পোকা রাতের বেলা গাছের গোড়া কেটে দিয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে।

- ক্ষতির ধরন- কচি চারা গাছ গোড়া কাটা অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকে। শুককীট দিনের বেলায় গাছের গোড়ায় মাটির সামান্য নিচে বা আবর্জনার ভিতর বিশ্রাম নেয় এবং রাতে উপরে উঠে চারা গাছের গোড়া কেটে দেয়। শুককীট যা খায় তার চেয়ে অনেক বেশি চারা বা গাছের গোড়া কেটে নষ্ট করে।

দমন ব্যবস্থা

- বিষটোপ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ১০০ গ্রাম গমের ভূষি অথবা ধানের কুড়া, ১০০ গ্রাম চিটা গুড় এবং ২০০ গ্রাম সেভিন ৫০ ডব্লিউ পি সবগুলো একত্রে মিশিয়ে প্রয়োজনীয় পানি দিয়ে মণ্ড তৈরি করতে হবে।
- সন্ধ্যার পর মণ্ড ছিটিয়ে দিলে শুককীট আকর্ষিত হবে এবং এই বিষটোপ খেয়ে মারা যাবে। ১ মিলিলিটার পরিমাণ সুমিসাইডিন ২০ ইসি বা রিপকর্ড ১০ ইসি বা সিমবুশ ১০ ইসি ১ লিটার পরিমাণ পানির সাথে মিশিয়ে সন্ধ্যার সময় জমিতে ছিটিয়ে দিলে এই পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- জমি তৈরির সময় দানাদার জাতীয় ঔষধ শতকে ৪০ গ্রাম হারে প্রয়োগ করতে হয়। অনেক সময় ফ্লাড সেচ দিলে মাটির গর্ত থেকে কাটুই পোকা বের হয়ে আসে ফলে পাখিতে খেয়ে ফেলে।

২) থ্রিপস্

- আক্রান্ত হওয়ার পর্যায়- সাধারণত কচি চারা গাছ ও চারা রোপণের ৭-১৭ দিনের মধ্যে এই পোকা মরিচ গাছকে আক্রমণ করে।
- ক্ষতির ধরন- থ্রিপ্স কচি পাতার রস শুষে খায় ফলে পাতা উপরের দিকে কুঁকড়ে যায়। পাতার মধ্যশিরার নিকটবর্তী এলাকা বাদামী রঙ ধারণ করে ও শুকিয়ে যায় নতুন কিংবা পুরাতন পাতার নিচের পিঠে অধিক ক্ষতি হয় নৌকার খোলের ন্যায় পাতা উপরের দিকে কুঁকড়ে যায় আক্রান্ত পাতা বিকৃত ও বেঢপ দেখায়।

সুস্থ গাছ

থ্রিপস্ আক্রান্ত গাছ

থ্রিপস্ পোকা

দমন ব্যবস্থা

- আঠালো সাদা ফাঁদ (প্রতি হেক্টরে ৪০ টি) ব্যবহার করে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা।
- এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ২০ লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি (ছেঁকে নেওয়ার পর) পাতার উপরের দিকে স্প্রে করা।
- আন্তঃফসল হিসাবে মরিচের সঙ্গে গাজর (রেপিলেন্ট ক্রপ) চাষ করে।
- আক্রমণ বেশি হলে ফিপ্রোনিল (রিজেন্ট/এসেণ্ড/গুলি/অন্য নামের) বা ডাইমেথয়েট (বিস্টারথোয়েট/টাফগর/অন্য নামে) ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে বা সাকসেস ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলি হারে স্প্রে করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- চারা রোপণের ১০-৩০ দিনের মধ্যে তিন বার ১০ দিন অন্তর অন্তর এই পোকা দমনের জন্য প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ মিলি এ্যাডমায়ার/টিডো/গেইন ঔষধ প্রতি ৫ শতক জমিতে স্প্রে করতে হয়।

৩) এফিড বা জাব পোকা

- আক্রান্ত হওয়ার পর্যায়- মরিচ গাছের কচি ও বয়স্ক পাতা।
- সব ধরনের পাতার নিচের দিকে বসে রস শুষে খায় এমনকি এরা গাছের কাণ্ডেও আক্রমণ করে থাকে ফলে কাণ্ড শুকিয়ে মারা যায়।

দমন ব্যবস্থা

- আঠালো হলুদ ফাঁদ (প্রতি হেক্টরে ৪০ টি) ব্যবহার করে।
- আধা ভাঙ্গা নিম বীজের (৫০ গ্রাম এক লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভেজানোর পর মিশ্রণটি ছাঁকতে হবে) নির্যাস আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করে এই পোকা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বন্ধু পোকাসমূহ (লেডীবার্ড বিটলের পূর্ণাঙ্গ ও কীড়া এবং সিরফিড ফ্লাই) প্রকৃতিতে লালন।
- আক্রমণ বেশি হলে স্বল্পমেয়াদী বিষক্রিয়ার ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি (ফাইফানন/সাইফানন) ১০ মিলি অথবা কুইনালফস ২৫ ইসি (করলাক্স/একালাক্স/কিনালাক্স/অন্য নামের) বা ডাইমেথয়েট (বিস্টারথোয়েট/টাফগর/অন্য নামে) বা কেরাতে ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে বা সাকসেস ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলি হারে স্প্রে করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৪) সাদা মাছি

- আক্রান্ত হওয়ার পর্যায়- সাধারণত কচি চারা গাছ আক্রমণ করে।
- ক্ষতির ধরন- কচি পাতার নিচে বসে রস শুষে খায় ফলে পাতা কুঁকড়ে যায়।

দমন ব্যবস্থা

- সাবান-পানি ব্যবহার (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ডিটারজেন্ট) করে।
- নিম বীজের নির্যাস (আধা ভাঙ্গা ৫০ গ্রাম নিম বীজ ১ লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে মিশ্রণটি ছেঁকে নিয়ে) স্প্রে করা ।
- আক্রমণ বেশি হলে ম্যালাথিয়ন ৫৭ইসি (১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে) অথবা এডমায়ার ২০০ এসএল (১০ লিটার পানিতে ৫ মিলি হারে) স্প্রে করে।

৪) মাইট

- আক্রান্ত হওয়ার পর্যায়- মাইট মরিচ গাছের কচি ও বয়স্ক পাতা আক্রমণ করে।
- ক্ষতির ধরন- সাধারণত পাতার নিচের দিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিরার মধ্যকার এলাকা বাদামী রং ধারণ করে ও শুকিয়ে যায় এবং মারাত্মকভাবে আক্রান্ত পাতা সহজেই ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। কচি পাতা মাকড় দ্বারা আক্রান্ত হলে পাতা নিচের দিকে মুড়ে গিয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে সরু হয়ে যায় ।

দমন ব্যবস্থাঃ

- নিমতেল ৫ মিলি + ৫ গ্রাম ট্রিকস প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচের দিকে স্প্রে করতে হবে ।
- এক কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ২০ লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে উক্ত পানি (ছেকে নেওয়ার পর) পাতার নিচের দিকে স্প্রে করা।
- পাইরিথ্রয়েড জাতীয় কীটনাশক ব্যবহার যথাসম্ভব পরিহার করতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে মাকড়নাশক ওমাইট ৫৭ইসি (প্রতি লিটার পানিতে ২.০ মিলি হারে) বা ভার্টিমেক ১.৮ ইসি প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলি হারে পাতা ভিজিয়ে স্প্রে করে মাকড়ের আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব।
- মাকড়ের সাথে অন্য পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রথমে মাকড়নাশক ব্যবহার করে অতপর কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

৪) ফল ছিদ্রকারী পোকা

- আক্রান্ত হওয়ার পর্যায়- এই পোকা কচি ও বাড়ন্ত ফল ছেদ করে ভিতরে ঢুকে ফলের ভিতরের অংশ খেয়ে ফেলে।
- ক্ষতির ধরন- ফলের বৃন্তের কাছে একটি ক্ষুদ্র আংশিক বদ্ধ কালচে ছিদ্র দেখা যাবে। ক্ষতিগ্রস্ত ফলের ভিতরে পোকার বিষ্ঠা ও পচন দেখা যাবে। পোকা আক্রান্ত ফল নিধারিত সময়ের পূর্বেই পাকে বা ঝরে পড়ে।

দমন ব্যবস্থা

- সেক্স ফেরোমন ফাঁদ (প্রতি বিঘায় ১৫টি) ব্যবহার করে পোকা নিয়ন্ত্রণ করা ।
- ডিম নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিজ* ও কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, ব্রাকন হেবিটর পর্যায়ক্রমিকভাবে মুক্তায়িত করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- আধভাঙ্গা নিম বীজ (৫০ গ্রাম এক লিটার পানিতে ২৪ ঘণ্টা ভেজানোর পর মিশ্রণটি ছাকতে হবে) নির্যাস আক্রান্ত গাছে ১০ দিন পর পার ৩ বার স্প্রে করে এই পোকা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- আক্রমণ তীব্র হলে কুইনালফস ২৫ ইসি (দেবীকুইন/কিনালাক্স/করলাক্স) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ১০ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে বা সাকসেস ১০ লিটার পানিতে ১২ মিলি হারে স্প্রে করে এদের নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বেশি মাত্রায় মরিচ এ পোকা দ্বারা আক্রান্ত হলে ডেনিটল ১০ ইসি/ ট্রিবন ১০ ইসি/ রিপকর্ড ১০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে অথবা ফেনকিল ২০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি হারে অথবা সুমিথিয়ন ৫০ ইসি ২ মিলি হারে এগুলোর যে কোন একটি কীটনাশক প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে গাছের সমস্ত অংশ ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে করা।

মৌরি

মৌরি বাংলাদেশের একটি বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় মসলা জাতীয় ফসল। কনফেকশনারী ও রন্ধনশালার দৈনন্দিন বিভিন্ন রকম খাবার তৈরিতে মৌরি ব্যবহার হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মৌরি সস হিসাবে দেশের ছোট, বড়, মাঝারী সকল রেস্টুরেন্টে বহুল প্রচলিত একটি নাম। মৌরি সস হিসেবে ব্যবহারের প্রধান কারণ এর গন্ধ। খাবার পর মৌরি খেলে মুখে খাওয়ার গন্ধ দূর হয়ে যায়। মৌরির বীজ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ তৈরি করা হয়।

মৌরির জাত

দেশ ও বিদেশ থেকে মৌরির ১০টি Germplasm সংগ্রহ করে ২০০৯ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত ২ বছর মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বগুড়ায় উক্ত Germplasm সমূহের ফলনসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা হয়। এর পর ২০১১ সাল থকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রথমিক ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে কিছু উচ্চ ফলনশীল মৌরির লাইন বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত স্থানীয় মৌরির সাথে Check হিসাবে ব্যবহার করে বাংলাদেশের লালমনিরহাট, বগুড়া, মাগুড়া, রাজশাহী, ফরিদপুর, গাজীপুর, কুমিল্লা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম-এ আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষা করা হয়। এতে FN01 ও FN06 লাইন ২টির ফলনসহ সকল বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে জাত হিসেবে অনুমোদনের জন্য ২০১৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডে আবেদন করা হয় এবং ২০১৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড FN01 লাইনটিকে বারি মৌরি-১ জাত হিসাবে এবং FN06 লাইনটিকে বারি মৌরি-২ জাত হিসাবে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

বারি মৌরি-১

মৌরি গাছ উচ্চতায় ১০০-১৩০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রতি গাছে গড় শাখা-প্রশাখা ৬-৭ টি, আম্বেল ৩৯ টি, প্রতি আম্বেলে আম্বেললেটের সংখ্যা প্রায় ২৭ টি এবং প্রতি আম্বেললেটে বীজের সংখ্যা প্রায় ১২ টি। প্রতি ১,০০০ বীজের গড় ওজন ৫-৬ গ্রাম। বীজ এর ফলন প্রতি হেক্টরে ১.৫৩-২.০৫ টন। এজাতের জীবনকাল ১৪০-১৫০ দিন এবং বীজ সংগ্রহের সময় ২-৩ ধাপে ফসল সংগ্রহ করতে হয়।

বারি মৌরি-১

বারি মৌরি-২

বারি মৌরি-২

মৌরি গাছ উচ্চতায় ১০০-১২৩ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রতি গাছে গড় শাখা-প্রশাখা প্রায় ৬টি, আম্বেল ৩০ টি, প্রতি আম্বেলে আম্বেললেটের সংখ্যা প্রায় ২২টি এবং প্রতি আম্বেললেটে বীজের সংখ্যা প্রায় ১৩-১৪ টি। প্রতি ১০০০ বীজের গড় ওজন ৫.২ গ্রাম। বীজ এর ফলন প্রতি হেক্টরে ১.৬-১.৮ টন। এজাতের জীবনকাল ১৩০-১৪০ দিন যা বারি মৌরি-১ থেকে প্রায় ১০-২০ দিন আগেই পাকে এবং কাটার সময় প্রায় ৮৫-৯০ ভাগ গাছের ফল একসাথে কাটা যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: প্রায় সব রকমের মাটিতেই মৌরির চাষ করা যায়। তবে বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি মৌরি চাষের জন্য উপযোগী। মৌরি জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় জমিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঠাণ্ডা আবহাওয়া মৌরির বীজ উৎপাদনের জন্য অনুকূল বলে রবি মৌসুমে এর চাষ করা হয়ে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রায় ও খরায় মৌরি বীজের ফলন ভাল হয় না। ফুল ফোটার সময় বৃষ্টি এবং অতিরিক্ত কুয়াশা হলে মৌরির ফলন কমে যায় এবং বীজের মান খারাপ হয়ে যায়।

বপন সময়: কার্তিক (মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর) মাস বীজ ফসলের জন্য উত্তম। মরিচ, শাক-সবজি, আখ, আলু, ডাল, মসলা জাতীয় অন্য ফসলের জমিতে সাথী ফসল হিসাবে মৌরির চাষ করা যায়। অতিরিক্ত সূর্যালোকে বীজ বপন করলে অঙ্কুরোদ্‌গমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। মৌরি বীজের জন্য বিলম্বে বীজ বপনে এর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং বিভিন্ন রোগবালাই এর আক্রমণ বেড়ে যায় ও বীজের মান খারাপ হয়ে ফলন কমে যায়।

জমি তৈরি: মাটির প্রকারভেদে ৪-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হবে। পরে জমিতে ১.৫ মিটার থেকে ২.০ মিটার চওড়া ও প্রয়োজনমতো লম্বা বেড তৈরি করতে হবে। পানি নিষ্কাশনের জন্য দু'বেডের মাঝে ৩৫-৪০ সেমি নালা রাখতে হবে।

বীজের হার: সারিতে হেক্টরপ্রতি ৭-৯ কেজি এবং ছিটিয়ে বোনার ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ৯-১২ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন: মৌরির বীজ বোনার আগে পানিতে ১২-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে বুনলে তাড়াতাড়ি অঙ্কুরোদ্‌গম হয়। সারিতে বোনার ক্ষেত্রে মাটির ২-৩ সেন্টিমিটার গভীরে বীজ বপন করে, সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০ সেন্টিমিটার, গাছ থেকে গাছের দুরত্ব ১০ সেন্টিমিটার বজায় রাখতে হবে। বপনকৃত বীজ অঙ্কুরোদ্‌গম হতে সাধারণত ৮-১৫ দিন সময় লাগে। কোন কোন ক্ষেত্রে এর চাইতেও বেশি সময় লাগতে পারে। জমির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে বীজ বপনের পর পরই হালকা সেচ দিতে হবে। তাতে অঙ্কুরোদগম বৃদ্ধি পাবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

মৌরি চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি নিচের হারে সার প্রয়োগ করতে হয় জমি তৈরির সময় সমস্ত গোবর, এমওপি ও টিএসপি সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ২৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং ফুল ফোটার পর পর বাকি সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা হিসেবে প্রয়োগ	
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি
গোবর	৫ টন	সব	-	-
ইউরিয়া	১৮০ কেজি	-	৯০ কেজি	৯০ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি	সব	-	-
এমওপি	১৪০ কেজি	সব	-	-
জিপসাম	১১০ কেজি	সব	-	-
জিংক	৩ কেজি	সব	-	-
বোরন	১.৫ কেজি	সব	-	-

আন্তঃপরিচর্যা: বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে প্রথম নিড়ানী দিতে হবে। একই ভাবে একই সময়ের ব্যবধানে পরবর্তীতে আরো ২-৩ টি নিড়ানী দিতে হবে। প্রতিবার সেচের পর জমির 'জো' আসা মাত্র মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। চারা গজানোর পর থেকে ২/৩ ধাপে ৪-৫ দিন পরপর নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চারা পাতলা করে দিতে হবে।

সেচ: মৌরির ফসলে ৪-৫ টি সেচ প্রয়োগ করতে হবে। গজানোর সময় হালকা সেচ, এ ছাড়া গাছের ৪-৫ পাতা অবস্থায়, শাখা বের হওয়া, ফুল আসার ও দানা গঠনের সময় মাঝারী সেচ দিতে হবে। এতে বীজ পুষ্ট ও ফলন বেশি হয়। সেচের অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে।

পোকামাকড়: কীটপতঙ্গের মধ্যে মৌরিতে জাব পোকার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। কালচে রঙের ছোট পোকা গাছের কাণ্ডসহ বীজের উপর বসে রস চুষে খায়। আক্রমণ বেশি হলে বীজ কালো হয়ে গাছ শুকিয়ে যাওয়ার মতো মনে হয়। গাছে ফুল ও ফল ধরার সময় জাব পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

দমন: প্রতি লিটার পানিতে ১-২ মিলিলিটার ম্যালাথিয়ন-১০০ ইসি বা ১ মিলিলিটার কনফিডর-২৫ ইসি ভালোভাবে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে।

মৌরির ব্লাইট রোগ: *অলটারনারিয়া ব্রাসিসিকোলা* নামক জীবাণু দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। গাছে ফুল আসার সময় এ রোগ দেখা যায়। প্রথমে পাতার উপর ছোট ছোট কালো কালো দাগ পড়ে। পরে এ দাগসমূহ সমস্ত পাতায় ছড়িয়ে পড়ে। তারপর কাণ্ড ও শাখা প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়ে। কুয়াশাচ্ছন্ন ও আর্দ্র আবহাওয়ায় এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত গাছ কালো হয়ে ঝলসে যায় ও গাছ মারা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা: প্রতি বীজে ৩ গ্রাম হারে বীজ শোধন করতে হবে এবং এই রোগ দেখা দিলে এমিস্টার টপ প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর পর ২-৩ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: বপনের ১৪০-১৫০ দিন পর মৌরি পাকে। পাকলে বীজগুলো হালকা হলদে হয়ে পাতা শুকিয়ে যায়। সাধারণত খুব ভোরে অর্থাৎ সূর্যের আলোর প্রখরতা বৃদ্ধির পূর্বে শাখা কেটে নিতে হবে। মৌরির বীজ হালকা সবুজ অবস্থায় থাকতেই গাছ থেকে বীজসহ তুলতে হবে। এভাবে ২-৩ ধাপে বীজ সংগ্রহ করতে হবে নতুবা বীজের মান ভাল হয় না বীজ কালো হয়ে নষ্ট হযে যায়। মৌরি বীজ সাধারণত রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে সংগ্রহ করতে হবে। বীজ সংগ্রহের পর এক জায়গায় গাদা করে রাখা যাবে না কারণ গাদা করে রাখলে বীজ কালচে হয়ে যায়। বীজ রোদে শুকিয়ে মাড়াই - ঝাড়াই করে পৃথক করা হয়। বীজে আর্দ্রতার পরিমাণ ৮-১০% রেখে শুকিয়ে ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

রসুন

রসুন একটি বহুবর্ষজীবী ফসল। মধ্য এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলই রসুনের আদি নিবাস। রসুন (*Allium Sativum*) Alliacee পরিবার ভুক্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কন্দ জাতীয় মসলা ফসল। এটি রান্নার স্বাদ, গন্ধ ও রুচি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। রসুন ব্যবহারে অজীর্ণ, পেটফাঁফা, ডিপথেরিয়া, বাতরোগ ও যে কোন রকম চর্মরোগ সারে। এছাড়া রসুন থেকে তৈরি ঔষধ নানা রোগ যেমন- ফুসফুসের রোগ, আন্ত্রিকরোগ, হুপিংকাশি, বাতরোগ, কানব্যথা প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হয়। পুষ্টিমানে রসুনে শতকরা ৬২.০ ভাগ পানি, ২৯.৮ ভাগ কার্বহাইড্রেট, ৬.৩ ভাগ প্রোটিন, ০.১ ভাগ তেল, ১.০ ভাগ খনিজ পদার্থ, ০.৪ ভাগ আঁশ এবং ভিটামিন সি আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বৎসর রসুনের চাহিদা ৩.৫ লক্ষ মেট্রিক টন কিন্তু উৎপাদন হয় মাত্র লক্ষ ৩.২৫ মেট্রিক টন। চাহিদার তুলনায় ফলন অনেক কম। নিম্ন ফলনের মূল কারণ উচ্চ ফলনশীল জাতের অপ্রতুলতা। রসুনের জাত উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে মসলা গবেষণার বিজ্ঞানীগণ বিগত কয়েক বৎসর থেকে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেন। পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েক বছর বাছাই করণের মাধ্যমে সম্প্রতি রসুনের আরো দুইটি উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছেন। এ জাত দুইটি বাংলাদেশের রসুনের নতুন উদ্ভাবিত জাত। ২০১৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বারি রসুন-৩ ও বারি রসুন-৪ নামে দুইটি জাত বাংলাদেশে চাষাবাদের জন্য মুক্তায়ন করা হয়।

রসুন ফসল

রসুনের জাত

বারি রসুন-১

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রসুনের উচ্চ ফলনশীল জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০০৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ‘বারি রসুন-১ নামে জাতটি অনুমোদিত হয়।

এ জাতের গাছের উচ্চতা ৬০-৬২ সেমি। প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ৭-৮টি, প্রতি কন্দে কোয়ার সংখ্যা ২০-২২টি, কোয়ার দৈর্ঘ্য ২-২.৫ সেমি, কোয়ার ব্যাস ১-১.৫ সেমি, কন্দের ওজন প্রায় ১৯-২০ গ্রাম। কোয়া লাগানো থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত প্রায় ১৪০-১৫০ দিন সময় লাগে। জাতটির ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধী এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা ভালো। গড় ফলন ৬-৭ টন/হেক্টর।

বারি রসুন-১

বারি রসুন-২

রসুনের এ জাতটি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। গাছের উচ্চতা ৫৬-৫৮ সেমি। প্রতি গাছের পাতার সংখ্যা ৯-১০টি, প্রতি কন্দে কোয়ার দৈর্ঘ্য ২.৫-৩ সেমি, কন্দের ওজন ২২-২৩ গ্রাম। জাতটি ভাইরাস ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং সংরক্ষণ গুণ ভাল।

বারি রসুন-২

রোপণের সময় আশ্বিনের শেষ সপ্তাহ থেকে কার্তিকের শেষ। বীজের হার হেক্টরপ্রতি ৩০০-৪০০ কেজি (কোয়া)। ০.৭৫-১.০০ গ্রাম রসুনের কোয়া বীজ হিসেবে ব্যবহার করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। জীবনকাল ১২০-১৪০ দিন। তবে আবহাওয়াভেদে কোন কোন সময় কম বেশি হতে পারে। ফলন হেক্টরপ্রতি ৮-৯ টন। জাতটি বাংলাদেশের সব এলাকায় চাষ করা যায়।

বারি রসুন-৩

২০১৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বারি রসুন-৩ নামে জাতটি অনুমোদিত হয়। বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। গাছের উচ্চতা ৭১-৭২.৩৯ সেমি। গাছের পাতার রং গাঢ় সবুজ। গাছ মাঝারী ধরনের, প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ১০-১০.৭টি। এটি শীতকালীন জাত। এ জাতের জীবনকাল ১৩৫-১৪০ দিন। প্রতি বাল্বের কোয়ার সংখ্যা ২৩-২৪.৪৫টি, কোয়ার গড় দৈর্ঘ্য ২-২.৫২ সেমি, বাল্বের গড় ওজন ১১-১২.৪৩ গ্রাম ও বাল্বের গড় দৈর্ঘ্য ৩-৩.৩৯ সেমি। জাতটি ভাইরাস রোগ আক্রমণ সহনশীল এবং পোকামাকড় এর আক্রমণ কম হয়। তবে মাঝে মাঝে পার্পল ব্লচ ও পাতা ঝলসানো রোগ দেখা দিতে পারে। জাতটির হেক্টরপ্রতি ফলন ১০.৫-১১.৩১ টন।

বারি রসুন-৩

বারি রসুন-৪

বারি রসুন-৪

২০১৬ সালে জাতীয় বীজ কর্তৃক বারি রসুন-৪ নামে জাতটি অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ৬৭-৬৮.৩৯ সেমি। গাছের পাতার রং সবুজ। গাছ মাঝারী ধরনের, প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ৭-৮.৬৩টি। এটি শীতকালীন জাত। এ জাতের জীবনকাল ১৩০-১৪০ দিন। প্রতি বাল্বে কোয়ার সংখ্যা ১৭-১৮.৬৬টি, কোয়ার গড় দৈর্ঘ্য ২-২.২০ সেমি, বাল্বের গড় ওজন ১০-১০.৬২ গ্রাম ও গড় বাল্বের দৈর্ঘ্য ২-২.৯৭ সেমি। জাতটি ভাইরাস রোগ আক্রমণ সহনশীল এবং পোকামাকড় এর আক্রমণ কম হয়। তবে কখনও কখনও পার্পল ব্লচ ও পাতা ঝলসানো রোগ দেখা দিতে পারে। জাতটির হেক্টরপ্রতি ফলন ৮.০-৮.৭৮ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

রোপণের সময়: মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রসুনের কোয়া রোপণের উপযুক্ত সময়।

বীজ হার ও দূরত্ব: হেক্টরপ্রতি ১ কেজি কোয়া (১ গ্রাম/কোয়া ওজন দরকার)। সারি × চারার দূরত্ব: ১০ কেজি × ১০ কেজি।

ফসল উৎপাদন

রসুন রোপণের দুই মাস পরে কন্দ গঠিত হতে থাকে। তিন থেকে সাড়ে তিন মাস পর কন্দ পুষ্ট হতে শুরু করে। ৪-৫ মাস পরে রসুন উত্তোলন করা যায়। পাতার অগ্রভাগ হলদে বা বাদামী হয়ে শুকিয়ে গেলে বুঝতে হবে রসুন পরিপক্ক হয়েছে। এছাড়া কন্দের বাহিরের দিকের কোয়াগুলি পুষ্ট হয়ে লম্বালম্বিভাবে ফুলে উঠে এবং দুই কোয়ার মাঝে খাঁজ দেখা যায়। এ সময় রসুন তোলার উপযুক্ত হয়। গাছ হাত দিয়ে টেনে তুলে মাটি ঝেড়ে পরিষ্কার করা হয়। এরপর কন্দগুলি ৩-৪ দিন ছায়ায় রেখে শুকানোর পর গুদামজাত করা হয়।

গুদামজাতকরণ

শুকনো রসুন আলো বাতাস চলাচলযুক্ত ঘরের মাচায় বেনি করে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এতে রসুন ভাল থাকে। এছাড়া হিমাগারে ০-২° সে. তাপমাত্রায় শতকরা ৬০-৭০% আর্দ্রতায় রসুন ভালভাবে বেশি দিন সংরক্ষণ করা যায়।

অন্যান্য পরিচর্যা

রোগ ও পোকামাকড় দমন

রোগ বালাইয়ের মধ্যে ব্লাইট, সফট রট, ড্যাম্পিং অফ, ডাউনি মিলডিউ এবং পাতা ঝলসানো রোগ হয়। পাতা ঝলসানো রোগের ফলে পাতার উপর ছোট ছোট সাদাটে গোল দাগ দেখা যায়। এ রোগের ফলে পাতা প্রথমে হলদে ও পরে বাদমী রং ধারণ করে ঝরে পড়ে ও শুকিয়ে যায়। এসব রোগ দমনের জন্য বর্দোমিক্সার (তুঁতেঃ চুনঃপানি = ১ঃ১ঃ১) বা ডাইথেন এম-৪৫/ রোভরাল ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পর স্প্রে করে দমন করা যায়। অনেক সময় পটাশিয়ামের অভাবে রসুনের পাতার ডগা শুকিয়ে যায়।

এ অবস্থা দেখা দিলে প্রধান সার হিসেবে পটাশিয়াম দেওয়া ছাড়াও পরবর্তীতে পটাশিয়াম সার দিলে ডগা শুকিয়ে যাওয়া রোধ করা যায়। রসুন সাধারণত থ্রিপ্স/চুঙ্গি পোকা, রেড স্পাইডার ও মাইট দ্বারা আক্রান্ত হয়। থ্রিপ্স পাতার রস চুষে খায় ফলে পাতায় প্রথমে সাদা লম্বাটে দাগ দেখা যায় পরে পাতার অগ্র ভাগ বাদামী হয়ে শুকিয়ে যায় এবং পাতা মরে নলের মত আকার ধারণ করে। এসব পোকা দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন/ডাইমেক্রন/জেসিড প্রতি লিটার পানিত ১ মিলি হারে স্প্রে করে সহজেই দমন করা যায়।

হলুদ

মসলা হিসেবে হলুদ বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। মসলা ছাড়াও আচার-অনুষ্ঠানে ও ঔষধি গুণাগুণ হিসেবে হলুদের ব্যবহার ব্যাপক। বর্তমানে দেশে মোট চাহিদার তুলনায় হলুদের ঘাটতি রয়েছে। হলুদ উৎপাদনে বারি উদ্ভাবিত হলুদ জাতের চাষ এলাকা বাড়িয়ে হলুদের এ ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব। বাংলাদেশে হলুদের চাহিদা ১.২ লাখ মেট্রিক টন এবং উৎপাদন প্রায় ১.৯৪ লাখ মেট্রিক টন।

হলুদ ফসল

হলুদের জাত

বারি হলুদ-১ (ডিমলা)

স্থানীয় জাতের তুলনায় ডিমলার ফলন প্রায় ৩ গুন। গাছের উচ্চতা প্রায় ১০৫-১২০ সেমি। বপনের ৩০০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। হলুদের ছড়া চওড়া, হেক্টরপ্রতি ফলন ১৭-১৮ টন। প্রতি ৮ কেজি শুকনো হলুদ পেতে ৪০ কেজি কাঁচা হলুদের প্রয়োজন হয় (১:৫)। এ জাত লিফ ব্লাইট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বারি হলুদ-১

বারি হলুদ-২

বারি হলুদ-২ (সিন্দুরী)

স্থানীয় জাতের তুলনায় ফলন দ্বিগুন। গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেমি। বপনের পর থেকে প্রায় ২৭০ দিনের মধ্যে ফসল সংগ্রহ করা যায়। হলুদের ছড়ার আকার মাঝারী। শাঁস আকর্ষণীয় গাঢ় হলুদ। হেক্টরপ্রতি ফলন ১২-১৩ টন। প্রতি ১০ কেজি শুকনো হলুদ তৈরিতে ৪০ কেজি কাঁচা হলুদ প্রয়োজন হয় (১:৪)। এ জাত লিফ ব্লাইট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন।

বারি হলুদ-৩

এ জাতটি ২০০৩ সালে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবমুক্ত হয়। এ জাতের গাছের উচ্চতা গড়ে প্রায় ১১০-১২৫ সেমি। প্রতি গাছে মোথার ওজন প্রায় ১৫০-১৮০ গ্রাম এবং প্রতি গাছে হলুদের ওজন প্রায় ৭০০-৮০০ গ্রাম হয়ে থাকে। রং গাঢ় হলুদ। হেক্টরপ্রতি ফলন ২৫-৩০ টন। শুষ্ক পদার্থের পরিমাণ শতকরা ১৪-১৫%।

বারি হলুদ-৩

বারি হলুদ-৪

বারি হলুদ-৪

গাছের উচ্চতা ১১০-১২০ সেমি। পাতার সংখ্যা ২২-২৮ টি, পাতা ৫০-৫২ সে.মি. লম্বা। পাতার রং হালকা সবুজ। প্রতি গোছায় গাছের সংখ্যা ৩-৫টি। প্রতি গোছায় মোথার সংখ্যা ৩-৫ টি (৫৫-৬০ গ্রাম), ছড়ার (ফিংগার) সংখ্যা ২২-২৫ টি (৪৫০-৫৫০ গ্রাম), ছড়া (ফিংগার) ৯.০-৯.৫ সেমি লম্বা এবং ২.৫-৩.০ সেমি চওড়া। অন্তর রং (Core color) কমলা হলুদ (Orange Yellow) এবং শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকরা ২০-২২ ভাগ। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ২৮-৩০ টন।

বারি হলুদ-৫

গাছের উচ্চতা ১২০-১৩৫ সেমি ও পাতার সংখ্যা ২৪-৩০টি। পাতা ৬২-৬৫ সেমি লম্বা এবং ১৮-২০ সেমি চওড়া । পাতার রং হালকা সবুজ। প্রতি গোছায় গাছের সংখ্যা ৪-৬টি। প্রতি গোছায় মোথার সংখ্যা ৩-৪ টি (৩০-৪০ গ্রাম), ছড়ার (ফিংগার) সংখ্যা ২০-২২ টি (২৫০-৩০০ গ্রাম), ছড়া (ফিংগার) ৯.০-১০.০ সেমি লম্বা এবং ২.০-২.৫ সেমি চওড়া। অন্তর রং (Core color) গাঢ় কমলা হলুদ (Deep Orange Yellow) এবং শুষ্ক পদার্থের (Dry matter) পরিমাণ শতকরা ২৬-৩০ ভাগ। জাতটির হেক্টর প্রতি ফলন প্রায় ১৮-২০ টন।

বারি হলুদ-৫

বারি হলুদ-৪ ও বারি হলুদ-৫ এর উৎপাদন কৌশল

চাষের মৌসুমঃ খরিফ-১ মৌসুমে বারি হলুদ-৪ ও বারি হলুদ-৫ রোপণ করা হয়। সাধারণত মধ্য এপ্রিল থেকে মে মাসের ১ম সপ্তাহ (বৈশাখের ১ম থেকে ৩য় সপ্তাহ) হলুদ লাগানোর উপযুক্ত সময়। উভয় জাতই রোপণ করার ৯-১০ মাস পর উত্তোলন করা যায়।

বংশ বিস্তারঃ রূপান্তরিত কাণ্ড অর্থাৎ রাইজোম (কন্দ) দ্বারা হলুদের বংশ বৃদ্ধি হয়। মাতৃকন্দ ও পার্শ্বকন্দ (ফিংগার) বীজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পরিপুষ্ট, সুস্থ, চকচকে ও রোগবালাই মুক্ত কন্দ নির্বাচন করতে হবে। অপর দিকে অন্যান্য হলুদ জাতের মত মাতৃকন্দের স্বল্পতায় সেকেন্ডারী ফিংগার ও বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

বীজ হার: বারি হলুদ-৪ এর ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ২.৫-৩.০ টন কন্দের (রাইজোম) প্রয়োজন হয়। প্রায় ৪০-৪৫ গ্রাম ওজন বিশিষ্ট কন্দ (রাইজোম) থেকে ভাল ফলন পাওয়া যায়। অপর দিকে বারি হলুদ-৫ এর ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ১.৫-২.০ টন কন্দ (রাইজোম) প্রয়োজন এবং কন্দের (রাইজোম) ওজন প্রায় ২৫-৩৫ গ্রাম হওয়া বাঞ্চনীয়।

বীজ শোধন: বীজ বাহিত বিভিন্ন রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বীজ শোধন পূর্বশর্ত। হলুদের বিভিন্ন ধরনের ছত্রাকনাশক দিয়ে শোধন করা যায়। সেক্ষেত্রে রোপণের ৬-৮ ঘণ্টা আগে অটোস্টিন ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে হলুদ ৩০-৪০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে, তারপর পানি থেকে রাইজোম তুলে নিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে মূল জমিতে রোপণ করতে হবে।

মাটি শোধন: ভাল ফলন পেতে হলে বীজ ও মাটি বাহিত রোগ থেকে হলুদ ফসলকে মুক্ত রাখার জন্য মাটি শোধন করা আবশ্যক। শেষ চাষের আগে ফুরাডান বা কুরাটার ৫ কেজি হেক্টর হারে প্রতি ২৫-৩০ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

শষ্য পর্যায়: বারি হলুদ-৪ ও বারি হলুদ-৫ এর ভাল ফলন পেতে হলে শষ্য পর্যায় অবলম্বন করা আবশ্যক। পূর্ববর্তী ফসল আদা ও হলুদ জমিতে লাগালে পরের বছর সেই জমিতে হলুদ চাষ করা ঠিক নয়। তাছাড়া আলু বা অন্যান্য কন্দ জাতীয় ফসল মুক্ত জমি হলুদ চাষের জন্য নির্বাচন করতে হবে।

জমি তৈরি: মাটি গভীরভাবে কর্ষণ করে ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। মাটি যাতে ঝুরঝুরে হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। আগাছা, ও অন্যান্যা বর্জ্য পদার্থ জমি থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। মাটির বড় বড় ঢিলা ভেঙ্গে ছোট করতে হবে। সর্বোপরি ভালভাবে মই দিয়ে জমি সমান করে নিতে হবে।

রোপণ পদ্ধতি ও দূরত্ব: সাধারণত ২ টি পদ্ধতিতে হলুদ রোপণ করা যায়। একটি হলো Bed Method অপরটি Ridge Method। প্রথম পদ্ধতিতে (Bed Method) জমি প্রস্তুত হবার পর ১.২-১.৮ মি প্রস্থ ও ২৫-৩০ সেমি উচ্চতায় সুবিধাজনক দৈর্ঘ্যে বেড তৈরি করতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের জন্য দুই বেডের মাঝে ৬০ সেমি প্রশস্ত নালা রাখতে হবে। এই পদ্ধতিতে ৬০ সেমি পরপর সারি টেনে সারিতে ২৫ সেমি পরপর ৭-৮ সেমি গভীরে বীজ কন্দ (রাইজোম) রোপণ করে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। পরবর্তীতে দুই বেডের মাঝের নালা থেকে মটি উঠিয়ে দিতে হবে। Ridge পদ্ধতিতে উপরোক্ত নিয়মে সারি টেনে বীজ কন্দ রোপণ করে দু'সারির মাঝের মাটি উঠিয়ে বীজ কন্দ ভালভাবে ঢেকে দিতে হবে।

সারে পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: বারি হলুদ-৪ ও বারি হলুদ-৫ চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি নিম্নোক্ত জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করা হয়।

সারের নাম	প্রতি মাত্রা/হেক্টর
গোবর	৫ টন
ইউরিয়া	২২০ কেজি
টিএসপি	১২৫ কেজি
এমপি	২৬০ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি
বোরিক এসিড	২.২ কেজি

তবে মাটির উর্বরতার উপর নির্ভর করে বর্ণিত মাত্রা কম বেশি হতে পারে। জমি পরিষ্কার করে শেষ চাষের সময় বীজ রোপণের ৫-৭ দিন আগে সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, বোরিক এসিড, অর্ধেক এমপি সার মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সারের অর্ধেক বীজ রোপণের ৫০-৬০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমপি সার সমান দুই কিস্তিতে রোপণের ৮০-৯০ ও ১১০-১২০ দিন পর দ্বিতীয়বার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা

আগাছা দমন : আগাছা জমি থকে খাদ্য, আলোবাতাস ও স্থান দখল করে হলুদ গাছের দুর্বল করে ফেলে। তাছাড়া আগাছা বিভিন্ন রোগ ও পোকা-মাকড়ের আবাসস্থল হিসাবে কাজ করে। এতে ফসল সহজেই রোগ ও পোকা-মাকড় দ্বারা আক্রান্ত

হয় ও ফলন হ্রাস পায়। এজন্য হলুদের জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে। জমির অবস্থা বুঝে ৩-৪ বার আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। সাধারণত আগাছা পরিষ্কার করে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা হয়। সেক্ষেত্রে রোপণের ৫০-৬০, ৮০-৯০ ও ১১০-১২০ দিন পর আগাছা পরিষ্কার করলে ফলন ভাল হয়।

গোড়ায় মাটি তুলে দেয়া : রাইজোমের সঠিক বৃদ্ধি এবং পানি নিষ্কাশনের জন্য ২-৩ বার হলুদের দুই সারির মাঝখান থেকে মাটি তুলে সারি বরাবর গাছের গোড়ায় দিতে হবে। এতে করে হলুদের উপর থেকে মাটি সরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। সাধারণত আগাছা পরিষ্কারের পর পরই গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া হয়।

পানিসেচ ও নিষ্কাশন : হলুদ ফসল সাধারণত বৃষ্টি নির্ভর। তবে মাটি শুষ্ক হলে বীজ রোপণের পরপরই হালকা সেচ দিতে হবে। তাছাড়া মাটির ধরন ও আবহাওয়ার উপর ভিত্তি করে ৪-৫টি সেচের দরকার হতে পারে। হলুদের জমিতে পানি জমে থাকলে সহজেই রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। বৃষ্টি পানি যেন কোনভাবেই জমিতে না জমে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। নালা করে জমে থাকা পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

মালচিং : খড় বা লতা-পাতা দিয়ে জমি ঢেকে দেওয়াকে সহজ অর্থে মালচিং বলা হয়। হলুদ রোপণ করার পর মালচিং একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচর্যা, পরীক্ষণে দেখা গেছে যে, জমিতে রস সংরক্ষণ, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও ভূমিক্ষয় রোধের জন্য হেক্টর প্রতি ৮-১০ টন শুকনো পাতা বা খড় দিয়ে হলুদের জমি ঢেকে দিতে হবে। এতে আগাছার পরিমাণও কমে যায়। পরে মালচিং হিসাবে ব্যবহৃত পাতা বা খড় পচে জমিতে জৈব সার তৈরি করে।

ফসল সংগ্রহ: বারি হলুদ-৪ ও ৫ রোপণের ৯-১০ মাস পর গাছের উপরের অংশ হলুদ রং ধারণ করে সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে ফসল সংগ্রহ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, বীজ হলুদ সংগ্রহের জন্য সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্য থেকে শেষ সপ্তাহ উপযুক্ত সময়। এছাড়াও প্রায় এক মাস আগে অবীজ বা খাওয়ার জন্য (Fresh consumption) রাইজোম উত্তোলন করা যেতে পারে। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে মাটি আলগা করে নিতে হয়। এরপর রাইজোম সংগ্রহ করে শিকড় কেটে মাটি পরিষ্কার করা হয়। হলুদ উত্তোলনের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন রাইজোম ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

কিউরিং: হলুদের রাইজোম পরিষ্কার করার পর মোথা ও ছড়া পৃথক করতে হবে। সংগ্রহকৃত রাইজোম ছায়াযুক্ত পরিষ্কার স্থানে গাদা করে রাখা হয়। একে কিউরিং বলে। ২-৩ দিন হলুদের কিউরিং করা হয়। কিউরিং শেষ হলে বীজ হিসাবে সংরক্ষণ বা খাওয়ার জন্য সিদ্ধ করে প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়।

সংরক্ষণ: হলুদ সংরক্ষণের জন্য সতেজ ও রোগমুক্ত রাইজোম নির্বাচন করতে হবে। গর্ত খনন করে হলুদ রাখলে রাইজোমের আর্দ্রতা ও সতেজতা বজায় থাকে, ফলে বাজার মূল্য সঠিক থাকে। খড় বা ছনের চাল যুক্ত ঘরের মেঝেতে গর্ত করে হলুদ সংরক্ষণ করা হয়। ঘরের ভেতর বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ২৪ ইঞ্চি প্রশস্ত ১৫ ইঞ্চি গভীর ও প্রয়োজন মত লম্বা গর্ত (ট্রেন্চ) করা যেতে পারে। তবে গভীরতা বজায় রেখে যেকোন মাপের গর্ত করা যায়। গর্ত বা ট্রেন্চ করার পর ২-৩ দিন খুলে রাখতে হবে যতে মাটির অতিরিক্ত রস বের হয়ে যায়। শুকিয়ে অতঃপর গর্তের তলদেশে ২ ইঞ্চি পুরু করে শুকনো বালি বিছিয়ে দিতে হবে। এরপর বাছাই করা হলুদ গর্তে ১০ ইঞ্চি পুরু করে বিছিয়ে দিতে হবে। এরপর হলুদের স্তরের উপর ৩ ইঞ্চি পুরু মাটি বালি দিয়ে পুরো গর্ত ভালভাবে ঢেকে দিতে হবে।

রোগ ও পোকা আক্রমণ: বারি হলুদ-৪ ও বারি হলুদ-৫ জাত দুটিতে রোগ ও পোকার প্রাদুর্ভাব নাই বললেই চলে। জাত দুইটি লিফ স্পট ও লিফ ব্লচ রোগ সহনশীল, কদাচিৎ লিফবচ রোগের আক্রমণ দেখা যায়, এদের বর্ণনা ও দমন ব্যবস্থা নিম্নরুপ:

লিফব্লচঃ *Taphrina maculans* নামক ছত্রাক দ্বারা আক্রমণ হয়।

উৎপত্তি ও বিস্তার: আক্রান্ত রাইজোম ও বায়ুর মাধ্যমে রোগের বিস্তার ঘটে। গাছের আক্রান্ত শুকনো পাতা যেগুলো জমিতে পড়ে থাকে তার মাধ্যমে জীবাণু দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত অক্টোবর এবং নভেম্বর মাসে এ রোগের লক্ষণ দেখা যায়। যখন আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০% এবং তাপমাত্রা ২১-২৩° সে. থাকে তখন প্রাথমিক সংক্রমণ শুরু হয়। পরবর্তীতে ঠাণ্ডা এবং আর্দ্র আবহাওয়া রোগের তীব্রতা বেড়ে যায়।

ক্ষতির ধরন: সাধারণত গাছ একটু বড় হলেই এ রোগ দেখা যায়। পাতা আক্রান্ত হওয়ার ফলে অনেক আগেই গাছ শুকিয়ে যায়। গাছ খাদ্য উৎপাদন করতে পারে না। ফলে রাইজোমের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পরিশেষে ফলন হ্রাস পায়।

লিফব্লচ রোগে আক্রান্ত হলুদ গাছ

সতেজ ও রোগমুক্ত হলুদ গাছ

রোগের লক্ষণ

এ রোগটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাতার উভয় পৃষ্ঠায় ছোট ছোট গোলাকার বাদামী দাগের উপস্থিতি এবং পাতার উপর পৃষ্ঠায় সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। প্রথমে গাছের নিচের দিকের পাতা ফ্যাকাশে হলুদ রং ধারণ করে। পরবর্তীতে দাগগুলো অতিদ্রুত একত্রিত হয়ে সমস্ত পাতা হলুদ করে ফেলে। গাছ ঝলসানোর মত মনে হয় এবং ফলন মারাত্মক ভাবে কমে যায়।

দমন ব্যবস্থা

- রোগ মুক্ত জমি থেকে সংগৃহীত সুস্থ রাইজোম বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে।
- রোগাক্রান্ত এবং শুকনো পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- বীজ রোপণের আগে ম্যানকোজেব (০.৩%) অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের কোন ছত্রাকনাশক অথবা স্কোর (০.০৫%) দ্বারা বীজ হলুদ শোধন করে নিতে হবে।
- রোগ দেখা দেওয়া মাত্রই অটোস্টিন ২ গ্রাম অথবা মেটারিল ২.৫ গ্রাম অথবা ফলিকুর ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর ৩-৪ বার সম্পূর্ণ জমির গাছের পাতায় ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাতার উভয় দিকে ছত্রাকনাশক ভালভাবে লাগে।

রাইজোম রট বা কন্দ পচা

Pythium graminicolum ছত্রাক দ্বারা এই রোগ সৃষ্টি হয়। বারি হলুদ-৪ ও বারি হলুদ-৫ রাইজোম রট রোগ সহনশীল। যদি কোনভাবে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, সেক্ষেত্রে রোগের লক্ষণ ও দমন ব্যবস্থা নিম্নরূপ।

রোগের লক্ষণ

- প্রথমে গাছের নিচের পাতা হলুদ হতে শুরু করে এবং এক সময় পুরো গাছের পাতাই হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়।
- কাণ্ডের গোরায় দিকে পানি ভেজা দাগ দেখা যায় যা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে।
- আক্রান্ত কাণ্ড ভেঙ্গে যায় যা হাত দিয়ে টান দিলে সহজেই উঠে আসে।
- এই রোগ আস্তে আস্তে মাটির ভিতরের রাইজোমে ছড়িয়ে পড়ে এবং পচন সৃষ্টি করে।
- এক পর্যায়ে পুরো রাইজোমে পচন ধরে এবং পচা রাইজোম হতে দুর্গন্ধ বের হয়।

দমন ব্যবস্থা

- রোগ মুক্ত জমি হতে সংগৃহীত সুস্থ রাইজোম বীজ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।
- জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখতে হবে।
- শস্য পর্যায় অবলম্বন করতে হবে। একই জমিতে দুই বছর অন্তর অন্তর হলুদ চাষ করলে রোগ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।
- রোগাক্রান্ত এবং শুকনো পাতা সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে।

- ❀ রোগ দেখা দেওয়া মাত্রই অটোস্টিন ১ গ্রাম/লিটার অথবা মেটারিল ২.৫ গ্রাম/লিটার অথবা ফলিকুর ১ মিমি/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর অন্তর ৩-৪ বার সম্পূর্ণ জমির গাছের গোড়ায় স্প্রে করতে হবে যাতে মাটিও ভিজে যায়।
- ❀ বীজ রোপণের আগে ম্যানকোজেব (০.৩%) অথবা কার্বেন্ডাজিম গ্রুপের কোন ছত্রাকনাশক অথবা স্কোর (০.০৫%) দ্বারা বীজ হলুদ শোধন করে নিতে হবে।

ধনিয়া

ধনিয়া বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয় মসলা ও পাতা জাতীয় সবজি। ধনিয়া পাতা ভিটামিন 'এ' এবং 'ক্যারোটিন' সমৃদ্ধ। মসলা ছাড়াও ধনিয়ার চারা গাছে পাতা সালাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ধনিয়া মসলা হলেও এতে অনেক ভিটামিন রয়েছে। বাংলাদেশে ধনিয়ার চাষ বাড়িয়ে বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ রয়েছে।

ধনিয়ার জাত

বারি ধনিয়া-১

বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত এ জাতটি ১৯৯৬ সালে অনুমোদন করা হয়। পাতা সবজি ও বীজ ফসল হিসেবে বারি ধনিয়া-১ উৎপাদন করা যায়।

পাতা বহু বিভক্ত, ফুল সাদা ও যৌগিক আম্বেল। গাছের উচ্চতা ৪০-৯০ সেমি। পাতার আকৃতি বড় ও উজ্জ্বল সবুজ রঙের। প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ১৬-১৮টি। বীজ ডিম্বাকার হলদে। প্রতি গাছে ৪০০-৫০০টি বীজ হয়। পাতা ফসল ৩০-৩৫ দিনে এবং বীজ ফসল ১১০-১২০ দিনে সংগ্রহ করা যায়। হেক্টরপ্রতি পাতার ফলন ৩.০-৪.০ টন এবং বীজের ফলন ১.৭-২ টন।

বারি ধনিয়া-১

বারি ধনিয়া-২

বারি ধনিয়া ২

দেশ ও বিদেশ থেকে ধনিয়ার ১৭টি Germplasm সংগ্রহ করে ২০০৯ সাল হতে ২০১০ সাল পর্যন্ত ২ বছর মসলা গবেষণা কেন্দ্র, বগুড়ায় উক্ত Germplasm সমূহের ফলনসহ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা হয়। এরপর ২০১১ থকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রথমিক ফলন পরীক্ষার মাধ্যমে COR ১৫ লাইনটি উচ্চ ফলনশীল ধনিয়ার লাইন হিসাবে বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৩ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বারি ধনিয়া ১ Check হিসাবে ব্যবহার করে বাংলাদেশের লালমনিরহাট, বগুড়া, মাগুড়া, রাজশাহী, ফরিদপুর, গাজীপুর, পাহাড়তলী, চট্টগ্রামে আঞ্চলিক ফলন পরীক্ষা করা হয়। জাত হিসাবে অনুমোদনের জন্য ২০১৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ডে আবেদন করা হয় এবং ২০১৬ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড COR ১৫ লাইনটিকে বারি ধনিয়া-২ জাত হিসাবে অনুমোদন প্রদান করে।

জাতটির বৈশিষ্ট্য: গাছ উচ্চতায় ১০০-১৩৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রতি গাছে পাতার সংখ্যা ১৮-২১ টি। প্রতি গাছে গড় আম্বেল ৬৩ টি, প্রতি আম্বেলে আম্বেললেটের সংখ্যা প্রায় ৬ টি এবং প্রতি আম্বেললেটে বীজের সংখ্যা প্রায় ৬ টি। প্রতি ১০০০ বীজের গড় ওজন ১১.৫৩ গ্রাম। বীজগুলো হরিদ্রা বর্ণের মাঝারী আকারের। পাতা ও বীজ উভয়ই ব্যবহার্য। শুকনা বীজ এর ফলন প্রতি হেক্টরে ১.৭-২.০ টন। এজাতের ধনিয়া বিশেষ বৈশিষ্ট্য (মে থেকে আগস্ট ব্যতিত) বছরের বেশীর ভাগ সময় পাতা হিসাবে চাষ করা যায়। যার ফলন হেক্টর প্রতি ৩-৪ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও আবহাওয়া: প্রায় সব রকমের মাটিতেই এজাতটি চাষ করা যায়। তবে বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটি ধনিয়া চাষের জন্য উপযোগী। ধনিয়া জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না বিধায় জমির পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঠাণ্ডা আবহাওয়া ধনিয়ার বীজ উৎপাদনের জন্য অনুকূল বলে রবি মৌসুমে এর চাষ করা হয়ে থাকে। উচ্চ তাপমাত্রায় ও খরায় ধনিয়া বীজের ফলন ভাল হয় না। ফুল ফোটার সময় বৃষ্টি এবং অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও কুয়াশা হলে ধনিয়ার ফলন কমে যায়। তবে অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে ধনিয়া পাতার উৎপাদন ব্যহত হয়ে থাকে।

বপন সময়: কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ (মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর) মাস বীজ ফসলের জন্য উত্তম। তবে সবুজ পাতা ধনিয়ার জন্য (মে থেকে আগস্ট মাস ব্যতিত) যে কোন সময় বপন করা যায় এবং ভাল দাম পাওয়া যায়। সাথী ফসল হিসাবে শাক-সবজি, আখ, আলু, ডাল ফসলের জমিতে ধনিয়া চাষ করা যায়। অতিরিক্ত সূর্যালোকে বীজ বপন করলে অঙ্কুরোদগমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। ধনিয়া বীজের জন্য বিলম্বে বীজ বপনে এর স্বাবাভিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং বিভিন্ন রোগবালাই এর আক্রমণ বেড়ে যায়।

জমি তৈরি: মাটির প্রকারভেদে ৪-৬ টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে জমি তৈরি করতে হবে। পরে জমিকে কয়েকটি ব্লকে ভাগ করে এবং দুই ব্লকের মাঝে পানি নিষ্কাশনের জন্য ৪০ সেমি নালা রেখে জমি তৈরি করা হয়।

বীজের হার: সারিতে হেক্টর প্রতি ৮-১০ কেজি এবং ছিটিয়ে বোনার ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ১০-১২ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। ধনিয়া পাতার জন্য হেক্টরপ্রতি ৩৫-৪০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বীজ বপন: বপনের পূর্বে বীজগুলো বস্তা বা চটের ব্যাগে নিয়ে ঘষে দু'টুকরো করে নিলে ভালো হয়। ধনিয়ার খোসা খুব শক্ত হওয়ায় বীজ বোনার আগে পানিতে ২৪-৪৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে বুনলে তাড়াতাড়ি অঙ্কুরোদ্গম হয়। মাটির ২-৩ সেন্টিমিটার গভীরে বীজ বপন করে ৩০ x ৪০ সেমি দূরত্বে বীজ বপন করতে হয়। বপনকৃত বীজ অঙ্কুরোদগম হতে সাধারণত ৮-২১ দিন সময় লাগে। কোন কোন ক্ষেত্রে এর চাইতেও বেশি সময় লাগতে পারে। জমির আর্দ্রতার উপর নির্ভর করে বীজ বপনের পর পরই হালকা সেচ দিতে হবে। তাতে অঙ্কুরোদ্গম বৃদ্ধি পাবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ধনিয়া চাষে হেক্টরপ্রতি নিচের হারে সার প্রয়োগ করতে হয়:

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা হিসেবে প্রয়োগ	
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি
গোবর	৫ টন	সব	-	-
ইউরিয়া	১৫০-১৮০ কেজি	-	৭৫-৯০ কেজি	৭৫-৯০ কেজি
টিএসপি	১১০-১৩০ কেজি	সব	-	-
এমওপি	৯০-১১০ কেজি	সব	-	-
জিপসাম	১১০ কেজি	সব	-	-
জিঙ্ক	৩ কেজি	সব	-	-
বোরন	১.৫ কেজি	সব	-	-

জমি তৈরির সময় সমস্ত গোবর, এমওপি, জিপসাম, টিএসপি, জিংক বোরন সার প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং চারা গজানোর ৪০ দিন পর বাকি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা: বীজ বপনের ১৫-২০ দিনের মধ্যে প্রথম নিড়ানী দিতে হবে। একইভাবে একইসময়ের ব্যবধানে পরবর্তীতে ২-৩টি নিড়ানী দিতে হবে। প্রতিবার সেচের পর জমির 'জো' আসা মাত্র মাটির চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। চারা গজানোর পর থেকে ২/৩ ধাপে ৪-৫ দিন পরপর নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে চারা পাতলা করে দিতে হবে।

সেচ: ধনিয়া ফসলে ৪-৫ টি হালকা সেচ প্রয়োগ করতে হবে। গজানোর সময় হালকা সেচ, ফুল আসার আগে ও দানা গঠনের সময় সেচ দেওয়া খুবই প্রয়োজন। এতে বীজ পুষ্ট ও ফলন বেশি হয়।

পোকামাকড়: কীটপতঙ্গের মধ্যে জাব পোকা ধনিয়ার প্রধান শত্রু। কালচে রঙের ছোট পোকা গাছের কাণ্ডসহ প্রায় সব জায়গাতেই ঘন হয়ে বসে গাছের রস চুষে খায়। আক্রমণ বেশি হলে পাতা হলদে হয়ে গাছ শুকিয়ে যায়। গাছে ফুল ও ফল ধরার সময় জাব পোকার আক্রমণ বেশি হয়।

দমন: প্রতি লিটার পানিতে ১-২ মিলিলিটার ম্যালাথিয়ন-১০০ ইসি বা ১ মিলিলিটার কনফিডর-২৫ ইসি ভালোভাবে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে।

রোগবালাই: পাউডারি মিলডিউ ধনিয়ার মারাত্মক রোগ। এ রোগের আক্রমণে গাছের কাণ্ডসহ বিটপ অংশে সাদা পাউডারের মতো গুঁড়া দেখা যায়। আক্রান্ত পাতার সবুজ রং নষ্ট হয়ে যায় ও পাতা শুকিয়ে যায়। গাছে ফুল হলেও ফল ধরে না, এমনকি আগে ফল ধরলে তা পুষ্ট হয় না। শীতের সময় হঠাৎ মেঘ করে তাপমাত্রা কমে গেলে এ রোগ দেখা দেয়। নাবি ফসলে এই রোগের আক্রমণ বেশি হয়।

দমন: প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম থিওভিট ভালোভাবে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে।

কাণ্ড ফোলা বা গল রোগ

কাণ্ড ফোলা রোগ ধনিয়ার প্রায় ৮০ ভাগ ক্ষতি করে থাকে। *প্রোটোমাইসিস* প্রজাতির ছত্রাকের আক্রমণে কাণ্ড ফোলা রোগ হয়ে থাকে। এটি একটি মাটি এবং বীজ বাহিত রোগ যা বীজের সাথে বা বাতাসের ধুলা বালির সাথে উড়ে এক জমি হতে অন্য জমিতে বা এক এলাকা হতে অন্য এলাকায় বিস্তার লাভ করে থাকে। শিকড় ব্যতিত গাছের শাখা-প্রশাখা ফুলে যায়। ধীরে ধীরে এ ফোলা বিস্তৃত হয়ে সমস্ত কাণ্ড, শাখা-প্রশাখা ও পুষ্পমঞ্জুরী আক্রান্ত হয়। পুষ্প মঞ্জুরীতে আক্রমণ হলে ফুল শুকিয়ে মরে যায়। বীজে আক্রমণ করলে বীজের আকার বড় হয়ে যায়।

দমন

- বীজ বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের জন্য ২ গ্রাম হারে অটোস্টিন দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।
- আক্রমণের প্রাথমিক অবস্থায় অটোস্টিন বা রিডোমিল গোল্ড (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম) ১০ দিন অন্তর ৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- শেষ চাষের পূর্বে জমিতে হেক্টরপ্রতি ৭-৮ কেজি কার্বোফুরান প্রয়োগ করলে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়।

ফসল সংগ্রহ: বপনের ৪৫-৫০ দিন পর গাছে ফুল আসে এবং ১৩৫-১৪০ দিন পর ধনিয়া পাকে। পাকলে গাছ হলদে হয়ে পাতা শুকিয়ে যায়। সাধারণত খুব ভোরে অর্থাৎ সূর্যের আলোর প্রখরতা বৃদ্ধির পূর্বে গাছ উঠাতে হবে। ধনিয়ার বীজ হালকা সবুজ অবস্থায় থাকতেই গাছ তুলতে হবে। নতুবা বীজের মান ভাল হয় না। বীজ রোদে শুকিয়ে মাড়াই-ঝাড়াই করে পৃথক করা হয়। বীজে আর্দ্রতার পরিমাণ ১০% রেখে শুকিয়ে ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

বীজ উৎপাদন ও সংরক্ষণ: ধনিয়া পর-পরাগায়িত ফসল। ইহার বীজ উৎপাদনের জন্য জাতের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হলে অন্য জাত থেকে ১,০০০ মিটার দূরত্বে চাষ করতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন জাতের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হলে, তা ফুল আসার পূর্বেই তুলে ফেলতে হবে। বীজ আহরণের পর ৫-৭ দিন রোদে শুকিয়ে মাড়াই-ঝাড়াই করে বীজ পৃথক করতে হবে এবং ভালভাবে শুকিয়ে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে। বীজের স্বাভাবিক রং এবং সুগন্ধ বজায় রাখার জন্য পাটের বস্তায় পলিথিনের ব্যাগে সংরক্ষণ করতে হবে।

গোলমরিচ

গোল মরিচ বহুবর্ষজীবী লতা জাতীয় গাছ। চির সবুজ পাতা অনেকটা পানের মতো। গোল মরিচ গাছের আপন আকর্ষি দিয়ে সহায়ক গাছকে আকড়িয়ে থাকে। ইহা ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলের চির হরিৎ বন ভূমির একটি দেশিয় গাছ।

গোলমরিচের জাত

জৈন্তিয়া গোলমরিচ

জৈন্তিয়া গোলমরিচ জাতটি মালয়েশিয়া ও শ্রীলংকা থেকে আনা বিভিন্ন জাত থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৯৯২ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কতৃক অনুমোদিত হয়।

জৈন্তিয়া গোলমরিচ

এ জাতটি ভাল বাওনী পেলে ১০-১১ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রতি বছর নিয়মিত ফল দেয়। স্বাদ ঝাল, দানা পুষ্ট ও বড় আকৃতির। গাছপ্রতি ফলন ১.২৫-১.৫০ কেজি শুকনা গোল মরিচ। হেক্টর প্রতি ফলন ১.৫-২.০ টন/হেক্টর (শুকনা মরিচ)।

উৎপাদন প্রযুক্তি

চারা উৎপাদন: কেবল অযৌন পদ্ধতিতে গোলমরিচের বংশ বিস্তার হয়। সেন্ট্রাল সিডার যা প্রধান গাছের গোড়া থেকে গজায় এমন লতা থেকে চারা (কাটিং) সংগ্রহ করাই উত্তম। কমপক্ষে ৩-৪টি গিঁটসহ ৩০-৪৫ সেমি লম্বা শাখা কাটিং হিসেবে নিতে হবে। কাটিংগুলো সরাসরি সহায়ক গাছের গোড়ায় লাগানো যেতে পারে এতে উৎপাদন খরচ অনেক কম হয়। বীজতলায় কাটিং লাগালে ২০-৩০ দিনের মধ্যে নতুন কুঁড়ি বের হতে শুরু করে। এক বছর বয়সের কাটিং বাগানে লাগানো উত্তম।

জমি তৈরি: গোলমরিচের জন্য পাহাড়ী উর্বর দোআঁশ মাটি প্রয়োজন এবং দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

চারা রোপণ: মে-আগস্ট মাসে প্রত্যেক সহায়ক বৃক্ষের পাশে তৈরি গর্তে ২-৩টি কাটিং লাগাতে হবে এরপর পানি দিতে হবে। কাটিংগুলি সহায়ক বৃক্ষের উত্তর পার্শ্বে লাগানো হলে সূর্যের তাপ কম লাগবে। সূর্য তাপ হতে প্রাথমিকভাবে রক্ষার জন্য পাতাওয়ালা গাছের ডাল বা অন্য কোনভাবে ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কাঁঠাল, সুপারী, জিগা, সজিনা, শিমুল ইত্যাদি সহায়ক আশ্রয়দাতা গাছ বৃক্ষ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোপণ দূরত্ব: গাছ রোপণের দূরত্ব ৪ মি. ও প্রতি বেডে সারির দূরত্ব ৪ মি.। গাছের গোড়ার গর্তের আকার ৩০ × ৩০ × ৩০ সেমি।

সারের পরিমাণ: গাছের বৃদ্ধি এবং ভাল ফলন পেতে হলে সময়মতো প্রয়োজনীয় সার উল্লিখিত হারে প্রয়োগ করতে হবে। রোপণের সময় সারের পরিমাণ (১নং টেবিল)।

সারের নাম	প্রতি গর্তে সারের পরিমাণ	গাছপ্রতি সার প্রয়োগ	
		প্রথমবার (বর্ষার শুরুতে)	দ্বিতীয়বার (বর্ষার শেষে)
গোবর বা কম্পোস্ট (কেজি)	১০	-	-
খৈল (গ্রাম)	২৫০	-	-
টিএসপি (গ্রাম)	১১৫	-	-
ইউরিয়া (গ্রাম)	-	৫০	৫০
মিউরেট অব পটাশ (গ্রাম)	১১৫	-	-

বয়স অনুযায়ী গাছপ্রতি সারের পরিমাণ ও প্রয়োগের সময় নিচে দেয়া হল (২নং টেবিল)।

সারের নাম	১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	৪র্থ বছর
গোবর বা কম্পোস্ট (কেজি)	-	৫	-	৫
টিএসপি (গ্রাম)	-	২৫০	-	-
ইউরিয়া (গ্রাম)	৭৫	৭৫	৭৫	৭৫
মিউরেট অব পটাশ (গ্রাম)	৫০	৫০	৫০	৫০

সার প্রয়োগ: প্রথমবার সার প্রয়োগ করতে হবে বর্ষা শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা বৈশাখ মাসে (মধ্য-এপ্রিল থেকে মধ্য-মে) এবং ২য় বার বর্ষার শেষে অর্থাৎ আশ্বিন (মধ্য-সেপ্টেম্বর থেকে মধ্য-অক্টোবর) গর্তগুলি ১০-১২ দিন খোলা রাখার পর প্রতি গর্তে উক্ত গোবর ও সার (১নং টেবিল) গর্তের মাটির সাথে মিশিয়ে পূর্ণ করে রাখতে হবে।

পানি সেচ: রোপণের সময় মাটি শুকনো থাকলে সেচ দিতে হবে। খরা মৌসুমে এমনভাবে সেচ দিতে হবে যাতে মাটিতে সব সময়ে রস থাকে। সবচেয়ে ভাল হয় যদি একটি ছিদ্রযুক্ত কলসি অথবা ছিদ্রযুক্ত পলিথিন ব্যাগ পানি ভর্তি

করে সহায়ক গাছের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া হয়। ছিদ্র দিয়ে সারাক্ষণ ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়তে থাকলে গাছের বৃদ্ধি এবং ফলের জন্য সবচেয়ে উপকারী। অতি বৃষ্টির সময় যাতে গাছের গোড়ায় পানি না জমে সেজন্য নালা কেটে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ছাঁটাইকরণ: গোলমরিচ গাছের শাখা-প্রশাখা বেড়ে অতিরিক্ত ঝোপ হয়ে গেলে তা সামান্য পরিমাণে ছেঁটে পাতলা করে দিতে হবে। প্রথম পাঁচ বছর গোলমরিচ গাছের তেমন কোন ছাঁটাইয়ের প্রয়োজন হয় না। তবে ফসল সংগ্রহের সুবিধার জন্য লতার আগা কেটে দেয়া যেতে পারে। এতে পার্শ্ব শাখাগুলো মজবুত এবং অধিক ফল দেয়। বর্ষা মৌসুমে গোলমরিচ গাছ যেন প্রচুর আলো-বাতাস পায় সেজন্য প্রয়োজনমতো সহায়ক গাছ বর্ষা মৌসুমের শুরুতে ছেঁটে দিতে হবে।

রোগ ও পোকা দমন: গোলমরিচের গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে ডায়াথেন ৪৫ প্রতি লিটার পানিতে ২-৫ গ্রাম হারে ৭ দিন পর পর ৩ বার স্প্রে করতে হবে। গোলমরিচে লাল ও কালো পিপড়ার আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিক অবস্থায় এদের ধ্বংস করতে হবে।

মাড়াই ও ফলন: লতা রোপণের ৩-৪ বছরের মধ্যে ফসল ধরা শুরু হয়। একটি গাছ পূর্ণ উৎপাদনের অবস্থায় আসে ৭-৮ বছর বয়সে এবং ২০ বছর পর্যন্ত ভাল ফলন দেয়। গোলমরিচ গাছে এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথমার্ধে ফুল আসে। ১০-১৫ সেমি লম্বা গুচ্ছে খুব ছোট হলুদ ফুল ফোটে যা পরবর্তী সময়ে পাকা বেরিতে (ফল) রূপান্তরিত হয়। ডিসেম্বর (মধ্য-অগ্রহায়ণ থেকে মধ্য-পৌষ) মাসের শেষ ভাগে যখন ২-১টি ফল লাল হয় তখনই সম্পূর্ণ গুচ্ছটি কেটে নিত হয়।

পূর্ণবয়স্ক একটি গাছ গড়ে ২.৫-৩ কেজি কাঁচা গোল মরিচ ফলন দেয় যা প্রক্রিয়াজাতকরণ ও শুকানোর পর গড়ে ১.২৫-১.৫০ কেজি হয়।

ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ: সংগ্রহের পর ফলগুলো গুচ্ছ থেকে আলাদা করে একটি পাত্রে জমা করতে হবে। তারপর দানাগুলো ফুটন্ত পানিতে ১০ মিনিট সিদ্ধ করে পানি ঝরা দিয়ে ফলগুলো রোদে শুকাতে হবে। যে পানিতে দানাগুলো সিদ্ধ করা হয়েছে সেই পানি কিছুক্ষণ পর পর দানাগুলোর উপর ছিটিয়ে দিতে হবে। এতে শুকনা গোল মরিচের রং সুন্দর হয়, সুগন্ধ অটুট থাকে এবং ঝাল নষ্ট হয় না। এভাবে ৬-৭ দিন ভালভাবে রোদে শুকিয়ে বাজারজাত করা যায়।

আদা

আদা (*Zingiber officinale*) বাংলাদেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী মসলা ফসল হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়। সুদূর অতীত থেকে আদা মসলা হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটি কাঁচা, শুকনা ও সংরক্ষিত অবস্থায় খাওয়া হয়ে থাকে। বিভিন্ন ঔষধি গুণ সম্পন্ন এই ফসল ব্যাথানাশক, প্রদাহ, বাতরোগ, ডায়াবেটিস, রক্তের কোলেস্টরল কমানো, অন্ত্রের রোগ ও সর্দি কাশি প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য তৈরির ক্ষেত্রে আদা একটি অন্যতম উপাদান। কাঁচা আদায় শতকরা ২.৩ ভাগ প্রোটিন, ১২.৩ ভাগ শ্বেতসার, ১.০-৩.০০ ভাগ উদ্বায়ী তেল, ২.৪ ভাগ আঁশ, ১.২ ভাগ খনিজ পদার্থ, ৮০.৮ ভাগ পানি, রেজিন ইত্যাদি উপাদান বিদ্যমান। বাংলাদেশের কৃষক পর্যায়ে আদার গড় ফলন ৮.৫.০ টন/হেক্টর। যা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। দেশে প্রতি বৎসর আদার চাহিদা ২.৩৫ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রতি বছর গড়ে ৯ হাজার হেক্টর জমিতে ৭৭ হাজার মেট্রিক টন আদা উৎপন্ন হয়, যা চাহিদার তুলনায় কম (বিবিএস ২০১৫-১৬)। ফলন কম হওয়ার মূল কারণ উন্নত ফলনশীল জাত এবং উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতির অভাব। আদার ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে মসলা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীবৃন্দ কয়েক বৎসর যাবত গবেষণা কার্যক্রম চালিয়ে বাছাইকরণের মাধ্যমে বারি আদা-২ ও বারি আদা-৩ নামে ৩টি উচ্চ ফলনশীল আদার জাত উদ্ভাবন করেছেন।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার উষ্ণ অঞ্চল আদার উৎপত্তি স্থান। বাংলাদেশের লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর, দিনাজপুর, টাঙ্গাইল, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় আদার চাষ করা হয়। এছাড়া ভারত, চীন, বার্মা, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, জ্যামাইকা, নাইজেরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, সিওরালিওন, ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল ইত্যাদি দেশে আদার ব্যাপক চাষ হয়।

আদার জাত

বারি আদা-১

জাতটি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ২০০৮ সালে উদ্ভাবন করা হয়। গাছের উচ্চতা প্রায় ৮০ সেমি। প্রতি গোছায় পাতার সংখ্যা ২১-২৫টি এবং পাতাগুলি আংশিক খাড়া প্রাকৃতির। প্রতি গোছায় টিলারের সংখ্যা ১০-১২টি। প্রতিটি গোছায় রাইজোমের ওজন ৪০০-৪৫০ গ্রাম। প্রচলিত জাতগুলির চেয়ে এর ফলন তুলনামূলকভাবে বেশি। স্থানীয় জাতের মত বারি আদা-১ সহজে সংরক্ষণ করা যায়।

বারি আদা-১

বারি আদা-২

আদা বহুবর্ষজীবী উদ্ভিদ হলেও বর্ষজীবী হিসাবেই সাধারণত আবাদ করা হয়। বারি আদা-২ একটি উচ্চ ফলনশীল জাত যা ১৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি. কৃষকের চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত হয়েছে। এ জাতের জীবনকাল ৩০০-৩১৫ দিন, গাছের গড় উচ্চতা ৮৮ - ৯০ সে.মি, গড় পাতার সংখ্যা ৪৯৫ - ৫০৩ টি, গড় কুশির সংখ্যা ২৯ - ৩০টি, গড় প্রাইমারী রাইজোমের ওজন ৬৭ - ৭০ গ্রাম, গড় সেকেন্ডারী রাইজোমের ওজন ৫৫০- ৫৫৭ গ্রাম, জাতটির হেক্টরপ্রতি ৩৭.৯৯ টন পর্যন্ত ফলন হয় যা বারি আদা-১ থেকে শতকরা ৭৬.৫৩% বেশি, জাতটি কাণ্ডপচা রোগ সহনশীল।

বারি আদা-২

বারি আদা-৩

বারি আদা-৩ একটি উচ্চ ফলনশীল জাত যা ১৯ মার্চ ২০১৭ খ্রি. কৃষকের চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়েছে। এ জাতের জীবনকাল ৩০০-৩১০ দিন, গাছের গড় উচ্চতা ৭৫-৭৯ সেমি, গড় পাতার সংখ্যা ৪২৫-৪২৯ টি, গড় কুশির সংখ্যা ২৪-২৬ টি, গড় প্রাইমারী রাইজোমের ওজন ৫৯-৬০ গ্রাম, গড়। সেকেন্ডারী রাইজোমের ওজন ৪৪০-৪৪২ গ্রাম, জাতটির হেক্টর প্রতি ২৯.০৫ টন, জাতটি কাণ্ডপচা রোগ সহনশীল।

বারি আদা-৩

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া জলবায়ু: আমাদের দেশে আদার উৎপাদনকাল সমগ্র খরিফ মৌসুমব্যাপী বিস্তৃত। আদার জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র আবহওয়া দরকার। অল্প ছায়াযুক্ত স্থানে আদা ভাল হয়। আদা রোপণের পরপরই গজানো জন্য মাটিতে যথেষ্ট রস থাকা দরকার। তাই রোপণের পর বৃষ্টিপাত না হলে জমিতে সেচ প্রদান করতে হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে ১৫০০ মিটার উঁচু পার্বত্য অঞ্চলেও আদা চাষ করা যায়। আদার জন্য বাৎসরিক ৩,০০০ মিমি বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। আদা ২৮-৩৫° সে. তাপমাত্রা চাষাবাদ করা যায় তবে তাপমাত্রায় ১০° সে. এর নিচে নেমে গেলে আদা গাছ মারা যায়।

মাটি: উর্বর দোআঁশ মাটি আদার চাষের জন্য সবচেয়ে ভাল। তবে বেলে দোআঁশ থেকে এঁটেল দোআঁশ মাটিতেও চাষ আদা চাষ করা যায়। এঁটেল দোআঁশ মাটিতে চাষ করতে হলে পানি নিষ্কাশনের খুব ভাল ব্যবস্থা থাকতে হবে। জমিতে পানি বেঁধে থাকলে আদা পচে নষ্ট হয়ে যায়।

বীজ রোপণ সময়: এপ্রিল মাসের প্রথম-দ্বিতীয় সপ্তাহে রোপণকৃত বারি আদা-আদা-২ ও আদা- ৩ থেকে ফলন সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। আদা মে মাস পর্যন্ত রোপণ করা যায়। গাছের দৈহিক বৃদ্ধির ৩-৪ মাস পর রাইজম উৎপন্ন হয়। তাই দেরিতে রোপণকৃত আদা গাছের বৃদ্ধি যথাযথ না হওয়ার কারণে ফলন কম হয়।

জমি শোধন: আদা গাছে কাণ্ড পচা রোগের আক্রমণ সবচেয়ে বেশি। এ রোগ প্রতিরোধের জন্য মাটি শোধন করতে হয়। মাটি শোধনের কয়েকটি পদ্ধতি নিচে দেওয়া হলো।

- নিম খৈল প্রতি শতকে ২ কেজি হারে প্রয়োগ করে মাটি শোধন করা যায়।
- ফুরাডান প্রতি বিঘায় ২-২.৫ কেজি হারে প্রয়োগ করে মাটি শোধন করা যায়।
- আদা লাগানোর ১৫-২০ দিন পূর্বে জমি ভালভাবে চাষ দিয়ে মাটি আলগা করে মাটির উপরে ধানের তুষ বা কাঠের গুঁড়া স্তর আকারে বিছিয়ে তাতে আগুন দিয়ে মাটি শোধন করা যায়।

জমি তৈরি: মার্চ-এপ্রিল মাসে বৃষ্টি হওয়ার পর জমিতে যখন 'জো' আসে তখন ৬-৮ টি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করা হয়। এরপর ১.৫ মিটার প্রস্থ এবং ৪ মিটার দৈর্ঘ্যের বা জমির আকার অনুযায়ী দৈর্ঘ্যের বেড তৈরি করে নিয়ে চারিদিকে ১-১.৫ ফুট গভীর নালা করে নালার মাটি বেডের উপর দিয়ে বেডকে উঁচু করতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য দুটি বেডের মাঝখানে ৫০ সেমি প্রশস্ত নালা রাখতে হবে।

বীজের আকার এবং হার: ফলন বীজের আকারের উপর নির্ভর করে। এজন্য ২৫-৫০ গ্রাম পর্যন্ত বীজ লাগানো যায়। তবে আর্থিক ও প্রাপ্যতা বিবেচনায় গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে যে ৪০-৪৫ গ্রাম আকারের বীজ আদা রোপণ করলে লাভজনক ফলন পাওয়া যায়। এ আকারের বীজ ব্যবহার করলে হেক্টরপ্রতি ২৮০০-৩০০০ কেজি আদার দরকার হয়।

বীজ শোধন: বীজের মাধ্যমে আদা সংক্রমিত হয় বিধায় নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আদা বীজ শোধন করতে হবে। এ জন্য ৭৫-৮০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ বা অন্য কোন ছত্রাকনাশক ঔষধ মিশিয়ে তার মধ্যে ১০০ কেজি আদা বীজ ৩০-৪০ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে। এরপর উক্ত বীজ আদা উঠিয়ে ছায়াযুক্ত জায়গায় শুকাতে হবে এবং তারপর জমিতে রোপণ/লাগাতে হবে। আদা বীজ জমিতে লাগানোর পূর্বে ঝুড়িতে বিছিয়ে তার উপর খড়/চটের বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখলে কয়েকদিনের মধ্যে ভ্রূণ বের হয়। এ রকম গাজানো আদা বীজ থেকে দ্রুত আদার গাছ জন্মায়।

বীজ রোপণ: বারি আদা-১ এর বীজ দুইভাবে রোপণ করা যায় যেমন- বহুসারি পদ্ধতি ও একক সারি পদ্ধতি বহুসারি পদ্ধতি আদা বীজ বেডে সারি থেকে সারি ৩০ সেমি দূরত্বে এবং রাইজম/কন্দ থেকে কন্দ ২৫ সেমি দূরত্বে রোপণ করা হয়। একক সারি পদ্ধতিতে বীজ আদা সরু লাঙ্গল বা রো-কোদাল দিয়ে ৫০-৬০ সেমি দূরে দূরে ৫-৬ সেমি গভীর করে সারি তৈরি করে এতে ২৫-৩০ সেমি দূরত্বে বীজ আদা লাগাতে হয়। সারিতে বীজ আদা লাগানোর সময় বীজের অঙ্কুরিত মুখ একইদিকে রাখতে হয় রোপণের ৭৫-৯০ দিন পর সারির এক পার্শ্বের মাটি সরিয়ে সহজেই পিলাই সংগ্রহ করা যায়। এভাবে পিলাই আদা সংগ্রহ করে বিক্রি করলে বীজের খরচ ৫০-৬০ ভাগ উঠে আসে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: কৃষি পরিবেশ অঞ্চলের উপর সারের পরিমাণ নির্ভর করে। বেশি ফলন পেতে হলে আদার জমিতে প্রচুর পরিমাণ জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

বারি আদা-১, ২ ও ৩ এর জন্য প্রতি হেক্টরে নিম্নোক্ত পরিমাণে জৈব ও অজৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	মোট পরিমাণ (কেজি)	শেষ চাষের সময় দেয় (কেজি)	পরবর্তী কিস্তি (কেজি)		
			প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
গোবর	৫ টন	৫টন	-	-	-
ইউরিয়া	৩০৪ কেজি	-	১৫২	৭৬	৭৬
টিএসপি	২৬৭	২৬৭	-	-	-
এমপি	২৩৩	১১৬.৫০	-	৫৮.২৫	৫৮.২৫
জিংক	৩	৩	-	-	-
জিপসাম	১১১	১১১	-	-	-

প্রতি শতকে সার প্রয়োগের পরিমাণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

সার	মোট পরিমাণ (কেজি)	শেষ চাষের সময় দেয় (কেজি)	পরবর্তী কিস্তি (কেজি)		
			প্রথম	দ্বিতীয়	তৃতীয়
গোবর	২০	২০	-	-	-
ইউরিয়া	১.২৩	-	০.৬১৫	০.৩০৮	০.৩০৮
টিএসপি	১.০৮	১.০৮	-	-	-
এমওপি	০.৯৪	০.৪৭	-	০.২৩৫	০.২৩৫
জিংক	০.১২	০.১২	-	-	-
জিপসাম	০.৪৫	০.৪৫	-	-	-

সম্পূর্ণ গোবর সার, টিএসপি, জিপসাম, জিংক ও অর্ধেক এমওপি জমি তৈরির শেষ চাষের সময় মাটিতে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। প্রথম কিস্তিতে অর্ধেক ইউরিয়া আদা লাগানোর ৫০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার ২য় ও ৩য় কিস্তিতে সমান দুইভাগে ভাগ করে বপনের যথাক্রমে ৮০ ও ১১০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা: বীজ রোপণের ২-৩ সপ্তাহ পর আদা গাছ বের হয়। আদা লাগানোর পর প্রয়োজনে জমিতে সেচ দিতে হবে। রোপণের ৪-৫ সপ্তাহ পর থেকে জমির আগাছা ভালভাবে পরিষ্কার করে দিতে হবে। এরপর প্রতিবার ইউরিয়া সার প্রয়োগ করার পূর্বে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। সার প্রয়োগ করে গাছের গোড়ায় মাটি তুলে দিতে হবে। এছাড়াও গাছের কাণ্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি, রাইজমের সঠিক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য ২-৩ বার আদার দুই সারির মাঝখান থেকে মাটি তুলে সারি বরাবর আদার গাছের গোড়ায় দিতে হবে।

মালচিং প্রয়োগ: ধানের খড়, কচুরিপানা বা অন্য গাছের লতা পাতা দিয়ে মালচিং করে আদা চাষ করা যায়। এতে উৎপাদন খরচ যেমন কমানো যায় অন্যদিকে মাটি আর্দ্রতাও সংরক্ষণ করা যায়। ফলে বীজ আদা থেকে তাড়াতাড়ি গাছ বের হতে পারে।

ছায়া প্রদান: আদা আংশিক ছায়া পছন্দকারী ফসল। সরাসরি প্রখর সূর্যালোকে আদা গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ব্যহত হয়। এক্ষেত্রে আদার মাঠে ৩ - ৪ সারি পর পর এক সারি করে ধৈঞ্চার বীজ ৪-৫ ফুট দূরত্বে বপন করে ছায়ার ব্যাবস্থা করা যেতে পারে। এতে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ভাল হয়।

রোগ ও পোকামাকড়

রাইজোম রট বা কন্দ পচা: কন্দ পচা রোগ আদা ফসলের একটি বিনাশকারী মারাত্মক রোগ। এই রোগের আক্রমণে আদা ফসলের ক্ষেত সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে ও ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। এটি মাটি ও বীজবাহিত রোগ। Pythium sp. (P. aphanidermatum, P. debaryanum & P. gingiberasum), Fusarium sp., Pseudomonas sp. ইত্যাদি জীবাণু এবং Melodygyne sp. বা Root knot Nematodes এর সম্মিলিত আক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয়। এ রোগ বীজ আদা, মাটি, ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং আদা ক্ষেতে ব্যবহৃত জুতার মাধ্যমেও বিস্তার ঘটে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে সংগঠিত বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট আর্দ্র আবহাওয়ায় আক্রমণের তীব্রতা এবং ছত্রাকের দ্রুত বংশ বৃদ্ধি ঘটে। চারা বা কচি অবস্থায় গাছ এই রোগের প্রতি অধিকমাত্রায় সংবেদনশীল। গাছের কাণ্ড ও মাটির সঙ্গে স্থলে (কলার রিজিওন) প্রথমে আক্রমণ শুরু হয়ে ক্রমশ উপরে এবং নিচের দিকে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত স্থানে এ পানিভেজা দাগ সৃষ্টি হয়। পচা রোগ দ্রুত রাইজমের দিকে ধাবিত হয় এবং একে নরম পচা (Soft rot) রোগও বলে। পরবর্তীতে শিকড়েও এই রোগের বিস্তার ঘটে।

লক্ষণ: বর্ষাকালে ৪-৬ সেমি দীর্ঘ গাছে এই রোগের লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পায়। গাছের নিচের দিকের পাতার প্রান্তভাগে প্রথমে হালকা হলুদাভ লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং পর্যায়ক্রমে পত্র ফলকে (Leaf blades) রোগ বিস্তার লাভ করে। এই রোগে আক্রমণের পাতার মধ্যভাগ সবুজ থাকলেও পাতার কিনারা ক্রমশ হলুদ হতে থাকে। গাছের উপর এবং নিচের সমস্ত পাতা হলুদ হয়ে গাছ ঝিমিয়ে পড়ে। এবং আদা ভূনিম্নস্থ কন্দ হওয়ায় আক্রান্ত গাছের মাটি সংলগ্ন এলাকায় পচনক্রিয়া শুরু হয় এবং ক্রমে পচন কন্দে ও শিকড়ে ছড়িয়ে পড়ে ফলে কন্দ নরম হয়ে ফুলে উঠে এবং অভ্যন্তরীণ টিস্যু সম্পূর্ণরূপে পচে যায়। মাটি সংলগ্ন পাতার ডাটা পচে ও শুকিয়ে মারা যায়। আক্রান্ত গাছ ধরে টান দিলে সহজে উঠে আসে।

দমন পদ্ধতি

- উত্তম পানি নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত উঁচু জমিতে এই রোগের আক্রমণ কম হয়।
- একই জমিতে পর পর ২ বছর আদা চাষ করা থেকে বিরত থাকা।
- পুষ্ট ও রোগমুক্ত বীজ আদা রোপণ করতে হবে।
- রোপণের পূর্বে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে রিডোমিল গোল্ড বা ১ গ্রাম হারে অটোস্টিন মিশিয়ে উক্ত দ্রবণে বীজকন্দ ৩০-৪০ মিনিট ডুবিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে রোপণ করতে হবে। একই পদ্ধতিতে বীজ কন্দ শোধন করে সংরক্ষণ করতে হবে।
- আদার মাতৃকন্দসমূহ রোপণের পূর্বে রোপণ সারিতে Coppeasan দিয়ে শোধন, ইহা শুধু রোগ দমনে সাহায্যই করে না বরং মারাত্মক রোগের আক্রমণের হাত থেকেও ফসলকে রক্ষা করে।
- প্রতি হেক্টর জমিতে নিম খৈল ২.৫ টন অথবা বাদামের খৈল ১.১ টন প্রয়োগের ফলে রাইজোম রট হ্রাস পায় ও ফলন বৃদ্ধি পায়।
- আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে যখন আক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পায় তখন দ্রুত ব্লাইটক্স-৫০ বা ব্লু-কপার (কপার অক্সিক্লোরাইড ৫০% ডব্লিউ পি) প্রতি লিটার পানিতে ৪ গ্রাম বা রিডোমিল গোল্ড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে মাটির সংযোগস্থলে ১৫-২০ দিন পর পর গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

পাতার রোগ: পাতায় অনেক সময় ডিম্বাকৃতি দাগ দেখা যায়। এ দাগের মাঝখানে সাদা বা ধূসর রং ধারণ করে। পরে আক্রান্ত পাতা শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার: প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ মিশিয়ে ১৫দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

পোকামাকড়: বারি আদা-২ ও ৩ এ রাইজোম ফ্লাই ছাড়া অন্য পোকার আক্রমণ তেমন হয়না। তবে মাঝে মাঝে কাণ্ড বা পাতা ছিদ্রকারী পোকার আক্রমণ দেখা যায়।

রাইজোম ফ্লাই: রাইজোম ফ্লাই আদা চাষীদের নিকট একটি প্রধান সমস্যা এই পোকার আক্রমণে কোন কোন ক্ষেত্রে ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হতে পারে। রাইজোম ফ্লাই দেখতে কালো রঙের চিকন ও লম্বা দেহ বিশিষ্ঠ পোকা যার পাখা আছে। সাধারণত ছায়াযুক্ত স্থানে এবং গাছের পাতায় সকাল ৬.০-৯.০ এবং বিকাল ৬.০-৭.০ টার মধ্যে পূর্ণ বয়স্ক পোকা দেখা যায়। স্ত্রী পোকা জুন মাস থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত আদা গাছের কলার রিজিয়নে (কাণ্ড ও মাটির সংযোগস্থল) এবং নতুন জন্মানো রাইজোমে ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার ১-২ দিনের মধ্যে ম্যাগোট বের হয় এবং কলারিজিয়নকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। ফলে গাছ হলুদ ও কলার রিজিয়ন বাদামী বর্ণ ধারণ করে। আস্তে আস্তে ম্যাগোট রাইজোম ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে রাইজোমের ভিতরের অংশ খাওয়া শুরু করে। এপর্যায়ে ৭-৮ দিন পর পূর্ণাঙ্গ পোকা রুপে ক্ষতিগ্রস্ত রাইজোম থেকে বের হয়ে আসে।

ক্ষতির ধরন: আদা লাগানোর ৩ মাস পর থেকে বৃষ্টিপাত শুরুর পরবর্তী অবস্থায় জমিতে কোন কোন আদার গাছ হলুদ বর্ণ ধারণ করে। গাছ টান দিলে রাইজোম থেকে সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়ে আসে। বিচ্ছিন্ন হওয়া গাছের নিচের অংশে সাদা রঙ্গের কীড়া পাওয়া যায়। একইভাবে আক্রান্ত গাছের আদা তুললে সেখানেও কীড়া এবং লাল রঙের পুত্তলী পাওয়া যায়। আক্রান্ত আদা হতে পচা দুর্গন্ধ বের হয়।

দমন ব্যবস্থ্যাপনা

- সুস্থ বীজ ব্যবহার করতে হবে।
- আদার জমি থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা করতে হবে।
- বপনের পূর্বে বীজ রিডোমীল ২ গ্রাম/লিটার হারে মিশ্রণে ভিজিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র কীড়া ও পুত্তলীসহ ক্ষতিগ্রস্থ গাছ তুলে ধবংস করতে হবে।
- আক্রমণ বেশি হলে ক্লোরপারিফস ১৫জি ২ গ্রাম/ লিটার হারে মিশিয়ে ১৫ দিন অন্তর মোট ২বার গাছের গোড়াসহ মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

পাতা ছিদ্রকারী পোকা: এই পোকা পাতা ছিদ্র করে খেয়ে ফেলে। কচি পাতায় এই পোকার আক্রমণ বেশি দেখা যায়। তবে বৃষ্টিপাত শুরু হলে পোকার আক্রমণ কমে যায়।

দমন: আদার জমিতে এই পোকা দেখামাত্র হাত দিয়ে সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে তবে আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে কিনালাক্স/ রিপকর্ড ১ মিলি হারে প্রতি লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করে দমন করা যায়।

ফসল সংগ্রহ: রাইজোম রোপণের ৯-১০ মাস পর পরিপক্ক ফসলের পাতা এবং গাছ হলুদ রঙের হয়ে শুকিয়ে যায়। ডিসেম্বর - জানুয়ারি মাসে কোদাল দিয়ে মাটি আলগা করে আদা উত্তোলন করা হয়। ফসল সংগ্রহের পর শিকড় ও মাটি পরিষ্কার করে আদা গুদামজাত করা হয়।

ফলন: বারি আদা-২ সাধারণত প্রতি হেক্টরে ৩৭.৯৯ টন ও বারি আদা-৩ সাধারণত প্রতি হেক্টরে ২৯.০৫ টন পর্যন্ত ফলন দেয়।

আদার সাথে সাথী ফসল চাষ: আদা প্রায় ১০-১১ মাসের ফসল। একই জমিতে আদার উপর মাচা তৈরি করে মাচায় লতা জাতীয় সবজি যেমন- লাউ, পটল, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, শিম ইত্যাদি সবজি ও মাচার নিচে আদার চাষ করে অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়াও আদার সারির মাঝে পাতলা করে বেগুন বা মরিচ উৎপাদন করা যায়।

সংরক্ষণ: আদা উঠানোর পর পরিষ্কার ছায়াযুক্ত স্থানে মাটিতে গর্ত করে বা ঘরের মধ্যে মেঝেতে গর্ত করে গর্তের নিচে ২ ইঞ্চি পরিমাণ বালি দিয়ে পুরু করে তার উপর আদা রেখে আবার ১-২ ইঞ্চি বালুর স্তর দিয়ে আদা ঢেকে রাখতে হবে। এতে করে আদা শুকিয়ে যাওয়া রোধ করা যায়।

দারুচিনি

বারি দারুচিনি-১

আকর্ষণীয় বাদামী রঙের সুগন্ধযুক্ত, মিষ্টি ও মধ্যম ঝাঁঝযুক্ত জাত। এর বাকলে রয়েছে চিনামালডিহাইড, চিনামিক অ্যাসিটেট, চিনামাইল অ্যালকোহল ও আরো উদ্বায়ী তৈল যা এর সুগন্ধ, মিষ্টতা ও ঝাঁঝের জন্য দায়ী। দারুচিনি জীবাণুনাশক, রক্ত জমাট বাধা প্রতিরোধী, এটি ব্যাথানাশক, ডায়াবেটিস এবং উচ্চ রক্তচাপ কমায়। দারুচিনি মসলা হিসাবে, ঔষধশিল্পে, বেভারেজে, পারফিউমে, কসমেটিক্স ও সাবান প্রস্তুতিতে বহুল ব্যবহৃত হয়। গাছের বৃদ্ধির হার ও ফলন ভাল (৭১৪ গ্রাম/গাছ, ৩৮৫কেজি/হেক্টর) ও রোগ বালাই এর আক্রমণ সহনশীল।

বারি দারুচিনি-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া ও মাটি: সাধারণত উষ্ণ ও অবউষ্ণ আবহাওয়া দারুচিনি চাষের জন্য উপযোগী। সুনিষ্কাশিত উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়। পাহাড়ের ঢালে ও পাহাড়ের উপরে ভাল বায়ু চলাচল উপযোগী ও পর্যাপ্ত সুর্যালোকে এর উৎপাদন ভাল হয়।

জমি তৈরি: যে জমিতে অন্য ফসল ভাল হয় না সে জমি দারুচিনি চাষের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে। বাগান আকারে চাষ করতে হলে নির্বাচিত জমি ভাল করে চাষ ও মই দিয়ে সমতল এবং আগাছামুক্ত করে দিতে হবে। পাহাড়ী এলাকা, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে জমিতে চাষ না দিয়ে শুধু পারিষ্কার করে নিলেই চলবে।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়: সমতল ভূমিতে দারুচিনি চারা সাধারণত বর্গাকার বা ষড়ভুজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। মে থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়।

মাদা তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে উভয় দিকে ১.০ মিটার দূরত্বে সারিতে ৬০ সেমি দূরে দূরে ৩০×৩০×৩০ সেন্টিমিটার মাপের গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ৫-১০ কেজি কম্পোস্ট বা পচা গোবর, ১-২ কেজি ছাই, ১০০ গ্রাম

টিএসপি এবং ৫০ গ্রাম এমওপি সার প্রয়োগ করে গর্তের উপরের মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা: এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত দারুচিনি চারা/কলম রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুঁটি দিয়ে চারা/কলমটি খুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমতো পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

গাছের সার প্রয়োগ: গাছের বৃদ্ধির সাথে সারের পরিমাণ বাড়বে। প্রতিটি গাছের জন্য ৪/৫ কেজি কম্পোস্ট বা পঁচা গোবর, ১০০ গ্রাম টিএসপি এবং ১০০ গ্রাম এমওপি ও ১০০ গ্রাম ইউরিয়া সার প্রয়োগ করতে হবে। সবটুকু সার তিন ভাগ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন ও মাঘ-ফাল্গুন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।

আগাছা দমন ও সেচ: গাছের গোড়া নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে লাগানো গাছের গোড়ায় আগাছা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে। চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমতো সেচ দেয়া দরকার। গাছ বড় হয়ে গেলে আর সেচের তেমন প্রয়োজন পড়ে না।

ডাল ছাঁটাইকরণ: চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য অবাঞ্ছিত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে রাখতে হবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন: দারুচিনি গাছ ২ ইঞ্চি (৫ সেমি) পরিমাণ মোটা (ব্যাস) বা দুই বছর বয়স হলে তা গোড়া থেকে ৬ ইঞ্চি বা ১৫ সেমি উপরে কেটে বাঁকানো ছুড়ি দিয়ে ছাল আলাদা করে নিয়ে হালকা রৌদ্রে বা ওভেনে ৫০° সে. তাপে ভালভাবে শুকিয়ে সংগ্রহ করতে হয়। দারুচিনির প্রথম অবস্থায় প্রতিবার কর্তনে হেক্টরপ্রতি ১৫০ কেজি থেকে ২০০ কেজি এবং পরবর্তীতে ৩০০-৩৫০ কেজি পর্যন্ত দারুচিনি ছাল (Quill) পাওয়া যেতে পারে।

তেজপাতা

তেজপাতা Lauraceae পরিবারভুক্ত একটি বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ মসলা জাতীয় উদ্ভিদ। বাংলাদেশে চাষকৃত অধিকাংশ তেজপাতা ইন্ডিয়ান বেলিফ (Indian Bay leaf) হিসেবে পরিচিত, যার বৈজ্ঞানিক নাম *Cinnamomum tamala* Nees যার আদি নিবাস হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশ ও ভারতের উত্তর পূর্ব পাহাড় হতে বার্মা পর্যন্ত বিস্তৃত। তেজপাতা বাংলাদেশসহ ভূমধ্যসাগর, পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া, দক্ষিণ এশিয়া, দক্ষিণ ও উত্তর পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহ, আফ্রিকা, দক্ষিণ পূর্ব আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, চায়না ও বার্মায় উৎপাদিত হয়। ইহা বাংলাদেশের সর্বত্রই জন্মে। বৃহত্তর সিলেট এলাকায় উৎপাদিত তেজপাতা লন্ডনে বেশ সমাদৃত। মসলা হিসেবে অতি পরিচিত তেজপাতায় রয়েছে অনেক ভেষজ গুণাগুণ। ঔষধ হিসেবে পাতা ও ছাল ব্যবহার হয়। গাছের বাকল হতে তেল পাওয়া যায়, যা সাবান প্রস্তুতে ব্যবহার হয়। এছাড়াও বাকল ও পাতা ট্যানিন হিসেবে ব্যবহার হয়। পাতায় প্রধান উপাদান হলো এক প্রকার উদ্বায়ী তেল ইউজিনল (প্রায় ৭৮%) নামে পরিচিত। তাছাড়াও পাতা আইসো ইউজিনল ডি-আলকা-ফেলা-নাড্রিনি এবং সিনানামিক অ্যালডিহাইড সমৃদ্ধ। তেজপাতা বিরেচক, উদ্দীপক, মূত্রবর্ধক, তলপেটে সংকোচনজনিত ব্যাথা, ডায়রিয়া, চর্মরোগ, গলায় সংক্রমক এবং সর্দি-কাশিতে ব্যবহার হয়। পাতা ব্যাকটেরিয়া বিধ্বংসী, জরায়ুর বিভিন্ন রোগনাশক এবং গর্ভফুল নিষ্কাশক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

বারি তেজপাতা-১ এর গাছ

তেজপাতার জাত

বারি তেজপাতা-১

বারি তেজপাতা-১ এর রোগমুক্ত শাখা

বারি তেজপাতা-১ এর সতেজ পাতা

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংগ্রহীত স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তেজপাতার উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি ২০১৭-১৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত হয় যা "বারি তেজপাতা-১" নামে পরিচিত। ইহা মাঝারী উচ্চতার (২.৫-৩.০ মিটার) সুগন্ধিযুক্ত চিরসবুজ বৃক্ষ জাতীয় উদ্ভিদ। বাকল গাঢ় ধূসর অথবা কালো, সামান্য অমসৃণ। পাতাগুলো বিপরীতভাবে বিন্যস্ত, কচি অবস্থায় লাল এবং পরে সবুজ হয়ে যায়, সূক্ষ্ম লোমযুক্ত ও তিন শিরা বিশিষ্ট। পাতাগুলো লম্বায় বেশ বড় ও সবুজ বর্ণের। "বারি তেজপাতা-১" সারাবছর বাংলাদেশের সর্বত্র চাষ উপযোগী। চারা লাগানোর ১৬-১৮ মাসের মধ্যে তেজপাতা সংগ্রহ করা যায়। এ জাতের তেজপাতার গাছের ০.৫ ঘনমিটারে গড়ে ১৫৮১.২৫-১৭০৬.০০টি এবং এক মিটার লম্বা ডালে ৯৭.০০-১০১.৮০টি পাতা পাওয়া যায়। একটি পাতায় গড় দৈর্ঘ্য ১৪.৮০-১৫.০৫ সেমি ও প্রস্থ ৩.৮৩-৩.৯৩ সেমি। পাতার পুরুত্ব গড়ে ০.৫৯-০.৬৯ মিমি। পাতার বোটার দৈর্ঘ্য গড়ে ১.০৫-১.৪৭ সেমি। পাতায় শুষ্ক পদার্থের পরমাণ গড়ে ৫৯.২৮-৬২.০% হয়। জাতটিতে লিফস্পট/পাতা পোড়া রোগ অন্যান্য স্থানীয় জাতের তুলনায় অনেক কম হয়। জাতটির ৭-৮ বছর বয়সের একটি গাছ হতে বছরে গড়ে ৩০.০০-৩৪.২৩ কেজি কাঁচা পাতা উৎপাদন হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

জলবায়ু ও মাটি: উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু তেজপাতা চাষের জন্য সর্বোত্তম। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ২৮০০-৩০০০ মিমি ও গড় তাপমাত্রা ২৮-৩৫°c হলে পাতার ফলন ও গুণগতমান উভয়ই ভাল হয়। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলে রোগের আক্রমণ ও ডাল (মাইট দ্বারা আক্রান্ত) রোগের প্রকোপ কম হয়। তবে তেজপাতার পরিবেশ উপযোগিতা ব্যাপক বিধায় আর্দ্র ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সফলভাবে এর চাষ করা সম্ভব। উঁচু সুনিষ্কাশিত বেলে দোআঁশ অথবা দোআঁশ বা এটেল দোআঁশ মাটি তেজপাতা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। তবে বাংলাদেশের সর্বত্রই সব ধরনের মাটিতেই বারি তেজপাতা-১ চাষ করা যায়।

বংশ বিস্তার: দু'ভাবে বংশ বিস্তার করা যায়। বীজ থেকে এবং কলম থেকে চারা তৈরি করে। কলমের চারা উত্তম কারণ এতে বংশগত গুণাগুণ অক্ষুন্ন থাকে।

বীজ হতে চারা উৎপাদন: তেজপাতা বীজ থেকে চারা তৈরী করা অপেক্ষাকৃত কঠিন। বীজের ডরমেনসি খুবই কম হওয়ায় বীজ সংগ্রহের ১-২ দিনের মধ্যে বীজ চারা তৈরী করার জন্য ব্যবহার করতে হবে। বীজ পেকে যখন কালো বর্ণ ধারণ করবে, তখন বুঝতে হবে বীজ সংগ্রহের সঠিক সময়। এই সময়ে বীজ সংগ্রহ করে পূর্বের প্রস্তুতকৃত মাটি ভর্তি প্রতিটি পলিব্যাগে ২-৩ বীজ দিতে হবে। বীজ বপনের পর পলিব্যাগে সেভিং পাউডার ব্যবহার করতে হবে। এতে করে পিঁপড়া বীজের ক্ষতি করতে পারবে না। উপযুক্ত পরিবেশে বীজ থেকে চারা হতে ১২-১৪ দিন সময় লাগে। এর পর হতে নিময়তিভাবে ঝরনা দ্বারা পানি দিতে হবে, যা মাটিতে সমসময় আর্দ্রতা বজায় থাকে।

কলমের মাধ্যমে চারা তৈরিকরণ: সাধারণত পার্শ্বীয় জোড় কলম (Side grafting) ব্যবহার করে চারা তৈরি করা হয়। সাধারণত কাবাব চিনির চারাকে রুটস্টক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পলিব্যাগে/মাটির ছোট টবে কাবাব চিনির চারা তৈরি করে নেয়া হয়। চারা ১.৫-২.০০ ফুট উঁচু হবে তখন কলমের জন্য উপযুক্ত হয়। মধ্য চৈত্র-বৈশাখ হতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত (এপ্রিল-মে) কলম করার উপযুক্ত সময়। নির্বাচিত তেজপাতার শাখাকে (পেনসিলের মতো মোটা) সায়ন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এরপর কলম করা হয়।

জমি তৈরি ও চারা রোপণ: বাগান আকারে গাছ লাগাতে হলে গভীরভাবে চাষ দিয়ে জমি তৈরি করা উচিত। এতে দীর্ঘজীবী আগাছা দমন হবে। বাড়ির আশে পাশে পুকুর পাড়ে কিংবা রাস্তার ধারে গাছ লাগালে চাষ না দিয়ে সরাসরি গর্ত

করে তেজপাতার চারা লাগানো যায়। চারা লাগানোর জন্য ৪-৬ মিটার দূরত্বে ০.৮০ × ০.৮০×০.৮০ মিটার আকারের গর্ত তৈরি করতে হবে। চারা রোপণের ১০-১৫ দিন পূর্বে প্রতি গর্তে ২৫ কেজি পচা গোবর ১৫০ গ্রাম টিএসপি, ১০০ গ্রাম এমওপি ও ৫০ গ্রাম জিপসাম সার প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে। জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। চারা রোপণের পূর্বে গর্তের মাটি কোদাল দিয়ে উলট-পালট করে নিতে হবে। রোপণের পর চারাটিকে একটি শক্তখুঁটির সাথে বেঁধে দিতে হবে এবং গোড়ায় পানি দিতে হবে।

সার প্রয়োগ: গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও অধিক ফলনশীলতার জন্য গাছে নিয়মিত সার প্রয়োগ অপরিহার্য। সারের মাত্রা নির্ভর করে গাছের বয়স ও মাটির উর্বরতার উপর। বিভিন্ন বয়সের গাছে সারের মাত্রা।

গাছের বয়স	গাছে প্রতি সারের পরিমাণ				
	গোবর	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম
১ - ২ বছর	১২	২৫০	২০০	২০০	৫০
৩ - ৪ বছর	১৭	৪০০	৩৫০	৩৫০	৮০
৫ - ৬ বছর	২২	৬৫০	৬০০	৬০০	১২০
৭ - ৮ বছর	২৭	৮৫০	৭৫০	৭৫০	১৬০
৯ বা তদুর্ধ্ব	৩২	১০৫০	৯৫০	৯৫০	২০০

এছাড়া অঞ্চলভিত্তিক যেসব সারের অধিক ঘাটতি রয়েছে সেসব সারও প্রয়োগ করতে হবে। উল্লিখিত সার সমান দুই কিস্তিতে পাতা সংগ্রহের পর পর প্রয়োগ করতে হবে। সার মাটির সাথে ভালভাবে মেশাতে হবে এবং প্রয়োজনে সেচ দিতে হবে।

পানি সেচ ও পরিচর্যা: শুষ্ক মৌসুমে বিশেষতঃ চারা গাছে এবং বয়স্ক গাছে পাতার বাড়ন্ত অবস্থায় সেচ দিলে ফলন ও পাতার গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। মাটির আর্দ্রতার উপর ভিত্তি করে খরিফ-১ এ ২-৩ টি এবং রবি মৌসুমে ৪-৫ টি সেচ দিতে হয়। চাষ দিয়ে বা কোঁদাল দিয়ে কুপিয়ে তেজপাতার বাগানের আগাছা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

পাতা সংগ্রহ: সাধারণতঃ বছরে ২ (দুই) বার পাতা সংগ্রহ করা হয়। গাছ হতে তেজপাতা সংগ্রহের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন গাছের ছোট ছোট ডাল না ভেঙ্গে যায়। আবহাওয়া অনুকূল ও পরিমিত পরিচর্যা করলে ৭-৮ বছরের একটি গাছ হতে বছরে প্রায় ৩০.০০- ৩৪.২৩ কেজি উৎপাদন হবে ।

অন্যান্য পরিচর্যা

তেজপাতায় রোগ ও পোকা-মাকড়ের আক্রমণ তেমন একটা লক্ষণীয় নয়। তেজপাতার রোগের মধ্যে গ্রে লিফ স্পট (Grey Leaf spot)/পাতা পোড়া (Leaf blight) রোগ প্রধান।

গ্রে লিফ স্পট (Grey leaf spot)/পাতা পোড়া (Leaf blight) রোগ

এই রোগ হলে তেজপাতার ফলন অনেকাংশে কমে যায়। তেজপাতার ব্যবহারের প্রধান অংশ পাতা হওয়ায় রোগের কারণে তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে। এর ফলে ফলন ৯০% পর্যন্ত কম হতে পারে (Karunakaran *et al.*, 1993)। তেজপাতার এই রোগ ছত্রাকের কারণে হয়। *Colletotrichium gloeosporioides* (Rov *et al*, 1976), *Glomerella cingulata* (Khan and Hossain, 1985) ও *Pestalotia cinnamomi* (Anonymous, 1996) যে কোন একটি ছত্রাকের আক্রমণে তেজপাতার এই রোগ হয়। পাতায় প্রথমে ছোট ছোট গোলাকার দাগ বা স্পট পড়ে। পরে দাগগুলো বড় হতে থাকে ও অনেকগুলো দাগ একত্রিত হয়ে বড় আকার ধারণ করে মনে হয় পাতাটি আগুনে পুড়ে গেছে। পাতাটি তখন ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

- রোগাক্রান্ত পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ।
- আবহাওয়া যখন শুষ্ক থাকে, তখন নিয়মিত সেচ প্রদান করতে হবে। মাটিতে আর্দ্রতা থাকলে এই রোগ কম হয়।
- রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানির সাথে ১ মিলি প্রোপিকোনাজল (টিল্ট ২৫০ ইসি) অথবা কার্বেনডাজিম (অটোস্টিন) ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার সমস্ত গাছে বিকেলে স্প্রে করতে হবে।

তেজপাতার গল

তেজপাতার গল বর্তমানে একটা বড় ধরনের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইরিওফাইড মাইট (Eriophyid mite) এর আক্রমণে তেজপাতার গল হয়। এই রোগ হলে আক্রান্ত গাছের পাতা ফুলে উঠে ও পরবর্তীতে পাতা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে।

প্রতিকার

- রোগাক্রান্ত পাতা ও শাখা-প্রশাখাগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- শুষ্ক আবহাওয়ায় এই রোগ বেশি হওয়ায় বাগানে নিয়মিত সেচ প্রদান করতে হবে। আর্দ্র আবহাওয়ায় মাইট এর আক্রমণ কম হয়।
- রোগের লক্ষণ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত পাতা ও শাখা-প্রশাখাগুলো ধারালো কাচি দিয়ে কেটে ফেলে দিতে হবে ও এর পর প্রতি লিটার পানির সাথে ১.২ মিলি ভার্টিমেক/ ওমাইট/লিকাড়/ পেগাসাস হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ৩-৪ বার সমস্ত গাছে বিকেলে স্প্রে করতে হবে।

একাঙ্গীর জাত

একাঙ্গী (*Kaempferia galanga* L.) জিনজিবারেসি (Zingiberaceae) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত একটি হার্ব জাতীয় উদ্ভিদ। এটাকে অনেক সময় বাংলায় ভূঁই চম্পা বা সুরভি আদা বলা হয়। তবে বাংলাদেশে ইহা একাঙ্গী/একানী নামে বেশি পরিচিত। একাঙ্গীর উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ চীন অথবা ভারত বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশসহ সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতে ইহার চাষ করা হয়। এর পাতা পুরু, গোলাকৃতি এবং মাটির সঙ্গে লাগানো অবস্থায় থাকে। নতুন পাতা ক্ষুদ্র রাইজোম থেকে বের হয়ে। গ্রীষ্মকালে ১-২টি সাদা রঙের ফুল ফোটে। শীতকালে পাতা মরে যায় এবং রাইজোম সুপ্ত অবস্থায় চলে যায়। যে সব এলাকায় আদা ও হলুদ চাষ হয় সে সব এলাকায় একাঙ্গী চাষের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বাংলাদেশে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, নড়াইল, মাগুড়া ও ঝিনাইদহ ইত্যাদি এলাকাতে একাঙ্গীর চাষ হয়ে থাকে। এছাড়া চীন, ভারত, থাইল্যান্ড ও মালয়েশিয়াতে একাঙ্গীর চাষ হয়ে থাকে। মসলা ফসল ও মাছের চার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এতে বিদ্যমান এসেনসিয়াল ওয়েল বিভিন্ন কারি (Curry) তৈরিতে সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন পারফিউম ও কসমেটিক শিল্পে ব্যবহৃত হয়। একাঙ্গী রক্ত পরিষ্কারক, পাকস্থলীর ঘা সারাতে ও ঠাণ্ডাজনিত রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন পানীয় (Soft Drink) জাতীয় দ্রব্যাদি তৈরীতে ইহা কাঁচামাল (Raw Materials) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ইহা মালয়েশিয়াতে মসলা ফসল হিসেবে চালের সুগন্ধি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। থাইল্যান্ডেও ইহা জনপ্রিয় মসলা ফসল হিসেবে স্যুপ ও বিভিন্ন কারি (Curry) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। এই সব এলাকা হতে শুকনো একাঙ্গী বাংলাদেশে বিভিন্ন ঔষধ ও প্রসাধনী শিল্পে ব্যবহারসহ বিদেশে সীমিত আকারে রপ্তানি হয়। একাঙ্গীর উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে মসলা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ একাঙ্গীর বেশ কয়েকটি লাইনের উপর গবেষণা চালিয়ে বারি একাঙ্গী-১ নামে একটি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন করেছে যা কম-বেশি সারা দেশে চাষ করা সম্ভব। জাতটি ২০১৭ সালে অবমুক্ত হয়। জাতটির বৈশিষ্ট ও উৎপাদন প্রযুক্তি নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

বারি একাঙ্গী-১

ইহা একটি বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। গাছের উচ্চতা ১০-১৫ সেন্টিমিটার। পাতার দৈর্ঘ্য ১২-১৫ সেন্টিমিটার, প্রস্থ ১০-১২ সেন্টিমিটার। রাইজমের দৈর্ঘ্য ৫.৫-৬.৫ সেন্টিমিটার। প্রতিটি রাইজমে ফিঙ্গারের সংখ্যা ৬-৮টি। ইহা রোগ ও পোকা সহনশীল। ফলন ১২-১৫ টন/হেক্টর।

রাইজম

বারি একাঙ্গী-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু: প্রায় সব ধরনের মাটিতেই একাঙ্গীর চাষ করা সম্ভব। তবে পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ দো-আঁশ থেকে বেলে দো-আঁশ মাটি একাঙ্গী চাষের জন্য উত্তম। একাঙ্গী চাষের জন্য মাটির উপযোগী পিএইচ হলো ৬-৬.৫। বার্ষিক ২,৫০০-৩,০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত একাঙ্গী চাষের জন্য উত্তম। ৩০-৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় একাঙ্গীর দৈহিক বৃদ্ধি ও ফলন ভাল হয়। একাঙ্গী হালকা ছায়াযুক্ত স্থানে চাষ করা যায়।

বীজ শোধন: ১০০ লিটার পানিতে ১০০ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ অথবা অটোস্টিন মিশিয়ে বীজকে ৩০-৪৫ মিনিট ভিজিয়ে রেখে শোধন করতে হবে। ভিজানো বীজকে ছায়াযুক্ত জায়গায় শুকিয়ে তারপর জমিতে রোপণ করতে হবে।

মাটি শোধন: গভীরভাবে চাষ দিয়ে মাটি উল্টিয়ে রেখে দিলে রোগ জীবাণু ও পোকামাকড় সূর্যের তাপে নষ্ট হয়ে যায়। মাটির উপর খড়কুটো দিয়ে পুরু স্তর তৈরি করে পুড়িয়ে অথবা জমিতে বিঘাপ্রতি ১.৫-২.০ কেজি ফুরাডান বা নিম কেক (২ কেজি/শতকে) প্রয়োগের মাধ্যমেও মাটি শোধন করা যায়।

রোপণ সময়: এপ্রিলের ১ম সপ্তাহ থেকে মে মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত একাঙ্গী লাগানোর উপযুক্ত সময়। বিলম্বে রোপণ করলে গাছের বৃদ্ধি ও ফলন কম হয়।

বীজের আকার ও হার: ২০-২৫ গ্রাম ওজনের রাইজোম/রোপণের জন্য উত্তম। বীজের হার নির্ভর করে রাইজোমের আকার আকৃতির উপর। বীজ হিসেবে মোথা উত্তম ও ফলন বেশি দেয়। তবে ছড়া (Finger) ব্যবহার করলে কম পরিমাণে বীজের দরকার হয়। সাধারণত প্রতি হেক্টরে ১,২০০-১,৪০০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

জমি তৈরি ও রোপণ দূরত্ব: জমি তৈরি করতে ৩-৪টি চাষ ও মই দিতে হবে। সাধারণত একাঙ্গীর জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০-৫০ সিমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০-২৫ সেন্টিমিটার রাখা হয়। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের জন্য দুই বেডের মাঝে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার প্রশস্ত নালা রাখাতে হবে যাতে করে প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান ও অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা যায়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ভালো ফলন পাওয়ার জন্য জমিতে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জৈব রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা প্রয়োজন। একাঙ্গী চাষের জন্য হেক্টরপ্রতি নিম্নে উল্লিখিত পরিমাণে জৈব ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা হিসেবে প্রয়োগ		
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি	৩য় কিস্তি
পচা গোবর	৫ টন	সব	-	-	-
ইউরিয়া	২৬০ কেজি	-	১৩০	৬৫	৬৫
টিএসপি	২৩০ কেজি	সব			
এমওপি	১৯০ কেজি	৯৫	-	৫০	৪৫
জিমসাম	১১০ কেজি	সব	-	-	-
জিংক	৩ কেজি	সব	-	-	-

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক এবং অর্ধেক এমওপি সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সারের অর্ধেক বীজ রোপণের ৬০ দিন পর পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট

ইউরিয়া ও এমওপি সার দুই কিস্তিতে বীজ রোপণের ৯০ ও ১২০ দিন পর পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। এ সময় দুই দিক থেকে মাটি উঠিয়ে দিতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পূর্বে জমি আগাছা মুক্ত করতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা: মাটিতে আর্দ্রতা কম থাকলে বীজ রোপণের পরপরই সেচ দিতে হবে। একাঙ্গীর সঠিক বৃদ্ধি ও পানি নিষ্কাশনের জন্য দুই সারির মাঝের মাটি গাছের গোড়ায় তুলে দিতে হবে। একাঙ্গীর গজানোর পর ফসলের সাথে আগাছার প্রতিযোগিতা রোধ করার জন্য জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। এই ভাবে যতবার সম্ভব প্রয়োজন অনুসারে ফসলকে আগাছা মুক্ত করতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টি না হলে একাঙ্গীর জমিতে সেচ দিতে হবে। জমিতে এমনভাবে সেব দিতে হবে যাতে জমিতে পরিমিত রস থাকে কিন্তু জমি অতিরিক্ত ভেজা/দাঁড়ানো পানি না থাকে।

আন্তঃফসল চাষ: একাঙ্গী হালকা ছায়া পছন্দ করে কাজেই একাঙ্গীর সংগে আন্তঃফসল হিসেবে মরিচ, গ্রীষ্মকালীন পেঁয়াজ, লালশাক, শিম, লাউ ইত্যাদি ফসল চাষ করা যায়। এছাড়া নতুন ফলের বাগানে সারি ফল গাছের মাঝে আন্তঃফসল/মিশ্র ফসল হিসাবে একাঙ্গীর চাষ করা যায়।

ফসল সংগ্রহ: সাধারণত জানুয়ারি - ফেব্রুয়ারি মাসে একাঙ্গীর উঠানো হয়। একাঙ্গী রোপণের ৯-১০ মাস পর গাছের পাতা যখন হলুদ রং ধারণ করে শুকিয়ে যায় তখনই একাঙ্গী সংগ্রহের উপর্যুক্ত সময় হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সংগ্রহের পরে একাঙ্গীতে লেগে থাকা মাটি, শিকড়, গাছের কাণ্ড ও পাতা পরিষ্কার করতে হবে।

সংরক্ষণ: সাধারণত একাঙ্গীর ক্ষেত্রে ছড়া (Finger) ও মোথাকে বীজ হিসাবে রাখা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে মোথা হতে উৎপন্ন গাছ অপেক্ষাকৃত সবল হয়। ছড়াও বীজ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তবে এক্ষেত্রে ফলন কম হয়। একাঙ্গীর রাইজোমকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পের জন্য ব্যবহার উপযোগী করা হয়। বাছাইকৃত রাইজোম বা ছড়া মাটির গর্তে রাখলে বেশি দিন পর্যন্ত ভাল রাখা যায়। ১×১×১ ঘনমিটার গর্ত করে তা বেশ কয়েক দিন খোলা রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। গর্তের গভীরতা বেশ হলে অধিক আর্দ্রতার কারণে একাঙ্গীর শিকড় ও গজানোর পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। গর্ত একাঙ্গী দিয়ে ভর্তি করার পর উপরে খড় বিছিয়ে মাটি চাপা দিয়ে গর্ত বন্ধ করে দিতে হবে। বীজ একাঙ্গী মাটির গর্তে রাখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে একাঙ্গীর আর্দ্রতা ধরে রাখা। কারণ খোলা বাতাসে থাকলে একাঙ্গীর সতেজতা ও ওজন কমে যায়।

ফলন: সাধারণত প্রতি হেক্টর ১২-১৫ টন একাঙ্গীর ফলন পাওয়া যায়।

রোগবালাই: একাঙ্গীতে রোগবালাই তুলনামূলকভাবে কম হয়। তবে মাঝে মধ্যে নেতিয়ে পড়া (wilt) রাইজোম রট ইত্যাদি রোগ দেখা যায়।

রাইজম রট/কন্দ পচা: কন্দ পচা রোগ একাঙ্গী ফসলের মাারাত্বক ক্ষতি করে এবং এ রোগে রাইজোম আংশিক থেকে সম্পূর্ণ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে । বীজ, মাটি, ব্যবহৃত কৃষিযন্ত্রপাতি ও পানির মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার ঘটে। পিথিয়াম এফানিডারমেটাম (*Phythium aphanidermatum*) নামক ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও রাইজোম ফ্লাই এ রোগের জন্য দায়ী।

রোগের লক্ষণ

- গাছের গোড়ায় কন্দতে প্রথমে পানি ভেজা দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে উক্ত স্থানে পচন দেখা যায় এবং ক্রমান্বয়ে কন্দের বেশি অংশ পচে যায়।
- আক্রান্ত গাছের শিকড়ও পচতে শুরু করে এবং গাছ টান দিলে সহজেই উঠে আসে।
- আক্রান্ত কন্দ থেকে এক ধরনের গন্ধ বের হয়। এই গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে রাইজোম ফ্লাই নামক পোকা রাইজোমে আক্রমণ করে।
- গাছের উপরের অংশে পাতা হলুদ হয়ে যায়। পাতায় দাগ থাকে না।
- হলুদ ভাবটা পাতার কিনারা দিয়ে নিচে নামতে থাকে, কিন্তু ভিতরটা তখনও সবুজ থেকে যায়।
- পরবর্তীতে গাছ ঢলে পড়ে ও শুকিয়ে মারা যায়।
- রাইজোম পচে যাওয়ার ফলে ফলন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

রোগের প্রতিকার

- আক্রান্ত গাছ মাটিসহ উঠিয়ে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোগবিহীন কন্দ সংগ্রহ করে বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে শস্য পর্যায় অনুসরণ করতে হবে।
- মাঠে যথাযথ পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- রিডোমিল গোল্ড বা অটোস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ঐ দ্রবণের মধ্যে বীজ আদা আধা ঘণ্টা ভিজিয়ে রেখে শোধন করে উঠিয়ে ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে জমিতে রোপণ করতে হবে।
- অর্ধকাঁচা মুরগির বিষ্ঠা (৫ টন/হেক্টর) একাঙ্গী রোপণের ২১ দিন পূর্বে জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।
- রোগ দেখা দেওয়া মাত্রই রিডোমিল গোল্ড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে অথবা সিক্যুয়র প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর গাছের গোড়ার মাটিতে স্প্রে করতে হবে।

পোকা-মাকড়

মাজরা পোকা: এ পোকার কীড়া কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরের অংশ খেয়ে ফেলে এবং আক্রান্ত কাণ্ডের উপরের অংশ মরে যায়।

পাতা মোড়ানো পোকা: এ পোকার কীড়া পাতা মুড়িয়ে ভিতরে বাস করে এবং পাতা খেয়ে গাছের সমূহ ক্ষতি করে। মাঠে রাইজম থেকে রস চুষে খায়। সংরক্ষণের সময় এই পোকা রাইজমকে পচিয়ে ফেলে।

দমন

- আক্রান্ত কাণ্ড/পাতা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে অথবা মাটিতে পুতে ফেলতে হবে।
- নাইট্রো/রিপকর্ড/ক্যারাটে(১.০ মিলিলিটার/লিটার) ৭দিন পর পর পাতায় স্প্রে করতে হবে।
- দানাদার ইনসেকটিসাইড (ফুরাডান) প্রতি বিঘায় ৩-৪ হারে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।

চিভ

চিভ (*Allium tuberosum*) একটি বহুবর্ষজীবী মসলা ফসল। ইহা অ্যামারাইলিডেসি (Amaryllidaceae) পরিবারের অর্ন্তভুক্ত। ইহার পাতা লিনিয়ার আকৃতির, ফ্লাট, পাতার কিনারা মসৃণ, বাল্ব লম্বা আকৃতির। ইহার ফুলের রং সাদা-পার্পল বর্ণের। পুষ্পমঞ্জুরী অম্বেল প্রকৃতির। ইহার উৎপত্তিস্থল সাইবেরিয়ান-মঙ্গোলিয়ান-নর্থ চাইনা অঞ্চল। চিভ স্যুপ ও সালাত তৈরিসহ বিভিন্ন চাইনিজ ডিসে ব্যবহৃত হয়। চিভের পাতা, কন্দ ও অপরিপক্ক ফুল সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চিভ হজমে সাহায্য করে এবং ক্যানসার প্রতিরোধী গুণাগুণ বিদ্যমান। আন্তঃফসল হিসেবে চাষ করার মাধ্যমে কলার পানামা রোগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। চিভ-এ প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ভিটামিন বি-১, ভিটামিন বি-২, নায়াসিন, ক্যারোটিন, কার্বোহাইড্রেট ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। তুলনামূলকভাবে সিলেট অঞ্চলে চাষাবাদ বেশি হয়ে থাকে। তাছাড়া পেঁয়াজ উৎপাদনকারী এলাকা যেমন: পাবনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, রাজশাহী (দূর্গাপুর ও তাহেরপুর) মাগুরা, বগুড়া, লালমনিরহাট ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চাষের সম্ভাবনা রয়েছে। বিবিএস (২০১৭) এর তথ্য মতে আমাদের দেশে পেঁয়াজ উৎপাদন হয় ১৭.৩৫ লাখ মেট্রিক টন, চাহিদা প্রায় ২২ লাখ মেট্রিক টন। এখনো প্রায় ৪.৬৫ লাখ মেট্রিক টন ঘাটতি রয়েছে। চিভ পেঁয়াজের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা সম্ভব এবং সারা বছর চাষ করা যায়। চিভ এর প্রসার পেঁয়াজের ঘাটতি অনেকটা মেটাতে চিভ এর উচ্চ ফলনশীল জাত উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে মসলা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানীগণ চিভ এর বেশ কয়েকটি লাইনের উপর গবেষণা চালিয়ে বারি চিভ-১ নামে একটি উচ্চ ফলন শীল জাত উদ্ভাবন করেছে যা সারা দেশে সারা বছর চাষ করা সম্ভব। জাতটি ২০১৭ সালে অবমুক্ত হয়। জাতটির বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন প্রযুক্তি নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

চিভ এর জাত

বারি চিভ-১

এ জাতের গাছের উচ্চতা ৩০-৪০ সেন্টিমিটার । পাতার দৈঘ্য ২৩-৩০ সেন্টিমিটার। বাল্ব লম্বাকৃতির, বাল্বের দৈঘ্য ১.০-১.৪৫ সেন্টিমিটার। চারা লাগানো থেকে ফসল উত্তোলন পর্যন্ত ৬৫-৭০ দিন সময় লাগে। ইহা পোকামাকড় ও রোগ সহনশীল। ফলন হেক্টর প্রতি ১০-১২ টন (গাছ ও পাতাসহ)।

বারি চিভ-১

পাতাসহ গাছ

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি ও জলবায়ু: সেচ ও পানি নিষ্কাশনের সুবিধাযুক্ত ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ বেলে দোআঁশ থেকে দোআঁশ মাটি চিভ চাষের জন্য উপযোগী। মাটির পিএইচ ৬.৩-৬.৮ হলে চিভ এর বৃদ্ধি ভাল হয়। চিভ এর চাষের জন্য বছরে ২,৫০০-৩,০০০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। ১৩-২৫° সে. তাপমাত্রা চিভ চাষের জন্য উপযোগী।

জমি তৈরি: জমিতে ৬-৭টি গভীরভাবে (১৫-২০ সেমি) চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে ও পরে মই দিয়ে সমতল করতে হবে। জমির আগাছা বেছে ফেলতে হবে। মাটির ঢেলা ভেঙ্গে ঝুরঝুরে ও সমান করে জমি তৈরি করতে হবে। চিভ চাষের জন্য ৩.০ মিটার × ১.৫ মিটার আকারের বেড তৈরি করতে হবে এবং বেডের উচ্চতা ১৫-২০ সেন্টিমিটার হতে হবে। পানি সেচ ও নিষ্কাশনের সুবিধার জন্য দুই বেডের মাঝে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার প্রশস্থ নালা থাকতে হবে।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: ফলন বেশি পেতে হলে সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণে সার প্রয়োগ করতে হবে। জৈব সার প্রয়োগ মাটির গুণাগুণ বৃদ্ধি পায় ও ফলন বেশি হয়। মাটিতে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের উপর সারের মাত্রা নির্ভর করে। চিভ এর জন্য প্রতি হেক্টরে নিম্নোক্ত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সার	মোট পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা হিসেবে প্রয়োগ	
			১ম কিস্তি	২য় কিস্তি
গোবর/কম্পোস্ট	৫ টন	সব	-	-
ইউরিয়া	১৪০ কেজি	৭০ কেজি	৩৫ কেজি	৩৫ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি	সব	-	-
এমওপি	৯০ কেজি	৪৫ কেজি	২২.৫ কেজি	২২.৫ কেজি
জিপসাম	৫০ কেজি	সব	-	-

শেষ চাষের সময় সবটুকু গোবর/কম্পোস্ট, টিএসপি, অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি সার জমিতে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাফক অর্ধেক ইউরিয়া এবং এমওপি সার সমান ভাগে ভাগ করে যথাক্রমে চারা রোপণের ২৫ এবং ৫০ দিন পর দুই কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পূর্বে জমি আগাছামুক্ত করতে হবে।

রোপণ সময়: বাংলাদেশে সারা বছর চিভ চাষ করা সম্ভব। তবে চিভ লাগানোর উপযোগী সময় এপ্রিল-মে মাস পর্যন্ত।

বীজ হার ও রোপণ দূরত্ব: প্রতি হেক্টরে ২,০০,০০০-৩,০০,০০০ চারা/ক্লাম্প ডিভিশন (Clump division) লাগে। প্রতিটি চারা ২০-২৫ সেন্টিমিটার দূরত্বে ১৫-২০ সেন্টিমিটার পরপর লাগাতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা: চিভ এর চারা রোপণের পর একটি প্লাবন সেচ দিতে হবে। চারা রোপণ এবং সেচের পর জমিতে প্রচুর আগাছা জন্মাতে পারে। আগাছা জমির রস ও অন্যান্য খাদ্য উপাদান গ্রহণ করে গাছের বৃদ্ধি ব্যহত করে। এই জন্য ২-৩ বার বা ততোধিক নিড়ানী দিয়ে জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। জমির 'জোঁ' অবস্থা দেখে ২০-২৫ দিন পর পর সেচ দিতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: চারা লাগানোর ৬৫-৭০ দিন পর থেকে ফসল সংগ্রহ করা যায়। গাছের গোড়া থেকে ২-৩ ইঞ্চি উপরে পাতা কেটে অথবা পুরো গাছ উঠিয়ে ফসল সংগ্রহ করা যায়। ফসল সংগ্রহের পর বাজারজাতকরণের জন্য পাতা/গাছ ভাল ভাবে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে এবং গাছের শিকড় কেটে ফেলতে হবে। বছরে ৫-৬ বার ফসল সংগ্রহ করা যায়।

ফলন: পাতা ও গাছ সহ প্রতি হেক্টরে ১০-১২ টন ফলন পাওয়া যায়।

রোগ বালাই: চিভ এ রোগের আক্রমণ খুব কম হয়। তবে জমিতে আর্দ্রতা বেশি থাকলে স্ক্লেরোসিয়া জাতীয় ছত্রাকের আক্রমণ হয়। এছাড়া পার্পল লিফ ব্লচ (Purple leaf blotch) নামক রোগের আক্রমণ হতে পারে।

পার্পল লিফ ব্লচ (Purple leaf Blotch): অলটারনারিয়া পোরি (*Alternaria porri*) নামক ছত্রাক দ্বারা এই রোগ হয়ে থাকে। আক্রান্ত বীজ, বায়ু ও গাছের পরিত্যক্ত অংশের মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এ রোগের প্রকোপ বাড়তে থাকে। এই রোগের আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়ে গাছের পাতা বা পুষ্পদণ্ডে ছোট ছোট পানি ভেজা দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে দাগগুলো ধীরে ধীরে বড় হয়। অনুকূলে আবহাওয়ায় পাতা বা পুষ্পদণ্ডে এক বা একাধিক দাগ পড়ে এবং তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। দাগের মধ্যবর্তী অংশ প্রথমে লালচে ও পরবর্তীতে কালো বর্ণ ধারণ করে এবং দাগের কিনারায় বেগুনী রং দেখা যায়। দাগের মধ্যস্থ গাঢ় অংশ ছত্রাকের বীজকনা দিয়ে পূর্ণ থাকে। সাধারণত আক্রান্ত পাতা ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যে হলুদ হয়ে মরে যায়।

দমন পদ্ধতি

- সুস্থ, নীরোগ বীজ ও চারা ব্যবহার করতে হবে।
- আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- রোভরাল বা ভিটাভেক্স-২০০ নামক ছত্রাকনাশক কেজি প্রতি ২.৫ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম রোভরাল এবং ২ গ্রাম রিডোমিল গোল্ড মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর ৩-৪ বার গাছে স্প্রে করতে হবে।
- এছাড়া প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার এমিস্টারটপ মিশিয়ে ৭-১০ দিন পর ৩-৪ বার গাছে স্প্রে করলে রোগের প্রকোপ কমে যায়।

পোকা-মাকড়: চিভ এ পোকা মাকড়ের আক্রমণ খুব কম হয়। তবে মাঝে মধ্যে থ্রিপস এর আক্রমণ লক্ষ্য করা যায়। আক্রান্ত পাতায় ক্ষুদ্রাকৃতির বাদামী দাগ দেখা যায়। পরবর্তীতে পাতা শুকিয়ে যায়।

দমন পদ্ধতি

- সাবান মিশ্রিত পানি ৪ গ্রাম/লিটার হারে প্রয়োগ করতে হবে।
- কেরাটে/এডমেয়ার/গেইন প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলিলিটার হারে মিশিয়ে স্প্রে করে সহজেই এই পোকা দমন করা যায়।

কালোজিরা

দেশে মসলা ফসলের মধ্যে কালোজিরার ব্যবহার কম। উৎপাদন ও ব্যবহারের দিক থেকে গৌণ হলেও কালোজিরা জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ মসলা। কনফেকশনারী ও রন্ধনশালায় দৈনন্দিন বিভিন্ন খাদ্য তৈরিতে এর জুড়ি নেই। কালোজিরার ঔষধি গুণাবলীও কম নয়। পেট ফাপা, চামড়ার ফুস্কুরী, মায়েদের প্রসব ব্যাথা, ব্রঙ্কাইটিস, এজমা ও কফ দূর করতে এটি ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া শরীরের মূত্রবর্ধক ও উদ্দীপক হিসেবে কালোজিরা ব্যবহৃত হয়। এদেশে অল্প জমিতে বিচ্ছিন্নভাবে কালোজিরার চাষ হয়ে থাকে। ফসলটির উন্নয়নের প্রধান বাধা হল এর উন্নত জাত ও উৎপাদন কৌশলের অভাব। বর্তমানে দেশে ব্যাপক চাহিদার কারণে কালোজিরা চাষ একান্ত প্রয়োজন।

বারি কালোজিরা-১

গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি। প্রতিটি গাছে প্রায় ৫-৭টি প্রাথমিক শাখা এবং ২০-২৫টি ফল থাকে। প্রতিটি ফলের ভিতরে প্রায় ৭৫-৮০টি বীজ থাকে যার ওজন প্রায় ০.২০-০.২৭ গ্রাম। প্রতি গাছে প্রায় ৫-৭ গ্রাম বীজ হয়ে থাকে এবং ১০০০ বীজের ওজন প্রায় ৩-৩.২৫ গ্রাম। বীজ পরিপক্ক হতে ১৩৫-১৪৫ দিন সময় লাগে। বীজের হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ১ টন। স্থানীয় জাতের তুলনায় এর রোগবালাই খুব কম।

বারি কালোজিরা-১

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: জলাবদ্ধতা মুক্ত উঁচু ও মাঝারী উঁচু এমন জমিতে কালোজিরা চাষ করা হয়ে থাকে। দোআঁশ থেকে বেলে দোআঁশ মাটিতে এটি চাষের জন্য উত্তম। জমিতে পানি সেচ এবং নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকা ভাল। শুষ্ক ও ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় কালোজিরা চাষের বেশি উপযোগী। মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশ রোগবালাইয়ের বিস্তারে অনুকূল। ফুল ফোটার সময় বৃষ্টি হলে কালোজিরার ফলন কমে যায়।

জমি তৈরি: সাধারণত ৩-৪টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে এবং আগাছা পরিষ্কার করে জমি তৈরি করা হয়।

বীজ বপন: মধ্য অক্টোবর-মধ্য নভেম্বর মাসে বীজ বপন করা হয়। তবে নভেম্বর মাসের প্রথম-দ্বিতীয় সপ্তাহ বীজ বপনের উত্তম সময়।

বীজের পরিমাণ: বীজ ছিটিয়ে বপন করলে হেক্টরপ্রতি ১০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। সারি করে বীজ বপন করলে হেক্টরপ্রতি ৮০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বপণ দূরত্ব: সারি থেকে সারি ৩০ সেমি ও গাছ থেকে গাছ ৫ সেমি (চারা পাতলাকরণের মাধ্যমে)।

সার প্রয়োগ: বাংলাদেশের প্রায় অধিকাংশ জমিতেই জৈব সারের ঘাটতি রয়েছে। তাই সম্ভব হলে জৈব সার বেশি পরিমাণ দেওয়াই ভাল। নিচে হেক্টরপ্রতি জৈব ও অজৈব সারের পরিমাণ উলেখ করা হলো।

সারের নাম	পরিমাণ	শেষ চাষের সময়	১ম কিস্তি	২ কিস্তি
পচা গোবর	৫ টন	সব	-	-
ইউরিয়া	১২৫ কেজি	সব	৬৫	৬০
টিএসপি	৯৫ কেজি	সব	-	-
এমওপি	৭৫ কেজি	সব	-	-

জমি চাষের পূর্বে সম্পূর্ণ পচা গোবর সার ছিটিয়ে দিতে হবে। সম্পূর্ণ টিএসপি এবং এমপি সার শেষ চাষের আগে জমিতে ছিটিয়ে ভালভাবে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সার বীজ বপনের ৩০-৪০ দিন ৫০-৬০ দিন পরে আগাছা নিড়ানীর পর দুই কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাটিতে প্রয়োজনীয় রস না থাকলে সার উপরি প্রয়োগের পর সেচ দেয়া ভাল।

অন্যান্য পরিচর্যা

আগাছা দমন: গাছের দৈহিক ও ফলন বৃদ্ধির জন্য সময়মতো আগাছা নিড়ানো ও গাছ পাতলাকরণ জরুরি। সাধারণত বীজ বপনের ১৫-২০ দিন পর আগাছা নিড়ানো উচিত। উপরে বর্ণিত গাছ থেকে গাছের দূরত্ব বজায় রাখার জন্য পাতলাকরণ উচিত। এ ফসলের জন্য ২-৩টি নিড়ানি ও পাতলাকরণ প্রয়োজন।

সেচ ও নিষ্কাশন: মাটিতে রস না থাকলে বীজ বপনের পর হালকা সেচ দেয়া ভাল। মাটির ধরন ও বৃষ্টির উপর নির্ভর করে জমিতে মোট ২-৩টি সেচ দেয়া যেতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগ দমন

কালোজিরার জমিতে তেমন একটা পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায় না। তবে জমিতে রস বেশি থাকলে গোড়া পচা রোগ দেখা যায়। এই রোগের আক্রমণ দেখা দিলে রিডোমিল গোল্ড বা ডাইথেন এম-৪৫ বা কার্বেন ডাজিম নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭ দিন পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করা যেতে পারে।

ফসল সংগ্রহ: বীজ বপনের ১৩৫-১৪৫ দিনের মধ্যে গাছ হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং এ সময় কালোজিরা সংগ্রহ করতে হয়। এ সময় গাছ উত্তোলনের পর শুকানোর জন্য রোদে ছড়িয়ে দিতে হয়।

মাড়াই, ঝাড়াই ও সংরক্ষণ: হাত দ্বারা ঘসে কিংবা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বীজ বাহির করা হয়। বীজগুলো পরিষ্কার করে এবং ভালভাবে রোদে শুকানোর পর ঠাণ্ডা করে পলিথিনের ব্যাগে/প্লাস্টিকের পাত্রে/টিনের কৌটায় রেখে মুখ ভালভাবে বন্ধ করে রাখতে হয়। চটের বস্তায় কালোজিরা রাখলে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক জায়গায় রেখে সংরক্ষণ করতে হবে।

মেথীর জাত

বারি মেথী-১

বারি মেথী-১

গাছের উচ্চতা ৫৫-৬০ সেমি। প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৪-৫টি। প্রতি গাছে পডের সংখ্যা ৪০-৪৫টি। প্রতিটি পডের দৈর্ঘ্য ৭-৯ সেমি। প্রতিটি পডে ১০-১২টি বীজ থাকে। বীজগুলো শুষ্ক ও হলুদাভ বাদামী বর্ণের। এই জাতে রোগবালাই নেই বললেই চলে। প্রতি হেক্টরে এর ফলন ১.২-১.৫ টন।

বারি মেথী-২

বারি মেথী-২

গাছের উচ্চতা ৬০-৭০ সেমি। প্রাথমিক শাখার সংখ্যা ৬-৭টি। মেথীর ফলকে 'পড' বলে। প্রতি গাছে পডের সংখ্যা ৬০-৬৫টি। প্রতিটি পডের দৈর্ঘ্য ৯-১০ সেমি যার প্রতিটিতে ১০-১২টি বীজ থাকে। বীজ হলুদাভ বাদামী বর্ণের। এই ফসলের রোগবালাই কম। প্রতি হেক্টরে ফলন ১.৮-২.১ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: মেথী রবি মৌসুমে চাষ করা হয়। প্রায় সব প্রকার মাটিতে চাষ করা সম্ভব। তবে পলি দোআঁশ মাটি থেকে বেলে দোআঁশ মাটি মেথী চাষের জন্য বেশি উপযুক্ত। মেথী গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য মাটির অম্লতা (পিএইচ ৬-৭) পরিমিত মাত্রায় হলে ভাল হয়।

জমি তৈরি ও বীজ বপন পদ্ধতি: মেথী চাষের জন্য জমি খুব ভালোভাবে চাষ ও মই দিয়ে তৈরি করতে হবে যাতে কোন প্রকার ঢেলা না থাকে। মাটি ও জমির প্রকারভেদে ৪-৬টি চাষ ও মই দেয়া প্রয়োজন হতে পারে। মাটিতে সরাসরি বীজ বুনে মেথী চাষ করা যায়। আবার তৈরিকৃত জমিতে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি বজায় রেখে বীজ বপন করা যায়। পরে যখন চারা গাছ ৪-৫ পাতা বিশিষ্ট হয় তখন গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫ সেমি বজায় রেখে চারা পাতলা করে দিতে হবে। সাধারণত ১ মিটার প্রস্থ ভিটিতে বীজ বপন করতে হয়। সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধার জন্য পাশাপাশি দুটি ভিটির মাঝখানে ৫০ সেমি প্রশস্ত নালা রাখতে হবে।

বপনের সময়: কার্তিক (মধ্য আগস্ট-মধ্য নভেম্বর)।

বীজের পরিমাণ: হেক্টরপ্রতি ১৫-২০ কেজি (ছিটিয়ে বোনার ক্ষেত্রে) ও ১০-১৫ কেজি (সারিতে বপনের ক্ষেত্রে)।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি: উচ্চ ফলন পাওয়ার জন্য সুষম সার প্রয়োগ করতে হবে। সারের মাত্রা জমির উর্বরতার উপর নির্ভরশীল।

প্রতি হেক্টরে নিম্নলিখিত পরিমাণ সারের প্রয়োজন হয়।

সারের নাম	পরিমাণ	শেষ চাষের সময় প্রয়োগ	পরবর্তী পরিচর্যা
গোবর	৫ টন	সব	-
ইউরিয়া	১৭৫ কেজি	৮৮ কেজি	৮৭ কেজি
টিএসপি	১৭৫ কেজি	সব	-
এম ও পি	১৩৫ কেজি	সব	-
জিপসাম	১১০ কেজি	সবা	-

সম্পূর্ণ গোবর সার, টিএসপি, এমওপি ও জিপসাম এবং অর্ধেক ইউরিয়া শেষ চাষের সময় দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া লাগানোর ৩০ দিন পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।

পরিচর্যা: গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের প্রাথমিক বৃদ্ধির সময় আগাছা পরিষ্কার ও মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে এবং ১০-১৫ দিন পরপর ৩-৪টি নিড়ানী দিতে হবে। সেচের পর 'জো' আসা মাত্র মাটির উপরের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। এতে মাটির ভিতর আলো বাতাস প্রবেশ করে এবং মাটি অনেকদিন রস ধরে রাখতে পারে যা পরবর্তী সময়ে গাছের দ্রুত বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে থাকে। মাটির প্রকারভেদে জমির সেচ প্রয়োগ করতে হবে। অতিরিক্ত পানি নালা দিয়ে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

রোগবালাই ও পোকামাকড় দমন: বারি মেথী-১ ও বারি মেথী-২ এ কোন মারাত্মক রোগ হয় না বললেই চলে। তবে জমিতে রস বেশি থাকলে গোড়া পচা রোগ দেখা যায়। ছোট চারায় এই রোগ বেশি হয় বলে চারা যথা সময়ে পাতলা করে দিতে হবে। রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ডাইথেন এম-৪৫ বা রিডোমিল বা রোভরাল কার্বেন ডাজিম মিশিয়ে ৭ দিন পরপর ৩-৪ বার স্প্রে করতে হবে। এ জাতে তেমন কোন পোকার আক্রমণ হয় না।

ফসল সংগ্রহ: বীজ বপনের পর থেকে ১১০-১২০ দিনের মধ্যেই ফসল সংগ্রহ করা যায়। সাধারণত চৈত্র মাসে (মধ্য মার্চ-মধ্য এপ্রিল) যখন শুঁটিসমূহ (পড) হলদে বাদামী ও কালচে বর্ণ ধারণ করে তখন গাছ কাটা হয়। এই কাটা গাছ ১-২ দিন ছায়ায় রাখতে হয়। এরপর মাড়াই করার জায়গায় ছড়িয়ে দিয়ে ২-৩ দিন রোদে শুকিয়ে মাড়াই করে বাতাসমুক্ত টিন, মাটির পট, পলিব্যাগ ইত্যাদিতে সংরক্ষণ করা হয়। বীজের রং ও সুগন্ধ বজায় রাখার জন্য সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা উচিত।

আলুবোখারা

আলুবোখারা বা প্লাম (*Prunus domestica*) রোজেসি (Rosaceae) পরিবারভুক্ত বাংলাদেশের স্বল্প ব্যবহৃত একটি উচ্চ মূল্যের ফল জাতীয় মসলা ফসল। এটি পিচ, চেরী ও বার্ত চেরী এর সমগোত্রীয় ফল প্রধানত মসলা হিসাবে ও আচার বা চাটনীতে ব্যবহার করা হয়। শুকনা আলুবোখারা (যা প্রুন নামে পরিচিত) মিষ্টি, রসালো এবং এন্টি অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ। পাকা ফল ডিপ ফ্রীজে সারা বছর রেখে তা থেকে সরবত বা চাটনি তৈরি করে খাওয়া যায়।

বারি আলুবোখারা-১

বারি আলুবোখারা-১

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মসলা গবেষণা কেন্দ্র থেকে উদ্ভাবিত বারি আলুবোখারা-১ জাতটি ২০১৩-১৪ সালে অনুমোদন করা হয়। এর গাছ মাঝারি আকারের, ৫-৬ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। তবে শাখা ছাটাই না করলে এর গাছ ১২ মিটার লম্বা ও ১০ মিটার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করতে পারে। ফেব্রুয়ারি মাসে এ জাতটিতে ফুল আসে আর জুন মাসে ফল পাকে। আকর্ষণীয় উজ্জ্বল লাল রঙের মাঝারী আকারের (৮.৬৬ গ্রাম/ফল) সুগন্ধিযুক্ত ফল। এর ফলের খাদ্যাংশ বেশি (৯৭%) এবং মাঝারী টক মিষ্টি স্বাদের (টিএসএস ১১.০)। গাছে প্রচুর ফল ধরে (গড়ে ১,৪০০টি), ১১.৩ কেজি বা হেক্টরপ্রতি ৭.০৩ টন। এ জাতটিতে রোগবালাই এর আক্রমণ অনেক কম।

উৎপাদন প্রযুক্তি

আবহাওয়া ও মাটি: সাধারণত শীত প্রধান ও অবউষ্ণ আবহাওয়া আলুবোখারা চাষের জন্য উপযোগী। তার ০-৭.২ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা এর জন্য সবচেয়ে উপযোগী। আলুবোখারা রৌদ্র উজ্জ্বল আবহাওয়া ও সুনিষ্কাশিত উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটিতে ভাল হয়। পাহাড়ের ঢালে ও পাহাড়ের উপরে ভাল বায়ু চলাচল উপযোগী পর্যাপ্ত সূর্যালোকে এর উৎপাদন ভাল হয়।

রোপণ পদ্ধতি ও সময়: সমতল ভূমিতে আলুবোখারা চারা সাধারণত বর্গাকার বা ষড়ভুজী প্রণালীতে লাগানো যেতে পারে। কিন্তু উঁচু নিচু পাহাড়ে কন্টুর রোপণ প্রণালী অনুসরণ করতে হবে। এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত আলুবোখারা চারা রোপণ করা যায়।

রোপণ স্থান: সারি-সারি ৪-৫ মিটার, চারা-চারা ৩-৪ মিটার।

আর্দ্র বালুর মধ্যে আলবোখারার সদ্য গজানো চারা

বংশ বিস্তার: বীজ থেকে উৎপাদিত চারা বা কলমের মাধ্যমে আলুবোখারার বংশ বিস্তার করা যেতে পারে। মাতৃ গাছের গুণগত মান বজায় রাখা ও দ্রুত ফলন পাওয়া যায় বলে কলমের চারাই উত্তম। ২,০০০-৪,০০০ পিপিএম মাত্রার ইনডোল বিউটেরিক এসিড (আইবিএ) প্রয়োগে গুটি কলম এর সাফল্য বাড়ে। মাতৃগাছ থেকে আলাদা করা কলম পাতা ও শাখা ছাটাই করে পলিব্যাগে ২/১ মাস রেখে ভালভাবে শিকড় ও পাতা গজানোর

পরে জমিতে লাগানো যেতে পারে। বীজ থেকে উৎপাদিত চারার উপর ক্লেফ্‌ট বা ভিনিয়ার কলম করে সহজেই কলমের চারা উৎপাদন করা যায়।

মাদা তৈরি: চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে ৪-৫ মিটার দূরের সারিতে ৪ মিটার দূরে দূরে ৭৫×৭৫×৬০ সেমি আকারের গর্ত তৈরি করে উপরের মাটি একপাশে ও নিচের মাটি অন্য পাশে রাখতে হবে। প্রতি গর্তে পচা গোবর অথবা কম্পোস্ট ১০-১৫ কেজি, ৩-৫ কেজি ছাই, টিএসপি ৩০০ গ্রাম, এমওপি ২৫০ গ্রাম, ইউরিয়া ১০০ গ্রাম, জিপসাম ১৫০ গ্রাম, দস্তা ১০ গ্রাম ও বোরন ১ গ্রাম পরিমাণে ভালভাবে উপরের মাটির সাথে মিশিয়ে উপরের মাটি নিচে আর নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত ভরাট করে রেখে দিতে হবে। গর্ত ভরাট করার ১০-১৫ দিন পর চারা রোপণ করতে হবে।

চারা/কলম রোপণ ও পরিচর্যা: ভাল উৎপাদন ও আগাম ফলন পেতে আলুবোখারার এক বছর বয়সী সুস্থ, সবল ও রোগমুক্ত কলমের চারা রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। গর্তে সার প্রয়োগের ১০-১৫ দিন পর নির্বাচিত চারা/কলমটি গর্তের মাঝখানে সোজাভাবে লাগিয়ে তারপর চারদিকে মাটি দিয়ে চারার গোড়ায় মাটি সামান্য চেপে দিতে হবে। রোপণের পরপর খুটি দিয়ে চারা/কলমটি খুটির সাথে বেঁধে দিতে হবে। অতঃপর প্রয়োজনমতো পানি ও বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। শুকনা মৌসুমে গাছে নিয়মিত সেচ ও আগাছা হলে তা দমনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: আশানুরূপ গুণগত মানসম্পন্ন ফল পেতে হলে আলুবোখারা নিয়মিত পরিমিত মাত্রায় সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বৃদ্ধির সাথে সাথে গাছে সার প্রয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। প্রতিটি গাছের জন্য সারের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে।

সারের নাম	গাছের বয়স			
	১-৩ বছর	৪-৭ বছর	৮-১০ বছর	১০ বছর এর উর্ধ্বে
গোবর/কম্পোস্ট	১০-১৫	১৫-২০	২০-২৫	২৫-৩০
ইউরিয়া(গ্রাম)	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০-৮০০	১০০০
টি এস পি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০
এম ও পি (গ্রাম)	১৫০-২০০	২০০-৩০০	৩০০-৪০০	৫০০

সবটুকু সার তিন ভাগ করে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন ও মাঘ-ফাল্গুন মাসে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার দেওয়ার পর প্রয়োজনে পানি দিতে হবে।

আগাছা দমন: গাছের গোড়া নিয়মিত পরিষ্কার করতে হবে। পাহাড়ের ঢালে, বাড়ির আঙ্গিনা, রাস্তার ধার বা পুকুর পাড়ে লাগানো গাছের গোড়ায় আগাছা কেটে পরিষ্কার রাখতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: চারা রোপণের প্রথমদিকে প্রয়োজনমতো সেচ দেয়া দরকার। খরা বা শুকানো মৌসুমে পানি সেচ দিলে ফল ঝরা কমে, ফলন বৃদ্ধি পায় এবং ফলের আকার ও অন্যান্য গুণাগুণ ভাল হয়।

অন্যান্য পরিচর্যা

ডাল ছাঁটাইকরণ: চারা অবস্থায় গাছকে সুন্দর কাঠামো দেয়ার জন্য অবাঞ্চিত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা ছাঁটাই করে রাখতে হবে। ছাঁটাইয়ের মাধ্যমে গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও পোকামাকড় আক্রান্ত ডালপালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে।

রোগবালাই ব্যবস্থাপনা: বারি আলুবোখারা-১ এ কোন পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়নি। শুধুমাত্র পাতার দাগ বা লিফ স্পট রোগ দেখা গেছে। ম্যানকোজেব বা এ জাতীয় ছত্রাকনাশক স্প্রে করেই তা দমন করা যায়।

ফসল সংগ্রহ ও ফলন: আলুবোখারার ফল নন-ক্লাইমেক্টেরিক হওয়ায় গাছ থেকেই ভালভাবে পাকার পর তা সংগ্রহ করতে হয়। আলুবোখারার ফল ভালভাবে পেকে গাঢ় লাল বা হালকা খয়েরী রং ধারণ করলে এবং ফল নরম হলেই সংগ্রহ করা উচিৎ। হালকা লাল বা হলুদ আবস্থায় সংগ্রহ করা হলে তা অত্যন্ত টক বা হালকা তেতো স্বাদেরও হতে পারে। বারি আলুবোখারা -১ এর বা এ জাতের প্রতি পূর্ণবয়স্ক (১০-২০ বছর) গাছে দেড় থেকে তিন হাজার পর্যন্ত ফল পাওয়া যেতে পারে। হেক্টরপ্রতি ৭ থেকে ১০ টন ফ্রেশ পাকা ফল পাওয়া যেতে পারে। যা থেকে হেক্টরপ্রতি ২৮-৪০ লক্ষ টাকা আয় করা সম্ভব।

পান

পান বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। পান Piperaceae পরিবারভুক্ত একটি বহুবর্ষজীবী চিরহরিৎ লতা জাতীয় উদ্ভিদ কিন্তু কাণ্ড হালকা শক্ত। পান ছায়া পছন্দকারী ডাইয়োসিয়াস প্রকৃতির অর্থাৎ পুরুষ ও স্ত্রী গাছ ভিন্ন ভিন্ন। পাতা ৩-৮ ইঞ্চি লম্বা, অগ্রভাগ সরু এবং হৃদপিণ্ডাকৃতির। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Piper betle.* চীন, মালয়েশিয়া ও ভারত পানের আদি বাসস্থান। অতিথি আপ্যায়নের অংশ হিসাবে পান পরিবেশন আমাদের দেশে ঐতিহ্য। পান পাতার রসে ফোনমিক উপাদানসমূহ থাকে। যাতে আছে চ্যাভিকল, রাইড্রোঅক্সিচ্যাভিকল, এসকরবিক এসিড এবং ১% পর্যন্ত উদ্বায়ী তেল যা কার্ডিনেনি, চ্যাভিকল, চ্যাভিবেটল এবং সিনেয়ল দ্বারা গঠিত। এতে আরও থাকে বিটা-ক্যারোটিন, আলফা-টোকোফেরল, আরোকেনি, ট্যানিন, স্টার্চ, সুগার ও ডায়াজটেজ থাকে। মূলে আছে ডায়োসজেনিন। পান মনে প্রফুল্ল আনে, পাকস্থলী শক্তিশালী করে এবং মস্তিষ্ক সতেজ করে ও শক্তিশালী করে। পান যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে ও শ্লেষ্মা দূর করে। পানের রস কান পাকা দূর করে ও উকুননাশক হিসেবে কাজ করে। পানের শিকড়ে গর্ভ নিরোধক শক্তি রয়েছে। পানে ভিটামিন 'বি' ও 'সি' রয়েছে। পান মাথা, যকৃত ও হৃৎপিণ্ডের টনিক হিসেবে কাজ করে। এর সবুজ পাতার ক্লোরোফিল দাতের জন্য উপকারী। পান বলবর্ধক, উত্তেজক এবং ক্ষতনাশক হিসেবেও কাজ করে। বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকাতেই কম বেশি পানের চাষ করতে দেখা যায় । বর্তমানে পান চাষের জমির পরিমাণ প্রায় ১৭-১৯ হাজার হেক্টর এবং উৎপাদনের পরিমাণ ২৩৮-২৬২ হাজার মেট্রিক টন। এদেশের মাটি, জলবায়ু, পারিপার্শ্বিকতা পান চাষের উপযোগী হলে ও পান উৎপাদন আশানুরূপ নয়। ভাল জাতের পানের চাষ ও আধুনিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে পানের ফলন অনেকাংশে বাড়ানো যায়।

পানের জাত

বারি পান-৩

বারি পান-৩ এর বরজ

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর বিজ্ঞানীরা বারি পান-১, বারি পান-২ ও বারি পান-৩ নামে তিনটি জাত উদ্ভাবন করেছেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হতে সংগ্রহীত স্থানীয় জার্মপ্লাজম থেকে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পানের উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়। জাতটি ২০১৭-১৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত হয় যা 'বারি পান-৩' নামে পরিচিত। পাতাগুলি গাঢ় সবুজ বর্ণের, বড় ও বোঁটা লম্বা। বারি পান-৩ বাংলাদেশের সর্বত্র সারা বছর চাষ উপযোগী। পান বরজের পরিচর্যা সময়মতো ও সঠিকভাবে গ্রহণ করা গেলে লতা লাগানোর ৬-৮ মাসের মধ্যে পান সংগ্রহ করা যায়। এ জাতের লতা প্রতি মাসে গড়ে ৩১.০০- ৩৩.৬৩ সেমি করে বৃদ্ধি পায়। এক মিটার দৈর্ঘ্যের লতায় গড়ে ১৯-২২ টি পান পাওয়া যায়। পাতার পুরুত্ব গড়ে ০.৭৫- ০.৯০ মিমি ও পাতার বোটার দৈর্ঘ্য গড়ে ৮.৯০- ৯.৩৪ সেমি হয়। জাতটিতে রোগ ও পোকার আক্রমণ অন্যান্য জাতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হয়। জাতটি হতে প্রতি বছর হেক্টরপ্রতি ৩৭.৫০-৪০.৯১ লাখ পান উৎপাদিত হয় বা হেক্টরপ্রতি ২০.০০-২২.৪৩ টন ফলন হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

পান চাষের অগ্রবর্তী জেলাসমূহ: বাংলাদেশের প্রায় সবত্রই পান জন্মায়। তবে যশোর, কুষ্টিয়া, বরিশাল, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, ফরিদপুর, পটুয়াখালী, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলায় উৎপন্ন পানের ৯০% উৎপাদিত হয়। পান একটি অত্যন্ত লাভজনক অর্থকরী ফসল ও খুব সুখী ফসল। পান চাষের পদ্ধতিও খুব নিবিড়, ব্যয়বহুল এবং শ্রমসাধ্য। অধিক উষ্ণ-আর্দ্র আবহাওয়ায় পান চাষ হয় বলে পোকা-মাকড় এবং ছত্রাক জাতীয় রোগের উপদ্রব অন্যান্য ফসলের চেয়ে অনেক বেশি।

আবহাওয়া, জলবায়ু ও মাটি: ছায়াযুক্ত, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বন্য পরিবেশে পান ভাল জন্মে। আমাদের দেশে খরিফ মৌসুমে পান উৎপাদনের অনুকূল আবহাওয়া বিরাজ করায় উৎপাদনের পরিমাণ রবি মৌসুমের তুলনায় দ্বিগুন হয়। পান চাষের জন্য

বাৎসরিক বৃষ্টিপাত ২,২৫০-৪,৭৫০ মিমি, আপেক্ষিক আদ্রতা ৪০-৮০% এবং তাপমাত্রা ১৫-৪০ ডিগ্রি সে.। তবে ১৫-২৫ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় পান ভাল হয়। বরজ এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেখানে গাছের জন্য প্রয়োজনীয় আলো বাতাস চলাচল করতে পারে। নিষ্কাশনযুক্ত, উর্বর বেলে বা বেলে দোআঁশ বা এঁটেল মাটি পানচাষের জন্য বেশি উপযোগী। মাটির পিএইচ ৫.৬ থেকে ৮.২ হলে পান চাষের জন্য ভালো।

জমি তৈরি ও মাটি শোধন: ৩-৪ টি চাষ দিয়ে মাটি তৈরি করা উচিত। চৈত্র-বৈশাখ মাসে ১ মাস ধরে স্বচ্ছ পলিথিন দিয়ে ঢেকে রেখে মাটি শোধন করতে হবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মাঝে মধ্যে বিকালের দিকে চাদর সরিয়ে অল্প পানি ছিটিয়ে দিয়ে আবার পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ৬০ মিলি ফরমালিনে ১০ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে প্রতি বর্গমিটার জমিতে প্রয়োগ করে পলিথিন দিয়ে ৪-৫ দিন ঢেকে রাখতে হবে। মাটি শোধনের ২০-২৫ দিন পর লতা রোপণ করতে হবে ।

লতা নির্বাচন ও শোধন: পানের লতা বা কাটিং লাগানোর জন্য সতেজ ও রোগমুক্ত বরজ হতে লতা বা কাটিং সংগ্রহ করতে হবে। গাছের উপরের এক মিটারের মধ্যে থেকেই কাটিং সংগ্রহ করা উচিৎ। লতা মাটিতে লাগানোর আগে প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম প্রোভ্যাক্স-২০০ বা অটোস্টিন ও এডমায়ার ১ মিলি মিশিয়ে এর জলীয় দ্রবণে ১২-১৫ মিনিট চুবিয়ে শোধন করে নিতে হবে। এর পর লতা ছায়াতে রেখে শুকিয়ে নিতে হবে। লতা সংগ্রহের ৫-৬ দিন পূর্বে গাছের ডগার দিকে ২-৩ সেমি ভেঙ্গে দিলে ভাল হয়। রোপণ দূরত্ব অনুযায়ী হেক্টরে ৭০ থেকে ৮০ হাজার কাটিং প্রয়োজন হয়।

রোপণ পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনা

- পান বরজে সেচ ও নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে ।
- চারা গাছের জন্য পর্যাপ্ত ছায়ার ব্যবস্থা করতে হবে ও লতা আকড়ে ধরার জন্য অবলম্বনের ব্যবস্থা করতে হবে ।

কাটিং বা চারা প্রস্তুতকরণ

- ২ বছর বয়সের পুরাতন, সুস্থ, সবল ও নিরোগ লতা নির্বাচন করতে হবে। লতা থেকে কাটিং সংগ্রহ করে ৮-১০ সেমি গভীর উর্বর মাটিতে বর্ষাকালে ৫০-৬০ সেমি এবং শরৎকালে ৪০-৫০ সেমি দূরে দূরে লাগাতে হবে।
- পান গাছের কাণ্ডকে ছোট ছোট টুকরায় কেটে চারা তৈরি করতে হবে। প্রতিটি কাটিং লম্বায় ৩০-৪০ সেমি হতে হবে ও ৩-৫টি গিট (পর্ব) এবং ৩-৪ টি পাতা থাকলে ভাল হয়।
- পানের লতার উপরের, মাঝের বা গোড়ার যে কোন অংশ কাটিং হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তবে গোড়ার অংশের তুলনায় উপরের ও মাঝের অংশ হতে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে শিকড় ও কুশি গজাতে পারে।
- বীজ লতা হতে সংগ্রহ করে প্রায় ৮০ টির মতো কাটিং একত্রে বেধে একটা বাণ্ডিল তৈরি করা হয়। এ বাণ্ডিলে কাদা মেখে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। ২-৩ দিনের মধ্যে পর্বসন্ধি হতে নতুন শিকড় বের হলে কাটিং লাগানো যায় ।

লতা রোপণের সময়: বছরের যে কোন সময় লতা লাগানো যায়। তবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, আশ্বিন-কার্তিক ও ফাল্গুন মাসে লতা লাগানো হলে ভাল ফল পাওয়া যায়। খরিফ মৌসুমে মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য চৈত্র মাসে পানের চারা রোপণ করা হয়। আবহাওয়ার তারতম্য ও অঞ্চল ভেদে চারা রোপণের উপযুক্ত সময়ের তারতম্য হয়। কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও নড়াইলে মধ্য ফাল্গুন হতে মধ্য চৈত্র মাসে, যশোরে মধ্য জ্যৈষ্ঠ হতে মধ্য শ্রাবণ মাসে, বরিশালে ও বাগেরহাটে মধ্য জ্যৈষ্ঠ হতে মধ্য আষাঢ় মাসে, পটুয়াখালী আষাঢ় হতে শ্রাবণ মাসে, রাজশাহীতে মধ্য মাঘ হতে মধ্য চৈত্র মাসে, চট্টগ্রামে মধ্য জ্যৈষ্ঠ হতে মধ্য ভাদ্র মাসে, কক্সবাজারে মধ্য শ্রাবণ হতে মধ্য ভাদ্র মাসে পানের কাটিং রোপণ করা হয়।

সার ব্যবস্থাপনা: জমি তৈরির সময় সার প্রয়োগ চারা লাগানোর পূর্বে হেক্টরপ্রতি ৮-১০ টন পচা গোবর সার ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

পান বরজে সার প্রয়োগ: পান অধিক মাত্রায় পুষ্টি গ্রহণ করে। সাধারণত খৈল, কোন কোন এলাকায় ইউরিয়া সার দেয়া হয়। কাঠা প্রতি জায়গায় বছরে টিএসপি ৩ কেজি, এমওপি ৩ কেজি, সরিষা বা নিম খৈল ২০ কেজি প্রয়োগ করা যেতে পারে। সার ও খৈল বছরে ৫-৬ টি ভাগে প্রয়োগ করা যেতে পারে। পান গাছের খাবার লতার গোড়ায় দেওয়া যাবে না। ২ সারির মাঝখানে ২ ইঞ্চি খুড়ে খৈল বা রাসায়নিক সার দিতে হবে। খৈল পচিয়ে তারপরে বরজে দিলে গাছ ভাল ভাবে গ্রহণ করতে পারে ও রোগবালাই কম হবে।

সারের মাত্রা

নতুন বরজে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়কাল

সারের নাম	পরিমাণ /হেক্টর	সার প্রয়োগ পদ্ধতি
গোবর	১০-১৫ টন	সবটুকু জমি তৈরির সময়
খৈল	৬ টন	১২ কিস্তি (চারা লাগানোর ২ মাস পর হতে ৩০ দিন পর পর) সার প্রয়োগ করতে হবে।
ইউরিয়া	২১৭ কেজি	১২ কিস্তি (চারা লাগানোর ২ মাস পর হতে ৩০ দিন পর পর) সার প্রয়োগ করতে হবে।
টিএসপি	১১০ কেজি	সবটুকু জমি তৈরির সময়
এমপি	৮৪ কেজি	সবটুকু জমি তৈরির সময়
জিপসাম	৫০ কেজি	সবটুকু জমি তৈরির সময়
জিংসালফেট	১৫ কেজি	সবটুকু জমি তৈরির সময়

(***Source*** *: Effect of N, P and K on the yield and quality of betel leaf, Anual Research Report 2014-15, Spices Research Centre, Shibganj, Bogura)*

পুরাতন বরজে সার প্রয়োগের পরিমাণ ও সময়কাল

সারের নাম	পরিমাণ/হেক্টর	সার প্রয়োগ পদ্ধতি
খৈল	৪ টন	জুন - নভেম্বর, ১৫ দিন পরপর ১২ কিস্তিতে।
ইউরিয়া	১৮০ কেজি	জুন - নভেম্বর, ১৫ দিন পরপর ১২ কিস্তিতে
টিএসপি	১৫০ কেজি	মে মাসে ১ কিস্তিতে
এমওপি	৭৫ কেজি	মে মাসে ১ কিস্তিতে
জিপসাম	৫০ কেজি	মে মাসে ১ কিস্তিতে
জিংক সালফেট	১৫ কেজি	মে মাসে ১ কিস্তিতে

সেচ প্রদান: সফলভাবে পান চাষের জন্য সঠিক মাত্রায় সেচ প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পান বরজের মাটিতে সবসময় আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে। শুষ্ক মৌসুমে ৬-৭ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। কিন্তু বর্ষাকালে পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে।

আন্তঃপরিচর্যা

- পানের লতা লাগানোর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে সতেজ হয়ে উঠে এবং ১ মাসের মধ্যে প্রথম পাতা গজায়।
- চারা একটু বড় হলেই এর খাড়া ভাবে বর্ধিত হওয়ার জন্য পাটকাটি বা বাশের কঞ্চি পুঁতে এর সাথে পান গাছ বেধে দিতে হবে।
- রোপণ পরবর্তী যত্নের উপর পানের উৎপাদন ও ফলন নির্ভর করে। রোপণ পরবর্তী যত্নের মধ্যে শূন্যস্থান পূরণ, সার প্রয়োগ, গোড়ায় মাটি তুলে দেওয়া, আগাছা পরিষ্কার, সেচ ও নিষ্কাশন, লতা নামানো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

লতা নামানো ও বরজে মাটি তুলে দেওয়া

- সাধারণত পান গাছকে ১-১.৫ মিটারের বেশি লম্বা হতে দেওয়া উচিত নায়। পানের লতা যখন বরজের ছাউনি পর্যন্ত (২-২.৫ মিটার) পৌছায় তখন তা নিচে নামিয়ে পাতা বিহীন অংশকে পেচিয়ে মাটি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়।
- আমাদের দেশে বছরে সাধারণত ২ বার (মাঘ-বৈশাখ ও আষাঢ়-আশ্বিন) পানের লতা নামানো হয়। কোন কোন স্থানে ৩-৪ বার লতা নামানো হয়।

- আন্তঃপরিচর্যা করার ফলে পান লতার গোড়ার মাটি সরে যায়। এর ফলে শিকড় মাটি থেকে বের হয়ে আসে এবং মাটি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে অসুবিধা হয়। এর ফলে লতা ধীরে ধীরে দুর্বল হয় ও রোগবালাই বৃদ্ধি পায়। এ জন্য বছরে ১-২ বার বাহির হতে ঝুরঝুরে মাটি এনে গাছের গোড়ায় দিতে হবে।

পান সংগ্রহঃ সময়মতো যত্ন ও পরিচর্যা করলে চারা লাগানোর ৬ মাস পর হতে পান তোলা যেতে পারে। প্রতিটি গাছ হতে মাসে ৩-৪ বার পান তোলা যায়। পানের লতা লাগানোর ৬-৮ মাসের মধ্যে পাতা সংগ্রহ করার উপযুক্ত হয়।

পাতার ফলনঃ আমাদের দেশের পানের গড় ফলন প্রতিবেশী দেশ ভারতের তুলনায় অনেক কম। এর অন্যতম কারণ যত্ন ও পরিচর্যার অভাব, সুষম সার প্রয়োগ না করা, আবহাওয়া, মাটি, জাত, চাষাবাদ পদ্ধতি, রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ ইত্যাদি। আমাদের দেশে গড়ে বছরে হেক্টরপ্রতি ১৬-২০ লক্ষ পান উৎপন্ন হয়। সেখানে ভারতে ৫০-৭০ লক্ষ পান উৎপন্ন হয়। বরজ তৈরির প্রথম বছরে পানের ফলন কম হয়। এবং দ্বিতীয় বছরে ফলন বৃদ্ধি পায়। একই জমিতে ১০-১২ বছরের বেশি সময় পর্যন্ত পান চাষ করা ঠিক হবে না।

উৎপাদন বাড়ানো খরচ কমানোঃ পান চাষে কম খরচের মাধ্যমে অধিক পরিমাণ লাভ করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে

- উচ্চ ফলনশীল পানের জাত চাষ করা, সুষমমাত্রায় সার প্রয়োগ করা এবং শুষ্ক মৌসুমে সেচের ব্যবস্থা করা।
- সঠিক সময়ে সঠিক পদ্ধতিতে সঠিক মাত্রায় সঠিক বালাইনাশক ব্যবহার করা এবং নিবিড় যত্ন ও পরিচর্যার ব্যবস্থা করা।

পোকা মাকড় ও রোগবালাই

বারি পান-৩, বারি পান-১ ও বারি পান-২ এবং অন্যান্য স্থানীয় জাত হতে পোকা-মাকড় ও রোগবালাই এর আক্রমণ কম হওয়ায় এর ফলনও বেশি হয়। যদি পোকা-মাকড় ও রোগবালাই এর আক্রমণ হয় তবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা প্রয়োগের মাধ্যমে পোকা-মাকড় ও রোগবালাই এর ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব।

পোকা-মাকড়

কালো মাছিঃ ইহা পান বরজের ক্ষতিকারক পোকা। গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে এ পোকা পানের বরজে বেশি দেখা যায়। এই পোকা পাতার নিচে বেশি দেখা যায় । নিম্ন বা বাচ্চা ও পূর্ণবয়স্ক দু অবস্থাতেই পান গাছের ক্ষতি করে। এরা পান পাতার রস চুষে খায়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- আক্রমণের মাত্রা কম হলে আক্রান্ত পাতা তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- বরজের ভিতর ও চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- এ পোকা হলুদ রঙের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই আঠালো হলুদ রঙের ফাঁদ পেতে এদের দমন করা যেতে পারে। হলুদ ফাঁদ তৈরির জন্য একটি প্লাস্টিকের বৈয়ামের উপরিভাগে মবিল বা অন্য কোন আঠালো পদার্থ মেখে পান বরজে স্থাপন করতে হবে। এর জন্য প্রতি বিঘায় ৭ টি ফাঁদ লাগবে।
- ২০ লিটার পানির মধ্যে ১ কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ভিজিয়ে রেখে পরে দিন সকালে ঐ পানি স্প্রে করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি নিম তেল ও ৫ মিলি টিক্স মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।
- আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে মেলাথিয়ন (ফাইফানন, মেলাটাফ, মেলাটক্স) ৫৭ ইসি ২ মিলি বা ডারসবান ১ মিলি বা ইমিটাফ বা গেইন ০.৫ মিলি মিশিয়ে ১০-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

সাদা মাছিঃ এক ধরনের শোষক পোকা। পূর্ণ বয়স্ক মাছি ও তার বাচ্চা পান পাতা ও কচি ডগার রস চুষে খেয়ে ক্ষতি করে। ফাল্গুন মাস হতে বর্ষার পূর্ব পর্যন্ত এর আক্রমণ বেশি হয়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- আক্রামণের মাত্রা কম হলে আক্রান্ত পাতা তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- বরজের ভিতর ও চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- এ পোকা হলুদ রং এ আকৃষ্ট হয়। তাই আঠালো হলুদ রঙের ফাঁদ পেতে এদের দমন করা যেতে পারে। হলুদ ফাঁদ তৈরির জন্য একটি প্লাস্টিকের বৈয়ামের উপরিভাগে মবিল বা অন্য কোন আঠালো পদার্থ মেখে পান বরজে স্থাপন করতে হবে। এর জন্য প্রতি বিঘায় ৭ টি ফাঁদ লাগবে।

- ২০ লিটার পানির মধ্যে ১ কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ভিজিয়ে রেখে পরেদিন সকালে ঐ পানি স্প্রে করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি নিম তেল ও ৫ মিলি টিক্স মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।
- আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে সাইফারমেথিয়ন (রিপকর্ড) ৫৭ ইসি ১ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

মিলি বাগ (Mily bug, *Ferrisia virgata*)

শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য: অপ্রাপ্ত বয়স্ক পর্যায়ে এই পোকা হলুদাভ অথবা ফ্যাকাশে সাদা হয়। অন্যদিকে প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী পোকা লম্বা, পালকবিহীন, মোমের সাদা আবরণযুক্ত হয়।

ক্ষতির লক্ষণ: প্রাথমিক পর্যায়ে পাতায় এবং নরম কাণ্ডে সাদা তুলার মত লক্ষণ দেখা যায়। এরা পাতা ও কাণ্ডের রস চুষে নেয়, ফলে গাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- আক্রমণের মাত্রা কম হলে আক্রান্ত পাতা তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- বরজের ভিতর ও চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- এ পোকা হলুদ রঙের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই আঠালো হলুদ রঙের ফাঁদ পেতে এদের দমন করা যেতে পারে। হলুদ ফাঁদ তৈরির জন্য একটি প্লাস্টিকের বৈয়ামের উপরিভাগে মবিল বা অন্য কোন আঠালো পদার্থ মেখে পান বরজে স্থাপন করতে হবে। এর জন্য প্রতি বিঘায় ৭ টি ফাঁদ লাগবে।
- ২০ লিটার পানির মধ্যে ১ কেজি আধা ভাঙ্গা নিম বীজ ভিজিয়ে রেখে পরেদিন সকালে ঐ পানি স্প্রে করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি নিম তেল ও ৫ মিলি টিক্স মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।
- আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে সাইফারমেথিয়ন (রিপকর্ড) বা ক্লোরপাইরিফস (ডারস্‌বান) ১ মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করার পূর্বে প্রাপ্ত বয়স্ক অথবা বাজারজাত করা যাবে এমন পাতা তুলে ফেলতে হবে।

সাদা কালো ও লাল মাকড়

মাকড় পান পাতার রস চুষে খায়। এদের খালি চোখে দেখা যায় না। গরম ও বৃষ্টিহীন অবস্থায় এদের আক্রমণ বেশি হয়। মাকড় আক্রমণ করলে পাতায় লাল লাল ফোটা ফোটা দাগ অথবা লম্বালম্বি ভাবে লাল দাগ দেখা যায়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের আক্রমণ বৃদ্ধি পায়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- আক্রমণের মাত্রা কম হলে আক্রান্ত পাতা তুলে ধ্বংস করতে হবে।
- বরজের ভিতর ও চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- বাড়ন্ত অবস্থায় থেকে ১৫ দিন পর পর প্রতি লিটার পানির সাথে ১০ মিলি নিম পাতা বা আতা পাতার নির্যাস ব্যবহার করলে পোকার আক্রমণ কম হয়।
- প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি নিম তেল ও ৫ মিলি টিক্স মিশিয়ে পাতায় স্প্রে করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানির সাথে সালফার জাতীয় ছত্রাক নাশক যেমন- থিয়ভিট/কুমুলাক্স/ফাইটোভিট ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে পাতার উপরে ও নিচে স্প্রে করতে হবে। আক্রমণের মাত্রা খুব বেশি হলে প্রতি লিটার পানির সাথে মাকড় নাশক যেমন- ভারটিমেক/ওমাইট/নিউরোন ইত্যাদি ১ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

রোগ ব্যবস্থাপনা

গোড়া/লতা ও পাতা পচা (Foot rot or leaf rot or wilt)

আক্রমণকারী জীবাণু: *Phytophthora parasitica var. piperina*

লক্ষণ: এই রোগ দ্বারা গাছ বৃদ্ধির সকল পর্যায়ে আক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রাথমিকভাবে হঠাৎ ঢলে পড়া এই রোগের লক্ষণ। আক্রান্ত গাছের পাতা হলুদাভ এবং নিচে দিকে ঢলে পড়ে। পাতার উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যায়। আক্রান্ত গাছ ২ অথবা ৩ দিনে সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায়। কাণ্ড বাদামী, ঝুরঝুরে এবং কাঠির মতো শুকিয়ে যায়। কাণ্ডের মাটির কাছের অংশে কাল অনিয়মিত ক্ষত দেখা যায়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- প্রতি লিটার পানির মধ্যে ৫০০ মিগ্রা. স্ট্রেপটোসাইক্লিন ও ৫ মিলি বর্দো মিক্সার বা ০.২% রিডোমিল গোল্ড দ্রবণে চারাকে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে ও পরে ছায়ায় শুকিয়ে রোপণ করতে হবে।

- আক্রান্ত লতা পাতাকে সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
- পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং শীতের সময় নিয়ন্ত্রিত সেচ দিতে হবে।
- শীতের সময় মাটির সাথে প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলি বর্দো মিক্সার মিশিয়ে প্রতি হিলে ৫০০ মিলি হারে এক মাস অন্তর অন্তর দিতে হবে।
- বরজে রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে রিডোমিল গোল্ড বা মিউকোসিল ২ গ্রাম বা সিকিউর ১.৫ গ্রাম মিশিয়ে গাছের গোড়াসহ সমস্ত গাছে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

গোড়া পচা (Sclerotium foot rot and wilt)

আক্রমণকারী জীবাণু: ***Sclerotium rolfsii***

লক্ষণ: সকল বয়সের গাছ এই রোগে আক্রান্ত হয়। মূল ও কাণ্ডে প্রথম আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় যা সাদাটে তুলার মতো দেখা যায়। আক্রান্ত কাণ্ডে পচন ধরে এবং গাছের পাতা ঝরে যায় এবং অবশেষে মারা যায়।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- লতা রোপণের পূর্বে প্রতি লিটার পানির মধ্যে ২ গ্রাম প্রভেক্স বা অটোস্টিন মিশিয়ে চারা ৩০-৩৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখতে হবে ও পরে রোপণ করতে হবে।
- আক্রান্ত গাছকে মূলসহ তুলে ফেলতে হবে এবং আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- মাটিতে সরিষার খৈল/জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে।
- বরজে রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম কার্বেনডাজিম/ প্রতি লিটার পানির সাথে ১ গ্রাম টিমসেন মিশিয়ে গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করতে হবে।

এনথ্রাকনোজ (Anthracnose)

আক্রমণকারী জীবাণু: *Colletotrichum capsici var. piperis*

লক্ষণ: প্রথম পর্যায়ে পাতায় ছোট, গোলাকার কালো দাগ দেখা যায় যা পরবর্তীতে বৃদ্ধি পায়, চক্রাকার আকার ধারণ করে এবং দাগগুলি হালকা হলুদ দাগ দ্বারা আবৃত থাকে, যেগুলি ২ সেমি পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাতা ফ্যাকাসে হলুদ হয়ে যায় এবং দাগের মধ্যখানে বড় কালো ফোটা থাকে। একই লক্ষণ কাণ্ডে ও দেখা যায়। রোগের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে কালো দাগ কাণ্ডকে বেষ্টিত করে রাখে।

সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

- আক্রান্ত লতা ও পাতা সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।
- পাতা তোলার পর প্রতি লিটার পানির সাথে ২ গ্রাম জিরাম বা ৫ মিলি বর্দো মিক্সার বা ০.৫ মিলি টিল্ট বা এমিস্টারটপ ১ মিলি বা ক্যাবরিওটপ ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

সংগ্রহ এবং সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থা

গাছ লাগানোর ৬-৮ মাস পর পান পাতা সংগ্রহ করা যায় এবং তার পর প্রতি ১৫-২৫ দিন অন্তর অন্তর পাতা সংগ্রহ করা যায়। পান গাছ লম্বায় ১.২ থেকে ১.৮ মিটার হলে পাকা সংগ্রহ করা যায়। কাণ্ডের নিচের অংশ থেকে পাতা সংগ্রহ হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে পরিণত পাতা প্রধান কাণ্ডের নিচের অংশ থেকে ২-৩ বার সংগ্রহ করা হয়। পরবর্তীতে পান পাতা প্রধান কাণ্ডে ও পার্শ্বীয় কাণ্ড হতে সংগ্রহ করা হয়। দূরবর্তী বাজারের জন্য পান পাতা তিন সপ্তাহ ও স্থানীয় বাজারের জন্য দুই সপ্তাহ পর পর সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহকৃত পাতা পরিষ্কার করে পাতার আকৃতি ও গুণগত মান অনুযায়ী বাছাই করা হয়। তারপর সেগুলো বোটার অংশ বিশেষ কেটে এবং নষ্ট পাতা অপসারণ করে প্যাকেট করা হয়। পরিষ্কার করার জন্য পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত পানি ব্যবহার করা হয়। কর্মীদেরকে নিজেদের হাত জীবাণুমুক্ত রাখতে হবে এবং প্রয়োজনীয় মানসম্মত উপায় অবলম্বন করতে হবে। স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অবলম্বন করে সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে গুণগত মান বজায় থাকে এবং সংগনিরোধ (quarantine) নিশ্চিত করা যায়।

দানা ফসল

- গম
- ট্রিটিক্যালি
- ভুট্টা
- বেবী কর্ণ
- চীনা
- কাউন
- বার্লি

দানা ফসল পুষ্টির দিক থেকে শ্বেতসার উপাদানের প্রধান উৎস। এ কারণে পৃথিবীর সকল দেশে প্রধান খাদ্য ফসল হিসেবে গম, ভুট্টা, চীনা, কাউন ও বার্লি প্রভৃতি দানা ফসল উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশে প্রায় ৮.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে এসব ফসলের চাষাবাদ হয়ে থাকে। এ সব ফসল থেকে বেশ কিছু পরিমাণ আমিষ ও খনিজ লবণও পাওয়া যায়। গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান দানা ফসল। ইদানীং মানুষের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও পুষ্টিমানের বিবেচনায় গমের আটা বাংলাদেশে মানুষের খাদ্য তালিকায় উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিয়েছে।

বর্তমানে উৎপাদন ও খাদ্যের দিক থেকে আমাদের দেশে ধানের পরই গমের স্থান। গমের পাশাপাশি ভুট্টা, চীনা, কাউন ও বার্লির বেশ কিছু উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং এসব জাতের আবাদ দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) সুপারিশ অনুযায়ী প্রতিদিন মাথাপিছু ৪৫৪ গ্রাম দানা খাদ্যের দরকার। বিগত ১০ বছরে গড় মাথাপিছু দানা খাদ্যের প্রাপ্যতা ছিল দৈনিক প্রায় ৬৩০ গ্রাম। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৩ কোটি ৬০ লক্ষ টন দানা খাদ্য ফসল উৎপাদিত হয়। তবুও প্রায় ১৬ কোটি অধিবাসীর জন্য এ পরিমাণ যথেষ্ট নয়।

সরকার আগামীতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য দানা শস্যের উৎপাদন সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আশা করা যায়, এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

গম

বাংলাদেশে খাদ্য ফসল হিসেবে গম দ্বিতীয় শীর্ষ স্থানে রয়েছে। সত্তর দশকে বাংলাদেশে প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর জমিতে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত খেরী, আইপি-৫২, আইপি-১২৫ জাতের গম আবাদ হত। এর মোট উৎপাদন মাত্রা ১ লক্ষ টনের মত ছিল। তখন উচ্চ ফলনশীল জাতের গম চাষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় এবং বিদেশ থেকে কল্যাণসোনা এবং সোনালিকা জাতের ৫ হাজার টন গম বীজ আমদানি করা হয়। স্থানীয় জাতের তুলনায় উচ্চ ফলনশীল জাতের ফসল প্রায় তিন গুণ বেশি হওয়ায় তখন গম উৎপাদনে বিপুল উৎসাহ সৃষ্টি হয়। প্রতি বছরই গম চাষের অধীন জমির পরিমাণ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে ১৯৮৫ সালে প্রায় ৭ লক্ষ হেক্টর জমিতে গমের চাষ সম্প্রসারিত হয় এবং এর উৎপাদন প্রায় ১২ লক্ষ টনে উন্নীত হয়। এভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে গম উৎপাদনকারী দেশে পরিণত হয়। ১৯৯৮-৯৯ সালে ৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে আবাদ সম্প্রসারিত হয় এবং উৎপাদন প্রায় ১৯ লক্ষ টনে উন্নীত হয়। তবে এরপর থেকে বিভিন্ন কারণে যেমন, অন্যান্য রবি ফসলের সাথে প্রতিযোগিতা ও প্রধান আবাদি জাত রোগাক্রান্ত হওয়ায় গমের আবাদ ও উৎপাদন প্রতি বছরই কমতে থাকে।

গম ফসল, ইনসেটে গমের দানা

১৯৯৮ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে বেশ কিছু উচ্চ ফলনশীল, তাপ সহিষ্ণু ও রোগ প্রতিরোধী জাত উদ্ভাবন ও কৃষক পর্যায়ে হস্তান্তরিত হওয়ায় গমের আবাদ, উৎপাদন এবং ফলন গত কয়েক বছর যাবত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে ৪.৫৩ লক্ষ হেক্টর জমিতে গমের উৎপাদন ১৩.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ৩.০৪ টন যা বাংলাদেশের গম চাষের ক্ষেত্রে একটি মাইল ফলক।

বাংলাদেশে গম চাষ এত দ্রুত জনপ্রিয় হওয়ার কারণ হিসেবে উলেখ করা যায় যে, গমের চাষ সহজ, সেচ পানির চাহিদা কম এবং রোগ ও পোকার আক্রমণের তেমন সমস্যা নেই।

বর্তমানে এদেশে অধিক আবাদকৃত গম জাতের মধ্যে ‘বারি গম-২৫’, ‘বারি গম-২৬’, ‘বারি গম-২৭’, ‘বারি গম-২৮’, ‘বারি গম-২৯’,‘বারি গম-৩০’,‘বারি গম-৩১’, ‘বারি গম-৩২’ এবং ‘বারি গম-৩৩’ রোগ প্রতিরোধী উচ্চ ফলনশীল জাত।

গমের জাত

বারি গম-২৫

গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ২৫ একটি উচ্চ ফলনশীল লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং তাপ সহিষ্ণু গমের জাত। জাতটি ২০১০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক দেশের সকল অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়।

বারি গম-২৫

এ জাতটি একটি কৌলিক সারি হিসেবে আঞ্চলিক নার্সারির মাধ্যমে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। কৌলিক সারিটি বি এ ডব্লিউ ১০৫৯ নামে বিভিন্ন নার্সারিতে ও ফলন পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায় এ সারিটি উচ্চ ফলনশীল বলে প্রমাণিত হয়। চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট এ জাতের গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫৫টি দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে বেশ বড় (হাজার দানার ওজন ৫৪-৫৮ গ্রাম) জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপসহিষ্ণু। জাতটি মধ্যম মাত্রার লবণাক্ততা (৮-১০ ডিএস/মি) সহিষ্ণু। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৩৮০০-৫২০০ কেজি। জাতটি লবণাক্ততা সহিষ্ণু হাওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলে মাধ্যম মাত্রার লবণাক্ত (৮-১০ ডিএস/মি) এলাকাসহ দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য উপযোগী।

বারি গম-২৬

গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ২৬ একটি উচ্চ ফলনশীল তাপ সহিষ্ণু গমের জাত। জাতটি ২০১০ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক দেশের সকল অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য অবমুক্ত করা হয়। তিনটি বিদেশি গম জাতের মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন প্রজন্মে বাছাইয়ের পর এ জাতের কৌলিক সারিটি নির্বাচন করা হয়। কৌলিক সারিটি বিভিন্ন নার্সারিতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমাণিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১০৬৪ নামে কৌলিক সারিটি নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায় এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমাণিত হয়।

বারি গম-২৬

পাঁচ-ছয়টি কুশি বিশিষ্ট। গাছের উচ্চতা ৯২-৯৬ সেন্টিমিটার। শীষ মাঝারী এবং প্রতি শীষ দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা,চকচকে ও আকারে বড় (হাজার দানার ওজন ৪৮-৫২ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। তাছাড়াও বারি গম ২৬ জাতটি কাণ্ডের মরিচা রোগের UG 99 race প্রতিরোধী। জাতটি তাপসহিষ্ণু তাই দেরিতে বপনেও ভাল ফলন দেয়। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪০০০-৫৫০০ কেজি। জাতটি গমের ব্লাস্ট রোগে সংবেদনশীল হওয়ায় দেশের উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে আবাদের জন্য উপযোগী।

বারি গম-২৭

বারি গম-২৭

গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ২৭ একটি স্বল্পমেয়াদী উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। সিমিটে সংকরায়ণকৃত এ কৌলিক সারিটি ট্রায়ালের মাধ্যমে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন নার্সারিতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমাণিত হওয়ায় বি এ ডব্লিউ ১১২০ নামে সারিটি নির্বাচন করা হয়। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায় এ সারিটি ভাল বলে প্রমাণিত হয়। উক্ত সারিটি দেশের সকল অঞ্চলে চাষাবাদের জন্য ২০১২ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বারি গম ২৭ নামে অবমুক্ত করা হয়।

চার-পাঁচটি কুশি বিশিষ্ট। গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার। শীষ বের হতে ৬০-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৭-১১২ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৩৫-৪০ গ্রাম) জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। এছাড়াও জাতটি কাণ্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪২০০-৫৫০০ কেজি। জাতটি কিছুটা তাপসহিষ্ণু এবং দেরিতে বপনেও ভাল ফলন দেয়। দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা ছাড়া দেশের সর্বত্র আবাদের জন্য বিশেষ উপযোগী। চারা অবস্থায় কুশিগুলো খাড়া থাকে। গাছের রং হালকা সবুজ। উপরের কাণ্ডের গিঁড়ায় খুবই কম সংখ্যক রোম (Hair)

বারি গম-২৮

বারি গম-২৮

গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ২৮ একটি স্বল্পমেয়াদী উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। সিমিটে সংকরায়ণকৃত এ কৌলিক সারিটি ট্রায়ালের মাধ্যমে ২০০5 সালে এদেশে পরীক্ষার জন্য নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন নার্সারিতে ও ফলন পরীক্ষায় উচ্চ ফলনশীল প্রমাণিত হওয়ায় বি এ ডাব্লিউ ১১৪১ নামে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ে ফলন পরীক্ষায় ধারাবাহিকভাবে ভালো করায় জাতটি ২০১২ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বারি গম ২৮ হিসেবে অবমুক্ত করা হয়।

জাতটি স্বল্পমেয়াদী এবং তাপসহিষ্ণু। জাতটির কুশির সংখ্যা চার থেকে পাঁচটি এবং গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার। শীষ বের হতে ৫৫-৬০ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০২-১০৮ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারি (হাজার দানার ওজন ৪৩-৪৮ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪০০০-৫৫০০ কেজি। জাতটি শতাব্দী জাতের চেয়ে প্রায ১০ দিন আগে এবং দেরিতে বপনে শতাব্দীর চেয়ে ১৫-২০% ফলন বেশি দেয়। জাতটি স্বল্পমেয়াদী হওয়ায় ধান-গম শস্য পর্যায়ে বপনের জন্য খুবই উপযোগী।

বারি গম-২৯

গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ২৯ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। বাংলাদেশে উদ্ভাবিত সৌরভ জাতের সংগে সিমিটের একটি জাতের সংকরায়ণের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিএডাব্লিউ ১১৫১ নামে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন নার্সারি ও ফলন পরীক্ষায়ও এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে ও মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষায় ভাল ফলন দেয়ায় জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৪ সালে বারি গম ২৯ নামে অবমুক্ত করা হয়। জাতটি আকারে খাট এবং এর কাণ্ড শক্ত হওয়ায় সহজে হেলে পড়ে না। জাতটি মোটামোটি তাপ সহনশীল, দানা সাদা ও আকারে মাঝারি।

জাতটির উচ্চতা ৯২-৯৬ সেন্টিমিটার এবং কুশির সংখ্যা তিন থেকে পাঁচটি। শীষ বের হতে ৬০-৬৪ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১১০ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধী। জাতটি কাণ্ডের মরিচা রোগ (ইউজি ৯৯ রেস) প্রতিরোধী হওয়ায় ভবিষ্যতে এ রোগের প্রাদুর্ভাব হলে তা মোকাবেলায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে। জাতটি শতাব্দীর চেয়ে গড়ে প্রায় ১০-১৫ ভাগ ফলন বেশি দেয়। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪,০০০-৫,০০০ কেজি।

বারি গম-২৯

বারি গম-৩০

গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ৩০ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। জাতটি ২০১৪ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বারি গম ৩০ হিসেবে অবমুক্ত করা হয়। বাংলাদেশে বিএডাব্লিউ ৬৭৭ এবং বিজয় (বারি গম ২৩) জাতের সাথে সংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিএডাব্লিউ ১১৬১ নামে এ জাতটি নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন নার্সারি ও ফলন পরীক্ষায় এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমাণিত হয়। প্রস্তাবিত জাতটি স্বল্প মেয়াদী এবং তাপ সহনশীল। দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য এ জাতটি খুবই উপযোগী।

বারি গম-৩০

চার থেকে ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ বের হতে ৫৭-৬২ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০০-১০৫ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫০টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪৪-৪৮ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু। সম্প্রতি গবেষণায় এ জাতটি গমের ব্লাস্ট রোগ সহনশীল হিসেবে প্রমানিত হয়েছে। তাই গমের ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধে এ জাতটি বিশেষভাবে উপযোগী। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪৫০০-৫৫০০ কেজি।

বারি গম-৩১

গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ৩১ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। KAL/BB, YD এবং PASTOR নামক ৩টি CIMMYT জাতের সংগে সংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিএডাব্লিউ ১১৮২ নামে এ জাতটি নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন নার্সারি ও ফলন পরীক্ষায় এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমাণিত হয়। প্রস্তাবিত জাতটি তাপ সহনশীল, দানা সাদা ও আকারে মাঝারী। আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্যও এ জাতটি উপযোগী।

চার থেকে ছয়টি কুশি বিশিষ্ট গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেন্টিমিটার। পাতা চওড়া ও গাঢ় সবুজ। শীষ বের হতে ৫৯-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৫-১০৯ দিন সময় লাগে। শীষ লম্বা এবং প্রতি শীষে দানার সংখ্যা ৪৫-৫২টি। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকারে মাঝারী (হাজার দানার ওজন ৪৬-৫২ গ্রাম)। জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী এবং তাপ সহিষ্ণু। উপযুক্ত পরিবেশে হেক্টরপ্রতি ফলন ৪৫০০-৫০০০ কেজি। জাতটি আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্য উপযোগী।

বারি গম-৩১

বারি গম-৩২

গম গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি গম ৩২ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। গমের প্রচলিত জাত SHATABDI এবং GOURAB জাতের মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিএডাব্লিউ ১২০২ নামে এ জাতটি নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন নার্সারি ও ফলন পরীক্ষায় এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমাণিত হয়। গত ফেব্রুয়ারি ২০১৭ প্রস্তাবিত জাতটি বারি গম ৩২ হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তক অনুমোদন লাভ করে। আমন ধান কাটার পর দেরিতে বপনের জন্যও এ জাতটি উপযোগী।

বারি গম-৩২

বারি গম-৩৩

বারি গম ৩৩ একটি উচ্চ ফলনশীল গমের জাত। KACHU এবং SOLALA জাতের মধ্যে সিমিটে সংকরায়নকৃত এজাতটি হারভেস্ট প্লাস ট্রায়ালের মাধ্যমে ২০১৩ সালে এদেশে নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিএডব্লিউ ১২৬০ নামে কৌলিক সারিটি প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন নার্সারী ও ফলন পরীক্ষায়ও এ কৌলিক সারিটি ভাল বলে প্রমাণিত হয়। জাতটি ২০১৬ ও ২০১৭ সালের ল্যাবরেটরী ও মাঠ পরীক্ষায় ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এ কৌলিক সারিটি ২০১৭ সালে বারি গম ৩৩ হিসেবে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়।

বারি গম-৩৩

উৎপাদন প্রযুক্তি

বপনের সময়: নভেম্বর মাসের ১৫ থেকে ৩০ পর্যন্ত (অগ্রহায়ণ মাসের ১ম থেকে ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত) গম বপনের উপযুক্ত সময়। তবে তাপসহনশীল জাত ডিসেম্বর মাসে ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত বুনলেও অন্যান্য জাতের তুলনায় বেশি ফলন দেয়।

বীজের পরিমাণ: গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশি হলে হেক্টরপ্রতি ১২০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে।

বীজ শোধন: প্রোভেক্স-২০০ নামক ছত্রাক নাশক (প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম হারে) মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধন করলে বীজ বাহিত রোগ দমন হয় এবং বীজ গজানোর ক্ষমতা বৃদ্ধিসহ চারা সবল ও সতেজ হয়। বীজ শোধন করলে ফলন শতকরা ১০-১২ ভাগ বৃদ্ধি পাবে।

বপন পদ্ধতি: সারিতে অথবা ছিটিয়ে গম বীজ বপন করা যায়। সারিতে বপনের জন্য জমি তৈরির পর ছোট লাঙ্গল বা বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে ২০ সে. মি. বা ৮ ইঞ্চি দূরে দূরে সারিতে এবং ৪-৫ সে. মি. গভীরে বীজ বুনতে হবে। ধান কাটার পর পরেই পাওয়ার টিলার চালিত বীজ বপন যন্ত্রের সাহায্যে স্বল্পতম সময়ে গম বোনা যায়। এ যন্ত্রের সাহায্যে একসঙ্গে জমি চাষ, সারিতে বীজ বপন ও মইয়ের কাজ করা যাবে।

সার প্রয়োগ: জমি চাষের শুরুতে হেক্টরপ্রতি ৭.৫-১০ টন গোবর/কম্পোস্ট জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা উত্তম। জৈব সার প্রয়োগ করার পর সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে হেক্টরপ্রতি ১৫০-১৭৫ কেজি ইউরিয়া, ১৩৫-১৫০ কেজি টিএসপি, ১০০-১১০ কেজি পটাশ ও ১১০-১২৫ কেজি জিপসাম সার শেষ চাষের পূর্বে জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

সেচসহ চাষের ক্ষেত্রে চারার তিন পাতা বয়সে প্রথম সেচের পর দুপুর বেলা মাটি ভেজা থাকা অবস্থায় প্রতি হেক্টরে ৭৫-৯০ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, সেচ ছাড়া চাষের ক্ষেত্রে সমস্ত ইউরিয়া শেষ চাষের সময় অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। তবে সেচ ছাড়া চাষের ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাত হলে বৃষ্টির পর জমি ভেজা থাকা অবস্থায় উপরি প্রয়োগের জন্য নির্ধারিত ইউরিয়া প্রয়োগ করা ভালো। জমিতে প্রায়শ বোরন সারের ঘাটতি দেখা যায় বলে প্রতি হেক্টরে ৬.৫ কেজি হারে বরিক এসিড শেষ চাষের সময় অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে প্রয়োগ করতে হবে। যেসব জমিতে দস্তা সারের ঘাটতি রয়েছে এবং পূর্ববর্তী ফসলে দস্তা প্রয়োগ করা হয়নি সে সব জমিতে শেষ চাষের সময় হেক্টরপ্রতি ১২.৫ কেজি দস্তা সার যথা জিংক সালফেট (মনোহাইড্রেট শতকরা ৩৬ ভাগ জিংক সম্বলিত) শেষ চাষের সময় অন্যান্য রাসায়নিক সারের সাথে প্রয়োগ করা ভালো।

জমিতে অম্লীয় মাত্রা ৫.৫ এর নিচে হলে হেক্টরপ্রতি ১০০০ কেজি হারে ডলোচুন গম বপনের কমপক্ষে দু'সপ্তাহ আগে প্রয়োগ করতে হবে। প্রতি ৩ বছরে একবার ডলোচুন প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ: মাটির প্রকারভেদে গম আবাদে ২-৩টি সেচের প্রয়োজন হয়। প্রথম সেচ চারার তিন পাতার সময় (বপনের ১৭-২১ দিন পর), দ্বিতীয় সেচ শীষ বের হওয়ার সময় (বপনের ৫০-৫৫ দিন পর) এবং তৃতীয় সেচ দানা গঠনের সময় (বপনের ৭৫-৮০ দিন পর) দিতে হবে। তবে মাটির প্রকারভেদে ও শুষ্ক আবহাওয়ায় ভাল ফলনের জন্য অতিরিক্ত এক বা একাধিক সেচ দেয়া ভাল। প্রথম সেচটি খুবই হালকাভাবে দিতে হবে। তা না হলে অতিরিক্ত পানিতে চারার পাতা হলুদ এবং চারা সম্পূর্ণ বা আংশিক নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেচের পর পরই জমি থেকে অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে। তাই বপনের পর জমির ঢাল বুঝে ২০-২৫ ফুট অন্তর নালা কেটে রাখতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা: বীজ বপনের পর ১০-১২ দিন পর্যন্ত পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে বীজ বা চারার সংখ্যা সঠিক থাকে। বপনের ২৫-৩০ দিনের মধ্যে জমিতে 'জো' অবস্থায় আগাছা দমনের জন্য নিড়ানী দিতে হবে। নিড়ানীর ফলে মাটি আলগা হবে এবং আর্দ্রতা বজায় থাকবে। চওড়া পাতা জাতীয় আগাছা (বথুয়া ও কাকরি) দমনের জন্য ২,৪ ডি এমাইন বা এফিনিটি জাতীয় আগাছা দমনকারী ঔষধ প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৩৫ মিলিলিটার হিসেবে ভালভাবে মিশিয়ে স্প্রে মেশিনের সাহায্যে মেঘমুক্ত দিনে একবার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। সময়মত আগাছা দমন করলে ফলন শতকরা ১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়। ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ শুরু হলে ফাঁদ পেতে বা বিষটোপ (জিঙ্ক ফসফাইড বা ল্যানিরেট) দিয়ে দমন করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: গম গাছ সম্পূর্ণরূপে পেকে হলুদ বর্ণ ধারণ করলে কাটার উপযুক্ত সময় হিসেবে গণ্য হবে। গম পাকার পর বেশি দিন ক্ষেতে থাকলে ঝড়/শিলা বৃষ্টিতে যথেষ্ট ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকালের দিকে গম কেটে দুপুরে মাড়াই করা উত্তম। মড়াই যন্ত্রের সাহায্যে সহজে গম মাড়াই করা যায়।

বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ: বীজের বিশুদ্ধতা নিশ্চিতকরণের জন্য শীষ বের হওয়ার পর হতে পাকা পর্যন্ত কয়েকবার অন্য জাতের মিশ্রণ, রোগাক্রান্ত গাছ এবং আগাছা গোড়াসহ উঠিয়ে ফেলতে হবে। বীজ সংগ্রহের জন্য গম পাকার পর হলুদ হওয়া মাত্রই কেটে রৌদ্রে শুকিয়ে আলাদা করে মাড়াই করতে হবে এবং মাড়াইয়ের পর কয়েক দিন বীজ শুকানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বীজের আর্দ্রতা শতকরা ১২ ভাগ বা তার নিচে রাখতে হবে। দানা দাঁতের নিচে চাপ দিলে কট করে শব্দ হলে বুঝতে হবে যে, উক্ত বীজ সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত। সংরক্ষণের পূর্বে পুষ্ট বীজ চালানি দিয়ে চেলে বাছাই করে নিতে হবে।

অন্যান্য পরিচর্যা

গমের পাতার মরিচা রোগ দমন

পাক্সিনিয়া রিকন্ডিটা নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়ে থাকে। প্রথমে পাতার উপর ছোট গোলাকার হলদে দাগ পড়ে। শেষ পর্যায়ে এই দাগ মরিচার মত বাদামি বা কালচে রঙে পরিণত হয়। হাত দিয়ে আক্রান্ত পাতা ঘষা দিলে লালচে মরিচার মত গুঁড়া হাতে লাগে। এ রোগের লক্ষণ প্রথমে নিচের পাতায়, তারপর সব পাতায় ও কাণ্ডে দেখা যায়। দেশের উত্তরাঞ্চলে এ রোগ বেশি হয়ে থাকে।

প্রতিকার

- রোগ প্রতিরোধী গমের জাত বারি গম-২৫, বারি গম-২৬, বারি গম-২৭, বারি গম-২৮, বারি গম-২৯, বারি গম-৩০, বারি গম-৩১, বারি গম-৩২ এবং বারি গম-৩৩ চাষ করতে হবে।

- ❀ সুষম হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।
- ❀ টিল্ট ২৫০ ইসি ছত্রাক নাশক (০.০৫%) ০.৫ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১২-১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

গমের পাতার দাগ রোগ দমন

বাইপোলারিস সরোকিনিয়ানা নামক ছত্রাক এ রোগ ঘটায়। গাছ মাটির উপর আসলে প্রথমে নিচের পাতায় ছোট ছোট বাদামি ডিম্বাকার দাগ পড়ে। পরবর্তীকালে দাগসমূহ আকারে বাড়তে থাকে এবং গমের পাতা ঝলসে যায়। রোগের জীবাণু বীজে কিংবা ফসলের পরিত্যক্ত অংশে বেঁচে থাকে। বাতাসে অধিক আর্দ্রতা এবং উচ্চ তাপমাত্রা (২৫ ডিগ্রি সে.) এ রোগ বিস্তারের জন্য সহায়ক।

প্রতিকার

- ❀ রোগমুক্ত জমি হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- ❀ গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ❀ প্রতি কেজি গম বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম প্রোভেক্স-২০০ মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।
- ❀ টিল্ট-২৫০ ইসি (০.০৪%) ১ মিলি প্রতি ২.০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

গমের গোড়া পচা রোগ দমন

স্কেলেরোশিয়াম রলফসি নামক ছত্রাক দ্বারা গমের এ রোগ হয়। এই রোগের ফলে মাটির সমতলে গাছের গোড়ায় হলদে দাগ দেখা যায়। পরে তা গাঢ় বাদামি বর্ণ ধারণ করে এবং আক্রান্ত স্থানের চারদিকে ঘিরে ফেলে। পরবর্তীকালে পাতা শুকিয়ে গাছ মারা যায়। রোগের জীবাণু মাটিতে কিংবা ফসলের পরিত্যক্ত অংশে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে। সাধারণত বৃষ্টির পানি কিংবা সেচের দ্বারা এক জমি হতে অন্য জমিতে বিস্তার লাভ করে।

প্রতিকার

- ❀ রোগ প্রতিরোধী বারি গম-২৫, বারি গম-২৬, বারি গম-২৭, বারি গম-২৮, বারি গম-২৯, বারি গম-৩০, বারি গম-৩১ এবং বারি গম-৩২ জাতের চাষ করতে হবে।
- ❀ মাটিতে সবসময় পরিমিত আর্দ্রতা থাকা প্রয়োজন।
- ❀ প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউপি নামক ঔষধ প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

গমের আলগা ঝুল রোগ দমন

আসটিলেগো ট্রিটিসি নামক ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগ হয়। গমের শীষ বের হওয়ার সময় এ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। উক্ত ছত্রাকের আক্রমণের ফলে গমের শীষ প্রথম দিকে পাতলা পর্দা দিয়ে আবৃত থাকে। পরে তা ফেটে যায় এবং দেখতে কালো ঝুলের মত দেখায়। ছত্রাকের বীজকণা সহজেই বাতাসের মাধ্যমে অন্যান্য গাছে এবং অন্য জমির গম গাছে সংক্রমিত হয়। রোগের জীবাণু বীজের ভ্রুণে জীবিত থাকে। পরবর্তী বছর আক্রান্ত বীজ জমিতে বুনলে বীজের অঙ্কুরোদগমের সময় জীবাণু সক্রিয় হয়ে উঠে।

প্রতিকার

- ❀ রোগ প্রতিরোধী বারি গম-২৫, বারি গম-২৬, বারি গম-২৭, বারি গম-২৮, বারি গম-২৯, বারি গম-৩০, বারি গম-৩১ এবং বারি গম-৩২ জাতের চাষ করতে হবে।
- ❀ রোগমুক্ত জমি হতে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- ❀ প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউপি ঔষধ প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

গম বীজের কালো দাগ রোগ দমন

ড্রেক্সলেরা প্রজাতি ও *অলটারনারিয়া* প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা গমের এ রোগ হয়। এ রোগের ফলে গমের খোসায় বিভিন্ন আকারের বাদামি অথবা কালো দাগ পড়ে। বীজের ভ্রুণে দাগ পড়ে এবং পরবর্তীকালে দাগ সম্পূর্ণ বীজে ছড়িয়ে পড়ে। এ রোগের জীবাণু বীজের মাধ্যমে সংক্রমিত হয়ে থাকে।

প্রতিকার

- সুস্থ বীজ সংগ্রহ করে বপন করতে হবে।
- প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউপি ঔষধ প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

গমের ইঁদুর দমনে বিষ টোপের ব্যবহার

ইঁদুর গমের একটি প্রধান শত্রু। গম ক্ষেতে বিশেষ করে শীষ আসার পর ইঁদুরের উপদ্রব বেশি দেখা যায়। গম পাকার সময় ইঁদুর সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে। বিএআরআই উদ্ভাবিত ২% জিংক সালফাইড বিষটোপ ইঁদুর দমনে কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিষটোপ প্রস্তুত প্রণালী

এক কেজি বিষটোপ তৈরির জন্য নিম্নরূপ হারে দ্রব্যাদি মিশাতে হবে।

উপাদান	পরিমাণ
গম	৯৬৫ গ্রাম
বার্লি	১০ গ্রাম
জিংক ফসফাইড (সক্রিয় উপাদান ৮০%)	২৫ গ্রাম
পানি	১০০ গ্রাম

একটি এলুমিনিয়ামের পাত্রে বার্লি ও ১০০ গ্রাম পানি মিশিয়ে ২-৩ মিনিট জ্বাল দিতে হবে। বার্লি আঠালো হয়ে গেলে পাত্রটি নামিয়ে ফেলতে হবে। ঠাণ্ডা হওয়ার পর ২৫ গ্রাম জিংক ফসফাইড আঠালো বার্লির সাথে ভালোভাবে মিশাতে হবে। জিংক ফসফাইড মিশানোর পর ৯৬৫ গ্রাম গমের দানা পাত্রে ঢেলে এমনভাবে মিশাতে হবে যেন প্রতিটি গমের দানার গায়ে কালো আবরণ পড়ে। এরপর গম দানা এক ঘন্টা রোদে শুকালে তা বিষটোপে পরিণত হবে। পরে তা ঠাণ্ডা করে পলিথিন ব্যাগ বা বায়ুরোধক পাত্রে রাখতে হবে।

ব্যবহার পদ্ধতি

গমের জমিতে সদ্য মাটি উঠানো গর্ত সনাক্ত করতে হবে। ৩-৫ গ্রাম জিংক ফসফাইড বিষটোপ কাগজে রেখে শক্ত করে পুটলি বাঁধতে হবে। গর্তের মুখের মাটি সরিয়ে এ পুটলি ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিতে হবে অথবা সতেজ গর্তের আশে পাশে কাগজে বা মাটির পাত্রে বিষটোপ রেখে দিতে হবে। বিষটোপ খেলে ইঁদুর সাথে সাথে মারা যাবে।

গমের ব্লাস্ট রোগ ও তার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা

গমের ব্লাস্ট একটি ক্ষতিকর ছত্রাকজনিত রোগ। ছত্রাকটির বৈজ্ঞানিক নাম ম্যাগনাপোরথি অরাইজি (পাইরিকুলারিয়া অরাইজি) প্যাথোটাইপ ট্রিটিকাম। গমের শীষ বের হওয়া থেকে ফুল ফোটার সময়ে উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া থাকলে এ রোগের আক্রমণ ঘটে। রোগটি ১৯৮৫ সালে সর্বপ্রথম ব্রাজিলে দেখা যায় এবং পরবর্তী সময়ে ব্রাজিলসহ দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি দেশে এর বিস্তার হয়। বাংলাদেশে প্রথম ২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে দক্ষিণাঞ্চলের যশোর, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, বরিশাল ও ভোলা জেলায় আনুমানিক ১৫০০০ হেক্টর জমিতে এ রোগের আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় যা মোট গম আবাদী জমির প্রায় ৩%। আক্রান্ত গম ক্ষেতের ফলন শতকরা ২৫-৩০ ভাগ হ্রাস পায়। ক্ষেত্র বিশেষে এ রোগের কারণে ক্ষেতের সম্পূর্ণ ফসল বিনষ্ট হতে পারে।

গমের ব্লাস্ট রোগ চেনার উপায়

- শীষ বের হওয়ার পর গম ক্ষেতের কোন এক স্থানে শীষ সাদা হয়ে যায় এবং অনুকূল আবহাওয়ায় তা অতি দ্রুত সারা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে।
- প্রধাণত গমের শীষে ছত্রাকের আক্রমণ হয়। শীষের আক্রান্ত স্থানে কালো দাগ পড়ে এবং আক্রান্ত স্থানের উপরের অংশ সাদা হয়ে যায়। তবে শীষের গোড়ায় আক্রমণ হলে পুরো শীষ শুকিয়ে সাদা হয়ে যায়।
- আক্রান্ত শীষের দানা অপুস্ট হয় ও কুচকিয়ে যায় এবং দানা ধুসর বর্ণের হয়ে যায়।
- পাতায়ও এ রোগের আক্রমণ হতে পারে এবং এক্ষেত্রে পাতায় চোখের ন্যায় ধুসর বর্ণের ছোট ছোট দাগ পড়ে।

গমের ক্ষেতে ব্লাস্টের প্রাথমিক লক্ষণ (বামে) এবং পুরো ক্ষেত আক্রান্ত লক্ষণ (ডানে)

ব্লাস্টে আক্রান্ত শীষ (বামে) এবং আক্রান্ত স্থানে কালো দাগ (ডানে)

ব্লাস্ট রোগে আক্রান্ত দানা

রোগের বিস্তার যেভাবে ঘটে

- আক্রান্ত বীজের মাধ্যমে গমের ব্লাস্ট রোগ ছড়ায়।
- বৃষ্টির কারণে গমের শীষ ১২-২৪ ঘণ্টা ভেজা ও তাপমাত্রা ১৮০ সে. অথবা এর অধিক হলে এরোগের সংক্রমণ হয় এবং রোগের জীবাণু দ্রুত বাতাসের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।
- ব্লাস্ট রোগের জীবাণু কিছু কিছু ঘাস জাতীয় পোষক আগাছার (যেমন- চাপড়া, শ্যামা, আংগুলি ঘাস) মধ্যে বাস করতে পারে; তবে সেখানে রোগের লক্ষণ সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না।

গমের ব্লাস্ট রোগ নিয়ন্ত্রণের উপায়

- ব্লাস্ট মুক্ত গম ক্ষেত থেকে বীজ সংগ্রহ করতে হবে।
- অপেক্ষাকৃত কম সংবেদনশীল জাত ব্যবহার করতে হবে।
- উপযুক্ত সময়ে (অগ্রহায়ণের ০১ হতে ১৫ তারিখ) বীজ বপন করতে হবে যাতে শীষ বের হওয়ার সময়ে বৃষ্টি ও উচ্চ তাপমাত্রা পরিহার করা যায়।
- বপনের পূর্বে প্রতি কেজি বীজের সাথে ৩ গ্রাম হারে প্রোভেক্স-২০০ ডব্লিউপি অথবা ৩ মিলি হারে ভিটাফ্লো ২০০ এফএফ ছত্রাকনাশক মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। বীজ শোধন করলে গমের অন্যান্য বীজবাহিত রোগও দমন হবে এবং ফলন বৃদ্ধি পাবে।
- গমের ক্ষেত ও আইল আগাছামুক্ত রাখতে হবে।
- প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে শীষ বের হওয়ার সময় একবার এবং ১২-১৫ দিন পর আর একবার নিম্নে উল্লিখিত ছত্রাকনাশক দ্বারা প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে স্প্রে করতে হবে।
- প্রতি শতাংশ জমিতে ৬ (ছয়) গ্রাম নাটিভো ৭৫ ডব্লিউ জি অথবা নভিটা ৭৫ ডব্লিউ জি ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। স্প্রে করলে গমের পাতা ঝলসানো রোগ, বীজের কালো দাগ রোগ এবং মরিচা রোগ ইত্যাদি দমন হবে।

বি.দ্র. ছত্রাকনাশক ব্যবহারের সময় হাতে গ্লোবস এবং মুখে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে যাতে রাসায়নিক দ্রব্যাদি শরীরের সংস্পর্শে না আসে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করতে না পারে।

ট্রিটিক্যালি

ডুরাম গম (*Triticum turgidum* L.) ও ঘাস জাতীয় রাই (Secale cereale L.) এর কৃত্রিম সংকরায়ণ ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক কলাকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সৃষ্ট একটি নতুন ফসলের নাম ট্রিটিক্যালি। একে মনুষ্য সৃষ্ট ফসল (Man-made crop) বলা হয়। ট্রিটিক্যালি দুটি ভিন্ন জেনাস (Genus) এর সংমিশ্রণে সৃষ্ট হওয়ার কারণে অধিক ফলনশীল, খরা সহিষ্ণু ও প্রতিকূল আবহাওয়া সহনশীল। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গম গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক বাছাইকৃত দ্বৈত ট্রিটিক্যালির লাইন ২০০৮ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক 'বারি ট্রিটিক্যালি-১' ও 'বারি ট্রিটিক্যালি-২' নামে অনুমোদিত হয়েছে।

ট্রিটিক্যালির জাত

বারি ট্রিটিক্যালি-১

'বারি ট্রিটিক্যালি-১' একটি উচ্চ ফলনশীল দ্বৈত ট্রিটিক্যালির জাত। এ জাতের গাছের উচ্চতা মাঝারী (১০০-১১০ সেমি) এবং গাছের রং গাঢ় সবুজ। জাতটি খুবই আগাম, ঘাস না কাটলে ফসল বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১০৬-১১২ দিন সময়

লাগে। তবে বোনার ৪০ দিন পর একবার ঘাস কাটলে পাকার জন্য ৯-১২ দিন সময় বেশি লাগে। দানার রং সাদা, চকচকে ও আকার বড়, হাজার দানার ওজন ৪৫-৫০ গ্রাম।

জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে বপন করে বোনার ৪০ দিন পর একবার ঘাস কেটে হেক্টরপ্রতি ১০-১১ টন কাঁচা ঘাস এবং হেক্টরপ্রতি ৪২০০-৪৫০০ কেজি দানা পাওয়া যায়।

বারি ট্রিটিক্যালি-১

বারি ট্রিটিক্যালি-২

'বারি ট্রিটিক্যালি-২' একটি উচ্চ ফলনশীল দ্বৈত ট্রিটিক্যালির জাত। এ জাতের গাছের উচ্চতা মাঝারী (১০০-১১০ সেমি) এবং গাছের রং হালকা সবুজ। জাতটি খুবই আগাম, ঘাস না কাটলে ফসল বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ১১০-১১৬ দিন সময় লাগে। তবে বোনার ৪০ দিন পর একবার ঘাস কাটলে পাকার সময় ১০-১২ দিন বেশি লাগে। দানার রং লাল, চকচকে ও আকার মাঝারী এবং হাজার দানার ওজন ৩৮-৪২ গ্রাম।

জাতটি পাতার দাগ রোগ সহনশীল এবং মরিচা রোগ প্রতিরোধী। উপযুক্ত পরিবেশে বপন করে বোনার ৪০ দিন পর একবার ঘাস কেটে হেক্টরপ্রতি ১০-১২ টন কাঁচা ঘাস এবং হেক্টরপ্রতি ৪৩০০-৪৬০০ কেজি দানা পাওয়া যায়।

বারি ট্রিটিক্যালি-২

উৎপাদন প্রযুক্তি

ট্রিটিক্যালি গমের মতই একটি ফসল। তাই এর চাষাবাদ পদ্ধতি প্রায় গম ফসলের মতই। গমের মত জমি তৈরি করে শেষ চাষের পূর্বে একরপ্রতি ৬০ কেজি ইউরিয়া, ৬০ কেজি টিএসপি, ৩০ কেজি পটাশ ও ৪৫ কেজি জিপসাম সার দিয়ে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম থেকে তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত দ্বৈত ট্রিটিক্যালি বোনা যায়। গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ ও তার বেশি হলে একরপ্রতি ৬০ কেজি বীজ ব্যবহার করতে হবে। গজানোর ক্ষমতা ৮০ ভাগের নিচে হলে প্রতি ১ ভাগ কম গজানোর জন্য একরপ্রতি ১ কেজি করে বেশি বীজ বপন করতে হবে। গজানোর ক্ষমতা শতকরা ৬০ ভাগের কম হলে ঐ বীজ ব্যবহার করা উচিত নয়। গমের মতই সকল আন্তঃপরিচর্যা যেমন- ১ম সেচের পরপরই 'জো' আসলে আগাছা দমন করতে হয়। বোনার ১৭-২১ দিনে হালকাভাবে প্রথম সেচ দিয়ে একরপ্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

ট্রিটিক্যালি ফসল বোনা থেকে ৩৫-৩৬ দিন বয়সে গোড়া থেকে ১ ইঞ্চি রেখে কেটে নিলে একরপ্রতি ১২০-১৫০ মণ কাঁচা ট্রিটিক্যালি ঘাস পাওয়া যায়। কাঁচা ঘাস সরাসরি গবাদি পশুকে খাওয়ানো যাবে কিংবা শুকনো খড়ের সাথে মিশিয়ে খাওয়ানো যাবে। অতিরিক্ত ঘাস রোদে শুকিয়ে 'হে' তৈরি করে কিংবা 'সাইলেজ' তৈরি করে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করে গবাদি পশুকে খাওয়ানো যায়। ট্রিটিক্যালি ঘাস কাটার পর জমিতে হালকা সেচ দিয়ে একরপ্রতি ৩০ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হয়। এরপর শীষ বের হলে আর একটি সেচ দিলেই ট্রিটিক্যালি থেকে একরে ৩০-৪০ মণ গমের মত দানা পাওয়া যায়। ট্রিটিক্যালি ক্ষেতে ইঁদুরের আক্রমণ হলে ফাঁদ পেতে কিংবা বিষটোপ (জিংক ফসফাইড বা ল্যানিরেট) দিয়ে দমন করতে হবে। দানার জন্য ট্রিটিক্যালি কাটার উপযুক্ত হলে, রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সকালে কাটা উত্তম। কাটার পর ভালভাবে রোদে শুকিয়ে দুপুরে মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে ট্রিটিক্যালি মাড়াই করা উত্তম। ট্রিটিক্যালির দানা গমের দানার মতই। তাই এর ব্যবহার ও সংরক্ষণ পদ্ধতি গমের মতই।

ভুট্টা

ভুট্টা একটি অধিকতর ফলনশীল দানা শস্য। ভুট্টা গ্রামিণী গোত্রের ফসল। বৈজ্ঞানিক নাম *Zea mays L.* একই গাছে পুরুষ ফুল ও স্ত্রী ফুল জন্মে। পুরুষ ফুল একটি মঞ্জুরী দণ্ডে বিন্যস্ত হয়ে গাছের মাথায় বের হয়। স্ত্রী ফুল গাছের মাঝামাঝি উচ্চতায় কাণ্ড ও পাতার অক্ষ-কোণ থেকে বের হয়। ভুট্টার ফল মঞ্জুরীকে মোচা বলে। মোচার ভিতরে দানা সৃষ্টি হয়। ভুট্টার দানা ক্যারিওপসিস জাতীয় ফল। এতে ফলত্বক ও বীজত্বক একসাথে মিশে থাকে। তাই ফল ও বীজ আলাদা করে চিনা যায় না। ধান ও গমের তুলনায় ভুট্টার পুষ্টিমান বেশি। এতে প্রায় ১১% আমিষ জাতীয় উপাদান রয়েছে। কিউপিএম (QPM) ভুট্টার আমিষে প্রয়োজনীয় অ্যামিনো এসিড যথা ট্রিপটোফেন ও লাইসিন অধিক পরিমাণে আছে। এছাড়া হলদে রঙের ভুট্টা দানায় প্রতি ১০০ গ্রামে প্রায় ৯০ মিলিগ্রাম ক্যারোটিন থাকে।

ভুট্টার দানা মানুষের খাদ্য হিসেবে এবং ভুট্টার গাছ ও সবুজ পাতা উন্নত মানের গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। হাঁস-মুরগি ও মাছের খাদ্য হিসেবেও এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমানে ৪.৪৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে ৩৮.১৮ লক্ষ টন ভুট্টা উৎপাদিত হচ্ছে।

ভুট্টার জাত সংগ্রহ, সংকরায়ন ও বাছাইকরণের মাধ্যমে বিএআরআই এ পর্যন্ত ৯টি মুক্ত পরাগায়িত জাত এবং ১৬টি হাইব্রিড ভুট্টার জাত উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে বহুমুখী ব্যবহারের উপযোগী ভুট্টা জাতের চাষের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল।

ভুট্টার জাত

খৈ ভুট্টা

খৈ ভুট্টা খৈ এর জন্য ১৯৮৬ সালে জাত হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। গাছ মাঝারী উচ্চতাসম্পন্ন, মোচার উপরের পাতা অপেক্ষাকৃত সরু এবং দানা আকারে ছোট। হাজার দানার ওজন ১৪০-১৫০ গ্রাম। খৈ ভুট্টা রবি মৌসুমে ১২৫-১৩০ দিনে এবং খরিফ মৌসুমে ৮০-৯০ দিনে পাকে। ফলন হেক্টর প্রতি রবি মৌসুমে ৩.৫-৪.০ টন এবং খরিফ মৌসুমে ২.৫-৩.৫ টন হয়।

খৈ ভুট্টা

মোহর

মোহর

ভুট্টার মোহর জাতটি ১৯৯১ সালে উচ্চ ফলনশীল জাত হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। মোহার জাতের গাছ অন্যান্য জাতের গাছের চেয়ে বেশ উঁচু, ফলে খড়ের পরিমাণ বেশি হয়।

এ জাতের মোচা পাকার পরেও পাতা বেশ সবুজ থাকে বলে পাতা উৎকৃষ্ট গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। মোহর জাতে কাণ্ড বেশ শক্ত হওয়ায় বাতাসে সহজে হেলে পড়ে না। মোচা মোটা, লম্বা এবং সম্পূর্ণ মোচা দানায় পূর্ণ থাকে। দানা উজ্জ্বল হলুদ এবং আকারে বড়। হাজার দানার ওজন ২৮০-৩০০ গ্রাম। মোহর জাতটি দানা এবং গো-খাদ্য উভয় উদ্দেশ্যে চাষ করা যেতে পারে। জাতটি রবি মৌসুমে ১৩৫-১৪৫ দিনে এবং খরিফ মৌসুমে ৯৫-১০৫ দিনে পাকে। ফলন হেক্টর প্রতি রবি মৌসুমে ৫.০-৫.৫ টন এবং খরিফ মৌসুমে ৩.৫-৪.৫ টন হয়।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫

একটি উচ্চ গুণগত মানের আমিষ (High Quality Protein Maize, QPM) সমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত। এটি একটি সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড। এ জাতটি ২০০৪ সালে বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫ নামে জাতীয় বীজ বোড কর্তৃক বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য অনুমোদন লাভ করে।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫

সাধারণত গাছের গড় উচ্চতা রবি ও খরিফ মৌসুমে যথাক্রমে ১৯৫-২০০ সেমি এবং ১১০-১১৫ সেমি। গাছের মোচার উচ্চতা ১০০-১১০ সেমি (রবি মৌসুম)। সিল্ক আসার

সময়কাল রবি মৌসুমে ৯০-৯৫ দিন। মোচার গড় ওজন ২৫০ গ্রাম। প্রতি মোচার বীজের গড় ওজন ২৩০ গ্রাম এবং বীজের সংখ্যা ৪২০টি। জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪০-১৪৫ দিন ও খরিফ মৌসুমে ৯৫-১০৫ দিন। জাতটির দানা উজ্জ্বল আকর্ষণীয় কমলা রঙের এবং ফ্লিন্ট প্রকৃতির। জাতটির হাজার দানার ওজন ২৯০-৩১০ গ্রাম। জাতটির ফলন হেক্টরে রবি মৌসুমে ৯.০-১০.০ টন এবং খরিফ মৌসুমে ৭.০-৭.৫ টন। প্রথম পাতার কাণ্ড বেষ্টনিতে (*Leaf sheath*) গাঢ় এন্থোসায়ানিন রং (*Strong anthocyanin colour*) থাকে।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫ এর গুণগত মান

অ্যামাইনো এসিডের নাম	বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫	সাধারণ ভুট্টা
ট্রিপটোফেন	০.১১%	০.০৫%
লাইসিন	০.৪৭৫%	০.২২৫%
মোট আমিষ	১১.০০%	৯.০০%

এই জাতটিতে উচ্চ গুণগত মানের আমিষের পরিমাণ বেশি থাকাতে হাঁস - মুরগির খাবারে আলাদাভাবে ট্রিপটোফেন ও লাইসিন দিতে হয় না।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭

আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) হতে সংগৃহীত ও বাছাইকৃত পিতৃ-মাতৃ লাইন হতে এক মুখী (Single cross) সংকরায়ণ করে এই জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশে এ জাতটি ২০০৬ সালে অবমুক্ত হয়।

জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৩৫-১৪১ দিন এবং খরিফ মৌসুমে ৯৫-১০০ দিন। গাছের উচ্চতা ১৯০-২০০ সেমি। মোচার উচ্চতা ১০০-১০৫ সেমি (রবি মৌসুমে) । মোচার গড় ওজন ২৫০ গ্রাম। প্রতি মোচার বীজের গড় ওজন ২৩০ গ্রাম। প্রতি মোচায় বীজের সংখ্যা ৭০০-৭৮০ টি। জাতটির দানা আকর্ষণীয় হলুদ রঙের এবং ফ্লিন্ট প্রকৃতির। হাজার দানার ওজন ৩৭০-৩৯০ গ্রাম। জাতটির ফলন হেক্টরে রবি মৌসুমে ১০.৫-১১.৫ টন।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭ (ইনসেটে মোচা)

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯

আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) হতে সংগৃহীত ও বাছাইকৃত পিতৃ-মাতৃ লাইন হতে একমুখী (Single cross) সংকরায়ণ করে এই জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশে এ জাতটি ২০০৭ সালে অবমুক্ত হয়।

জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪৫-১৫০ দিন এবং খরিফ মৌসুমে ১০৫-১১০ দিন। গাছের উচ্চতা ২০৫-২৩০ সেমি এবং মোচার উচ্চতা ১০০-১১৫ সেমি (রবি মৌসুমে)। জাতটির দানা আকর্ষণীয় হলুদ রঙের এবং ডেন্ট প্রকৃতির। হাজার দানার ওজন ৩৭০-৩৭৫ গ্রাম। জাতটির ফলন হেক্টরে রবি মৌসুমে ১১.৫-১২.৫ টন।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯ (ইনসেটে মোচা)

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১০

এই নন-কনভেনশনাল সিঙ্গেল ক্রস হাইব্রিড জাতটি আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) হতে সংগৃহীত ও বাছাইকৃত মুক্তপরাগায়িত জাত ও বারির নিজস্ব উদ্ভাবিত ইনব্রিড লাইনের সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশে এ জাতটি ২০০৯ সালে অবমুক্ত হয়।

জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৪৫-১৫০ দিন এবং খরিফ মৌসুমে ১০০-১১০ দিন। গাছের উচ্চতা ১৮৫-২২৫ সেমি এবং মোচার উচ্চতা ৮৫-৯৭ সেমি (রবি মৌসুম)। মোচার প্রতি সারিতে বীজের সংখ্যা ৪২-৪৯টি। প্রতি মোচায় বীজের সংখ্যা ৭০০-৭৮০টি। জাতটির দানা আকর্ষণীয় হলুদ রঙের এবং ফ্লিন্ট প্রকৃতির। জাতটির ফলন হেক্টরে রবি মৌসুমে ১০.০-১১.৫০ টন।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১০ (ইনসেটে মোচা)

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১

আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) হতে সংগৃহীত ও বাছাইকৃত মাতৃ-পিতৃ লাইনের একমুখী-সংকরায়ণের (Single cross) মাধ্যমে এই জাতটি উদ্ভাবিত হয়েছে। বাংলাদেশে এ জাতটি ২০০৯ সালে অবমুক্ত হয়।

জাতটির জীবনকাল রবি মৌসুমে ১৫০-১৫৫ দিন এবং সিল্ক আসার সময় ৯০-৯৫ দিন। উদ্ভাবিত এ জাতটি তুলনামূলকভাবে খাটো। গাছের গড় উচ্চতা ১৭০-২০৫ সেমি এবং মোচার উচ্চতা ৮০-৯৫ সেমি (রবি মৌসুমে)। প্রতি সারিতে বীজের সংখ্যা ৪২-৪৯ টি। দানাগুলো হলুদ রঙের ও ফ্লিন্ট প্রকৃতির । রবি মৌসুমে হেক্টর প্রতি ফলন ১০.৫-১১.৫০ টন।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১ (ইনসেটে মোচা)

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২

বাংলাদেশে খরা সহিষ্ণু এবং কম সেচে উৎপাদনক্ষম ভুট্টার কোনো জাত ছিল না। তাই খরা সহনশীল ভুট্টার জাত উদ্ভাবনের গুরুত্ব অনুধাবন করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ স্বল্প সেচে উৎপাদনক্ষম এবং মধ্যমাত্রার খরা সহিষ্ণু উচ্চ ফলনশীল সাদা দানা বিশিষ্ট বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২ উদ্ভাবন করে। বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২ সিঙ্গেল ক্রস পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত একটি জাত। আন্তর্জাতিক গম ও ভুট্টা উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT), মেক্সিকো থেকে ২০০৭ সালে বেশ কিছু সাদা দানা বিশিষ্ট ইনব্রিড লাইন (কৌলিতাত্ত্বিকভাবে বিশুদ্ধ) সংগ্রহ করে নির্বাচিত কয়েকটি লাইনের মধ্যে সংকরায়ণ করা হয়। পরবর্তীতে আইএপিপি (IAPP) প্রকল্পের মাধ্যমে কয়েক বছরের মাঠ মূল্যায়ন ও ল্যাবরেটরীতে জৈব রসায়ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর P1×P4 ক্রসটি স্বল্প সেচে উৎপাদনক্ষম ও মধ্যমাত্রার খরাসহিষ্ণু হিসেবে প্রতীয়মান হয়। খরা অবস্থায় একটি মাত্র সেচ প্রয়োগে (ফল আসার আগে) জাতটির ফলন ৮.১-৮.৫ টন/হেক্টর এবং স্বাভাবিক সেচ প্রয়োগে ফলন ১০.০-১১.১ টন/হেক্টর। রবি মৌসুমে জাতটির জীবনকাল ১৪০-১৪৫ দিন। জাতটির দানার রং সাদা এবং ফ্লিন্ট এর প্রকৃতির। হাইব্রিডটি বেশ কয়েক বছর ধরে রাজশাহীর খরাপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলসহ (High Barind Tract) দেশের বেশ কয়েক জায়গায় স্বাভাবিক সেচ প্রয়োগে এবং শুধুমাত্র একটি সেচে খরা সহিষ্ণু হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় জাত হিসেবে মুক্তায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয় এবং পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোর্ড ২০১৬ সালে এই ক্রসটি বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২ নামে অবমুক্ত করে।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩

ভুট্টা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দানা ফসল যা বিশ্বব্যাপী মানুষ ও প্রাণিসম্পদের পুষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ভুট্টা এখন দেশে ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠা হাঁস-মুরগির খামারে ও পশু খাদ্যে ব্যবহার হচ্ছে। এসবক্ষেত্রে হলুদ দানা বিশিষ্ট ভুট্টা ব্যবহার হচ্ছে। তবে সাদা ভুট্টা গমের আটার সাথে মিশিয়ে রুটি তৈরি করে খাদ্য হিসেবে ব্যবহারের উপযোগী। দেশে বেশিরভাগ ভুট্টাই রবি মৌসুমে সেচের মাধ্যমে আবাদ করা হয়ে থাকে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য প্রাকৃতিকভাবেই দেশে পানির প্রাপ্যতা কমে যাচ্ছে। তাই ভুট্টা দেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে বরেন্দ্র অঞ্চল ও অন্যান্য

খরাপ্রবণ এলাকায় ব্যাপকভাবে চাষের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত সেচ সুবিধার অভাবে এর উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ খরা সহিষ্ণু বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩ জাতটি উদ্ভাবন করে, যা কেবলমাত্র একটি সেচেই (ফুল আসার আগে) অধিক ফলন দিতে সক্ষম। খরা অবস্থায় একটি মাত্র সেচ প্রয়োগে জাতটির ফলন ৮.২-৮.৯ টন/হেক্টর। জাতটির জীবনকাল ১৪৫-১৫২ দিন। মোচা পরিপক্ক হওয়ার পরও জাতটির গাছ ও পাতা সবুজ থাকে যা গো-খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের উপযোগী। জাতটির দানার রং সাদা এবং ফ্লিন্ট প্রকৃতির। উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় বরেন্দ্র অঞ্চলে এর চাষাবাদ সম্প্রসারিত হলে সেখানের মাটির নিচে পানির উপর চাপ কমবে এবং খরা সহনশীল হওয়ায় আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪

ইউএসএইড (USAID) এর আর্থিক সহায়তায় এবং CIMMYT-India কর্তৃক পরিচালিত Heat Tolerant Maize for Asia (HTMA) প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত তাপ সহিষ্ণু হাইব্রিড সমূহ হতে খরিফ-১ মৌসুমে বহুস্থানিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই জাতটি বাছাই করা হয় এবং পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোড কর্তৃক ২০১৭ সালে বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪ নামে অবমুক্ত হয়। জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিবর্তিত জলবায়ুগত পরিস্থিতি মোকাবেলা করে ভুট্টার ফলন ঠিক রাখতে অধিক তাপ সহনশীল জাতের বিকল্প নেই। নতুন এই জাতটি খরিফ মৌসুমে ফুল আসার পর্যায়ে অধিক তাপ সহিষ্ণু (দিনের তাপমাত্রা>৩৫° সে. এবং রাতের তাপমাত্রা >২৩° সে.) এবং মধ্যম ফলন ক্ষমতা সম্পন্ন। দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ো আবহাওয়াতে এ জাতের গাছ সহজে হেলে ও ভেঙ্গে পড়ে না। জাতটি সাদা বর্ণের এবং সেমি ডেন্ট প্রকৃতির। রবি ও খরিফ মৌসুমে জাতটির গড় উচ্চতা যথাক্রমে ১৮৪ সেমি ও ১৬০ সেমি যা বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে চাষকৃত অন্যান্য প্রায় সব জাতের চেয়ে খাটো। জাতটিতে মোচা শক্তভাবে খোসা দ্বারা আবৃত থাকে বিধায় খরিফ মৌসুমে বৃষ্টির পানিতে নষ্ট হবার সম্ভাবনা কম। জাতটি পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল। রবি ও খরিফ মৌসুমে পরিপক্ক হতে এ জাতের যথাক্রমে প্রায় ১৪০ দিন ও ১১৫ দিন সময় লাগে। জাতটির গড় ফলন রবি ও খরিফ মৌসুমে যথাক্রমে ১০.৮৪ টন/হেক্টর এবং ১০.৫২ টন/হেক্টর।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫

ইউএসএইড (USAID) এর আর্থিক সহায়তায় এবং CIMMYT-India কর্তৃক পরিচালিত Heat Tolerant Maize for Asia (HTMA) প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত তাপ সহিষ্ণু হাইব্রিড সমূহ হতে খরিফ-১ মৌসুমে বহুস্থানিক পরীক্ষার মাধ্যমে এই জাতটি বাছাই করা হয় এবং পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোড কর্তৃক ২০১৭ সালে বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫ নামে অবমুক্ত হয়। জলবায়ুগত পরিবর্তনের কারণে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিবর্তিত জলবায়ুগত পরিস্থিতি মোকাবেলা করে ভুট্টার ফলন ঠিক রাখতে অধিক তাপ সহনশীল জাতের বিকল্প নেই। নতুন এই জাতটি খরিফ মৌসুমে ফুল আসার পর্যায়ে অধিক তাপ সহিষ্ণু (দিনের তাপমাত্রা> ৩৫° সে. এবং রাতের তাপমাত্রা > ২৩° সে.) এবং উচ্চ ফলন ক্ষমতা সম্পন্ন। পরিপক্ক অবস্থায় গাছটির বেশির ভাগ পাতা সবুজ থাকে (Stay green) বিধায় গো-খাদ্য হিসেবে ব্যবহার উপযোগী। জাতটির দানা হলুদ বর্ণের এবং সেমি ডেন্ট প্রকৃতির। রবি ও খরিফ মৌসুমে জাতটির গড় উচ্চতা যথাক্রমে ২১৪ সেমি এবং ১৬৫ সেমি। জাতটিতে মোচা শক্তভাবে খোসা দ্বারা আবৃত থাকে বিধায় খরিফ মৌসুমে বৃষ্টির পানিতে দানা নষ্ট হবার

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫

সম্ভাবনা কম। জাতটি পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল। রবি ও খরিফ মৌসুমে পরিপক্ক হতে এ জাতটির যথাক্রমে প্রায় ১৪৮ দিন ও ১২১ দিন সময় লাগে। জাতটির গড় ফলন রবি ও খরিফ মৌসুমে যথাক্রমে ১২.৭৫ টন/হেক্টর এবং ১২.০৭ টন/হেক্টর।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬

বারি হাইব্রিড ভুট্টা ১৬ সিঙ্গেল ক্রস পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত একটি জাত। প্রথমে বাণিজ্যিক ভুট্টার জাত QY-11 এবং 900M থেকে স্ব-পরাগায়ন (সেলফিং) এর মাধ্যমে ইনব্রিড লাইন তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন লাইনগুলো সনাক্ত করে তাদের মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে তৈরিকৃত হাইব্রিডগুলো বেশ কয়েক বছর ধরে বহুস্থানিক মাঠ মূল্যায়ন করা হয়। সেখান থেকে মাঝারি উচ্চতা বিশিষ্ট উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিডটি বাংলাদেশের আবহাওয়া উপযোগী হিসেবে প্রতীয়মান হওয়ায় এবং পরবর্তীতে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধনের পর ২০১৮ সালে 'বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬' নামে অবমুক্ত করা হয়।

বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬

রবি মৌসুমে পরিপক্ক হতে ১৪০-১৪৫ দিন সময় লাগে। জাতটি সহজে হেলে ও ভেঙ্গে পড়েনা। গাছ মাঝারী উচ্চতা সম্পন্ন (১৮৬ সেমি) এবং মোচার উচ্চতা ৮৪ সেমি। রবি মৌসুমে জাতটির গড় ফলন ১১.৫৭ টন/হেক্টর। মোচা পরিপক্ক অবস্থায়ও গাছ ও পাতা সবুজ থাকে (Stay green)। মোচা অগ্রভাগ পর্যন্ত শক্তভাবে খোসা দ্বারা আবৃত থাকে এবং সকল মোচা গাছের একই উচ্চতায় থাকে। মোচার মাথায় সিল্কে মধ্যম মাত্রার এন্থোসায়ানিন বিদ্যমান। দানা হলুদ, সেমি-ডেন্ট প্রকৃতির এবং সম্পূর্ণ মোচা দানা দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে। জাতটি ৮-৯ ডিএস/মি. লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে এবং এই পরিবেশে গড় ফলন ৭.০৬ টন/হেক্টর। জাতটিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিটা-ক্যারোটিন বিদ্যমান (33.13 mg/kg)। দানা পুষ্ট ও বড়। হাজার দানার গড় ওজন ৪২২ গ্রাম এবং প্রতি মোচায় গড়ে ৬৩২ টি দানা থাকে। জাতটি পাতা ঝলসানো রোগ সহনশীল।

বারি মিষ্টি ভুট্টা-১

মিষ্টি ভুট্টা একটি বিশেষ ধরনের ভুট্টা যা সবজি হিসেবেও খাওয়া যায়। আবার মাছ, মাংস প্রভৃতি স্যুপের সাথে মিশিয়ে অথবা স্ন্যাক্সের উপাদান হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। থাইল্যান্ড থেকে সংগৃহীত জার্মপ্লাজম হতে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এ সিনথেটিক জাতটি নির্বাচন করা হয় এবং বারি মিষ্টি ভুট্টা-১ নামে ২০০২ সালে অনুমোদিত হয়।

মিষ্টি ভুট্টা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া হয়। তাই দানা যখন অল্প নরম থাকে (Milk and dough stage) তখনই মোচা সংগ্রহ করতে হয়। সিল্ক বের হবার ২০-২৫ দিনের মধ্যে অর্থাৎ বপনের মাত্র ১১৫-১২০ দিনে খাওয়ার উপযোগী মোচা গাছ থেকে সংগ্রহ করা যায়। মিষ্টি ভুট্টার দানাতে সবচেয়ে বেশি মিষ্টতা থাকে যখন খোসা ছাড়িয়ে সরাসরি কাঁচা অবস্থায় অথবা প্রক্রিয়াজাত বা হিমায়িত অবস্থায় খাওয়া হয়। তবে মাঠ থেকে সংগ্রহের পর পরই যদি দানা না খাওয়া যায় অথবা প্রক্রিয়াজাত বা হিমায়িত না করা হয় তবে মিষ্টি ভুট্টার স্বাদ ও গুণাগুণ কমে যায়।

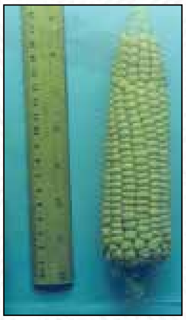

বারি মিষ্টি ভুট্টা-১

কচি দানায় চিনির ভাগ গড়ে ১৮% । হলুদ দানা প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন "এ" (ক্যারোটিন) সমৃদ্ধ। জাতটি হেলে পড়া প্রতিরোধী এবং মোচার অগ্রভাগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ খোসা দ্বারা আবৃত থাকে। জাতটির ফলন প্রতি হেক্টরে রবি মৌসুমে ১০.০ থেকে ১০.৫ টন (খোসা ছাড়ানো কচি মোচা) এবং প্রায় ২৫ টন/হেক্টর সবুজ গো খাদ্য পাওয়া যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি চাষের জন্য উপযোগী। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন জমিতে পানি জমে না থাকে।

বপনের সময়: বাংলাদেশে রবি মৌসুমে মধ্য-আশ্বিন থেকে মধ্য-অগ্রহায়ণ (অক্টোবর-নভেম্বর) এবং খরিফ মৌসুমে ফাল্গুন থেকে মধ্য-চৈত্র (মধ্য-ফেব্রুয়ারি থেকে মার্চ) পর্যন্ত সময় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

বীজের হার ও বপন পদ্ধতি: শুভ্রা, বর্ণালী ও মোহর জাতের ভুট্টার জন্য হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ কেজি হাইব্রিড ভুট্টার বীজ হেক্টর প্রতি ২০-২২ কেজি এবং খৈ ভুট্টা জাতের জন্য ১৫-২০ কেজি হারে বীজ বুনতে হয়। বীজ সারিতে বুনতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ৬০ সেমি। সারিতে ২৫ সেমি দূরত্বে ১টি অথবা ৫০ সেমি দূরত্বে ২টি গাছ রাখতে হবে।

সারের পরিমাণ: ভুট্টা চাষে বিভিন্ন প্রকার সারের পরিমাণ নিচে দেওয়া হল।

সারের নাম	পরিমাণ/হেক্টর			
	কম্পোজিট		বারি হাইব্রিড ভুট্টা	খৈ ভুট্টা
	রবি	খরিফ	রবি	রবি
ইউরিয়া	৩২৫-৪০০ কেজি	৩৭৫-৪৫০ কেজি	৫৫০-৬০০কেজি	২৬০-৩২০০ কেজি
টিএসপি	২০০-২০০ কেজি	১৮০-২৬০ কেজি	২৫০-২৫০ কেজি	১৫০-২০০ কেজি
এমওপি	১৬০-২০০ কেজি	১৫০-২০০০ কেজি	২০০-২৫০ কেজি	১৫০-২০০ কেজি
জিপসাম	১৭০-১৯০ কেজি	১৩০-১৬০ কেজি	১৭৫-২২০ কেজি	১৪০-১৮০ কেজি
জিংক সালফেট	০৮-১০ কেজি	৬-৯ কেজি	৮-১২ কেজি	৮-১০ কেজি
বরিক এসিড(প্রয়োজন বোধে)	৬-৯ কেজি	৫-৮ কেজি	৬-১০ কেজি	৬-৮ কেজি
গোবর	৮০-১০০ টন	৮০-১০০ টন	১০০-১২০ টন	-

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে অনুমোদিত ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে জমি চাষ ও মই দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর (৮-১০ পাতা পর্যায়) এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ গজানোর ৬০-৬৫ দিন পর (পুরুষ ফুল আসা পর্যায়) উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে জমি থেকে অতিরিক্ত চারা তুলে ফেলতে হবে। চারার বয়স এক মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

সেচ প্রয়োগ পদ্ধতি: উচ্চ ফলনশীল জাতের ভুট্টার আশানুরূপ ফলন পেতে হলে রবি মৌসুমে সেচ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক। উদ্ভাবিত জাতে নিম্নরূপ ৩-৪টি সেচ দেওয়া যায়।

প্রথম সেচ: বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (৩-৫ পাতা পর্যায়)

দ্বিতীয় সেচ: বীজ বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে (৮-১০ পাতা পর্যায়)

তৃতীয় সেচ: বীজ বপনের ৬৫-৭০ দিনের মধ্যে (পুরুষ ফুল আসা পর্যায়)

চতুর্থ সেচ: বীজ বপনের ৯০-৯৫ দিনের মধ্যে (দানা বাঁধার পূব পর্যায়)

তবে বীজ বপনের সময় মাটিতে যথেষ্ট রস না থাকলে বপনের পরপরই একটি হালকা সেচ দিতে হবে, সেক্ষেত্রে প্রথম সেচ ৩০ দিনের মধ্যে দিলেও চলবে। ভুট্টার ফুল ও দানা বাঁধার সময় কোন ক্রমেই জমিতে যাতে পানির স্বল্পতা এবং জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ভুট্টার মোচা সংগ্রহ: হাইব্রিড ভুট্টার মাঠ হতে সংগৃহীত দানা বীজ হিসেবে পরবর্তী বছরের জন্য কোন অবস্থাতেই সংরক্ষণ করা যাবে না। তবে মুক্ত পরাগায়িত জাতের ভুট্টার বীজ সঠিক নিয়ম মেনে লাগানো হলে বীজ হিসেবে পরবর্তী বছরে ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করা যাবে। মোচা সংগ্রহের সময় বীজে বা দানায় সাধারণত ২৫-৩৫% আর্দ্রতা থাকে। তাই সংরক্ষণের আগে দানা এমনভাবে শুকাতে হবে যেন আর্দ্রতা ১২% এর বেশি না থাকে। দানার জন্য ভুট্টা সংগ্রহের ক্ষেত্রে মোচা চকচকে খড়ের রং ধারণ করলে এবং পাতা কিছুটা হলদে হলে সংগ্রহের ক্ষেত্রে উপযুক্ত হয়। মোচার দানার গোড়ায় কালো দাগ দেখা গেলে ও মোচার উপরের আবরণ সম্পূর্ণ খড়ের রং ধারণ করলে এবং গাছের পাতা কিছুটা হলদে হয়ে এলে ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করতে হবে। শুষ্ক আবহাওয়া ও রোদের দিন ভুট্টা সংগ্রহ করা উচিত। যদি বৃষ্টি ও খারাপ আবহাওয়ার জন্য মোচা সংগ্রহ সম্ভব না হয় তাহলে পাকা মোচার কিছুটা নিচের দিকে গাছ আলতো করে ভেঙ্গে গাছের মাথাসহ মোচা মাটির দিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এতে বৃষ্টির পানি মোচার ভিতর ঢুকতে পারবে না। পরে রোদ হলে মোচা সংগ্রহ করতে হবে।

মোচা সংগ্রহের পরবর্তী কাজ: ক্ষেত হতে মোচা বাড়িতে এনে ছায়ায় ঠাণ্ডা ও শুকনা স্থানে চাটাইয়ের উপর বিছিয়ে রাখতে হবে এবং খুব দ্রুত মোচার খোসা ছড়িয়ে নিয়ে ৩-৪ দিন চাটাইয়ের উপর মোচা বিছিয়ে ভালভাবে রোদে শুকাতে হবে।

দানা ছাড়ানো: আমাদের দেশে চাষীর হাতেই মোচার দানা ছাড়িয়ে থাকে। এতে সময় ও পরিশ্রম বেশি লাগে। তবে দানা ছাড়ানোর জন্য সস্তা হাত মাড়াই যন্ত্র পাওয়া যায়। এই মাড়াই যন্ত্র দিয়ে সহজে বেশি দানা ছাড়ানো যায়। শক্তি চালিত মাড়াই যন্ত্রের সাহায্যে অনেক সহজে ও কম সময়ে বেশি ভুট্টা মাড়াই করা সম্ভব।

ভুট্টা দানা সংরক্ষণ, গোলাজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ: ভুট্টা দানা গোলাজাতের পূর্বে ৪-৫ দিন রোদে ভালভাবে শুকাতে হবে। দাঁত দিয়ে চাপ দিলে যদি ভুট্টা দানা "কট" শব্দ করে ভেঙ্গে যায়, তাহলে বুঝতে হবে দানা গোলাজাতের উপযোগী হয়েছে। ঘরের মেঝেতে চাটাইয়ের উপর ভুট্টা দানা ১০-১২ ঘণ্টা ঠাণ্ডা করে নিয়ে গোলাজাত করতে হবে। পরিষ্কার ও ছিদ্রমুক্ত ড্রামে অথবা মোটা পলিথিন দেয়া চটের বস্তায় দানা এমনভাবে ভরতে হবে যেন ভেতরে খালি জায়গা না থাকে। বস্তা ও ড্রামের মুখ বন্ধ করে ঘরের মেঝেতে বাঁশ বা কাঠের পাটাতনের উপর রাখতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে। যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা না হলে গোলাজাত ভুট্টা দানার বিভিন্ন পোকা যেমন-ভুট্টার শুঁড় পোকা, সুরুই পোকা, চালের শুড় পোকা ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে প্রচুর ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

অন্যান্য পরিচর্যা

ভুট্টার বীজ পচা এবং চারা গাছের রোগ

বীজ পচা এবং চারা নষ্ট হওয়ার কারণে সাধারণত ক্ষেতে ভুট্টা গাছের সংখ্যা কমে যায়। নানা প্রকার বীজ ও মাটিবাহিত ছত্রাক যেমন; পিথিয়াম, রাইজকটনিয়া, ফিউজেরিয়াম, পেনিসিলিয়াম ইত্যাদি বীজ পঁচা, চারা ঝলসানো, গোড়া ও শিকড় পচা রোগ ঘটিয়ে থাকে। জমিতে রসের পরিমাণ বেশি হলে এবং মাটির তাপমাত্রা কম থাকলে বপনকৃত বীজের চারা বড় হতে অনেক সময় লাগে। ফলে এ সময়ে ছত্রাক আক্রমণের মাত্রা বেড়ে যায়।

প্রতিকার

- সুস্থ, সবল ও ক্ষতমুক্ত বীজ এবং ভুট্টার বীজ পচা রোগ প্রতিরোধী জাত ব্যবহার করতে হবে।
- উত্তমরূপে জমি তৈরি করে পরিমিত রস ও তাপমাত্রায় (১৩° সে. এর বেশি) বপন করতে হবে।
- থিরাম বা প্রোভেক্স ২০০ (০.২৫%) প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করলে ভুট্টার বীজ পচারোগের আক্রমণ অনেক কমে যায়।

ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ

হেলমিনথোসপরিয়াম টারসিকাম ও হেলমিনথোসপরিয়াম মেইডিস নামক ছত্রাকদ্বয় এ রোগ সৃষ্টি করে। প্রথম ছত্রাকটি দ্বারা আমাদের দেশে ভুট্টার পাতা ঝলসানো রোগ বেশি হতে দেখা যায়।

হেলমিনথোসপরিয়াম টারসিকাম দ্বারা আক্রান্ত গাছের নিচের দিকের পাতায় লম্বাটে ধূসর বর্ণের দাগ দেখা যায়। পরবর্তীকালে গাছের উপরের অংশে তা বিস্তার লাভ করে। রোগের প্রকোপ বেশি হলে পাতা আগাম শুকিয়ে যায় এবং গাছ মরে যায়। এ রোগের জীবাণু গাছের আক্রান্ত অংশে অনেক দিন বেঁচে থাকে। জীবাণুর জীবকণা বা কনিডিয়া বাতাসের সাহায্যে অনেক দূর পর্যন্ত সুস্থ গাছে ছড়াতে পারে। বাতাসের আর্দ্রতা বেশি হলে এবং ১৮-১৭০ সে. তাপমাত্রায় এ রোগের আক্রমণ বেড়ে যায়।

প্রতিকার

- রোগ প্রতিরোধী জাতের ভুট্টা চাষ করতে হবে।
- আক্রান্ত ফসলে টিল্ট ২৫০ ইসি (০.০৫%) ১৫ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- ভুট্টা উঠানোর পর জমি থেকে আক্রান্ত গাছ সরিয়ে অথবা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

ভুট্টার মোচা ও দানা পচা রোগ

মোচা ও দানা পচা রোগ ভুট্টার ফলন, বীজের গুণাগুণ ও খাদ্যমান কমিয়ে দেয় । বিভিন্ন প্রকার ছত্রাক যথা ডিপোডিয়া মেডিস, ফিউজেরিয়ম মনিলিফরমি প্রভৃতি এ রোগ ঘটায়।

আক্রান্ত মোচার খোসা ও দানা বিবর্ণ হয়ে যায়। দানা পুষ্ট হয় না, কুঁচকে অথবা ফেটে যায়। অনেক সময় মোচাতে বিভিন্ন দানার মাঝে বা উপরে ছত্রাকের উপস্থিতি খালি চোখেই দেখা যায়। ভুট্টা গাছে মোচা আসা থেকে পাকা পর্যন্ত বৃষ্টিপাত বেশি থাকলে এ রোগের আক্রমণ বাড়ে। পোকা বা পাখির আক্রমণে কাণ্ড পঁচা রোগে গাছ মাটিতে পড়ে গেলে এ রোগ ব্যাপকতা লাভ করে। এ রোগের জীবাণু বীজ অথবা আক্রান্ত গাছের পরিত্যক্ত অংশে বেঁচে থাকে। একই জমিতে বার বার ভুট্টার চাষ করলে এ রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

প্রতিকার

- এ রোগের প্রাদুর্ভাব এড়াতে একই জমিতে বার বার ভুট্টা চাষ করা ঠিক নয়।
- জমিতে পোকা ও পাখির আক্রমণ রোধ করতে হবে।
- ভুট্টা পেকে গেলে তাড়াতাড়ি কেটে সংগ্রহ করে ফেলতে হবে।

ভুট্টার কাণ্ড পচা রোগ

বিভিন্ন প্রজাতির ছত্রাক যথা ডিপোডিয়া মেডিস, ফিউজেরিয়াম মনিলিফরমি এর কারণে এ রোগ ঘটে থাকে। প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে গাছের কাণ্ড পচে যায় এবং গাছ মাটিতে ভেঙ্গে পড়ে। আমাদের দেশে খরিফ মৌসুমে এ রোগটি বেশি হয়ে থাকে। জমিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশি এবং পটাশের পরিমাণ কম হলে ছত্রাকজনিত কাণ্ড পচা রোগ বেশি হয়।

প্রতিকার

- ছত্রাকনাশক প্রোভেক্স ২০০ দিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।
- সুষম হারে সার ব্যবহার করতে হবে, বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও পটাশ পরিমিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।
- ভুট্টা সংগ্রহের পর পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- শিকড় ও কাণ্ড আক্রমণকারী পোকা-মাকড় দমন করতে হবে।
- আক্রান্ত জমিতে অনুমোদিত ছত্রাক নাশক ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

ভুট্টার পোকা-মাকড়

মাঠ পর্যায়ে বেশ কিছু কীট-পতঙ্গ ভুট্টা ফসলকে আক্রমণ করে। এর মধ্যে কাটুই পোকা, গোলাপী মাজরা পোকা, মাজরা পোকা, পাতা খেকো লেদা পোকা, জাব পোকা ও মোচার পোকা অন্যতম। এছাড়া গোলাজাত ভুট্টার দানায় কিছু পোকা আক্রমণ করে থাকে। এগুলোর মধ্যে চালের শুঁড় পোকা, ভুট্টার শুঁড় পোকা ও সুরুই পোকা অন্যতম।

মাঠে ভুট্টার অনিষ্টকারী পোকাসমূহ

কাটুই পোকা

ভুট্টার অন্যতম ক্ষতিকর পোকা হলো কাটুই পোকা। দিনের বেলা কাটুই পোকার কীড়া মাটির নিচে লুকিয়ে থাকে এবং রাতের বেলা বের হয়ে ভুট্টার চারাগাছ কেটে ফেলে। সকাল বেলা ক্ষেতে কাটুই পোকা দ্বারা কাটা ভুট্টার চারাগাছ দেখা যায় এবং কাটা গাছের কাছে মাটি খুঁড়লে কাটুই পোকার কীড়া পাওয়া যায়। এ পোকার আক্রমণে জমিতে গাছের সংখ্যা কমে যায় বলে ফলনও স্বাভাবিকভাবে কম হয়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- কাটুই পোকা দমনের জন্য ভোর বেলা কাটা চারা গাছের গোড়া খুড়ে কীড়াগুলো মেরে ফেলতে হবে।
- তাছাড়া হালকা সেচ দিলে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা কীড়া মাটির উপরে আসবে, ফলে সহজে পাখি এদের ধরে খাবে বা হাত দ্বারা মেরে ফেলা যাবে।
- আক্রমণ বেশি হলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি কীটনাশক (ক্যারেট ২.৫ ইসি বা ফাইটার ২.৫ ইসি) মিশিয়ে গাছের গোড়ার চারদিকে বিকেল বেলায় ভালভাবে স্প্রে করে দিতে হবে।

গোলাপী মাজরা পোকা

চারা অবস্থায় ভুট্টা গাছের কাণ্ড যখন কচি থাকে তখন এ পোকার আক্রমণ দেখা যায়। রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই এ পোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। ডিম ফুটে কীড়া বের হয়ে গাছের কচি কাণ্ড ছিদ্র করে ঢুকে ভেতরের অংশ কুড়ে কুড়ে খায়। ফলে গাছের মধ্য ডগা বা মাইজ ডগা মরে যায় এবং ডগা উপরের দিকে টানলে উঠে আসে। আক্রান্ত গাছটি লম্বালম্বি চিরে পরীক্ষা করলে তাতে পোকার কীড়া দেখা যায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- আলোক ফাঁদ পেতে মথ ধ্বংস করতে হবে।
- চারা অবস্থায় ফেরোমন ফাঁদ ১০ বর্গমিটার দূরত্বে স্থাপন করে এ পোকা দমন করা যায়।
- আক্রান্ত মাঠে বায়োকীটনাশক যেমন স্পিসোসেড (ট্রেসার অথবা সাকসেস) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি মার্শাল ২০ ইসি অথবা ডায়াজিনন ৬০ ইসি ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে করলে এই পোকা দমন করা যায়।
- ফুরাডান ৫ জি প্রতি হেক্টরে ২০ কেজি হারে অথবা ৩/৪ টি দানা প্রতি গাছের উপরিভাগে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন দানাগুলো কাণ্ড এবং পাতার মাঝে থাকে।

মাজরা পোকা

রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমে ভুট্টা গাছের শক্ত কাণ্ডে মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা যায়। ডিম ফুটে কীড়া বের হয়ে গাছের কাণ্ড ছিদ্র করে ভিতরে ঢুকে টিস্যুসমূহ খেতে থাকে। আক্রান্ত গাছে পোকার কীড়া দ্বারা সৃষ্ট ছিদ্র এবং ছিদ্রপথে বের হয়ে আসা মল দেখা যায়। কাণ্ডের উপরের দিক আক্রান্ত হলে টাসেল, মোচা কিংবা গাছের মাইজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এরূপ আক্রান্ত গাছে মাইজ মরা লক্ষণ দেখা যায়। ফলে গাছে মোচা হয় না এবং ফলন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়।

দমন ব্যবস্থাপনা

- ডিমের গাদা সংগ্রহ করে পুড়িয়ে, পা দিয়ে পিষে বা মাটির নিচে পুঁতে রেখে ধ্বংস করতে হবে।
- চারা অবস্থায় ফেরোমন ফাঁদ ১০ বর্গমিটার দূরত্বে স্থাপন করে এ পোকা দমন করা যায়।
- আক্রান্ত মাঠে বায়োকীটনাশক যেমন স্পিসোসেড (ট্রেসার অথবা সাকসেস) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি মার্শাল ২০ ইসি অথবা ডায়াজিনন ৬০ ইসি ভালোভাবে মিশিয়ে স্প্রে করলে এই পোকা দমন করা যায়।
- ফুরাডান ৫ জি প্রতি হেক্টরে ২০ কেজি হারে অথবা ৩/৪ টি দানা প্রতি গাছের উপরিভাগে এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন দানাগুলো কাণ্ড এবং পাতার মাঝে থাকে।

পাতা খেকো লেদা পোকা

ভুট্টা গাছের চারা অবস্থায় লেদা পোকা পাতা খেয়ে ক্ষতি করতে পারে। পূর্ণবয়স্ক ভুট্টা গাছে পাতা খেকো লেদা পোকার আক্রমণে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা কম।

দমন ব্যবস্থাপনা

- পাতা খেকো লেদা পোকা দ্বারা আক্রান্ত গাছে প্রতি লিটার পানির সাথে ১ গ্রাম কীটনাশক (প্রোক্লেইম ৫ এসজি বা ইমাকর ৫ এসজি) মিশিয়ে গাছের উপরিভাগে ভালভাবে স্প্রে করে ভিজিয়ে দিতে হবে।

জাব পোকা

অনেকগুলি পূর্ণাঙ্গ এবং বাচ্চা পোকা একটি ভুট্টা গাছের পাতা টাসেল এবং মোচায় অবস্থান করে সেখান থেকে রস চুষে খেয়ে গাছের ক্ষতি করে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- জাব পোকা দমনের জন্য প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ গ্রাম ডিটারজেন্ট বা সাবানের গুঁড়া মিশ্রিত করে আক্রান্ত গাছে প্রয়োগ করতে হবে।
- এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে বায়োনিম-১ ইসি বা ফাইটোম্যাক্স ৩ ইসি (১ মিলি) অথবা মেলাডান ৫৭ ইসি (২ মিলি) হারে ভালভাবে মিশিয়ে আক্রান্ত গাছে স্প্রে করে জাব পোকা দমন করা যায়।

মোচার পোকা

ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ভুট্টার মোচার সিল্ক এর ভিতর দিয়ে ঢুকে কচি দানা খেয়ে নষ্ট করে। এ পোকা দ্বারা ব্যাপকভাবে আক্রান্ত হলে ভুট্টার ফলন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।

দমন ব্যবস্থাপনা

- উত্তমরূপে জমি চাষ করা, এতে পুত্তলিগুলো বের হয়ে পড়ে এবং পরভোজী পোকা ও পাখি এদের খেয়ে ফেলে।
- আক্রান্ত মোচা হতে কীড়া সংগ্রহ করে মেরে ফেলা।
- চারা অবস্থায় ফেরোমন ফাঁদ ১০ বর্গমিটার দূরত্বে স্থাপন করে এ পোকা দমন করা যায়।
- আক্রান্ত মাঠে বায়োকীটনাশক যেমন স্পিসোসেড (ট্রেসার অথবা সাকসেস) প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৪ মিলি হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
- প্রতি ১০ লিটার পানিতে ২ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড ১০ ইসি/সিমবুশ ১০ ইসি/ফেনম ১০ ইসি) মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

গোলাজাত ভুট্টা দানার পোকাসমূহ

চালের শুঁড় পোকা

স্ত্রী-শুঁড় পোকা ছুঁচালো মুখের সাহায্যে ভুট্টা দানায় ছিদ্র করে ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে কীড়া বের হয়ে দানার ভিতর খেয়ে বড় হয়ে এবং পরে দানা ফুটো করে পূর্ণাঙ্গ পোকা বেরিয়ে আসে। এরা কীড়া অবস্থায় বেশি ক্ষতি করে এবং পূর্ণাঙ্গ পোকাও শস্য দানা খেয়ে নষ্ট করে।

ভুট্টার শুঁড় পোকা

এ পোকা শুঁড় পোকার মতই তবে দেখতে কিছুটা কাল এবং লম্বায় বড়। এই পোকার আক্রমণ লক্ষণ, ডিম, কীড়া, পুত্তলি ও পূর্ণাঙ্গ পোকার বৈশিষ্ট্যসমূহ চালের শুঁড় পোকার অনুরূপ।

সুরুই পোকা

ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে ভুট্টার দানা ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে। দানার ভিতর কীড়া অবস্থায় কাটায় এবং কুড়ে কুড়ে খেয়ে বড় হতে থাকে এবং দানা নষ্ট করে ফেলে। এ পোকা শুধু কীড়া অবস্থায় ক্ষতি করে থাকে।

গোলাজাত ভুট্টার পোকা দমন ব্যবস্থাপনা

ক) সতকর্তা অবলম্বন

- ভুট্টা দানা গোলাজাত করার পূর্বে ৩-৪ বার ভালভাবে রোদে শুকাতে হবে।
- ভুট্টা দানার আর্দ্রতা শতকরা ১০-১২ এর মধ্যে রাখতে হবে।

- ❀ দানা গোলাজাত করার পূর্বে গোলাঘরের দেয়ালে বা মেঝেতে কোন রকম ফাটল থাকলে তা বন্ধ করতে হবে। গোলা ঘর ও তার আশপাশ ভালভাবে পরিষ্কার করতে হবে।
- ❀ গোলাজাত করার পূর্বে গোলাঘর, ভুট্টা দানা রাখার পাত্র অথবা ছালার ব্যাগ/বস্তা ভালভাবে পরিষ্কার করে সেভিন বা ম্যালাথিয়ন ১০% পাউডার দ্বারা শোধন করা যেতে পারে।
- ❀ গোলা ঘরে প্রয়োজনমতো আলো বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করতে হবে এবং বৃষ্টির দিনে যেন পানি প্রবেশ করতে না পারে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ❀ মেটালিক ড্রাম, ছোট মুখযুক্ত উন্নতমানের টিন এবং ভেতরে পলিথিন দেয়া মাটির মটকায় ভুট্টার দানা সংরক্ষণ করা উত্তম। দানা রাখার পর পাত্রগুলো অবশ্যই ঢেকে রাখতে হবে।
- ❀ মাঝে মাঝে ভুট্টা দানা রোদে শুকাতে হবে। এতে ভেতরের কীড়া মারা যায়।

খ) কীটনাশক প্রয়োগ

- ❀ প্রতি কেজি শস্য বীজে এক গ্রাম সেভিন বা ম্যালাথিয়ন ১০% পাউডার ব্যবহার করতে হবে।
- ❀ গুদামঘরে স্তূপীকৃত প্রতি টন শস্যের জন্য ৩-৬ টি ফসটকসিন ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হবে।
- ❀ গুদামঘরে বস্তায় রাখা স্তূপীকৃত প্রতি ১,০০০ ঘনফুট দানার জন্য ১৫-২৫ টি ফসকটসিন ট্যাবলেট ব্যবহার করতে হবে।

গ) ন্যাপথেলিন বলের ব্যবহার

গোলাজাত করার পূর্বে যে কোন আবদ্ধ পাত্রে প্রতি কেজি বীজে ২ গ্রাম ওজনের ৪টি ন্যাপথেলিন বল ১৫-২০ দিন পর্যন্ত রেখে, পরবর্তীতে তা বের করে নিয়ে উক্ত বীজ ভুট্টাকে পুনরায় আবদ্ধ অবস্থায় রেখে ৯ মাস পর্যন্ত পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা করা যায়।

ঘ) নিম তেলের ব্যবহার

প্রতি কেজি ভুট্টা বীজে ১০ মিলি হারে নিম তেল ব্যবহার করে শুঁড় পোকা দমন করা যেতে পারে।

বারি বেবী কর্ণ-১

থাইল্যান্ডের ক্যাসেটর্সাট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাতটি সংগ্রহ করে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় চাষাবাদ উপযোগীতা যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভাবিত "বারি বেবী কর্ণ-১" জাতটি ২০১৩ সালে চাষাবাদের জন্য অনুমোদিত হয়।

বারি বেবী কর্ণ-১

রবি মৌসুমের পুরুষ ফুল বের হতে গড়ে ৮৬ দিন এবং বীজ বোনা থেকে বেবী কর্ণ সংগ্রহ করা পর্যন্ত ৮৫-১০০ দিন সময় লাগে । গাছের গড় উচ্চতা ১৪০-১৫৫ সেমি (রবি মৌসুমে)। মোচার অগ্রভাগ সুচালো এবং মোচাতে সারির বিন্যাস সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রতিটি গাছে ২-৩টি করে বাজারজাত উপযোগী মোচা উৎপন্ন হয়। জাতটি টারসিকাম লিফ বাইট রোগ প্রতিরোধী। হেক্টর প্রতি ১৫-২০ টন পশু খাদ্য পাওয়া যায়। রবি মৌসুমে গড় ফলন ১.২৭-১.৩০ টন/হেক্টর (খোসা ছাড়া)।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বেবী কর্ণ বা বেবী ভুট্টা বিশেষ এক ধরনের ভুট্টা। ভুট্টার মোচা কচি অবস্থায় সংগ্রহ ও ব্যবহার করা হয় বলে নামকরণ হয়েছে বেবী কর্ণ। সাধারণত ভুট্টা (Field corn), মিষ্টি ভুট্টা (Sweet corn) অথবা খই ভুট্টা (Pop corn) এবং হাইব্রিড বা মুক্তপরাগায়িত (OPV) যে কোন জাতকেই বেবী ভুট্টা হিসেবে ব্যবহার করা যায় যদি তা থেকে বাজারজাত করার উপযোগী মানসম্পন্ন মোচা পাওয়া যায়। তবে বেবী ভুট্টা হিসেবে ব্যবহারে জন্য উদ্ভাবিত বিশেষ জাতও রয়েছে।

বেবী ভুট্টা হিসেবে চাষকৃত জাতের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, এ জাতগুলোতে গড়ে প্রতি গাছে ২-৪টি মোচা পাওয়া যায়। বেবি ভুট্টা অত্যন্ত কচি অবস্থায় সবজি, স্যুপ, সালাদ নুডুলস এর সাথে অথবা কাচা অবস্থায় রান্না ছাড়াই খাওয়া যায়। ভুট্টার কচি মোচা পরাগায়ণের পূর্বেই সংগ্রহ করে সবুজ খোসা অপসারণ করে ব্যবহার করতে হয়।

মাটি: উঁচু ও মাঝারী উঁচু উর্বর বেলে দো-আঁশ মাটি অথবা পানি দাঁড়ায় না এমন এঁটেল মাটিতে বেবী কর্ণ চাষ করা যায়।

জমি তৈরি: মাটির 'জো' থাকা অবস্থায় জমির প্রকারভেদে প্রথমে ৩-৪টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নিতে হবে।

বপনের সময়: সারা বছর বেবী কর্ণ চাষ করা যায় (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ , আষাঢ় ও শ্রাবণ মাস ছাড়া)।

বীজের হার: হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ কেজি।

বীজের বপন পদ্ধতি: সারি থেকে সারির দূরত্ব ৪০-৫০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০-২৫ সেমি। এতে প্রতি হেক্টর জমিতে ৮০,০০০-১,২৫,০০০ গাছ থাকবে।

সারের পরিমাণ:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	২৫০-৩০০ কেজি
টিএসপি	১২৫-১৫০ কেজি
এমওপি	৮০-১০০ কেজি
জিপসাম (প্রয়োজনবোধে)	১২৫-১৫০ কেজি
জিংক সালফেট (প্রয়োজনবোধে)	৮-১০ কেজি

সারের প্রয়োগ পদ্ধতি: জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে ইউরিয়া সারের ১/৩ অংশ ও অন্যান্য সারের সবটুকুই জমিতে ছিটিয়ে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান ২ ভাগ করে চারা গজানোর ১৫-২০ দিন এবং ৩৫-৪০ দিন পর জমির উর্বরতাভেদে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। মাটির উর্বরতাভেদে সারের তারতম্য হতে পারে।

আগাছা দমন: গাছের বয়স ১ মাস না হওয়া পর্যন্ত জমি অবশ্যই আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

সেচ ও পানি নিষ্কাশন: রবি মৌসুমে সাধারণত ২ বার সেচের প্রয়োজন হয় এবং ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগের সময় সেচ দিলে ভালো হয়। খরিফ মৌসুমে খরা দেখা দিলে সেচ দিতে হবে। খরিফ মৌসুমে অতি বৃষ্টিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।

বেবী কর্ণের পুরুষ ফুল/মঞ্জুরীদণ্ড অপসারণ: পুরুষ ফুল কচি অবস্থায় ফুটে বের হওয়ার পূর্বেই টাসেল ধরে টান দিয়ে অপসারণ করতে হয়।

ফসল সংগ্রহ: নিচের দিকে মোচার মাথায় যখন সিল্কগুলো ১-৩ সেমি লম্বা হয় তখন ধারালো চাকু বা কাঁচি দ্বারা মোচাটি গাছ থেকে কেটে নিতে হবে।

ফলন: হেক্টরপ্রতি ফলন ১.২৭-১.৩০ টন (খোসা ছাড়া) এছাড়া গো-খাদ্য হিসেবে (গাছ) ১৫-২০ টন।

জীবন কাল: গ্রীষ্মকাল : ৫০-৬০ দিন, শীতকাল : ৭০-৮০ দিন।

সংরক্ষণ: টাটকা মোচার ক্ষেত্রে সংগ্রহের পর হতে ভোক্তার হাতে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত বাজার জাতকরণের সকল স্তরে নিম্ন তাপমাত্রা (৫-৭০) এবং উচ্চ আপেক্ষিক আর্দ্রতায় (৯০ শতাংশ) সংরক্ষণ করতে পারলে ৭-১০ দিন পর্যন্ত ভাল থাকে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে মোচা অল্প সময়ে শুষ্ক হয়ে দানা বসে যায় এবং বাদামী বর্ণ ধারণ করে, ফলে বাজারমূল্য কমে যায়। এছাড়া ব্রাইন দ্রবণে বায়ু রোধক পাত্রে (ক্যানে) বেবী কর্ণ সংরক্ষণ করা হলে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায়। প্রতি ক্যানে ১ কেজি বেবীকর্ণ থাকে। অভিজাত দোকানে একটি ক্যানের বর্তমান বাজার মূল্য ২০০-২২৫ টাকা।

চীনা

বর্তমানে বাংলাদেশে অপ্রধান ফসল হিসেবে চীনার চাষ করা হয়ে থাকে। অনুর্বর মাটিতে ও চরাঞ্চলে এ ফসলটি বেশি চাষ হয়ে থাকে। বাংলাদেশে কাউন ও চীনার জমির মোট পরিমাণ প্রায় ১০৬৪ হেক্টর এবং মোট উৎপাদন প্রায় ১০৫৪ মে. টন। খরা বা বন্যার পর কৃষি উৎপাদন পুনর্বাসন কার্যক্রমে চীনা যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে। চীনা দ্বারা খিচুড়ি, পায়েশ, মোয়া, নাড়ু ও পিঠা তৈরি করা যায়।

চীনার জাত

তুষার

চীনার তুষার জাতটি ১৯৭২ সালে সুষাইট মিলেট নামে ফ্রান্স থেকে বাংলাদেশে আনা হয় এবং পরবর্তীকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৮৯ সালে তুষার নামে অনুমোদন লাভ করে।

এ জাতটি উচ্চ ফলনশীল, আগাম এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন । তুষার গাছের উচ্চতা মাঝারি, ৫-৬ টি কুশি বিশিষ্ট শীষ আকারে বেশ লম্বা ও শীষে বীজ গুচ্ছাকারে থাকে। বীজের রং হালকা ঘিয়ে। হাজার দানার ওজন ৪.৫০-৪.৭৫ গ্রাম। গাছ শক্ত, সহজে হেলে পড়ে না। স্থানীয় জাতের চেয়ে তুষারের ফলন শতকরা ৩৫-৪০% বেশি। তুষার স্থানীয় জাতের চেয়ে ৯-১০ দিন আগে পাকে, ফলন প্রতি হেক্টরে ২.৫-৩.০ টন।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: পানি জমে না এমন বেলে দোআঁশ মাটি চীনা চাষের জন্য বেশ উপযোগী।

বপনের সময়: মধ্য-কার্তিক থেকে পৌষ মাস (নভেম্বর থেকে মধ্য-জানুয়ারি)।

বীজের হার: চীনা বীজ ছিটিয়ে এবং সারিতে উভয় পদ্ধতিতেই বোনা যায়। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টরপ্রতি ২০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ১৮ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। সারিতে বীজ বুনলে ২ সারির মাঝে দূরত্ব হবে ২০-৩০ সেমি। সারিতে চারা গজানোর পর ৬-৮ সেমি দূরত্বে একটি করে চারা রেখে বাকী চারা তুলে ফেলতে হবে।

সারের পরিমাণ: সাধারণত অনুর্বর জমিতে চীনার চাষ করা হলেও সার প্রয়োগ করে ফলন বাড়ানো যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১৩০-১৭০ কেজি
টিএসপি	১০০-১২৫ কেজি
এমওপি	৮০-৯০ কেজি
জিপসাম	৪৫-৫৫ কেজি
জিংক সালফেট	৩-৪ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: সেচ বিহীন চাষে সম্পূর্ণ সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। কিন্তু সেচের ব্যবস্থা থাকলে শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া এবং সবটুকু টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ: মাটিতে রসের অভাব হলে ১-২টি হালকা সেচ দেওয়া যেতে পারে।

সংগ্রহ: শীষ খড়ের রং ধারণ করলে তখন বুঝতে হবে ফসল কাটার সময় হয়েছে।

রোগবালাই: চীনার এ জাতটিতে সাধারণত রোগবালাই দেখা যায় না।

দমন ব্যবস্থা: প্রযোজ্য নয়

পোকামাকড়

চীনায় পোকামাকড়ের আক্রমণ কম।

দমন ব্যবস্থা

পোকার আক্রমণ দেখা দিলে আক্রমণের ব্যাপকতা বুঝে কার্বোফুরান ৫ জি (তারপোকার ক্ষেত্রে) জাতীয় দানাদার কীটনাশক (যেমন ফুরাডান, ব্রিফার ইত্যাদি) হেক্টর প্রতি ১৮ কেজি হারে বীজ বপনের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং কাটুই পোকার জন্য প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি ক্লোরোপাইরিফস ২০ ইসি জাতীয় কীটনাশক (ডারসবান/পাইরিফস/অন্য নামের) মিশিয়ে চারাগাছ গুলোর গোড়ায় মাটি ভিজিয়ে ভালভাবে স্প্রে করে দিয়ে এ পোকার আক্রমণ কমানো যায়।

কাউন

কাউন বাংলাদেশে দীর্ঘ দিন ধরে চাষাবাদ হয়ে আসছে। ছোট দানা বিশিষ্ট শস্যটি এ দেশে গরীবের খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের সাধারণত চরাঞ্চলে অথবা কম উর্বর জমিতে স্বল্প চাষে কাউনের চাষ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রায় ১০৬৩ হেক্টর জমিতে কাউন এবং চীনা চাষ করা হয় এবং এর মোট উৎপাদন প্রায় ১০৫৪ মে. টন

কাউনের জাত

তিতাস

কাউনের এ জাতটি শিবনগর নামে ১৯৮০ সালে কুমিল্লা জেলা থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং দেশি-বিদেশি জাতের সাথে তুলনামূলক মূল্যায়নের পর ১৯৮৯ সালে তিতাস নামে অনুমোদন লাভ করে।

তিতাস

তিতাস জাত উচ্চ ফলনশীল, আগাম রোগ ও পোকা প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। তিতাস জাতের গাছ মাঝারী লম্বা, পাতা সবুজ, কাণ্ড শক্ত। গাছ সহজে নুয়ে পড়ে না। শীষ বেশ লম্বা, মোট এবং রোমশ। বীজ মাঝারী আকারের এবং ঘিয়ে রঙের। হাজার বীজের ওজন ২.৩-২.৫ গ্রাম। স্থানীয় জাতের চেয়ে ফলন প্রায় ৩০-৩৫% বেশি। জাতটি রবি মৌসুমে ১০৫-১১৫ দিনে এবং খরিফ মৌসুমে ৮৫-৯৫ দিনে পাকে।

তিতাস জাতটি গোড়া পচা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। রবি মৌসুমে তিতাসের ফলন হেক্টর প্রতি ২.০-২.৫ টন। খরিফ মৌসুমে এর ফলন একটু কম হয় ।

বারি কাউন-২

এ জাতটি কুমিল্লা জেলার পরাকান্দি থেকে সংগ্রহ করা হয়। এ জাতটি দেশি-বিদেশি জাতের সাথে তুলনামূলক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতীয় বীজ বোড কর্তৃক বারি কাউন-২ নামে অনুমোদিত হয়।

বারি কাউন-২

গাছের উচ্চতা ১২০ সেমি। কাণ্ড শক্ত ও মজবুত হওয়ায় গাছ সহজে হেলে পড়ে না। পাতা সবুজ, চওড়া এবং লম্বা। শীষ ২০-২৫ সেমি লম্বা এবং ছোট শুয়োযুক্ত হয়।

বীজ গোলাকার এবং ঘিয়ে রঙের। হাজার বীজের ওজন ২.৫৫ গ্রাম। এ জাতটির ফলন হেক্টরপ্রতি ২.৭৫-৩.০ টন (রবি মৌসুমে)। তিতাস জাতের চেয়ে গড় ফলন প্রায় ২০% বেশি। এ জাতটির জীবনকাল ১২০-১২৫ দিন। এ জাতটিতে রোগ-বালাই বা পোকা-মাকড়ের আক্রমণ তেমন দেখা যায় না।

বারি কাউন-৩

কাউনের এ জাতটি মিউটেশন ব্রিডিং পদ্ধতিতে উদ্ভাবিত। দেশি-বিদেশি কাউনের জাতসমূহের সাথে এবং প্যারেন্ট এর সাথে তুলনামূলক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ২০০১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক বারি কাউন-৩ নামে অনুমোদিত হয়।

বারি কাউন-৩

এই জাতটি খাটো অর্থাৎ গড়ে ৪৫-৫০ সেমি লম্বা হয়, গাছ খর্বাকৃতির হওয়ায় প্রবল বাতাসে নুয়ে পড়ে না। ফলে পাহাড়ের ঢালে চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী। এই জাতটির শীষ মাঝারি (গড়ে ১৭ সেমি) এবং ছোট শুয়াযুক্ত হয়।

বীজ আকারে বড়, গোলাকার এবং ঘিয়ে রঙের। হাজার বীজের ওজন ২.৩৬ গ্রাম। স্থানীয় জাতের চেয়ে ফলন শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ বেশি। রবি মৌসুমে এ জাতটির ফলন হেক্টর প্রতি ২.৫-৩.০ টন। জীবকাল ১২০-১২৫ দিনে। পাতার অগ্রভাগ সুঁচালো হওয়ায় পাখির আক্রমণজনিত ক্ষতি অনেক কম হয়। এ জাতটিকে রোগবালাই বা পোকামাকড়ের আক্রমণ তেমন একটা দেখা যায় না।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: প্রায় সব ধরনের মাটিতেই কাউনের চাষ করা যায়। তবে পানি দাঁড়ায় না এমন বেলে দোআঁশ মাটিতে এর ফলন ভালো হয়।

বপনের সময়: দেশের উত্তরাঞ্চলে অগ্রহায়ণ থেকে মাঘ মাস (মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য-ফেব্রুয়ারি)। পর্যন্ত বীজ বোনা যায়।

বীজের হার: কাউনের বীজ ছিটিয়ে ও সারিতে বোনা যায়। ছিটিয়ে বুনলে হেক্টরপ্রতি ১০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ৮ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়। বীজ সারিতে বুনলে সারির থেকে সারির দূরত্ব ২৫-৩০ সেমি রাখতে হবে। চারা গজানোর পর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে সারিতে চারার দূরত্ব ৬-৮ সেমি রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে।

সারের পরিমাণ: কাউন চাষে সচারাচর রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা হয় না। তবে অনুর্বর জমিতে হেক্টরপ্রতি নিম্নরূপ সার প্রয়োগ ফলন বেশি হয়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১৩০-১৭০ কেজি
টিএসপি	১০০-১২৫ কেজি
এমওপি	৮০-৯০ কেজি
জিপসাম	৪৫-৫৫ কেজি
জিংক সালফেট	৩-৪ কেজি
বরিক এসিড	-

সেচবিহীন চাষে সবটুকু সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। সেচের ব্যবস্থা থাকলে শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া এবং সবটুকু টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ: কাউন একটি খরা সহিষ্ণু ফসল। তবে রবি মৌসুমে খরা দেখা দিলে ১-২ টি হালকা সেচের ব্যবস্থা করলে ফলন ভাল হয়।

ফসল সংগ্রহ: কাউনের শীষ খড়ের রং ধারণ করলে বীজ দাঁতে কাটার সময় ‘কট’ করে শব্দ হলে বুঝতে হবে ফলন কাটার সময় হয়েছে।

রোগবালাই

কাউনে সাধারণত রোগবালাই দেখা যায় না।

দমন ব্যবস্থা: প্রযোজ্য নয়

পোকা-মাকড়: কাউনে পোকামাকড়ের আক্রমণ কম।

দমন ব্যবস্থা: পোকার আক্রমন দেখা দিলে আক্রমণের ব্যপকতা বুঝে কার্বোফুরান ৫ জি (তার পোকার ক্ষেত্রে) জাতীয় দানাদার কীটনাশক (যেমন ফুরাডান, ব্রিফার ইত্যাদি) হেক্টর প্রতি ১৮ কেজি হারে বীজ বপনের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং কাটুই পোকার জন্য প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি ক্লোরোপাইরিফস ২০ ইসি জাতীয় কীটনাশক (ডারসবান/পাইরিফস/অন্য নামের) মিশিয়ে চারাগাছের গোড়ায় মাটি ভিজিয়ে ভালভাবে স্প্রে করে দিয়ে এ পোকার আক্রমণ কমানো যায়।

বার্লি

বার্লির অপর নাম যব। এদেশে বার্লির চাষ দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে। সাধারণত চরাঞ্চলে অনুর্বর জমিতেও স্বল্প ব্যয়ে এর চাষ করা হয়।

বার্লি কিছুটা লবণাক্ততা সহনশীল ফসল। বার্লি দিয়ে শিশু খাদ্য, ওভালটিন, হরলিক্স প্রভৃতি সুস্বাদু খাদ্য তৈরী হয়। পুষ্টিমানের দিক থেকে বার্লি গমের চেয়ে উন্নত। বাংলাদেশে মোট বার্লি জমির পরিমাণ প্রায় ৩৩০ হেক্টর এবং মোট উৎপদান প্রায় ২৮৭ মে. টন।

বার্লির জাত

বারি বার্লি-১

১৯৮৮ সালে CIMMYT থেকে এ জাতটি বাংলাদেশে আনা হয়। পরবর্তী কালে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে বারি বার্লি-১ নামে এ জাতটি অনুমোদন লাভ করে।

এ জাতের উচ্চতা মাঝারী (৮৫-৯০ সেমি)। পাতার রং গাঢ় সবুজ ও কাণ্ড শক্ত। গাছ সহজে নুয়ে পড়ে না। বীজ, শীষে ৬ সারিতে অবস্থান করে। দানা খোসাযুক্ত। দানার রং সোনালী। হাজার দানার ওজন ৩৬-৩৮ গ্রাম। এ দেশের আবহাওয়ায় এর জীবনকাল ১০৮-১১২ দিন। এ জাতটিতে রোগ ও পোকার আক্রমণ খুব কম। সেচ ছাড়া চাষ করলেও হেক্টরপ্রতি ২.২-২.৫ টন ফলন পাওয়া যায়। তবে একটি সেচ প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি পায়।

বারি বার্লি-১

বারি বার্লি-২

'বারি বার্লি-২' জাতটি ১৯৯৪ সালে অনুমোদিত হয়। এ জাতের গাছ মাঝারী উচ্চতা সম্পন্ন। বীজ ৬ সারি বিশিষ্ট এবং খোসাযুক্ত কাণ্ড শক্ত, ফলে সহজে হেলে পড়ে না। জাতটি গোড়া পচা ও ঝলসানো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন। এ জাতটির হাজার বীজের ওজন ৩৫-৩৮ গ্রাম এবং দানাতে ১২-১৪% আমিষ থাকে। 'বারি বার্লি-২' সেচবিহীন চাষে হেক্টরপ্রতি ২.০-২.৫ টন এবং একটি সেচসহ চাষে ২.৫-৩.০ টন ফলন পাওয়া যায়।

বারি বার্লি-২

বারি বার্লি-৩

বারি বার্লি-৩ ও খোসা মুক্ত দানা

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আমদানিকৃত লাইন থেকে কারান-১৯ বাছাই করে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিক্ষণ-নিরীক্ষণ করে জাতটি ২০০১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

গাছ খাট প্রকৃতির ৭৫-৮৫ সেমি। পাতা মোমযুক্ত ৬ সারি, খোসামুক্ত দানা, শীষ ১০-১২ সেমি লম্বা। হাজার দানার ওজন ৩৪-৩৬ গ্রাম। রোগবালাই কম, দানা বড়, ৯৫-১০০ দিনে ফসল পরিপক্ক হয়। গড় ফলন ২.২০-২.৫০ টন/হেক্টর।

বারি বার্লি-৪

বারি বার্লি-৪

জাতটি ২০০১ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে নমুনা সংগ্রহ করে বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জাতটি উদ্ভাবন করা হয়।

লবণাক্ততা সহনশীল, লবণাক্ত এলাকায় গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেমি, ৬ সারি খোসাযুক্ত দানা। শীষ ৮-১০ সেমি। হাজার দানার ওজন ৩৫-৩৮ গ্রাম। রোগবালাই কম, দানা পরিপুষ্ট ও সোনালী বর্ণের, ৯৫-১০০ দিনে ফসল ; পরিপক্ক হয়। গড় ফলন ১.৭৫-২.০০ টন/হেক্টর।

বারি বার্লি-৫

বারি বার্লি-৫

'বারি বার্লি-১' ও 'বেল-4' এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। জাতটি ২০০৫ সালে জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গাছের উচ্চতা ৯৫-১০০ সেমি। আগাম পরিপক্কতা বিশিষ্ট। পাতার রং সবুজ। বীজের রং বাদামী, বীজ ৬ সারি বিশিষ্ট। শীষ ১০-১২ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রতি শীষে ৬০-৬৫ টি দানা থাকে। বীজ খোসাযুক্ত। জীবন কাল ৯৫-৯৮ দিন। হাজার দানার ওজন ৩৬-৩৮ গ্রাম। উপযুক্ত পরিবেশে গড় ফলন ২.৫০-৩.০০ টন/হেক্টর। এটি বাংলাদেশের কম উর্বর, খরা পিড়ীত ও চর অঞ্চলে চাষ উপযোগী।

বারি বার্লি-৬

জাতটি ২০০৫ সালে জাতীয় বীজ বোড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বারি বার্লি-১ এবং ই-৬ এর মধ্যে সংকরায়ণের মাধ্যমে উদ্ভাবিত।

বারি বার্লি-৬

গাছের উচ্চতা ৮৫-৯০ সেমি। পাতার রং সবুজ, শক্ত কাণ্ড বিশিষ্ট, নুয়ে পড়ে না । শীষ ১০-১২ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। বীজ ৬ সারি বিশিষ্ট এবং খোসামুক্ত। প্রতিটি শীষে ৪৮-৬৫ টি বীজ থাকে। জীবনকাল ৯৮-১০২ দিন। হাজার দানার ওজন ৩৫-৩৮ গ্রাম। রোগবালাই কম, দানা বড় ও সোনালী বর্ণের। উপযুক্ত পরিবেশে গড় ফলন ২.৫০-২.৭৫ টন/হেক্টর। লবণাক্ত এলাকায় গড় ফলন ২.৫.২.৭৫ টন/হেক্টর। বীজের রঙ বাদামী। এটি বাংলাদেশের কম উর্বর, খরা পিড়ীত ও চর অঞ্চলে চাষ উপযোগী।

বারি বার্লি-৭

বারি বার্লি-৭

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি বার্লি-৭ একটি লবণাক্ততা সহনশীল খোসামুক্ত বার্লির জাত। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সংগৃহীত কারান-৩৫১ এর সাথে ICARDA E-21 জাতের সংকরায়নের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। দেশের বিভিন্ন লবণাক্ত এলাকায় মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষায় ভাল ফলন দেয়ায় জাতটি জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৫ সালে বারি বার্লি-৭ নামে অবমুক্ত করা হয়।

লবণাক্ত এলাকায় এ জাতের গাছের গড় উচ্চতা ৫০-৬৫ সেমি। শীষ বের হতে ৬০-৬৫ দিন এবং বোনা থেকে পাকা পযর্ন্ত ৯৫-১০৫ দিন লাগে। জাতটির শীষ ছয় সারি বিশিষ্ট ও দানাগুলো খোসামুক্ত। প্রতিটি শীষে দানার সংখ্যা ৩৮-৪৮। দানার রঙ বাদামী ও আকারে মাঝারী। হাজার দানার ওজন ৩০-৪০ গ্রাম। জাতটি ০৮ ডিএস/মি পর্যন্ত লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। হেক্টর প্রতি ফলন ২.০০-২.৫০ টন/হেক্টর (লবণাক্ত এলাকায়)।

বারি বার্লি-৮

বারি বার্লি-৮

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি বার্লি-৮ একটি লবণাক্ততা সহনশীল খোসামুক্ত বার্লির জাত। ক্যালিফোনিয়া থেকে সংগ্রহীত কারান-১৯ এর সাথে ICARDA, সিরিয়া থেকে সংগৃহীত IEBON/96-163 জাতের সংকরায়ণের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। দেশের বিভিন্ন লবণাক্ত এলাকায় মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষায় ভাল ফলন দেয়ায় জাতটির জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৮ সালে বারি বার্লি-৮ নামে অবমুক্ত করা হয়।

এ জাতের গাছের গড় উচ্চতা ৭৩ সেমি। বোনা থেকে পাকা পর্যন্ত ৯৫ দিন লাগে। জাতটির শীষ ছয় সারি বিশিষ্ট ও দানা গুলো খোসা মুক্ত। শীষ গড়ে ১০.৭ সেমি পর্যন্ত লম্বা হয়। প্রতিটি শীষে দানার সংখ্যা ৫৮। দানার রঙ বাদামী ও আকারে মাঝারী। হাজার দানার ওজন ৩৪-৩৮ গ্রাম। জাতটি ৪.৮-১০.০ ডিএস/মি পর্যন্ত লবণাক্ততা সহ্য করতে পারে। হেক্টর প্রতিফলন ২.২০-২.৫১ টন/হেক্টর (লবণাক্ত এলাকায়)। কম উর্বর, প্রতিকূল প্রান্তিক জমি যেমন যেমন লবণাক্ত এলাকায় (নোয়াখালী, পটুয়াখালী, সাতক্ষীরা ও খুলনা) এবং চরঅঞ্চলে কম খরচে এই জাতটি চাষ উপযোগী।

বারি বার্লি-৯

বারি বার্লি-৯

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত বারি বার্লি-৯ একটি খরা সহনশীল খোসামুক্ত বার্লির জাত। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে সংগ্রহীত কারান-৩৫১ এর সাথে ICARDA, সিরিয়া থেকে সংগ্রহীত E-21 MRA জাতের সংকরায়ণের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন আবহাওয়ায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ জাতটি উদ্ভাবন করা হয়। দেশের বিভিন্ন খরা এলাকায় মাঠ পর্যায়ের পরীক্ষায় ভাল ফলন দেয়ায় জাতটির জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ২০১৮ সালে বারি বার্লি-৯ নামে অবমুক্ত হয়। জাতটির গড় উচ্চতা ১০০ সেমি এবং প্রতি গাছে ৩টি করে কার্যকরি কুশি আছে। খরা এলাকায় জাতটির দানার ফলন ২.২ টন/হেক্টর এবং খড়ের ফলন ৪.২ টন/হেক্টর। জাতটির শীষ ৮.৯ সেমি লম্বা, শীষে দানা ৬ সারি বিশিষ্ট হয় এবং প্রতি শীষে গড়ে ৩৮টি করে দানা আছে। দানা খোসামুক্ত ও খড় বর্ণের এবং

১,০০০ দানার ওজন ৩৬ গ্রাম। জাতটি ৯৭ -৯৯ দিনে পরিপক্ক হয়। বাংলাদেশের সকল এলাকাতে এই জাতটি চাষ করা যায় বিশেষভাবে খরা প্রবণ এলাকায় চাষ উপযোগী। জাতটিতে খড়ের পরিমাণ বেশি হয় বিধায় খরা প্রবণ এলাকায় যেখানে গবাদী পশুর খাবারের অভাব রয়েছে সেখানে চাষ করা উপযোগী।

উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: পানি জমে না এমন বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি বার্লি চাষের জন্য উপযুক্ত । জমিতে 'জো' আসার পর মাটির প্রকারভেদে ৩-৪টি আড়াআড়ি চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরী করতে হয়।

বপনের সময়: কার্তিক মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অগ্রহায়ণ মাস (নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহ) পর্যন্ত বীজ বপন করা যায়।

বীজের হার: বার্লি ছিটিয়ে ও সারিতে বপন করা যায়। ছিটিয়ে হেক্টর প্রতি ১২০ কেজি এবং সারিতে বুনলে ১০০ কেজি বীজ প্রয়োজন হয়। সারিতে বুনলে ২ সারির মাঝে দূরত্ব ২০-২৫ সেমি রাখতে হবে। লাঙ্গল দিয়ে ৩.৫ সেমি গভীর নালা টেনে তাতে বীজ বুনে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।

আগাছা দমন: চারা গজানোর পর ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে ৮-১০ সেমি দূরত্বে একটি চারা রেখে বাকি চারা তুলে পাতলা করে দিতে হবে। জমিতে আগাছা দেখা দিলে নিড়ানি দিয়ে তুলে ফেলতে হবে।

সারের পরিমাণ: সাধারণত অনুর্বর জমিতে চাষ করা হলেও সুপারিশমতো সার প্রয়োগে এর ফলন বাড়ানো যায়।

বার্লির জমিতে নিম্নরূপ সার প্রয়োগ করা যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১৫০-১৮০ কেজি
টিএসপি	১০০-১২৫ কেজি
এমওপি	১০০-১২০ কেজি
জিপসাম	৪০-৬০ কেজি
জিংক সালফেট	৩-৫ কেজি

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: সেচের ব্যবস্থা থাকলে শেষ চাষের সময় অর্ধেক ইউরিয়া এবং সবটুকু টিএসপি ও এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া ২ কিস্তিতে বীজ বপনের ৩০-৩৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ বপনের ৫৫-৬০ দিন পর (সেচের পর) প্রয়োগ করতে হবে।

পানি সেচ: রবি মৌসুমে খরা দেখা দিলে ১-২ টি হালকা সেচের ব্যবস্থা করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়।

ফসল সংগ্রহ: শীষ খড়ের রং এবং পাতা বাদামি হয়ে এলে বোঝা যাবে ফসল পেকেছে। চৈত্রের প্রথম সপ্তাহ থেকে মধ্য সপ্তাহ।

অন্যান্য পরিচর্যা

বার্লির পাতা ঝলসানো রোগ

Bipolaris horde প্রজাতির ছত্রাক দ্বারা এ রোগটি ঘটে। সবুজ পাতায় ঈষৎ বাদামি রঙের ছোট ছোট ডিম্বাকার দাগ পড়ে। পরবর্তীকালে এ সকল দাগ বাড়তে থাকে ও গাঢ় বাদামী থেকে কালো বর্ণ ধারণ করে। দাগ একত্রিত হয়ে সমস্ত পাতা বাদামী বর্ণ ধারণ করে এবং ঝলসানোর লক্ষণ দেখা যায়। ফসলের পরিত্যক্ত অংশ, বীজ ও বায়ুর মাধ্যমে এ রোগ বিস্তার লাভ করে। বায়ুর অধিক আর্দ্রতা ও ২৫° সে. তাপমাত্রা এ রোগ বিস্তারের জন্য সহায়ক।

প্রতিকার

- গাছের পরিত্যক্ত অংশ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- টিল্ট ২৫০ ইসি (০.০৫%) ০.৫ মিলি ঔষধ প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- প্রোভেক্স ২০০ প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম হারে মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে।

বার্লির গোড়া পচা রোগ

স্কেলেরোসিয়াম রফসি নামক ছত্রাক দ্বারা এ রোগ হয়ে থাকে। এ রোগ জীবাণু প্রায় সকল ক্ষেত্রে মাটির নিকটবর্তী কাণ্ড ও মূলের সংযোগস্থলে আক্রমণ করে। প্রথমে গাছের গোড়ায় হলদে দাগ দেখা যায়, পরে দাগ গাঢ় বাদামি হয়ে আক্রান্ত স্থানের চারদিকে ঘিরে ফেলে, ফলে গাছ শুকিয়ে মরে যায়। অনেক সময় গাছের গোড়ায় ও মাটিতে সরিষার দানার মতো বাদামি থেকে কালো রঙের স্কেলেরোসিয়া গুটি দেখা যায়। রোগের জীবাণু মাটিতে বা ফসলের পরিত্যক্ত অংশে দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকে এবং বৃষ্টি ও সেচের পানির মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে। আর্দ্রতাপূর্ণ মাটি রোগ দ্রুত বিস্তারের জন্য সহায়ক।

প্রতিকার

- সবসময় মাটিতে পরিমিত আর্দ্রতা বজায় রাখা প্রয়োজন।
- প্রোভেক্স-২০০ (প্রতি কেজি বীজে ২.৫-৩.০ গ্রাম) মিশিয়ে বীজ শোধন করে বপন করতে হবে।

পোকা-মাকড়

বার্লিতে তেমন কোন পোকা-মাকড়ের আক্রমণ দেখা যায় না। তবুও সময় সময় কিছু পোকা বার্লি ফসলে আক্রমণ করে থাকে। বার্লির প্রধান অনিষ্টকারী পোকাগুলো হলো: তারপোকা ও কাটুই পোকা।

তারপোকা

চারা অবস্থায় বার্লির ক্ষেতে “তারপোকা” দেখা যায়। গাছের বয়স যখন ২৫-৩৫ দিন হয় তখন তারপোকার আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় ফলে Dead heart লক্ষণ দেখা দেয়। এ ধরণের আক্রান্ত গাছ উঠালে দেখা যাবে গাছের গোড়ার অংশ থেতলিয়ে গেছে।

তারপোকার দমন ব্যবস্থা

- তার পোকা আক্রান্ত ডগা সংগ্রহ করে কীড়াসহ ধ্বংস করতে হবে।
- যে সমস্ত এলাকায় এ পোকার আক্রমণ বেশি হয় সেখানে হেক্টর প্রতি ১৮ কেজি কার্বোফুরান (ফুরাডান ৫ জি অথবা সানফুরাডান ৫ জি অথবা ফুরাডান ৫ জি) বীজ বপনের সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে।
- সাধারণত বেলে ও বেলে দোআঁশ জমিতে তারপোকার আক্রমণ বেশি হয়। সময় ও স্থানভেদে এ পোকার দ্বারা ৭.৫% পর্যন্ত চারাগাছ আক্রান্ত হতে পারে।
- ফসল তোলার পর আক্রান্ত জমি ভালভাবে চাষ করলে এ পোকার বংশ বৃদ্ধি কমে যায়।

কাটুই পোকা

এই পোকার ক্ষতিকর ধাপ হচ্ছে কীড়া। কীড়া সাধারণত রাতের বেলা কার্যক্ষম থাকে। দিনের বেলা কীড়া মাটির ফাটলে, মাটির ঢেলায় এবং আবর্জনার মধ্যে লুকিয়ে থাকে। এরা রাতের বেলা বের হয়ে বার্লির চারাগাছ কেটে ফেলে। সকাল বেলা ক্ষেতে কাটুই পোকা দ্বারা কাটা বার্লির চারাগাছ দেখা যায়। ভোর বেলা ক্ষেতের মধ্যে কাটা গাছের কাছে মাটি খুঁড়লে কাটুই পোকার কীড়া দেখতে পাওয়া যায়। কাটুই পোকার আক্রমণে জমিতে বার্লিগাছের সংখ্যা কমে যায় বলে স্বাভাবিকভাবে ফলনও কম হয়।

কাটুই পোকার দমন ব্যবস্থা

- কাটুই পোকা দমনের জন্য দিনের বেলা আক্রান্ত গাছের গোড়া থেকে মাটি সরিয়ে পোকা বের করে মেরে ফেলতে হবে।
- হালকা সেচ দিলে মাটির নিচে লুকিয়ে থাকা কীড়া মাটির উপরে আসবে, ফলে পাখি সহজে এদের ধরে খাবে বা হাত দ্বার এদের মেরে ফেলা যাবে।
- এছাড়া বিষ ফাঁদ ব্যবহার করে এ পোকা দমন করা যায়। বিষ ফাঁদ তৈরি করার জন্য প্রতি হেক্টরে ২ কেজি সেভিন ৮৫ ডাব্লিউ পি এর সাথে ১০০ কেজি গম বা ধানের কুঁড়া মিশ্রিত করে সন্ধ্যার সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।
- এছাড়া প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিলি ডার্সবান ২০ ইসি বা পাইরিফস ২০ ইসি অথবা প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি কীটনাশক (ক্যারেট ২.৫ ইসি বা ফাইটার ২.৫ ইসি) মিশিয়ে গাছের গোড়ার চারপাশে ভালভাবে স্প্রে করে পোকা দমন করা যায়।

কৃষি যন্ত্রপাতি

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অপরিহার্য। গবেষণা করে দেখা গেছে যে, জমিতে শক্তির ব্যবহার বাড়লে উৎপাদন বাড়ে। তাই জমিতে শক্তির ব্যবহার বাড়ানো প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্য সামনে রেখে এবং বাংলাদেশের কৃষকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে বিভিন্ন ফসলের জন্য লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। বর্তমানে ডিজেল ইঞ্জিনের দাম তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এবং দেশের প্রত্যন্ত এলাকাতেও পাওয়ার টিলার পাওয়া যায় বলে শক্তি-চালিত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এতে একদিকে পাওয়ার টিলারের বহুমুখী ব্যবহার বেড়েছে, অন্যদিকে কৃষকগণ অল্প খরচে শক্তি-চালিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে পারছেন। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতাও আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে।

উৎপাদিত শস্য ঠিকমতো প্রক্রিয়াজাতকরণ না করলে শস্য সংগ্রহোত্তর পর্যায়ে এর বড় একটা অংশ নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য প্রক্রিয়াজাতকরণ যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে যা ব্যবহার করে ফসলের পরিমাণগত ও গুণগত মান বাড়ানো যায়।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত অনেকগুলো কৃষি যন্ত্রপাতি দেশের বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত প্রস্তুতকারকগণ উৎপাদন ও বিপণন করছে। ফলে এসব কৃষি যন্ত্রপাতি কৃষকদের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠেছে এবং যন্ত্রপাতিগুলোর চাহিদাও বাড়ছে। বারি কর্তৃক এ যাবৎ যত আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করা হয়েছে তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো।

বারি বীজ বপন যন্ত্র

সারিতে বীজ বুনলে কম বীজ লাগে, সহজে আগাছা পরিষ্কার করা যায়, গাছ বেশি আলো বাতাস পায় এবং সর্বোপরি উৎপাদন বাড়ে। এত সব সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সারিতে বীজ বোনা কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। সারিতে বীজ বুনতে হলে লাঙ্গলের ফলা বা অনুরূপ কিছু দিয়ে লাইন করে গর্ত করতে হয়, হাত দিয়ে ধীরে ধীরে সারিতে বীজ ফেলতে হয় এবং একটি চাপ দিয়ে লাইন করা গর্ত ঢেকে দিতে হয়। এ কাজগুলো করা কষ্টকর ও সময় সাপেক্ষ বলেই সারিতে বীজ বোনা ততটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। বর্তমানে পাওয়ার টিলার জমি চাষে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এসব পাওয়ার টিলার দিয়ে যাতে বীজ বোনা যায় সে জন্য পাওয়ার টিলার চালিত বীজবপন যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। বারি দুই ধরনের বীজবপন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। একটি জমি চাষ করার পর ব্যবহার করতে হয় (মডেল-১)। অপরটি চাষ বিহীন অবস্থায় ব্যবহার করা যায় (মডেল-২)। উভয় মডেলের বীজ বপন যন্ত্র দ্বারা গম, ভুট্টা, পাট, ধান, তৈলবীজ ও ডাল শস্য সারিতে বপন করা যায়।

বীজ বপন যন্ত্র (মডেল- ১)

মডেল-২ দ্বারা গম বীজ বপন করা হচ্ছে

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- যন্ত্রটি পাওয়ার টিলার চালিত।
- এ যন্ত্র বীজকে নির্দিষ্ট স্থানে ও সঠিক গভীরতায় সুষমভাবে বপন করে।
- বীজের মান ভাল হলে ভাল অঙ্কুরোদগম এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক চারাগাছ নিশ্চিত করা যায়।
- এটি ব্যবহার করে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে প্রায় ১০-৪০ শতাংশ বীজ কম লাগে এবং ফলনও ১০-১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

- ❀ সারিবদ্ধভাবে বীজ বপনের ফলে নিড়ানি যন্ত্র ব্যবহার করা যায়। ফলে আগাছা দমন, কীটনাশক প্রয়োগ সহ অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা করার জন্য প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে প্রায় ২৫ শতাংশ সময় ও খরচ কম লাগে।
- ❀ প্রশস্ততা : ৬০-১২০ সেমি।
- ❀ গভীরতা : ২-৪ সেমি (নিয়ন্ত্রণযোগ্য)
- ❀ গতিবেগ : ২-২.৫ কিমি/ঘণ্টা।
- ❀ দক্ষতা : ৭০ শতাংশ
- ❀ কার্যক্ষমতা : ০.১৪-০.২৫ হেক্টর/ঘণ্টা (২৮-৬০ শতাংশ/ঘণ্টা) (মডেল-১)।
  : ০.১২-০.২০ হেক্টর/ঘণ্টা (৩৬-৪৮ শতাংশ/ঘণ্টা) (মডেল-২)।
- ❀ মূল্য : ৪৫,০০০ টাকা (মডেল-১) (রোটারি বাদে) ও ৭৫,০০০ টাকা (মডেল-২)।

কার্যপ্রণালী

মডেল-১ বীজ বপন যন্ত্রটি ব্যবহার করার আগে জমি ভালভাবে চাষ করে মই দিয়ে সমান করে নিতে হয়। মডেল-১ বীজ বপন যন্ত্রের জন্য রোটাভেটরের প্রয়োজন নেই বলে এর লিভারটি নিউট্রাল অবস্থানে রেখে পাওয়ার টিলারের পিছনে নাট বোল্ট দিয়ে যন্ত্রটি লাগাতে হয়। মডেল-২ বীজ বপন যন্ত্রের জন্য রোটাভেটর খুলে যন্ত্রটি পাওয়ার টিলারের সঙ্গে সংযুক্ত করতে হয়। ফসল অনুযায়ী ফারো ওপেনারের সাহায্যে সারি থেকে সারির দূরত্ব ও বীজ গভীরতা ঠিক করে নিতে হয়। জমির এক প্রান্তে (উত্তর বা দক্ষিণ হলে ভাল হয়) পাওয়ার টিলার নিয়ে জমির জো ও বীজের ধরন অনুসারে চাষের গভীরতা ঠিক করে নিতে হয়। বীজ হার ঠিক করার জন্য নির্দিষ্ট ফসলের জন্য নির্ধারিত বীজ প্লেট ও পিনিয়ামে চেইন সংযুক্ত করে নিয়ে হয়। বীজ বপন যন্ত্রে পরিমাণমতো বীজ ঢেলে পাওয়ার টিলারের গিয়ার ২ নম্বরে রেখে (গতি ২ থেকে ২.৫ কিমি/ঘণ্টা) যন্ত্রটি চালানো শুরু করলে প্লাস্টিক টিউবের মধ্য দিয়ে সারিতে বীজ পড়তে থাকে। ঠিকমতো বীজ পড়ছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে। জমির শেষ মাথায় গিয়ে পাওয়ার টিলার ঘোরানোর সময় এর হাতলের সাহায্যে বপন যন্ত্রটি উঁচু করে ঘোরাতে হয় এবং পাশের সারিতে বীজ বোনা শুরু করা হয়। মিটারিং ডিভাইস ঠিকমতো ঘুরছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়।

বারি বেড প্লান্টার

বারি বেড প্লান্টার

আমাদের দেশে আলু, ভুট্টা, মরিচ, সব্জিসহ বিভিন্ন প্রকার ফসল বীজ-ফারো বা বেড-নালা তৈরি করে আবাদ করা হয়। বেড পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদন করলে বাতাস সহজেই গাছের শিকড়ের নিকট যেতে পারে। ফলে গাছ বাতাস থেকে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান গ্রহণ করতে পারে। বেড পদ্ধতিতে নালায় পানি সেচ দিলে সহজেই অল্প সময়ে অনেক জমিতে পানি সেচ দেওয়া যায়। এতে পানির পরিমাণ ও প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় কম লাগে। এই পদ্ধতিতে শুকনা বা রবি মৌসুমে পানি যেমন কম লাগে তেমনি বর্ষার সময় অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে নালা দিয়ে সহজেই পানি বেড় হয়ে যায়। ফসলের কোনো ক্ষতি করতে পারে না। আমাদের দেশের কৃষকের অনেক আগ থেকেই জন্মগতভাবে বেড-নালা পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। তাই আলু, ভুট্টা, সবজিসহ বিভিন্ন ফসল বেড-নালা পদ্ধতিতে আবাদ করে আসছে। প্রচলিত পদ্ধতিতে কোদাল ব্যবহার করে আলু, ভুট্টা, সব্জির জমিতে বেড তৈরি করে থাকে। কোদাল দিয়ে হাতে বেড তৈরি করা কষ্টকর, সময় সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল। কৃষকের কষ্টের বিষয়টি চিন্তা করে, ফসলের ফলন বৃদ্ধি ও উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে পাওয়ার টিলার চালিত বেড প্লান্টার উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ❀ বেডে ফসল ফলালে উৎপাদন খরচ কমে, মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে ও দুষণ মুক্ত পরিবেশ পাওয়া যায়।
- ❀ এই যন্ত্রের দ্বারা ১-২ চাষে বেড তৈরি, সার প্রয়োগ ও বীজ বপনের কাজ একই সঙ্গে করা যায়।

- বেড প্লান্টার দ্বারা গম, ভুট্টা, আলু, মুগ, তিলসহ বিভিন্ন প্রকার সব্জি বীজ সফলভাবে বপন করা সম্ভব।
- স্থায়ী বেডেও বীজ বপন করা যায়।
- বেডে ফসলের অবশিষ্টাংশ রেখেই শূন্য চাষে বীজ বপন করা যায়।
- স্থায়ী বেডে কেঁচো বাস করে বিধায় জমির উর্বরতা বাড়ে।
- স্থায়ী বেডে কয়েক বছর চাষ করলে জমিতে জৈব সারের পরিমাণ বাড়ে।
- বেডে ফসল করলে ইঁদুরের উৎপাত কমে।
- বেডে ফসল করলে সেচ খরচ ও সময় ২৫% কমে।
- বেডের উচ্চতা: ১২-১৫ সেমি।
- বেড থেকে বেডের মধ্যবর্তী নালা: ৩০ সেমি চওড়া।
- মাঠ দক্ষতা: ০.১১-০.১৫ হেক্টর/ঘণ্টা (২৭-৩৭ শতাংশ)।
- মূল্য: ৪৫,০০০ টাকা (পাওয়ার টিলার ছাড়া)।

কার্যপ্রণালী

যন্ত্রটি পাওয়ার টিলারের পেছনে চারটি নাট দ্বারা যুক্ত করতে হয়। চাকার শ্যাফ্টের সাথে স্প্রোকেট স্থাপন করে চাকার শ্যাফ্টের স্প্রোকেট ও মিটারিং শ্যাফ্টের মধ্যে চেইন দ্বারা সংযোগ দিতে হবে এবং বীজ হার ঠিক রাখতে হয়। বীজ হার ঠিক করার জন্য ফসলের জন্য নির্ধারিত প্লেট লাগাতে হয়। প্লেটের উপরের নাট খুলে সহজেই প্লেটকে পরিবর্তন করে নেয়া সম্ভব। বেড শ্যাপারের পরিবর্তনক্ষম অংশ নাড়াচাড়া করে ৫৬-৬০ সেমি এর কাঙ্ক্ষিত বেড সাইজ ঠিক করতে হবে। সাধারণত এইভাবে তৈরিকৃত বেডে গম, ধান, মুগ, তিল বাদামের ২ লাইনে ও ভুট্টার ১ লাইন করা যায়। সবগুলো নাট ঠিকমতো টাইট করে জো সম্পন্ন মাঠে যন্ত্রটিকে নিয়ে প্রথমে পাওয়ার টিলার চালু করতে হবে। চাষের গভীরতা নির্ধারক দণ্ডের ছিদ্র সমন্বয় করে নিতে হবে। অতঃপর রোটারিতে শক্তি সরবরাহ করতে হবে। চাকার গতি সঞ্চালনের পূর্বেই বীজের লিভারটি চালু করতে হবে। জমির এক প্রান্তে পাওয়ার টিলার নিন এবং বীজবপন যন্ত্রে পরিমাণ মতো বীজ ঢালুন। পাওয়ার টিলারের গিয়ার ২ নম্বরে রেখে (গতি ২ থেকে ২.৫ কিমি/ঘণ্টা) যন্ত্রটি চালানো হয় এবং প্লাস্টিক টিউবের মধ্য দিয়ে সারিতে ঠিকমতো বীজ পড়ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখতে হয়। জমির শেষ মাথায় গিয়ে পাওয়ার টিলার ঘোরানোর সময় এর হাতলের সাহায্যে বপন যন্ত্রটি উঁচু করে ঘোরাতে হয় এবং পাশের সারিতে বীজ বোনা শুরু করা হয়। বীজ প্লেট ঠিকমতো ঘুরছে কিনা সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। 'জো' সম্পন্ন অচাষকৃত জমিতে এক বারেই চাষ, বেড তৈরি ও বেডে বীজ বপন করা যায়। কিন্তু প্রথমে জমি তৈরি করে নিয়ে তারপর যন্ত্র দিয়ে বেড করলে বেডের উচ্চতা বেশি হয়। সবজি চাষের জন্য বেড তৈরীতে প্রথমে জমিতে এক চাষ দিয়ে নেয়া ভালো।

বারি স্ট্রিপ টিল প্লান্টার

বারি স্ট্রিপ টিল প্লান্টার

দেশের জনসংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে অথচ জমির পরিমাণ প্রতিদিনই কমে যাচ্ছে। এ বাড়তি জনসংখ্যার মুখে খাদ্য দিতে একমাত্র পতিত জমি ব্যবহার ছাড়া গতান্তর নাই। এ দেশের কৃষি পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট পতিত জমি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্ট্রিপ টিলেজ যন্ত্র তৈরি করেছেন। স্ট্রিপ টিলেজ পদ্ধতি একটি প্রকৃত সংরক্ষণশীল কৃষি পদ্ধতি (Conservation Agriculture)। এ পদ্ধতিতে সরাসরি বীজ বপন করা হয়। স্বাভাবিক পদ্ধতির মতো চাষ-মইয়ের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু অধিক কর্ষিত জমির রস দ্রুত উড়ে যায় তাই বৃষ্টি নির্ভর পরিবেশে যেখানে ফসল উৎপাদনের জমির প্রান্তিক আর্দ্রতা ও বৃষ্টির পানি গুরুত্বপূর্ণ সেখানে স্ট্রিপ টিলেজ একটি আদর্শ চাষ পদ্ধতি। সংরক্ষণশীল কৃষির উপযোগী যন্ত্র ব্যবহারে মাঝারী মানের মালচ ও নাড়া সংযোজিত ফসলের জমিতেও স্ট্রিপ টিলেজ পদ্ধতিতে বীজ বপন করা যায়।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- পূর্ববর্তী ফসলের খড় বা নাড়া থাকায় মাটির রস ধীরে ধীরে শুকায় যা ফসল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- শুধু মাত্র ফালি বা সরু চাষ হয় ফলে মাটিতে রস সংরক্ষণ করে এবং মাটির বুনট ঠিক রাখে।
- ফসল খরা সহনশীল করে তুলে। খরা প্রবণ এলাকায় এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী।
- পূর্ববর্তী ফসল কাটার পর মাটির অবশিষ্ট রসকে কাজে লাগিয়ে বীজ বপন কাজ করা যায়।
- একই সাথে বীজ ও সার প্রয়োগ করা যায় বলে সার ব্যবহারের কার্যকারী দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- গম, ভুট্টা এবং অন্যান্য ফসলের ফলন শতকরা ১৫-২০ ভাগ বৃদ্ধি পায়।
- প্রচলিত বীজ বপন পদ্ধতির চেয়ে মাঠ দক্ষতা শতকরা ১৯ ভাগ বাড়ে এবং জ্বালানী খরচ ২১ ভাগ কমে।
- স্ট্রিপ টিলেজ ৬০% বপন খরচ কমায়।
- কার্যক্ষমতা: প্রতি ঘণ্টায় ০.১২ হেক্টর (ঘণ্টায় ৩০ শতাংশ)।
- মূল্য: ৪৭,০০০ টাকা (পাওয়ার টিলার বাদে)।

কার্যপ্রণালী

স্ট্রিপ টিলেজ পদ্ধতিতে সরু স্ট্রিপ তৈরির জন্য বপন লাইনের সামনে যন্ত্রের ৪টি ফাল এমনভাবে সাজানো থাকে যে ২টি ফাল বাম থেকে ডানে এবং অপর ২টি ডান থেকে বামে মুখোমুখি থাকে। এতে করে ঘূর্ণায়মান ফাল মাটি কেটে স্ট্রিপ তৈরি করে এবং ঐ স্ট্রিপে ওপেনারের মাধ্যমে পরিমিত বীজ ও সার প্রয়োগ করে। পরবর্তীতে প্রেস হুইল স্ট্রিপের উপর দিয়ে হালকাভাবে চাপ দিয়ে গড়িয়ে যায় এবং বীজ ঢেকে দেয়। ক্ষেত্র বিশেষে বীজ ঢেকে দেয়ার জন্য প্রেস হুইলের পরিবর্তে প্রেস রোলার ব্যবহার করা হয়। স্ট্রিপ টিলেজ যন্ত্রটি একটি পাওয়ার টিলারের পিছনে সংযুক্ত থাকে। স্ট্রিপ টিলেজে ফসলের বীজ ও সার নির্দিষ্ট গভীরতায় পড়ে ফলে বীজের অঙ্কুরোদ্গম ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। দুই লাইনের মধ্যবর্তী অংশে জমি চাষ হয় না এবং নাড়া বা খড় স্বাভাবিক ভাবে থাকে। ফসলের প্রকার ও জমির রসের উপর ভিত্তি করে স্ট্রিপ টিলেজে গভীরতা কম বেশি হয়ে থাকে।

বারি জিরো টিল প্লান্টার

জিরো টিলেজ বলতে কোন জমিকে সম্পূর্ণ চাষ না করে মাটিকে প্রয়োজন অনুসারে ফারো ওপেনারের মাধ্যমে ২-৩ সেন্টিমিটার উন্মুক্ত করে বীজ এবং সার প্রয়োগ করে ফসল উৎপাদন করাকে বোঝায়। মাটিকে একাধিকবার চাষ না করার কারণে মাটির গুণগত মান বজায় থাকে এবং মাটিতে বিভিন্ন ধরনের উপকারী অণুজীবের বংশবৃদ্ধি ঘটে যা মাটিকে উর্বরা রাখতে সহায়তা করে। শূন্য চাষে মাটিতে যথেষ্ট রস বজায় থাকে যা বীজ গজানো থেকে প্রাথমিক গাছের বৃদ্ধিতে ঐ রস সহায়তা করে এবং অনেকাংশে প্রথম সেচের দরকার হয় না। এ দেশের কৃষি পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট জমির উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জিরো টিল প্লান্টার তৈরি করেছেন।

বারি জিরো টিল প্লান্টার

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- পূর্ববর্তী ফসলের খড় বা নাড়া থাকায় মাটির রস ধীরে ধীরে শুকায় যা ফসল বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।
- শুধুমাত্র সরু চাষ হয় ফলে মাটিতে রস সংরক্ষণ করে।
- ফসল খরা সহনশীল করে তুলে এবং খরাপ্রবণ এলাকায় এ পদ্ধতি অত্যন্ত কার্যকরী।
- পূর্ববর্তী ফসল কাটার পর মাটির অবশিষ্ট রসকে কাজে লাগিয়ে বপন কাজ করা যায়।

- একই সাথে বীজ ও সার প্রয়োগ করা যায় বলে সার ব্যবহারের কার্যকারী দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- গম, ভুট্টা, মুগ, মসুর, ছোলা এবং অন্যান্য ফসলের ফলন শতকরা ১০-১৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।
- প্রচলিত বীজ বপন পদ্ধতির চেয়ে মাঠ দক্ষতা শতকরা ১৯ ভাগ বাড়ে এবং জ্বালানী খরচ ২১ ভাগ কমে।
- জিরো টিলেজ ৬০% বপন খরচ কমায়।
- কার্যক্ষমতা: প্রতি ঘণ্টায় ০.১০ হেক্টর (ঘণ্টায় ২৫ শতাংশ)।
- মূল্য: ৩০,০০০ টাকা (পাওয়ার টিলার বাদে)।

কার্যপ্রণালী

পাওয়ার টিলারকে পাওয়ার ইউনিট হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পাওয়ার টিলারের পিছনে নাট-বোল্ট এর মাধ্যমে যন্ত্রটি সংযুক্ত করা হয়। বপন লাইনের সামনে বিশেষ ধরনের ফারো ওপেনার লাগানো থাকে। আমন ধান কাটার পর জমিতে রস থাকাবস্থায় ফারো ওপেনার মাধ্যমে প্রয়োজনানুসারে উন্মুক্ত করে সারিতে বীজ বপন, সার দেয়া ও বীজ ঢেকে দেয়ার কাজ একসঙ্গে এই যন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করা যায়। আগাছা বেশি থাকলে বপনের ২-৩ দিন পূর্বে রৌদ্র উজ্জ্বল দিনে রাউন্ড আপ আগাছানাশক, জমিতে ১০০ মিলি /১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে এই মাত্রায় স্প্রে করতে হবে। জিরো টিলেজ যন্ত্রের সাহায্যে দানাদার সার (ডিএপি, টিএসপি ইত্যাদি) ও বীজ একই সাথে বোনা যায়।

বারি সৌর পাম্প

বারি সৌর পাম্প

বর্তমানে বাংলাদেশে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ প্রায় শতকরা ৬৩ ভাগ। অবশিষ্ট শতকরা ৩৭ ভাগ জমি সেচ যন্ত্রের স্বল্পতা, জ্বালানী সংকট, বিদ্যুতের অভাব ইত্যাদি কারণে সেচের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। বোরো ধানে সেচের জন্য মোট উৎপাদনের প্রায় এক পঞ্চমাংশ বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৭ লক্ষ সেচ পাম্প রয়েছে, যার শতকরা ৮১ ভাগই ডিজেল চালিত। প্রতি বছর প্রায় ৮০ কোটি লিটার ডিজেল সেচ কাজে ব্যবহৃত হয়, যা কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে ভর্তুকির মাধ্যমে কৃষককের নিকট বিক্রয় করতে হয়। সেচ মৌসুমে গ্রামীণ এলাকায় কৃষককে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে জ্বালানী তেল ক্রয় করতে হয় এবং অনেক সময় জ্বালানী তেল দুষ্প্রাপ্য হয়ে যায়। গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দেশ হওয়ায় অবস্থানগত কারণে বাংলাদেশে সৌরশক্তির প্রাচুর্যতা রয়েছে। সৌর আলোক শক্তির মাত্রা প্রতিদিন প্রতি বর্গমিটারে ৪.০ থেকে ৬.৫ কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং প্রখর সূর্যালোক প্রতিদিন ৬-৯ ঘণ্টা এর মধ্যে উঠানামা করে। বর্তমানে সৌর কোষ (Photovoltaic cell) অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল হওয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতা কম। কিন্তু প্রযুক্তির অগ্রসরতায় এর মূল্য উল্লেখযোগ্য হারে কমছে। যেখানে বিদ্যুৎ সুবিধা নাই, সেখানকার একটা সুবিশাল অঞ্চল সেচের আওতায় আনা প্রয়োজন। এই এলাকাগুলোতে ভাল ফসল উৎপাদনের জন্য সৌর পাম্প ব্যবহার করা যেতে পারে। দেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সংকটে সেচ ব্যবস্থার সমস্যা সমাধানের জন্য সৌরচালিত সেচ পাম্প বিকল্প সেচ ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- বারি উদ্ভাবিত সৌর পাম্প ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সেচের জন্য উপযোগী।
- পাম্প দ্বারা সর্বোচ্চ ২৫ ফুট গভীরতা থেকে পানি তোলা যায়।
- পাম্প চালনায় কোন প্রকার তেল ও জ্বালানী লাগে না।
- পাম্প ৯০০ ওয়াট সোলার প্যানেল দ্বারা চালনা করা হয়।
- পাম্পে কোন ব্যাটারী লাগে না।
- রাতে বা আকাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকলে পাম্প চালনা করা যায় না।

পাইপের ব্যাস	: ৩৮ মিমি (১.৫ ইঞ্চি)
মোটরের শক্তি	: ৯০০ ওয়াট
মোটরের প্রকৃতি	: ডিসি
ঘূর্ণন গতি	: প্রতি মিনিটে ৩,০০০ বার
প্যানেল শক্তি	: ১০০০ ওয়াট
বিভব পার্থক্য	: ৪৮ ভোল্ট
গড় পানি নির্গমন ক্ষমতা	: প্রতি মিনিটে ১৮০ লিটার
সৌর পাম্পের মোট মূল্য	: ৭৫,০০০ টাকা

বারি এক্সিয়াল ফ্লো পাম্প

এক্সিয়াল ফ্লো পাম্প (এএফপি) এক ধরনের লো লিফ্‌ট পাম্প (এলএলপি) যা কম হেডে অধিক পানি উত্তোলনের উপযোগী। এটি ১৬ ফুট বা ৫ মিটার পর্যন্ত উচ্চতায় খাল-বিল বা খোলা জলাশয়ের পানি উঠাতে পারে। সমান ক্ষমতার এলএলপি'র তুলনায় এটি প্রায় ৩ গুণ পর্যন্ত পানি তুলতে পারে এবং জ্বালানী (ডিজেল) খরচ প্রায় অর্ধেক হয়। এক্সিয়াল ফ্লো পাম্প এক ধরনের প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তি যা সাধারণত ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডে ভূপৃষ্ঠস্থ পানি উত্তোলের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই অঞ্চলে যেখানে ভূ-উপরস্থ পানিকে ১-৩ মিটার উচ্চতায় সেচ দিতে হয় বা নিষ্কাশন করতে হয় অথবা ছোট থেকে বড় মাপের মৎস্য খামারের কাজে এ পাম্প ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তিন মিটারের চেয়ে নিচের উচ্চতায় এক্সিয়াল ফ্লো পাম্প পানি প্রবাহের ক্ষমতা ও জ্বালানী দক্ষতা সমআকারের সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের তুলনায় দুই থেকে তিনগুণ বেশি। এক্সিয়াল ফ্লো পাম্প দিয়ে পানি তোলা ও প্রবাহ করার জন্য এর ইমপেলার অবশ্যই পানির নিচে ডুবানো রাখতে হবে। এ পাম্পে প্রাইমিং এর প্রয়োজন হয় না। এক্সিয়াল ফ্লো পাম্পের খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এটি লম্বা ও পাম্প একটি ফাকা পাইপ যার ভিতর ঘূর্ণায়মান শ্যাফট রয়েছে। এই শ্যাফটগুলো প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের হতে পারে। কিছু পাম্প ৭.৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হতে পারে। জ্বালানী খরচ কমানো ও ভূপৃষ্ঠস্থ পানি দ্বারা সেচের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে বাংলাদেশে সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের বিপরীতে শক্তি ব্যবহারে দক্ষ। এক্সিয়াল ফ্লো পাম্প বোরো ধান ও অন্যান্য উচ্চমূল্যের ফসল উৎপাদনের জন্য বিকল্প হিসেবে পরিণত হচ্ছে।

বারি এক্সিয়াল ফ্লো পাম্প

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি উত্তোলনের জন্য উপযোগী ।
- পাঁচ মিটার গভীরতা থেকে পানি উত্তোলন করা যায়।
- চার মিটার বা কম উচ্চতায় সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের তুলনায় ৩০% বেশি পানি উত্তোলন হয় ও ৩০% জ্বালানী সাশ্রয়ী হয়।
- ছোট, মাঝারী ও বড় আকারের পাম্পের গড় পানি উত্তোলন ক্ষমতা (Discharge) প্রতি সেকেন্ডে যথাক্রমে ১৫, ২৬, ও ৪৫ লিটার।
- ছোট, মাঝারী ও বড় আকারের পাম্পের মূল্য (ইঞ্জিন ছাড়া) যথাক্রমে ১৫,০০০, ২০,০০০, ও ২৫,০০০ টাকা।
- বারি উদ্ভাবিত এক্সিয়াল ফ্লো পাম্প হাওড় ও দক্ষিণাঞ্চলে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি সেচের ও মাছ চাষের জন্য উপযোগী।

কার্যপ্রণালী

যে পুকুর বা খাল হতে পানি উঠাতে হবে, সেখানে পাম্প ও ইঞ্জিন নিতে হবে। এরপর পাম্পের জালিযুক্ত পানি প্রবেশ অংশ পানির ভিতর এমন ভাবে ডুবাতে হবে যাতে ইম্পেলারসহ সম্পূর্ণ জালি পানির মধ্যে ডুবে থাকে কিন্তু মাটি স্পর্শ না করে। পাম্পের নিম্নাংশ ও উপরাংশ বাঁশের খুটির সাথে এমনভাবে বাঁধতে হবে যাতে পাম্প চলাকালীন সময়ে কোন প্রকার নড়াচড়া করতে না পারে। এরপর পাম্পের ডেলিভারি প্রান্তের শ্যাফটের সাথে ৭৬ মিমি (৩") ব্যাসের পুলি লাগাতে হবে। পাম্প চালনার জন্য ইঞ্জিন পাম্পের সমান্তরালে শক্ত করে স্থাপন করতে হবে। উল্লেখ্য যে, ৭৬ মিমি (৩"), ১০২ মিমি (৪"), ও ১৫০ মিমি (৬") ব্যাসের মধ্যে যথাক্রমে ১০, ১২.৫ ও ১৪ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন ব্যবহার করতে হবে। ভি-বেল্টের দ্বারা পাম্পের সাথে ইঞ্জিনের কাপলিং করতে হবে। বেল্টের টেনশন টানটান হতে হবে যাতে বেল্টের স্লিপ কম হয়। যেখানে পানি তুলতে হবে সেই মাপের প্লাস্টিক বা ফিতা পাইপ পাম্পের ডেলিভারি পাইপের সংযোগ করত হবে। ইঞ্জিন চালুর পূর্বে ইঞ্জিনের জ্বালানী তেল ও পানি পরীক্ষা করতে হবে। এরপর ইঞ্জিন চালুর সাথে সাথেই পাম্প হতে সবেগে পানি প্রবাহিত হতে থাকবে। ইঞ্জিনের এক্সিলেটর কমিয়ে বা বড়িয়ে পাম্পের পানি প্রবাহের পরিমাণ কম বা বেশি করা যায়। তবে পাম্পের ঘূর্ণনের গতি প্রতি মিনিট ১৭০০-১৮০০ তে ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। এই পাম্পের সেন্ট্রিফিউগাল পাম্পের মত প্রাইমিং এর প্রয়োজন হয় না। কাজ শেষে পাম্প ও ইঞ্জিনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে পরিষ্কার করে শুকনা জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

বারি মোবাইল ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র

বর্তমানে দেশের অনেক এলাকায় ব্যাপকভাবে ভুট্টা চাষ করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা সম্প্রসারিত হবে। বারি শক্তিচালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র এদেশে ব্যাপক অবদান রাখছে। কিন্তু যন্ত্রটি টানার জন্য মাঝে মাঝে পাওয়ার টিলারের প্রয়োজন হয় এবং মাঠে নিয়ে তা সেট করাও কঠিন। এ অসুবিধাগুলো দূর করার জন্যই বারি মোবাইল ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে। বারি মোবাইল ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র দিয়ে কৃষকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এবং জমিতে বসিয়ে খুবই সহজে ভুট্টা মাড়াই করা সম্ভব। এ যন্ত্র দ্বারা সময় এবং খরচ উভয়ই সাশ্রয় হয়।

বারি মোবাইল ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- পাওয়ার টিলার চালিত ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র, পাওয়ার টিলারের অগ্রভাগে সংযুক্ত অবস্থায় পরিবহন ও ভুট্টা মাড়াই করা যায়।
- যন্ত্রটি পরিচালনা করা খুবই সহজ।
- এর মেরামত করার প্রয়োজনীয়তা কম।
- দুই জন শ্রমিক সহজেই যন্ত্রটি পরিচালনা করতে পারে।
- যন্ত্রটির মাড়াই খরচ তুলনামুলকভাবে কম।
- যন্ত্রটি খুবই সহজে পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে সহজে স্থানান্তর করা যায়।
- ইঞ্জিন/মোটর ভি-পুলি ও ভি-বেল্টের সাহায্যে মাড়াই সিলিন্ডার ঘোরানো হয়।
- যন্ত্রটির মূল্য ২০,০০০ টাকা এবং
- ইহা প্রতি ঘণ্টায় ১.৫- ২.০ টন ভুট্টা মাড়াই করতে পারে।

কার্যপ্রণালী

বারি মোবাইল ভুট্টা মাড়াই যন্ত্রটি একটি অত্যাধুনিক ভুট্টা মাড়াই যন্ত্র। এই যন্ত্রটি পাওয়ার টিলারের সম্মুখে নাট বোল্টের সাহায্যে স্থাপন করতে হয়। যন্ত্রটির বেইজ ফ্রেমের নিচে একটি নমনীয় স্ট্যান্ড থাকে যা মাড়াই যন্ত্রকে সমতল পজিশনে রাখতে সাহায্য করে। মাড়াই যন্ত্রটি টিলারের ইঞ্জিনের পুলির সাথে ভি-বেল্টের মাধ্যমে যুক্ত থাকে। পাওয়ার টিলার রাস্তায় চলন্ত অবস্থায় ইঞ্জিনের এক্সিলেটর টেনে প্রয়োজনীয় আরপিএম যন্ত্রে দেওয়া হয়। এবার মাড়াই যন্ত্রটিকে পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে সুবিধাজনক শুকনা ও উচু স্থানে স্থাপন করতে হবে। মাড়াই শুরু করার আগে শুকনো ভুট্টার মোচাগুলো যন্ত্রের কাছে একস্থানে জমা করতে হবে। এ অবস্থায় ঝুড়িতে করে ভুট্টার মোচা হপারের মাধ্যমে ফিডিং সিলিন্ডারে প্রবেশ করাতে হবে। ভুট্টার দানা মোচা থেকে পৃথক হয়ে নিচে পড়ে যাবে এবং অবশিষ্টাংশ আউটলেট টিউব দ্বারা নিক্ষিপ্ত হবে। যন্ত্রের সামনে জমাকৃত ভুট্টার দানা কিছুক্ষণ পরপর বস্তায় ভরতে হবে।

বারি গার্ডেন বুম স্প্রেয়ার

সঠিক সময়ে পোকামাকড় দমন, রোগবালাই আক্রমণ ও আগাছা দমন না করলে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পায়। অধিকাংশ উন্নত দেশে খাদ্যের গুণগতমান ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ফসলকে রোগবালাই ও পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য বালাইনাশক ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে কৃষকেরা উচ্চ মূল্য পাওয়ায়, ঝুঁকি কম হওয়ায়, বাজারজাত সহজীকরণের দরুণ মাঠ ফসলের তুলনায় উদ্যান ফসল উৎপাদনের প্রতি আগ্রহী। বাংলাদেশে বর্তমানে বালাইনাশক স্প্রে করার জন্য প্রধানত নেপসেক স্প্রেয়ার, পাওয়ার ডাস্টার এবং ফুট পাম্প স্প্রেয়ার ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ স্প্রেয়ারই ত্রুটিপূর্ণ নকশা ও উপাদান দিয়ে তৈরি। ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রপাতি ও বালাইনাশক প্রয়োগের ভুল পদ্ধতির কারণে প্রয়োগকৃত বালাইনাশকের ৫০-৮০% নষ্ট হয়ে যায়। তারই প্রেক্ষিতে উদ্যান ফসলে সঠিক পদ্ধতিতে, পরিমিত উপায়ে এবং অল্প খরচে পোকামাকড়, রোগবালাই ও আগাছা দমনের জন্য বিএআরআই উদ্ভাবিত বুম স্প্রেয়ার খুবই কার্যকরী যা তিন চাকার রিক্সা ভ্যানে সংযোগ করায় চলাচল সহজসাধ্য হয়েছে। এ বুম স্প্রেয়ার দ্বারা আম, লিচু গাছে বালাইনাশক স্প্রে করা যায়।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

বারি গার্ডেন বুম স্প্রেয়ার

- এর মাধ্যমে রাসায়নিক বালাইনাশক ক্ষুদ্র আয়তনে তরল আকারে খুব দক্ষতার সাথে স্প্রে করা হয় ।
- বুম স্প্রেয়ারের মাধ্যমে অল্প পরিমাণ কীটনাশক সমভাবে ফলবাগানে স্প্রে করা সম্ভব।
- এতে নির্দিষ্ট মাপের ছিদ্রযুক্ত নজেল আছে যা লম্বা গাছে স্প্রে করতে সহায়তা করে।
- এর প্রেসার এ সমতা রয়েছে।
- এটা জোরে ও এলোমেলো বাতাস প্রবাহিত হলে সমস্যা হয় না।
- একটা স্বচ্ছ প্লাস্টিক ট্যাংকের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে ট্যাংকের ভিতর বালাইনাশকের লেভেল পর্যবেক্ষণ করা যায়।
- সমস্ত এসেম্বলি একটি রিক্সা ভ্যানে চালকের সিটের পিছনে লাগানো থাকে।
- বাগানে বুম স্প্রেয়ার চালানোর জন্য প্রতিদিন ৫৯৫ টাকা খরচ হয় যা ফুট পাম্প স্প্রেয়ারে ১,০২৯ টাকা ।
- প্রতি হেক্টর জমিতে বুম স্প্রেয়ার দিয়ে বালাইনাশক প্রয়োগে সময় লাগে মাত্র তিন ঘণ্টা যা ফুট পাম্প স্প্রেয়ারে লাগে ১০ ঘণ্টা। অর্থাৎ তিনগুণ সময় সাশ্রয় হয়।
- মূল্য: ৩০,০০০ টাকা।

কার্যপ্রণালী

বারি গার্ডেন বুম স্প্রেয়ার একটি স্বল্প মূল্যের পাওয়ার স্প্রেয়ার। স্প্রেয়ারটির পাম্প, নজেল, বালাইনাশক ট্যাংক একটি রিক্সাভ্যানের উপর স্থাপিত। যে বাগানে বা গাছে বালাইনাশক স্প্রে করতে চান সেখানে স্প্রেয়ারটি সমতল ও শুকনা জায়গায় স্থাপন করুন। বুম নজেল গাছের Canopy থেকে ২/৩ ফুট পরে স্থাপন করুন। রিক্সাভ্যানের উপর স্থাপিত ট্যাংকে পরিমাণমতো বালাইনাশক মিশ্রিত করে ট্যাংকে ভর্তি করুন। এরপর আপনি কি পরিমাণ স্প্রে করতে চান সেই অনুপাতে বুম নজল সেট করুন। আপনি যদি বালাইনাশক মিস্ট আকারে স্প্রে করতে চান তাহলে যন্ত্রটি নজলের নিকটবর্তী পয়েন্টে স্থাপন করুন। এমনিভাবে যদি স্প্রে ফোঁটা থেকে পানির মতো স্প্রে করতে চান তাহলে লিভারটি নিচের দিকে পর্যায়ক্রমে সেট করুন। এরপর ইঞ্জিনটি চালু করুন। ইঞ্জিন চালু করার পূর্বে হাইপ্রেসার নবটি চালু (On) অবস্থায় রাখুন। তাহলে ইঞ্জিন চালু করতে সহজ হবে। ইঞ্জিন চালু হওয়ার পর হাইপ্রেসার নবটি বন্ধ রাখুন। এবার বুমটি যে দণ্ডে লাগানো আছে সে দণ্ডটি উপরের দিকে উঠিয়ে গাছের নিকট নিতে হবে। হাইপ্রেসার নবটি অন করে সুবিধামতো স্প্রে করতে থাকুন। বুমটি যদি ভূমির বরাবর রাখতে চান তাহলে হাইপ্রেসার পাইপটি ঢিলা করে দণ্ডটির সাথে বেধে নিন। আর যদি ধীরে ধীরে বুমটি উলম্ব/খাড়া করতে চান তাহলে হাইস্প্রেসার পাইপটি নিচের দিকে টেনে

দণ্ডটির সাথে বেধে নিন। এইভাবে স্প্রে দণ্ডটি ধরে ঘুরে ঘুরে উঁচু নিচু করে স্প্রে সুষমভাবে করুন। স্প্রে কাজ শেষে দণ্ডটি সুবিধামতো জায়গায় রেখে ইঞ্জিনটি বন্ধ করুন। কাজ শেষে সমস্ত কিছু পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে রাখুন। মনে রাখতে হবে স্প্রে শুরু করার আগে আপনাকে স্প্রে ইউনিফরম পড়তে হবে এবং মুখোশ পড়ে নিতে হবে যা স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ।

বারি আলু রোপণ যন্ত্র

বাংলাদেশের মাটি ও আবহাওয়া আলু চাষের উপযোগী। উত্তরাঞ্চলের প্রায় সব জেলা ও মুন্সিগঞ্জে আলু বেশি চাষ হয়। প্রতি বছর প্রায় ৪.৭৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। আলু চাষ পদ্ধতি বিশেষ করে আলু রোপণ শ্রমিক নির্ভরশীল, সময় সাপেক্ষে এবং ব্যয়বহুল পদ্ধতি। গ্রাম এলাকায় কৃষি শ্রমিক দিন দিন হ্রাস পাওয়ার ফলে আলু রোপণ মৌসুমে কৃষক শ্রমিকের অভাবে সময়মতো আলু রোপণে ব্যর্থ হয়। অথচ কাঙ্ক্ষিত ফলন পাওয়ার জন্য সঠিক সময়ে আলু লাগানো একটি পূর্বশর্ত। পাওয়ার টিলার বাংলাদেশের কৃষিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এ পাওয়ার টিলারকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট আলু রোপণ যন্ত্র তৈরি করেছে যা ছোট আকারে এবং সহজে ব্যবহার করা যায়।

বারি আলু রোপণ যন্ত্র

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- যন্ত্রটি পাওয়ার টিলার চালিত।
- একসাথে মাটি কর্ষণ, নির্ধারিত দূরত্বে বীজ স্থাপন, আলু বীজ ঢেকে দেওয়া এবং বেড তৈরি করে।
- একসারিতে বীজ রোপণ করে যেখানে সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং বীজ থেকে বীজের দূরত্ব ২০-২৫ সেমি বজায় রাখা যায়।
- কার্যক্ষমতা- ০.০১ হেক্টর/ঘণ্টা (২.৫ শতাংশ)।
- যন্ত্রটি উচ্চ মাত্রার শ্রম ও অর্থ সাশ্রয়ী (৯৪%)।
- মূল্য- ৪০,০০০ টাকা (ইঞ্জিন ছাড়া)।

কার্যপ্রণালী

পাওয়ার টিলারের ঘূর্ণায়মান ফাল পূণর্বিন্যাস করে ২৪ টি ফাল সংযোগ করা হয়েছে। যার ১২ টি ফাল বাম থেকে ডানে এবং ১২ টি ফাল ডান থেকে বামে মুখ করে সাজানো থাকে। ঘুর্ণায়মান ফাল জমি চাষ করে ফারো তৈরি করে। মিটারিং ডিভাইস একটা করে আলু তোলে নিদিষ্ট দূরে স্থাপন করে, বেড মেকার বেড তৈরি ও ঐ আলু বীজ ঢেকে দেয়। ইহা এক সঙ্গে আলু রোপণ এবং বেড তৈরি করে।

বারি আলু উত্তোলন যন্ত্র

বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভূতাত্ত্বিক সমস্যার কারণে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে বাংলাদেশ অনেক স্বল্প উন্নত দেশের চাইতেও অনেক পিছিয়ে আছে। গ্রামাঞ্চলে মৌসুমী ফসল উত্তোলন কালে ভয়াবহ শ্রমিক স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে আলু উত্তোলন অত্যন্ত ধীর, সময়সাপেক্ষ ও খরচ বহুল প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতিতে প্রথমে দেশীয় লাঙ্গল দ্বারা আলুর বেড উন্মুক্ত করা হয় এবং আলুকে হাতের সাহায্যে মাটি থেকে তোলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় বিঘা প্রতি (৩৩ শতাংশ) প্রায় আট জন শ্রমিক প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, এ পদ্ধতিতে বিবেচনাযোগ্য পরিমাণ (৮-৯%) আলু মাটির অভ্যন্তরেই রয়ে যায় যা কৃষকের আর্থিক ক্ষতি বৃদ্ধি করে। এ সমস্যা সমাধানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ আলু উত্তোলনের যান্ত্রিক সমাধানের উদ্দেশ্য ট্রাক্টর উপবিষ্ট কিছু সংখ্যক ভারি ও ব্যয়বহুল যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে। বাংলাদেশের কৃষিতে ট্রাক্টর উপবিষ্ট আলু উত্তোলন যন্ত্র ছোট খণ্ড জমি ও কৃষি জোট প্রধান সমস্যা। এছাড়াও দেশের বেশির ভাগ কৃষকের এ সকল উচ্চ ক্রয় মূল্যের ব্যয়বহুল ভারী যন্ত্র ক্রয়ের সক্ষমতা নেই। তাই ট্রাক্টর

বারি আলু উত্তোলন যন্ত্র

উপবিষ্ট আলু উত্তোলন যন্ত্র এ দেশের কৃষির অনূকুল নয়। সুতরাং আমাদের কৃষকদের প্রয়োজন স্বল্প মূল্যের আলু উত্তোলন যন্ত্র যা পাওয়ার টিলার দ্বারা চালানো সম্ভব। যা আলু সহজে উত্তোলন করতে পারে, শ্রমিক নির্ভরশীলতা কমায় ও মাটি থেকে আলুর সর্বাধিক উত্তোলন সু-নিশ্চিত করে।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- যন্ত্রটি পাওয়ার টিলার চালিত।
- প্রচলিত আলু উত্তোলের চেয়ে প্রায় ৬৫% শ্রমিক ও ৫১% খরচ সাশ্রয়ী।
- আলুর বাহ্যিক ক্ষতি ১.৫% এর কম, মাটির নিচে আলু থাকে না।
- কার্যক্ষমতা: ০.১২ হেক্টর/ঘণ্টা (৩০ শতাংশ)।
- মূল্য- ৬০,০০০ টাকা (পাওয়ার টিলার ছাড়া)।

কার্যপ্রণালী

বারি উদ্ভাবিত আলু উত্তোলন যন্ত্র পাওয়ার টিলারের সাথে সংযুক্ত হয়ে আলুকে মাটির গভীর থেকে উপড়িয়ে মাটির পৃষ্ঠে উন্মুক্ত করে। সার্বিকভাবে লম্বায়, প্রশস্ততায় ও উচ্চতায় এ যন্ত্রের মাপ ক্রমান্বয়ে, ৯০০ মিমি, ৮৫০ মিমি ও ৮৫০ মিমি। ফ্লাট আয়রন কলাম ব্লেডের উপর উলম্বভাবে ঝালাই করা থাকে যা মাটির সাথে ২০ কোণে আনত থাকে। ব্লেডটি ৫৪০ মিমি লম্বা, ৩২৫ মিমি প্রশস্ত ও ধারালো অংশটি সামনের দিকে ৬ মিমি আগানো থাকে। যন্ত্রের পেছন দিকে নিচে ৫০ × ৫০× ৬ মিমি এর একটি লোহা (এ্যাঙ্গেল আয়রন) লাগানো থাকে যা যন্ত্রটির বেকে যাওয়ার বিরুদ্ধে শক্তিশালী করে। সিঙ্গেল রিজ ওপেনিং ডিভাইসকে বোল্ট দ্বারা লাগানো হয় যথাক্রমে ৩১০ বা ২১০ মিমি দূরত্বে। কনভেয়ার চেইনের সামনে একটি উচ্চ মাত্রার কার্বন সম্বলিত স্টিল এর বেলচা বোল্ট দ্বারা লাগানো থাকে। যন্ত্রের কার্যপদ্ধতিতে রিজ কাটার ব্লেড বেডের নিচে রিজের অভ্যন্তরে আলু জন্মানোর স্থানে প্রবেশ করে রিজকে ফালিতে বিভক্ত করে। বিভক্তিকৃত রিজ কন্দাল সহকারে দ্রুতগামী মইয়ের কনভেয়ার বেল্টের সহিত বাইরে বের হয়ে আসে ও বেশিরভাগ মাটির চাকতি ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায় এবং গুঁড়ো হওয়া মাটির চাকতি কনভেয়ার বেল্ট স্টিকের ফাকের মাঝে পড়তে থাকে ফলে আলু মাটি থেকে আলাদা হয়ে যায়। যন্ত্রটি আল্‌গা হওয়া আলুকে যন্ত্রের পেছনে নরম মাটিতে ছুড়ে ফেলে।

বারি ফল শোধন যন্ত্র

বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে ফল উৎপন্ন হয়। প্রধান ফলের মধ্যে আম, কলা, পেপে, পেঁয়ারা, কাঁঠাল ও আনারস ইত্যাদি রয়েছে। এ ফলগুলোর জীবনকাল খুব কম ও উচ্চ পচনশীল। যেমন আম ও কলা এ্যান্থ্রাকনোস রোগের মাধ্যমে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। আম ৭/৮ দিনের বেশি স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা যায় না। তদ্রুপ কলাও ৬/৭ দিনের বেশি রাখা যায় না। আমাদের দেশে ফলের সংগ্রহোত্তর অপচয় ২০-৩০%। ফলে প্রতি বছর বিরাট অংশের টাকার ফল অপচয় হচ্ছে। এ অপচয় রোধে জীবাণুনাশক ব্যবহার করা হয় যা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর ও পরিবেশ দূষণ করে। এদের জীবনকাল বাড়ানোর ও অপচয় কমানোর জন্য রাসায়নিক দ্রব্য ছাড়া গরম পানিতে শোধন করে উক্ত উদ্দেশ্য সম্পন্ন করা যায়। এ লক্ষ্যে বিএআরআই এর এফএমপিই বিভাগ ফল শোধন যন্ত্র উদ্ভাবন করেছে।

প্রধান বৈশিষ্ট্য

- মডেল ১ যন্ত্রে ২ কিলোওয়াটারের ১০টি বৈদ্যুতিক ওয়াটার হিটারের মাধ্যমে পানিকে গরম করা হয়।
- মডেল ২ যন্ত্রে ২ কিলোওয়াটারের ৬ টি বৈদ্যুতিক ওয়াটার হিটারের মাধ্যমে পানিকে গরম করা হয়।
- তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য ডিজিটাল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা হয়।
- ফলভর্তি প্লাস্টিক ক্রেট বহনের জন্য মোটরচালিত কনভেয়ার রোলার ব্যবহার করা হয়।
- যন্ত্র চালানোর জন্য ৪ (চার) জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।
- যন্ত্রটি দ্বারা আমকে সুষমভাবে ৫৩ থেকে ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৫ থেকে ৭ মিনিট ডুবিয়ে শোধন করা হয়।
- যন্ত্রটি দ্বারা কলাকে সুষমভাবে ৫৩ থেকে ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৫ থেকে ৯ মিনিট ডুবিয়ে শোধন করা হয়।
- শোধনকৃত আম ৭-৮ দিনের পরিবর্তে ১০-১২ দিন পর্যন্ত টাট্‌কা থাকে এবং আমের গায়ের রং উজ্জ্বল হয়।
- শোধনকৃত কলাকে ৬-৭ দিনের পরিবর্তে ৮-১০ দিন পর্যন্ত টাট্‌কা থাকে এবং কলা গায়ের রং উজ্জ্বল হয়।
- যন্ত্রটি পরিচালনা করা খুবই সহজ।
- উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়ায় প্রতি কেজির শোধন খরচ খুবই কম।

কার্যক্ষমতাঃ

আমের জন্য : ১০০০ কেজি/ঘণ্টা (বড়)
: ৫০০ কেজি/ঘণ্টা (ছোট)
কলার জন্য : ৬০০ কেজি/ঘণ্টা (বড়)
: ৩০০ কেজি/ঘণ্টা (ছোট)
মূল্য : ২,৫০,০০০ টাকা (বড়)
: ১,৭০,০০০ টাকা (ছোট)

বারি ফল শোধন যন্ত্র

শোধন খরচ

আমের জন্য : ০.৬০ টাকা/কেজি (বড়), ০.৮৩ টাকা/কেজি (ছোট)
কলার জন্য : ০.৭০ টাকা/কেজি (বড়), ০.৯০ টাকা/কেজি (ছোট)

কার্যপ্রণালী

পরিষ্কার পানি দিয়ে চৌবাচ্চাটি এমনভাবে পূর্ণ করুন যেন চৌবাচ্চার উপর থেকে ১০ সেন্টিমিটার খালি থাকে। হিটারগুলো বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে প্যানেল বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত করুন। পানির তাপমাত্রা কাঙ্খিত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বজায় রাখার জন্য তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক নব ঘুরিয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সেট করুন। বৈদ্যুতিক প্যানেল বোর্ডের সাহায্যে হিটারগুলো চালু করুন। দুই থেকে তিন ঘণ্টা পর পানি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ওঠে। রোলার চালানোর জন্য মোটর চালু করুন। এবার জলাধারের এক প্রান্ত থেকে ফলভর্তি প্লাস্টিকের ঝুড়ি পানির মধ্য দিয়ে রোলারের উপর বসিয়ে দিন। ঝুড়িটি সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের অন্য প্রান্তের দিকে চলা শুরু করবে। পুনরায় ফল ভর্তি ঝুড়ি রোলারের উপর বসিয়ে দিন। এভাবে অনবরত ফল ভর্তি ঝুড়ি রোলারের উপর বসাতে থাকুন। অন্য প্রান্তে পৌঁছার পর ঝুড়ি পানি থেকে তুলে ফল শুকানোর জন্য রাখা প্লাস্টিক শিটের উপর ছড়িয়ে দিন। দ্রুত ফল শুকানোর জন্য বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করা যেতে পারে। শুকানোর পর যথাযথ পদ্ধতিতে ফল প্যাকিং করুন।

বারি আলু গ্রেডিং যন্ত্র

বাণিজ্যিকভাবে এবং কৃষক পর্যায়ে বীজ সংরক্ষণ ও বাজারে বিক্রয়ের জন্য বিভিন্ন সাইজে আলু ভাগ করতে হয়। বর্তমানে আলু গ্রেডিং এর কাজটি কোল্ডস্টোরের শ্রমিক ও কৃষকগণ হাতের সাহায্যে করে থাকেন। এর জন্য প্রচুর শ্রমিক লাগে এবং অনেক সময় ব্যয় হয়। সেজন্য গ্রেডিং এর কাজে খরচ পড়ে অনেক বেশি। কম খরচে, অল্প সময়ে আলু বিভিন্ন সাইজে ভাগ করার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক শক্তিচালিত আলু গ্রেডিং যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত লোহার সামগ্রী দিয়ে এ যন্ত্রটি তৈরি করা যায়।
- যন্ত্রটি চালানোর জন্য ৩ জন লোকের দরকার হয়।
- স্বল্প সময়ে ও কম খরচে আলুকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায়।
- ভাগ করা আলু সরাসরি বস্তায় জমা করা যায়।
- যন্ত্রটি চারটি চাকার উপর বসান থাকে যাতে সহজে স্থানান্তর করা যায়।
- কার্যক্ষমতা : ১.৩ টন/ঘণ্টা।
- মূল্য : ৪০,০০০ টাকা (মোটরসহ)।

বারি আলু গ্রেডিং যন্ত্র

কার্যপ্রণালী

আলু গ্রেডিং যন্ত্রটি একটি সমতল স্থানে এমনভাবে স্থাপন করুন যেন যন্ত্রটি চালু করলে নড়াচড়া না করতে পারে। যন্ত্রটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বলে একজন লোক শুধু হপারে আলু ঢালার জন্য প্রয়োজন হয়, বাকি দু'জন বস্তায় আলু ভরা, সরানো এবং চালুনির উপর আটকে পড়া আলু সরিয়ে দেয়ার জন্য প্রয়োজন হয়। ইঞ্জিন বা মোটর চালু করুন। সিলিন্ডারটি ঘুরতে শুরু করবে। এবার হপারে আলু ঢেলে দিন। ছোট আকারের (২৮ মিলিমিটারের ব্যাসের) আলু সিলিন্ডারের প্রথম অংশ দিয়ে বের হয়ে গড়িয়ে নেমে বস্তার মধ্যে পড়বে। তার চেয়ে বড় আলুগুলো (২৮-৪০ মিমি) দ্বিতীয় অংশে চলে যাবে এবং বের হয়ে গড়িয়ে নেমে বস্তার মধ্যে পড়বে। বড় আকারের (৪০ মিলিমিটারের বেশি ব্যাসের) আলু সিলিন্ডারের ভিতর গড়িয়ে গিয়ে শেষ নালা দিয়ে বস্তার মধ্যে পড়বে। এভাবে সাইজ অনুযায়ী আলু ৩ ভাগে ভাগ হয়ে যাবে।

বারি মূলজাতীয় সবজি ধৌতকরণ যন্ত্র

বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৩০ লক্ষ টন সবজি উৎপাদন হয়। উৎপাদনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিশ্বের তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। এখন বাণিজ্যিকভাবে সবজি উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে সারা বছর প্রায় সব ধরনের সবজি বাজারে পাওয়া যায়। বর্তমানে বিদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সবজি রপ্তানি করা হয়। গাজর বছরে উৎপাদন হয় প্রায় ১২৯৭৪ মেট্রিক টন। প্রচলিত পদ্ধতিতে কৃষকগণ কায়িক পরিশ্রমসহ পা-দিয়ে গাজর ধুয়ে থাকেন যা দৃষ্টিকটু ও অস্বাস্থ্যকর। এই পদ্ধতিতে গাজর যেভাবে ধোয়া হয় তাতে সময় ও অর্থ ও কায়িক শ্রম বেশি লাগে। বর্তমানে শ্রমিক সংকট। এইসব বিষয়ে বিবেচনা করে বিএআরআই এর এফএমপিই বিভাগ যন্ত্রটি স্থানীয় কাঁচামাল দিয়ে যন্ত্রটি তৈরি করে। এই যন্ত্রের মাধ্যমে স্বল্প সময়ে, অল্প খরচে ও কম পরিশ্রমে গাজর ধোয়া যায়। যার ফলে ধূলাবালি মুক্ত নিরাপদ, টাটকা সবজি ভোক্তাগণ খেতে পারবেন এবং কৃষক ও ব্যবসায়ীগণ পাশাপাশি ভাড়া খাটিয়ে আর্থিক লাভবান হতে পারবেন এমনকি যুবক/মহিলাদের নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে।

যন্ত্রটির সুবিধাসমূহ

- শাকসবজি ধোয়ার ফলে সবজির গায়ে লেগে থাকা ময়লা, ধুলাবালি, জীবাণু দূরীভূত হয় এমনকি E-coli ও Salmonella দূর হয়।
- যন্ত্র দুইটি একটি ২ অশ্বশক্তির ইলেকট্রিক মোটর ও অন্যটি ৪.৫ অশ্বশক্তির ইঞ্জিন দ্বারা চালনা করা হয়।
- প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ৬৭% অর্থ সাশ্রয় হয়।
- প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় সময় বাঁচে ৪০%।
- প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় কষ্ট লাঘব হয়।
- প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় শ্রমিক সাশ্রয় হয় ৬৭%।
- যন্ত্র দিয়ে প্রতি ব্যাচে ১২০ কেজি (বড়), ২৫ কেজি (ছোট) ধোয়া যায় যাতে সময় লাগে মাত্র ৫-৬ মিনিট।
- যন্ত্রটির মূল্য: ২,০০,০০০ টাকা (বড়), ১,০০,০০০ টাকা (ছোট)।

বারি মূলজাতীয় সবজি ধৌতকরণ যন্ত্র

কার্যপ্রণালী

যন্ত্র সমতল স্থানে এমনভাবে স্থাপন করুন যেন যন্ত্রটি চালু করলে নড়াচড়া না করতে পারে। মোটর চালিত যন্ত্রটি যেখানে বিদ্যুৎ লাইন ও পানির ব্যবস্থা আছে সেই জায়গায় স্থাপন করুন। যন্ত্রটি চালু করার পূর্বে বিয়ারিং ঠিক আছে কিনা, চেইন-স্প্রোকেট সংযোগ ঠিক আছে কিনা, বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ সঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করে নিন। এরপর পানির ট্যাঙ্কে পানি ভর্তি করে নিন। চালানের পূর্বে আরেকটি কাজ করতে হবে, মোটর ও পাম্প চালু করে দেখতে হবে রোলারগুলো চলে কিনা, পানি স্প্রে ঠিকমতো হয় কিনা। ডিজেল ইঞ্জিন চালিত যন্ত্রের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনের ডিজেল, মবিল ও পানি চেক করে নিতে হবে। বেল্ট-পুলি ঠিকমতো টাইট আছে কিনা এবং নাট-বোল্ট টাইট আছে কিনা পরীক্ষা করে নিতে হবে। উভয় যন্ত্রের ক্ষেত্রে, ইঞ্জিন/মোটর চালু করে মাঠ থেকে ধূলাবালি ও ময়লাযুক্ত গাজর ঘূর্ণায়মান রোলারের উপর পরিমাণমতো গাজর ঢেলে দিতে হবে। কিছুক্ষণ ঘূর্ণনের পর আস্তে আস্তে পরিমাণমতো পানি ঢালতে থাকুন। আপনার চাহিদামতো পরিষ্কার হলে পানি বন্ধ করে মেশিন চালু অবস্থায় মেশিনের ঢাকনা খুলে দিলে অধিকাংশ গাজর আপনা আপনি বের হয়ে যাবে। মেশিন বন্ধ করে বাকি গাজর হাত দিয়ে সরিয়ে বের করে নিতে হবে। আবার মেশিন চালু করে মাঠ থেকে সংগ্রহকৃত গাজর মেশিনে ঢেলে দিন। এভাবে যন্ত্রটি পরিচালনা করতে হবে।

বারি নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ানো যন্ত্র

নারিকেল বাংলাদেশের খুব সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ফল। ইহা উপকূলীয় অঞ্চলে অধিক হারে উৎপাদিত হয়। সাধারণত গ্রামাঞ্চলে দা এর সাহায্যে, ধারালো লোহা অথবা সাঁড়াশির সাহায্যে নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ানো হয় যা সময় সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। এই কাজের জন্য দক্ষ শ্রমিকেরও প্রয়োজন। ফলে সকল আকারের ও স্বল্প সময়ে অধিক হারে নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ানোর জন্য শক্তিচালিত নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ানো যন্ত্রের প্রয়োজন। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ানোর যন্ত্রের বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো ।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- যন্ত্রটি দিয়ে সহজে ও দ্রুত সকল আকারের নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ানো যায়।
- যন্ত্রটি স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত লৌহ সামগ্রী দিয়ে স্থানীয় প্রকৌশলকারখানায় তৈরি করা যায়।
- এই যন্ত্র দিয়ে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় দ্বিগুন পরিমাণ নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ানো যায়।
- যন্ত্রটি প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় ৫৭% খরচ এবং ৫০% সময় সাশ্রয় হয়।
- যন্ত্রটি ২.২ কিলোওয়াট বৈদ্যুতিক মোটর দিয়ে পরিচালিত হয়।
- যন্ত্রটির কার্যক্ষমতাঃ প্রতি ঘণ্টায় ৩০০ টি নারিকেল।
- যন্ত্রটির মূল্য: ৭০,০০০ টাকা।
- একশত নারিকেলের খোসা ছাড়াতে খরচ হয় ৪০ টাকা।
- বাণিজ্যিকভাবে ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত কৃষক এই যন্ত্র ব্যবহার করে সময় ও অর্থ বাঁচাতে পারবে।

বারি উদ্ভাবিত নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ানো যন্ত্র দিয়ে নারিকেলের ছোবড়া ছাড়ানো হচ্ছে

কার্যপ্রণালী

যন্ত্রটিকে একটি সমতল, খোলা ও ছায়াযুক্ত স্থানে স্থাপন করতে হবে। বৈদ্যুতিক মোটরকে অন-অফ সুইচের মাধ্যমে চালু করে যন্ত্রটিকে চালনা করতে হবে। অতঃপর চালককে একের পর এক নারিকেল দুই রোলারের মাঝে দিতে হবে এবং সাথে সাথে যন্ত্রের উপরের ঢাকনাকে লিভারের মাধ্যমে নারিকেলের উপর চাপ দিয়ে ধরতে হবে। রোলারের বিপরীতমুখী ঘূর্ণনের ফলে নারিকেলের ছোবড়া সহজেই ছাড়ানো যায়। নারিকেল ও ছোবড়াগুলো নির্গমন পথ দিয়ে বের হয়ে যায়।

বারি মোবাইল তেল নিষ্কাশন যন্ত্র

বাংলাদেশে কয়েক দশক ধরে ভোজ্যতেলের ঘাটতি রয়েছে। মোট ভোজ্যতেলের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশে উৎপন্ন তৈলবীজ (সরিষা, তিল, সূর্যমুখী, চীনাবাদাম, তিসি ইত্যাদি) দ্বারা শতকরা ৩০ ভাগ চাহিদা পূরণ করা হয়ে থাকে। স্বল্প মেয়াদী ও উচ্চ ফলনশীল তৈলবীজ ফসলের প্রচলের ফলে বর্তমানে তৈলবীজের উৎপাদন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে কৃষকেরা অর্থকরী ফসল হিসেবে তৈলবীজ আবাদ করে থাকেন। ফসল ওঠার সাথে সাথে বেশীর ভাগ তৈলবীজ তেল মিল মালিকদের নিকট বিক্রয় করে দেন। অধিকাংশ কৃষক নিজ উৎপন্ন তৈলবীজ বিক্রয় করে বাজার থেকে সয়াবীন তেল ক্রয় করে খেয়ে থাকেন। আবার অনেক কৃষক তৈলবীজ ভাঙ্গানোর অভাবে তৈলবীজ বিক্রয় করে তৈল ক্রয় করেন। বাজারে প্রচলিত তৈল মিলের ধারণক্ষমতা বেশী (কমপক্ষে ১০ কেজি) হওয়ায় অনেক কৃষক অল্প পরিমাণ তৈলবীজ ভাঙ্গাতে পারেন না। তাছাড়া বাণিজ্যিক তেল মিলগুলো শহর বা উপজেলা পর্যায়ে স্থাপিত। গ্রামাঞ্চলে তেলের মিল বিরল। ফলে কৃষকগণ তৈলবীজ উৎপাদন করা সত্ত্বেও নিজের ক্ষেতের উৎপন্ন বিশুদ্ধ তেলের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হন। কৃষক যাতে তার উৎপন্ন অল্প পরিমাণ (কমপক্ষে ২ কেজি) তৈলবীজ তার এলাকায় ভাঙ্গিয়ে বিশুদ্ধ তেল গ্রহণ করতে পারেন তার জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক একটি মিনি ও মোবাইল তেল নিষ্কাশন যন্ত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে।

প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ

- যন্ত্রটি রিক্সাভ্যানের উপর স্থাপন হওয়ায় সহজে স্থানান্তরযোগ্য।
- যন্ত্রটি দিয়ে সহজে অল্প সময়ে ও কম খরচে সরিষা, বাদাম, সূর্যমুখী, তিল, কালোজিরা প্রভৃতির বীজ থেকে তেল নিষ্কাশন করা সম্ভব।
- স্থানীয় কারখানায় যন্ত্রটি তৈরি করা যায়।
- একটি গিয়ার বক্সের মাধ্যমে ইঞ্জিনের ঘুর্ণায়মান গতিকে যন্ত্রের কাঙ্ক্ষিত গতিতে হ্রাস করা হয়।
- বিভিন্ন প্রকারের তৈলবীজের ধরণ অনুযায়ী যন্ত্রটির প্রতি ঘণ্টায় তৈলবীজ ভাঙ্গানো ক্ষমতা ১২-২০ কেজি।
- যন্ত্রটির তেল নিষ্কাশন ক্ষমতা ৩০-৩৫%।
- যন্ত্রটি দ্বারা চাষী অথবা বাসা বাড়ির লোকজন স্বল্প পরিমাণ তৈলবীজ ভাঙ্গাতে পারেন যা দ্বারা পরিবারের পুষ্টিমান নিশ্চিত করা যায়।
- সেবাপ্রদানকারীগণ যন্ত্রটি ভাড়া খাটিয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন।
- যন্ত্রটির মূল্য (ভ্যানসহ): ৬৫,০০০.০০ টাকা।

বারি মোবাইল তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের দৃশ্য

বারি মোবাইল তেল নিষ্কাশন যন্ত্র দ্বারা তেল নিষ্কাশনের দৃশ্য

কার্যপ্রণালী

প্রথমে ইঞ্জিন চালু করে ইঞ্জিনের পুলির গতিকে এমনভাবে সামঞ্জস্য করতে হবে যাতে যন্ত্রের পুলির গতি ১৫ আরপিএমএ ঘোরে। কমপক্ষে দুই কেজি সরিষা অথবা অন্য তেলের বীজকে ফিডিং হপারে ঢালতে হবে। তেলের বীজ প্রথমে হপার থেকে ধীরে ধীরে রোটর সিলিন্ডারে প্রবেশ করবে, যেখানে বীজগুলো চূর্ণ হবে। রোটর সিলিন্ডারে একটি স্পাইরাল স্ক্রু আছে যা তেলের বীজকে সামনের দিকে চূর্ণ হওয়ার জন্য ঠেলে দেয় ফলে বীজ থেকে তেল নিষ্কাশন হয়। প্রথমবারে ফিডিং এ তেলের বীজ থেকে যে খৈল বের হয় তা দ্বিতীয়বারে ফিডিং হপারে দেওয়া হয়। ফিডিং হপারে অবস্থিত ঘূর্ণায়মান প্লেট খৈলগুলো ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে পুনরায় রোটর সিলিন্ডারে প্রেরণ করে। রোটর কেসিং এর নিচে তেল সংগ্রহ করা হয়। যখন বীজ খৈলে রুপান্তরিত হয় তখন তা কোণের বাইরের অংশ দিয়ে রোটর কেসিং থেকে বেরিয়ে আসে। তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের গতি পর্যায়ক্রমে ১২-১৫ আরপিএম হয় যা তেল নিষ্কাশনের জন্য উপযুক্ত। আংশিকচূর্ণ বীজ থেকে প্রাপ্ত খৈল ২-৩ বার রোটর কেসিং এ তেল নিষ্কাশনের জন্য প্রবেশ করানো হয়।

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা

বর্তমান বিশ্বে কৃষি উৎপাদনে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। পুরানো সেচ ব্যবস্থাপনায় ফসলের পানির প্রকৃত চাহিদার তুলনায় ২ থেকে ৩ গুণের বেশি পানি জমিতে প্রয়োগ করা হয় যা পানি সম্পদের ঢালাও অপচয়। ফসলভেদে পানির চাহিদা সঠিকভাবে নিরুপণ, সেচকার্যে পানির পরিবহন ও বিতরণের সঠিক পদ্ধতি নির্ধারণ করে সেচের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত অবস্থার উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বেশ কিছু পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতিতে টমেটো ও আলু উৎপাদন

শীতকালে সমগ্র বাংলাদেশে নানা ধরনের সবজি চাষ হয়। বিগত বছরগুলোতে সবজি চাষের জমি ও উৎপাদন উল্লেখযোগ্যহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে উৎপাদিত সবজি দেশের মোট চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগই সরবরাহ করতে পারে। তন্মধ্যে টমেটো ও আলু হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বাণিজ্যিক সবজি ফসল যার দিন দিন চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। টমেটো ও আলুতে পানির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। রবি মৌসুমে সেচ দিলে এদের ফলন আড়াই থেকে তিনগুন পর্যন্ত বেড়ে যায় কিন্তু এ মৌসুমে দেশের অধিকাংশ এলাকায় সেচের পানির সংকট দেখা দেয়। পানির সুষ্ঠু বিতরণ ব্যবস্থা না থাকায় পানির অপচয় বেড়ে যায় এবং সেচ এলাকাও কমে যায়। তাই অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতিতে ফসলে পানি প্রয়োগ করে পানির ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং সেইসাথে পর্যাপ্ত ফলন পাওয়া সম্ভব। অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতি তুলনামূলকভাবে প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে অধিকতর সহজ ও সময় সাশ্রয়ী। কৃষি কাজে ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সেচ পানি সরবরাহ পদ্ধতি সীমিত। উন্নত ও সহজলভ্য সেচ পদ্ধতির দ্বারা পানির সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় রোধ করার সাথে সাথে ফসলের উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি করা যায়।

টমেটো উৎপাদন প্রযুক্তি

চারা রোপণের সময় ও পদ্ধতি

শীতকালে মধ্য-কার্তিক থেকে অগ্রহায়ণ (নভেম্বর ও মধ্য-ডিসেম্বর) পর্যন্ত চারা রোপণ করা যায়। শীতকালে চারার বয়স সাধারণত ৩০-৩৫ দিনের হয়। প্রতি ফারোর কেন্দ্র থেকে অপর ফারোর কেন্দ্র দূরত্ব ৬০ সেমি এবং চারা থেকে অপর চারার দূরত্ব ৪০ সেমি হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	প্রয়োগের সময়
ইউরিয়া ১ম উপরি প্রয়োগ	১৫০ কেজি-১৮০ কেজি	চারা লাগানোর ১০ -১৫ দিনের মধ্যে
ইউরিয়া ২য় উপরি প্রয়োগ	১৫০ কেজি-১৮০ কেজি	চারা লাগানোর ২৫-৩০ দিনের মধ্যে
ইউরিয়া ৩য় উপরি প্রয়োগ	১৫০ কেজি-১৮০ কেজি	চারা লাগানোর ৪০ -৪৫ দিনের মধ্যে
টি এস পি	২৫০- ৩৫০ কেজি	বেসার হিসাবে জমি তৈরির শেষ চাষের সময়
এমওপি	১০০ কেজি	জমি তৈরির শেষ চাষের সময় বেসার হিসাবে প্রয়োগ
এমওপি ১ম উপরি প্রয়োগ	৮০ কেজি	চারা লাগানোর ২৫-৩০ দিনের মধ্যে
এমওপি ২য় উপরি প্রয়োগ	৮০ কেজি	চারা লাগানোর ৪০ -৪৫ দিনের মধ্যে
জিপসাম	১২০ কেজি	জমি তৈরির সময়
জিংক সালফেট	২.৫-৩ কেজি	জমি তৈরির সময়
বরিক এসিড	১২-১৫ কেজি	জমি তৈরির সময়
গোবর	৫০০০ কেজি	জমি তৈরির সময়

আলু উৎপাদন প্রযুক্তি

বপনের সময় ও পদ্ধতি

মধ্য নভেম্বর থেকে মধ্য ডিসেম্বর পর্যন্ত আলুর বীজ বপন করার উপযুক্ত সময়। বপনের সময় প্রতি ফারোর কেন্দ্র হতে পার্শ্ববর্তী ফারো এর কেন্দ্রের দূরত্ব ৬০ সেমি এবং এক গাছ থেকে পার্শ্ববর্তী গাছের দূরত্ব ২৫ সেমি রাখা হয়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)	প্রয়োগের সময়
ইউরিয়া	২২০-২৫০	১/২ ভাগ ইউরিয়া জমি তৈরির সময় এবং বাকি অর্ধেক বপনের ২৫-৩০ দিন পর সাইড ড্রেসিং করে
টি এস পি	১২০-১৫০	জমি তৈরির সময়
এমওপি	২০০-২৪০	১/২ ভাগ ইউরিয়া জমি তৈরির সময় এবং বাকি অর্ধেক বপনের ২৫-৩০ দিন পর সাইড ড্রেসিং করে
জিপসাম	৮০-১০০	জমি তৈরির সময়
জিংক সালফেট	৮-১০	জমি তৈরির সময়
বরিক এসিড	৮-১০	জমি তৈরির সময়
গোবর	৫০০০	জমি তৈরির সময়

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- অল্টারনেট ফারো সেচ হলো এমন একটি সেচ পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রতি সেচের সময় একটি ফারো অন্তর অপর ফারোতে পানি সরবরাহ করা হয়।
- দুই ফারোর মধ্যবর্তী ফারো শুষ্ক থাকে যেখানে পরবর্তী সেচের সময় পানি সরবরাহ করা হয় এবং পূর্বের সেচকৃত ফারোগুলো পরবর্তী সেচের সময় শুষ্ক রাখা হয়।
- উঁচু বেডে সারিতে লাগানো ফসল যেমনঃ টমেটো, আলু ও ভুট্টা ইত্যাদি ফসল উৎপাদনে এই সেচ ব্যবস্থা উপযুক্ত।

অল্টারনেট ফারো সেচ পদ্ধতিতে টমেটো ও আলু চাষ

- চারা লাগানোর পর প্রাথমিক পর্যায়ে (১০-১২ দিন) প্রতি ২-৩ দিন অন্তর সেচ দিতে হবে। পরবর্তীতে প্রতি ১২-১৫ দিন অন্তর অল্টারনেট ফারো পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ

- এই পদ্ধতিতে ফসলের ফলনের তেমন কোন ক্ষতি না করে প্রচলিত ফারো বা প্লাবন সেচ পদ্ধতির চেয়ে শতকরা প্রায় ৩০-৩৫% পানি সাশ্রয় হয়।
- এই পদ্ধতি সারিতে লাগানো ফসল যেমনঃ টমেটো, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, সূর্যমুখী ও ভুট্টা ইত্যাদি উৎপাদনে খুবই উপযুক্ত।

- এই পদ্ধতিতে ফলের গুণগত মান প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে বেশি পাওয়া যায়।
- এই পদ্ধতিতে কম পানি ব্যবহার করে মুনাফা প্রচলিত সেচ পদ্ধতিরে চেয়ে শতকরা প্রায় ৫-১০ ভাগ বেশি পাওয়া যায়।
- পানির ঘাটতিজনিত কারণে ফসলের সংকটকাল পর্যায়ে এই প্রযুক্তির গুরুত্ব অপরিসীম।
- খরাপ্রবণ এলাকায় ফসল উৎপাদনে যেখানে পানির প্রাপ্যতা সীমিত, সেসব এলাকায় সেচের পানি বিতরণের ক্ষেত্রে এটি একটি সহজতর সময়োপযোগী কৃষক বান্ধব সেচ পদ্ধতি।

ড্রিপ ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে টমেটো ও বেগুন উৎপাদন

সারা বিশ্বে ড্রিপ ফার্টিগেশন বহুল ব্যবহৃত একটি আধুনিক সেচ প্রযুক্তি হলেও বাংলাদেশের জন্য এটি তুলনামূলক নতুন সেচ প্রযুক্তি। ফার্টিগেশন বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সেচ পদ্ধতি। এতে পানির সাথে রাসায়নিক সার মিশিয়ে ফসলে প্রয়োগ করা হয়। কেবলমাত্র পানিতে দ্রবণীয় সার যেমন- ইউরিয়া, পটাশ ইত্যাদি ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা যায়। ফলে ফসলের জমিতে সেচ এবং সার একই সঙ্গে প্রয়োগ করা যায়। প্রতি ১৪০ লিটার পানিতে ১ কেজি সার মেশাতে হয়। সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগের বিজ্ঞানীগণ উদ্যানতত্ত্ব ফসলের উপর এ পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভাল ফল পেয়েছেন।

ফার্টিগেশন পদ্ধতির সুবিধাসমূহ:

- ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে ৭০-৭৫ টন বেগুন এবং ৯০-৯৫ টন টমেটো উৎপাদন করা সম্ভব।
- প্রচলিত পদ্ধতি অপেক্ষা এ পদ্ধতিতে ২৮-৩১% ফলন বেশি পাওয়া যায়।
- এ পদ্ধতিতে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ৪৫-৫৫% সার কম লাগে।
- প্রচলিত ফারো এবং প্লাবন সেচ পদ্ধতি অপেক্ষা এ পদ্ধতিতে প্রায় ৪৫-৪৮% পানি কম লাগে।
- প্লাবন বা ফারো সেচ পদ্ধতি অপেক্ষা এ পদ্ধতিতে 'ব্যাকটেরিয়াজনিত নুয়ে পড়া' রোগের বিস্তার কম হয়।
- প্রচলিত ফারো পদ্ধতিতে টমেটো এবং বেগুন চাষ করলে হেক্টরপ্রতি নীট মুনাফা ৭০,০০০-৭৫,০০০ এবং ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করলে নীট মুনাফা শীতকালীন টমেটোর চেয়ে ২.০-২.৫ গুণ বেশি পাওয়া যায়।
- শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন টমেটো, বেগুন, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পেঁপে, পেয়ারা, লেবু, আম ও কাঁঠালসহ যাবতীয় ফলবাগানে এ প্রযুক্তি অধিকতর কার্যকর।
- খরাপীড়িত ও সেচ সংকট এলাকা, লবণাক্ত অঞ্চল এবং পাহাড়ী অঞ্চল যেখানে সেচের পানির অভাব, সেখানে ড্রিপ সেচ পদ্ধতি খুবই উপযোগী।
- বর্তমানে এ উন্নত পদ্ধতির যাবতীয় উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরি করা হয়।
- প্রতি ৫ শতক জমির ফসলের জন্য এই পদ্ধতি স্থাপনের প্রাথমিক খরচ ১০,০০০-১২,০০০ টাকা। তবে এই পদ্ধতির জীবনকাল ৩-৫ বছর হওয়ায় বছরওয়ারী গড় খরচ হবে ২,০০০-২,৫০০ টাকা মাত্র।

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে বেগুন উৎপাদন

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে টমেটো উৎপাদন

গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদনে ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে সার এবং পানি ব্যবস্থাপনা

ফার্টিগেশন বাংলাদেশের জন্য একটি নতুন সেচ প্রযুক্তি যার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে পানিতে দ্রবণীয় সার যেমন ইউরিয়া, পটাশ ইত্যাদি পানির সাথে মিশিয়ে ফসলে প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রচলিত পদ্ধতির চাইতে ৩৫-৪০ ভাগ পটাশ, ৫০-৫৫ ভাগ ইউরিয়া ও প্রায় ৫০ ভাগ সেচের পানি সাশ্রয় হয়। সার এবং পানি সাশ্রয়ের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণেও ফার্টিগেশন পদ্ধতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করে কম সময়ে অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব। উন্নত সার এবং পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নিয়মিত পরিবেশে ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে চাষ করলে আশানুরূপ ফলন এবং অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব।

রোপণের সময় এবং পদ্ধতি

সাধারণত মধ্য জুন গ্রীষ্মকালীন টমেটো রোপণের উপযুক্ত সময়। ২৫-৩০ দিন বয়সের চারা পলিথিন টানেলের বেডে রোপণ করতে হবে। বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য টমেটোর চারা পলি টানেলে রোপণ করতে হয়। লাইনে চারা রোপণের জন্য বেডের সাইজ ২.২ মিটার প্রস্থ এবং ৪ মিটার লম্বা হওয়া বাঞ্চনীয়। প্রতি সারি থেকে সারির দূরত্ব ৫৫ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪০ সেমি হওয়া উচিত।

সারের মাত্রা ও ব্যবহার

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ইউরিয়া এবং পটাশ কম লাগে এবং সারের অপচয় হয় না। এই পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ২০০ কেজি ইউরিয়া, ২৬৫ কেজি টিএসপি, ২৫০ কেজি পটাশ, ১ কেজি বোরন, ৪ কেজি জিঙ্ক এবং ৪ কেজি ম্যাগনেশিয়াম ব্যবহার করতে হয়। ইউরিয়া এবং পটাশ ছাড়া বাকি সারগুলোর সবটুকু জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া এবং পটাশ চারা রোপণের ১৫ দিন, ৩০ দিন, ৪৫ দিন এবং ৬০ দিন পর সমান ৪ (চার) ভাগে সেচের পানির সঙ্গে মিশিয়ে ড্রিপ সেচের মাধ্যমে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে। প্রধান প্রধান রাসায়নিক সারের সাথে গোবর সার (Micro-nutrient) ব্যবহার করলে গুণগতভাবে ফলের আকার ও রং আকর্ষণীয় হয়।

সেচ প্রয়োগ

ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পানি প্রতি ২ দিন পর পর প্রয়োগ করতে হয়। ভূ-উপরিস্থ পানির বাষ্পায়ন রোধে ধানের খড় মালচ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত প্রতি ১৪০ লিটার পানিতে ১ কেজি সার মিশিয়ে ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সার নিয়মিত সেচের সাথে প্রয়োগ করতে হয়।

ড্রিপ সেচের প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ

পানির ট্যাংক: প্লাস্টিক বা টিনের তৈরী অথবা মবিলের ড্রাম পানির ট্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রতি ৩ (তিন) শতাংশ জমিতে সেচ দেওয়ার জন্য ১৭৫-২০০ লিটার ধারণক্ষমতা সম্পূর্ণ ২ টি ট্যাংকের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি পানির ট্যাংক মাটি হতে ন্যূনতম ৩ ফুট উচ্চতায় স্থাপন করতে বাঁশের চারাটি খুঁটি এবং আড়াআড়ি বাশেঁর সাপোর্ট প্রয়োজন হয়।

পানির ট্যাপ: পানির ট্যাংক থেকে মেইন লাইনে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ছাঁকনি: প্লাস্টিকের তৈরি। পানিতে ময়লা থাকলে তা ছাঁকার কাজে ব্যবহৃত হয়।

টি: পিভিসির তৈরী।

মেইন লাইন: ৩/৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট পিভিসি পাইপ।

সাব মেইন: ১/২ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট পিভিসি পাইপ।

জয়েন্টার: মেইন লাইন ও সাব মেইন লাইনের মধ্যে সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়। পিভিসির তৈরি।

মাইক্রোটিউব: ০.২৫ সেমি ব্যাসের প্লাস্টিক পাইপ।

কানেক্টর: মাইক্রোটিউব ও সাব মেইনের সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।

ড্রিপার: গাছের গোড়ায় ফোঁটায় ফোঁটায় পানি দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। পিভিসির তৈরি।

সুবিধাসমূহ

- ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টর জমিতে ৩০-৪০ টন গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন করা সম্ভব, যা প্রচলিত পদ্ধতির চাইতে প্রায় ৩০-৩২ ভাগ বেশি।
- এই পদ্ধতিতে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ৪৫-৫৫ ভাগ সার কম লাগে এবং ৪০-৪৫ ভাগ সেচের পানি কম লাগে।
- এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত ফসল গুণগতমান ভাল হওয়ার কারণে বাজার মূল্য বেশি পাওয়া যায়।
- ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো চাষ করলে হেক্টর প্রতি নীট মুনাফা শীতকালীন টমেটো চাইতে ২.০-২.৫ গুণ বেশি পাওয়া যায়।

ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালীন টমেটো উৎপাদন

- খড়াপীড়িত ও সেচ সংকট এলাকা, লবণাক্ত অঞ্চলে এবং পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানে সেচের পানির অভাব, সেখানে ড্রিপ খুবই উপযোগী সেচ পদ্ধতি।
- বর্তমানে এ উন্নত পদ্ধতির যাবতীয় উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরী করা যায়।

ড্রিপ পদ্ধতিতে সার মিশ্রিত সেচ পানির ব্যবহার

টমেটো

আমাদের দেশে শস্য উৎপাদনে সার এবং পানি আলাদাভাবে জমিতে প্রয়োগ করা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই পানি প্রচলিত সেচের মাধ্যমে প্রয়োগ করা হয় বলে চোয়ানো পানির সঙ্গে জমি থেকে সারও বের হয়ে যায়। ফলে সার ও পানি উভয়েরই অপচয় হয়। সার মিশ্রিত সেচের পানি ড্রিপ সেচের মাধ্যমে প্রয়োগ করে এই অপচয় কমানো সম্ভব।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- সেচের পানি ফোঁটায় ফোঁটায় গাছের গোড়ায় প্রয়োগ করা হয় বলে সমস্ত জমি ভেজানোর প্রয়োজন হয় না এবং সেচের পানিও সুষ্ঠুভাবে ব্যবহৃত হয়।
- স্বল্প পরিমাণ পানি বারবার প্রয়োগ করতে হয় বলে এই পদ্ধতিতে পানির চোঁয়ানো তেমন হয় না ঢলে সারের অপচয় হয় না।
- এই পদ্ধতিতে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে প্রায় ৬০% ইউরিয়া এবং ৩০% এমওপি সার কম লাগে।

ড্রিপ পদ্ধতিতে সার মিশ্রিত সেচ পানির ব্যবহার

- প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে প্রায় ৪৮% পানি সাশ্রয় হয়।
- টমেটোর জমিতে ড্রিপ সেচের মাধ্যমে সার মিশ্রিত পানি প্রয়োগ করে একজন কৃষক যথেষ্ট লাভবান হতে পারেন।
- ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে ২ থেকে ৩ দিন অন্তর অল্প অল্প পানি সেচ দিতে হবে।
- উন্নতমানের এই সেচ পদ্ধতিতে টমেটো চাষে সাধারণভাবে আয়-ব্যয়ের অনুপাত ২.৭৫: ১.০০।
- ড্রিপ সেচ পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রতি ৩ শতাংশ জমির জন্য বার্ষিক সেচ খরচ প্রায় ৩৫০ টাকা।

স্বল্প মূল্যের ড্রিপ সেচ পদ্ধতি

বাড়ির আশেপাশের ফল বা সবজি বাগানে ছোটখাটো জমিতে সেচ প্রদানের জন্য স্বল্প মূল্যে এ ড্রিপ সেচ পদ্ধতি বেশ কার্যকর। সেচ পদ্ধতি গরিব চাষীদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

- পদ্ধতিটি ১.২৭ সেমি ব্যাসের পিভিসি পাইপ দিয়ে তৈরি যার মাধ্যমে জমিতে পানি পরিবহন ও প্রয়োগ করা হয়।
- পাইপের গায়ে ৪০ সেমি পরপর ১ মিমি ব্যাসের ছিদ্র করা হয় যেগুলো পাতলা কাপড় দিয়ে পেঁচানো থাকে। ছিদ্রগুলোর মধ্যকার দূরত্ব ফসলভেদে ভিন্নতর হতে পারে।
- পাইপ পদ্ধতিটি ৯০-১২০ সেমি উঁচুতে স্থাপিত পানির ট্যাংকের সাথে যুক্ত থাকে।
- ট্যাংক থেকে পাইপের মাধ্যমে সেচ প্রদানের সময় একটি নিয়ন্ত্রক ভাল্বের মাধ্যমে পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
- এ ধরনের সেচ পদ্ধতিতে প্রচলিত নালা পদ্ধতির চেয়ে ৩০-৪০ শতাংশ পানি কম লাগে।

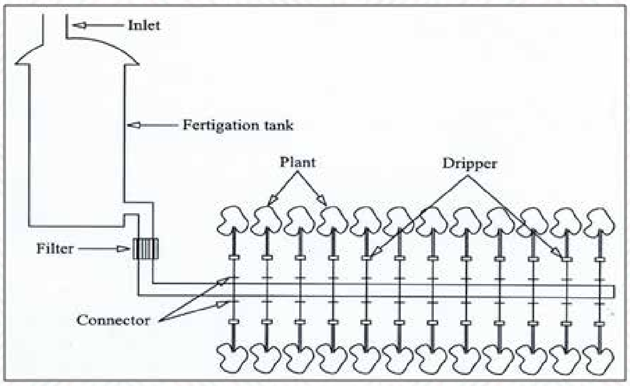

ফার্টিগেশন পদ্ধতির নকশা

- স্বল্পমূল্যের এ ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে কম সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।
- জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে সেচ পদ্ধতির দামেরও পরিবর্তন হয়ে থাকে। তবে ০.১০ হেক্টর জমির জন্য প্রায় ৩,০০০ টাকা মূল্যের ড্রিপ সেচ পদ্ধতির প্রয়োজন।
- সেচ পদ্ধতির আয়ুষ্কাল প্রাথমিকভাবে ৫ বছর। তবে ভালভাবে মেরামত বা কিছু যন্ত্রাংশ সংযোজনের মাধ্যমে তা বাড়ানো সম্ভব।

পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে সেচ ও মাল্চ প্রযুক্তি

দোআঁশ ও জৈব পদার্থ সমৃদ্ধ হালকা দোআঁশ বা পলিযুক্ত মাটি পেঁয়াজ চাষের জন্য উত্তম। পেঁয়াজ চাষের জন্য সেচ ও নিষ্কাশন সুবিধাযুক্ত উর্বর মাটি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পেঁয়াজের ভালো ফলন পেতে হলে উত্তম বীজ অত্যাবশ্যকীয়। ভালো বীজ এবং সঠিক পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পেঁয়াজের ফলন শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। ঘাটতি সেচ এবং মাল্চ ব্যবহারের মাধ্যমে পানির পরিমিত ব্যবহার করে যে সকল এলাকায় পানির ঘাটতি আছে, সেসব এলাকায় এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে পেঁয়াজের বীজের ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব। ঘাটতি সেচ প্রযুক্তিতে কম পানি প্রয়োগ করা হলেও মাল্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির আর্দ্রতা ধরে রাখা সম্ভব। ফলে পেঁয়াজের বীজের ফলন বৃদ্ধি এবং গুণগত মান বজায় থাকে।

বপনের সময় এবং পদ্ধতি

সাধারণত নভেম্বর মাসে বীজ উৎপাদনের জন্য পেঁয়াজের কন্দ বপনের উপযুক্ত সময়। বেডের সাইজ ১.৫ মিটার প্রস্থ এবং ৩ মিটার লম্বা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার হওয়া উচিত। প্রতি হেক্টরে প্রায় ১০ টন পেঁয়াজের কন্দ বপন করা প্রয়োজন।

সারের মাত্রা ও ব্যবহার

রবি মৌসুমে বীজ উৎপাদনের জন্য পেঁয়াজ চাষে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৩২০-৩৩০ কেজি
টি এস পি	৫০০ কেজি
এমওপি	৩৬০ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি
জিঙ্ক সালফেট	১০ কেজি
বরিক এসিড	১০ কেজি
গোবর	৮-১০ টন

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক, রোরাক্স, এমওপি এবং ইউরিয়া সারের অর্ধেক জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া কন্দ রোপণের ২৫ এবং ৫০ দিন পর সমান ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

উদ্ভিদের বিভিন্ন বৃদ্ধি পর্যায়ে ৪ বার সেচ প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সেচ প্রয়োগের পূর্বে মাটির আর্দ্রতা পরীক্ষা করা প্রয়োজন। মাল্চ ব্যবহার করার ফলে এ পদ্ধতিতে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতার শতকরা ১০০ ভাগ এর পরিবর্তে ৮০ ভাগ পানি প্রয়োগ করেও ভালো ফলন পাওয়া সম্ভব। এই পদ্ধতিতে পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনের পুরো মৌসুমে ২৩০-২৪০ মিমি পানির প্রয়োজন হয়।

সেচ ও মালচ্ প্রয়োগে পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন

সুবিধাসমূহ

- এ পদ্ধতিতে হেক্টরে ১,৫০০-১,৬০০ কেজি পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন সম্ভব।
- মালচ্ ব্যবহারে করার ফলে শতকরা ২০ ভাগ কম পানি প্রয়োগ করেও সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া সম্ভব।
- মাল্চ ব্যবহারের ফলে আগাছার উপদ্রব কম হয়। রোপণের তিন এবং ছয় সপ্তাহ পর সার প্রয়োগের পূর্বে দুই বার আগাছা পরিষ্কার করতে হয়।
- এ পদ্ধতিতে পেঁয়াজের বীজ উৎপাদনে আয়-ব্যয়ের অনুপাত ৫.১৭:১ এবং প্রতি হেক্টর জমিতে পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করে ১০,০০,০০০-১১,০০,০০০০ টাকা নীট মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।
- মালচ্ ব্যবহারের মাধ্যমে ৫-১৭% ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- এ পদ্ধতিতে প্রতি কেজি পেঁয়াজের বীজ উৎপাদন করতে ১,৪০০ লিটার পানি প্রয়োজন হয় (পানির উৎপাদনশীলতা ০.৭১ কেজি/মিটার)
- খরা প্রবণ এলাকায় এই প্রযুক্তি আরও অধিকতর কার্যকরী।
- পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির উত্তোলন কম করতে হয়।

স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে পেঁয়াজ ও রসুন উৎপাদন

স্প্রিংকলার সেচ এমন একটি সেচ পদ্ধতি যা প্রাকৃতিক বৃষ্টিপাতের অনুরূপ। এই পদ্ধতিতে ভূ-গর্ভস্থ বা ভূপৃষ্ঠস্থ জলাধার হতে পাম্পদ্বারা পাইপ ও স্প্রিংকলার সিস্টেমের মাধ্যমে পানি বাতাসে স্প্রে করা হয় যা ছোট ছোট ফোঁটা আকারে বৃষ্টির ন্যায় ফসলের মূলাঞ্চলকে সিক্ত করে। সব ধরনের ফসলেই স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা যায়, তবে যেসব ফসলের মূল অগভীর ও পরিমিত পরিমাণ পানি দ্বারা ঘন ঘন সেচ প্রয়োগ করতে হয় সে সব ফসলে এই পদ্ধতি অধিক উপযোগী। তাছাড়া বেলে মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা কম হওয়ায় স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করলে পানির ব্যবহার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। মসলা জাতীয় ফসলের মধ্যে পেঁয়াজ ও রসুন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফসল। পেঁয়াজ ও রসুন বিভিন্ন রকমের রান্নার গন্ধ, রুচি ও স্বাদ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। তাছাড়া বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও রসুন ব্যবহার হয়ে থাকে। বাংলাদেশে চাহিদার তুলনায় পেঁয়াজ ও রসুনের উৎপাদন অনেক কম। সেচ পানির সঠিক বিতরণ ব্যবস্থা ও দক্ষ সেচ ব্যবস্থাপনার অভাব উৎপাদন কম হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। পেঁয়াজ ও রসুন একটি অগভীর মূলীয় কন্দ জাতীয় ফসল হওয়ায় এর বৃদ্ধি ও অধিক ফলনের জন্য স্বল্প পরিমাণ সেচ ঘন ঘন প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। আর ঘন ঘন হালকা সেচের জন্য স্প্রিংকলার একটি উপযুক্ত সেচ পদ্ধতি।

রোপণের সময় ও পদ্ধতি (রসুন)

মধ্য অক্টোবর থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত রসুনের কোয়া লাগানোর উপযুক্ত সময়। ৪-৫ টি চাষ দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। এসময় জমিতে আগাছা থাকলে তা পরিষ্কার করতে হবে। রসুনের কোয়া রোপণের সময় এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব হবে ১০ সেমি। সাধারণত ০.৭৫-১ গ্রাম রসুনের কোয়া বীজ হিসেবে ব্যবহার করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগঃ রসুনের জন্য প্রতি হেক্টরে নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
ইউরিয়া	২১৭ কেজি
টিএসপি	২৬৭ কেজি
এমওপি	৩৩৩ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি
গোবর	৫ টন

সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি জমি তৈরীর শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করে জমি ভালভাবে তৈরি করতে হবে। বাকী ইউরিয়া ও এমওপি দুই কিস্তিতে সমানভাগে রসুন বপনের ২৫ দিন এবং ৫০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

বপনের সময় এবং পদ্ধতি (পেঁয়াজ)

সাধারণত নভেম্বর মাস বীজ উৎপাদনের জন্য পেঁয়াজের কন্দ বপনের উপযুক্ত সময়। বেডের সাইজ ১.৫ মিটার প্রস্থ এবং ৩ মিটার লম্বা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সারি থেকে সারির দূরত্ব ২৫ সেন্টিমিটার এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০ সেন্টিমিটার হওয়া উচিত। প্রতি হেক্টরে প্রায় ১০ টন পেঁয়াজের কন্দ বপন করা প্রয়োজন।

সারের মাত্রা ও ব্যবহার

রবি মৌসুমে বীজ উৎপাদনের জন্য পেঁয়াজ চাষে নিম্নরূপ হারে সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের নাম	পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৩২০-৩৩০ কেজি
টি এস পি	৫০০ কেজি
এমওপি	৩৬০ কেজি
জিপসাম	১১০ কেজি
জিঙ্ক সালফেট	১০ কেজি
বরিক এসিড	১০ কেজি
গোবর	৮-১০ টন

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক, রোরাক্স, এমওপি এবং ইউরিয়া সারের অর্ধেক জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া কন্দ রোপণের ২৫ এবং ৫০ দিন পর সমান ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এটা এমন একটি সেচ পদ্ধতি যা জলাধার হতে পাম্প, পানি বিতরণের পাইপ এবং স্প্রিংকলার সিস্টেমের মাধ্যমে পানি বাতাসে স্প্রে করে ছোট ছোট ফোঁটা আকারে বৃষ্টির মতো করে ফসলের জমিতে প্রয়োগ করা হয়। এটা ওভারহেড সেচ পদ্ধতি নামেও পরিচিত।
- পানি পরিবহনে নালা তৈরির প্রয়োজন হয় না তাই পানির পরিবহনজনিত কোন ক্ষতি নেই।
- এঁটেল মাটি ছাড়া সব ধরনের মাটির জন্যই এ পদ্ধতি উপযোগী।
- পাহাড়ী এলাকা বা উঁচু-নিচু জমিতে যেখানে অন্য পদ্ধতি উপযোগী নয়।
- খুব কাছাকাছি লাগানো ফসলের ক্ষেত্রে।
- সেচ পানি সাশ্রয়ী ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।
- এ পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করলে পানির অনুস্রবণ জনিত বা গড়িয়ে যাওয়া ক্ষতি হয় না।
- এই পদ্ধতি অগভীর মূলের ফসলে যেখানে ঘন ঘন পানি দেয়ার প্রয়োজন পড়ে যেমন- পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি ফসলে উপকারি।
- বীজ বোনার পর এই পদ্ধতিতে হালকা সেচ দিলে বীজের অঙ্কুরোদগম নিশ্চিত হয় এবং বীজের কোন পচনজনিত ক্ষতি হয় না।
- সেচ পানির সুষম বণ্টন হয় ফলে পানি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- প্রাথমিক খরচ অন্যান্য সেচ পদ্ধতির চেয়ে বেশি।
- এঁটেল মাটির ফসলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি অনুপযোগী।
- সেচ প্রয়োগের সময় বাতাসের বেগ বেশি থাকলে পরিষ্কার পানির প্রয়োজন।
- অপরিষ্কার পানি দ্বারা সেচ প্রয়োগ করলে স্প্রিংকলার নজেল বন্ধ হয়ে যায়।
- এই পদ্ধতিতে পানির বাষ্পীভবনজনিত ক্ষতি বেশি হয় যদি নজেল প্রেসার, বায়ু প্রবাহ, তাপমাত্রা বেশি হয়।

স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে রসুন চাষ

স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে পেঁয়াজ চাষ

স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে পেঁয়াজ উৎপাদন

- পেঁয়াজ অগভীর মূলীয় ফসল হওয়ায় ভাল ফলন পেতে ঘন ঘন সেচ প্রদান করতে হয়, যা একমাত্র স্প্রিংকলার পদ্ধতিতেই সম্ভব।
- স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে প্রস্বেদনের ১০০-১২০% মাত্রার সেচ ৭ দিন অন্তর প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।
- চারা লাগানোর পর ২/৩ দিন অন্তর সেচ প্রয়োগ করতে হবে ১৫ দিন পর্যন্ত।
- পেঁয়াজ ফসল তোলার ১৫ দিন পূর্বে সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

- স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করলে প্রায় ৩০% পানি সাশ্রয় এবং ৪০-৪৫% ফলন বৃদ্ধি হয়। এর ফলে বেশি এলাকায় সেচের আওতায় আনা সম্ভব হবে।
- স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে পেঁয়াজ উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের অনুপাত ৩: ১।
- স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগে পেঁয়াজে থ্রিপ্স পোকার আক্রমণ কম হয়।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ (প্লাবন সেচ) ও স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে পেঁয়াজে সেচ প্রয়োগের নির্ঘণ্ট (সিডিউল)

প্রতি সেচে পানির পরিমাণ (মিমি)				
পদ্ধতি	প্রাথমিক পর্যায় (০-২৫ দিন)	বৃদ্ধি পর্যায় (২১-৪৫ দিন)	কন্দ গঠন ও বৃদ্ধ পর্যায় (৪৫-৬৫ দিন)	কন্দ পরিপক্ক পর্যায় (৬৬-৯০ দিন)
ভূ-পৃষ্ঠস্থ সেচ (১৫ দিন অন্তর)	২০-২৫	৩৫-৪০	৪৫-৫০	৪০-৪৫
স্প্রিংকলার সেচ (৭ দিন অন্তর)	১০-১২ (২-৩ দিন অন্তর)	১৫-১৮	৩৫-২৮	২২-২৫

স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে রসুন উৎপাদন

- রসুনে ফসলের চাহিদা অনুযায়ী ৮ থেকে ১০ দিন অন্তর স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করলে প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে শতকরা প্রায় ১৫-২০ ভাগ বেশি ফলন পাওয়া যায় এবং শতকরা প্রায় ২০-২৫ ভাগ পানি সাশ্রয় হয়।
- স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে প্রস্বেদনের ৮০-১০০% মাত্রার সেচ ১০ দিন অন্তর প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।
- মাটিতে রস কম থাকলে রসুনের কোয়া লাগানোর পর পর হালকা সেচ দিতে হবে।
- এই পদ্ধতিতে রসুন চাষ করলে কৃষক পদ্ধতি অপেক্ষা প্রতি হেক্টরে প্রায় ১ লাখ টাকা বেশি আয় সম্ভব।
- স্প্রিংকলার সেচ পদ্ধতিতে রসুন উৎপাদনের আয়-ব্যয়ের অনুপাত ২:১ ।

রসুনে সেচ প্রয়োগে বিবেচ্য বিষয়াবলী

- রসুন অগভীর মূলীয় ফসল হওয়ায় সতর্কতার সাথে সেচ প্রদান দরকার। সেচ প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হলে মূলাঞ্চলে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয় ফলে গাছ হলুদ বর্ণ ধারণ করে।
- রসুনের প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে পানি কম লাগে তবে গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে পানির চাহিদা বেড়ে যায়।
- সাধারণত ১০/১৫ দিন অন্তর সেচ প্রদান করতে হয়। তবে রসুন পরিপক্ক হওয়ার অন্তত ২০ দিন পূর্বে সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হয়।
- কন্দ গঠন এবং বৃদ্ধি পর্যায়ে পানির চাহিদা বৃদ্ধি পায় এ সময়ে সেচ প্রদান না করলে ফলনের মারাত্মক ক্ষতি হয়। তাই এ পর্যায়কে সেচ প্রদান করলে কন্দের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় আবার অধিক সেচ প্রয়োগ করলে রসুনের কন্দে পচন ধরে।
- অতিরিক্ত ভেজা অবস্থায় রসুনের বাইরের খোসা (scale) ফেটে যায়।

ভূ-পৃষ্ঠস্থ (প্লাবন সেচ) ও স্প্রিংকলার পদ্ধতিতে রসুনে সেচ প্রয়োগের নির্ঘণ্ট

প্রতি সেচে পানির পরিমাণ (মিমি)				
পদ্ধতি	প্রাথমিক পর্যায় (০-৩০ দিন)	বৃদ্ধি পর্যায় (৩১-৭০ দিন)	কন্দ গঠন ও বৃদ্ধি পর্যায় (৭০-১০০ দিন)	কন্দ পরিপক্ক পর্যায় (১০১-১২৫ দিন)
ভূ-পৃষ্ঠস্থ সেচ (১৫ দিন অন্তর)	২০-২৫	৩৫-৪০	৪৫-৫০	৪০-৪৫
স্প্রিংকলার সেচ (৭ দিন অন্তর)	১৫-১৮	১৫-১৮	৩৫-২৮	২২-২৫

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম চাষ

ফার্টিগেশন বাংলাদেশের একটি নতুন সেচ প্রযুক্তি। এতে পানির সাথে দ্রবণীয় রাসায়নিক সার যেমন-ইউরিয়া, পটাশ একত্রে মিশিয়ে ফসলে প্রয়োগ করা হয়। ফলে ফসলের জমিতে সেচ এবং সার একই সঙ্গে প্রয়োগ করা যায়। প্রতি ১৪০ লিটার পানিতে ১ কেজি সার মিশাতে হয়।

ফার্টিগেশন/ড্রিপ সেচ উচ্চ মূল্যের ফসলে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে চাষের জন্য খুবই উপযোগী পদ্ধতি। ক্যাপসিকাম একটি খুবই উচ্চ মূল্যের সবজি ফসল। তবে এটি একটি আবহাওয়া সংবেদনশীল ফসল। সাধারণত দিনের তাপমাত্রা ১৬-২৫° সে. থাকলে ভাল জন্মে। সেজন্য উন্মুক্ত/অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ক্যাপসিকাম ভাল ফলন দেয় না। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ড্রিপ সেচের মাধ্যমে চাষ করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া এবং অধিক মানুফা অর্জন করা সম্ভব।

রোপণের সময়

সাধারণত মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বর পর্যন্ত ক্যাপসিকাম রোপণের উপযুক্ত সময়। মাটি শোধিত বীজতলায় চারা তৈরি করে ২৫-৩০ দিনের বয়সের চারা বেডে রোপণ করতে হয়। ড্রিপ সেচের বেডের সাইজ ৭-১০ মিটার লম্বা এবং ২.২ মিটার প্রস্থ হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে প্রতি বেডে ৪টি লাইনে গাছ রোপণ করা যায়। প্রতি লাইন থেকে লাইনের দূরত্ব ৫০ সেমি হওয়া উচিত।

সার প্রয়োগ

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে ফারো/প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ইউরিয়া এবং পটাশ কম লাগে কারণ এতে সারের ব্যবহার ক্ষমতা অনেক বেশি।

সারের তুলনামূলক ব্যবহার

সারের নাম	ফারো/প্রচলিত পদ্ধতি	ফার্টিগেশন পদ্ধতি
গোবর	১০ টন/হেক্টর	১০ টন/হেক্টর
ইউরিয়া	২২০ কেজি/হেক্টর	১৬০ কেজি/হেক্টর
টিএসপি	২০০ কেজি/হেক্টর	৩৩০ কেজি/হেক্টর
এমওপি	২০০ কেজি/হেক্টর	১৫০ কেজি/হেক্টর
জিপসাম	১০০ কেজি/হেক্টর	১০ কেজি/হেক্টর
জিংক অক্সাইড	৫ কেজি/হেক্টর	৫ কেজি/হেক্টর

ইউরিয়া এবং পটাশ ছাড়া বাকি সারগুলো সমুদয় পরিমাণ জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া এবং পটাশ চারা রোপণের ২০ দিন, ৪০ দিন এবং ৬০ দিন পর সমান ৩ ভাগে সেচের পানির সঙ্গে মিশিয়ে ড্রিপ সেচের মাধ্যমে ফসলে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ

- প্লাস্টিক বা টিনের তৈরি অথবা ২০০-৫০০ লিটারের মবিলের ড্রাম পানির ট্যাংক হিসেবে ব্যবহার করা যায়। প্রতি ৩ শতাংশ জমিতে সেচ দেয়ার জন্য ১৭৫-২০০ লিটার ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ২টি ট্যাংকের প্রয়োজন হয়। প্রতিটি ট্যাংকের দাম বাজারে ৪০০-৫০০ টাকা। প্রতিটি পানির ট্যাংক মাটি হতে ন্যূনতম ৩ ফুট উচ্চতায় স্থাপন করতে বাশেঁর ৪টি খুঁটি এবং আড়াআড়ি বাশেঁর সাপোর্ট প্রয়োজন হয়।
- পানির ট্যাপ ট্যাংক থেকে মেইন লাইনে পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়। পিভিসির তৈরি। প্রতিটির দাম ৮-১০ টাকা।
- মেইন লাইন ৩/৪ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট পিভিসি পাইপ। প্রতি ফুটের দাম ৫-৬ টাকা।

- সাব মেইন ১০-১২ মিমি ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট পিভিসি পাইপ। প্রতি ফুটের দাম ২.২৫-২.৫০ টাকা।
- পিভিসির তৈরি জয়েন্টার মেইন লাইন ও সাব-মেইন লাইনের মধ্যে সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয় যার প্রতিটির দাম ১০-১২ টাকা।
- মাইক্রোটিউব ০.২৫ মিমি ব্যাসের প্লাস্টিক পাইপ। প্রতি ফুটের দাম ০.৮০০-১.০০ টাকা।
- কানেক্টর (পিভিসির তৈরি) মাইক্রোটিউব ও সাব-মেইনের সংযোগের জন্য ব্যবহৃত যার প্রতিটির দাম ১.৫০ টাকা।
- পিভিসির তৈরি ড্রিপার গাছের গোড়ায় ফোঁটায় ফোঁটায় পানি দেয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় যার প্রতিটির দাম ১.৫০ টাকা।

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে উৎপন্ন ক্যাপসিকাম

সুবিধাসমূহ

- ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে প্রতি হেক্টরে ১৫-১৬ টন (প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ৪০-৪৫% অধিক) ক্যাপসিকাম উৎপাদন করা যায়।
- প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ইউরিয়া ও পটাশ কম লাগে (৩৫-৪০%) এবং সেচের পানি কম লাগে (৪৫-৪৮%)।
- ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম চাষের আয়-ব্যয়ের অনুপাত ৫:১ এবং প্রতি হেক্টর জমিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে (পলিসেড) ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে ক্যাপসিকাম চাষ করে নিট মুনাফা ৪.০-৪.২৫ লক্ষ টাকা পাওয়া সম্ভব।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত নুয়ে পড়া রোগের বিস্তার কম হয়। বর্তমানে এ উন্নত পদ্ধতির যাবতীয় উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরি করা হয় এবং প্রতি ৩ শতক জমিতে ফসলের জন্য এ পদ্ধতিতে সেচ খরচ মৌসুমে ৮৫০-১,০০০ টাকা হয়।

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি উৎপাদন

ফার্টিগেশন বাংলাদেশের জন্য নতুন একটি সেচ প্রযুক্তি যার চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইহা এমন একটি সেচ প্রযুক্তি যার মাধ্যমে পানিতে দ্রবণীয় সার যেমনঃ ইউরিয়া, পটাশ ইত্যাদি পানির সাথে মিশিয়ে সরাসরি গাছের শিকড় অঞ্চলে অল্প অল্প করে প্রয়োগ করা যায়। সেচের সময় সার ও পানি একই সঙ্গে প্রয়োগ করা হয় এবং নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ফসলের গোড়ায় প্রয়োগের ফলে প্রয়োগকৃত সার এবং পানির প্রায় সবটুকুই উদ্ভিদ গ্রহণ করে। ফলে অব্যবহৃত সার চুঁইয়ে ভূ-উপরিস্থ বা ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষিত করে না। স্ট্রবেরি অত্যন্ত আকর্ষণীয় বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ও উচ্চ পুষ্টিমানের জন্য অত্যন্ত সমাদৃত ফল। স্ট্রবেরি শীত প্রধান দেশের ফল হলেও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে উন্নত চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে স্ট্রবেরির চাষ খুবই লাভজনক। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ২৫ টি জেলায় স্ট্রবেরির চাষ হচ্ছে। তবে ফসল উৎপাদনে স্ট্রবেরি চাষের ক্ষেত্রে সেচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিমিত পানি বা অতিরিক্ত মাটির রসের কারণে আশানুরূপ ফসল পাওয়া যায় না। তাই নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে চাষ করলে আশানুরূপ ফলন যেমন পাওয়া যায় তেমনি অধিক মুনাফা অর্জন সম্ভব।

ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি চাষ

উৎপাদন প্রযুক্তি

চারা রোপণের সময় ও পদ্ধতি

বাংলাদেশের আবহাওয়ায় আশ্বিন মাস (মধ্য সেপ্টেম্বর-মধ্য অক্টোবর) পর্যন্ত স্ট্রবেরি চারা রোপণের উপযুক্ত সময়। তবে নভেম্বর মাসেও চারা রোপণ করা যায়। স্ট্রবেরি উৎপাদনের জন্য কয়েকবার চাষ ও মই দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে চারা রোপণের জন্য বেড পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। এজন্য ১ মিটার প্রশস্ত এবং ১৫-২০ সেমি উঁচু বেড তৈরী করতে হবে। দুইটি বেডের মাঝে ৪০-৫০ সেমি নালা রাখতে হবে। প্রতি বেডে ৫০ সেমি দূরত্বে সারিতে ৩০-৪০ সেমি দূরে দূরে চারা রোপণ করতে হবে।

সারের মাত্রা ও ব্যবহার

গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চফলন পেতে হলে স্ট্রবেরির জমিতে (ফার্টিগেশন পদ্ধতির ক্ষেত্রে) হেক্টর প্রতি নিম্নলিখিত পরিমাণ সার প্রয়োগ করতে হবে।

সারের প্রকার	হেক্টর প্রতি সারের প্রয়োজনীয়তা
ইউরিয়া	১৬০-১৮০ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি
এমওপি	১৫০ কেজি
জিপসাম	১৪০ কেজি
বরিক এসিড	১২ কেজি
জিঙ্ক সালফেট	৮ কেজি
পঁচা গোবর	৫ টন

শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, বরিক এসিড ও জিঙ্ক সালফেট সার জমিতে ছিটিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে ইউরিয়া ও এমওপি সার চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ১৫-২০ দিন অন্তর ৪-৫ কিস্তিতে সেচের পানির সাথে মিশিয়ে ড্রিপ সেচের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ও ফল সংগ্রহ

স্ট্রবেরি সরাসরি মাটির সংস্পর্শে এলে পঁচে নষ্ট হয়ে যায়। এজন্য চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর স্ট্রবেরি বেড খড় বা কালো পলিথিন দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খড়ে যাতে পোকার আক্রমণ না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ব্যবহারের পূর্বে প্রতি লিটার পানির সাথে ৫ মিমি ডার্সবান ২০ ইসি ও ৩ গ্রাম ব্যভিস্টিন ডি এম মিশিয়ে খড়ে স্প্রে করে শোধন করে নিতে হবে। স্ট্রবেরি জমি সব সময় আগাছামুক্ত রাখতে হবে। গাছের গোড়া হতে নিয়মিত রানার বের হয় যা ১০-১৫ দিন পর পর কেটে ফেলতে হবে। রানার না কাটলে গাছের ফুল ও ফল উৎপাদন হ্রাস পায়। স্ট্রবেরির ফলন পৌষ মাস হতে শুরু হয়ে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত চলে। ফল পেকে লাল বর্ণ ধারণ করলে ফল সংগ্রহ করতে হয়। স্ট্রবেরির সংরক্ষণকাল খুবই কম বিধায় ফল সংগ্রহের পর গাদাগাদি অবস্থায় না রেখে প্লাস্টিকের ঝুড়ি বা ডিমের ট্রেতে সংরক্ষণ করে যত দ্রুত সম্ভব বাজারজাত করতে হবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ফার্টিগেশন একটি নতুন সেচ প্রযুক্তি যার মাধ্যমে পানিতে দ্রবণীয় সার যেমন-ইউরিয়া, পটাশ ইত্যাদি পানির সাথে মিশিয়ে সরাসরি গাছের শিকড় অঞ্চলে ধীরে ধীরে ফোটা ফোটা করে প্রয়োগ করা হয়।
- ইহা এমন একটি সেচ পদ্ধতি যা পানির ট্যাংক, ভাল্ব, ছাকনি, টি, মেইন লাইন, সাব-লাইন, জয়েন্টার, কানেক্টর এবং ড্রিপার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে গাছের শিকড় অঞ্চলে পানি প্রয়োগ করা হয়।
- সাধারণত প্রতি ১৪০ লিটার পানিতে ১ কেজি সার মিশিয়ে ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় সার ও পানি নিয়মিত সেচের মাধ্যমে গাছের শিকড় অঞ্চলে প্রয়োগ করতে হয়।

- ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে ইউরিয়া ও এমওপি সার চারা রোপণের ১৫ দিন পর থেকে ১৫-২০ দিন পরপর ৪-৫ কিস্তিতে পানির সাথে মিশিয়ে ড্রিপ সেচের মাধ্যমে প্রয়োগ করতে হবে।
- এই পদ্ধতিতে প্রতি ২-৩ দিন অন্তর অন্তর ড্রিপ পদ্ধতিতে অল্প পানি সেচ প্রয়োগ করতে হয়।
- ভূ-উপরিস্থ পানির বাষ্পায়ন রোধে এবং ফলের গুণগতমান সংরক্ষণে ধানের খড় বা প্লাস্টিকের মালচ্ ব্যবহার করতে হবে।
- বর্তমানে ফার্টিগেশন পদ্ধতির যাবতীয় উপকরণ স্থানীয়ভাবে তৈরি করা সম্ভব।
- স্ট্রবেরি জলাবদ্ধতা মোটেই সহ্য করতে পারে না। তাই বৃষ্টির অতিরিক্ত পানি দ্রুত নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সেচের পানি বাষ্পায়ন জনিত অপচয় রোধকল্পে ফসলের জমিতে সেচ সাধারণত সকালে অথবা বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া প্রচণ্ড তাপমাত্রার রৌদ্রের সময় যাতে ফসলের জমিতে সেচ না দেওয়া হয় সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ

- নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ফসলের গোড়ায় পানি প্রয়োগের ফলে প্রয়োগকৃত সারের প্রায় সবটুকুই গাছ গ্রহণ করে।
- ফার্টিগেশন পদ্ধতি প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ৫০-৫৫ ভাগ ইউরিয়া এবং ২৫ ভাগ পটাশ কম লাগে।
- এই পদ্ধতিতে প্রচলিত ফারো বা প্লাবন সেচ পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ৪৫-৪৮ ভাগ সেচের পানির কম লাগে।
- ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে স্ট্রবেরির ফলন ৯-১২ টন পর্যন্ত পাওয়া সম্ভব।
- ফার্টিগেশন পদ্ধতিতে স্ট্রবেরি চাষের আয়-ব্যয়ের অনুপাত ৬:১ এবং প্রতি হেক্টর জমিতে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে স্ট্রবেরি চাষ করে নীট মুনাফা ১৫-১৮ লক্ষ টাকা অর্জন সম্ভব।
- প্রতি ১০ (দশ) শতক জমিতে ফসলের জন্য এই পদ্ধতিতে সেচের খরচ হয় মৌসুমে মাত্র ১,২০০-১,৫০০ টাকা।

প্রসেসিং আলু উৎপাদনের সেচ প্রযুক্তি

আলু একটি কন্দাল জাতীয় ফসল। অধিক শর্করা থাকার কারণে অনেক দেশেই আলু প্রধান খাদ্য এবং প্রধান সম্পূরক খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশে গমের পরই প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য হিসেবে আলুর ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধিকন্তু- চিপস্, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই ইত্যাদি খাদ্য তৈরির জন্য আলুর বিশেষ জাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আলুর অধিকাংশ মূল মাটির কম গভীরতায় থাকায় সময়মতো সেচ প্রয়োগ না করলে মাটিতে পানি ঘাটতির দরুণ ফলন কমে যায়। এতে প্রসেসিং খাদ্য হিসাবে আলুর গুণাবলী নষ্ট হয়ে যায়। সময়মতো প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ প্রয়োগের মাধ্যমে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায় এবং অধিক মুনাফা অর্জন করা সম্ভব।

বপনের সময় এবং পদ্ধতি

আলু চাষের জন্য বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি সবচেয়ে উপযোগী। সাধারণত নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ থেকে মধ্য নভেম্বর পর্যন্ত আলু বপনের উপযুক্ত সময়। প্রতি হেক্টরে ১.৫ টন আলু বীজের প্রয়োজন হয়। আস্ত আলু রোপণ করলে রোপণের দূরত্ব ৬০ × ২৫ সেন্টিমিটার হওয়া বাঞ্ছনীয়। পক্ষান্তরে, কাটা আলু রোপণ করলে রোপণের দূরত্ব ৪৫ × ১৫ সেন্টিমিটার হলেই চলবে। রোপণের পূর্বে বীজ শোধন করা প্রয়োজন।

সারের মাত্রা ও ব্যবহার

আলু চাষের জন্য নিম্নে উল্লিখিত হারে সার ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সারের নাম	পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	২২০-২৫০ কেজি
টি এস পি	১২০-১৪৫ কেজি
এমওপি	২২০-২৫০ কেজি
জিপসাম	১০০-১২০ কেজি
জিঙ্ক সালফেট	৮-১০ কেজি
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট	৮০-১০০ কেজি
বরিক এসিড	৮-১০ কেজি
গোবর	৫ টন

গোবর, অর্ধেক ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক সালফেট রোপণের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর ভেলীতে মাটি উঠিয়ে জমিতে সেচ দিতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

আলু উৎপাদনে সেচের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে রবি মৌসুমে আলুতে সেচ প্রয়োগ করলে ফলন কয়েকগুণ বেড়ে যায়। আলুর তিনটি সংবেদনশীল বৃদ্ধি পর্যায় রয়েছে যে সময় সেচ প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য।

প্রথম সেচ : বীজ আলু বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (স্টোলন বের হওয়া পর্যায়ে)

দ্বিতীয় সেচ : বীজ আলু বপনের ৪০-৪৫ দিনের মধ্যে (গুটি বের হওয়া পর্যায়ে)

তৃতীয় সেচ : বীজ আলু বপনের ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে (গুটি বৃদ্ধি পর্যায়ে)

সেচ দ্বারা ভাল মানের উৎপন্ন প্রসেসিং আলু

সেচ প্রয়োগে ফলনের প্রভাব

সেচ এমনভাবে প্রয়োগ করতে হয় যেন গাছের শিকড়াঞ্চলের মাটি ভালভাবে ভিজে। গভীর বা অগভীর বা হস্তচালিত নলকূপ বা ভূ-উপরিস্থ পানি হতে পলিথিন হুস পাইপ বা ফারো (নালা) পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করায় উত্তম। অতিরিক্ত সেচের দরুণ যাতে গাছের গোড়ায় জলাবদ্ধতা না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এই প্রযুক্তিতে মৌসুমে আলুর জন্য ১৬০-১৮০ মিমি পানির প্রয়োজন হয়।

গাছের চাহিদা মোতাবেক মাটিতে উপযুক্ত সময়ে সঠিক পরিমাণ পানি প্রয়োগ করলে প্রসেসিং আলুর (বারি আলু-২৫ এবং বারি আলু-২৮) ফলন ও পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং খরচও কমে যায়। প্রসেসিং বারি আলু-২৫ ও ২৮ এর দুইটি সংবেদনশীল পর্যায় অর্থাৎ স্টোলন এবং গুটি বৃদ্ধির সময় সেচ প্রয়োগ একান্ত অপরিহার্য। এই পদ্ধতিতে আলু চাষ করলে বারি আলু-২৫ এর ফলন ৩৩-৩৫ টন/হেক্টর, পানির উৎপাদনশীলতা ২২-২৭ কেজি/ঘনমিটার এবং আয়-ব্যয়ের অনুপাত ২.৭৪ঃ১-৩.৬৪ঃ১ হয় এবং প্রতি হেক্টরে নীট মুনাফা ৩,০০,০০০-৪,০০,০০০ টাকা অর্জন করা সম্ভব। অন্যদিকে বারি আলু-২৮ এর ফলন ২৯-৩২ টন/হেক্টর, পানির ব্যবহার (১৫০-১৯০ মিমি) পানির উৎপাদনশীলতা ১৯-২৬ কেজি/ঘনমিটার এবং আয়-ব্যয়ের অনুপাত ২.৭:১-৩.২:১ হয়। বারি আলু-২৫ ফ্রেঞ্চ ফ্রাই এবং বারি আলু-২৮ চিপস এর জন্য উপযোগী। পানি সুষ্ঠু ব্যবহারের ফলে প্রসেসিং আলুর গুণগত খাদ্যমান অর্থাৎ টিএসএস (৫-৬ ব্রিক্স) ঘনত্ব (১-১.২) ড্রাই মেটার (২১-২৪%) এবং শর্করা (১৫-১৭%) ইত্যাদি বজায় থাকে যা বারি আলু-২৫ এর চেয়ে বারি আলু-২৮ এর গুণগত মান বেশি পাওয়া যায়।

করলা উৎপাদনে সেচ ও মালচ্ প্রযুক্তি

সারা বৎসরব্যাপী উৎপাদিত সবজি ফসলের মধ্যে করলা একটি গুরুত্বপূর্ণ সবজি হিসেবে পরিচিত। করলায় খাদ্যমান, প্রোটিন, খনিজ এবং ভিটামিন অধিক পরিমাণ পাওয়া যায়। করলা সাধারণত নিষ্কাশনযুক্ত মাটিতে ভাল হয়। একদিকে যেমন মাটিতে রসের ঘাটতি হলে ভাল ফলন দেয় না, তেমনি জলাবদ্ধতাও সহ্য করতে পারে না। তাই সুষ্ঠু সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার অভাবে করলা উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। করলা সাধারণত দিনের তাপমাত্রা ২৪-২৬° সে. থাকলে ভাল ফলন দেয়। আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণত করলা চাষে সেচ প্রয়োগ বা অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে না। সে কারণে গাছের বৃদ্ধি যথাযথ না হওয়ায় ফলন কমে যায়। তাই সময়মতো প্রয়োজনীয় পরিমাণ সেচ প্রয়োগ ও মালচ্ ব্যবহার করে অধিক ফলন যেমন পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি পানির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে অধিক মুনাফাও অর্জন করা সম্ভব।

বপনের সময় এবং পদ্ধতি

করলা চাষের জন্য বেলে দোআঁশ ও দোআঁশ মাটি উপযোগী। করলা সাধারণত মধ্য-জানুয়ারি থেকে মধ্য-ফেব্রুয়ারিতে চাষের উপযোগী। সাধারণত উঁচু বেডে নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদায় এর বীজ বপন করতে হয়।

সারের ব্যবহার

করলা চাষের জন্য নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করতে হয়।

সারের নাম	পরিমাণ
ইউরিয়া	১৭০-১৭৫ কেজি/হেক্টর
টি এস পি	১৭৫-১৮০ কেজি/হেক্টর
জিপসাম	১৫০-১৫৫ কেজি/হেক্টর
জিঙ্ক সালফেট	১২-১৫ কেজি/হেক্টর
বরিক এসিড	৪-১০ কেজি/হেক্টর
গোবর	২০-২৫ টন/হেক্টর

সেচ প্রয়োগ

গাছের চাহিদা মোতাবেক মাটিতে পানি সরবরাহ ভাল ফলনের পূর্বশর্ত। মাটির রস সংরক্ষণের জন্য মাটিতে পরিমাণমতো মাল্চ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। করলা চাষে খরিফ মৌসুমে প্রাথমিক বৃদ্ধি পর্যায়ে সাধারণত সেচের প্রয়োজন হয়। তবে ফুল আসা এবং ফল ধরার পর্যায়ে যদি বৃষ্টিপাত হয় তখন পানি নিষ্কাশনের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। রবি মৌসুমে মাটিতে পরিমাণমতো রস না থাকলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চারা গজানোর ১২-১৫ দিন পরপর রিং বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে করলা উৎপাদনের জন্য প্রায় ১৮০-২০০ মিমি পানির প্রয়োজন হয়।

সেচ ও মালচ্ প্রয়োগে ফলনের প্রভাব

গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধি ও ফলনের জন্য পরিমিত সেচ প্রয়োগ এবং মাটির রস বজায় রাখার জন্য মাল্চ অপরিহার্য। শুষ্ক মৌসুমে চারা গজানোর ১৪ দিন পর পর মাল্চসহ গাছের গোড়ায় পরিমিত সেচ প্রয়োগ করলে করলার ফলন অধিকতর বৃদ্ধি পায়। এই পদ্ধতিতে করলা চাষ করলে প্রতি হেক্টরে ১৩-১৫ টন ফলন পাওয়া করা সম্ভব। পরিমাণমতো মাল্চ ও সেচ প্রয়োগের ফলে মৌসুমে ২২০-২৬০ মিমি পানি ব্যবহারের মাধ্যমে আয়-ব্যয়ের অনুপাত ২.৪ঃ১-৩ঃ১ হয় এবং প্রতি হেক্টরে নীট মুনাফা ৭০,০০০-৭৫,০০০ টাকা অর্জন করা সম্ভব।

করলা উৎপাদনে সেচ ও মালচ্ প্রযুক্তি (ছবি-১)

করলা উৎপাদনে সেচ ও মালচ্ প্রযুক্তি (ছবি-২)

বেড ও ফারো (নালা) সেচ পদ্ধতিতে লবণাক্ত এলাকায় ফসল চাষ

বাংলাদেশের মোট আবাদযোগ্য জমির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ দক্ষিণের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত, যার প্রায় অর্ধেকের বেশি কম-বেশি লবণাক্ততায় আক্রান্ত। বছরের বেশিরভাগ সময় এ সকল জমির অধিকাংশই থাকে জলাবদ্ধ, আবার শুষ্ক মৌসুমে দেখা দেয় সেচযোগ্য স্বাদু পানির তীব্র সংকট। ফলে দেশের অন্যান্য এলাকার চেয়ে দক্ষিণাঞ্চলে ফসলের নিবীড়তা ও ফলন উভয়ই অনেক কম, যা অত্র অঞ্চলের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রতিবন্ধক। অতঃপর, এ অঞ্চলের কৃষির উন্নয়নের জন্য যেমন প্রয়োজন লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত, তেমনি প্রয়োজন উন্নত পানি ও মাটির ব্যবস্থাপনা। সীমিত সেচযোগ্য পানির সঠিক ও বুদ্ধিমান প্রয়োগে লবণাক্ত এলাকায় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং সেইসাথে বাড়ানো সম্ভব এই অঞ্চলের ফসল আবাদের ব্যাপকতা। বেড ও ফারো (নালা) হলো এমন একটি সহজ সেচ ব্যবস্থা যেটি প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে অনেক পানি সাশ্রয়ী এবং লাভজনক।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এ পদ্ধতিতে ১৫-২০ সেমি উচ্চতায় বেডে ফসলের বীজ বপন/ চারা রোপণ করার পর জমিতে মালচ (খড় বা পাতার আস্তরণ) প্রয়োগ করতে হয়।
- পাশাপাশি দুইটি বেডের মাঝখানে একটি ফারো (নালা) রাখতে হয় যেটি সেচ প্রয়োগ এবং/অথবা অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত হয়।
- বেড ও ফারো পদ্ধতিতে প্রায় সব ধরনের ফসলই চাষ করা সম্ভব, তবে সারিতে বা পীটে রোপণযোগ্য সবজি জাতীয় ফসল (যেমন- টমেটো, বেগুন, তরমুজ, কুমড়া, ইত্যাদি) বেশি কার্যকরী।
- বেড ও ফারো পদ্ধতিতে সরাসরি নালা দিয়ে অথবা ড্রিপ/হুস পাইপের মাধ্যমে উভয়ভাবেই সেচের পানি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ

- ফসল উৎপাদনে এ পদ্ধতির ব্যবহারে প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ কম পানি লাগে, অপরদিকে শতকরা প্রায় ২০ ভাগ ফলন বৃদ্ধি পায়।
- বপন/রোপণের সময় শতকরা প্রায় ২০-৩৫ ভাগ বীজ কম লাগে।
- বেডে ফসল চাষ সার ও কীটনাশকের ব্যবহার ব্যাপকভাবে কমাতে সক্ষম।
- এ পদ্ধতিতে ফসল উৎপাদনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল কম আগাছার সংক্রমণ। নির্দিষ্ট দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে চারা লাগানোতে এবং সারির মাঝখানে ফাঁকা জায়গা থাকায় আগাছা দমন (হাত দিয়ে বা মেকানিক্যাল) সহজতর হয়।
- গাছপ্রতি আলো-বাতাস পানি ও সারের বন্টন সুষম হওয়ায় গাছের বৃদ্ধি ভালো হয়, রোগের আক্রমণ কম হয় এবং বীজ/দানা/ফলের আকার সুঠাম হয়।
- ফসলের লজিং (ঢলে পড়া) কম হয়।
- গাছের গোড়ায় লবণাক্ততা হ্রাস পায়।
- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভালো থাকায় অল্প বৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় না ফলে এ পদ্ধতিতে পানিতে নাজুক ফসল চাষ সুবিধাজনক।

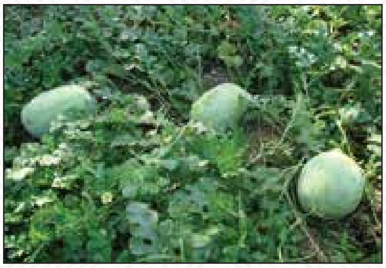

বেড ও ফারো সেচ পদ্ধতিতে লবণাক্ত এলাকায় যথাক্রমে টমেটো, শশা ও তরমুজ চাষ

লবণাক্ত অঞ্চলে রবি ফসলে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহার

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততা কৃষির জন্য বড় সমস্যা। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মাটি ও পানির লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও বৈরি পরিবেশ ইত্যাদি কৃষি উৎপাদনকে ক্রমান্বয়ে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। রবি মৌসুমে স্বাদু পানির অভাবে এবং লবণাক্ততার কারণে অধিকাংশ জমি পতিত থাকে ফলে কৃষকরা রবিশস্য জন্মাতে পারে না। কিছু কিছু এলাকায় নালা, পুকুর বা ডোবা থাকলেও উন্নত সেচ পদ্ধতির অভাবে ফসলে পানি প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয় না বা প্রচলিত পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করে থাকলেও আশানুরূপ ফসল ফলানো সম্ভব হয় না। প্রতিকূল পরিবেশের মাঝে দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে উন্নত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অধিক পরিমাণ ফসল ফলানো সম্ভব। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ায় মাটির লবণাক্ততা প্রায় এক ডিএস/মি এর নীচে নেমে আসে এবং নভেম্বর থেকে লবণাক্ততা বাড়তে থাকে যা মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে ১২ ডিএস/মি এর চেয়ে বেশি হয়। ফলে লবণাক্ত অঞ্চলে রবি ফসলে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহারের ফলে পানির উৎপাদনশীলতা ও ফসলের নিবিড়তা বাড়ানো সম্ভব।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ফসলের সংবেদনশীল পর্যায়গুলোতে পরিমিত ভূ-গর্ভস্থ মিঠা পানি প্রাথমিক পর্যায়ে ও খালের/নালা মাঝারি মানের লবণাক্ত পানি পরবর্তী পর্যায়ে সেচ দেওয়া হয়।
- ২.৮-৪.৩ ডিএস/মি মাত্রা ভূ-গর্ভস্থ পানি ফসলের প্রাথমিক পর্যায়ে সেচের জন্য উপযোগী।
- ৪.৬-৬.৪ ডিএস/মি মাত্রায় লবণাক্ত খালের/নালা পানি ফসলের মাঝামাঝি বা শেষ পর্যায়ে জমিতে সেচ প্রয়োগ করা যায়। এ ক্ষেত্রে ফসলের ফলনের খুব একটা তারতম্য হয় না।
- উপকূলীয় অঞ্চলের পতিত জমিতে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন করে কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হতে পারেন।
- উপকূলীয় এলাকায় গম, সরিষা, ভুট্টাসহ অধিকাংশ রবি ফসলের ক্ষেত্রে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ প্রয়োগ অত্যন্ত উপযোগী।

প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ

- লবণাক্ত এলাকায় গম, সরিষা, ভুট্টাসহ অধিকাংশ রবি ফসলের ক্ষেত্রে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ প্রয়োগ অত্যন্ত উপযোগী।
- ফসলের মাঝামাঝি বা শেষ পর্যায়ে ৪.৬-৬.৪ ডিএস/মি মাত্রার লবণাক্ত খালের/নদীর পানি ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ফসলের ফলনের তেমন কোন ক্ষতি হয় না।
- মাঝারি মাত্রার লবণাক্ত খালের/নালার পানি ফসল উৎপাদনে সেচের পানির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে দেশের দক্ষিণ অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় অধিক রবি ফসল উৎপাদন সম্ভব। ফলে ফসলের নিবীড়তা বাড়ার সাথে সাথে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

হাইব্রিড ভুট্টার গুণগত মানের বীজ উৎপাদনের জন্য সেচ ব্যবস্থাপনা

ভুট্টা একটি উচ্চ ফলনশীল দানাদার শস্য। বাংলাশের চাল গমের পরই তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ফসল হলো ভুট্টা। বিশ্বব্যাপী মানব ও পশু সম্পদের পুষ্টি উপাদান হিসাবে ভুট্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থায় পানির সীমাবদ্ধতার কারণে টেকসই ও সবল ভুট্টা বীজ উৎপাদনের প্রভাব ফেলছে। যথাযথ সেচের অভাবে বীজের পূর্ণতা, আকার আকৃতি ও গুণগত মান নষ্ট হচ্ছে। ফলে বীজের গুণগতমানের কারণে বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম ক্ষমতাও হ্রাস পাচ্ছে। হাইব্রিড ভুট্টার বীজের প্রাণশক্তির কার্যকারিতা, গুণগতমান ও আশানুরূপ ফসল বজায় রাখার জন্য পরিমিত সেচ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।

বপনের সময় ও পদ্ধতি

বাংলাদেশে সারা বছরই ভুট্টা চাষ করা যায়। তবে রবি মৌসুমে চাষ করলে শতকরা প্রায় ২০-৩০ ভাগ বেশি ফলন পাওয়া যায়। রবি মৌসুমে অর্থাৎ মধ্য কার্তিক হতে অগ্রহায়ণের শেষ (নভেম্বরের শুরু হতে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি) পর্যন্ত বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। যদি অঙ্কুরোদগমের হার শতকরা ৯০ বা তার উপরে হয় তাহলে একর প্রতি ৭-৮ কেজি ভুট্টা বীজ লাগবে। বীজ সারিতে বপন করতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ২০ সেমি।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

ভুট্টা চাষে বিভিন্ন প্রকার সারের পরিমাণ নিম্নে দেওয়া হল

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	১৭২-৩১২ কেজি
টিএসপি	১৬৮-২১৬ কেজি
এমওপি	৯৬-১৪৪ কেজি
জিপসাম	১৪৪-১৬৮ কেজি
জিংক সালফেট	১০-১৫ কেজি
বরিক এসিড	৫-৭ কেজি
গোবর	৪-৬ টন

জমি তৈরির শেষ চাষ ও মই দেওয়ার আগে অনুমোদিত ইউরিয়ার এক তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সারের সবটুকু ছিটিয়ে চাষ দিতে হবে। বাকী ইউরিয়া সমান ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ২৫-৩০ দিন পর এবং দ্বিতীয় কিস্তি বীজ গজানোর ৪০-৫০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা গজানোর ৩০ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত চারা তুলতে হবে এবং জমি আগাছামুক্ত রাখতে হবে। ভুট্টা চাষের অন্যান্য পরিচর্যা প্রচলিত উন্নত পদ্ধতির মতোই অনুসরণ করতে হবে।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ভুট্টায় আশানুরূপ ফলন পেতে হলে বাংলাদেশের আবহাওয়ায় এলাকাভেদে ৩ থেকে ৪টি সেচ প্রয়োগ অত্যাবশ্যক।
- মাটির প্রকারভেদে নিয়ন্ত্রিত প্লাবন প্রচলিত ফারো বা অল্টারনেট ফারো বা স্প্রিংলার পদ্ধতিতে সেচ দেয়া যেতে পারে।
- বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের মধ্যে (৪-৬ পাতা পর্যায়) প্রথম সেচ দিতে হবে।
- বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে (৮-১২ পাতা পর্যায়) দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে।
- বীজ বপনের ৭০-৭৫ দিনের মধ্যে (মোচা বের হওয়া পর্যায়) তৃতীয় সেচ দিতে হবে।
- বীজ বপনের ৯০-১০০ দিনের মধ্যে (দানা বাঁধার আগের পর্যায়) চতুর্থ সেচ দিতে হবে।
- সেচের পানি বাষ্পায়ন জনিত অপচয় রোধকল্পে ফসলের জমিতে সেচ সাধারণত সকালে অথবা বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। তাছাড়া প্রচণ্ড তাপমাত্রার রৌদ্রের সময় যাতে ফসলের জমিতে সেচ না দেওয়া হয় সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।
- ভুট্টার ফুল ফোটা ও দানা বাঁধার সময় কোনোক্রমেই জমিতে যাতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

ভুট্টা চাষে সেচ প্রযুক্তি

প্রযুক্তির সুবিধাসমূহ

- গবেষণায় দেখা গেছে যে, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯ এর গুণগতমানের বীজ উৎপাদনের জন্য চারটি সেচ অত্যাবশ্যক।
- ভাল মানের বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভুট্টার ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি পর্যায়ে সেচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- সঠিকভাবে সার ও পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯ এর হেক্টর প্রতি ৮-৯ টন ভাল গুণগতমানের বীজ উৎপাদন করা সম্ভব।

- পরিমিত সেচ প্রয়োগের ফলে ভুট্টা বীজের পুষ্ঠমান ও প্রাণশক্তি বৃদ্ধির ফলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে বেশি হয়।
- ভুট্টা চাষে উন্নত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানসম্মত বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নীট মুনাফা প্রচলিত সেচ পদ্ধতির চেয়ে বেশি পাওয়া সম্ভব।

কাঁঠাল চাষে সেচ পদ্ধতি

কাঁঠাল বাংলাদেশের জাতীয় ফল। বাংলাদেশের সব জেলাতেই কাঁঠালের চাষ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে কাঁঠালের মোট উৎপাদন প্রায় ৯.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন। কাঁঠাল সাধারণত ভাল নিষ্কাশনযুক্ত মাটিতে ভাল হয়। ইহা একদিকে যেমন জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না, অন্যদিকে মাটিতে রসের ঘাটতি হলেও ভাল ফলন দেয় না। কাঁঠাল গ্রীষ্মকালীন ফল বিধায় শুষ্ক আবহাওয়ার সময়ই চাষাবাদ করা হয়। সাধারণত এ সময়ে বৃষ্টিপাত হয়না বললেই চলে। আমাদের দেশের কৃষকেরা সাধারণত কাঁঠাল গাছে সেচ প্রদান করে না। সে কারণে ফুল আসার সময় হতে ফল ধরা বা বৃদ্ধি পর্যায়ে মাটিতে পরিমিত রস না থাকার কারণে কাঁঠালের উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। গাজীপুর জেলার শ্রীপুর এলাকায় ৪-৫ বৎসর যাবত গবেষণার মাধ্যমে দেখা যায়, প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে একবার সার প্রয়োগসহ ফুল আসার সময় হতে ফল পরিপক্ক হওয়ার সময় পর্যন্ত প্রতি ১৫ দিন অন্তর সেচ দিলে ফলন ৩.০-৩.৫ গুণ ফলন বেশি হয়।

সারের ব্যবহার

অক্টোবর মাসে নিম্নোক্ত হারে গাছে সার প্রদান করে একটি স্বাভাবিক সেচ দিতে হয়। প্রতিটি ফলন্ত গাছের জন্য সারের মাত্রা নিম্নরূপ:

সারের নাম	পরিমাণ/গাছ প্রতি
গোবর/কম্পোস্ট	৩০ কেজি
ইউরিয়া	১০০০-১১০০ গ্রাম
টিএসপি	১৫০০ গ্রাম
এমওপি	১০০০-১১০০ গ্রাম
জিপসাম	২৫০ গ্রাম

গাছের গোড়া থেকে ২-২.৫ মিটার দূরে বৃত্তাকার আকারে ড্রিবলিং পদ্ধতিতে (গর্ত করে) এ সার প্রয়োগ করলে ভাল হয়। এতে শিকড়ের কোন ক্ষতি হয় না।

সেচ প্রয়োগ

গাছের গোড়া হতে ২ থেকে ৩ মিটার দূরে বৃত্তাকার বেসিন তৈরি করে সেচ প্রয়োগ করতে হয়। গভীর বা হস্তচালিত নলকূপ হতে পলিথিন হুস পাইপের সাহায্যে পানি বৃত্তাকার বেসিনে প্রয়োগ করায় উত্তম। সেচ এমনভাবে প্রয়োগ করতে হয় যেন শিকড়ের ১ মিটার গভীর পর্যন্ত মাটি ভালভাবে ভেজে। অতিরিক্ত সেচের দরুণ ৫-৭ ঘণ্টার বেশি সময় যেন গাছের গোড়ায় জলাবদ্ধতা না থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

সেচ প্রয়োগে ফলনের প্রভাব

গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, গাছে ফুল আসা হতে শুরু করে ফল পাকা পর্যন্ত প্রতি ১৫ দিন অন্তর সেচ দিলে সেচ বিহীন গাছের তুলনায় প্রায় ৩.০-৩.৫ গুণ ফলন বেশি পাওয়া যায়। শুধুমাত্র ফুল আসার সময় এবং ফল ধরার সময় ২ বার সেচ প্রয়োগ করলেও সেচবিহীন গাছের চেয়ে প্রায় ২ গুণ ফলন বেশি পাওয়া সম্ভব।

সেচবিহীন কাঁঠাল গাছ

সেচকৃত কাঁঠাল গাছ

লিচু চাষে সেচ প্রযুক্তি

লিচু (Litchi chinensis) একটি জনপ্রিয় গ্রীষ্মকালীন ফল। আকর্ষণীয় বর্ণ, স্বাদ ও উচ্চমান পুষ্টিগুণ ছাড়াও এটি গ্রীষ্মকালীন প্রচণ্ড দাবদাহে মানবদেহ ঠাণ্ডা রাখতে অন্যতম সহায়ক। লিচু ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ ফল। এছাড়া এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে অন্যান্য ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও এন্টি-অক্সিডেন্ট বিদ্যমান। এটি একটি স্বল্পকালীন ফল এবং বাজারে বেশ উচ্চমূল্যে বিক্রয় হয় বিধায় এর চাষ খুবই লাভজনক। গ্রীষ্মকালীন ফল বিধায় এটি শুষ্ক আবহাওয়ার সময়ই চাষাবাদ করা হয়। বাংলাদেশে ২০১১-২০১২ অর্থবছরে সর্বমোট ৫,৫৯৮.৩৮ হেক্টর জমিতে লিচু চাষ হয় এবং উৎপাদিত লিচুর পরিমাণ ৫৬.৬৮৭ মেট্রিক টন (হাজারে), প্রতিটি গাছে উৎপাদিত লিচুর সংখ্যা প্রায় ৫০ কেজি (বিবিএস-২০১৩)। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট দীর্ঘদিন যাবত লিচু চাষের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে এবং অদ্যাবধি বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চারটি জাত উদ্ভাবন করেছে যার প্রাতিষ্ঠানিক নাম বারি লিচু-১, বারি লিচু-২, বারি লিচু-৩, বারি লিচু-৪। অত্র ইনস্টিটিউটের সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ লিচু গাছে সেচের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছে এবং স্বল্প পানি ব্যবহারে করে বেশি ফলন পাবার প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

মাটি ও আবহাওয়া

লিচু অগ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলের ফল। সংক্ষিপ্ত ঠাণ্ডা, শুষ্ক, বরফমুক্ত শীতকাল এবং উচ্চ বৃষ্টিপাত ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা সম্পন্ন দীর্ঘ উষ্ণ গ্রীষ্মকাল সমৃদ্ধ অঞ্চলে লিচু সবচেয়ে ভাল হয়। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২০০ মিলিমিটার ও ৭০%- ৮০% আপেক্ষিক আর্দ্রতা লিচু চাষের উপযোগী। লিচু গাছের সন্তোষজনক বৃদ্ধির জন্য মাটিতে মাইকড়ইজা নামক ছত্রাকের উপস্থিতি প্রয়োজন। গভীর, নিকাশযুক্ত, উর্বর বেলে অথবা দোআঁশ মাটি লিচু চাষের জন্য উত্তম। বাংলাদেশের সর্বত্রই কমবেশি এর চাষ হয়। তবে বৃহত্তর রাজশাহী, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, পাবনা, ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম জেলায় বেশি পরিমাণে লিচু উৎপন্ন হয়। ফুল আসা পর্যায়ে দেশের অধিকাংশ এলাকার তাপমাত্রা হয় ২২°- ২৩° সে. এবং গুটি আসার সময় এ তাপমাত্রা হয় ২৫° - ২৬° সে.। পরবর্তীতে তাপমাত্রা আরও বেড়ে যায়, প্রস্বেদনের পরিমাণও বেড়ে যায়। এ সময় ভূ-গর্ভস্থ এবং ভূ-উপরিস্থ উভয় পানির প্রাপ্যতা হ্রাস পায়।

সারের পরিমাণ ও প্রয়োগ পদ্ধতি

গাছের যথাযথ বৃদ্ধি ও কাঙ্ক্ষিত ফলনের জন্য সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছের বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন বয়সের গাছের জন্য প্রয়োজনীয় সারের পরিমাণ নিচের ছকে দেয়া হল:

গাছের বয়স (বছর)	সারের পরিমাণ (গ্রাম/গাছ/বছর)					
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	বরিক এসিড	গোবর (কেজি/গাছ/বছর)
রোপণের পূর্বে	-	৫০০	-	১৯৩	-	২০
০ - ১	৩০০	-	-	-	-	১০
২ - ৪	৪০০	৫০০	২০০	১০০	১৫	১০
৫ - ৭	৫০০	৭৫০	৪০০	১০০	৩০	১৫
৮ - ১০	৭৫০	১৫০০	৮০০	১০০	৩০	২০
১১ - ১৫	১২০০	২০০০	১২০০	১৫০	৪৫	৩০
১৬ - ২০	১৫০০	২৫০০	১৫০০	২০০	৬০	৪০
২০	২০০০	৩৫০০	২০০০	২৫০	৭৫	৫০

চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে রোপণের জন্য প্রস্তুতকৃত গর্তে পরিমাণমতো গোবর, টিএসপি এবং জিপসাম ভাল করে মিশ্রিত করে প্রয়োগ করতে হবে। এ সময় সেচ প্রয়োগ করতে হবে। চারার প্রথম বছর, একই সময়ে জৈব সার এবং ইউরিয়া চারার চারদিকে প্রয়োগ করতে হবে এবং মাটির সাথে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। পরের বছর হতে, সকল

সার সমান তিন কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। প্রথম কিস্তি বর্ষার শুরুতে (ফল আহরণের পর), দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষার শেষে (আশ্বিন-কার্তিক মাসে) এবং শেষ কিস্তি গাছে ফুল আসার পর প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার সার প্রয়োগের পর সেচ প্রয়োগ করতে হবে।

সেচ প্রয়োগ

- গাছের গোড়া হইতে ২ থেকে ৩ মিটার দূরে রিং বেসিন পদ্ধতিতে পানি প্রয়োগ করতে হবে।
- গভীর, অগভীর বা হস্তচালিত নলকূপ হতে পলিথিন হুস পাইপের সাহায্যে রিং বেসিন পদ্ধতিতে সেচ প্রয়োগ করাই উত্তম।
- সেচ এমনভাবে প্রয়োগ করতে হবে যেন শিকড়ের ৯০ সেমি গভীর পর্যন্ত মাটি ভালভাবে ভেজে।
- গাছের গোড়ায় মাটিতে পানির প্রাপ্যতা অনুযায়ী ফুল ফোটা পর্যায়ে (ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ) একবার এবং গুটি আসার সময় একবার (এপ্রিল) মোট দুইবার প্রতি গাছে প্রায় ১,৮০০ লিটার থেকে ২,৪০০ লিটার পানি প্রয়োগ করতে হবে।
- সেচের পানি সাধারণত সকালে অথবা বিকালে প্রয়োগ করতে হবে। যাতে সেচের পানি বাষ্পায়নজনিত অপচয় রোধ করা যায়। তাছাড়া প্রচণ্ড তাপমাত্রায় রৌদ্রের সময় যাতে, লিচু গাছের গোড়ায় সেচ না দেওয়া হয় সেদিকে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সেচের ওপর লিচুর ফলনের প্রভাব

ক্রমিক নং	সেচ পর্যায়	প্রতি গাছে ফলন (কেজি)	প্রতি গাছে আয় (টাকা)
১.	বিনাসেচ	২৮.৪৯	৫,৮২৪.০০
২.	ফুল আসা পর্যায় ১টি সেচ প্রয়োগ	৩৯.৯০	৮,০৮৪.০০
৩.	গুটি আসা পর্যায় ১টি সেচ প্রয়োগ	৩৬.৮২	৭,৩৪৩.০০
৪.	ফুল ও গুটি আসা উভয় পর্যায় ২টি সেচ প্রয়োগ	৪৪.৩৮	৮,৯৯৮.০০
৫.	গুটি আসার পর ১৫ দিন পর পর সেচ প্রয়োগ	৫২.৭৭	১১,০১০.০০

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ও ফল সংগ্রহ

- গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য জমিকে আগাছামুক্ত করতে হবে। গাছের মরা, রোগাক্রান্ত ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। কলমের চারার ক্ষেত্রে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রথম ৩-৪ বছর পর্যন্ত মুকুল আসলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।
- লিচুতে সাধারণত ফল ছিদ্রকারী পোকা, লিচুর মাইট বা মাকড়, পাউডারী মিলডিউ ইত্যাদির আক্রমণ দেখা যায়। ফল ছিদ্রকারী পোকা থেকে রক্ষা পেতে হলে বাগান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। আক্রান্ত ফল বাগান থেকে কুড়িয়ে মাটির গভীরে পুঁতে ফেলতে হবে। এ পোকা দমনের জন্য রিপকর্ড/ সিমবুশ/ সুমিসাইডিন/ ডেসিস স্প্রে করতে হবে। লিচুর মাইট বা মাকড় আক্রমণ দেখা দিলে ফল সংগ্রহের সময় আক্রান্ত পাতা ডালসহ ভেঙ্গে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। পোকা দমনে মাকড় নাশক ওমাইট ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। পাউডারী মিলডিউ রোগে আক্রান্ত গাছে টিল্ট/থিওভিট ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া বাদুর লিচুর প্রধান শত্রু। বাদুড় তাড়ানোর জন্য রাতে পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত গাছ জালের সাহায্যে ঢেকে অথবা বাগানে গাছের উপর দিয়ে শক্ত ও চিকন সুতা টাঙ্গিয়ে রাখলে বাদুরের চলাচল বাঁধাগ্রস্থ হয়।

সেচের সুবিধাসমূহ

- গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, গাছে ফুল আসার সময় এবং ধরার সময় ২ (দুই) বার সেচ দিলে সেচ বিহীন গাছের চাইতে ২-২.৫ গুণ ফলন বেশি হয়।
- ফলন বেশি হওয়ায় কৃষক প্রায় ২-২.৫ গুণ বেশি লাভবান হবে।

- সঠিক পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করলে লিচুর অন্তর্নিহিত গুণাগুণ বৃদ্ধি পায়। যার দরুণ বাজারে এর চাহিদা বৃদ্ধি পায়।
- গবেষণায় দেখা গেছে পরিমিত পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করলে ফল ফেটে যাওয়া এবং ঝরে পড়া হ্রাস পায়।

গভীর নলকূপে পানি বিভাজন যন্ত্রের ব্যবহার

অগভীর নলকূপের পানি প্রবাহের সবটাই যখন একবারে কোন হাল্কা বুনটের ফসলের জমিতে প্রয়োগ করা হয় তখন মাটির অতিরিক্ত ক্ষয় এবং চারাগাছের সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়। বীজ বোনা বা চারা লাগানোর অল্প দিনের মধ্যেই যদি এভাবে সেচ প্রয়োগ করা হয় তাহলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। তাই অগভীর নলকূপের পানিকে ভাগ করে প্রয়োগ করলে পানির ধারার আঘাত কম হয় এবং ফসলের ক্ষতির পরিমাণও অনেক কমে যায়। এ ব্যাপারে অগভীর নলকূপের পানি বিভাজন যন্ত্রটি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

বৈশিষ্টসমূহ

- যন্ত্রটি এমএস পাইপ, রিডিউসার, ফ্রেঞ্জ ইত্যাদি দিয়ে তৈরি।
- অগভীর নলকূপের পানির প্রবাহকে এই যন্ত্রের সাহায্যে ২ বা ৪ ভাগে ভাগ করে জমিতে প্রয়োগ করা যায়।
- যন্ত্রটি সর্বোচ্চ ১০ লিটার/সেকেন্ড প্রবাহের জন্য উপযুক্ত।
- প্রাইমিং এর সুবিধার্থে যন্ত্রটিতে একটি প্রাইমিং পোর্ট রাখা হয়েছে।
- পেঁয়াজ, রসুন ও অন্যান্য মসলাজাতীয় ফসল এবং ফুলকপি, বাঁধাকপি, ইত্যাদির জমিতে সেচ প্রয়োগের জন্য যন্ত্রটি অত্যন্ত উপযোগী।
- যন্ত্রটি ব্যবহার করে মাটির ক্ষয় ও চারা গাছের সমূহ ক্ষতি রোধ করা সম্ভব।
- যন্ত্রটি ব্যবহার করে ২ বা ৪ জন কৃষক এক সাথে নিজ নিজ জমিতে সেচ দিতে পারে।
- বর্তমানে যন্ত্রটির মূল্য ৩,০০০ টাকা। বেশি তৈরি করলে খরচ কমে ১,৫০০ টাকায় পাওয়া সম্ভব। পিভিসি দিয়ে তৈরি করলে তা আরও কমে প্রায় ৫০০-৬০০ টাকার মধ্যে পাওয়া যাবে।

সেচকৃত লিচু গাছ

সেচ বিহীন লিচু গাছ

সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা (আইপিএম)

বর্তমানে বাংলাদেশে বিভিন্ন ফসলের পোকা-মাকড় দমনের জন্য প্রচুর পরিমাণে বিষাক্ত কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। কীটনাশকের উপর্যুপুরি ব্যবহারের ফলে একদিকে যেমন পরিবেশগত, স্বাস্থ্যগত মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হচেছ অন্যদিকে তেমনি ব্যবহৃত কীটনাশক সমুহের উপর সহনশীল ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ায় পোকা-মাকড় দমনে এগুলি অকার্যকর হয়ে পড়ছে। এমতাবস্থায় কীটনাশকের উপর একক নির্ভরশীলতা পরিত্যাগ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাকারী, অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক, সহজ, উৎপাদক এবং ভোক্তার জন্য সবচেয়ে কম ক্ষতিকারক দমন ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা একান্তভাবে প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। যা সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা বা আইপিএম নামে পরিচিত। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীগণ ইদানিংকালে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় দমনে সহজ, নিরাপদ, কার্যকরী ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক সমন্বিত দমন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন। নিম্নে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের উপর আলোকপাত করা হলো:

আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির মাধ্যমে বিভিন্ন ফল যেমন আম, পেয়ারা, কমলা ও কুলের মাছি পোকা দমন

আম, পেয়ারা, কমলা, কুল ইত্যাদি ফলে মাছি পোকার আক্রমণে ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। মূলত মাছি পোকার কীড়া ফলের ভিতরে ঢুকে ক্ষতি করে থাকে বিধায় কীটনাশক ব্যবহার করে এই পোকা দমন করা খুবই কঠিন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ অতি সম্প্রতি আকর্ষণ ও মেরে ফেলার মাধ্যমে মাছি পোকা দমনের একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। এ প্রযুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একই সাথে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষ মাছি পোকা আকর্ষণ করে মেরে ফেলে এবং প্রযুক্তিটি কার্যকর, সহজ ও পরিবেশবান্ধব। ইতোপূর্বে ফেরোমন ফাঁদভিত্তিক দমন ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র পুরুষ মাছি পোকা ফাঁদে আকৃষ্ট হয়ে মারা যেতো। কিন্তু নতুন এই পদ্ধতির মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় পোকা আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়। পুরুষ মাছি পোকা আকর্ষণ করার জন্য মিথাইল ইউজিনল ফেরোমন ও জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত জেল বা পেষ্টের মত একটি পদার্থ বাগানের সীমানা লাইনে অবস্থিত গাছের কাণ্ডে (মাটি হতে ৩-৪ ফুট উপরে) ১০-১২ মিটার দূরে দূরে অল্প পরিমাণে লাগিয়ে দিতে হবে। এই ভাবে সারা বাগানের সীমানা লাইনের গাছ গুলিতে লাগিয়ে দেওয়ার ফলে অন্য বাগানেরসহ ঐ বাগানেরও পুরুষ মাছি পোকাসমূহ সীমানা লাইনের গাছে পেস্টের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে মারা যাবে। স্ত্রী মাছি পোকাকে আকৃষ্ট করে মেরে ফেলার জন্য বাগানের ভিতরের গাছ গুলোতে ১০-১২ মিটার দূরে দূরে জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত এক প্রকার পোকার খাবার সহ একটি ফাঁদ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতে হবে। গাছ অনেক বড় হলে একই গাছে পরিমাণ মতো উক্ত খাবারের ফাঁদ স্থাপন করা যেতে পারে। এভাবে বাগানের ভিতরে থাকা সকল স্ত্রী পোকা খাবারের লোভে আকৃষ্ট হয়ে পাত্রের কাছে ছুটে যাবে এবং মারা যাবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প খরচে এবং পরিবেশ সম্মত উপায়ে আম, পেয়ারা, কমলা, কুল ইত্যাদি ফসলের মাছি পোকা কার্যকরীভাবে দমনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বৎসর: ২০১৬।

আকৃষ্ট পুরুষ মাছি পোকা

স্ত্রী মাছি পোকার ফাঁদ

আম গাছে পুরুষ পোকা আকৃষ্টকরণ জেল

স্ত্রী মাছি পোকার ফাঁদ

আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির মাধ্যমে কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকা দমন

কুমড়া জাতীয় প্রায় ১৬টি সবজি, যেমন মিষ্টি কুমড়া, লাউ, করলা, কাঁকরল, চাল কুমড়া, ঝিঙ্গা, চিচিংগা, ধুন্দুল, পটল, তরমুজ ইত্যাদির ফলে মাছি পোকার আক্রমণ ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। মুলত মাছি পোকার কীড়া ফলের ভিতরে ঢুকে ক্ষতি করে থাকে বিধায় কীটনাশক ব্যবহার করে এই পোকা দমন করা খুবই কঠিন। আম, পেয়ারা ইত্যাদি ফসলের মাছি পোকা দমনের আর্কষণ করে মেরে ফেলা পদ্ধতির অনুরূপ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীগণ অতি সম্প্রতি কুমড়া জাতীয় সবজির মাছি পোকা দমনের একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছে। ইতোপূর্বে ফেরোমন ফাঁদভিত্তিক দমন ব্যবস্থাপনায় শুধুমাত্র পুরুষ মাছি পোকাকে আকৃষ্ট হয়ে মারা যেতো। কিন্তু নতুন এই পদ্ধতির মাধ্যমে পুরুষ ও স্ত্রী উভয় পোকা আকৃষ্ট হয়ে মারা যায়। পুরুষ মাছি পোকা আকর্ষণ করার জন্য কিউলিউর ফেরোমন ও জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত জেল বা পেস্টের মত একটি পদার্থ বাগানের সীমানা লাইনে অবস্থিত গাছের লতানো কাণ্ডে বা মাচার বাঁশে (মাটি হতে ২-৩ ফুট উপরে) ১০-১২ মিটার দূরে দূরে অল্প পরিমাণে লাগিয়ে দিতে হবে। এই ভাবে সারা বাগানের সীমানা লাইনে কিউলিউর ফেরোমন ও জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত জেল লাগিয়ে দেওয়ার ফলে অন্য বাগানেরসহ ঐ বাগানেরও পুরুষ মাছি পোকাসমূহ সীমানা লাইনের গাছে পেস্টের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে মারা যাবে। স্ত্রী মাছি পোকাকে আকৃষ্ট করে মেরে ফেলার জন্য বাগানের ভিতরের গাছ গুলোতে ১০-১২ মিটার দূরে দূরে জৈব বালাইনাশক মিশ্রিত এক প্রকার পোকার খাবার সহ একটি ফাঁদ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিতে হবে। এর ফলে বাগানের ভিতরে থাকা সকল স্ত্রী পোকা খাবারের লোভে আকৃষ্ট হয়ে ফাঁদের কাছে ছুটে যাবে এবং মারা যাবে। এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করে অল্প খরচে এবং পরিবেশ সম্মত উপায়ে কুমড়া জাতীয় ফসলের মাছি পোকা কার্যকরীভাবে দমনের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বৎসর: ২০১৬।

করলা গাছে পুরুষ পোকা আকৃষ্টকরণ জেল

করলা গাছে স্ত্রী মাছি পোকার ফাঁদ

ফলজ ও বনজ বৃক্ষের জায়ান্ট মিলিবাগ দমন ব্যবস্থাপনা

সম্প্রতি বাংলাদেশে জায়ান্ট মিলিবাগ বিভিন্ন ফলজ ও বনজবৃক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। এই পোকা বিভিন্ন ফলজ উদ্ভিদ যেমন- কাঁঠাল, আম, লেবু, নারিকেল এবং বনজ বৃক্ষ যেমন- রেইন ট্রি, কড়ই গাছে আক্রমণ করে। স্ত্রী নিম্ফ পোকা পুষ্পমঞ্জুরী, কচি পাতা, শাখা প্রশাখা ও ফলের বোঁটা থেকে রস শোষণ করে ফলে গাছের আক্রান্ত অংশ শুকিয়ে যায় যা ফল ধরার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং অনেক ফল ঝরে যায়। বিগত ২০১৪ সনে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের বৃক্ষ সমূহে এই পোকার ব্যাপক আক্রমণ পরিলক্ষিত হয় যা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বর্তমানে দেশের উত্তরাঞ্চলসহ বিভিন্ন অংশে এ পোকার ব্যাপক প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীগণ এ পোকা দমনে একটি সহজ প্রযুক্তি উ ডাবন করেছে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে পোকা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাবার পূর্বেই অতি সহজেই একত্রে মেরে ফেলা যায় অন্যদিকে এটি অত্যন্ত কার্যকরি, সহজ ও অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী।

সাধারণত আক্রমণের সময়ানুযায়ী ২টি পদ্ধতিতে এ পোকা দমন করা যায়, ১) মার্চ-এপ্রিল মাসে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা ধ্বংস করা এবং ২) নভেম্বর মাসে সদ্য প্রস্ফুটিত নিম্ফ ধ্বংস করা।

দমন পদ্ধতি ১: মার্চ- এপ্রিল মাসে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকা ধ্বংস করা: এপ্রিল-মে মাসে পূর্ণাঙ্গ স্ত্রী পোকাগুলো মাটিতে ডিম পাড়ার জন্য দলবদ্ধভাবে গাছ থেকে মাটিতে নেমে আসে তখন এরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ হতেই গাছের গোড়ায় মাটি থেকে ১ মিটার উচুঁতে ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া প্লাস্টিকের পিচ্ছিল ব্যান্ড (র‍্যাপিং টেপ) গাছের চতুর্দিকে আবৃত করে দিলে এরা উপর থেকে নেমে আসতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময় প্লাস্টিকের পিচ্ছিল ব্যান্ড এর উপরের অংশে স্ত্রীপোকাসমূহ জমা হয়। এ অবস্থায় এদের সহজেই পিটিয়ে বা একসাথে করে আগুনে পুড়িয়ে মারা সম্ভব অথবা জমাকৃত পোকার উপর সংস্পর্শ কীটনাশক স্প্রে করে দমন করা যায়। যেহেতু এ পোকাটির বহিরাবরণ ওয়াক্সি পাউডার জাতীয় পদার্থ দিয়ে সুরক্ষিত থাকে সেহেতু পরীক্ষিত কীটনাশক ছাড়া এটি দমন করা দুরূহ। এ ক্ষেত্রে প্রথমে ক্লোরপাইরিফস (ডারসবান ২০ ইসি বা এ জাতীয় কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ৩ মিলি হারে) এবং তার ২-৩ দিন পর কার্বারিল জাতীয় কীটনাশক (সেভিন ৮৫ এসপি বা মিপসিন ৭৫ ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে) আক্রান্ত অংশে স্প্রে করতে হবে। প্রতি ১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার এভাবে স্প্রে করলে এ পোকা সম্পূর্ণভাবে দমন করা সম্ভব।

দমন পদ্ধতি ২: নভেম্বর মাসে সদ্য প্রস্ফুটিত নিম্ফ ধ্বংস করা: নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ হতেই এ পোকার নিম্ফসমূহ গাছ বেয়ে উপরে উঠে তাই উক্ত সময় গাছের গোড়ায় মাটি থেকে ১ মিটার উঁচুতে ৩-৪ ইঞ্চি চওড়া প্লাস্টিকের পিচ্ছিল ব্যান্ড (র‍্যাপিং টেপ) গাছের চতুর্দিকে আবৃত করে দিলে এরা বার বার উঠার ব্যর্থ চেষ্টা করে পরিশ্রান্ত হয়ে মারা যায়। অনেক সময় প্লাস্টিকের পিচ্ছিল টেপ এর নিচের অংশে নিম্ফ সমূহ জমা হয়। এ অবস্থায় এদের সহজেই পিটিয়ে বা একসাথে করে আগুনে পুড়িয়ে মারা সম্ভব অথবা জমাকৃত পোকার উপর সংস্পর্শ কীটনাশক স্প্রে করে দমন করা যায়। ব্যান্ডের নিচে একত্রিত নিম্ফসমূহকে মেরে ফেলার জন্য কার্বারিল (সেভিন) ৮৫ এসপি প্রতি লিটার পানিতে ৩ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর ২-৩ বার ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। এসময় নিম্ফ সমূহকে গাছে উঠা হতে নিবৃত করতে পারলে এ পোকার আক্রমণ পুরোপুরিভাবে দমন করা সম্ভব।

গাছের কাণ্ডে বাইন্ডিং টেপ

বাইন্ডিং টেপের নিচে জায়েন্ট মিলিবাগের নিম্ফ

বাইন্ডিং টেপের নিচে জায়েন্ট মিলিবাগের নিম্ফ

বাইন্ডিং টেপের নিচে স্প্রে করে মিলিবাগ দমন

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বৎসর: ২০১৫

আমের ফুল ও ফল ঝরা রোধে টেকসই ব্যবস্থাপনা

আম একটি জনপ্রিয় ফল। সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে আমের উৎপাদন মারাত্বকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। সঠিক সময়ে ও মাত্রায় সার, সেচ, পোকামাকড়, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা না করায় আমের ফুল ও ফল ঝরে যায় এবং সামগ্রিকভাবে আমের উৎপাদন ব্যহত হয়। আম উৎপাদনকারী বাংলাদেশের ১৪টি জেলার ২০টি উপজেলায় কৃষক পর্যায়ে সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে আমের ফুল ও ফল ঝরা রোধের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির সমন্বিত প্যাকেজ উদ্ভাবন করা হয়েছে যা নিম্নরূপ:

ক) ফসল সংগ্রহের পর আগস্ট মাসে রোগক্রান্ত মরা ও অপ্রয়োজনীয় ডালপালা, শাখা প্রশাখা এবং পরগাছা ছেটে গাছে পর্যাপ্ত আলো বাতাসের ব্যবস্থা করতে হবে ।

খ) সেপ্টেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ হতে নিম্নে বর্ণিত উপায়ে সার প্রয়োগ করতে হবে।

গ) আমের মুকুল আসার ৭-১০ দিনের মধ্যে অথবা মুকুলের দৈর্ঘ্য ১ থেকে দেড় ইঞ্চি হলে (অবশ্যই ফুল ফুটে যাবার আগে) আমের হপার পোকা দমনের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড (কনফিডর) ৭০ ডব্লিউ জি বা অন্য নামের অনুমোদিত কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে অথবা সাইপারমেথ্রিন (রিপকর্ড) ১০ ইসি বা অন্য নামের অনুমোদিত কীটনাশক প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে বা অন্যান্য অনুমোদিত কীটনাশক এবং এনথ্রাকনোজ রোগ দমনের জন্য ম্যানকোজেব (ইন্ডোফিল) এম-৪৫ নামক বা অন্যান্য অনুমোদিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে একত্রে মিশিয়ে আম গাছের মুকুল, পাতা, শাখা প্রশাখা ও কাণ্ডে ভালভাবে ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। এরপর ৪-৫ সপ্তাহের মধ্যে আম মটরদানা আকৃতির হলে একই ধরনের কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক উল্লিখিত মাত্রায় একত্রে মিশিয়ে মুকুল পাতা ও কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা ভিজিয়ে আর একবার স্প্রে করতে হবে। আম গাছে হপার পোকা এবং এনথ্রাকনোজ রোগের হাত থেকে মুকুল রক্ষা করার জন্য উপরোক্ত পদ্ধতিতে ২ (দুই) বার কীটনাশক এবং ছত্রাকনাশকের একত্রে প্রয়োগ করাই যথেষ্ট।

ঘ) আম গাছে ভরা মুকুলের (Full bloom) সময় থেকে শুরু করে ১৫ দিন অন্তর আম গাছের গোড়ায় ৪ বার সেচ দিতে হবে।

গাছে সার প্রয়োগ: চারা রোপণের পর গাছের সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত সার প্রয়োগ করা আবশ্যক। গাছ বৃদ্ধির সাথে সাথে সারের পরিমাণও বাড়াতে হবে। বয়স ভিত্তিতে গাছ প্রতি সারের পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো।

সারের নাম	গাছের বয়স (বছর)					
	১-৪	৫-৭	৮-১০	১১-১৫	১৬-২০	২০-এর উর্ধ্বে
গোবর (কেজি)	২৬.২৫	৩৫	৪৩.৭৫	৫২.৫০	৭০	৮৭.৫০
ইউরিয়া (গ্রাম)	৪৩৭.৫০	৮৭৫	১৩১২.৫০	১৭৫০	২৬২৫	৩৫০০
টিএসপি (গ্রাম)	৪৩৭.৫০	৪৩৭.৫০	৮৭৫	৮৭৫	১৩১২.৫০	১৭৫০
এমওপি(গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৭.৫০	৭০০	৮৭৫	১৪০০
জিপসাম (গ্রাম)	১৭৫	৩৫০	৪৩৭.৫০	৬১২.৫০	৭০০	৮৭৫
জিংক সালফেট (গ্রাম)	১৭.৫০	১৭.৫০	২৬.২৫	২৬.২৫	৩৫	৪৩.৭৫
বরিক এসিড	৩৫	৩৫	৫২.৫০	৫২.৫০	৭০	৮৭.৫০

প্রয়োগ পদ্ধতি: বয়স ভেদে নির্ধারিত সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বরিক এসিড এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি সার সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন ফল মটর দানার মতো হয় তখন এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, গাছের চারিদিকে গোড়া থেকে কমপক্ষে ১ থেকে ১.৫ মি. দূরে হালকাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বেশি হলে এই দূরত্ব বাড়তে পারে। সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে।

সুস্থ আমের মুকুল

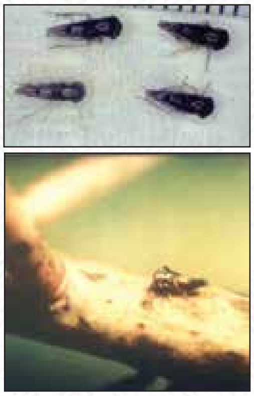

আমের হপার পোকা

হপার আক্রান্ত আমের মুকুল

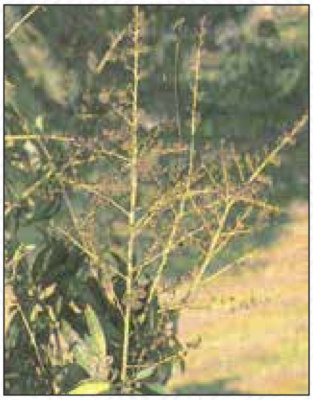

পোকা আক্রান্ত আমবিহীন মুকুল

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বৎসর: ২০১৫।

কচু ফসলের সাধারণ কাটুই পোকা (*Spodoptera litura*) এর সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

সাধারণ কাটুই পোকা (*Spodoptera litura*) কচু ফসলের একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা। বিগত কয়েক বছর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে কচু ফসলে এ পোকার ব্যাপক আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পোকার কীড়া সাধারণত গাছের পাতা অথবা সবুজ অংশ খায়। পূর্ণবয়স্ক কীড়া খুব দ্রুত সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে। গাছের সমস্ত পাতায় বড় বড় ছিদ্র হয় এবং পাতা নষ্ট হয়ে যায়। অনেক সময় গাছ মরে যায়। এ পোকা কচুর লতিতেও আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে থাকে।

কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকাসমূহ সহজে পরিবেশসম্মতভাবে দমন করা সম্ভব।

ক) আক্রান্ত পাতা হাত বাছাই: ডিমের গাদা ও কীড়াসহ আক্রান্ত পাতা হাত দিয়ে সংগ্রহ করে ধ্বংস করতে হবে।

খ) ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার: কচুর জমিতে চারা রোপনের দুই সপ্তাহ পরে ২০ মিটার দূরে দূরে সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে।

গ) উপকারী পোকা অবমুক্তকরণ: প্রতি সপ্তাহে একবার করে কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি পূর্ণাঙ্গ পোকা) কচুর জমিতে মুক্তায়িত করতে হবে।

ঘ) জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার: আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব বালাইনাশক এসএনপিভি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বৎসর: ২০১৫।

সাধারণ কাটুই পোকা আক্রান্ত কচু পাতা

কচুর জমিতে স্থাপিত সেক্স ফেরোমন ফাঁদ

মরিচের ফলছিদ্রকারী পোকা এর সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

বিগত কয়েক বছর থেকে দেশের বিভিন্ন মরিচ উৎপাদনকারী এলাকায় ফলছিদ্রকারী পোকার ব্যাপক আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সাধারণত দুই ধরণের ফলছিদ্রকারী পোকা (*Spodoptera litura* এবং *Helicoverpa armigera*) মরিচ ফসলের ক্ষতি করে থাকে। এ পোকার কীড়া ফলের বৃন্তের কাছে ছোট ছোট ছিদ্র করে ফলের মধ্যে ঢুকে পড়ে ভিতরের অংশ খায়। ক্ষতিগ্রস্ত ফলের ভিতরে পোকার বিষ্ঠা ও পচন দেখা দেয়। আক্রান্ত ফল অসময়ে পেকে যায়। আক্রান্ত ফলে ছিদ্র দেখে সহজেই এই পোকার উপস্থিতি বোঝা যায়। কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকা সমূহ সহজে পরিবেশসম্মতভাবে দমন করা সম্ভব।

ক) ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার: মরিচের জমিতে চারা রোপণের দুই সপ্তাহ পরে দুই ধরনের ফলছিদ্রকারী পোকার ফেরোমন ফাঁদ ২০ মিটার দূরে দূরে পর্যায়ক্রমিক ভাবে স্থাপন করতে হবে।

খ) উপকারী পোকা অবমুক্তকরণ: প্রতি সপ্তাহে একবার করে কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১,২০০টি পূর্ণাঙ্গ পোকা) এবং ডিম নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ট্রাইকোগ্রামা* (হেক্টরপ্রতি এক গ্রাম পরজীবী পোকা আক্রান্ত ডিম, যেখানে হতে ৪০,০০০ হতে ৪৫,০০০ পূর্ণাঙ্গ *ট্রাইকোগ্রামা* বের হয়ে আসবে) মরিচের জমিতে মুক্তায়িত করতে হবে।

গ) জৈব বালাইনাশকের ব্যবহার: আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব বালাইনাশক এসএনপিভি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে এবং এইচএনপিভি প্রতি লিটার পানিতে ০.১ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বৎসর: ২০১৫।

ফলছিদ্রকারী পোকা আক্রান্ত মরিচ

সমন্বিত পদ্ধতিতে মরিচের ব্যবস্থাপনা ফলছিদ্রকারী পোকা

কপি জাতীয় ফসলের বিভিন্ন পাতা-খেকো পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন পাতা খেকো পোকা যেমন- সাধারণ কাটুই পোকা বা প্রোডেনিয়া ক্যাটারপিলার এবং সুরুই পোকা বা ডায়ামন্ডব্যাক মথ বাঁধাকপির মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। অনুরূপভাবে সাধারণ কাটুই পোকা বা প্রোডেনিয়া ক্যাটারপিলার ফুলকপি উৎপাদনেরও বড় অন্তরায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত পোকাসমূহ কার্যকরীভাবে, কম খরচে ও পরিবেশসম্মত উপায়ে দমন করা সম্ভব।

ক) **যান্ত্রিক উপায়ে দমন:** সাধারণ কাটুই পোকা এবং ডায়ামন্ডব্যাক মথ এর ডিম/কীড়া আক্রমণের প্রথমাবস্থায় দু-একটি পাতায় দলবদ্ধভাবে থাকে। উক্ত সময় আক্রান্ত পাতার পোকাগুলিকে ২-৩ বার হাত বাছাই করে মেরে ফেললে এই সব পোকা অনেকাংশে দমন করা সম্ভবপর হয়।

খ) **সাধারণ কাটুই পোকার জন্য সেক্স ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার:** সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে সাধারণ কাটুই পোকার পুরুষ পোকা আকৃষ্ট করা সম্ভব। পানি ফাঁদের মাধ্যমে উক্ত ফেরোমন ব্যবহার করে আকৃষ্ট পোকা সমূহকে মেরে ফেলা যায়। সেক্স ফেরোমন ফাঁদ বাঁধাকপি/ফুলকপির জমিতে চারা লাগানোর ১ সপ্তাহের মধ্যে ৩০ মিটার দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে।

গ) **আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে:** জৈব বালাইনাশক এসএনপিভি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ মিগ্রা পরিমাণ মিশিয়ে জমিতে স্প্রে করতে হবে।

গ) **উপকারী পোকামাকড় অবমুক্তকরণ:** সম্ভবপর হলে প্রতি সপ্তাহে একবার করে ডিম নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিজ* (হেক্টরপ্রতি এক গ্রাম পরজীবী পোকা আক্রান্ত ডিম, যেখান থেকে ৪০,০০০ হতে ৪৫,০০০ পূর্ণাঙ্গ *ট্রাইকোগ্রামা* বের হয়ে আসবে) ও কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি পূর্ণাঙ্গ পোকা) পর্যায়ক্রমিকভাবে বাঁধাকপি/ফুলকপির জমিতে মুক্তায়িত করতে হবে।

ঘ) **এলাকা ভিত্তিক সমন্বিত উদ্যোগ:** উপরোক্ত পদ্ধতিটির সামগ্রিক সফলতার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল চাষীদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ খুবই জরুরি।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বৎসর: ২০১৪।

সাধারণ কাটুই পোকা

পোকা আক্রান্ত বাঁধাকপি

সুরুই পোকা আক্রান্ত বাঁধাকপির পাতা

বাঁধাকপির জমিতে স্থাপিত সেক্স ফেরোমন ফাঁদ

সরিষা ফসলের সাধারণ কাটুই পোকা (*প্রোডেনিয়া ক্যাটারপিলার*) এর সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

সাধারণ কাটুই পোকা (প্রোডেনিয়া ক্যাটারপিলার) সরিষা ফসলের একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা। বিগত কয়েক বছর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরিষায় এ পোকার ব্যাপক আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক সাম্প্রতিক কালে উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকাসমূহ সহজে পরিবেশসম্মতভাবে দমন করা সম্ভব।

ক) **ফেরোমন ফাঁদের ব্যবহার:** সেক্স ফেরোমন ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে সাধারণ কাটুই পোকার পুরুষ পোকা আকৃষ্ট করা সম্ভব। পানি ফাঁদের মাধ্যমে উক্ত ফেরোমন ব্যবহার করে আকৃষ্ট পোকাসমূহকে মেরে ফেলা যায়। ফাঁদ প্রতি একটি ফেরোমন টোপ পানি ফাঁদের প্লাস্টিক পাত্রের মুখ হতে ৩-৪ সেমি নিচে একটি সরু তার দিয়ে স্থাপন করতে হবে। ফেরোমনের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে পুরুষ মাছি পোকা প্লাস্টিক পাত্রের ভিতরে প্রবেশ করে ও সাবান পানিতে পড়ে আটকে যায় এবং মারা যায়। সেক্স ফেরোমন ফাঁদ সরিষার জমিতে বীজ বপনের ২-৩ সপ্তাহ পরে ২০ মিটার দূরে দূরে স্থাপন করতে হবে। সাধারণত সরিষার জমিতে ফেরোমন ফাঁদ একবার স্থাপন করলে পুরো মৌসুমে আর পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না।

খ) **উপকারী পোকা অবমুক্তকরণ:** প্রতি সপ্তাহে একবার করে কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১,২০০টি পূর্ণাঙ্গ পোকা) সরিষার জমিতে মুক্তায়িত করতে হবে।

গ) আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে জৈব বালাইনাশক এসএনপিভি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বৎসর: ২০১৪।

সরিষা জমিতে স্থাপিত সেক্স ফেরোমন ফাঁদ

সমন্বিত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিমের মাজরা পোকা দমন

বিভিন্ন মাজরা পোকা শিমের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত পোকাসমূহ দমন করা সম্ভব।

ক) **যান্ত্রিক উপায়ে দমন:** সাধারণত মাজরা পোকা শিমের ফুল ও পরবর্তীকালে ফলে আক্রমণ করে থাকে। গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, এক দিন পর পর আক্রান্ত ফুল ও ফল হাত বাছাই করে ধ্বংস করে ফেললে এই পোকা অনেকাংশে দমন করা সম্ভবপর হয়।

খ) **উপকারী পোকামাকড় অবমুক্তকরণ:** প্রতি সপ্তাহে একবার করে ডিম নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিজ* (হেক্টরপ্রতি এক গ্রাম পরজীবী পোকা আক্রান্ত ডিম, যেখানে থেকে ৪০,০০০ হতে ৪৫,০০০ পূর্ণাঙ্গ *ট্রাইকোগ্রামা* বের হয়ে আসবে) ও কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি পূর্ণাঙ্গ পোকা) পর্যায়ক্রমিকভাবে শিমের জমিতে মুক্তায়িত করতে হবে।

গ) **বিষাক্ত কীটনাশকের প্রয়োগ বন্ধ বা সীমিত ব্যবহার:** একান্ত প্রয়োজনে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে কেবলমাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন জৈব কীটনাশক (স্পাইনোসেড ৪৫এসসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৪ মিলি হিসাবে) ব্যবহার করা যেতে পারে।

ঘ) **এলাকা ভিত্তিক সমন্বিত উদ্যোগ:** উল্লিখিত পদ্ধতিটির সামগ্রিক সফলতার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল শিম চাষীদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ খুবই জরুরি।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বৎসর: ২০১৩

মাজরা পোকা আক্রান্ত শিমের ফুল ও ফল

উপকারী পোকা বা বন্ধু পোকার ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদন

ফসলের বিভিন্ন ক্ষতিকারক পোকা দমনে বন্ধু পোকা ব্যবহারের মাধ্যমে কীটনাশকের যথেচ্ছচার ব্যবহার কমিয়ে এনে নিরাপদ ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা সম্ভব। সে উদ্দেশ্য বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কীটতত্ত্ব বিভাগ, এদের ব্যাপক ভিত্তিক উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করেছে যা নিম্নরূপ

ক) **ডিম নষ্টকারী পরজীবী পোকা, ট্রাইকোগ্রামা এর উৎপাদন:** অনিষ্টকারী পোকার ডিম নষ্টকারী পরজীবী পোকা হিসেবে পৃথিবীব্যাপী বিভিন্ন প্রজাতির *ট্রাইকোগ্রামা* এর ব্যাপক ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কীটতত্ত্ব বিভাগ, এদের ব্যাপক ভিত্তিক উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করেছে যার মাধ্যমে বর্তমানে দেশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এগুলোকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করছে এবং বাজারজাত করছে। সাধারণত গুদামজাত ধানের পোকা, সুরুই পোকার (*Corcyra cephalonica*) ডিমের উপর *ট্রাইকোগ্রামা* এর পরজীবায়নের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক উৎপাদন করা হয়ে থাকে।

খ) কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা ব্রাকন হেবিটর এর উৎপাদন: অত্যন্ত বিধ্বংসী *ব্রাকন হেবিটর* সাধারণত মাজরা বা বিটল জাতীয় শত্রু পোকার নরম ও শুং বিহীন কীড়ায় পরজীবায়ন করে ধ্বংস করে থাকে এবং অনিষ্টকারী পোকার কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা হিসেবে সুপরিচিত। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কীটতত্ত্ব বিভাগ, এদের ব্যাপক ভিত্তিক উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করেছে যার মাধ্যমে বর্তমানে দেশে বেশ কয়েকটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এগুলো বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন করছে এবং বাজারজাত করছে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে *ব্রাকন হেবিটর* এর উৎপাদন ওয়াক্স মথ (*Galleria mellonella*) এর কীড়ায় সম্পন্ন করা হয়।

ব্রাকন

ট্রাইকোগ্রামা

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বৎসর: ২০১৩।

কুলের ফল ছিদ্রকারী উইভিল পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

ফল ছিদ্রকারী উইভিল পোকা কুল গাছের মারাত্মক ক্ষতিকারক পোকা। বিগত কয়েক বছর থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে কুলের উন্নতজাত সমূহে এ পোকার ব্যাপক আক্রমণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত পোকাসমূহ দমন করা সম্ভব।

ক) পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ : কুল বাগানের আশে পাশের ঝোপ জঙ্গল এবং বাগানের আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। কুল গাছে অসময়ের ফুল ও কুঁড়ি নষ্ট করে ফেলতে হবে। কুল গাছে প্রাথমিক পর্যায়ে আক্রান্ত ফলগুলো সংগ্রহ করে (পূর্ণ বয়স্ক পোকা আক্রান্ত ফল থেকে বের হওয়ার পূর্বে) কীড়া বা পুত্তলি বা পূর্ণ বয়স্ক পোকাসহ ধ্বংস করে ফেলতে হবে।

খ) কীটনাশক ব্যবহার : গাছে ফুল ধরার আগে কার্বারিল ৮৫ ডব্লিউপি জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম) একবার এবং পরাগায়নের পর ফলধারণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে একবার সাইপারমেথ্রিন ১০ইসি জাতীয় কীটনাশক (প্রতি লিটার পানিতে ১.০ মিলি হারে) স্প্রে করতে হবে।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বৎসর: ২০১২।

পূর্ণাঙ্গ উইভিল পোকা

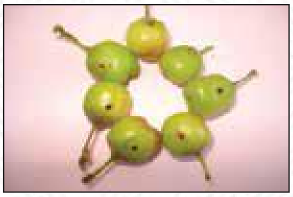

পোকা আক্রান্ত কুল

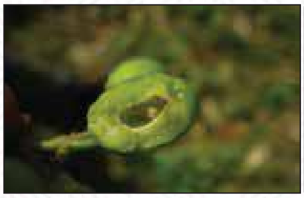

ফলের ভিতরে পোকার কীড়া

ফলের ভিতরে পূর্ণাঙ্গ পোকা

জৈব বালাই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে শিমের প্রধান ক্ষতিকর পোকা (মাজরা ও জাব পোকা) দমন

জাব ও বিভিন্ন মাজরা পোকা শিমের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত জৈব বালাই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত পোকাসমূহ দমন করা সম্ভব।

- প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত পাতা ও ডগার জাব পোকা হাত দিয়ে পিষে মেরে ফেলা যায়। ডিটারজেন্ট মিশ্রিত পানি (প্রতি ১০ লিটার পানিতে ৫ গ্রাম গুঁড়া সাবান মেশাতে হবে) স্প্রে করেও এ পোকার আক্রমণ অনেকাংশে কমানো যায়। এছাড়াও আক্রমণের মাত্রা বেশি হলে আক্রান্ত স্থানে বায়োনিম প্লাস ১ মিলি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ৭ দিন অন্তর অন্তর ২-৩ বার স্প্রে মাধ্যমে এ পোকা সহজে দমন করা যায়।

- যান্ত্রিক উপায়ে দমন: সাধারণত মাজরা পোকা শিমের ফুল ও পরবর্তীকালে ফলে আক্রমণ করে থাকে। গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, এক দিন পর পর আক্রান্ত ফুল ও ফল হাত বাছাই করে ধ্বংস করে ফেললে এই পোকা অনেকাংশে দমন করা সম্ভবপর হয়।

- **উপকারী পোকামাকড় অবমুক্তকরণ:** প্রতি সপ্তাহে একবার করে ডিম নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ট্রাইকোগ্রামা কাইলোনিজ* (হেক্টরপ্রতি এক গ্রাম পরজীবী পোকা আক্রান্ত ডিম, যেখানে থেকে ৪০,০০০ হতে ৪৫,০০০ পূর্ণাঙ্গ *ট্রাইকোগ্রামা* বের হয়ে আসবে) ও কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি পূর্ণাঙ্গ পোকা) পর্যায়ক্রমিকভাবে শিমের জমিতে মুক্তায়িত করতে হবে।
- **বিষাক্ত কীটনাশকের প্রয়োগ বন্ধ বা সীমিত ব্যবহার:** একান্ত প্রয়োজনে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে কেবলমাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন জৈব কীটনাশক (স্পাইনোসেড ৪৫ এসসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৪ মিলি হিসাবে) ব্যবহার করা যেতে পারে।
- **এলাকা ভিত্তিক সমন্বিত উদ্যোগ:** উল্লিখিত পদ্ধতিটির সামগ্রিক সফলতার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল শিম চাষীদের সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ খুবই জরুরি।

মাজরা পোকা আক্রান্ত শিমের ফুল

মাজরা পোকা আক্রান্ত শিমের ফুল ও ফল

জাব পোকা আক্রান্ত শিমের ডগা

বেগুনের বিভিন্ন ধরনের শোষক পোকার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

বেগুন বাংলাদেশের একটি অন্যতম জনপ্রিয় সবজি যা সারা বৎসর ধরে চাষাবাদ হয়ে থাকে। প্রায় ১৫টি প্রজাতির পোকা-মাকড় বেগুনে আক্রমণ করে, এর মধ্যে শোষক পোকা উভয় মৌসুমে বিশেষ করে গ্রীষ্মে মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে থাকে। শোষক পোকাগুলির মধ্যে সাদা মাছি, জ্যাসিড, জাব পোকা এবং থ্রিপস অন্যতম। বাংলাদেশ কৃষি গবেসণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উক্ত পোকাসমূহ কার্যকরীভাবে কম করচে ও পরিবেশ সম্মত উপায়ে দমন করা সম্ভব।

- **আঠালো ফাঁদের ব্যবহার:** জাব ও থ্রিপস পোকা বিভিন্ন ধরনের আঠালো ফাঁদে সহজে আকৃষ্ট হয়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীটতত্ত্ব বিভাগ ২ (দুই) ধরনের আঠালো ফাঁদ উদ্ভাবন করেছে। জাব পোকার জন্য হলুদ আঠালো এবং থ্রিপস পোকার জন্য সাদা আঠালো ফাঁদ। চারা রোপণের ২-৩ সপ্তাহের মধ্যে বেগুনের মাঠে ১৫-২০ মিটার দূরে দূরে একটি সাদা ফাঁদের পর একটি হলুদ ফাঁদ স্থাপন করে জাব ও থ্রিপস পোকা আঠালো ফাঁদে ধরা পড়ে মারা যাবে।
- **বোটানিক্যাল কীটনাশক ব্যবহার:** আঠালো ফাঁদ ব্যবহারের পাশাপাশি ৭-১০ দিন পর পর এজাডিরাকটিন (বায়োনিম প্লাস ১ ইসি বা অন্য নামে) ১ মিলি লিটার হারে ৩-4 বার স্প্রে করে এই পোকা গুলো দমন করা যায়।

হলুদ আঠালো ফাঁদে আকৃষ্ট জাব পোকা

সাদা আঠালো ফাঁদে আকৃষ্ট থ্রিপস পোকা

বায়োনিম প্লাস প্রয়োগকৃত প্লটে উৎপাদিত বেগুন

বাঁধাকপি ও ফুলকপি ফসলের সাধারণ কাটুই পোকার সমন্বিত ব্যবস্থাপনা

বাঁধাকপি ও ফুলকপির একটি প্রধান অনিষ্টকারী পোকা। ডিম থেকে কীড়া বের হয়ে পাতায় একত্রে গাদা করে থাকে এবং পাতার বিভিন্ন অংশ গোলাকার করে খেয়ে বড় হতে থাকে। এভাবে খাওয়ার ফলে পাতা জালের মতো হয়ে যায় এবং তা দূর থেকে দেখেই চেনা যায়। কাছে গেলে ঐ জালের মত হয়ে যাওয়া পাতায় অনেক কীড়া দেখতে পাওয়া যায়। কয়েক দিনের মধ্যে এরা ক্ষেতে ছড়িয়ে পড়ে এবং বড় বড় ছিদ্র করে পাতা খেয়ে ফেলে।

সাধারণ কাটুই পোকা

পোকা আক্রান্ত বাঁধাকপি

বাঁধাকপির জমিতে স্থাপিত ফেরোমন ফাঁদ

দমন ব্যবস্থাপনা

- যেহেতু পোকার দল প্রথম দিকে দলবদ্ধ অবস্থায় থাকে সেজন্য প্রতিটি গাছ যত্ন নিয়ে দেখলেই পাতায় কীড়া খাওয়া চিহ্ন সহজেই চোখে পড়ে। ঐ অবস্থায় আক্রান্ত পাতা কীড়াসহ গাছ থেকে ছিড়ে নিয়ে পা দিয়ে পিষে মেরে ফেলতে হবে এবং ছড়িয়ে পড়া বড় কীড়াগুলোকে ধরে ধরে মেরে ফেলতে হবে। এভাবে অতি সহজেই এ পোকা দমন করা যায়।
- প্রতি সপ্তাহে একবার করে কীড়া নষ্টকারী পরজীবী পোকা, *ব্রাকন হেবিটর* (হেক্টরপ্রতি এক বাংকার বা ৮০০-১২০০টি হিসাবে) পর্যায়ক্রমিকভাবে মুক্তায়িত করলে এ পোকার আক্রমণের হার অনেকাংশে কমে যায়।
- চারা লাগানোর এক সপ্তাহের মধ্যেই জমিতে ফেরোমন ফাঁদ পাততে হবে। ফেরোমন ফাঁদ পাতার পরও যদি আক্রমণের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় তবে জৈব বালাইনাশক এসএনপিভি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা এর সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

কলার পাতা ও ফলের বিটল পোকা (*Nodostoma viridipennis* Mots.) সারা বাংলাদেশব্যাপী কলা চাষে যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকে। পূর্বে অমৃতসাগর কলাতেই এর আক্রমণের হার সর্বাধিক হতো। তবে বর্তমানে প্রায় সব জাতের কলাতেই এ পোকার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বিশেষত বর্ষা মৌসুমে কোন ধরনের দমন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত কলা এ পোকার দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। তবে শুষ্ক মৌসুম বা শীতকালে আক্রমণের হার বেশ কম হতে দেখা যায়। কারণ উক্ত সময় বেশির ভাগ পোকা কীড়া অবস্থায় মাটির নিচে শীতনিদ্রা যায়। কলার মুড়ি ফসলে আক্রমণের হার সর্বাধিক হয়ে থাকে।

কীটতত্ত্ব বিভাগ, বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত নিম্নোক্ত আইপিএম পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপরোক্ত পোকা সহজে পরিবেশসম্মতভাবে দমন করা সম্ভব:

পর্যায়ক্রমিক ফসলের চাষ: যে সমস্ত বাগানে পোকার আক্রমণ হার অত্যন্ত বেশি সেখানে পরবর্তী বছর জমি উত্তমরূপে চাষ করে অন্য ফসল আবাদ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। তৃতীয় বছর উক্ত জমিতে পুনরায় কলা চাষ করা যেতে পারে।

পলিথিন ব্যাগিং: কলার মোচা বের হওয়ার সাথে সাথে ও ছড়িতে কলা বের হওয়ার পূর্বেই ১০৫ সেমি লম্বা ও ৭৫ সেমি প্রস্থের দু'মুখ খোলা একটি পলিথিন ব্যাগের একমুখ মোচার ভিতর ঢুকিয়ে বেঁধে দিতে হবে, অন্য মুখ খোলা রাখতে হবে। বাতাস চলাচলের জন্য পলিথিন ব্যাগটিতে ২০-৩০টি ছোট ছোট ছিদ্র রাখা বাঞ্ছনীয়। পলিথিন ব্যাগিং দ্বারা এ পোকা দমন অত্যন্ত কার্যকরী ও নিরাপদ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

বিটল আক্রান্ত কলা

পূর্ণাঙ্গ বিটল পোকা

কলার কাঁদির পলিথিন ব্যাগিং

পোকামুক্ত কলার কাঁদি

কীটনাশক দ্বারা পোকা দমন: মোচা বের হওয়ার ৫ দিন আগে একবার, মোচা বের হওয়ার সাথে সাথে একবার, ছড়িতে প্রথম কলা বের হওয়ার পর একবার এবং সম্পূর্ণ কলা বের হওয়ার পর আরো একবার, মোট চারবার অনুমোদিত কীটনাশক স্প্রে করলে এই পোকা দমন সম্ভব। কীটনাশক, ডায়াজিনন ৬০ ইসি (প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি) বা সেভিন ৮৫ ডাব্লিওপি (প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম) বা মিপসিন ৭৫ ডাব্লিও পি (প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম) স্প্রে করে ভাল ফল পাওয়া যায়।

টমেটো ও বেগুনের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়া রোগ দমনে কৃষকদের করণীয়

টমেটো শীতকালীন সবজি ও বেগুন সারা বছর চাষাবাদের উপযোগী সবজি হিসেবে বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। গ্রামাঞ্চলে এমন কোন বাড়ী পাওয়া যাবে না যেখানে আঙিনায় এ দুটি সবজির গাছ দেখা যাবে না। কিন্তু এ দুটি সবজির চারা তৈরিতে কৃষক ভাইদের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়াজনিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। নিচে এই রোগের কারণ, লক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

টমেটো ও বেগুনের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়া রোগের কারণ

ফাইটোপথোরা, পিথিয়াম, ফিউজারিয়াম, রাইজোকটোনিয়া, স্কেলেরোশিয়াম ইত্যাদি প্রজাতির মাটি বাহিত ছত্রাকের কারণে বীজতলাতে এই রোগ হয়।

টমেটো ও বেগুনের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ

- আক্রান্ত অঙ্কুরিত চারার রং ফ্যাকাসে সবুজ হয়।
- কাণ্ডের নিচের দিকে মাটি বরাবর বাদামী রঙের পানি ভেজা দাগ পড়ে।
- আক্রান্ত জায়গায় চারার গোড়া পচে যায় ও চারা মারা যায়।

টমেটো ও বেগুনের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ

টমেটো ও বেগুনের ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়া রোগের ব্যবস্থাপনা:

বীজতলা তৈরিকরণ এবং সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদন

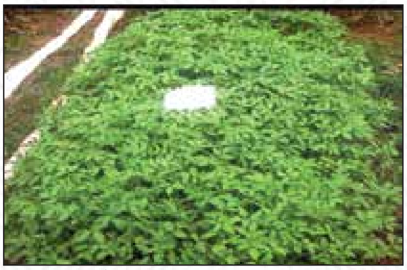

কাঠের গুড়া পোড়ানো বীজতলা

- জমি উত্তমরূপে চাষ করতে হবে এবং চাষ দিয়ে ৫ দিন প্রখর রোদে জমি ফেলে রাখতে হবে।
- অতঃপর বীজতলার মাটি সমান করে কাঠের শুকনো গুঁড়ো ৩ ইঞ্চি বা ৬ সেমি পুরুস্তরে তৈরি করে বীজতলার উপরে সমানভাবে বিছিয়ে দিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বীজতলার মাটি শোধন করতে হবে।
- বীজতলাতে বীজ বোনার আগে বীজকে প্রোভেক্স-২০০ (প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম) নামক ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে লাগাতে হবে।
- প্রতিরোধী জাত যেমন বারি টমেটে-১৬, বারি টমেটে-১৭ চাষ করতে হবে।
- বীজতলার পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে ও পাতলা করে বীজ বুনতে হবে।

টমেটো ও বেগুনের ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া/ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট ও শিকড়ে গিঁট কৃমি/রুট নট নেমাটোড রোগ এবং তার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

টমেটো শীতকালীন সবজি ও বেগুন সারা বছর চাষাবাদের উপযোগী সবজি হিসেবে বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয়। গ্রামাঞ্চলে এমন কোন বাড়ী পাওয়া যাবে না যেখানে আঙিনায় এ দুটি সবজির গাছ দেখা যাবে না। কিন্তু এ দুটি সবজির ফলন আশাব্যঞ্জক নয়। কম ফলনের কারণগুলোর মধ্যে এ দুটি সবজির রোগ বালাই অন্যতম। টমেটোতে এ পর্যন্ত ২০ টির ও বেশি রোগ চিহ্নিত করা হয়েছে এবং বেগুনের এক ডজনেরও বেশি রোগ শনাক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ড্যাম্পিং অফ বা চারা গাছ ঢলে পড়া, ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া ও শিকড়ের গিঁট কৃমি রোগসমূহ সবচেয়ে ক্ষতিকর এবং এসব রোগের জীবাণু সমূহ মাটি বাহিত। এসব রোগের ফলে চাষীরা টমেটো এবং বেগুন চাষের উৎসাহ দিন দিন হারিয়ে ফেলছে। নিচে এ দুটি সবজির কয়েকটি মারাত্মক মাটি বাহিত রোগের কারণ, লক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বর্ণনা করা হলো।

টমেটো ও বেগুনের ঢলে পড়া রোগের কারণ

র‌্যালসটোনিয়া সোলানেসিয়েরাম নামক ব্যাক্টেরিয়ার আক্রমণে এই রোগ সৃষ্টি হয়। টমেটো, আলু, বেগুন এর আক্রমণ বেশি পরিলক্ষিত।

টমেটো ও বেগুনের ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ

টমেটো ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ

গাছ বৃদ্ধির যে কোন সময় এ রোগ হতে পারে এবং ব্যাপক ক্ষতি করে। আক্রান্ত গাছের পাতা সবুজ অবস্থাতেই ঝিমুতে শুরু করে। বিকালে ঝিমুতে দেখলেও সকালে গাছটি সুস্থ মনে হয়। এভাবে ৩/৪ দিন যাওয়ার পর গাছটি আর সকালে সতেজ হবে না এবং গাছটি সবুজ অবস্থাতেই মারা যাবে। মাটি থেকে তুললেও রোগের কোন লক্ষণ শিকড়েও দেখা যাবে না। এ রোগ চেনার সহজ উপায় হলো ব্লেড বা ছুরি দিয়ে একটানে কেটে পরিষ্কার কাচেঁর গ্লাসের পানিতে কাণ্ডটির কাটা প্রান্ত ডুবিয়ে রাখতে হবে। এ অবস্থায় গ্লাসটি নাড়ানো যাবে না। দুই থেকে তিন মিনিট অপেক্ষা করলেই দেখা যাবে দুধের মত সাদা সুতার মত ব্যাক্টেরিয়া কাণ্ডের ডুবানো প্রান্ত হতে অবিরত বের হচ্ছে।

টমেটো ও বেগুনের শিকড়ে গিঁট কৃমি /রুট নট নেমাটোড রোগের কারণ

মেলোয়যোগাইনি ইনকগনিটা ও *মেলোয়ডোগাইনি জাভনিকা* নামক কৃমির আক্রমণে টমেটো, বেগুন ও অন্যান্য শাক সবজিতে এ রোগ হয়ে থাকে।

টমেটো ও বেগুনের শিকড়ে গিঁট কৃমি /রুট নট নেমাটোড রোগের লক্ষণ

গাছ বৃদ্ধির শুরুতে কৃমি দ্বারা আক্রান্ত হলে এবং আক্রমণের ব্যাপকতা বেশি হলে গাছ নিস্তেজ ও খাটো হয়ে যায়। পাতাগুলো হলদে সবুজ হতে হলুদ রঙের হয়। অনেক ক্ষেত্রেই পাতা হঠাৎ করেই ঝরে পড়ে। এ রোগ চেনার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো গাছ তুললে শিকড়ে অসংখ্য ছোট বড় গিঁট দেখা যায়। সাধারণত আক্রান্ত স্থলের কোষের আকার খুব দ্রুত বৃদ্ধি মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। গাছে ফুল ধরার ক্ষমতা আশংকাজনকভাবে কমে যায় এবং ফল ধরে না বললেই চলে।

টমেটো শিকড়ে গিট কৃমি /রুট নট নেমাটোড রোগের লক্ষণ

টমেটো ও বেগুনের ব্যাকটেরিয়া জনিত ঢলে পড়া/ব্যাক্টেরিয়াল উইল্ট ও শিকড়ে গিঁট কৃমি/রুট নট নেমাটোড রোগের সমনিত দমন ব্যবস্থাপনা

বীজতলা তৈরিকরণ এবং সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদন

- জমি উত্তমরূপে চাষ করতে হবে এবং চাষ দিয়ে ৫ দিন প্রখর রোদে জমি ফেলে রাখতে হবে ।
- অতঃপর বীজতলার মাটি সমান করে কাঠের গুকনো গুড়া ৩ ইঞ্চি বা ৬ সেমি পুরুস্তরে তৈরি করে বীজতলার উপরে সমানভাবে বিছিয়ে দিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে বীজতলার মাটি শোধন করতে হবে।
- বীজতলাতে বীজ বোনার আগে বীজকে প্রোভেক্স-২০০ (প্রতি কেজি বীজে ২.৫ গ্রাম) নামক ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে লাগাতে হবে।
- প্রতিরোধী জাত যেমন বারি টমেটে-১৬, বারি টমেটে-১৭ চাষ করতে হবে।
- বীজতলার পানি নিষ্কাশনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা থাকতে হবে ও পাতলা করে বীজ বুনতে হবে।

জমি তৈরিকরণ ও চারা রোপণ

- হেক্টর প্রতি ৫ টন অর্ধ-পচা মুরগির বিষ্ঠা জমিতে প্রয়োগ করে জমি উত্তমরুপে চাষ করে মাটির ভালভাবে মিশিয়ে দিয়ে কমপক্ষে ১৫ দিন মুরগির বিষ্ঠা পচাতে হবে।
- ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগের প্রভাব জানা থাকলে হেক্টরপ্রতি ২০ কেজি স্টেবল ব্লিচিং পাউডার শেষ চাষের সময় মাটিতে প্রয়োগ করা হইলে শুধুমাত্র ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগের প্রকোপ হ্রাস পায়।
- শিকড়ে গিঁট কৃমি রোগের জন্য চারা লাগানোর সময় ফুরাডন ৫ জি নামক কৃমিনাশক ৪৫ কেজি/হেক্টর হারে প্রয়োগ করলে টমেটো ও বেগুনের শিকড়ে গিট কৃমি/রুট নট নেমাটোড সার্থক ভাবে দমন করা যায়।

চারা রোপণের পর করণীয়

- ব্যাক্টেরিয়া জনিত ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ দেখা দিলে সাথে সাথে জমিতে ভাসানো সেচ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। আক্রান্ত গাছ সংগ্রহ করে পুড়িয়ে ফেরতে হবে এবং আক্রান্ত স্থান স্টেবল ব্লিচিং পাউডার দিয়ে শোধন করতে হবে।
- জমিতে ছত্রাক জনিত ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ দেখা দিলে অটোস্টিন নামক ছত্রাকনাশক (০.২% হারে ১২-১৫ দিন পর পর তিন বার) দিয়ে গাছের গোড়ার মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

মসুর এর গোড়া পচা রোগ ও তার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা কৃষকদের করণীয়

মসুর বাংলাদেশে প্রধান ডাল জাতীয় ফসল আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মসুর ডাল একটি অন্যতম উপাদান। বাংলাদেশে মোট প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে মসুর চাষ হয়ে থাকে এবং মোট উৎপাদন প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার মে. টন। কিন্তু আমাদের দেশে মসুরের হেক্টরপ্রতি ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় অত্যন্ত কম। কম উৎপাদনের কারণগুলোর মধ্যে রোগবালাই একটি অন্যতম প্রধান কারণ। মসুরের বিভিন্ন রোগবালাই এর মধ্যে গোড়া পচা একটি প্রধান রোগ। এই রোগের মসুরের ফলন ১০০% পর্যন্ত নষ্ট হইতে পারে। এ রোগ গাছের চারা বয়সে বেশি সংক্রমিত হয়।

মসুর এর গোড়া পচা রোগের লক্ষণ

- চারা অবস্থায় এ রোগ হলে গাছ হঠাত ঢলে পড়ে এবং মারা যায়।
- আক্রান্ত গাছের পাতা ক্রমান্বয়ে হলুদ রং ধারণ করে। গাছ নেতিয়ে পড়ে এবং শুকিয়ে মারা যায়।
- মাটি ভেজা থাকলে আক্রান্ত গাছের গোড়ায় আক্রান্ত স্থানে সাদা রং এর ছত্রাকের মাইসেলিয়া এবং সরিষার দানার মতো স্কেলেরোসিয়াম গুটি দেখা যায়।

মসুর এর গোড়া পচা রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থা

জমি নির্বাচন, মাদা তৈরিকরণ ও বীজ বপন/চারা রোপণ

রোগের লক্ষণ

- মসুর চাষের জন্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে যে জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে স্যাঁতস্যাঁতে না থাকে।
- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে
- জমি উত্তমরূপে চাষ করতে হবে এবং চাষ দিয়ে প্রখর রোদে জমি ৫ দিন ফেলে রাখতে হবে।
- আংশিক পচা মুরগির বিষ্ঠা ৫ টন/হেক্টর হারে বীজ বপনের কমপক্ষে ২১ দিন পূর্বে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে পচাতে হবে। মুরগির বিষ্ঠা না পাওয়া গেলে ট্রাইকোডারমা বায়োফানজিসাইড ট্রাইকো-কমপোস্ট ৩ টন/হেক্টর হারে জমি শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- অতঃপর প্রোভেক্স (০.২৫%) নামক ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে বীজ বপন করতে হবে।

বীজ বপন/চারা রোপণের পর করণীয়

বীজ বপণের পর রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রোভেক্স ০.২৫% হারে পানিতে মিশিয়ে ১২-১৫ দিন পর পর দুইবার গাছের গোড়ায় মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিলে এই রোগের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব।

নিয়ন্ত্রিত জমি

- চারা লাগানোর ৩ মাস পরে বা গাছে ফলন আসার ২-৩ সপ্তাহ পূর্বে দ্বিতীয় বার ১০-১৫ গ্রাম ফুরাডান ৫ কেজি প্রতি গাছের গোড়ার চারদিকে রিং করে প্রয়োগ করতে হবে এবং মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
- মিষ্টি কুমড়া গাছে পাউডারী মিলডিউ রোগের লক্ষণ দেখা দিলে এ রোগ দমনে সালফার জাতীয় বালাইনাশক যেমন- থিওভিট ৮০ ডব্লিউপি অথবা কুমুলাস-ডিএফ অথবা বেকিং সোডা ২ গ্রাম/লিটার হারে পানিতে মিশিয়ে ১০-১২ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করা।
- আংশিক পচা মুরগির বিষ্ঠা ৫ টন/হেক্টর হারে বীজ বপনের কমপক্ষে ২১ দিন পূর্বে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে পচাতে হবে। অতঃপর প্রো-ভেক্স (০.২৫%) নামক ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে বীজ বপন করতে হবে।

রোগমুক্ত প্লট

- চারা গাজানোর ২০-২৫ দিন পর একবার এবং ৩৫-৪০ দিন পর দ্বিতীয় বার প্রোভেক্স ০.২৫% হারে পানিতে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিলে এই রোগ ভালভাবে দমন করার পাশাপাশি মসুরের ফলন স্বাভাবিক এর চেয়ে ২৮-৪৩% বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- এছাড়া ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে এবং প্রোভেক্স (০.২৫%) দ্বারা বীজ শোধন করে বপন করতে হবে। অতঃপর চারা গাজানোর ২০-২৫ দিন পর একবার এবং ৩৫-৪০ দিন পর দ্বিতীয় বার প্রোভেক্স ০.২৫% হারে পানিতে মিশিয়ে গাছের গোড়ায় মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিলে এই রোগের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব।

ছোলার গোড়া পচা বা কলার রট এবং ঢলে পড়া রোগ ও তার সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনায় কৃষকদের করণীয়

ছোলা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান ডাল জাতীয় ফসল। ডাল ফসলের এলাকা ও উৎপাদনের দিক থেকে ছোলা বাংলাদেশে পঞ্চম স্থান দখল করে আছে। বাংলাদেশে মোট প্রায় ১৫ হাজার হেক্টর জমিতে ছোলা চাষ হয় এর মোট উৎপাদন প্রায় ১৫ হাজার মে. টন। কিন্তু বাংলাদেশে ছোলার গড় ফলন অন্যান্য দেশের তুলনায় খুবই কম। বিভিন্ন কারণের মধ্যে রোগবালাই অন্যতম প্রধান কারণ। ছোলা বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই দ্বারা আক্রান্ত হয় তবে মাটিবাহিত রোগ যেমন ঢলে পড়া ও গোড়া পচা অন্যতম। এই রোগের কারণে ছোলার ৫৫-৯৫% পর্যন্ত গাছ মারা যেতে পারে। এ রোগ গাছের চারা বয়স থেকে পূর্ণাঙ্গ গাছ আবার সংক্রমিত হতে পারে।

ছোলার গোড়া পচা বা কলার রট

রোগের কারণ: স্কেলেরেসিয়াম রলফসি নামক মাটিতে বসবাসকারী এক প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে এ রোগের সৃষ্টি হয়।

রোগের লক্ষণ

- চারা অবস্থায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি দেখা যায়।
- রোগে আক্রান্ত গাছ প্রথমে হলদে হয়ে যায় অতঃপর আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ে এবং শুকিয়ে মারা যায়।
- চারা গাছের শিকড় ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে এই রোগের আক্রমণ হলে আক্রান্ত স্থানে কালো দাগের সৃষ্টি হয়। আস্তে আস্তে দাগ বৃদ্ধি পেয়ে আক্রান্ত অংশে পচন হয় এবং গাছ মারা যায়।
- স্যাতস্যাতে আবহাওয়ায় আক্রান্ত স্থানে ছত্রাকের সাদা রং এর মাইসেলিয়া এবং সরিষার দানার মত স্কেলেরোসিয়া দেখা যায়।

ছোলার ঢলে পড়া রোগের লক্ষণ

ছোলার ঢলে পড়া বা উইল্ট

রোগের কারণ: ফিউজারিয়াম অক্সিসপোরাম নামক ছত্রাক এ রোগ সংগঠিত হয়।

রোগের লক্ষণ

- গাছের বৃদ্ধির যে কোন অবস্থায় এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে।
- চারা অবস্থায় আক্রান্ত হলে গাছ হঠাৎ করে ঢলে পড়ে কিন্তু গাছের পাতার রঙের কোন পরিবর্তন হয়।
- পূর্ণ বয়স্ক গাছ এই রোগে আক্রান্ত হলে প্রথমে গাছের পাতা হলুদ হয় এবং আস্তে আস্তে গাছ নেতিয়ে পড়ে এবং পরিশেষে গাছ মারা যায়।
- রোগে আক্রান্ত গাছের কাণ্ড লম্বালম্বিভাবে চিড়লে কাণ্ডের কেন্দ্রস্থলের ভাসকুলার বান্ডেলের মাঝ বরাবর অংশ কালচে রং ধারণ করে।
- আক্রান্ত গাছের শিকড় ও কাণ্ডের সংযোগস্থলে অনেক সময় লালচে বাদামী রঙের পচন দেখা যায়।
- আক্রান্ত গাছ টান দিয়ে সহজেই উঠানো যায়।

ছোলার ঢলে পড়া এবং গোড়া পচা রোগের সমন্বিত দমন ব্যবস্থাপনা

জমি নির্বাচন, মাদা তৈরিকরণ ও বীজ বপন/চারা রোপণ

- ছোলা চাষের জন্য এমন জমি নির্বাচন করতে হবে যে জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে স্যাঁতস্যাঁতে না থাকে।
- ফসলের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে
- জমি উত্তমরূপে চাষ করতে হবে এবং চাষ দিয়ে প্রখর রোদে জমি ৫ দিন ফেলে রাখতে হবে।
- আংশিক পচা মুরগির বিষ্ঠা ৫ টন/হেক্টর হারে বীজ বপনের কমপক্ষে ২১ দিন পূর্বে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে পচাতে হবে। মুরগির বিষ্ঠা না পাওয়া গেলে ট্রাইকোডারমা বায়োফানজিসাইড, ট্রাইকো-কমপোস্ট ৩ টন/হে. হারে জমি শেষ চাষের সময় মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- অতঃপর প্রোভেক্স (০.২৫%) নামক ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে বীজ বপন করতে হবে।

ছোলার গোড়া পচা ও ঢলে পড়া রোগের সম্বনিত দমন

নিয়ন্ত্রিত জমি

বীজ বপন/চারা রোপণের পর করণীয়

বীজ বপনের পর রোগের লক্ষণ দেখা দিলে অটোস্টিন নামক ছত্রাকনাশক ০.২% হারে পানিতে মিশিয়ে ১২-১৫ দিন পর পর দুইবার গাছের গোড়ায় মাটি ভালভাবে ভিজিয়ে দিলে এই রোগের আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব।

পেস্টিসাইড টক্সিকোলজি

সবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ সংক্রমণমুক্তকরণ

শাকসবজি মানবদেহের প্রয়োজনীয় জৈবরাসায়নিক পুষ্টি উপাদনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এতে রয়েছে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম ও আয়রনসহ মানবদেহের জন্য অপরিহার্য খনিজ পদার্থ। উন্নয়নশীল দেশের জন্য শাকসবজি শক্তির মৌলিক উৎস হিসেবে কাজ করে। এটি স্বাস্থ্যের জন্য যেমন অত্যন্ত উপকারী, তেমনি খাদ্য ও আর্থিক নিরাপত্তার জন্যও অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশে চাষকৃত শাকসবজিতে বিভিন্ন কীটপতঙ্গ ব্যাপকভাবে আক্রমণ করে থাকে। কৃষকরা মানসম্মত সবজির ফলন বৃদ্ধি ও বিনিয়োগের উপর ভালো লাভ পেতে কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে কীটনাশক ব্যবহার করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অজ্ঞতার কারণে কৃষকগণ ব্যাপকভাবে কীটনাশক ব্যবহার করে থাকেন এবং সর্বশেষ স্প্রে ও ফসল তোলার মধ্যে সময়ের উপযুক্ত ব্যবধান মেনে চলেন না। যার ফলে বাজারের সবজির নমুনাতে অহরহ কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের পরিমাণ মানবদেহের সহনীয় মাত্রার চেয়ে বেশি থাকে, যা স্বাস্থ্যের জন্য হুমকীস্বরূপ। ফলে, জীবন রক্ষাকারী পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ সবজি হয়ে ওঠে জীবনঘাতী কীটনাশকের অবশিষ্টাংশের বাহক। যা নিয়মিত গ্রহণের মাধ্যমে মানবদেহের বিভিন্ন অংশে কীটনাশকের দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়া হয়, যার ফলশ্রুতিতে দেখা যায় বিভিন্ন জীবনঘাতী ব্যাধী যেমনঃ ক্যান্সার, লিভার সিরোসিস, কিডনীর বিভিন্ন রোগ ইত্যাদি। ভোক্তা নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শাকসবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারণ জরুরি এবং এই অপসারণ হতে হবে বাড়িতে তথা রান্নাঘরে সহজলভ্য উপাদান দ্বারা।

শাকসবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারণ তথা সংক্রমণমুক্তকরণ কয়েক পদ্ধতিতে রান্নাঘরে সহজলভ্য কিছু উপাদান দ্বারা সহজেই করা যেতে পারে। উপাদানগুলো হলো খাবার লবন, গুঁড়া সাবান, হলুদ গুঁড়া প্রভৃতি। বেগুন, শিম, টমেটো, শসা এবং কাঁচা মরিচ হতে অর্গানোফসফরাস কীটনাশকের যথা- ক্লোরোপাইরিফস, কুইনালফস, ফেনিট্রোথিয়ন, ম্যালাথিয়ন এবং ডায়াজিননের অবশিষ্টাংশ অপসারণের জন্য নিম্নে কিছু পদ্ধতি আলোচনা করা হলো।

খাবার লবণ দ্বারা: বাজার থেকে কিনে আনা সবজি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে → প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম হারে লবণ যোগ করে লবণ পানি তৈরি করতে হবে → তৈরিকৃত লবণপানিতে সবজি ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে → পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে → পরিমিত তাপে রান্না করতে হবে।

এই পদ্ধতিতে ৮৬% পর্যন্ত অর্গানোফসফরাস কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারণ হয়।

হলুদ গুঁড়া দ্বারা: বাজার থেকে কিনে আনা সবজি পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে → প্রতি লিটার পানিতে ১০ গ্রাম হারে হলুদ গুঁড়া যোগ করে দ্রবণ তৈরি করতে হবে → তৈরিকৃত হলুদ দ্রবণে সবজি ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে → পরিষ্কার পানি দিয়ে ধৌত করতে হবে → পানিতে ১৫ মিনিট রান্না করতে হবে।

এই পদ্ধতিতে ৭১% পর্যন্ত অর্গানোফসফরাস কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারণ হয়।

প্রযুক্তি উদ্ভাবনের বৎসর: ২০১৫

এ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বাজার থেকে সংগ্রহ করা বিভিন্ন সবজি কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ সংক্রমণমুক্তকরনের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি সহজলভ্য করা সম্ভব।

সবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ সংক্রমণমুক্তকরণ

সবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ সংক্রমনমুক্তকরণ

কাকরোল, টমেটো ও শসা থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ দূরীকরণ

সবজি মানুষের দেহের প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। দুর্ভাগ্যবশত সবজি ফসল প্রায়ই পোকামাকড় ও রোগজীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় যা সবজির উৎপাদন ও মান নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। সবজির উৎপাদন বৃদ্ধি ও ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাসায়নিক কীটনাশক ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে যার অবশিষ্টাংশ ভোক্তার স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এই ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য সবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারণ করা জরুরি। বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাতকরণ কৌশল বা পদ্ধতি ব্যবহার করে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ কিছুটা হলেও অপসারণ করা যায়।

কাকরোল, টমেটো ও শসা থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ অপসারণ তথা দূরীকরণ রান্নাঘরে সহজলভ্য কিছু উপাদান যেমন খাবার লবণ ও ভিনেগার দ্বারা সহজেই করা যেতে পারে। তাছাড়া, খোসা ছাড়ানোর মাধ্যমে শসা হতে

অর্গানোফসফরাস কীটনাশকের যথা- ডাইমেথয়েড, ক্লোরপাইরিফস, কুইনালফস, ডায়াজিনন, ম্যালাথিয়ন এবং ফেনিট্রোথিয়নের অবশিষ্টাংশ অপসারণ করা যায় যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

খাবার লবণ + খোসা ছাড়ানো

বাজার থেকে কিনে আনা শসা পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে → প্রতি লিটার পানিতে ২০ গ্রাম হারে লবণ যোগ করে লবণপানি তৈরি করতে হবে → তৈরিকৃত লবণপানিতে শসা ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে → চাকু দিয়ে শসার খোসা ছাড়াতে হবে →পরিষ্কার পানি দিয়ে খোসা ছাড়ানো শসা ধুয়ে ফেলতে হবে।

সবজি থেকে কীটনাশকের অবশিষ্টাংশ দূরীকরণ পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে ৮৫% পর্যন্ত ক্লোরপাইরিফস, কুইনালফস, ডায়াজিনন, ম্যালাথিয়ন এবং ফেনিট্রোথিয়নের অবশিষ্টাংশ অপসারণ করা সম্ভব।

ভিনেগার দ্বারা

বাজার থেকে কিনে আনা কাকরোল ও টমেটো পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে → প্রতি লিটার পানিতে ২০ মিলি হারে এসিটিক এসিড বা ভিনেগার যোগ করে ভিনেগার-পানি তৈরি করতে হবে → তৈরিকৃত ভিনেগার-পানিতে কাকরোল ও টমেটো ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখতে হবে → পরিষ্কার পানি দিয়ে কাকরোল ও টমেটো ধুয়ে নিতে হবে → পানিতে ১৫ মিনিট রান্না করতে হবে।

এই পদ্ধতিতে ৮০% পর্যন্ত ডাইমেথয়েড, ক্লোরপাইরিফস, কুইনালফস, ডায়াজিনন, ম্যালাথিয়ন এবং ফেনিট্রোথিয়নের অবশিষ্টাংশ অপসারণ করা সম্ভব।

বেগুনের শিকড়ের গিঁট রোগ দমন ব্যবস্থাপনা

জমি প্রস্তুতির শেষ চাষের সময় প্রতি হেক্টর জমিতে ২৫ কেজি ফুরাডান ৫ জি এবং চারা লাগানোর ২১ দিন পূর্বে প্রতি হেক্টরে ৫.০ টন মুরগির বিষ্টা (অপচনশীল অবস্থায়) প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটি আলোড়িত করে দিতে হবে যার ফলে ব্যবহৃত মুরগির বিষ্টার পচন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এর ফলে মাটিতে অবস্থিত বেগুনের শিকড়ের গিঁট সৃষ্টিকারী রোগজীবাণু ধ্বংস হয় এবং বেগুন গাছ এ রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।

শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি

বিভিন্ন শাক ও সবজির গুণাগুণ বজায় রেখে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ

আমাদের দেশের আবহাওয়ায় উৎপাদিত অধিকাংশ শাক ও সবজি মাঠ থেকে সংগ্রহের পর স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সাধারণত ২-৩ দিনের বেশি সতেজ ও খাবার উপযোগী থাকে না। মাঠ থেকে সংগ্রহের পর ২০০ পিপিএম/লিটার ক্লোরাক্স দ্রবণ (২/৩ টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট) দিয়ে ধৌত করার পর শিম ও পালং শাক মুখবন্ধ পলিপ্রপাইলিন প্যাকেটে ৬ দিন, ০.২%, ০.৩%, ০.৪% ও ০.৫% ছিদ্রযুক্ত ও মুখ বন্ধ পলিপ্রপাইলিন প্যাকেটে পুঁই শাক, কাঁচা মরিচ, ঢেঁড়স ও লাল শাক যথাক্রমে ৮ দিন, ১০ দিন, ১১ দিন এবং ৭ দিন পর্যন্ত ভাল থাকে। অন্যদিকে ১.৫% ও ১.০% ছিদ্রযুক্ত ও মুখ বন্ধ পলিপ্রপাইলিন প্যাকেটে ৯ দিন পর্যন্ত যথাক্রমে ঝিঙ্গা ও ধুন্দল ভাল থাকে।

ছিদ্রযুক্ত ও মুখ বন্ধ পলিপ্রপাইলিন প্যাকেটে কাঁচা মরিচ ও ঢেঁড়স

ছিদ্রযুক্ত ও মুখ বন্ধ পলিপ্রপাইলিন প্যাকেটে ঝিঙ্গা ও ধুন্দল

স্ট্রবেরি ফলের গুণাগুণ বজায় রেখে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ

স্ট্রবেরি আমাদের দেশে একটি নতুন ফল। আকর্ষণীয় বর্ণ, গন্ধ ও উচ্চ পুষ্টিমানের জন্য স্ট্রবেরি অত্যন্ত সমাদৃত। স্ট্রবেরি অত্যন্ত রসালো ও নরম বিধায় এর সংরক্ষণকাল খুবই কম যা বাজারজাতকরণের একটি প্রধান অন্তরায়। তাজা স্ট্রবেরি ফলের সংরক্ষণকাল বাড়ানোর লক্ষে সম্প্রতি এক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায় ১° সে. তাপমাত্রা এবং ৮৫% আপেক্ষিক আর্দ্রতায় (RH) তাজা (Fresh) স্ট্রবেরি ফল ৭ দিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়, এতে স্ট্রবেরির পুষ্টি উপাদান ও বাহ্যিক বর্ণের তেমন কোন পরিবর্তন ঘটে না। এছাড়া ৪.৭-১০° সেলসিয়াস তাপমাত্রাতেও এই ফল ৪-৫ দিন পর্যন্ত ভাল থাকে ।

স্ট্রবেরি ফলের গুণাগুণ বজায় রেখে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ

ম্যাংগোবার তৈরিকরণ

আম আমাদের দেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ফল। যার জন্য আমকে এ দেশে ফলের রাজা বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। আম থেকে প্রক্রিয়াজাতকৃত বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মধ্যে ম্যাংগোবার অন্যতম। কিন্তু সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে না পারায় আমাদের দেশে উৎপাদিত ম্যাংগোবার অল্প সময়ের মধ্যেই কালো হয়ে যায়, জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় ও খাবার অনুপযোগী হয়ে যায়।

ম্যাংগোবার

ম্যাংগোবার তৈরি করার জন্য প্রথমে আমগুলো ভালো করে পানিতে ধুয়ে ছাল ফেলে আঁটি বের করে নিতে হয়। অতঃপর টুকরো করা আমগুলো ব্লেন্ড করে পাল্প তৈরি করে তাতে চিনি যোগ করতে হয় যতক্ষণ না পাল্পের টিএসএস (TSS) ৩০° ব্রিক্স পর্যন্ত পৌঁছে । অতঃপর ৩ মিনিট সময়কাল পর্যন্ত আগুনে জ্বাল দিতে হয় এবং ৫০০ পিপিএম পটাসিয়াম মেটাবাই সালফাইট (কেএমএস) যোগ করতে হয়। এভাবে প্রক্রিয়াজাতকৃত আমের পাল্পকে ৫০°- ৫৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটি শুকানো যন্ত্রে শুকালে আকর্ষণীয় রঙের সুস্বাদু ম্যাংগোবার হয় এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত খাওয়ার উপযোগী থাকে।

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পেয়ারার পাল্প সংরক্ষণ

বাংলাদেশে ফলের মধ্যে পেয়ারা একটি অন্যতম জনপ্রিয় ফল। পেয়ারা অত্যন্ত পুষ্টিগুন সমৃদ্ধ, সহজপাচ্য ও সুস্বাদু। পেয়ারা উৎপাদন মৌসুমে প্রচুর পরিমাণে ও সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। এটি ভিটামিন সি সমৃদ্ধ একটি ফল এবং এতে কমলা থেকে প্রায় ২ থেকে ৫ গুন বেশি ভিটামিন সি পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য ফলের মত পেয়ারাও দ্রুত পচনশীল, ফলে ভরা মৌসুমে এর প্রচুর অপচয় ঘটে। পেয়ারা থেকে পাল্প প্রস্তুত করে তা সংরক্ষণের মাধ্যমে পরবর্তীকালে জ্যাম, জেলি, জুস ইত্যাদি তৈরি করে এর অপচয় অনেকাংশে রোধ করা সম্ভব।

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পেয়ারার পাল্প সংরক্ষণ

পেয়ারা থেকে পাল্প প্রস্তুত করে তা স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণের জন্য পুষ্ট ও পরিপক্ক পেয়ারা নিতে হবে। অতঃপর সেগুলোকে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কাটতে হবে। এবার টুকরোর ওজনের অর্ধেক পরিমাণে পানিতে (পেয়ারা ও পানি ২:১ অনুপাতে) প্রায় ৩০ মিনিট সময় সিদ্ধ করতে হবে যেন টুকরোগুলো নরম হয়। সিদ্ধ করা পেয়ারার টুকরোগুলোকে এবার হাতে চেপে ও ৪৫ মাইক্রন মাপের ছাকনিতে নিয়ে ছাল ও বিচিগুলো আলাদা করে পাল্প আহরণ করা হয়। এভাবে আহরিত পাল্পকে ১০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ৩ মিনিট পর্যন্ত তাপ প্রয়োগ করা হয় এবং এর সাথে প্রতি কেজিতে এক গ্রাম হিসেবে সাইট্রিক এসিড যোগ করা হয় যেন পাল্পের এসিডিটি ১% এর মতো হয়। অতঃপর এই পাল্পের সাথে প্রতি কেজিতে ২,০০০ পিপিএম পটাসিয়াম মেটাবাই সালফাইট (কেএমএস) যুক্ত করে তা গরম অবস্থায় পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত কাঁচের পাত্রে সংরক্ষণ করা হয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় এ পাল্প প্রায় ৬ মাস সংরক্ষণ করা যায়।

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষিত পেঁয়াজের পেস্ট

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পেঁয়াজের পেস্ট সংরক্ষণ

বাংলাদেশের প্রধান মসলা জাতীয় ফসলের মধ্যে পেঁয়াজ অন্যতম। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং আমাদের প্রতিদিনের রান্নার কাজে পেঁয়াজের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। মাঠ থেকে সংগ্রহ করা পেঁয়াজ সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে, রোগ-জীবাণুর আক্রমণ এবং এর মধ্যস্থিত এনজাইমের কারণে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। এ জন্য বাংলাদেশের ন্যায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অঞ্চলে পেঁয়াজের সংরক্ষণ একটি বড় সমস্যা। বাংলাদেশে পেঁয়াজের সংরক্ষণকালীন অপচয় প্রায় শতকরা ৬৬ ভাগ এবং কিছু কিছু এক্সোটিক কাল্টিভারের ক্ষেত্রে এই অপচয়ের হার আরও বেশি। পেঁয়াজের এই সংরক্ষণকালীন অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব যদি মাঠ থেকে সংগ্রহের পর পরই এটি প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হয়। পেঁয়াজ শুকিয়ে সংরক্ষণ একটি প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু শুকিয়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করলে এর রং ও ঝাঁঝের জন্য দায়ী উদ্বায়ী তৈল ও রাসায়নিক উপকরণ হ্রাস পায়। পেস্ট আকারে পেঁয়াজের সংরক্ষণ ব্যবস্থায় এর স্বাদ ও গন্ধ অটুট থাকে, অপচয় বহুলাংশে কমে যায় এবং ব্যবহার করাও সহজ হয়।

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় পেঁয়াজের পেস্ট প্রস্তুত ও সংরক্ষণের জন্য ভালমানের পেঁয়াজের কন্দ (Bulb) নিতে হবে। কন্দগুলো ধুয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে গ্রাইন্ডার/ব্লেন্ডার মেশিনে দিয়ে পেস্ট তৈরি করতে হবে। অতঃপর কক্ষতাপমাত্রায় একটি ঢাকনা দিয়ে ১ ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিতে হবে যাতে এনজাইমের বিক্রিয়ার দ্বারা উৎপাদিত স্বাদ ও গন্ধ সম্পূর্ণরূপে পেঁয়াজের পেস্টের সাথে মিশে যেতে পারে। এরপর এই পেস্টের সাথে সাধারণ খাবার লবণ ৮% এবং ২ গ্রাম সাইট্রিক এসিড/কেজি

হারে মেশাতে হবে যাতে পেঁয়াজের পেস্টের P^H এর মান ৪ হয়। অতঃপর পেঁয়াজের পেস্টকে ১০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০ মিনিটকাল ফুটিয়ে ১০০০ পিপিএম পটাশিয়াম মেটাবাই সালফাইট (কেএমএস) মিশিয়ে সাথে সাথে জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ঢালতে হবে। এরপর বোতলের মুখে ভালভাবে ছিপি লাগিয়ে সাধারণ তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে সংরক্ষিত পেঁয়াজের পেস্ট ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে। পেঁয়াজের পেস্টের সাথে লবণের ভাগ বেশি থাকে বলে রান্নার সময় অতিরিক্ত লবণ সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

পাপড় তৈরি পদ্ধতি

বাংলাদেশে বিভিন্ন রকমের মুখরোচক খাবারের মধ্যে পাপড় অন্যতম। এটি অতি জনপ্রিয়, সহজ পাচ্য ও সুস্বাদু মুখরোচক খাদ্য। পাপড় যেমন তেলে ভেজে খাওয়া যায় তেমনি বিভিন্ন সবজি স্যুপ ও কারী স্যুপের সাথে খেতে ভাল লাগে। দেশের প্রায় অধিকাংশ জায়গায় সারা বছর এটি পাওয়া যায় এবং সকলেই গ্রহণ করে থাকে। ত্রুটিমুক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি সঠিক প্রয়োগের অভাবে পাপড়ের পরিমাণগত ও গুণগতমানের অপচয় ঘটে। এটির প্রস্তুত পদ্ধতি অতি সহজ। দরিদ্র লোকজন এ সহজ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে বহুলাংশে অপচয় রোধের পাশাপাশি অর্থ উপার্জন করতে পারে। উন্নতমানের চাল ও ডালের মিহি গুঁড়া/ময়দা দিয়ে এটি তৈরি করা হয়।

ডালের পাপড়

ভালমানের সমপরিমাণ মুগ ও মাসকলাই ডাল একসাথে মিশিয়ে মেশিনের মাধ্যমে ভেঙ্গে গুঁড়া করা হয়। এক কেজি পানি ফুটিয়ে নিয়ে ৮০ গ্রাম লবণ, ৫ গ্রাম জিরা, ৫ গ্রাম কালোজিরা, ৫ গ্রাম গোল মরিচের গুঁড়া, ৭০ গ্রাম দই, ১০ গ্রাম খাবার সোডা, ১ গ্রাম হিং ও ১ গ্রাম কাতেলী দিয়ে মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এরপর সমপরিমাণ মুগ ও মাসকলাই ডালের মিহি গুঁড়া/ময়দা নিয়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণ মিশ্রিত ঠাণ্ডা পানি যোগ করে ৫-৮ মিনিট রোলিং করলে পাপড় তৈরির উপযুক্ত মণ্ড তৈরি হয়। মণ্ডটিকে লম্বালম্বি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে সুতা দিয়ে কেটে নেয়া হয়। গোল আকৃতির মসৃণ কাঠের পিঁড়িতে বেলুন দিয়ে চাপ দিয়ে কয়েকবার এপিঠ-ওপিঠ করলে পাপড় তৈরি হয়। পাপড়ের ব্যাস সাধারণত ১০-১৪ সেমি ও পুরুত্ব ০.৬-০.৯ মিলি মিটার আকৃতির হয়ে থাকে। এগুলো ২০-২৫ মিনিট রৌদ্রে শুকানোর পর ঠাণ্ডা হলে পলিপ্রোপাইলিন প্যাকেটে ভরে ভালভাবে মুখ সিল করে ৮-১০ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

বিভিন্ন ফলের (আমড়া, চালতা) আচার ও চাটনি তৈরিকরণ পদ্ধতি

আচারঃ রকমারি মশলা মেশানো ফল বা সবজিকে খাওয়ার তেল অথবা ভিনেগারে ডুবানো অবস্থায় প্রস্তুত খাদ্যকে আচার বা পিকল বলা হয়। এ পদ্ধতিতে ফল বা সবজির জলীয়াংশ বেশ কমে গিয়ে (১২% বা কম) তেল বা ভিনেগারে সম্পৃক্ত হয়ে উঠলে এদের সংরক্ষণ ক্ষমতা বেড়ে যায়। আচার তৈরিতে মশলা হিসেবে সরিষা, আদা, রসুন, হলুদ, মরিচ, মেথী, জিরা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া টক মিষ্টি করার জন্য চিনি এবং অ্যাসেটিক এসিড ব্যবহার করা হয়। আচারে ব্যবহৃত সরিষার তেল ও এসিড প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করে। আচার বা পিকলস্ খাদ্যকে সুস্বাদু করে। চিনি পুষ্টি ও মিষ্টতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে এবং মশলা উহাকে সুস্বাদু ও মুখরোচক করে তুলে। সব ধরনের আচার বা পিকলস্ে মুলত একই নীতির প্রয়োগ ঘটে এবং তৈরির প্রক্রিয়াও প্রায় অভিন্ন। শুধুমাত্র উপকরণের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে। খুব সহজ পদ্ধতিতে এবং মূল্যবান যন্ত্রপাতি ছাড়াই আচার প্রস্তুত করা সম্ভব বিধায় গ্রাম পর্যায়ে এ প্রযুক্তির প্রসারের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।

আমড়ার আচার

বরই-তেতুঁলের মিশ্র চাটনি

চাটনিঃ চাটনি অর্থ যা চেটে চেটে খাওয়া হয়। বিভিন্ন রকমের ফল ও সবজি যেমন- বরই, তেঁতুল, জলপাই, আম, আমড়া, চালতা ইত্যাদি থেকে চাটনি তৈরি করা যায়। চাটনি সাধারণত ভাত, রুটি, লুচি, ইত্যাদি তন্দুর জাতীয় খাদ্যের সঙ্গে অল্প পরিমাণ মিশিয়ে খেতে ভাল লাগে। এটি খাদ্যকে বেশ সুস্বাদু ও মুখরোচক করে তোলে। সাধারণত ফলের পাল্পের সাথে চিনি, লবণ ও বিভিন্ন মশলা মিশেয়ে চাটনি তৈরি করা হয়। মশলা হিসেবে সরিষা, মরিচ, মেথী, কালোজিরা, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, জয়ফল, জয়ত্রী ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। চিনি ও অ্যাসেটিক এসিড চাটনিকে টকমিষ্টি করে। চাটনিতে ব্যবহৃত সরিষার তেল, অ্যাসেটিক এসিড এবং সোডিয়াম

বেনজোয়েট প্রিজারভেটিভ হিসেবে কাজ করে। এ ছাড়া চিনি পুষ্টি ও মিষ্টতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সংরক্ষক হিসেবে কাজ করে এবং মশলা চাটনির স্বাদ ও সুগন্ধ বাড়ায়। সব ধরনের চাটনিতে মূলত একই নীতির প্রয়োগ ঘটে এবং তৈরির প্রক্রিয়াও প্রায় অভিন্ন। শুধুমাত্র উপকরণের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে থাকে। চাটনির মধ্যে বরই-তেঁতুলের মিশ্র চাটনির স্বাদে অন্যতম একটি মুখরোচক খাবার। মূল্যবান যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছাড়াই বিএআরআই উদ্ভাবিত সহজ পদ্ধতি প্রয়োগ করে বরই-তেঁতুলের মিশ্র চাটনি তৈরি করা যায়। গ্রাম পর্যায়ে এই প্রযুক্তির প্রসারের ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।

ডাবের পানি সংরক্ষণ

নারিকেল বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান অর্থকরী ফসল হিসেবে পরিচিত। দেশের প্রায় সব জেলাতেই এটি জন্মায়, তবে দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে উপকূলীয় জেলাসমূহে এর উৎপাদন বেশি। বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট নারিকেলের শতকরা ৩০-৪০ ভাগ কচি ডাব হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কচি ডাবের শাঁসে স্নেহ ও খনিজ জাতীয় পর্দাথের পরিমাণ বেশি থাকে। খনিজ পদার্থের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পটাসিয়াম, সোডিয়াম ও ফসফরাস থাকে। মূলত কচি ডাবের ভিতরের তরল পদার্থই ডাবের পানি হিসেবে পরিচিত। এই পানি ৯৯ ভাগ চর্বিমুক্ত এবং কম ক্যালরিযুক্ত। প্রচলিতভাবে উন্নত দেশে ডাবের পানি কোমল ও সতেজ পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে এর চাহিদা ব্যাপক। কচি ডাবের পানি শরীরকে ঠাণ্ডা ও দেহের তাপমাত্রা ঠিক রাখে। এ ছাড়াও ডায়রিয়া আক্রান্ত, বয়স্ক এবং বৃদ্ধ লোকের জন্য ডাবের পানি খুবই কার্যকর। আমাদের দেশে প্রক্রিয়াজাতকৃত ডাবের পানির বাণিজ্যিক চাহিদা আছে। ডাবের পানি প্রক্রিয়াজাত করার জন্য প্রথমে ভালমানের কচি ডাব সংগ্রহ করে পরিষ্কার পানিতে ধৌত করতে হয়। অতঃপর ডাব থেকে পানি বের করে মসৃণ কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে যাতে কোন আঁশ বা শাঁস না থাকে। এখন পরিষ্কার ডাবের পানি একটি কাঁচের বিকার বা কনটেইনারে নিয়ে ৯৫-১০০^{0} সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ১০ মিনিট ওয়াটার বাথে রেখে পাস্তুরাইজেশন করতে হবে। পাস্তুরাইজেশনকৃত ডাবের পানির সাথে ১০০ পিপিএম পটাসিয়াম মেটাবাইসালফাইট এবং ০.০৫% কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ যোগ করতে হবে যাতে কোন অবশিষ্টাংশ বা দ্রব্যাদি বোতলের নিচে পড়ে না থাকে। পরিশেষে গরম পানিতে ফুটানো কাঁচের বোতলে গরম অবস্থায় ডাবের পানি ভর্তি করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় শুষ্ক ও ঠাণ্ডা জায়গায় সংরক্ষণ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ডাবের পানি প্রায় ৬-৮ মাস সহজে সংরক্ষণ করা যায়।

স্বাভাবিক তাপমাত্রায় কাঁচের বোতলে ডাবের পানি সংরক্ষণ

নারিকেলের ক্যান্ডি তৈরিকরণ

নারিকেল আমাদের দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল। খাদ্য-পানীয় থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকমারি কাজে এটি ব্যবহৃত হয়। নারিকেলের শাঁস আমাদের শরীরে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। এই শাঁসে আমিষ, শর্করা এবং বিভিন্ন খনিজ পদার্থের উপাদান রয়েছে। নারিকেলের শাঁস দিয়ে বিভিন্ন আকর্ষণীয় ও সুস্বাদু খাবার যেমন নাড়ু, বরফি, বিস্কুট, নারিকেল বার, নারিকেল ক্যান্ডি ও সালাদ তৈরি করা হয়। নারিকেল থেকে তৈরিকৃত খাবারগুলোর মধ্যে নারিকেল ক্যান্ডি অন্যতম আকর্ষণীয় খাবার। নারিকেল থেকে ক্যান্ডি তৈরির জন্য প্রথমে গুটনযুক্ত ভাতের মল্ট তৈরি করতে হয়। এরপর নারিকেলের শাঁস পিষে নিতে হয় যাতে সহজেই শাঁস চেপে নারিকেল মিল্ক বের করা যায়। এখন ক্যান্ডির জন্য ৫০ ভাগ নারিকেল মিল্কের সাথে ২৫ ভাগ চিনি ও ২৫ ভাগ ভাতের মল্ট মিশিয়ে দ্রবীভূত না হওয়া পর্যন্ত তাপ প্রয়োগ করতে হবে। অতঃপর মিশ্রণটিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ লেবুর রস যোগ করে মসৃণ কাপড়ের সাহায্যে ছাঁকতে হয়। এখন মিশ্রণটির সঙ্গে পরিমাণমতো বাদাম যোগ করে কঠিন সমসত্ব মিশ্রণ তৈরির জন্য অনবরত জ্বাল দিতে হবে। তৈরিকৃত মিশ্রণ ১৫-২০ মিনিট পর্যন্ত ঠাণ্ডা করতে

নারিকেল ক্যান্ডি

হয়। এখন ক্যান্ডি তৈরির জন্য মিশ্রণটিকে নির্দিষ্ট মন্ডে রেখে মিশ্রণের উপরিভাগ মসৃণ করা হয় এবং চাকু বা ছুরির সাহায্যে ২ সেমি পরিমাণ করে নারিকেল ক্যান্ডি কাটা হয়। পরিশেষে ক্যান্ডিগুলো র‍্যাপিং কাগজে মুড়িয়ে পলিপ্রপাইলিন ব্যাগে ভর্তি করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত নারিকেল ক্যান্ডি ৬ মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

গুণাগুণ বজায় রেখে কৃত্রিমভাবে ফল পাকানোর জন্য গ্রহণযোগ্য রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রা নির্ধারণ

আম, কলা এবং পেঁপে বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ফল। অপরপক্ষে, টমেটো প্রধান সব্জিগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই সব ফল ও সবজি সাধারণত পরিপক্ক অবস্থায় গাছ থেকে উত্তোলন করা হয়। কিন্তু কখনও কখনও নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই অপরিপক্ক ফসল গাছ থেকে উত্তোলন করা হয় এবং কিছু রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে এদের দ্রুত পাকানো হয়। সাধারণত অপরিপক্ক ফসল উত্তোলনের পেছনে কৃষক/ব্যবসায়ীদের মূল লক্ষ্য থাকে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে (ভরা মৌসুম) তাদের ফসল বাজারজাত করা এবং রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে এই অপরিপক্ক ফসল পাকিয়ে (মূলত রং ধরিয়ে) অধিক মুনাফা অর্জন করা। উপযুক্ত শিক্ষা এবং জ্ঞানের অভাবে তারা এ সব রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের সঠিক মাত্রা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ফসলের কোন পর্যায়ে কি পরিমাণ বা কতবার এসব রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা উচিত, নিয়ম বহির্ভূত ব্যবহারের কারণে খাদ্যোপযোগী ফসলে কি পরিমাণ রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ থেকে যাচ্ছে এবং তা থেকে মানব দেহের কি ক্ষতি হতে পারে সে বিষয়ে তারা পুরোপুরি অসচেতন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ ফসলের সংগ্রহোত্তর বৈশিষ্ট্যের উপর ফল পাকানোর প্রক্রিয়া ত্বরান্বিতকারী রাসায়নিক দ্রব্য (ইথোফন) এর বিভিন্ন ঘনমাত্রার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করেছে এবং খাদ্যোপযোগী ফল ও সবজিতে অবশিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্যের মাত্রা নির্ণয় করেছে।

চিত্র ১: ফল ও সবজি পাকানোর জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্য

ইথোফন (২-কোরোইথাইল ফসফনিক এসিড) হল একটি রাসায়নিক দ্রব্য যা সাধারণত বাণিজ্যিকভাবে ফল পাকানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি ফলের ভিতর প্রবেশ করে এবং ইথিলিনে রূপান্তরিত হয়। ইথোফনের জলীয় দ্রবণ pH ৩.৫ এর নিচে সুস্থিত (Stable)। pH ৩.৫ এর উপর ইথোফনের জলীয় বিশ্লেষণ মুক্ত ইথিলিন নির্গমন করে। এর সাথে কিছু ক্লোরাইড ও ফসফেট আয়নও নির্গত হয়। যখন পরিপক্ক ফলকে ইথোফনের জলীয় দ্রবণে ডুবানো হয়, তখন এটি কোষের ভিতর প্রবেশ করে ইথিলিন নির্গমন করে এবং ফল পাকানোর প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

পরিপক্ক টমেটো ও কলা পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে বাতাসে শুকিয়ে নিতে হয়। অতঃপর ইথোফন (১-ক্লোরোইথাইল ফসফনিক এসিড) এর ৭৫০ - ১,০০০ পিপিএম দ্রবণে পাঁচ মিনিট ভিজিয়ে রাখা হয়। এরপর স্বাভাবিক তাপমাত্রায় বাতাসে ১০ মিনিট শুকানো হয় যেন কলা ও টমেটোগুলো রাসায়নিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। অতঃপর কলা ও টমেটোগুলোকে খড় অথবা পলিপ্রোপাইলিন দিয়ে ঢেকে রাখতে হয়।

পরীক্ষার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে, স্বাভাবিকভাবে পাকানো এবং ইথোফনের দ্রবণ ব্যবহার করে পাকানো ফলে পুষ্টিমানের পার্থক্য সামান্য। কিন্তু ইথোফন ব্যবহৃত ফলের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য স্বাভাবিকভাবে পাকানো ফলের তুলানায় আকর্ষণীয় হয়। সম্পূর্ণ পরিপক্ক অবস্থায় যেসব ফলে ইথোফেন ব্যবহার করা হয় তার পুষ্টিমান অপরিপক্ক ফলের তুলনায় ভাল থাকে। আরও দেখা যায় যে, ৭৫০-১,০০০ পিপিএম ইথোফন পরিপক্ক কলা ও টমেটোর ঈষৎ রঙ ধরা পর্যায়ে (Breaker stage) ব্যবহার করলে ৬ দিনের মধ্যে সুষমভাবে পাকানো যায়। এসব খাদ্যোপযোগী কলা ও টমেটোতে।

চিত্র ২: ৭৫০- ১০০০ পিপিএম ইথোফন ফল ও সবজির ব্রেকার পর্যায়ে ব্যবহার করলে ৬ দিনের মধ্যে সুষমভাবে পেকে যায়।

অবশিষ্ট ইথোফনের পরিমাণ পাওয়া যায় ০.১৬-০.৮৮ পিপিএম, যা সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য ইথোফনের মাত্রা (২ পিপিএম) এর চেয়ে কম। একইভাবে দেখা যে, ৫০০- ৭৫০ পিপিএম ইথোফন পরিপক্ক আম ও পেঁপেতে ব্যবহার করলে ৩-৫ দিনের মধ্যে সুষমভাবে পাকানো যায়। এসব খাদ্যোপযোগী ফলো মধ্যে অবশিষ্ট ইথোফনের পরিমাণ পাওয়া যায় ০.১১-০.৫৮ পিপিএম (আমের ক্ষেত্রে) এবং ০.২১-০.৪৫ (পেঁপের ক্ষেত্রে) যা সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য ইথোফনের মাত্রা (২ পিপিএম) এর চেয়ে কম।

চিত্র ৩: ৫০০- ৭৫০ পিপিএম ইথোফন ফলের ব্রেকার পর্যায়ে ব্যবহার করলে ৫-৬ দিনের মধ্যে সুষমভাবে পেকে যায়

ভুট্টার কনডেন্সড মিল্ক তৈরিকরণ

তৈরিকৃত ভুট্টার কনডেন্সড মিল্ক

ভুট্টার মোচা

ভুট্টা একটি অধিক ফলনশীল দানাশস্য। ধান ও গমের তুলনায় এর পুষ্টিমান বেশি। এতে শর্করা ছাড়াও প্রোটিন, ভিটামিন 'এ', অ্যামাইনো এসিড ও ফাইবার বিদ্যমান। দেশে অনেক জেলাতেই ভুট্টার চাষ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে হাঁস-মুরগি, মাছ ও গো-খাদ্য হিসেবে ভুট্টা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটির দানা মানুষের খাদ্য হিসেবে অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। দেশের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে এবং খাদ্যদ্রব্য তৈরিতে ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ ভুট্টার বহুমুখী ব্যবহার হিসেবে কঁচি ভুট্টা থেকে কনডেন্সড মিল্ক তৈরির সহজ পদ্ধতি গবেষণার মাধ্যমে নির্ধারণ করেছে।

ভুট্টা কাঁচা অবস্থায় দানা যখন অল্প নরম থাকে (Milky stage) তখনই মোচা সংগ্রহ করতে হবে। মোচা থেকে খোসা ও সিল্ক সরিয়ে পরিষ্কার পানিতে ভুট্টা ধুয়ে নিতে হবে। এখন ভুট্টার মোচা থেকে ধারালো ছুরির সাহায্যে কেটে দানা বা কার্নেলগুলো আলাদা করতে হবে। অতঃপর জুস এক্সট্রাক্টরের মাধ্যমে কার্নেল থেকে কর্নমিল্ক বা ভুট্টার রস বের এবং পরিষ্কার কাপড়ের মাধ্যমে ছেঁকে নিতে হবে। এভাবে প্রাপ্ত কর্নমিল্ককে একটি সসপেনে নিয়ে টিএসএস (TSS) ১৭° ডিগ্রি ব্রিক্স না আসা পর্যন্ত ৭০-৮০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তাপমাত্রায় রান্না করতে হবে। এবার পাত্রটিতে প্রাপ্ত কর্নমিল্কের ৮০% চিনি যোগ করে ৮০-৯০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রান্না করতে হবে যাতে টিএসএস (TSS) ৬৫° ডিগ্রি ব্রিক্স হয়। এখন কর্নমিল্কের ০.৩% কার্বোক্সি মিথাইল সেলুলোজ (সিএমসি) এবং কর্নমিল্কের ০.৫% ল্যাকটোজ পাত্রে যোগ করতে হবে। অতঃপর মিশ্রণটিতে কর্নমিল্কের ০.২৫% লবণ এবং ৪% গ্লুকোজ সিরাপ যোগ করে ভালোভাবে নেড়ে ৭২-৭৫° ডিগ্রি ব্রিক্স পর্যন্ত রান্না করতে হবে। অতঃপর প্রাপ্ত মিশ্রণটিকে ব্লেন্ডার এর মাধ্যমে ব্লেন্ড করে সমঘনত্বে আনতে হবে যাতে কোন ছোট দানা না থাকে। এভাবে প্রাপ্ত কনডেন্সড মিল্ককে নির্দাধিত তাপমাত্রায় ৫ মিনিট ফুটন্ত পানিতে রেখে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। গরম মিশ্রণটিতে ১,০০০ পিপিএম পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইড যোগ করে গরম অবস্থায় জীবাণুমুক্ত কাঁচের বোতলে ভর্তি করে শুষ্ক জায়গায় সংরক্ষণ করতে হবে।

কাঁচা আমের জুস তৈরিকরণ

আম বাংলাদেশের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপাদেয় ফল। এ ফলটি স্বাদ, গন্ধ ও পুষ্টিমান ও ব্যবহার বৈচিত্রে তুলনাহীন বলে এটিকে ফলের রাজা বলা হয়। আমে ভিটামিন এ, সি ও খনিজ পদার্থ বিদ্যমান। দেশের প্রায় সকল জেলাতেই আমের

চাষ হয়ে থাকে। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে উন্নত প্যাকেজিং, পরিবহন ব্যবস্থা, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অভাবে প্রতি বছর ২৫-৩০ ভাগ আমের সংগ্রহোত্তর অপচয় হয়ে থাকে। এ ছাড়াও ঝড় ও শিলাবৃষ্টির কারণে পরিপক্ক হওয়ার পূর্বেই কাঁচা আমের একটি বিরাট অংশ গাছ থেকে পড়ে যায়। গাছ থেকে অকালে ঝড়ে পড়া এ কাঁচা আম কৃষককে নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করতে হয়। এই ঝড়ে পড়া কাঁচা আমকে শিল্প কারখানায় প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্যসামগ্রী বিশেষ করে কাঁচা আমের জুস তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের পোস্টহারভেস্ট টেকনোলজি বিভাগ গবেষণার মাধ্যমে সহজ পদ্ধতিতে কাঁচা আমের জুস তৈরি এবং এর সংরক্ষণ কৌশল উদ্ভাবন করেছে।

কাঁচা আমের জুস

কাঁচা আম

কাঁচা আম সংগ্রহ করে ভালভাবে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে নিতে হবে এবং আমের খোঁসা ও আঁটি ফেলে টুকরো করতে হবে। অতঃপর ব্লেন্ডারে নিয়ে এক ভাগ আমের সাথে চার ভাগ পানি নিয়ে পাল্প তৈরি করতে হবে। এখন পাল্পগুলো একটি পরিষ্কার নেট বা সাদা কাপড়ে নিয়ে ছাঁকতে হবে এবং প্রস্তুতকৃত পাল্পকে একটি পাত্রে নিয়ে ৭৫^{0} সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ২ মিনিট জ্বাল দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এভাবে প্রস্তুতকৃত কাঁচা আমের পাল্পকে পরবর্তী সময়ের জন্য ব্যবহারে জন্য -২০^{0} সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় (ডীপ ফ্রিজ) সংরক্ষণ করতে হয়।

কাঁচা আমের জুস তৈরি করার জন্য একটি পাত্রে এক লিটার পরিমাণ পানি নিয়ে ১০০^{0} সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় আট মিনিট ফুটিয়ে নিতে হবে। অতঃপর এ পানিতে ১২৭ গ্রাম চিনি মিশিয়ে দ্রবীভূত করে মোটা কাপড়ে ছেঁকে নিতে হবে। প্রাপ্ত চিনির দ্রবণে ৩.৩৯ গ্রাম কার্বোক্সি মিথাইল সেলুলোজ (সিএমসি) মিশ্রিত করে ৫-৬ মিনিট জ্বাল দিয়ে দ্রবীভূত করতে হবে। এরপর প্রাপ্ত দ্রবণে ২২৬ মিলি লিটার কাঁচা আমের পাল্প যোগ করে ভালোভাবে নেড়ে মিশিয়ে দিতে হবে এবং দুই মিনিট পর্যন্ত জ্বাল দিতে হবে। পরিশেষে প্রস্তুতকৃত কাঁচা আমের জুসকে পর পর দুইবার মোটা কাপড় দিয়ে ছেঁকে নিয়ে তাতে ৬৮ মিলি গ্রাম পটাশিয়াম মেটাবাইসালফাইড (কেএমএস) সংরক্ষণকারক মিশিয়ে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত বোতলজাত করতে হবে। এভাবে প্রস্তুতকৃত কাঁচা আমের জুস ৬-৮ মাস স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা যায়।

তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আনারস, কলা ও লেবুর সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ

আনারসঃ আনারস বাংলাদেশের অন্যতম একটি সুস্বাদু ও পুষ্টিকর জনপ্রিয় ফল। এটি ভিটামিন 'এ', 'বি' ও 'সি' ছাড়াও অন্যান্য খনিজ লবণ বিদ্যমান। বাণিজ্যিক ফল হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজারে এর চাহিদা রয়েছে। আমাদের দেশে উৎপাদিত আনারসের জাতগুলোর মধ্যে জায়ান্ট কিউ ও হানিকুইন ব্যাপকভাবে সমাদৃত। মৌসুমে উৎপাদিত শতকরা ৬০-৬৫ ভাগ আনারস দেশের অভ্যন্তরে বিক্রয় হয়ে থাকে। মাত্র ৫-৭ ভাগ আনারস শিল্প কারখানায় প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য সামগ্রী যেমন জ্যাম, জেলী, স্কোয়াশ, জুস ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। ভরা মৌসুমে একসঙ্গে অধিক আনারস পাঁকার ফলে দাম কমে যায়, এছাড়া সঠিক পরিবহন ব্যবস্থা ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে শতকরা প্রায় ২০-৪০ ভাগ আনারস নষ্ট হয়ে থাকে। পরিবহন ব্যবস্থা, উন্নত প্যাকেট জাতকরণ ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা গেলে সতেজ অবস্থায় পুষ্টিগুণ বজায় রেখে ৩-৪ সপ্তাহ অনায়াসে আনারস সংরক্ষণ করা যায়। সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির মাধ্যমে এটি দেশে বিক্রয়ের পাশাপাশি অধিক পরিমাণে বিদেশেও রপ্তানি করা যাবে, ফলে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি আনারসের সংগ্রহোত্তর অপচয় বহুলাংশে কমানো সম্ভব হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের শস্য সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি বিভাগ আনারস পরিবহন, প্যাকেটজাতকরণ ও সংরক্ষণকাল বৃদ্ধির প্রযুক্তি গবেষণার মাধ্যমে নির্ধারণ করেছে।

পরিপক্ক, সতেজ ও সমআকারের আনারস বাগান হতে সংগ্রহ করার পর কাঠের বাক্সে/ক্রেটস্ অথবা বড় আকারের প্লাস্টিক ক্রেটসে্ সারিবদ্ধভাবে সাজাতে হবে যাতে আঘাতপ্রাপ্ত/নষ্ট না হয়। ডিজাইনকৃত কেরোসিন (৬০ সেমি × ৩৬ সেমি × ৩২ সেমি) কাঠের বাক্সে/ ক্রেটস্-এ ২০-২৫টি আনারস সহজেই পরিবহন করা যাবে। কার্টুনে (৫ প্লাই, ভার্জিন

কার্টুন) পরিবহনের ক্ষেত্রে ১২-১৫ টি আনারস পরিবহন করা যায়। ক্রেটস্ বা কার্টুনে আনারস ভর্তি করার পর বেশি দূরত্বে পরিবহনের জন্য রিফ্রিজারেটেড ট্রাক/ রিফার ভ্যান ব্যবহার করতে হবে, যাতে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের (১৮-২০^{0}) মাধ্যমে সতেজ থাকে।

পরিপক্ক আনারস (CV. Giant Kew)

ফালিকৃত আনারস (২৮ দিন পর)

অতঃপর ক্রেটস/কার্টুনে ভর্তি আনারস অধিক সময় সতেজ অবস্থায় গুণাগুণ বজায় রেখে সংরক্ষণ করার জন্য কোল্ড চেম্বার বা কোল্ড রুমে সংরক্ষণ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, পলিপ্রপাইলিন প্যাকেটে আনারস ভর্তি না করে কোল্ড রুমে রাখলে সতেজ থাকলেও ভিতরের শ্বাস শুকিয়ে যায়। গবেষণায় পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে, জায়ান্ট কিউ জাতের (CV. Giant Kew) ২টি আনারস ১% ছিদ্রযুক্ত পলিপ্রপাইলিন প্যাকেটে (৩৪ মাইক্রোন) একত্রে রাখলে সতেজ ও রসালো অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়। প্যাকেটে ভর্তি আনারসগুলো কোল্ডরুমে রেখে ১১^{0} সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং ৮৮±১% আর্দ্রতা নির্ধারণ করে দিতে হবে। ফলে কোল্ডরুমে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সতেজ অবস্থায় আনারস সংরক্ষণ করা যাবে। অপরপক্ষে, হানিকুইন জাতের আনারস (CV. Honey Queen) ৬০ গ্রাম/লি. স্টা-ফ্রেশ ১৯৫২ (Sta-Fresh 2952) দিয়ে প্রলেপ দিয়ে, ১১±১ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রা এবং ৮৮±২% আর্দ্রতায় রেখে ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

পরিপক্ক আনারস (CV. Honey Queen) সংরক্ষণ ২১ দিন পর

বিক্রয়ের জন্য কোল্ডরুম থেকে বের করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখলে আরও ৩-৪ দিন সতেজ অবস্থায় সংরক্ষণ করা যায়, যেখানে মাঠ থেকে পরিপক্ক আনারস উঠানোর পর স্বাভাবিক তাপমাত্রায় মাত্র ৬-৭ দিন সতেজ থাকে বা বিক্রয়ের উপযোগী থাকে। এভাবে সংরক্ষণকৃত আনারস বাণিজ্যিক উদ্দেশে বিদেশে রপ্তানির পাশাপাশি আমাদের দেশেও দীর্ঘ সময় ভোক্তাগণ খেতে পারবে।

কলা ও লেবু : কলা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ফল। যথাযথ হ্যান্ডেলিং, পরিবহন ও সংরক্ষণাগারের অভাবে প্রচুর কলা নষ্ট হয়। এই ক্ষতির পরিমাণ সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং সংরক্ষণকালে যথাযথ তাপমাত্রা বজায় রেখে সহজেই কমানো যায়। পরীক্ষায় দেখা যায়, অ্যালাম (২০ গ্রাম/মিলি), থায়াবেন্ডাজল (০.৫ গ্রা/লিটার), ইমিডাজল (০.৫ গ্রা/লিটার) এবং জিব্রেলিক এসিড (০.০৫ গ্রাম/লিঃ) দ্রবণে কলাকে ডোবানোর পরে একে কম ঘনত্বের পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগে (৪৫ মাইক্রন) ভরে ১৩ ± ২° সে. তাপমাত্রায় এবং ৮৫% ± ৫% ভাগ আর্দ্রতায় একে অনেকদিন সংরক্ষণ করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় কলা পাকার বিভিন্ন পর্যায়গুলো দীর্ঘায়িত করা যায় এবং গুণগতমান ৩ সপ্তাহ পর্যন্ত রক্ষা করা যায়। অপরদিকে, লেবু ১৩±২ ডিগ্রি সে. তাপমাত্রায় এবং ৮৮±২% আর্দ্রতায় ১% ছিদ্রযুক্ত পলিপ্রোপাইলিন ব্যাগে (৩৪ মাইক্রন) ভরে ৪ সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যায়।

কলার সংরক্ষণকাল বৃদ্ধিকরণ

২৮ দিন পর

অনিষ্টকারী মেরুদণ্ডী প্রাণি ব্যবস্থাপনা

ইঁদুর দমন ব্যবস্থাপনা

ইঁদুর দমন পদ্ধতি সমূহকে আমরা সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। (ক) পরিবেশসম্মত ভাবে ইঁদুর দমন (খ) বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ইঁদুর দমন বা রাসায়নিক পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন ।

ক) পরিবেশ সম্মতভাবে দমন : কোন রকম বিষ ব্যবহার না করে অর্থাৎ পরিবেশের কোন ক্ষতি না করে ইঁদুর দমনই হলো পরিবেশ সম্মতভাবে ইঁদুর দমন । বিভিন্ন ভাবে এটা করা যায়। যেমন-

১) **পরিবেশগত ব্যবস্থাপনা :** বিভিন্ন পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ইঁদুরের ক্ষতি কমিয়ে আনা যায়।

- ইঁদুর নোংরা স্থান পছন্দ করে বিধায় বাড়িঘর, ক্ষেত খামার, পুকুরপাড়, বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধ, নদীর পাড় ইত্যাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।
- খাদ্য গুদাম এবং খড়ের গাদা মাটির সাথে তৈরি না করে, প্রায় ৬০-৭৫ সেমি উঁচু মাচা তৈরি করে তার উপর করতে হবে এতে ইঁদুরের উপদ্রব কম হবে। ক্ষেতের আইল মোটা হলে ইঁদুর গর্ত করে, তাই আইল ছেঁটে চিকন করতে হবে।
- বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বাড়ী বা গুদাম ঘরে ইঁদুর যাতে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অনুরূপভাবে নারিকেল বা সুপারি গাছে মাটি থেকে ৫-৬ ফুট উঁচুতে ও ২.৫ ফুট চওড়া মসৃণ টিনের পাত লাগিয়ে ইঁদুর প্রতিরোধ করা যায়।

২) **নিবিড়ভাবে ফাঁদ পাতা:** বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ পেতে ইঁদুর দমন করা যায়। যেমন বাঁশ, কাঠের, টিন ও লোহার তার দ্বারা তৈরি ফাঁদ ব্যবহার করা যেতে পারে। ফাঁদ সাধারণত ২ প্রকার, জীবিত অবস্থায় ধরা ফাঁদ এবং মৃত্যু ফাঁদ। মৃত্যু ফাঁদে সরাসরি ইঁদুর যাতাকলে আটকিয়ে মারা যায়। জীবিত ফাঁদে ইঁদুর আটকা পরে কিন্তু মারা যায় না। নতুন গর্তের মুখে ইঁদুর চলাচলের রাস্তায়, ক্ষেতের আইলে বা ঘরের দেয়াল ঘেসে ফাঁদ ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ফাঁদ প্রতিদিন পরিষ্কার করা হয় এবং নতুন খাবার/টোপ দেয়া হয়। ফাঁদে টোপহিসাবে শুটকীমাছ, নারিকেল পাউরুটি বেশী কার্যকর।

৩) **পরভোজী প্রাণি সংরক্ষণ:** পেঁচা, গুইসাপ, বেজী, শিয়াল, বিড়াল ইত্যাদি প্রাণির প্রধান খাদ্য ইঁদুর। এ প্রাণি গুলোকে সংরক্ষণ করলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষাসহ ইঁদুর সমস্যা অনেকাংশে কমে যাবে।

খ) রাসায়নিক পদ্ধতি: বিভিন্ন ধরনের বিষ ব্যবহার করে ইঁদুর দমনকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে ইঁদুর দমন বলে। দুই ধরনের বিষ সাধারণত পাওয়া যায়। তীব্র বা তাৎক্ষনিক বিষ এবং দীর্ঘস্থায়ী বিষ।

- তাৎক্ষনিক বিষ খাওয়ার ১-২ ঘন্টার মধ্যেই ইঁদুর মারা যায়। এই বিষটোপ ব্যবহারের পূর্বে ১-২ দিন বিষহীন টোপ ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তাৎক্ষনিক বিষ হিসাবে জিংক ফসফাইড বিষটোপ ব্যবহৃত হয়, যা বিভিন্ন নামে বাজারে বিক্রি হয়। জিংক ফসফাইড মিশ্রিত গম বিষটোপ গর্তের ভিতর প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।
- দীর্ঘস্থায়ী বিষটোপ খাওয়ার ৬-৭ দিন পর ইঁদুর মারা যায়। তাই অন্যান্য জীবিত ইঁদুর বুঝতেই পারে না যে, এই বিষটোপই তাদের সঙ্গিদের মৃত্যুর কারণ। ফলে ইঁদুর দমনের সফলতা বেশি আসে। অবশ্যই সরকার অনুমোদিত পেস্টিসাইড ডিলারের নিকট থেকে বিষটোপ কিনতে হবে। বাড়িঘর, ক্ষেত খামার যেখানেই ইঁদুরের আক্রমণ হোক না কেন, এক স্থানে অনেকগুলো বিষটোপ না রেখে ৪/৫ স্থানে বিষটোপ ইঁদুরের গর্ত ও চলাচলের রাস্তার আশে পাশে রাখা উচিত। বিষটোপ প্রস্তুত বা ব্যবহারের সময় খুব সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত দরকার। বিষটোপ ছোট ছেলে মেয়েদের ও গৃহপালিত পশু পাখির নাগালের বাইরে রাখতে হবে। মৃত

ইঁদুর গুলো একত্রিত করে গর্তে পুঁতে ফেলতে হবে। বিষটোপ ছাড়া এক প্রকার গ্যাস বড়ি এ্যালুমিনিয়াম ফসফাইড দিয়েও ইঁদুর দমন করা যায়। প্রতিটি সতেজ গর্তে একটি ট্যাবলেট দিয়ে গর্তের সব মুখ ভাল ভাবে বন্ধ করতে হবে। শুকনা মাটির চেয়ে একটু আর্দ্র মাটিতে যেন কোন ফাটল না থাকে গর্তের মুখ খোলা থাকলে বা মাটিতে ফাটল থাকলে গ্যাস বেরিয়ে যাবে এবং ইঁদুর মারা যাবে না। ইঁদুর দমনের সফলতা নির্ভর করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর।

ধাতব পাত দ্বারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে ফল গাছে ইঁদুর দমন

ইঁদুর সর্বভুক প্রাণি। এরা ঘরের ও মাঠের ফসল খেয়ে ও কেটে নষ্ট করে ক্ষতি করে থাকে। ইঁদুরের ছেদন দাঁত গজানোর পর হতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পায়। কাটাকুটি না করতে পারলে দাঁত বেড়ে চোয়াল দিয়ে বের হয়ে যায় ফলে ইঁদুর মুখ বন্ধ করতে না পারায় খাওয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়। তাই দাঁত ঠিক রাখার জন্য ইঁদুর সর্বদা শক্ত জিনিস কাটাকাটি করে থাকে। ইঁদুর বৎসরে প্রায় ৪-৫ লক্ষ মেট্রিকটন ফসল নষ্ট করে যার মূল্য প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। তাছাড়া ইঁদুর প্লেগসহ প্রায় ৪০ প্রকার রোগ বিস্তার করে। ইঁদুর দানাশস্য ও গুদামে ক্ষতি ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার ফল খেয়ে ও কেটে ক্ষতি করে থাকে যেমন নারিকেল, সুপারি, আম, লেবু, পেয়ারা, সফেদা, কাঠাল, কলা, কুল ইত্যাদি ফল খেয়েও গাছে বাসা তৈরি করে ক্ষতি করে থাকে। সাধারণত ফল গাছে *Rattus rattus* প্রজাতির ইঁদুর ক্ষতি করে থকে। এরা কিছুটা বাদামী বর্ণের। এরা নারিকেল গাছে উঠে বাসা তৈরি করে এবং কচি ডাবের অগ্রভাগে ছিদ্র করে ডাবের পানি ও শাস খেয়ে ক্ষতি

ইঁদুর দ্বারা ডাবের ক্ষতি ও ধাতব পাতের মাধ্যমে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি

করে থাকে। বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলের এক জরিপে দেখা যায় প্রতি বছর গাছ প্রতি ১০-১২ টি কচি নারিকেল ইঁদুর দ্বারা নষ্ট হয়। যার আনুমানিক মূল্য ৩০০-৪০০ টাকা । তাই এদের দমন করা অত্যন্ত জরুরি। নারিকেল গাছ সহ অন্যান্য গাছে ইঁদুর দমনের ক্ষেত্রে ধাতব পাত দ্বারা সাফল্যজনকভাবে ইঁদুর দমন করা যায়। এ ক্ষেত্রে টিনের পাত লাগানোর পূর্বে গাছকে ইঁদুর মুক্ত করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় মরা ডাল পালা কেটে পরিষ্কার করতে হবে। এবং অন্য গাছের সাথে লেগে থাকা ডালপালা ছেটে দিতে হবে। বিশেষ করে গাছ থেকে গাছের দূরত্ব কমপক্ষে ৬ ফুট বা ২ মিটার ব্যবধান হতে হবে। যাতে ইঁদুর অন্য গাছ থেকে ডাল বেয়ে টিন লাগানোর গাছে না আসতে পারে। নারিকেল, সুপারি গাছসহ ফল উৎপাদনকারী গাছের গোড়া হতে ২ মিটার উপরে গাছের খাড়া কাণ্ডের চারিদিকে ৫০-৬০ সেমি প্রশস্ত টিনের পাত শক্তভাবে আটকিয়ে দিতে হয়। ফলে ইঁদুর গাছের গোড়া (নিচ) থেকে উপরে উঠতে যেয়ে টিনের পাত কিছুটা মসৃন হওয়ার বাধা প্রাপ্ত হয়। ফলে উপরে উঠতে পারেনা। এই পদ্ধতি অরাসায়নিক হওয়ায় পরিবেশ দূষণমুক্ত, অর্থনৈতিকভাবে সাশ্রয়ী ও লাভজনক। সাধারণত এ পদ্ধতি ব্যবহারে ১টি নারিকেল গাছে ১০০-১৫০ টাকা খরচ হয়। একবার টিনের পাত লাগালে ৪-৫ বৎসর পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এ পদ্ধতি ব্যবহার করে নারিকেল সহ অন্যান্য ফল গাছে ইঁদুর ও কাঁঠবিড়ালী সফলভাবে দমন করা যায়।

চকচকে ফিতা দিয়ে পাখি তাড়ানো

আমাদের দেশে নানা জাতের পাখি আছে। এরা বিভিন্ন প্রকার কীটপতঙ্গ ও ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় খেয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। তবে কিছু কিছু পাখি আছে যেগুলো উপকারের পাশাপাশি কিছু অপকার করে থাকে । যেমন বাবুই, কাক, টিয়া, শালিক, এসব পাখি ফসলের ক্ষতি করে থাকে।

গম ক্ষেতে শালিক পাখির উপদ্রব হয়। বীজ বোনার ৫/৬ দিন পর গমের অঙ্কুর বের হয়। কোন কোন এলাকায় শালিক পাখি এ অংকুরিত গম ক্ষেতের বীজ তুলে খেয়ে ফেলে। এতে আশানুরুপ ফলন হয় না। পাকা টমেটো ক্ষেতেও পাখির উপদ্রব হয়। ভুট্টা ক্ষেতে টিয়া ও কাকের উপদ্রব হয়। এরা ভুট্টার মোচা খেয়ে ফেলে ফসলের ক্ষতি করে। তেমনি ভাবে সূর্যমুখী ক্ষেতেও কাক ও টিয়া পাখি পরিপক্ক বীজ খেয়ে ফেলে। যেহেতু এসব পাখি ফসলের ক্ষতির পাশাপাশি যথেষ্ট উপকার করে থাকে তাই এগুলো একবারে মেরে ফেলে উচিত নয়। পাখিকে না মেরে ফসলের ক্ষেত থেকে তাড়িয়ে দেয়াই উত্তম। পাখি তাড়ানোর উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো হলো-ঢিল ছোড়া, বাশেঁর ডুগডুগি বাজানো, কাক তাড়ুয়া ব্যবহার করা, বাজি ফুটানো চকচকে ফিতা ব্যবহার করা, জাল পাতা ইত্যাদি। এসব পদ্ধতির মধ্যে চকচকে ফিতার ব্যবহার বেশি কার্যকর।

পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ এবং শুকনা মরিচের গুড়ার মাধ্যমে কাঠবিড়ালী দমন

পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ এবং শুকনা মরিচ গুড়া এর মিশ্রণ স্প্রের মাধ্যমে সবজি, ফল এবং মাঠের অন্যান্য ফসল থেকে কাঠবিড়ালী সফলভাবে ৪ থেকে ৫ দিন অবধি বিতারণ সম্ভব। এটি একটি সহজ পদ্ধতি, কৃষকভাই ও বোনেরা খুব সহজে নিজ বাড়ীতে এই মিশ্রণটি তৈরি করে তাদের মাঠের কাঠবিড়ালী বিতাড়ণ করতে পারবেন।

মিশ্রণ তৈরির পদ্ধতি: প্রথমে, ৫০ গ্রাম পেঁয়াজ, ১০ গ্রাম কাঁচামরিচ এবং ১০ গ্রাম শুকনা মরিচ গুড়া মেপে নিতে হবে। এরপর পিয়াজগুলো ছিলে নিতে হবে। তারপর পেঁয়াজ ও কাঁচামরিচ চাকু দিয়ে কুচি কুচি করে কেটে নিতে হবে। এরপর একটি সসপেনে ২ লিটার পানির মধ্যে পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ এবং শুকনা মরিচ গুড়া নিয়ে মিশ্রণটি চুলায় ৩০ মিনিট ফুটাতে হবে। মিশ্রণটি ঠাণ্ডা হলে, তা একটি পাত্রে ছেঁকে নিতে হবে। এরপর ছেঁকে নেওয়া মিশ্রণটি স্প্রে মেশিনে ঢেলে নিতে হবে। ফল গাছের সংখ্যা ও জমির পরিমাণ অনুযায়ী সঠিক পরিমাণ মিশ্রণ তৈরি করে নিতে হবে।

স্প্রে পদ্ধতি: ফল গাছে ফুটপাম্প স্প্রে মেশিন এবং ফসলের মাঠের জন্য ন্যাপস্যাক স্প্রেয়ার ব্যবহার করে গাছের ক্যানোপি ভালোভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে। এভাবে ৪ থেকে ৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হবে।

শুকনা মরিচের গুঁড়া

পেঁয়াজ

কাচা মরিচ

ফুটানো মিশ্রণ

ফুটানো মিশ্রণ স্প্রে করা

বীজ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। এদেশের মূল অর্থনীতি, উন্নয়ন সবটাই নির্ভর করে কৃষির উপর। এই উন্নয়নের ক্ষেত্রে বীজের গুরুত্ব সকল উপকরণের চেয়ে বেশি। বীজই হলো একমাত্র সেই উপকরণ যা মানসম্পন্ন না হলে অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার ফলপ্রসূ হয় না। কৃষি ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিতে হলে মানসম্পন্ন বীজকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং এর সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। বীজের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১৯৯৮ সালে বীজ প্রযুক্তি বিভাগ নামে এই বিভাগের জন্ম হয়। বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং সংরক্ষণ ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাই এ বিভাগের প্রধান কাজ। গবেষণা কর্মকর্তা, সম্প্রসারণকর্মী ও কৃষকদের আধুনিক মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য বিভিন্ন সভা সমিতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রশিক্ষণ প্রদান অত্র বিভাগের বিজ্ঞানীদের অন্যতম দায়িত্ব। কৃষকের মাঠে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরীক্ষা, পরিদর্শন ছাড়াও প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বীজ উৎপাদনের আধুনিক কলা কৌশলের উপর মাঠ দিবস আয়োজন করা হয়ে থাকে। বীজ প্রযুক্তি বিভাগের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি এখানে কর্মরত বিজ্ঞানীরা ভালো মানের বীজ উৎপাদনের এবং সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন রকম প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছেন। কৃষক পর্যায়ে বীজের অংকুরোদ্‌গমের পরীক্ষা, বিভিন্ন বীজের সতেজতা পরীক্ষা, বৃষ্টিতে ভিজে যাওয়া গম বীজ কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়; ফেলন, মুগবীন, সয়াবিন ইত্যাদি ফসলের বীজ বপনের এবং কর্তনের সঠিক সময় নির্ধারণ; বিভিন্ন ফসল যেমন চীনাবাদাম, মুগবীন, খেসারী, মসুর ইত্যাদি বীজ হিসাবে সংরক্ষণ পদ্ধতি উদ্ভাবন হলো। এগুলো বীজ প্রযুক্তি বিভাগের কর্মকাণ্ডের প্রতিফলন। শিম, টমেটো, মিষ্টি কুমড়া, লাউ, মিষ্টি মরিচ, বেগুন ফসলগুলোর বীজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

কৃষক পর্যায়ে বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম হার নির্ণয়ের সহজ পরীক্ষা

গম: পুরনো খবরের কাগজ বা ছোট পাত্রে বালি ভরে সেখানে গমের বীজ গজানোর জন্য দিতে হবে। প্রতি পাত্রে ১০০টি বা ৫০টি করে বীজ ৪টি পাত্রে মোট ৪০০টি বা ২০০টি বীজ দুই ভাজ করে কাগজের মধ্যে দূরত্ব রেখে ট্রেতে বিছিয়ে ঘরের মাচায় রাখতে হবে এবং কাগজ সব সময় ভেজা রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। পাঁচদিন পর গজানো বীজের সংখ্যা গণনা করে গম বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা নির্ণয় করা যায়। অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা শতকরা ৮৫ এবং তার বেশি হলে বীজের অঙ্কুরোদগম ক্ষমতা ভাল এবং শতকরা ৭৫-৮০ ভাগ হলে অতিরিক্ত ২৫% বীজসহ বুনতে হবে। শতকরা ৭০ ভাগের নিচে অঙ্কুরোদগম হলে বীজ হিসেবে ব্যবহারের যোগ্য নয়।

গমের দানা

ভুট্টা: বালি বা মাটিপূর্ণ পাত্রে অথবা কলা গাছের খোল/বাকল ভুট্টা বীজ গজানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। কলা গাছের বাকল প্রয়োজনীয় আকারে কেটে নিয়ে আড়াআড়িভাবে মাঝখান দিয়ে চিরে নিতে হবে। তারপর দুই স্তরের মাঝে ৫০টি ভুট্টার বীজ স্থাপন করতে হবে। কলাগাছের বাকল যথেষ্ট ভেজা তাই আলাদাভাবে পানি দেয়ার প্রয়োজন নেই। বীজসহ বাকলটি ঘরের মধ্যে রেখে দিতে হবে। ছয় দিন পর্যন্ত গজাতে দিতে হবে এবং অঙ্কুরোদগমের হার দেখতে হবে। বীজ গজানোর হার যদি শতকরা ৯৮-১০০ ভাগ হয় তাহলে একটি করে বীজ প্রতি স্থানে দিতে হবে এবং ৭৫-৯৪ ভাগ হলে দুটি করে বীজ দিতে হবে। তবে ৭৫% এর নিচে হলে বীজগুলো ব্যবহার যোগ্য নয়।

ভুট্টার দানা

চীনাবাদাম: মাটি বা প্লাস্টিকের ছোট পাত্রের ২/৩ ভাগ মাটি বা বালি দিয়ে ভরতে হবে। তার উপর ১০০টি বা ৫০টি করে বীজ বসিয়ে এর উপর আধা ইঞ্চি মাটি দিয়ে

চীনাবাদামের দানা

বীজ ঢেকে দিতে হবে। এরূপ ৪টি পাত্রে বীজ দিতে হবে। পাত্রের বালু প্রয়োজনমতো ভেজা রাখতে হবে। বীজ গজানো পরীক্ষার পাত্রটি ঘরের মধ্যে মাচায় রাখতে হবে। বীজ গজানোর সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য ৮-৯ দিন অপেক্ষা করতে হবে। তারপর যে সংখ্যক বীজ গজালো তার মাধ্যমে চীনাবাদাম বীজ গজানোর হার নির্ণয় করা যায়। বীজ গজানোর পর যদি শতকরা ৮০-৯৫ ভাগ হয় সেক্ষেত্রে ২টি করে বীজ দিতে হবে এবং ৭০-৮০% হলে ৩টি করে বীজ প্রতি স্থানে দিতে হবে। শতকরা ৭০ ভাগের নিচে হলে বীজ হিসেবে ব্যবহার যোগ্য নয়।

বীজের সুপ্ততা ভাঙ্গার সহজ পদ্ধতি

করলা : মাঠে বপনের আগে করলা বীজ ১% KNO_3 (পটাশিয়াম নাইট্রেট) অথবা ১% বরিক এসিড অথবা পানিতে ১৬ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে বীজের সুপ্ততা হ্রাস পায় এবং অঙ্কুরোদগম হার বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে বীজের হার কম লাগে এবং কৃষকের উৎপাদন খরচ কম হয়।

চালকুমড়াঃ চালকুমড়া একটি জনপ্রিয় গ্রীষ্মকালীন সবজি। চালকুমড়ার অনেক জাতের বীজের কাঙ্খিত মানের অঙ্কুরোদগম না হওয়া একটি সমস্যা। বারি চালকুমড়া-১ বীজের অঙ্কুরোদগম হার সাধারণত শতকরা ৩০ ভাগের মতো হয়ে থাকে। পটাসিয়াম নাইট্রেট (০.৪%) দ্রবণে ২৪ ঘণ্টা ভিজেয়ে বাতাসে শুকিয়ে বীজ বপন করলে অঙ্কুরোদগম হার অনেক বেড়ে যায়। চালকুমড়ার বীজকে ডিপ ফ্রিজে (তাপমাত্রা ৪-৫° সে.) ৪ (চার) দিন রেখে বাতাসে শুকিয়ে তারপর বপন করলে অঙ্কুরোদগম হার বেড়ে যায়। বীজ সংরক্ষণের সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে বীজের অঙ্কুরোদগম হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। চালকুমড়ার বীজকে ৭ মাস সংরক্ষণের পর বপন করলে বীজের অঙ্কুরোদগম হার ৮১% পর্যন্ত হয়ে থাকে। এ সমস্ত বীজের সতেজতার মাত্রাও তুলনামূলকভাবে অধিক হয়ে থাকে।

চালকুমড়া

মুগবিন বীজের উপর ন্যাপথলিন এসেটিক এসিডের মাত্রার প্রভাব

বাংলাদেশে মুগ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ডাল জাতীয় ফসল। খেসারী এবং মসুরের পরেই এর স্থান। মুগের অধিক পরিমাণে ও মানসম্মত বীজ উৎপাদনে অনেক কারণ জড়িত থাকলেও উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রকের (Plant growth regulators) ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ন্যাপথলিন এসেটিক এসিড (৩০ পিপিএম) বীজ বপনের ৩০ দিন পর স্প্রে করলে বারি মুগ-৬ এর গাছে পডের সংখ্যা বেশি হয় এবং ফলন প্রতি হেক্টরে ১,৩৪৩ কেজি হয়ে থাকে যা ন্যাপথলিন এসটিক এসিড প্রয়োগ না করার চেয়ে শতকরা ১৭ ভাগ বেশি। শুধু তাই নয় ন্যাপথলিন এসেটিক এসিড (৩০ পিপিএম) প্রয়োগে বীজের গজানোর হার শতকরা ৮০ ভাগের অধিক হয়ে থাকে।

মানসম্মত করলার বীজ উৎপাদনে বপন সময়ের প্রভাব

করলা একটি দিবস নিরপেক্ষ উদ্ভিদ হলেও বাংলাদেশে এই গুরুত্বপূর্ণ সবজিটি গ্রীষ্মকালে চাষ করা হয়ে থাকে। শীতকালে এর বীজ গজানোর হার কমে যায় এবং বাড়-বাড়তিও কমে যায়, ফলে ফলের সংখ্যা হ্রাস পায় এবং বীজ উৎপাদন কমে যায়। অন্যদিকে দেরিতে বপন করলে গাছের বাড়-বাড়তি ভাল হলেও অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে পরাগায়ণ ব্যাহত হয়। ফলশ্রুতিতে ফলন কমে যায়। তাছাড়া বৃষ্টিপাতের দরুণ বীজ শুকাতে বিলম্ব হয় এবং এতে বীজের মান কমে যায়। পরীক্ষায় দেখা যায় যে, গাজীপুর অঞ্চলে ফেব্রুয়ারি মাসের ১ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে বীজ বপন করলে বারি করলা-১ এর গাছপ্রতি ফলন ১৬-১৮টি এবং বীজের ফলন হেক্টরপ্রতি ১৮০-১৯০ কেজি হয়ে থাকে। শুধু তাই নয়, এ সময়ে বীজ বপন করলে উৎপাদিত বীজের মানও অধিকতর ভাল হয়ে থাকে। বীজ গজানোর হার ৮৫% এর অধিক হয়ে থাকে।

লাক্ষা ফসল

লাক্ষা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পোকা ক্যারিয়া লাক্ষা কর্তৃক নিঃসৃত লালা বা আঠালো রস রজন জাতীয় পদার্থ। লাক্ষা পোকার ত্বকের নিচে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা এক প্রকার গ্রন্থি থেকে আঠালো রস নিঃসৃত হয় যা ক্রমশ শক্ত ও পুরু হয়ে পোষক গাছের ডালকে আচ্ছাদিত করে ফেলে। পোষক গাছের ডালের এই আবরণ লাক্ষা বা লাহা নামে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে ডালের সেই আবরণ ছাড়িয়ে ও শোধিত করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়।

লাক্ষা একটি অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অর্থকরী ফসল। সাধারণত লাক্ষা চাষের জন্য পৃথক কোন জমির প্রয়োজন পড়ে না। লাক্ষার পোষক গাছসমূহ জমির আইল বসতবাড়ির আশেপাশে, খালের পাড়, রাস্তা ও রেললাইনের পাশে পরিত্যক্ত স্থানসমূহে লাগানো যায়। বর্তমানে বাংলাদেশে বাৎসরিক চাহিদার মাত্র এক দশমাংশ লাক্ষা উৎপাদিত হয়। এ ছাড়াও লাক্ষার বহুবিধ ব্যবহারের কারণে পৃথিবীর অনেক দেশেই লাক্ষা রপ্তানির সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া লাক্ষা চাষের আওতায় এনে প্রচুর পরিমাণে লাক্ষা উৎপাদনের পাশাপাশি বিশাল কর্মহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সম্ভব।

লাক্ষা পোকা

লাক্ষা চাষ করতে হলে পোষক গাছের প্রয়োজন হয়। যে সকল গাছের রস শোষণ করে লাক্ষা পোকা জীবনধারণ করে ও বংশ বিস্তার করে তাদেরকে লাক্ষা পোকার পোষক গাছ বলে। লাক্ষা চাষের জন্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি পোষক গাছ হচ্ছে কুল, কড়ই, পলাশ, খয়ের, বাবলা, ডুমুর ইত্যাদি।

দুই ধরনের লাক্ষা পোকা বিভিন্ন ধরনের লাক্ষা ফসল উৎপাদনের সাথে জড়িত। কুল, পলাশ, বাবলা ইত্যাদি পোষক গাছসমূহে যে সমস্ত পোকা লাক্ষা উৎপাদন করে তাদের রং লাল বলে তাদের রঙ্গিনী পোকা বলে। অন্যদিকে আর এক ধরনের লাক্ষা কীট কেবলমাত্র কুসুম গাছে ভালভাবে বৃদ্ধিলাভ ও বংশ বিস্তার করতে পারে এবং যে লাক্ষা উৎপাদন করে তাদের রং হলুদ বা কুসুমী বলে এরা কুসুমী পোকা নামে পরিচিত। বাংলাদেশ কুসুমী পোকার অপর্যাপ্ততার কারণে সাধারণত রঙ্গিনী পোকা দ্বারা লাক্ষার চাষ করা হয়। যে মাসে লাক্ষা ফসল কাটা হয় সে মাসের নাম অনুসারেই ফসলের নাম করণ করা হয়ে থাকে। রঙ্গিনী পোকা থেকে বৎসরে দুই বার, বৈশাখ মাসে ও কার্তিক মাসে ছাড়ানো লাক্ষা পাওয়া যায়। বৈশাখী ফসল পেতে প্রায় ৮ মাস সময় লাগে, অন্যদিকে মাত্র ৪ মাসেই কার্তিকী ফসল পরিপক্কতা লাভ করে। বীজের জন্য কার্তিকী ফসল এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে বৈশাখী ফসল করা উত্তম।

লাক্ষা চাষ পদ্ধতি

১. সময়মতো পোষক গাছ ছাঁটাই করা লাভজনক লাক্ষা উৎপাদনের পূর্বশর্ত। সাধারণত কার্তিকী ফসলের জন্য মধ্য-ফেব্রুয়ারি এবং বৈশাখী ফসলের জন্য মধ্য-এপ্রিল পোষক গাছসমূহ ছাঁটাই করার উপযুক্ত সময়।

২. গাছ ছাঁটাই করার পর কচি ডালের বয়স কার্তিকী ফসলের ক্ষেত্রে ১০৫ থেকে ১২০ দিন এবং বৈশাখী ফসলের ক্ষেত্রে ১৬০ থেকে ১৮০ দিন হলে তা লাক্ষা লাগাবার উপযুক্ত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়। এ অবস্থায় বীজ লাক্ষা (লাক্ষা পোকাসমেত খণ্ড খণ্ড পোষক ডাল) পোষক গাছের ডালে এমনভাবে আটকিয়ে দিতে হবে যাতে কাঠির দু'প্রান্তই কচি ডালের সাথে ভালভাবে লেগে থাকে। রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া হলে ৩-৭ দিনের মধ্যে লাক্ষা পোকা কচি ডালে বসে যাবে। লাক্ষা বীজ লাগানোর ৪ সপ্তাহ পরে যদি সংক্রমিত ডালগুলি সাদা তুলার মত আবরণে আবৃত হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে যে লাক্ষা ফসল ভাল অবস্থায় রয়েছে।

   লাক্ষা সম্পূর্ণ পরিপক্ক হওয়ার পরই ফসল কাটা উচিত। কার্তিকী ফসল কার্তিক মাসে এবং বৈশাখী ফসল বৈশাখ মাসে কাটার উপযুক্ত সময়। তবে বীজ লাক্ষা পেতে হলে লাক্ষা পোকা ঝাঁক বেঁধে বের না হওয়া পর্যন্ত ফসল কাটা যাবে না। সাধারণত কার্তিকী ফসলে কার্তিক মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং বৈশাখী ফসলে আষাঢ় মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে শিশু লাক্ষা পোকা ঝাঁক বেঁধে বের হতে দেখা যায়।

বরই গাছের ডালে লাক্ষা পোকা

বরই গাছে লাক্ষা

ছাড়ানো লাক্ষা

দানা লাক্ষা

চাঁচ

টিকিয়া

৩. লাক্ষা ফসল কাটার পর দা বা হাঁসুয়ার সাহায্যে কাঠি হতে লাক্ষা ছড়িয়ে ফেলতে হবে। বীজ লাক্ষা যত শীঘ্র সম্ভব নতুন গাছের কচি ডালে লাগতে হবে। নতুন গাছে লাক্ষা পোকা বসে গেলে লাক্ষাসমেত বীজ লাক্ষার কাঠিগুলোকে গাছ থেকে নামিয়ে পোষক ডাল হতে পরিপক্ক লাক্ষা দা বা হাঁসুয়ার সাহায্যে ছাড়ানো হয় যা 'ছাড়ানো লাক্ষা' নামে পরিচিত। ছাড়ানো লাক্ষা বেশি দিন ঘরে না রেখে দ্রুত প্রক্রিয়াজাতকরণ করা ভাল।

লাক্ষার ব্যবহার

১. কাঠের আসবাবপত্র বার্নিশ করা, বিভিন্ন ধরনের বার্নিশ, পেইন্ট ইত্যাদি ও পিতল বার্নিশ করার কাজে।
২. অস্ত্র ও রেলওয়ে কারখানায়।
৩. বৈদ্যুতিক শিল্প কারখানায় অপরিবাহী বার্নিশ পদার্থ হিসেবে।
৪. বিভিন্ন অটোমোবাইল ইঞ্জিন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে আঠালো বন্ধনকারী পদার্থ হিসেবে।
৫. চামড়া রং করার কাজে।
৬. স্বর্ণালংকারের ফাঁপা অংশ পূরণে।
৭. লবণাক্ত পানি হতে জাহাজের তলদেশ রক্ষা করার কাজে বার্নিশ হিসেবে।
৮. লাক্ষার উপাদান, আইসো এমব্রিটোলিডি, পারফিউম শিল্পে ব্যবহৃত হয়।
৯. লাক্ষা হতে নিগর্ত আরেকটি উপাদান, এ্যালুউরিটিক এসিড, পারফিউম শিল্পে, পোকার যৌন আকৃষ্টকরণ পদার্থ (Sex pheromone) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
১০. ডাকঘরের চিঠি, পার্সেল ইত্যাদি সীলমোহর করার কাজে।
১১. পুতুল, খেলনা, আলতা, নখরঞ্জন, শুকনা মাউন্টিং টিস্যু পেপার ইত্যাদি তৈরির কাজে।
১২. ঔষধ শিল্পে ক্যাপসুলের কোটিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
১৩. আপেল, কমলা ইত্যাদি ফলের সংরক্ষণ গুণ বাড়ানোর জন্য কোটিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
১৪. চকলেট, চুইংগাম ইত্যাদির কোটিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
১৫. ইউরিয়া সারের কোটিং হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

লাক্ষা চাষে আয়-ব্যয়

পোষক গাছের নাম	লাক্ষা উৎপাদনে গাছপ্রতি খরচ (টাকা)	গাছপ্রতি ছাড়ানো লাক্ষা উৎপাদন (কেজি)	গাছপ্রতি আয় (টাকা)	নিট মুনাফা (টাকা)
কুল	৪০০	১০	২,৫০০	২,১০০
শিরিষ	১,৫০০	৪০	১০,০০০	৮,৫০০
পলাশ	৪০০	৭	১,৭৫০	১,৩৫০
বাবলা	৪০০	৫	১,২৫০	৮৫০

পাহাড়ী কৃষি

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত বিস্তীর্ণ এলাকাকে পার্বত্য অঞ্চল বলা হয়। খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি এবং বান্দরবান এই ৩টি জেলা নিয়ে পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের মোট আয়তন ১৩,১৯১ বর্গ কিলোমিটার যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় এক দশমাংশ। অসমতল বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি ও অন্যান্য কারণে এ অঞ্চল মাঠ ফসল উৎপাদনের জন্য তেমন উপযোগী নয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন রকম উদ্যান ফসল উৎপাদনের সম্ভবনা এখানে ব্যাপক। বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলে 'জুম' চাষের যে ব্যাপক প্রচলন বিদ্যমান যা ভূমির ক্ষয়, গাছপালা নিধন সর্বোপরি পরিবেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এ ছাড়া এ পদ্ধতিতে কাঙ্খিত ফলনও পাওয়া সম্ভব নয়। তাই অধিক ফলন ভূমির ক্ষয় রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য আধুনিক এবং স্থায়ী খামার ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ৩টি গবেষণা উপকেন্দ্রের মাধ্যমে এ অঞ্চলে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গবেষণার মাধ্যমে এ অঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী বিভিন্ন ফসলের উন্নত জাত ও উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। গবেষণা উপকেন্দ্রসমূহের মাধ্যমে এসব প্রযুক্তি কৃষক পর্যায় সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

পাহাড়ী কৃষি

ম্যাথ মডেল

'ম্যাথ' হলো পাহাড়ী অঞ্চলের উপযোগী চাষাবাদের একটি মডেল যার পুরো নাম Modern Agricultural Technology in the Hillis (MATH)। এই মডেল অনুসরণ করে ভূমির ক্ষয়রোধ ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে একই জমিতে উন্নত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে পাহাড়ী অঞ্চলের কৃষকদের ব্যাপক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব। এ ছাড়া, এই মডেলের মাধ্যমে 'জুম' চাষকে সরাসরি নিরুৎসাহিত না করে পর্যায়ক্রমে 'জুম' চাষ বিলুপ্ত করা সম্ভব।

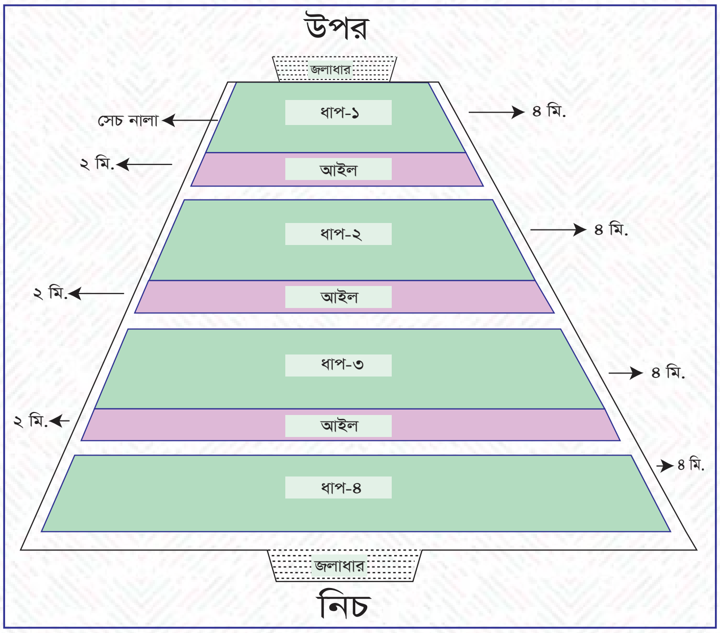

ম্যাথ মডেল

'ম্যাথ' বাস্তবায়ন পদ্ধতি

ধাপ-১ : জমি নির্বাচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 'জুমি' ফসলগুলো আবাদের ব্যবস্থা করা।

ধাপ-২ : প্রথম বৃষ্টির পর পরই 'ম্যাথ' মডেলের অনুসরণে দ্রুত বর্ধনশীল ফসল যেমন, পেঁপে, কলা, স্বল্প মেয়াদী পেঁয়ারা, লেবু, দীর্ঘ মেয়াদী কাঁঠাল, লিচু, আম, সফেদা, জাম্বুরা, কমলা, জাম, ইত্যাদি এবং বনজ গাছ 'জুম' ক্ষেতে একই সময়ে রোপণ করা।

ধাপ-৩ : ধান, মারফা, কাউন, ভুট্টা ও তিল সংগ্রহের পর পাহাড়ের ঢালভেদে 'জুম' ক্ষেতের মধ্যে আড়াআড়িভাবে সারিতে (Strip cultivation) আনারস, অড়হর, ইত্যাদি ফসল রোপণ/বপন করা।

ধাপ-৪ : সময়ভেদে 'জুমি' ফসল সংগ্রহের পর মৌসুম ভিত্তিক (কচু, ঢেঁড়স, বরবটি, টমেটো, বেগুন ও মরিচ ইত্যাদি) ফসলের আবাদ করা।

ধাপ-৫ : সবজি চাষের পাশাপাশি জমি পরিষ্কার করে 'আচ্ছাদন ক্রপ' (Cover crop) আবাদ করা।

ধাপ-৬ : 'ম্যাথ'-এর আওতায় উৎপাদিত কৃষি পণ্য কৃষক সমিতি গঠন করে Central Procurement and Distribution Point (CPDP) -এর মাধ্যমে বাজারজাত করা।

ধাপ-৭ : মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক তিন ভাগে বিভক্ত পাহাড়ের ১ম ও ২য় শ্রেণীর পাহাড়ের বেলায় 'ম্যাথ' মডেলটি প্রযোজ্য। অন্যথায়, যেখানে 'জুম' আছে সেখানেই উক্ত মডেল কার্যকর হবে।

'ম্যাথ' মডেলের উপকারিতা

- ভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।
- একই জমিতে বহু ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে পাহাড়ী কৃষকদের স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।
- শস্য পর্যায় (Crop rotation) অবলম্বনের মাধ্যমে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করা ও মাটির ক্ষয় রোধ করা।
- স্থায়ীভাবে বনায়ন সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় রোধ করা। Central Procurement and Distribution Point (CPDP)-এর মাধ্যমে উৎপাদতি পণ্যের সমবায় ভিত্তিক বাজারজাতকরণ।
- পর্যায়ক্রমে 'ম্যাথ' মডেলের বাস্তবায়ন হলে পাহাড়ী অঞ্চলে 'জুম' চাষ বিলুপ্ত হবে।
- সর্বোপরি পাহাড়ী এলাকায় ফসলের ফলন বৃদ্ধি পাবে, মাটির ক্ষয়রোধ হবে, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভভ হবে ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা পাবে।

পাহাড়ে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ

বসত বাড়িতে সবজি চাষ 'খাগড়াছড়ি মডেল'

পাহাড়ী এলাকায় বসত বাড়িতে সারা বছরব্যাপী সবজি চাষের জন্য পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি কর্তৃক 'খাগড়াছড়ি সবজি চাষ মডেল' এর উদ্ভাবন করা হয়। এই মডেলে ৩টি বেড পাশাপাশি তৈরি করে সারা বছর সবজি চাষ করা হয়। প্রতি বেডের প্রস্থ ৩ হাত (১.৩ মিটার) এবং দৈর্ঘ্য ১০ হাত (৫ মিটার)। তবে বেডের দৈর্ঘ্য কৃষকের জমির পরিমাণের উপর নির্ভর করে কম বেশি হতে পারে। দুই বেডের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে ১ হাত (প্রায় ৫০ সেমি)।

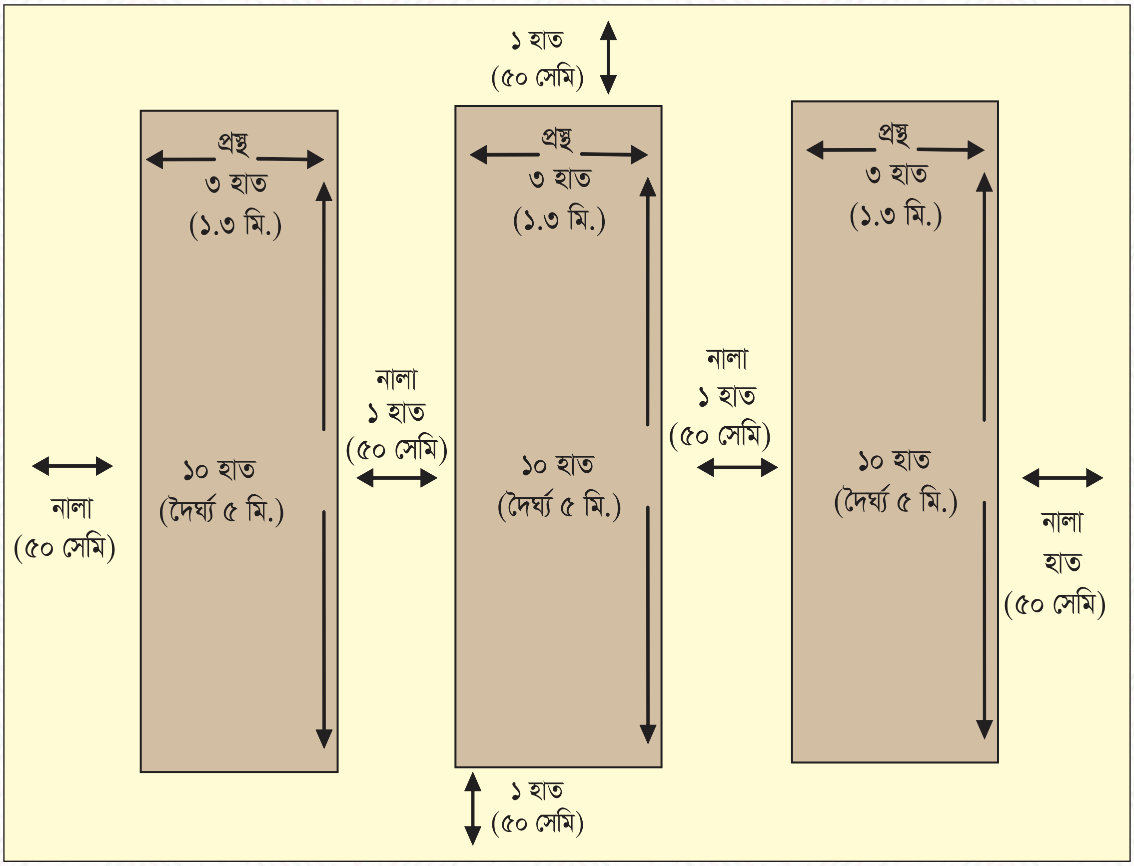

বসত বাড়িতে সবজি চাষ (খাগড়াছড়ি মডেল)

সবজি বিন্যাস: সবজি বাগানের তিন খণ্ড জমিতে বা বেডে যে ৩টি সবজি বিন্যাস অনুসরণ করা হয়, এখানে সেগুলোর একটি তালিকা দেওয়া হলো।

বেড	(অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি) রবি	(মার্চ-মে) খরিফ-১	(জুন-সেপ্টেম্বর) খরিফ-২
বেড ১	রাইশাক - লালশাক	লাল শাক	বারি পানি কচু-২
বেড ২	লালশাক - ডাঁটা শাক	কুমড়া শাক	পুঁই শাক
বেড ৩	মুলাশাক - কুমড়া শাক	পুঁই শাক	গিমা কলমী

পাহাড়ী এলাকায় টেকসই কৃষির জন্য বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রযুক্তি

পাহাড়ী এলাকার কৃষকেরা মূলত বৃষ্টিনির্ভর কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এখানে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের এলাকা শতকরা এক ভাগেরও কম। ফলে শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় পানির সরবরাহ থাকে একেবারে অপ্রতুল। এখানকার বেশিরভাগ পাহাড় ও সমতল ভূমি সেচের পানির অভাবে অনাবাদি পড়ে থাকে। ফলে অত্র অঞ্চলের কৃষকদের বৃষ্টিনির্ভর জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে। পাহাড়ী ঝর্ণা, ছড়া, চেঙ্গি, মাইনী, ফেনী নদী এখানকার পানির প্রধান উৎস। গবেষণার এক তথ্যে জানা যায়, গত একাদশকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পাহাড়ী এলাকায় গড়ে ১৫০০-২০০০ মিমি বৃষ্টি কমে গেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সঠিক সময়ে তথা খরায় পাহাড়ী কৃষকের জীবন ও জীবিকা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এজন্য এখনই বৃষ্টির পানি সংরক্ষণপূর্বক বিভিন্ন লাগসই, খাপখাওয়ানোর উপায় সমৃদ্ধ প্রযুক্তি উদ্ভাবন প্রয়োজন। উক্ত প্রয়োজনের কথা অনুধাবন করে পাহাড়ী অঞ্চলের জন্য উপযোগী পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ি থেকে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে কৃষি, বাসা-বাড়ি এবং নদীর নাব্যতার জন্য প্রয়োজনীয় পানির চাহিদার যোগান হয়।

বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ পদ্ধতি

১. জলাধারের মাধ্যমে।

২. বাসা-বাড়ির ছাদের উপরের অংশের মাধ্যমে।

পাহাড়ী এলাকার নিম্নাংশে দুই পাহাড়ে বাঁধ দিয়ে ছোট ছোট পানি সংরক্ষণাগার তৈরি করা হয়। পরে ধরে রাখা বৃষ্টির পানি শুষ্ক মৌসুমে পাহাড়ী সমতল ভূমিতে বিনা খরচে কৃষি জমিতে সেচের মাধ্যমে যে কোন ধরনের শস্য, ফল কিংবা অন্যান্য ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। এই সংরক্ষিত পানি লো-লিফট সেচ পাম্পের মাধ্যমে পাহাড়ের চূড়ায় উত্তোলন করে সেচের মাধ্যমে পাহাড়ের সকল অংশ চাষাবাদের আওতায় আনা যায়। আবার দেখা যায় যে, শুষ্ক মৌসুমে ভূনিম্নস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায়। ফলে পাম্প দিয়ে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করা সম্ভব হয় না। তাই বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করলে জলাধারের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ পানির অভাব পূরণ হয় এবং পানির স্তর উপরে উঠে আসে। ফলে পাম্পের মাধ্যমে পানি উত্তোলন করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায়।

পাহাড়ী অঞ্চলে উন্নত ঝাড়শিমের চাষ

ঝাড়শিম একটি সুস্বাদু পুষ্টিকর সবজি। বারি ঝাড়শিম একটি উচ্চ ফলনশীল জাত। জাতটি ইতোমধ্যে পাহাড়ী এলাকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

জমি ও মাটি: পার্বত্য এলাকার উর্বর বেলে দোআঁশ থেকে দোআঁশ মাটিযুক্ত পাহাড়ের ভ্যালী বা উপত্যকা, পাদদেশ ও সামান্য ঢালের জমি ঝাড়শিম চাষের উপযোগী। হালকা ছায়াযুক্ত স্থানেও ঝাড়শিম চাষ করা যায়। ভুট্টার সাথে আন্তঃফসল হিসেবেও পার্বত্য এলাকায় এর ফলন বেশ ভাল হয়। পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন ছড়া বা নালার তীরে ঝাড়শিম চাষ করা সম্ভব।

উন্নত ঝাড়শিমের ফসল

বপন পদ্ধতি: বপনের আগে বীজ ২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে নিলে অঙ্কুরোদগম ত্বরান্বিত হয়। জমিতে সরাসরি ২৫ সেমি দূরত্বের সারিতে ১০ সেমি দূরে দূরে ২টি করে ঝাড়শিমের বীজ বপন করলে ফলন বেশি পাওয়া যায়। বীজ বপনের ১০ দিন পর প্রতি পিটে একটি সবল চারা রেখে বাকি চারা তুলে ফেলতে হবে।

বারি ঝাড়শিম-১ এবং পিভিরাই-০০১ লাইনের জন্য হেক্টরপ্রতি ৫০-৬০ কেজি এবং পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় জাতের জন্য ৮০-৯০ কেজি বীজের প্রয়োজন হয়।

বেড পদ্ধতিতে ঝাড়শিমের চাষ

বীজ বপনের সময়: পার্বত্য অঞ্চলে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে মধ্য-নভেম্বর পর্যন্ত সময়ে ঝাড়শিমের বীজ বপন করলে ফলন ভাল হয়। তবে সেচের সুযোগ থাকলে ডিসেম্বরের শেষ সময় পর্যন্ত এর বীজ বপন করা যায়।

সারের মাত্রা:

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
ইউরিয়া	৯০-১০০ কেজি
টিএসপি	১৮০-২২০ কেজি
এমওপি	১৪০-১৬০ কেজি
কম্পোস্ট	৪-৫ টন

সার প্রয়োগ: জমি তৈরির সময় সম্পূর্ণ কম্পোস্ট, টিএসপি, এমওপি ও অর্ধেক ইউরিয়া দিতে হবে। বাকি ইউরিয়া বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: ঝাড়শিম দাঁড়ানো পানি সহ্য করতে পারে না। আবার বেশি শুকনা অবস্থায় ফলন কমে যায়। এ জন্য পানি সেচ ও নিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফল সংগ্রহ: বারি ঝাড়শিম-১ এবং পিভিএরাই-০০১ লাইন থেকে বীজ বপনের ৪৫-৫০ দিন পর বা ফুল ফোটার ১০-১৫ দিন পর শুঁটি সংগ্রহ করা যায়। এতে হেক্টরপ্রতি ১৪-১৫ টন শুঁটি পাওয়া যায়।

ঝাড়শিমের সংগ্রহপযোগী পড

বীজ বপনের সময়: পার্বত্য অঞ্চলের স্থানীয় বড় বীজসম্পন্ন জাতগুলো বপনের ৬০-৭০ দিনের মধ্যে খাবার উপযোগী খাইস্যা বা আধাপাকা বীজ এবং ৭০-৮০ দিন পর পাকা বীজ সংগ্রহ করা যায়। এ জাত থেকে হেক্টরপ্রতি ২.৫-৩.০ টন খাইস্যা বীজ অথবা ১.৪-১.৫ টন শুকনা বীজ পাওয়া যায়।

পাহাড়ী অঞ্চলে বিলাতি ধনিয়ার উৎপাদন প্রযুক্তি

মাটি: বিলাতি ধনিয়া চাষের জন্য দোআঁশ থেকে পলি-দোআঁশ মাটি বেশি উপযুক্ত। বীজ গজানোর জন্য মাটি নরম হওয়া আবশ্যক।

জমি তৈরি: জমির মাটি ৫-৬ বার চাষ ও মই দিয়ে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। বীজতলার মতো করে জমি তৈরি করতে হবে। প্রতি বীজতলার জমির চারদিকে নালার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে সেচ দেওয়া ও পানি নিকাশের সুবিধা হয়। এই ধনিয়া ছায়াতেও চাষ করা যায়। জমির উপরে সেক্ষেত্রে মাচাও দেওয়া যায়।

বীজ বপন: রবি মৌসুমে কার্তিক মাসে বা মধ্য-অক্টোবর থেকে মধ্য-নভেম্বরে চাষ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। তবে বীজ ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত বপন করা যেতে পারে। হেক্টরপ্রতি ৭৫-৭৮ কেজি প্রয়োজন।

বপন পদ্ধতি: বীজতলায় বীজ ছিটিয়ে বপন করা হয়। বপন করার আগে বীজ পানিতে ২০-২৪ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখতে হয়। ভিজানো বীজ সংগ্রহ করে পরিষ্কার কাপড় দিয়ে জড়িয়ে ঝুলিয়ে রাখতে হয়। তারপর বীজ মৃদু সূর্যের আলোতে এক ঘণ্টা শুকাতে হয়।

বিলাতি ধনিয়া

মিহি বালুতে মিশিয়ে বীজ বপন করতে হয়। বীজ বপন করার পর সেচ দিয়ে শুকনা ধানের খড় দিয়ে জাবড়া প্রয়োগ করতে হবে। জমিতে রসের অভাব হলে ঝাঝরি দিয়ে সেচ দিতে হবে। বীজের অঙ্কুরোদগমের পর জাবড়া সরিয়ে ফেলতে হবে। বীজ গজাতে ২০-২৫ দিন সময় লাগে। ছায়া প্রদানের জন্য জমির উপর ঘাস/ধানের খড়/নারিকেলের পাতা দিয়ে মাচা দিতে হবে। মাচার উপরে কুমড়া জাতীয় সবজি চাষ করে বাড়তি আয়ও করা সম্ভব।

সারের মাত্রা: বিলাতি ধনিয়ায় নিম্নলিখিত হারে সার প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়।

সারের নাম	সারের পরিমাণ/হেক্টর
পচা গোবর	১৫-২০ টন
ইউরিয়া	২৭৫-৩০০ কেজি
টিএসপি	১৩৫-১৫০ কেজি
এমওপি	১৭০-২০০ কেজি

সার প্রয়োগ: সম্পূর্ণ গোবর এবং টিএসপি বীজ বপনের পূর্বে শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া এবং এমওপি ৩-৫ বার পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। বিলাতি ধনিয়ার চারা ২-৩ সেমি উঁচু হলে প্রথমবার ইউরিয়া এবং এমওপি পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। প্রতিবার ফসল সংগ্রহের পর ইউরিয়া এবং এমওপি পার্শ্ব প্রয়োগ করতে হবে। পার্শ্ব প্রয়োগের সময় মাটিতে উপযুক্ত রস থাকা প্রয়োজন।

পানি সেচ ও নিকাশ: মাটিতে রসের অভাব হলে সেচ দিতে হবে। পানি অতিরিক্ত হলে তা নিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা: আগাছার উপদ্রব হলে নিড়ানী দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে। ৩-৪ বার আগাছা পরিষ্কার করলেই চলে। এতে গাছে উৎপাদন বাড়বে। গাছে মঞ্জুরী বের হলে তা ভেঙ্গে দিতে হবে।

বিলাতী ধনিয়ার গোড়া পচা একটি মারাত্মক রোগ। রোগের প্রাদুর্ভাব হলে ছত্রাকনাশক রিডোমিল ০.২% হারে অথবা বোর্দো মিশ্রণ ১% হারে ১৫ দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে।

বিলাতি ধনিয়ার

ফসল সংগ্রহ: শিকড়সহ গাছ উঠিয়ে ফসল সংগ্রহ করা হয়। প্রতি খণ্ড জমি থেকে ৭-৮ বার ফসল সংগ্রহ করা সম্ভব। গাছ ১০-১৫ সেমি উঁচু হলে ফসল সংগ্রহ করা হয়। পাতা নরম থাকতে তা খাওয়ার জন্য সংগ্রহ করতে হবে।

অ-মৌসুমে লেবুর উৎপাদন প্রযুক্তি

কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, রাইখালী, রাঙ্গামাটিতে গবেষণা চালিয়ে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়। এ প্রযুক্তি অনুসরণ করে অ-মৌসুমে লেবু উৎপাদন করে বেশি লাভবান হওয়া যায়।

প্রধান মৌসুমে অর্থাৎ এপ্রিল-সেপ্টেম্বর মৌসুমে লেবু গাছে অত্যধিক ফুল-ফল হয়। এই সময় গাছ থেকে কিছু ফুল ছাঁটাই বা পাতলা করে দিলে ফলের জন্য গাছের কম শক্তি ব্যয় হয়। ফলে গাছে সঞ্চিত শক্তির পরিমাণ বেশি থাকে। এই সঞ্চিত শক্তি কাজে লাগিয়ে গাছ অমৌসুমে বা অক্টোবর-মার্চ মাসে বেশি পরিমাণে ফুল-ফল উৎপাদন করে। এই সময় বাজারে মূল্য বেশি থাকায় লেবু বিক্রি করে বেশি লাভ পাওয়া যায়। এপ্রিল-মে মাসে পুষ্প মঞ্জুরিতে ফুলের সংখ্যার ভিত্তিতে শতকরা ৫০টি ফুল ছাঁটাই করতে হবে।

ফসল সংগ্রহ: ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত লেবু সংগ্রহ করা যায়।

উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ

ফসল উন্নয়ন কার্যক্রমে উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কেন্দ্রের প্রধান উদ্দেশ্যে হ'ল (১) দেশীয় বিভিন্ন ফসলের জাত এবং তাদের বন্য প্রজাতিগুলোর অনুসন্ধান, সনাক্তকরণ ও সংগ্রহ করা (২) জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা (৩) জার্মপ্লাজম সমূহের বীজ বর্ধন, বৈশিষ্ট্যকরণ ও মূল্যায়ন (৪) জার্মপ্লাজম সরবরাহ ও বিতরণ এবং অন্যান্য দেশের সাথে জার্মপ্লাজম বিনিময় কার্যক্রম (৫) জার্মপ্লাজম সংগ্রহ, মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য সমূহ লিপিবদ্ধকরণ। বর্তমানে উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্রের জিন ব্যাংকে মধ্য-মেয়াদী সংরক্ষণে (৪^0-৬^0 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়) ও দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণে (-১৮^0 হতে -২২^0 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়) এবং ফিল্ড জিন ব্যাংকে (মাঠ পর্যায়ে) মোট ১৫৯ টি ফসলের ১১৭১৯ টি জার্মপ্লাজম সংরক্ষণ করা হয়েছে। রিক্যালসিট্রেন্ট (Recalcitrant) বীজ উৎপাদনকারী ফসল, অঙ্গজ বৃদ্ধি সম্পন্ন ফসল এবং কন্দাল ফসলগুলোর জার্মপ্লাজম উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্রের ফিল্ড জিন ব্যাংকে ও ক্লোনাল জিন ব্যাংক হিসেবে কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, জৈন্তাপুর, সিলেটে সংরক্ষণ করা আছে। সংগৃহীত ফসল সমূহের মধ্যে ৬০০০ এর অধিক জার্মপ্লাজমের বৈশিষ্ট্যকরণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও উদ্ভিদ কৌলিসম্পদ কেন্দ্র এ পর্যন্ত সয়াবিনের ৯ টি, সরিষার ৪৬ টি, মটরের (Cow-pea) ১৯ টি জার্মপ্লাজমের লবণাক্ত সহিষ্ণুতা ল্যাবরেটরীতে এবং বাঙ্গীর ৭৮ টি জার্মপ্লাজম ও টমেটোর ৫ টি জাতের লবণাক্ত সহিষ্ণুতা কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, বেনের পোতা, সাতক্ষীরায় সম্পন্ন হয়েছে। সংগৃহীত প্রতিশ্রুতিশীল জার্মপ্লাজম সমূহ নিয়ে উদ্ভিদ প্রজননবিদগণ জাত উন্নয়নের কাজ করে যাচ্ছেন এবং বেশ কিছু জাত ইতোমধ্যেই অবমুক্ত করা হয়েছে। ভৌগলিক নির্দেশক ফসল (Geographical indication crop) এবং অবমুক্ত জাতের উপর আইনগত অধিকার বা মেধা ভিত্তিক সত্ত্বাধিকার (IPR) নিশ্চিতকরণ ও জার্মপ্লাজম সমূহের ডুপ্লিকেশন কমানোর লক্ষ্যে মলিকুলার বৈশিষ্ট্যকরণের কাজও চলছে। এ পর্যন্ত মুগডালের ৪২ টি, বেগুনের ৮৫ টি, খেসারীর ২৫টি, গমের ২০ টি, ভূট্টার ২৪ টি, ছোলার ৯ টি, মুসুরের ৭ টি, মাশকালাইয়ের ৩ টি, মরিচের ৯৬ টি, সরিষার ২৫ টি, বাঙ্গির ৯৬টি ও আমের ১৯টি জার্মপ্লাজমের মলিকুলার বৈশিষ্ট্যকরণ এর কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে আলুর ৯ টি, গাছ-আলুর ৩ টি এবং পুদিনার ৩ টি জার্মপ্লাজম ইন-ভিট্রো পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে সংগ্রহকৃত জার্মপ্লাজম থেকে ৬,০০০ এর অধিক জার্মপ্লাজমের পার্সপোর্ট ডাটা লিপিবদ্ধকরণ (Documentation) সম্পন্ন হয়েছে। নিচের সারণীতে সংগৃহীত বিভিন্ন ফসলের জার্মপ্লাজমের সংখ্যা ও বৈশিষ্ট্যকরণ সংখ্যা দেখানো হলো।

জিন ব্যাংকে মধ্য মেয়াদী সংরক্ষণ (৪^0 হতে ৬^0 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়)

জিন ব্যাংকে দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ (- ১৮^0 হতে - ২২^0 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায়)

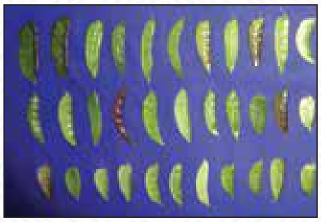

শিমের বৈশিষ্ট্যকরণ (Characterization)

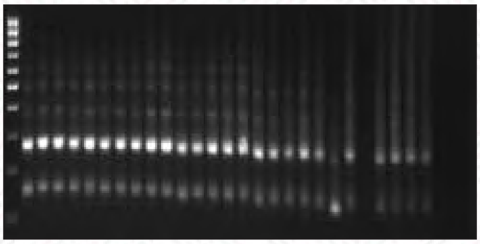

মরিচের মলিকুলার বৈশিষ্ট্যকরণ

বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি কুমড়ার সংগ্রহ

মাঠ পর্যায়ে মুলার বৈশিষ্ট্যকরণ ও বীজ বর্ধন পরীক্ষা

সরেজমিন ও সিস্টেম গবেষণা

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন ও সিস্টেম গবেষণার উদ্দেশ্য মূলত (১) গবেষণা কেন্দ্রে উদ্ভাবিত কৃষি প্রযুক্তিসমূহের ব্যবহারোপযোগিতা সরাসরি কৃষকের মাঠে পরীক্ষা করে দেখা এবং তা কৃষকের উপযোগী করে তোলা, (২) খামার পদ্ধতি গবেষণার মাধ্যমে কৃষকের সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা, (৩) এলাকা ভিত্তিক কৃষি সমস্যা সনাক্তকরণ ও তা সমাধানের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা করা এবং (৪) প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত সমস্যাদি বিষয়ে কৃষক, সম্প্রসারণ কর্মী ও বিজ্ঞানীদের মাঝে যোগসূত্র রক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া। বর্তমানে ৯টি ফার্মিং সিস্টেমস রিসার্চ সাইট এবং ৭২টি মাল্টি লোকেশন টেস্টিং সাইটের মাধ্যমে দেশের প্রায় সর্বত্র মাঠ গবেষণা কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ফসল বিন্যাস প্রযুক্তি

রসুন/ভুট্টা-রোপা আমন ধান-কুড়িগ্রামের চরাঞ্চলের জন্য একটি লাভজনক ফসল বিন্যাস

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- বোরো ধানে সেচের খরচ বেশি হওয়ায় প্রচলিত পতিত-বোরো-রোপা আমন ধান ফসল বিন্যাসের পরিবর্তে অর্থকরী ফসল রসুনের সাথে ভুট্টার আন্তঃফসল চাষ ঐ অঞ্চলের জন্য একটি লাভজনক প্রযুক্তি।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কুড়িগ্রাম জেলায় কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।
- উন্নত এ ফসল ধারায় ধানের সমতুল্য ফলন শতকরা প্রায় ২১৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ		
ফসল	রসুন	ভুট্টা	রোপা আমন ধান
জাত	বারি রসুন-১	এন কে-৪০	ব্রি ধান৪৯
বপন/রোপণের সময়	ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহ	জানুয়ারির ৩য় সপ্তাহ	জুলাই এর ৩য় সপ্তাহ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	২৫০	২০	৩০
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	২০ × ১০	৬০ × ২৫	২০ × ১৫
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	২১০	৪৩৫	২৫০
টিএসপি	২৬০	২২৫	০
এমওপি	৩৩০	১৮০	৮০
জিপসাম	১২৫	১৮৮	৯৫
জিংক সালফেট	০	১১	০
বরিক এসিড	৫	৬	১২
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	ইউরিয়া সারের অর্ধেক ও অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া বপনের ৩৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া সারের অর্ধেক এবং অন্যান্য সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া বপনের ৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া ব্যতীত অন্যান্য সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে চারা রোপণের ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
আন্তঃপরিচর্যা	রোপণের ৩৫ দিন পর থ্রিপস দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি @ ২ মিলিলিটার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।	কাটুই পোকা দমনের জন্য ফুরাডান ১০ কেজি/হেক্টর জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে।	স্টেমবোরার দমনের জন্য ফুরাডান ১৫ কেজি/হেক্টর দ্বিতীয় বার আগাছা দমনের সময় প্রয়োগ করা যেতে পারে।
জীবনকাল (দিন)	১৩০	১৩০	৯০
ফসল সংগ্রহের সময়	মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ	জুনের প্রথম সপ্তাহ	অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহ
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি			
ফলন (টন/হেক্টর)	৮.৬	৬.০	৪.০
ধানের সমতুল্য ফলন (কেজি/হেক্টর)	২০.৩	৪.৯	৪.০

রংপুর সমতল বরেন্দ্র অঞ্চলের জন্য আলু/মুখীকচু-রোপা আমন ফসল বিন্যাস

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- বৃহত্তর রংপুর অঞ্চল এবং কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩ এর অনুরূপ অন্যান্য অঞ্চলের জন্য আলু-বোরো ধান-রোপা আমনের পরিবর্তে আলুর সাথে মুখীকচুর সাথী ফসল হিসেবে রোপা আমন ফসল ধারা সুপারিশ করা হয়।
- উন্নত এ ফসল ধারায় কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়।
- প্রচলিত ফসল বিন্যাসের চেয়ে উদ্ভাবিত ফসল বিন্যাসে ধানের সমতুল্য ফলন গড়ে শতকরা ৪৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা

রংপুর, বগুড়া, জয়পুরহাট ও রাজশাহী জেলার অংশবিশেষ (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩, ২৫ ও ২৭)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ		
ফসল	আলু	মুখীকচু	রোপা আমন ধান
জাত	বারি আলু-২৫	মেহেরপুরী	ব্রি ধান৪৯
বপন/রোপণের সময়	নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ	জানুয়ারির ২য় সপ্তাহ	জুলাই শেষ সপ্তাহ
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৬০ × ২৫	৬০ × ২০	২০ × ১৫
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	১৫০০	৪৫০-৬০০ (১৫-২০ গ্রাম ওজনের মুখী)	৩০
সারেরর মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	২৬০	২৫০	২৫০
টিএসপি	২৫০	২১০	-
এম ও পি	২২০	২১০	৮০
জিপসাম	১৩৮	১১০	৯৫
জিংক সালফেট	১০	-	-
বরিক এসিড	৬	-	১২
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সকল সার সারিতে মাটি তুলে দেয়ার পূর্বে প্রয়োগ এবং বাকি ইউরিয়া লাগানোর ৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া ও পটাশ সার ছাড়া বাকি সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হবে। অর্ধেক ইউরিয়া ও সম্পূর্ণ পটাশ সার লাগানোর ৬০ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া রোপণের ৭৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	সম্পূর্ণ টিএসপি, দুই তৃতীয়াংশ পটাশ এবং সম্পূর্ণ জিপসাম ও বরিক এসিড জমি শেষ চাষের সময় এবং বাকি এমওপি সার কুশি বের হওয়ার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথাক্রমে চারা রোপণের ১০ ও ৩০ দিন এবং থোর আসার ৫-৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে।
ফসলের জীবনকাল (দিন)	৮৬	১৭৪	১১১
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি			
ফসল (টন/হেক্টর)	১৯.৮৪	১৪.২০	৪.০৬

উন্নত ফসল বিন্যাস: রোপা আমন-আলু-বোরো ধান (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৯ এর সেচের আওতাধীন মাঝারী উঁচু জমি)

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- রোপা আমন ও বোরো ধানের মধ্যবর্তী সময়ে আলু চাষ একটি লাভজনক প্রযুক্তি।
- এতে ধানের সমতুল্য ফলন ১৭১% পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- এটি প্রচলিত রোপা আমন-পতিত-বোরো ফসল ধারার চেয়ে বেশি লাভজনক। এতে পতিত সময়ে আলু উৎপাদন নিশ্চিত করায় ফসলের নিবিড়তা বেড়েছে।

- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত জামালপুর জেলায় কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: জামালপুর ও শেরপুর জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৮ ও ৯)

উৎপাদন প্রযুক্তি

ফসল	রোপা আমন ধান	আলু	বোরো ধান
জাত	বিনাধান-৭	বারি আলু-৮	ব্রি ধান২৮
বপন/রোপণের সময়	আগস্টের শেষ সপ্তাহ	নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারির ১ম সপ্তাহ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৫০	১৫০০	৫০
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)			
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	১৪৫	২১০	২১০
টিএসপি	২০	৮০	৩০
এমওপি	৪৫	১৬০	৬০
জিপসাম	৪০	৮৫০	৪০
জিংক সালফেট	৩	৪.০	৩
বরিক এসিড	০	৬	০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার জমি তৈরির সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে রোপণের ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া আলু রোপণের ৩০ দিন পর সারিতে মাটি তুলে দেওয়ার সময় প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার জমি তৈরির সময় মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে রোপণের ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
আন্তঃপরিচর্যা	আলু রোপণের ২০ দিন পর আগাছা দমন ও সেচ দিতে হবে। আলুর ব্লাইট রোগ দমনের জন্য ডায়থেন এম-৪৫ ডবিউপি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম মিশিয়ে রোপণের ৪০ দিন পর প্রতি ১০ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করা যেতে পারে।	৮টি সেচ এবং চারা রোপণের ২০ এবং ৪০ দিন পর ২ বার আগাছা দমন করতে হবে।	আগাছা দমন, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা সময়মতো করতে হবে।

ফসল	রোপা আমন ধান	আলু	বোরো ধান
জীবনকাল (দিন)	৯৩	৯০	১০৫
ফসল সংগ্রহের সময়	নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারির ১ম সপ্তাহ	মে মাসের ২য় সপ্তাহ
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি			
ফলন (টন/হেক্টর)	৪.৫	২৮.৫	৫.৮০

উন্নত ফসল বিন্যাস: আলু + করলা + পটল (আন্তঃ ফসল)-পেঁয়াজ (বাল্ব)

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- বৃহত্তর টাংগাইল অঞ্চল এবং কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৯ এর অনুরূপ অঞ্চলের জন্য আলু+করলা+রোপা আমনের পরিবর্তে করলার সাথে পটলের আন্তঃফসল চাষ সুপারিশ করা হয়।
- এতে ধানের সমতুল্য ফলন শতকরা ১০৮ ভাগ এবং কৃষকের আয় ১৩৫ ভাগ বৃদ্ধি পায়।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: টাংগাইল জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৭, ৮, ৯ ও ২৮)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ			
ফসল	আলু	করলা	পটল	পেঁয়াজ
জাত	বারি আলু-৭ (ডায়ামন্ট)	টিয়া	বারি পটল-২	ফরিদপুরী
বপন/রোপণের সময়	নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ	নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ	ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ	সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	১৫০০	৬	১৬০০ (লতা)	
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৬০ × ২৫	২.৫ মি. × ২.৫ মি.	২.৫ মি. × ২.৫ মি.	২০× ১৫
সারেরর মাত্রা (কেজি/হেক্টর)				
ইউরিয়া	২৪০	১৫০	৩০০	২৫০
টিএসপি	১৩০	১৭৫	২০০	২৭৫
এম ও পি	২৫০	১৫০	১৫০	১৫০
জিপসাম	১৩০	১০০	৬০	১১০
জিংক সালফেট	১০	১২	৮	৩
বরিক এসিড	১০	১০	০	৫
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	অর্ধেক ইউরিয়া, টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও বরিক এসিড রোপণের সময় জমিতে মিশিয়ে দিতে	টিএসপি, এমওপি, জিপসাম ও জিংক সালফেট সারের অর্ধেক জমি তৈরির সময় এবং বাকি অর্ধেক মাদায় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার চারা	টিএসপি, এমপি, জিপসাম ও জিংক সালফেট সারের অর্ধেক জমি তৈরির সময় এবং বাকি অর্ধেক মাদায় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার চারা গজানোর	শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ টিএসপি, জিপসাম এবং ইউরিয়া ও এমপি সারের অর্ধেক জমিতে সমানভাবে ছিটিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি অর্ধেক

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ			
	হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর অর্থাৎ ২য় বার মাটি তোলার সময় প্রয়োগ করতে হবে।	গজানোর ২০ দিন পর পর তিন কিস্তিতে সমানভাবে মাদার চার পার্শ্বে প্রয়োগ করতে হবে।	২০ দিন পর পর তিন কিস্তিতে সমানভাবে মাদার চার পার্শ্বে প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া ও এমপি যথাক্রমে চারা রোপণের সাথে ২৫ এবং ৫০ দিন পর ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।
ফসলের সময় কাল (দিন)	৯৫	১৯৮	১৯৮	৬০
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি				
ফলন (টন/হেক্টর)	২৫.৬৩	২৩.২৫	২৪.০	১৯.২

একটি উন্নত ফসল ধারা: আলু + ভুট্টা-পাট-রোপা আমন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- আলুর সাথে ভুট্টার আন্তঃফসল চাষের পর পাট চাষ করে পরবর্তীতে রোপা আমন সহজেই চাষ করা যায়।
- আলু, ভুট্টা, পাট ও রোপা আমনের উন্নত জাতের অন্তর্ভুক্তির ফলে ফসলের নিবিড়তা ও ফলন বৃদ্ধি পায়।
- প্রচলিত আলু + শসা-রোপা আমন ফসল ধারার পরিবর্তে উন্নত নতুন ফসল ধারায় ধানের সমতুল্য ফলন শতকরা ১৯.৮২ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: টাংগাইল জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৭, ৮, ৯ ও ২৮)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ			
ফসল	আলু	ভুট্টা	পাট	রোপা আমন
জাত	ডায়ামন্ট (বারি আলু-৭)	বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭	ও-৯৮৯৭	ব্রি ধান৪৯
বপন/রোপণের সময়	নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহ	নভেম্বরের ১ম থেকে সপ্তাহ ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ	মে মাসের ১ম সপ্তাহ	আগস্টের ১ম সপ্তাহ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	১৫০০	২৫	৮	৫০
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৬০×২৫	৬০×৩০	ছিটিয়ে বোনা	২০×২০
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)				
ইউরিয়া	২৪০	১২০	১৭০	২০০
টিএসপি	১৩০	০	১৭০	১০৫
এম ও পি	২৫০	৬০	১২৫	৭৫
জিপসাম	১৩০	০	১২৫	৭৫
জিংক সালফেট	১০	০	১১	০
বরিক এসিড	১০	০	০	০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং অন্যান্য সারের সম্পূর্ণ অংশ জমি শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়ার অবশিষ্টাংশ আলু রোপণের ৩০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	সম্পূর্ণ পরিমাণ ইউরিয়া ও পটাশ সার আলু সংগ্রহের পর প্রয়োগ করতে হবে।	অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সারের সম্পূর্ণ অংশ জমি শেষ চাষের সময় এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া বীজ বপনের ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	সম্পূর্ণ পরিমাণ টিএসপি, পটাশ ও জিপসাম জমি শেষ চাষের সময় এবং ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।

বিষয়	বিবরণ			
আন্তঃপরিচর্যা	সেচ, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা প্রয়োজনমতো করতে হবে	সেচ, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা প্রয়োজনমতো করতে হবে	সেচ, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা প্রয়োজনমতো করতে হবে	সেচ, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা প্রয়োজনমতো করতে হবে
ফসলের জীবনকাল (দিন)	১৫৯		৯১	১০২
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ	এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ	জুলাই এর শেষ সপ্তাহ থেকে আগস্টের ১ম সপ্তাহ	নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি				
ফলন (টন/হেক্টর)	২২.৪	৯.০	৫.২	৪.৩

একটি উন্নত ফসল বিন্যাস: তিসি-রোপা আউশ-রোপা আমন ধান

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- প্রচলিত পতিত-রোপা আউশ-রোপা আমন ফসল বিন্যাসে পতিত সময় উচ্চ ফলনশীল তিসি (বারি তিসি-১) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।
- এতে ধানের সমতুল্য ফলন শতকরা ৪২ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে উৎপাদন দক্ষতা এবং কৃষকের আয় বাড়ে।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৮ ও ১৯)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ		
ফসল	তিসি	রোপা আউশ ধান	রোপা আমন ধান
জাত	বারি তিসি-১	ব্রি ধান২৭	ব্রি ধান৪০
বপন/রোপণের সময়	ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ	এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ	আগস্টের ২য় সপ্তাহ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৭	৫০	৫০
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৩০ সেমি × অবিরত সারি	২৫×৫	২৫×১৫
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	৭০	১৭৫	১১৫
টিএসপি	১১৫	৮০	৯০
এমওপি	৪০	৬০	৬৫
জিপসাম	১৫	০	০
জিংক সালফেট	০	০	০
বরিক এসিড	০	০	০

বিষয়	বিবরণ		
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সার জমি শেষ চাষের সময় এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ২৫-৩০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	সম্পূর্ণ টিএসপি এবং পটাশ সার জমি শেষ চাষের সময় এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	সম্পূর্ণ টিএসপি এবং পটাশ সার জমি শেষ চাষের সময় এবং ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
আন্তঃপরিচর্যা	আগাছা দমন, সেচ ও অন্যান্য উদ্ভিদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজনমতো করতে হবে।		
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	মার্চের ৩য় সপ্তাহ	আগস্টের ১ম সপ্তাহ	নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ
ফসলের জীবনকাল (দিন)	১১০	১১০	১১০
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি			
ফলন(টন/হেক্টর)	১.০	৩.২	৩.৮
ধানের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	৮.৯		

একটি উন্নত ফসল ধারা: গম-পতিত-রোপা আমন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- পটুয়াখালী অঞ্চলে রোপা আমন ধান একটি প্রধান ফসল এবং রোপা আউশ ও রবিশস্য অবহেলিত। এর কারণ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, লবণাক্ততা, খরা, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, শুষ্ক মৌসুমে সেচের পানির অভাব, স্বল্প দীর্ঘ রবি মৌসুম ইত্যাদি।

- প্রায় ৪১% চাষযোগ্য জমি শুষ্ক মৌসুমে পতিত থাকে এবং স্থানীয় জাতের দীর্ঘমেয়াদী রোপা আমন ধানের জাত চাষ করা হয়। এইসব পতিত জমিতে প্রচলিত ফসলধারার চেয়ে উচ্চ ফলনশীল গম ও ধান সহজে চাষ করা সম্ভব।
- এতে ধানের সমতুল্য ফলন শতকরা প্রায় ২৩৩ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৩)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ		
ফসল	গম	পতিত	রোপা আমন
জাত	বারি গম-২৫	-	ব্রি ধান৫৩
বপন/রোপণের সময়	ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ	-	জুলাই এর ৩য় সপ্তাহ
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	ছিটিয়ে বোনা	-	২৫×১৫
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	১২০	-	৫.০
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	২০৬	-	১৪০
টিএসপি	১০৬	-	৯৫
এমওপি	৫০	-	৭০
জিপসাম	১২৫	-	১৪০
জিংক সালফেট	১৮	-	০
বরিক এসিড	৬	-	০

বিষয়	বিবরণ		
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং সমস্ত টিএসপি, পটাশ, জিংক ও বোরন সার জমি শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া বীজ বপনের ১৫ - ২০ দিন পর ১ম থেকে পূর্বে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।		সম্পূর্ণ টিএসপি, পটাশ ও জিপসাম জমি শেষ চাষের সময় এবং ইউরিয়া সার চারা রোপণের ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর সমান ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।
আন্তঃপরিচর্যা	বীজ বপনের ২০ দিন পর এবং শীষ বের হওয়া সময় মোট ২টি সেচ দিতে হবে। অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা সময়মত করতে হবে।		আগাছা দমন এবং অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা সময়মতো করতে হবে।
ফসলের জীবনকাল (দিন)	১০৫	-	১২৩
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	মার্চের ৩য় সপ্তাহ	-	নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি			
ফলন(টন/হেক্টর)	৩.০	-	৪.০

রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে মসুর এবং সরিষার মিশ্র চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- পাবনা এলাকায় কৃষকেরা মসুর এবং সরিষা একক ফসল হিসেবে চাষ করে থাকে যার ফলন খুবই কম।
- রোপা আমন ধান কাটার ১০-১৫ দিন আগে মাটিতে বিদ্যমান আর্দ্রতা ব্যবহার করে ১০০ ভাগ মসুর (বীজ হার ৫০ কেজি/হেক্টর) এবং ১০ ভাগ সরিষা (০.৭ কেজি/হেক্টর) সাথী ফসল হিসেবে মিশ্র চাষ করলে ফলন শতকরা ১৪ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।
- এতে মসুরের সমতুল্য ফলন ১.৯৭ টন/হেক্টর পাওয়া সম্ভব।
- এতে একক ফসল চাষের ঝুঁকি, জমি চাষের খরচ কমে এবং সর্বোপরি মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১ ও ৪)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসলের বিবরণ
ফসল	মসুর + সরিষা
জাত	বারি মসুর-৭ + বারি সরিষা -১৪
বপন পদ্ধতি	মসুর ও সরিষা একত্রে ছিটিয়ে বোনা হয়।
বপন সময়	নভেম্বর প্রথম সপ্তাহে আমন ধান কাটার ১০ -১৫ দিন পূর্বে
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৫০ কেজি মসুর + ০.৭ কেজি সরিষা

বিষয়	ফসলের বিবরণ
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	
ইউরিয়া	৪০
টিএসপি	১৫০
এমওপি	৫০
জিপসাম	১১৫
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	ইউরিয়া বাদে সকল সার মসুর ও সরিষা ছিটিয়ে বোনার সময় এবং ইউরিয়া সার বীজ বপনের ১৫ -২০ দিন পরে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
আন্তঃপরিচর্যা	মসুর বীজ বপনের পূর্বে সারারাত পানিতে ভিজিয়ে রাখতে হবে। রোভরাল ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে ৩ বার স্প্রে করে মসুরের স্টেমফাইলিয়াম ব্লাইট ও সরিষার অল্টারনেরিয়া ব্লাইট দমন করা যায়
ফসল কাটার সময়	মার্চের প্রথম সপ্তাহ ও ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি	
ফলন (টন/হেক্টর)	১.৮ (মসুর) + ০.৩৩ (সরিষা)

রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে মটরশুঁটির চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- রোপা আমন ধান কাটার ১০-১৫ দিন পূর্বে জমিতে বিদ্যমান আর্দ্রতা ব্যবহার করে পূর্বে ভিজানো মটরশুটি বীজ ৯০ কেজি/হেক্টর হারে ছিটিয়ে বুনলে জমি চাষের ব্যয় এবং সময় বাঁচে।
- এতে একক ফসল চাষের ঝুঁকি কমে এবং সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, পাবনা অঞ্চলে ২০১২ থেকে ২০১৫ খ্রি. সাল পর্যন্ত পাবনা অঞ্চলে কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১ ও ৪)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	:	বিবরণ
ফসল	:	মটরশুঁটি
জাত	:	নাটোর লোকাল-২
বপন সময়	:	নভেম্বরের শুরুতে রোপা আমন ধান কাটার ১০ -১৫ দিন পূর্বে
বপন পদ্ধতি	:	ছিটিয়ে বোনা
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	:	৯০
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর	:	
ইউরিয়া	:	১০০
টিএসপি	:	৪০
এমওপি	:	৪২
জিপসাম	:	৭০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	:	ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার মটরশুটি বীজ বোনার সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সার বীজ বপনের ১২ -১৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়	:	ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি		
ফলন (টন/হেক্টর)	:	২.৫

সরিষা-বোরো মিশ্র চাষ একটি লাভজনক প্রযুক্তি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- কুমিল্লার দাউদকান্দি, মুরাদনগর এবং হাজীগঞ্জ এলাকায় সরিষা এবং বোরো ধান উভয়ই প্রধান ফসল।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণা চালিয়ে শতকরা ১০০ ভাগ বোরো ধানের সাথে শতকরা ১০০ ভাগ সরিষার মিশ্র চাষের এ লাভজনক প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।
- এতে একক ফসল চাষের তুলনায় ধানের সমতুল্য ফলন শতকরা ৬৪.৩ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

- মিশ্র ফসল চাষে জমি চাষের খরচ ও ফসল উৎপাদনের ঝুঁকি কমে এবং সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: কুমিল্লা, চাঁদপুর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৯)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ	
ফসল	সরিষা	বোরো ধান
জাত	বারি সরিষা-১৪	ব্রি ধান৫৮/ব্রি ধান২৯
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	ছিটিয়ে	২৫ × ১৫
বপন সময়	অক্টোবর ২য় সপ্তাহ	রোপা আমন ধান কাটার ১৫-২০ দিন পূর্বে
বীজের হার (কেজি/হেক্টর)	৮ (১০০%)	৪০ (১০০%)
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)		
ইউরিয়া	৪৫৫	
টিএসপি	১৭০	
এমওপি	৯০	
জিপসাম	১৮৮	
জিংক সালফেট	৫	
বরিক এসিড	১০	
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সারের সম্পূর্ণ অংশ জমি শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ২২-২৪ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। সরিষা সংগ্রহের পরপরই জমি আগাছামুক্ত করে সরিষার সারির ফাঁকে বোরো ধানের চারা রোপণ করতে হবে। ধানের ক্ষেতে প্রথম আগাছা দমন এবং শীষ বের হওয়ার আগে প্রতি হেক্টরে ২৬০ কেজি ইউরিয়া সমান ২ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ছাড়া অন্য সার প্রয়োগের প্রয়োজন নেই।	
আন্তঃপরিচর্যা	সরিষা জমিতে আগাছা দমনের পর সেচ দিতে হবে। রোগ ও পোকামাকড় দমনের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে।	আগাছা দমন, সেচ ও অন্যান্য পরিচর্যা সময়মতো করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	ফেব্রুয়ারির ১ম সপ্তাহ	মে মাসের ১ম সপ্তাহ
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি		
ফলন (টন/হেক্টর)	১.৬ -১.৭	৬.৬-৬.৬৭
ধানের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	১১.০১	

উপকূলবর্তী লবণাক্ত অঞ্চলে তরমুজের সাথে রসুনের আন্তঃফসল চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- নোয়াখালীর চরাঞ্চলে তরমুজ একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল।
- তরমুজের সাথে রসুনের আন্তঃফসল জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারে।
- এতে তরমুজের সমতুল্য ফলন ৪৮.৫ টন/হেক্টর এবং রসুনের ফলন ২.৮ টন/হেক্টর পাওয়া যায়।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১১ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত কৃষকদের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৮ ও ১৯)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ	
ফসল	তরমুজ	রসুন
জাত	গ্লোরী	বারি রসুন-২
বপন/রোপণের সময়	ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহ থেকে ৩য় সপ্তাহ	
বপন/রোপণ দূরত্ব	২ মিটার × ২ মিটার	২৫ সেমি × ১৫ সেমি
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	সরাসরি মাদায় বপনের ক্ষেত্রে : ১.৫-২.০	রসুনের কোয়া রোপণ ৪০০ কেজি/হেক্টর
বপন/রোপণ পদ্ধতি	তরমুজের দুই সারির মাঝখানে ২ সারি রসুন বুনতে হবে	
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)		
ইউরিয়া	২২০	
টিএসপি	৩১৫	
এমওপি	২০০	
জিপসাম	১১৫	
গোবর	১০ টন	
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, অর্ধেক পটাশ এবং এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া জমি শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক পটাশ সার ও দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া বীজ বপনের ২০ এবং ৪০ দিন পর সমান ২ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।	
আন্তঃপরিচর্যা	আগাছা দমন এবং অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা সময়মতো করতে হবে।	২-৩ বার সেচ প্রদান এবং ধানের খড় বা কচুরীপানা দ্বারা জমিতে পুরু মালচ্ ব্যবহার করতে হবে। অন্যান্য পরিচর্যা প্রয়োজনমতো করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	এপ্রিলের ২য় সপ্তাহ	এপ্রিলের ২য় সপ্তাহ
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি		
ফলন (টন/হেক্টর)	৩৬.০	২.৮

রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে মিষ্টি কুমড়া চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় রোপা আমন ধান কাটার পর দীর্ঘ সময় জমি পতিত থাকে এবং এই সময়ে মাটির আর্দ্রতা দ্রুত কমে যেতে থাকে।
- মাটির সংরক্ষিত আর্দ্রতা ব্যবহার করে রোপা আমন ধান কাটার ১৫-২০ দিন পূর্বে মিষ্টি কুমড়া খুব সহজেই চাষ করা সম্ভব।
- এতে ধানের সমতুল্য ফলন ২১ টন/হেক্টর পাওয়া সম্ভব।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১২ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৩)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ	
ফসল	রোপা আমন ধান	মিষ্টি কুমড়া
জাত	বিআর ২৩	বারি মিষ্টি কুমড়া-১
বীজ বপনের সময়	জুলাইয়ের ৩য় সপ্তাহে বীজ তলায় বীজ বপন করতে হবে।	নভেম্বরের ২য় সপ্তাহে পলিব্যাগ বীজ বপন করতে হবে।
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৩০-৩৫	৫-৬
চারা রোপণের সময়	আগস্টের ৩য় সপ্তাহে ৩০ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হবে।	ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহে রোপা আমন ধান কাটার ১৫ -২০ দিন পূর্বে ২৫ দিন বয়সের চারা রোপণ করতে হবে।
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	২৫×১৫	২ মি. ×২ মি.
সারের মাত্রা	(কেজি/হেক্টর)	(গ্রাম/মাদা)
ইউরিয়া	১৪০	১২০
টিএসপি	৯৫	৭০
এমওপি	৭০	৭০
জিপসাম	১৪০	
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সম্পূর্ণ টিএসপি, পটাশ ও জিপসাম জমি শেষ চাষের সময় এবং ইউরিয়া চারা রোপণের ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর সমান ৩ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি, পটাশ ও জিপসাম এবং অর্ধেক ইউরিয়া সার জমি তৈরীর ৭ দিন পূর্বে এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া চারা রোপণের ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
আন্তঃপরিচর্যা	আগাছা দমন ও অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা সময়মতো করতে হবে।	কুমড়ার মাছি পোকা দমনের জন্য সেক্স ফেরোমন ফাঁদ স্থাপন করতে হবে। আগাছা দমন ও অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা সময়মতো করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	ডিসেম্বরের ৩য় সপ্তাহ	মার্চের শেষ সপ্তাহ
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি		
ফলন (টন/হেক্টর)	৩.৮০	৩১.৫
ধানের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	২১	

আমন ধানের পর বেড পদ্ধতিতে কুমড়া জাতীয় সবজি চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশগত নানাবিধ সমস্যার কারণে ফসল উৎপাদন বিশেষ করে সবজির আবাদ খুবই সীমিত এবং ঝুঁকিপূর্ণ।
- নিচু জমি, জলাবদ্ধতা, সময়মত জমি তৈরি করতে না পারা, হঠাৎ করে জোয়ারের পানি দ্বারা প্লাবিত হওয়া, স্বল্প মেয়াদী শীতকাল, দেরিতে আমন ধান পাকা প্রভৃতি সমস্যার কারণে এসব এলাকার কৃষকেরা সবজি উৎপাদনে অনেকাংশেই পিছিয়ে আছে।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ (২০১২-২০১৫) গবেষণায় দেখা যায় যে, ৩-৪টি চাষ দিয়ে উঁচু বেড তৈরি সবজি চাষ করে লবণাক্ততা, আকস্মিক বন্যা কিংবা জোয়ারের পানিসহ আগাম বৃষ্টির হাত থেকে ফসল রক্ষা করা যায়। যা দক্ষিণাঞ্চলের কৃষিক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ হয়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১, ১৩ ও ১৪)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ			
ফসল	তরমুজ	শসা ও খিরা	করলা	বাঙ্গি
জাত	গ্লোরী, ওয়ার্ল্ড কুইন, জাম্বু	গ্রীনকিং শিলা, গ্রীন ফিল্ড, আলাভী, ময়নামতি, লাকি-৭ বাশখালী, মধুমতি	বারি করলা-১, টিয়া (হাইব্রিড), পাপিয়া (হাইব্রিড)	চিনাল (হাইব্রিড)
বপন/রোপণের সময়	জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি	শীতকালীন: অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর গ্রীষ্মকালীন: ফেব্রুয়ারি থেকে মে	ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চ পর্যন্ত	মধ্য ফেব্রুয়ারি থেকে মধ্য মার্চ
বপন/রোপণ দূরত্ব (মি.)	২ × ২	২ × ২	১.৫ × ১.৫	২ × ২
বীজ বপন পদ্ধতি	করলা, খিরা, ঢেড়স, বাঙ্গি ও তরমুজের ক্ষেত্রে বেডে সরাসরি বীজ লাগাতে হবে। করলা ও খিরার ক্ষেত্রে ১ মিটার পর পর বীজ বপন করতে হবে। গর্তগুলো এক সারিতে হবে এবং বেডের নিচের দিকের সেচ নালার কিনারা থেকে ৫৫ সেমি ভিতরের দিকে হবে।			
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)				
ইউরিয়া	১৩৬	১৭৫	১৭৫	১৫০
টিএসপি	১৭৫	১৫০	১৭৫	১৭৫
এম ও পি	১৫০	১৭৫	১৫০	২০০
জিপসাম	১০০	১০০	১০০	১০০
জিংক সালফেট	১২	১২	১২	১২
বরিক এসিড	১০	১০	১০	১০
গোবর (টন)	৫	৫	৫	৫

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ			
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	শেষ চাষের সময় পচা গোবর, টিএসপি, এমওপি এবং জিপসাম মাটির সাথে ছিটিয়ে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। চারা গজানোর ১০-১৫ দিন পর ইউরিয়াসহ অন্যান্য সার গাছের গোড়া থেকে সামান্য দূরে ছিটিয়ে দিয়ে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ মাদায় রিং আকারে প্রয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে মাদার উপরের মাটির সাথে ভাল করে সার মিশিয়ে উপরের মাটি গর্তের নিচে এবং নিচের মাটি গর্তের উপরে দিতে হবে। সার ও মাটি যেন ঠিকভাবে মিশে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে এবং ৭ -১০ দিন পর গর্ত খুড়ে মাটি ওলট পালট করে সার ভালভাবে মিশেছে কিনা তা দেখে গর্তে চারা অথবা বীজ বুনতে হবে। মাটিতে পর্যাপ্ত রস না থাকলে সার দেয়ার পর পানি সেচ দিতে হবে।			
জাবড়া (মালচ) প্রয়োগ	জাবড়া ব্যবহারের ফলে মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষিত হয় এবং মাটির কৈশিক নালিকার মধ্য দিয়ে পানির চলাচল বাধাগ্রস্থ হওয়ায় মাটির লবণাক্ততা বাড়তে পারে না। সাধারণত ধানের খড় জাবড়া হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেচের পানির অপ্রতুলতা থাকলে সেক্ষেত্রে মালচিং করাই ভাল।			
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	৯০-১২০	৪৫-৬০	৫০-৬৫	৫০-৬৫
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি				
ফলন (টন/হেক্টর)	৫৫	২০	৩৫	২৫

মরিচের সাথে রসুনের আন্তঃফসল চাষ

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- কিশোরগঞ্জের হাওর এলাকায় একক ফসল হিসেবে মরিচ চাষ করা হয়ে থাকে।
- মরিচের সাথে আন্তঃফসল হিসেবে রসুন চাষ করলে মরিচের সমতুল্য ফলন ২৫.৫ টন/হেক্টর পাওয়া সম্ভব এবং একক ফসলের তুলনায় নীট আয় শতকরা ১৭৮ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

প্রযুক্তির উপযোগিতাঃ কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল- ৭, ৮ ও ৯)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ	
ফসল	মরিচ	রসুন
জাত	বালুঝুরি	বারি রসুন-৩
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৩০ × ২৫	১০ × ১০
বপন/রোপণের সময়	অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে	নভেম্বরের ১ম সপ্তাহে
বীজের হার (কেজি/হেক্টর)	১	৩৫০ (কোয়া)

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ	
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)		
ইউরিয়া	২১২	
টিএসপি	৩৩০	
এমওপি	২০০	
জিপসাম	১২৫	
বরিক এসিড	৬	
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সকল সার জমি প্রস্তুতির শেষভাবে প্রয়োগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।	
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	জানুয়ারির ১ম সপ্তাহ থেকে মার্চের ২য় সপ্তাহ	মার্চের ২য় সপ্তাহ
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি		
ফলন (টন/হেক্টর)	কাঁচা মরিচ : ১৪ শুকনা মরিচ: ৩.১৫	৩.৫০

কচুরিপানা মালচ্ এর মাধ্যমে আলু ও টমেটো উৎপাদন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- নোয়াখালী অঞ্চলে শুষ্ক মৌসুমে মালচ্ ব্যবহার করে আর্দ্রতা সংরক্ষণের মাধ্যমে মাটির লবণাক্ততা কমিয়ে সাফল্যজনক ভাবে আলু ও টমেটোর চাষ করা যায়।
- নোয়াখালী অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকা ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৮ এর অনুরূপ এলাকায় মালচ্ হিসেবে প্রতি হেক্টরে ৬৮ টন কচুরিপানা ব্যবহার করে আলু ও টমেটোর ফলন যথাক্রমে প্রতি হেক্টরে ২৬.৫ এবং ৬৭.৫ টন পাওয়া সম্ভব।
- মালচ্ ব্যবহার করে আলু ও টমেটোর ফলন শতকরা প্রায় ৪২.৫ ভাগ এবং ২২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত কৃষকদের মাঠে গবেষণা চালিয়ে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: লক্ষ্মীপুর ও ফেনী জেলা (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৮ ও ১৯)

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ	
ফসল	আলু	টমেটো
জাত	বারি আলু-৭	বারি টমেটো-১৪
বীজ হার (হেক্টর)	১৫০০ কেজি	২০০ গ্রাম
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৬০×২৫	৬০×৪০
বপন/রোপণের সময়	ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ	ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)		
ইউরিয়া	২৫০	৪৫০
টিএসপি	১৫০	২৫০

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ	
এমওপি	২৫০	২৫০
জিপসাম	১৭০	-
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	জমি প্রস্তুতের সময় সকল সার মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।	সম্পূর্ণ টিএসপি ও অর্ধেক এমওপি শেষ চাষের সময় এবং বাকি এমওপি এবং সম্পূর্ণ ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে রোপণের যথাক্রমে ১৫ ও ৩০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
সংগ্রহের সময়কাল	মার্চের প্রথম সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চের ১ম সপ্তাহ
প্রযুক্তিতে ফলন/ প্রাপ্তি		
ফলন (টন/হেক্টর)	২৬.৫	৬৭.৫

উন্নত ফসল বিন্যাস: আলু-চীনাবাদাম-রোপা আমন ধান

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- নীলফামারী এবং লালমনিরহাট জেলায় তামাক-বোরো-রোপা আমন একটি প্রধান ফসল বিন্যাস। কিন্তু কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৩ একটি খরাপ্রবণ এলাকা সেখানে সেচের পানির ঘাটতি রয়েছে এবং এই অঞ্চলের মাটির পানি ধারণক্ষমতা খুবই কম। বোরো ধান উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণে ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার হয়। এমতাবস্থায় প্রচলিত ফসল বিন্যাসে বোরো ধানের পরিবর্তে চীনাবাদাম এবং তামাকের পরিবর্তে আলুর অন্তর্ভুক্তি সুপারিশ করা হয়। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৪-১৫ সাল পর্যন্ত গবেষণার মাধ্যমে আলু-চীনাবাদাম-রোপা আমন ধান উন্নত এ ফসলধারা উদ্ভাবন করে। ধানের সমতুল্য ফসল শতকরা ৬৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: নীলফামারী এবং লালমনিরহাট

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ		
ফসল	আলু	চীনাবাদাম	রোপা আমন ধান
জাত	বারি আলু-৮	বারি চীনাবাদাম-৮	ব্রি ধান৪৯
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	১৫০০	৯৫-১০০	৩০-৩৫
বপন/রোপণের সময়কাল	নভেম্বরের ৩য় থেকে ৪র্থ সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ	জুলাই এর ৩য় সপ্তাহ
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৬০×২৫	৩০×১৫	২০×১৫
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	২৬০	২৬	১৪৫
টিএসপি	২৫০	১৬০	২০
এমওপি	২২০	৮৫	৪৫
জিপসাম	১৪০	১৭০	৪০
জিংক সালফেট	৮	৫	৩
বরিক এসিড	৮	১০	০

বিষয়	বিবরণ		
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	দুই-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার জমি শেষ চাষের সময় এবং বাকি ইউরিয়া রোপণের ৩০ দিন পর সারিতে মাটি তুলে দেয়ার সময় প্রয়োগ করতে হবে।	অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার বীজ বপনের পূর্বে শেষ চাষের সময় এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া বপনের ৪০-৪৫ দিন পর গাছে ফুল আসার সময় প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় এবং ইউরিয়া সমান তিন কিস্তিতে রোপণের ১০, ৩৫ এবং ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
আন্তঃপরিচর্যা	মোট ৭-৮ টি সেচ প্রয়োগ করতে হবে। রোগবালাই এবং অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা সময়মতো করতে হবে।		
ফসল সংগ্রহের সময়	ফেব্রুয়ারির ৩য় সপ্তাহ	জুনের ৩য় সপ্তাহ	নভেম্বরের ১ম ও ২য় সপ্তাহ
প্রযুক্তিতে ফলন/প্রাপ্তি			
ফলন (টন/হেক্টর)	২৬	২.৩	৪.১

সবজি উৎপাদনে সারের দক্ষতা বৃদ্ধি করণে এনপিকে ব্রীকেট সার এর ব্যবহার

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

- ফসল চাষের নিবিড়তা বাড়ার কারণে বাংলাদেশের মাটির উর্বরতা ক্রমশ কমছে এবং বেড়েছে মাত্রাতিরিক্ত সারের ব্যবহার।
- শাক-সবজি উৎপাদনে সারের প্রয়োগ ও দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- ছিটিয়ে সার প্রয়োগের চেয়ে মাটির গভীরে প্রয়োগ করলে সার ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।
- সরেজমিন গবেষণা বিভাগ কর্তৃক যশোর, পটুয়াখালী ও ময়মনসিংহ জেলায় ২০১২ কৃষকের মাঠে এ প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে এনপিকে ব্রীকেট ব্যবহারে সুপারিশকৃত ছিটিয়ে বোনা সারের চেয়ে সবজির ফলন যেমন-শসাতে ২৯%, করলাতে ১১% এবং কচুতে ২৬% বেশি ফলন পাওয়া যায়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: যশোর, পটুয়াখালী ও ময়মনসিংহ

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ		
ফসল	শসা	করলা	কচু
জাত	অলরাউন্ডার	টিয়া	বারি পানি কচু-২
বীজ হার (হেক্টর)	৫০০-৮০০ গ্রাম	৩-৫ কেজি	৩৭-৩৮ হাজার চারা
বপন/রোপণ দূরত্ব(সেমি)	১০০×১০০	১০০×১০০	৬০×৪৫
বপন/রোপণের সময়	এপ্রিলের ৩য় সপ্তাহ	জুনের শেষ সপ্তাহ হতে জুলাই এর ১ম সপ্তাহ	এপ্রিলের ২য় সপ্তাহ
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	শতকরা ১০ ভাগ কম এনপিকে ব্রিকেট (ইউরিয়া ১৩৭ কেজি/হেক্টর)	শতকরা ১০ ভাগ কম এনপিকে ব্রিকেট (ইউরিয়া ১৫৬ কেজি/হেক্টর)	শতকরা ১০ ভাগ কম এনপিকে ব্রিকেট (ইউরিয়া ১৭৫ কেজি/হেক্টর)
টিএসপি	৯০	১৩৫	৯০
এমওপি	৬৩	৬৩	১০৮

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ		
জিপসাম	১০০	৫০	৯৪
জিংক সালফেট	৭	৭	০৬
বরিক এসিড	৯	৯	০৯
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	৩.৪ গ্রাম ওজনের ৭টি এনপিকে ব্রিকেট রোপণের ১০ দিন পর চারার গোড়া থেকে ৯-১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ৭-৮ সেন্টিমিটার গভীরে রিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে। জমি শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বোরন মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।	৩.৪ গ্রাম ওজনের ৯টি এনপিকে ব্রিকেট রোপণের ১০ দিন পর চারার গোড়া থেকে ৯-১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ৭-৮ সেন্টিমিটার গভীরে রিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে। জমি শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বোরন মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।	৩.৪ গ্রাম ওজনের ৫টি এনপিকে ব্রিকেট রোপণের ১০ দিন পর চারার গোড়া থেকে ৯-১০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ৭-৮ সেন্টিমিটার গভীরে রিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে। জমি শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বোরন মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
আন্তঃপরিচর্যা	আগাছা দমন, সেচ ও অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা প্রয়োজনমতো করতে হবে।		
সংগ্রহের সময়কাল	মার্চের প্রথম সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চের ১ম সপ্তাহ	মধ্য জুলাই হতে মধ্য নভেম্বর
প্রযুক্তিতে ফলন/প্রাপ্তি			
ফলন (টন/হেক্টর)	১.৯৮	৪৫.৫	রাইজোম-২২.১, লতি-৪১.৫

হলুদ উৎপাদনে চুনের ব্যবহার

ফসলের বৃদ্ধি ও ফলনে মাটির অম্লতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা উদ্ভিদ কর্তৃক পুষ্টি উপাদান গ্রহণের সাথে জড়িত। মাটির অতিরিক্ত অম্লতা নিয়ন্ত্রণে চুন প্রয়োগ একটি মৌলিক ব্যবস্থাপনা যা পুষ্টি উপাদানের সহজলভ্যতা, গ্রহণ ও মৃত্তিকা অণুজীবের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে ফসলের ফলন বৃদ্ধি করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে হলুদ উৎপাদনে চুনের মাত্রা নির্ধারণ করেছে। সুপারিশকৃত মাত্রায় সার এবং প্রতি হেক্টরে ২ টন হিসাবে চুন প্রয়োগে শতকরা ২৩ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসলের বিবরণ
ফসল	হলুদ
জাত	বারি হলুদ-৪
রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৫০ × ২৫
রোপণের সময়	এপ্রিলের মাঝামাঝি হতে শেষ সপ্তাহ
বীজের হার (টন/হেক্টর)	২
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	
ইউরিয়া	২৪০
টিএসপি	১৯০
এমও পি	১৮০
জিপসাম	১৩৮
বরিক এসিড	৬
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	কন্দ রোপণের ১৫ দিন পূর্বে ২ টন/হেক্টর হিসাবে চুন প্রয়োগ করে চাষ দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। জমি তৈরির সময় সমুদয় টিএসপি, জিপসাম ও বরিক এসিড প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি কন্দ লাগানোর যথাক্রমে ৫০, ৮০ এবং ১১০ দিন পর সমানভাবে ভাগ করে প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল সংগ্রহ	ফেব্রুয়ারি প্রথম সপ্তাহ
ফলন (টন/হেক্টর)	২৩.৯০

বাঁধাকপির সাথে ধনিয়ার আন্তঃফসল চাষ

ময়মনসিংহ জেলায় (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৯) যেখানে একক ফসল হিসেবে বাঁধাকপি চাষ করা হয় সেখানে বাঁধাকপির (১০০%) দুই সারির মাঝখানে দুই সারিতে ধনিয়া বপন করলে প্রচুর ধনিয়ার পাতা উৎপাদিত হয়। এতে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হয়। এ প্রযুক্তিতে বাঁধাকপির সাথে ধনিয়া চাষের ফলে বাঁধাকপির সমতুল্য ফলন ৮৫ টন প্রতি হেক্টরে পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ	
ফসল	বাঁধাকপি	ধনিয়া
জাত	এটলাস-৭০	বারি ধনিয়া-১
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৬০×৫০	২০× অবিরত লাইন
বপন/রোপণের সময়	নভেম্বরের মাঝামাঝি	
বীজের হার (হেক্টর)	৩৫০ গ্রাম	১০ কেজি
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)		
ইউরিয়া	৩৫২	
টিএসপি	২৫০	
এমওপি	৩০০	
গোবর	৫ টন	
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি এবং অর্ধেক এমওপি সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া এবং অর্ধেক এমওপি সমান ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের যথাক্রমে ১০, ২৫ এবং মাথা বাধার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	
সংগ্রহের সময়কাল	ফেব্রুয়ারির ১ম সপ্তাহ	বীজ বপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে ধনিয়ার পাতা সংগ্রহ করা যায়।
বাঁধাকপি সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	৮৫	
ফলন (টন/হেক্টর)	৭৫	২.৭

পাবনার চরাঞ্চলে মসুর + সরিষা-বোনা আউশ ধান-মাসকলাই ফসল ধারার জন্য সার সুপারিশ

বৃহত্তর পাবনা এবং কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১১ এর অনুরূপ এলাকায় চার ফসল ভিত্তিক মসুর (৮০%) + সরিষা (২০%)-বোনা আউশ ধান-মাসকলাই ফসল ধারার জন্য সার সুপারিশ করা হয়। পাবনা জেলার চরসাদীপুর এলাকায় কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে ৮০% মসুরের বীজের সাথে ২০% সরিষার মিশ্র চাষের উন্নত এই ফসল ধারার জন্য সারের মাত্রা নিরূপণ করা হয়। এতে মসুরের সমতুল্য ফলন ১১৩৭ কেজি/হেক্টর পাওয়া গেছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ			
ফসল	মসুর	সরিষা	বোনা আউশ	মাসকলাই
জাত	বারি মসুর-৬	বারি সরিষা-১৪	স্থানীয় জাত	বারি মাস-৩
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৩৫	৭	৪০	৪০
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	ছিটিয়ে	ছিটিয়ে	ছিটিয়ে	ছিটিয়ে
বপন/রোপণের সময়	নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহ	নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহ	মে এর ১ম সপ্তাহ	আগস্টের শেষ সপ্তাহ
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)				
ইউরিয়া	৫৫		১১০	৫৫
টিএসপি	১৫০		৫৫	৯৫

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ			
এম ও পি	৫০		৪০	৩০
জিপসাম	১১৫		৪০	৫৬
জিংক সালফেট	৮.৫		৩	৬
বরিক এসিড	৯		৯	-
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সকল সার জমি তৈরির শেষভাগে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।		ইউরিয়া সারের দুই তৃতীয়াংশ এবং বাকি সকল সার জমি তৈরির শেষ ভাগে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বাকি এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া শীষ বের হওয়ার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	সকল সার জমি তৈরির শেষভাগে চাষ দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	ফেব্রুয়ারির ২য় সপ্তাহ হতে ৩য় সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারির ২য় সপ্তাহ হতে ৩য় সপ্তাহ	আগস্টের ২য় সপ্তাহ	নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহ
মসুরের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	১.১৪			
ফলন (টন/হেক্টর)	০.৯৫	০.২৮	২.৮১	০.৮৭

কিশোরগঞ্জের হাওর অঞ্চলে মরিচের সাথে রসুনের আন্তঃফসল চাষ

কিশোরগঞ্জের হাওর এলাকায় (কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৮, ১৯, ২১) একক ফসল হিসেবে মরিচ চাষ করা হয়ে থাকে। মরিচের (১০০%) সাথে এক সারিতে আন্তঃফসল হিসেবে রসুন চাষ করলে মরিচের সমতুল্য ফলন ২৫.৫ টন/হেক্টর পাওয়া সম্ভব এবং একক ফসলের তুলনায় নীট আয় শতকরা ১৭৮ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৪ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণা করে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ	
ফসল	মরিচ	রসুন
জাত	বালুঝুরি	বারি রসুন-৩
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)		
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৩০×২৫	১০×১০
বপন/রোপণের সময়	অক্টোবরের শেষ সপ্তাহে	নভেম্বরের ১ম সপ্তাহে
বীজের হার (কেজি/হেক্টর)	১	৩৫০ (কোয়া)
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)		
ইউরিয়া	২১২	
টিএসপি	৩৩০	
এমওপি	২০০	
জিপসাম	১২৫	
বরিক এসিড	৬	
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সকল সার জমি প্রস্তুতির শেষভাবে প্রয়োগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে।	
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	জানুয়ারির ১ম সপ্তাহ থেকে মার্চের ২য় সপ্তাহ	মার্চের ২য় সপ্তাহ
মরিচের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	২৫.৫	
ফলন (টন/হেক্টর)	কাঁচা মরিচ : ১৪ শুকনা মরিচ: ৩.১৫	৩.৫০

বরেন্দ্র অঞ্চলে স্বল্পচাষ ও মালচ্ ব্যবহার করে মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণের মাধ্যমে টমেটো উৎপাদন

উঁচু বরেন্দ্র এলাকা ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-২৬ এর অনুরূপ এলাকায় মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও জৈব পদার্থের পরিমাণ কম থাকার কারণে শুষ্ক মৌসুমে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে মাটি তার আর্দ্রতা হারায় ও শস্য উৎপাদন ব্যহত হয়। স্বল্পচাষ ও মালচ্ ব্যবহারে বাষ্পীভবন রোধ ও মাটির আর্দ্রতা সংরক্ষণ করে টমেটোর উৎপাদন করা যায়। স্বল্প চাষ (একটি চাষ) ও প্রতি হেক্টরে ৫ টন খড়ের মালচ্ ব্যবহার করে টমেটোর উৎপাদন প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে শতকরা ২৭ ভাগ বৃদ্ধি করা সম্ভব। ৩০ ভাগ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন খরচ প্রায় ২৩ ভাগ কমানো সম্ভব হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসলের বিবরণ
ফসল	টমেটো
জাত	ভিএল-৬৪২
বীজ হার (গ্রাম/হেক্টর)	২০০
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৬০×৫০
বপন/রোপণের সময়	সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	
ইউরিয়া	২৮২
টিএসপি	১৫০
এমওপি	৮৫
জিপসাম	৭৫
জিংক সালফেট	৩
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে লাগানোর যথাক্রমে ১০, ২৫ ও ৪০ দিন পর সেচ দিয়ে রিং পদ্ধতিতে প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহ হতে ফেব্রুয়ারির ২য় সপ্তাহ
ফলন (টন/হেক্টর)	৫৩.৭৫১.০০

পানিকচু উৎপাদনে কাটুই পোকার দমন ব্যবস্থাপনা

বগুড়া ও জয়পুরহাট জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় কৃষকেরা ব্যাপকভাবে পানি কচুর চাষ করে থাকে। কাটুই পোকা একটি অনিষ্টকারী সর্বভুক পতঙ্গ যা কচুর লতি ও পাতায় আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষতি করে থাকে। এই পোকার কীড়া (ক্যাটারপিলার) প্রথমে পাতায় ও পরবর্তীতে লার্ভা লতিতে আক্রমণ করে। রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হওয়ায় সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনার (আইপিএম) মাধ্যমে এই পোকা সহজেই দমন করা যায়। ফেরোমোন ফাঁদ + কাটুই পোকার ডিম ও লার্ভা সংগ্রহ + এসএনপিভি (SNPV) @ ০.২ গ্রাম/লিটার পানিতে মিশিয়ে ২-৩ বার ব্যবহার করে এই পোকা সফলভাবে দমন করা সম্ভব। ফেরোমোন ফাঁদ মাটি থেকে দুই ফুট উচ্চতায় ২০ মিটার × ২০ মিটার দূরত্বে স্থাপন করতে হবে। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে লতি ও রাইজোম এর ফলন যথাক্রমে ১৫.৬ এবং ২০.৬ টন প্রতি হেক্টরে পাওয়া সম্ভব।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ
ফসল	পানি কচু
জাত	বারি পানি কচু-২
চারার সংখ্যা/হেক্টর	৩৭-৩৮ হাজার চারা
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৬০×৪৫
বপন/রোপণের সময়	ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহে
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	
ইউরিয়া	৩০০
টিএসপি	১৫০
এমওপি	৩০০
জিপসাম	১০০
জিংক সালফেট	১০
বরিক এসিড	১০
গোবর	৫ টন
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট, বরিক এসিড এবং অর্ধেক এমওপি সার জমি তৈরির সময় শেষ চাষের আগে প্রয়োগ করতে হবে। চারা রোপণের ১.৫-২ মাস সময়ে অর্ধেক এমওপি এবং ইউরিয়ার এক ষষ্ঠাংশ ছিটিয়ে দিতে হবে। বাকি পাঁচ ভাগ ইউরিয়া সার সমান কিস্তিতে ১৫ দিন পর পর জমিতে প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	জানুয়ারি শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের ২য় সপ্তাহ পর্যন্ত লতি সংগ্রহ করা যায়।
ফলন (টন/হেক্টর)	লতি - ১৫.৬৩ রাইজোম - ২০.৬৩

রোপা আমন ধানের পর শীতকালীন মিষ্টি কুমড়ার চাষ: দক্ষিণাঞ্চলের একটি লাগসই প্রযুক্তি

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলবর্তী জেলা সমূহ যেখানে শীতের সময় আমন ধান কাটার পর জমি পতিত অবস্থায় থাকে এবং মাটির আর্দ্রতা দ্রুত কমে যেতে থাকে সে সমস্ত এলাকায় যেখানে অন্য ফসল চাষ প্রায় অসম্ভব সেখানে আমন ধান কর্তনের পর সাথী ফসল হিসেবে মিষ্টি কুমড়া সফলভাবে চাষ করা যেতে পারে। ধান পাকার এক মাস পূর্বে বসতবাড়িতে পলিব্যাগে বা কচুরীপানার মণ্ডে চারা উৎপাদন করে ধানকাটার পরপরই মাদায় চারা রোপণ করা হয় অথবা ধান কাটতে বেশি দেরি হলে ধান কাটার ৮-১০ দিন পূর্বে ধান ক্ষেতের সারির মাঝে ২ মিটার অন্তর অন্তর ছোট মাদা (heap) তৈরি করে চারাগুলো রোপণ করতে হবে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের সরেজমিন গবেষণা বিভাগ, পটুয়াখালীর বিজ্ঞানীগণ দীর্ঘ তিন বছর বহুস্থানিক গবেষণা এলাকা (এমএলটি সাইট), কলাপাড়া এবং খামার পদ্ধতি গবেষণা ও উন্নয়ন এলাকা (এফএসআরডি সাইট), রাজাখালী, দুমকী এবং পটুয়াখালীতে গবেষণা চালিয়ে রোপা আমন ধান সংগ্রহের পর মিষ্টি কুমড়া উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রযুক্তিটি এলাকার কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসলের বিবরণ
ফসল	মিষ্টি কুমড়া
জাত	বারি মিষ্টি কুমড়া-১, বারি মিষ্টি কুমড়া-২ এবং বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া-১
বীজ বপনের সময়	আমন ধান কাটার এক মাস পূর্বে
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৫-৬
পলি ব্যাগে চারা তৈরি	চারা উৎপাদনের জন্য ৮ সেমি/১০ সেমি বা এর চেয়ে কিছুটা বড় আকারের পলিব্যাগে ব্যবহার করা যায়। আমন ধান কর্তনের এক মাস পূর্বে অর্থাৎ নভেম্বর মাসের শুরুতে বা শেষে বসতবাড়ির আঙ্গিনায় ছোট পলিব্যাগে মাটি ও গোবর সমপরিমাণ মিশিয়ে বীজ বপন করতে হবে। এছাড়া কচুরিপানা পচিয়ে বড় আকারে মণ্ড তৈরি করে তাতে বীজ বপন করে চারা উৎপাদন করা যায়। পলিব্যাগের ক্ষেত্রে প্রথমে গোবর ও মাটি সমপরিমাণে মিশিয়ে মাটি তৈরি করে নিতে হবে। মাটিতে চারা গজানোর জন্য জো' নিশ্চিত করে প্রতি ব্যাগে দুইটি করে বীজ বপন করতে হবে। বীজগুলো ১ ইঞ্চি মাটির গভীরে পুঁতে মাটি চাপা দিতে হবে। মাটিতে জো' না থাকলে পানি দিয়ে জো' তৈরি করে নিতে হবে। কুমড়া বীজের খোসা বেশ শক্ত। তাই বপন করার পূর্বে বীজগুলো ১০ -১২ ঘন্টা ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে নিতে হবে।
চারার সংখ্যা/হেক্টর	৩৭-৩৮ হাজার
বপন/রোপণ দূরত্ব (মি.)	২×২
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	
গোবর	৫ টন
ইউরিয়া	১৭৫
টিএসপি	১৭৫
এমওপি	১৭৫
জিপসাম	১১০
জিংক সালফেট	১০
বরিক এসিড	১০
ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড	২০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	ইউরিয়া ব্যতীত অন্যান্য সকল সার চারা রোপণের ৫-৭ দিন পূর্বে মাদায় প্রয়োগ করে মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার সমান চার কিস্তিতে যথাক্রমে ১৫, ৩৫, ৫৫ এবং ৭৫ দিন পর গাছের চারপাশে প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	পরাগায়নের ২০-২৫ দিনের মধ্যে কাঁচা ফল সংগ্রহ করা যায়। পাকা ফল ফলের বোঁটা খড়ের রং ধারণ করতে এবং ফলের রং হলুদাভ হলে সংগ্রহ করতে হবে।
ফলন (টন/হেক্টর)	৩০-৪০ (গাছ প্রতি ১৫-২০ টি ফল সংগ্রহ করা যায়)।

সরিষা-পাট-রোপা আমন: একটি উন্নত ফসলবিন্যাস

প্রচলিত খেসারী-পাট-রোপা আমন ফসল বিন্যাসের পরিবর্তে উন্নত এ ফসল বিন্যাসে সাথী ফসল হিসেবে খেসারীর পরিবর্তে বারি সরিষা-১১ জাত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে ধানের সমতুল্য ফলন ৯% পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। বারি সরিষা-১১ এর ফলন ১.৭৫ টন/হেক্টর পাওয়া গেছে। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণা চালিয়ে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ		
ফসল	সরিষা	পাট	রোপা আমন
জাত	বারি সরিষা-১১	০-৯৮৯৭	বিনাধান-৭
বপন/রোপণের সময়কাল	নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ	মে মাসের ১ম সপ্তাহ	আগস্ট মাসের ২য় সপ্তাহ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৬	৬	৫০
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৩০ সেন্টিমিটার × অবিরত সারি	ছিটিয়ে বোনা	২০×১৫
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	১৫০	২৪০	২২০
টিএসপি	১৭০	১৫০	১৫০
এমওপি	৮৫	৯০	৭০
জিপসাম	১৭০	১০৫	৭৫

বিষয়	বিবরণ		
জিংক সালফেট	৬	০	১৪
বরিক এসিড	৬	০	০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	অর্ধেক ইউরিয়া এবং সম্পূর্ণ টিএসপি ও পটাশ, জিপসাম, জিংক সালফেট ও বোরন সার জমি শেষ চাষের সময় এবং বাকী অর্ধেক ইউরিয়া বীজ বপনের ২০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	সম্পূর্ণ টিএসপি, পটাশ, জিপসাম, জিংক বোরন সার এবং এক-তৃতীয়াংশ ইউরিয়া জমি শেষ চাষের সময় এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া সমান ২ কিস্তিতে বীজ বপনের ২০-২৫ এবং ৪০-৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	সম্পূর্ণ টিএসপি, পটাশ এবং জিপসাম জমি শেষ চাষের সময় এবং ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
আন্তঃপরিচর্যা	আগাছা দমন, সেচ ও অন্যানা উদ্ভিদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রয়োজনমতো করতে হবে।		
ফসল জীবনকাল (দিন)	১১১	৯০	৯৬
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ	আগস্টের ১ম সপ্তাহ	নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ
ধানের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	১৫.৪২		
ফলন (টন/হেক্টর)	১.৮	৩.৩	৪.৭

সরিষা-রোপা আউশ-রোপা আমন: একটি উন্নত ফসলধারা

সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১১ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণা চালিয়ে নোয়াখালী অঞ্চলের প্রচলিত পতিত-রোপা আউশ-রোপা আমন ফসল ধারায় সরিষা অন্তর্ভুক্ত করেছে। রোপা আউশ ও রোপা আমন ধান কাটার পর রবি মৌসুমে বারি সরিষা-১৫ অন্তর্ভুক্ত করায় ধানের সমতুল্য ফলন শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে সরিষার ফলন প্রায় ১২০০ কেজি/হেক্টর পাওয়া গেছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ		
ফসল	সরিষা	রোপা আউশ	রোপা আমন
জাত	বারি সরিষা-১৫	ব্রিধান ২৭	ব্রিধান ৪০
বপন/রোপণের সময়কাল	নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের ১ম সপ্তাহ	এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ	আগস্টের ২য় সপ্তাহ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৮	৫০	৫০
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৩০ সেন্টিমিটার × অবিরত সারি	২৫×১৫	২৫×১৫
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	২০০	১৭৫	১১৫
টিএসপি	১৫০	৮০	৯০
এমওপি	৭০	৬০	৬৫
জিপসাম	০	০	০
জিংক সালফেট	০	০	০
বরিক এসিড	১২	০	০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	অর্ধেক ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সার জমি শেষ চাষের সময় এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া বীজ বপনের ২২-২৪ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	সম্পূর্ণ টিএসপি ও পটাশ সার জমি তৈরি সময় এবং ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের ১০, ৩০ এমবং ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	সম্পূর্ণ টিএসপি ও পটাশ সার জমি তৈরি সময় এবং ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের ১০, ৩০ এমবং ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।
আন্তঃপরিচর্যা	অল্টারনোরিয়া লীফ ব্লাইট দমনের জন্য কীটনাশক ও ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করা যেতে পারে।	আগাছা দমন, সেচ ও অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা সময়মতো করতে হবে।	আগাছা দমন, সেচ ও অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা সময়মতো করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	৮৫	১১০	১১০
ফলন (টন/হেক্টর)	১.২	৩.২০	৩.৮
ধানের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	৮.৮৫		

খুলনা অঞ্চলে ভুট্টার সাথে লালশাক ও পালংশাকের আন্তঃফসল চাষ

দীর্ঘ মেয়াদী ফসল ভুট্টার সারির মাঝে দুই সারি লালশাক অথবা পালংশাক এর আন্তঃফসল চাষে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। এ সময়ে মাটির লবণাক্ততা কম থাকায় (৩-৫ ডিএস/মিটার) বীজ গজাতে কোন সমস্যা হয় না। লালশাক ও পালংশাকের সাথে ভুট্টার সমতুল্য ফলন যথাক্রমে ১০.৫০ এবং ৯.৪০ টন/হেক্টর পাওয়া গেছে। একক ভুট্টা চাষের তুলনায় লালশাক ও পালংশাকে আন্তঃফসল চাষে যথাক্রমে শতকরা ৩১.২৫ এবং ১৭.৫০ ভাগ আয় বৃদ্ধি পায়। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কৃষকদের মাঠে গবেষণা চালিয়ে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ		
ফসল	ভুট্টা	লালশাক	পালংশাক
জাত	বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯	বারি লাল শাক-১	স্থানীয় জাত
বপন/রোপণের সময়কাল	ডিসেম্বর	ডিসেম্বর	ডিসেম্বর
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	২৫-৩০	২-২.৫	১২-১৫
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৬০×২৫	ভুট্টার সারির মাঝে ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ২ সারি লাল শাক	ভুট্টার সারির সাথে ২০ সেন্টিমিটার দূরত্বে ২ সারি পালংশাক
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	৫০০	-	-
টিএসপি	২৪৫	-	-
এমওপি	২০০	-	-
জিপসাম	২৮০	-	-
জিংক সালফেট	১১	-	-
বোরণ	৮	-	-
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	শুধুমাত্র ভুট্টায় সার প্রয়োগ করতে হবে। বীজ বপনের সময় সকল প্রকার সার এবং এক - তৃতীয়াংশ, ইউরিয়া প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া সমান ২ কিস্তিতে বীজ বপনের ৩০ এবং ৬০ দিন পর পার্শ্বপ্রয়োগ করতে হবে। লালশাক ও পালংশাকে অতিরিক্ত সার প্রয়োগের প্রয়োজন নাই।		
আন্তঃপরিচর্যা	২ বার আগাছা দমন এবং অলবণাক্ত পানি দিয়ে বীজ বপনের ১৫.৩০ এবং ৬০ দিন পর ৩টি সেচ দিতে হবে।	আগাছা দমন এবং বীজ বপনের ১৫ দিন পর অলবণাক্ত পানি দিয়ে সেচ দিতে হবে।	আগাছা দমন এবং বীজ বপনের ১৫ দিন পর অলবণাক্ত পানি দিয়ে সেচ দিতে হবে।
উদ্ভিদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা	বপনের পূর্বে প্রতি কেজি ধানের জন্য ২.৫ -৩ গ্রাম প্রোভেক্স ২০০ দ্বারা বীজ শোধন করতে নিতে হবে। ভুট্টার চারা অবস্থায় কাটুই পোকা দমনের জন্য ডারসবান ২০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ৫ মিলিলিটার মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। ভুট্টার পাতার ব্লাইট রোগ দমনের জন্য টিল্ট-২৫০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলিলিটার মিশিয়ে ২ -৩ বার স্প্রে করা যেতে পারে।		
ফসল সংগ্রহের সময়	এপ্রিলের ২য় থেকে শেষ সপ্তাহ	জানুয়ারির ২য় থেকে শেষ সপ্তাহ	জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ
ফলন (টন/হেক্টর)	৮.০	৭.৫	৬.০
ভুট্টার সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	১৪		
জীবন কাল (দিন)	১৫০	৩০	৪০

রোপা আমন-পতিত-মুগডাল: খুলনা অঞ্চলের একটি উন্নত ফসল বিন্যাস

প্রচলিত রোপা আমন-পতিত ফসল বিন্যাসের পরিবর্তে রোপা আমন-পতিত-মুগডাল (বারি মুগ-৬) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারির শেষ হতে মার্চের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত মুগ বীজ বপন করা হয়। (মাটির লবণাক্ততা ৪-৬ ডিএস/মি)। বারি মুগ-৬ এর ফলন ১.৩ টন/হেক্টর এবং ধানের সমতুল্য ফলন ৪.৩৩ টন/হেক্টর পাওয়া সম্ভব। এতে ফসলের নিবিড়তা ও মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৩ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত কৃষকদের মাঠে গবেষণা করে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ	
ফসল	রোপা আমন ধান	মুগ
জাত	ব্রিধান ২৩	বারি মুগ-৬
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৩০	৩০
বপন/রোপণ সময়	আগস্টের ১ম সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারির শেষ হতে মার্চের ১ম সপ্তাহ
বীজের হার (কেজি/হেক্টর)	২৫-৩০	৪০-৪৫
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	২৫ × ১৫	২-৩ সেমি × অবিরত সারি
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)		
ইউরিয়া	১৬৫	৫০
টিএসপি	৬০	৮০
এমওপি	৮৫	৩০
জিপসাম	৬৫	০
জিংক সালফেট	৮	০
বরিক এসিড	০	০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সম্পূর্ণ টিএসপি, পটাশ ও জিপসাম জমি শেষ চাষের সময় এবং ইউরিয়া সমান ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের ১০, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ছাড়া বাকি সব সার জমি তৈরির সময় এবং ইউরিয়া চারা রোপণের ১০,৩০ এবং ৪৫ দিন পর সমান ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে।	সকল সার জমি শেষ চাষের সময় দিতে হবে।
আন্তঃপরিচর্যা	২ বার আগাছা দমন করতে হবে।	আগাছা দমন এমং বীজ বপনের ২০-২৫ দিনের (ফুল ফোটা পর্যায়) মধ্যে অলবণাক্ত পুকুরের পানি দিয়ে সেচ দিতে হবে।
ফসল সংরক্ষণ	প্রতি কেজি বীজের জন্য প্রোভেক্স ২০০ @ ২.৫-৩.০ গ্রাম মিশিয়ে বীজ শোধন করতে হবে। স্টেমবোরার দমনের জন্য লিবাসিড/ সুমিথিয়ন/ ডায়াজিনন প্রতি লিটার পানিতে ১.৫ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে। ধানের ব্লাস্ট রোগ দমনের জন্য নাটিভো/ট্রুপার এবং ব্রাউন স্পট রোগ দমনের জন্য ফলিকুর প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলিমিটার মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।	এসিড দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি এবং বোরার দমনের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলিলিটার মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে	এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের ১ম সপ্তাহ
ফসলের জীবনকাল (দিন)	১৪৫	৬৫
ফলন (টন/হেক্টর)	৪.৬	১.৩
ধানের সমতুল ফলন (টন/হেক্টর)	৮.২১	

বরেন্দ্র অঞ্চলে গম-মুগডাল-রোপা আমন ফসল বিন্যাসের জন্য সার সুপারিশমালা

রাজশাহী উঁচু বরেন্দ্র এলাকার ধাপযুক্ত ধূসর বর্ণের মাটি কম জৈব পদার্থযুক্ত এবং নিম্ন মাত্রায় নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম ও সালফার বিদ্যমান। মাটির নিম্ন উর্বরতা, সুষম সার এবং জৈব পদার্থ ব্যবহার না করার কারণে ফসলের ফলন খুব কম। মৃত্তিকা বিশ্লেষণ নির্ভর সারের মাত্রা + ২৫% এন-পি-কে সার প্রয়োগে ফলন বাড়ে এবং কৃষক অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়। এতে ধানের সমতুল্য ফলন ১৬.০১ টন/হেক্টর পাওয়া সম্ভব। উন্নত এ ফসল বিন্যাসে মুগডাল অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মাটির উর্বরতা রক্ষা হয়। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ উঁচু বরেন্দ্র এলাকায় ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ		
ফসল	গম	মুগবীন	রোপা আমন ধান
জাত	বারি গম-২৬	বারি মুগ-৬	বিনা ধান ৭
বপন/রোপণের সময়কাল	নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ	মার্চের শেষ সপ্তাহে	জুলাই এর ২য় সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	১২০	৩০	৩০
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	২০ × অবিরত সারি	৩০ × অবিরত সারি	২০ × ১৫
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	৩০৫	৫২	১৫২
টিএসপি	১৬৫	১০০	৪০
এমওপি	১৪২	৪০	২০
জিপসাম	৬৩	-	৩৮
জিংক সালফেট	৬	-	৪.২
বরিক এসিড	৬	-	-
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	ইউরিয়া সারের দুই তৃতীয়াংশ এবং অন্যান্য সকল সার শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।	সকল সার জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া ছাড়া অন্যান্য সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করে হবে। ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে চারা রোপণের ১৫, ৩০, এবং ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
আন্তঃপরিচর্যা	প্রধান মূল গজানোর সময় অবশ্যই একটি সেচ দিতে হবে।	বপনের ২০ দিনের মধ্যে আগাছা দমন ও চারা পাতলা করতে হবে।	প্রয়োজন অনুযায়ী আগাছা দমন ও সেচ প্রয়োগ করতে হবে।
জীবনকাল (দিন)	১২০	৭৫	১০০
ফসল সংগ্রহের সময়	মার্চের ২য় থেকে ৩য় সপ্তাহ	জুনের ১ম থেকে ৩য় সপ্তাহ	অক্টোবরের ৩য় সপ্তাহ থেকে শেষ সপ্তাহ
ধানের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	১৬.০১		
ফলন (টন/হেক্টর)	৪.১	১.৫	৪.৫

বরেন্দ্র অঞ্চলে রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে খেসারী চাষ

রোপা আমন কাটার পর বরেন্দ্র অঞ্চলের মাটির আর্দ্রতা দ্রুত কমে যায়। আমন ধান কাটার ১৫ দিন পূর্বে জমির অবশিষ্টাংশ আর্দ্রতা ব্যবহার করে সাথী ফসল হিসেবে খেসারী চাষে ফলন শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এতে জমি চাষের খরচ কমে এবং ফসলের সামগ্রীক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায়। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ উঁচু বরেন্দ্র এলাকায় ২০১২ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণার মাধ্যমে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ
ফসল	খেসারী
জাত	বারি খেসারী -১
বপন সময়	রোপা আমন ধান কাটার ১৫ দিন পূর্বে খেসারী ছিটিয়ে বুনতে হবে।
বপন পদ্ধতি	রসুনের কোয়া রোপণ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৪৫
বপন দূরত্ব (সেমি)	
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর	
ইউরিয়া	৩৫
টিএসপি	৭৫
এমওপি	৩০
জিপসাম	৩২
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	সকল সার জমি শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল সংরক্ষণ ব্যবস্থা	রোভরাল ৫০ ডব্লিউ পি ফুল আসার পর তিনবার স্প্রে করা যেতে পারে।
ফসল সংগ্রহের সময়	মধ্য-মার্চ
ধানের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	৮.০০
ফলন (টন/হেক্টর)	১.৫

রাজশাহী অঞ্চলে আলু-ভুট্টা-রোপা আমন ধান ফসল বিন্যাসে সার ব্যবস্থাপনা

রাজশাহী অঞ্চলে আলু-ভুট্টা-রোপা আমন ধান ফসল বিন্যাসে অসম সার ব্যবহার একটি প্রধান সমস্যা। এই অঞ্চলে সুষম সারের তুলনায় ২ থেকে ৩ গুন বেশি সার ব্যবহার করে থাকে। সুষম মাত্রার সার ব্যবহার করে ফলন শতকরা ১৭.১৭ ভাগ বাড়ানো সম্ভব হয়েছে। এতে ধানের সমতুল্য ফলন ৩০.৩৫ টন/হেক্টর পাওয়া সম্ভব হয়েছে সাথে সাথে সারের খরচ কমায় ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা পায়। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১২ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত রাজশাহী অঞ্চলে কৃষকের মাঠে গবেষণা চালিয়ে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ		
ফসল	আলু	ভুট্টা	রোপা আমন ধান
জাত	বারি আলু-৭	বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯	ব্রি ধান ৩৩
বপন/রোপণের সময়কাল	নভেম্বরের ৩য় সপ্তাহ	মার্চের ২য় থেকে ৩য় সপ্তাহ	জুলার এর শেষ সপ্তাহ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	১৫০০	২১	৩০
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৬০ ×২০	৬০ ×২০	৬০ ×১৫
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	৪০২	৬৯০	১৮০
টিএসপি	১৬০	১৮৫	৫৫
এমওপি	২৬৪	১২৬	৫০
জিপসাম	১৭০	২৩৮	৮১
জিংক সালফেট	০	০	৩
বরিক এসিড	১২	০	০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকি ইউরিয়া বীজ বপনের ৩৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	অর্ধেক ইউরিয়া ও অন্যান্য সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকি ইউরিয়া ভুট্টা ৬ পাতা ও ১০ পাতা অবস্থার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া বাদে সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় এবং সমান তিন কিস্তিতে লাগানোর ১৫, ৩০ ও ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
জীবনকাল (দিন)	১০১	১০৫	৯৪
ফসল কাটার সময়	মার্চের ১ থেকে ৩য় সপ্তাহ	জুনের ২য় সপ্তাহ	অক্টোবরের ৩য় সপ্তাহ
ধানের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	৩০.৩৫		
ফলন (টন/হেক্টর)	২৮.৫	৮.৫	৪.৬

পাবনা অঞ্চলে খড়ের মালচ্ ব্যবহার করে বিনাচাষে রসুন উৎপাদন

বিনা চাষে হেক্টরপ্রতি ৩ টন/হেক্টর খড়ের মালচ্ প্রয়োগ দীর্ঘ সময় জমির আর্দ্রতা ধরে রাখা যায় এবং জমি চাষের খরচ কমে। এতে রসুনের উৎপাদন শতকরা ৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়। রসুন উৎপাদনে পাবনা অঞ্চলে এটি একটি লাভজনক প্রযুক্তি। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৫ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত কৃষকের মাঠে গবেষণা চালিয়ে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসলের বিবরণ
ফসল	রসুন
জাত	বারি রসুন-২
বপন সময়	নভেম্বর প্রথম সপ্তাহে
বপন পদ্ধতি	রসুনের কোয়া রোপণ
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	৪০০
বপন দূরত্ব (সেমি.)	১০ ×১০
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	
ইউরিয়া	২১৭
টিএসপি	২৭০
এমওপি	৩৩৫
জিপসাম	১২৫
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং অন্যান্য সকল সার বীজ বপনের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া যার সমান দুইভাগে একমাস পর পর সেচের আগে প্রয়োগ করতে হবে।

বিষয়	ফসলের বিবরণ
আন্তঃপরিচর্যা	জানুয়ারির ২য় সপ্তাহে একবার এবং ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে একবার আগাছা দমন করতে হবে। ডিসেম্বর ২য় সপ্তাহে এবং জানুয়ারি ৩য় সপ্তাহে মোট ২টি সেচ দিতে হবে। ছত্রাক দমনে রোভরাল স্প্রে করা যেতে পারে।
ফসল সংগ্রহের সময়	মার্চের শেষ সপ্তাহে
ফলন (টন/হেক্টর)	১৪.১২

রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে গমের চাষ

রোপা আমন ধানের জমির অবশিষ্ট আর্দ্রতা ব্যবহার করে সাথী ফসল হিসেবে গম চাষ জমি তৈরির খরচ ও সময় বাঁচায় এবং সামগ্রীক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। রোপা আমন ধানের সাথে সাথী ফসল হিসেবে আগাম গম বীজ বপন করলে দানা গঠনের সময় উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষতিকর প্রভাব পরিহার করা যায় এবং ফলন বৃদ্ধি পায়। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৩ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত পাবনা অঞ্চলে কৃষকের মাঠে গবেষণা চালিয়ে এ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ
ফসল	গম
জাত	বারি গম-২৬
বপন সময়	নভেম্বর শুরু‍তে রোপা আমন ধান কাটার ১০ -১৫ দিন পূর্বে
বপন পদ্ধতি	ছিটিয়ে বোনা
বীজ হার (কেজি/হেক্টর)	১৫০
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	
ইউরিয়া	১৮০
টিএসপি	১৪০
এমওপি	৪০
জিপসাম	১৩৮
জিংক	৮.৫
বরিক এসিড	১৮
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার গম বীজ বোনার সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সার বীজ বপনের ১২ -১৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়	মধ্য-মার্চ
ফলন (টন/হেক্টর)	৪.৩
ধানের সমতুল্য ফলন (টন/হেক্টর)	৮.৩

চার ফসল ভিত্তিক ফসলধারা

১. রোপা আমন-সরিষা-মুগ-রোপা আউশ

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি ইউনিট আবাদি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। এক ফসলি, দুই ফসলি ও তিন ফসলি জমিতে চারটি ফসল আবাদ করে ফসলের

নিবিড়তা ১৯১% থেকে ৪০০% এ উন্নীত করা সম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বিনা উদ্ভাবিত স্বল্পমেয়াদী 'বিনা ধান-৭', বারি উদ্ভাবিত স্বল্পমেয়াদী সরিষার জাত 'বারি সরিষা-১৫', মুগডালের স্বল্পমেয়াদী জাত 'বারি মুগ-৬' এবং আউশের স্বল্পমেয়াদী জাত 'পারিজা' সমন্বয় করে রোপা আমন-সরিষা-মুগডাল-রোপা আউশ ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন করেছে। এই ফসল বিন্যাস অবলম্বন করে কৃষক অধিক ফলন পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এছাড়া মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই ফসল বিন্যাস যথেষ্ট অবদান রাখবে। মোটকথা কৃষকের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিশেষ করে নারী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই ফসল বিন্যাস অবদান রাখবে।

ফসলধারা : রোপা আমন - সরিষা - মুগ - রোপা আউশ

তিন বছর ব্যাপী (২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪) রোপা আমন-সরিষা-মুগডাল-রোপা আউশ ধান পরীক্ষাটি সাফল্যজনক ভাবে সম্পন্ন করা হয়। রোপা আমন-সরিষা-মুগডাল-রোপা আউশ ফসল ধারাটি রোপা আমন-পতিত-বোরো-পতিত ফসল ধারার সঙ্গে তুলনামূলক পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ সালে উন্নত পদ্ধতিতে এই ফসল ধারায় ধানের সাদৃশ্য ফলন (Rice equivalent yield) ২১.১৭ টন/হেক্টর এবং কৃষকের ফসল ধারায় সাদৃশ্য ফলন ১৪.৩০ টন/হেক্টর। এই ফসল ধারায় প্রতি হেক্টরে প্রতিবছর মোট আয় ৩,১২,৪৪৪ টাকা, মোট ব্যয় ১,০৭,৯৯২ টাকা। মোট প্রান্তিক আয় ২,০৫,৫২৭ টাকা এবং মোট লাভ এবং খরচের অনুপাত ২.৮৯ঃ১। কিন্তু কৃষকের ধারায় প্রতি হেক্টরে আয় ১,৯৬,৮৭৫ টাকা, খরচ ১,১০,৬৫৫ টাকা, প্রান্তিক আয় ৮৬,২২০ টাকা এবং লাভ খরচের অনুপাত ১.৭৮ঃ১।

রোপা আমন-সরিষা-মুগ ডাল-রোপা আউশ ফসল ধারায় (২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪) তিন বছরের গড় ফলন, আয় ব্যয় ও লাভ খরচের অনুপাত।

ফসল ধারা	মোট উৎপাদন (টন/হে.)	মোট আয় (টাকা/হে.)	মোট ব্যায় (টাকা/হে.)	প্রান্তিক আয় (টাকা/হে.)	লাভ খরচের অনুপাত
রোপা আমন-সরিষা-মুগডাল-রোপা আউশ	২১.১৭	৩,১২,৪৪৪	১,০৭,৯৯২	২,০৫,৫২৭	২.৮৯ঃ১
রোপা আমন - পতিত - বোরো ধান- পতিত	১৪.৩০	১,৯৬,৮৭৫	১,১০,৬৫৫	৮৬,২২০	১.৭৮ঃ১

রোপা আমন-সরিষা-মুগ ডাল-রোপা আউশ ধান ফসলধারায় অন্তর্ভুক্ত ফসলের নাম ও চাষের সময়।

	ফসলের নাম (জাতের নাম)			
	রোপা আমন - (বিনা ধান-৭)	সরিষা - (বারি সরিষা-১৫)	মুগডাল - (বারি মুগ-৬)	রোপা আউশ- (পারিজা)
ফসল চাষের সময় (বীজ তলার সময় ছাড়া)	জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে চারা রোপণ-অক্টেবরের ৩য় সপ্তাহে ফসল কর্তন (৯০ দিন)	অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (৮৫ দিন)	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহ (৬৫ দিন)	মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (৭০ দিন)

রোপা আমন-সরিষা-মুগ-রোপা আউশ ফসল ধারাটি কৃষকের ফসল ধারা (রোপা আমন-পতিত-বোরো-পতিত) থেকে অতিরিক্ত আয় পাওয়া গেছে ১,১৯,৩০৭ টাকা। সুতরাং বাংলাদেশে যে সমস্ত এলাকায় রোপা

আমন-পতিত-বোরো-পতিত ফসল ধারা রয়েছে সেই সব এলাকায় রোপা আমন-সরিষা-মুগ-রোপা আউশ ফসলধারা প্রচলন করা সম্ভব অর্থাৎ চার ফসল ভিত্তিক ফসলধারাসমূহ কৃষিতাত্ত্বিকভাবে চাষ করা সম্ভব, এতে করে ফসলের নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে আমাদের দেশে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে। ফলে ফসলধারাটি আগামীতে ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমি থেকে বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদনের একটি অন্যতম প্রযুক্তি হিসেবে কাজ করবে।

রোপা আমন-সরিষা-মুগডাল-রোপা আউশ ফসল ধারার ফসল চাষ পঞ্জিকা।

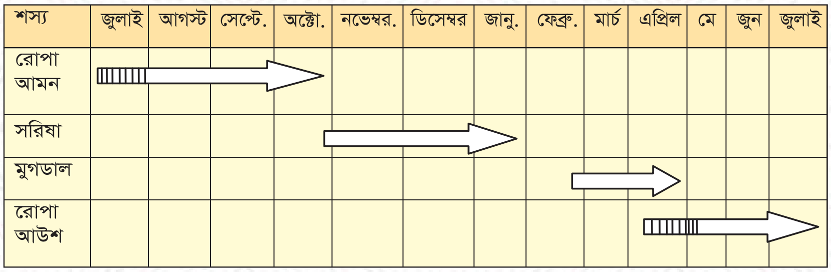

উৎপাদন প্রযুক্তি

রোপা আমন-সরিষা-মুগডাল-রোপা আউশ ধানের সংক্ষিপ্ত চাষ পদ্ধতি।

	আমন ধান	সরিষা	মুগডাল	আউশ ধান
মাটি ও জমি	দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাঝারী উঁচু জমি।	দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাঝারী উঁচু জমি।	উঁচু, বেলে দোআঁশ বা পলি দোআঁশ জমি।	দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটি মাঝারী উঁচু ও মাঝারী নিচু।
বীজ বপন	জুলাই প্রথম সপ্তাহ বীজতলায় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।	অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের ১ম সপ্তাহে বীজ বপন (কার্তিক মাসের ২য় - ৩য় সপ্তাহ)।	ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে চৈত্র মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত অর্থাৎ ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত।	এপ্রিলের ১০-১৫ তারিখ বীজতলায় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়।

	আমন ধান	সরিষা	মুগডাল	আউশ ধান
চারা রোপণের সময়	জুলাই মাসের শেষ (শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয়) সপ্তাহে চারা রোপণ।	-	-	মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ।
সার (কেজি/হেক্টরে)	১৫০ঃ ১১০ঃ ৫০ঃ ৫০ঃ ১ ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ জিপসামঃ দস্তা।	২০০ঃ১৫০ঃ৭০ ঃ১২০ঃ১ঃ০.৫ ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃজিপসামঃ জিংকঅক্সাইডঃ বোরিক এসিড।	৪৫ঃ ১০০ঃ ৬০ ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপি।	১৫০ঃ ৭৫ঃ ৭৫ঃ ৩৭৫০ ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপিঃ গোবর।
সার প্রয়োগ	ইউরিয়া সমান তিনভাগে ভাগ করে চারা রোপণের ৭, ২২ ও ৪২ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হয়।	অর্ধেক ইউরিয়া শেষ চাষের আগে এবং বাকি ইউরিয়া চারা গজানোর ২০-২২ দিন পর অর্থাৎ ফুল আসার আগেই প্রয়োগ করতে হবে।	শেষ চাষের আগে সকল সার প্রয়োগ করতে হবে	ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে চারা রোপণের ১০-১৫ দিনে প্রথম উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ৩০-৩৫ দিনে দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
বীজের হার	২৫-৩০ কেজি/হেক্টর	৬-৭ কেজি/হেক্টর	৩৫-৪০ কেজি/হেক্টর	২৫-৩০ কেজি/হেক্টর

	আমন ধান	সরিষা	মুগডাল	আউশ ধান
দূরত্ব	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি (২০ সেমি) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি)।	এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ৩০ সেমি। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫ সেমি। ছিটিয়ে বীজ বোনা যায়।	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৩০ সেমি	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি) ।
ফসলের পরিচর্যা	চারা রোপণের পর ১০/১৫ দিন অন্তর নিড়ানী অথবা হাত দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।	চারা গজানোর ১০-১২ দিনে প্রথমবার এবং ২০-২৫ দিনে দ্বিতীয়বার নিড়ানী এবং গাছ পাতলা করতে হবে (৫০-৬০টি গাছ প্রতি বর্গমিটারে)।	অঙ্কুরোদগমের ২০-২৫ দিন পর অবশ্যই আগাছা দমন করতে হবে	চারা রোপণের পর ১০/১৫ দিন অন্তর নিড়ানী অথবা হাত দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।
সেচ প্রয়োগ	চারা রোপণের পর থেকে ক্ষেতে ৩-৫ সেমি এবং গাছ বড় হবার সাথে সাথে পানির মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে।	বপন করার ১৮-২০ দিন পর এবং শুঁটি হওয়ার সময় ৫০-৫৫ দিনে জমিতে সেচ দিতে হবে।	জমিতে অপর্যাপ্ত রস থাকে তাহলে বপনের পূর্বে একটি হালকা সেচ দিলে ভাল অঙ্কুরোদগম ও ফলন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়।	ধানের চারা রোপণের পর জমিতে ১০-১২ দিন পর্যন্ত ছিপছিপে পানি রাখতে হবে, থোড় অবস্থা থেকে দানার দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।
নিষ্কাশন	অধিক পানি জমে গেলে মাঝে মাঝে পানি বের করে দিয়ে জমি শুকিয়ে ফেলতে হবে।	অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে।	অধিক পানি জমে গেলে মাঝে মাঝে পানি বের করে দিয়ে জমি শুকিয়ে ফেলতে হবে।	অধিক পানি জমে গেলে মাঝে মাঝে পানি বের করে দিয়ে জমি শুকিয়ে ফেলতে হবে।
ফসল কাটা	ধানের গাছ কর্তনের সময় হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং দানাপুষ্ট হলে ধান কর্তন করা যায়।	গাছের শতকরা ৭০-৮০ ভাগ শুঁটি যখন খড়ের রং ধারণ করে তখন সরিষা কাটার উপযুক্ত সময়।	ফসলের শুঁটি যখন কালচে রং ধারণ করবে তখনই ফসল সংগ্রহ করতে হবে।	ধানের গাছ কর্তনের সময় হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং দানাপুষ্ট হলে ধান কর্তন করা যায়।

২. রোপা আমন-সরিষা-বোরো-রোপা আউশ

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি ইউনিট আবাদি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। এক ফসলি, দুই ফসলি ও তিন ফসলি জমিতে চারটি ফসল আবাদ করে ফসলের নিবিড়তা ১৯১% থেকে ৪০০% এ উন্নীত করা সম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বিনা উদ্ভাবিত স্বল্পমেয়াদী 'বিনা ধান-৭', বারি উদ্ভাবিত স্বল্পমেয়াদী সরিষার জাত 'বারি সরিষা-১৪', ব্রি উদ্ভাবিত স্বল্পমেয়াদী জাত 'ব্রি ধান২৮', এবং আউশের স্বল্পমেয়াদী জাত 'পারিজা' সমন্বয় করে রোপা আমন-সরিষা-বোরো-রোপা আউশ ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন করেছে। এই ফসল বিন্যাস অবলম্বন করে কৃষক অধিক ফলন পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এছাড়া মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই ফসল বিন্যাস যথেষ্ট অবদান রাখবে। মোটকথা কৃষকের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিশেষ করে নারী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই ফসল বিন্যাস অবদান রাখবে।

তিন বছর ব্যাপী (২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪) রোপা আমন-সরিষা-বোরো-রোপা আউশ ফসলধারাটির বাস্তবায়নযোগ্যতা ও কার্যকারিতা পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। রোপা আমন-সরিষা-বোরো ধান-রোপা আউশ ফসলধারাটি রোপা আমন-পতিত-বোরো-পতিত ফসলধারার সঙ্গে তুলনামূলক পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, এই ফসলধারায় ধানের সাদৃশ্য ফলন (Rice equivalent yield) ২৪.১২ টন/হেক্টর এবং কৃষকের প্রচলিত ফসল ধারায় সাদৃশ্য ফলন ১৪.৩০ টন/হেক্টর। এই ফসলধারায় প্রতি হেক্টরে তিন বছরে গড় মোট ব্যয় ১,৬৩,৩৩৭ টাকার বিপরীতে মোট আয় ৩,৩৬,৯০০ টাকা। মোট প্রান্তিক আয় ১,৭৩,৫৬৩ টাকা এবং মোট লাভ-খরচের অনুপাত (BCR) ২.০৬ঃ১। কিন্তু কৃষকের প্রচলিত ফসল ধারায় প্রতি হেক্টরে আয় ১,৯৬,৮৭৫ টাকা, খরচ ১,১০,৬৫৫ টাকা, প্রান্তিক আয় ৮৬,২২০ টাকা এবং লাভ-খরচের অনুপাত ১.৭৮ঃ১। রোপা আমন-সরিষা- বোরো-রোপা আউশ ফসল ধারায় কৃষকের ফসল ধারা (রোপা আমন-পতিত-বোরো-পতিত) থেকে প্রতি হেক্টরে অতিরিক্ত আয় পাওয়া গেছে ৮৭,৩৪৩ টাকা। সুতরাং উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশে যে সমস্ত এলাকায় রোপা আমন-পতিত-বোরো-পতিত ফসলধারা রয়েছে সেই সব এলাকায় রোপা আমন-সরিষা-বোরো ধান-রোপা আউশ ফসলধারা প্রচলন করা সম্ভব এবং উন্নত এই ফসল ধারাটি প্রবর্তন করে শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি করে ফসলের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এর মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে। আগামীতে এই ফসল বিন্যাস বর্ধিত খাদ্য চাহিদা পূরণে অত্যন্ত কার্যকর প্রযুক্তি হিসেবে কাজ করবে।

ফসলধার : রোপা আমন - সরিষা - বোরো - রোপা আউশ

রোপা আমন-সরিষা-বোরো-রোপা আউশ ফসল ধারায় ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ তিন বছরের গড় ফলন, আয়, ব্যয় ও লাভ খরচের অনুপাত।

ফসল ধারা	মোট উৎপাদন (টন/হে.)	মোট আয় (টাকা/হে.)	মোট ব্যয় (টাকা/হে.)	প্রান্তিক আয় (টাকা/হে.)	লাভ খরচের অনুপাত
রোপা আমন-সরিষা-বোরো ধান-রোপা আউশ	২৪.১২	৩৩৬৯০০	১৬৩৩৩৭	১৭৩৫৬৩	২.০৬:১.০
রোপা আমন - পতিত - বোরো ধান-পতিত	১৪.৩০	১,৯৬,৮৭৫	১,১০,৬৫৫	৮৬,২২০	১.৭৮:১.০

রোপা আমন-সরিষা-বোরো ধান-রোপা আউশ ফসলধারায় অর্ন্তভুক্ত ফসলের নাম ও চাষের সময়।

	ফসলের নাম (জাতের নাম)			
	রোপা আমন - (বিন ধান-৭)	সরিষা - (বারি সরিষা-১৪)	বোরো ধান- (ব্রি ধান২৮)	রোপা আউশ - (পারিজা)
ফসলচাষের সময় (বীজতলার সময় বাদে)	জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে চারা রোপণ- অক্টোবরের ৩য় সপ্তাহে ফসল কর্তন (৯০ দিন)	অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (৮০ দিন)	জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ (১০০ দিন)	মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (৭০ দিন)

রোপা আমন-সরিষা-বোরো ধান-রোপা আউশ ফসল ধারার ফসল চাষ পঞ্জিকা।

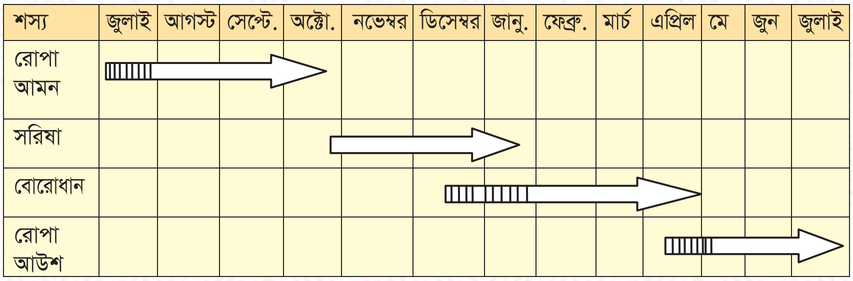

উৎপাদন প্রযুক্তি

রোপা আমন-সরিষা-বোরো-আউশ ধানের সংক্ষিপ্ত চাষ পদ্ধতি।

	আমন ধান	সরিষা	বোরো ধান	আউশ ধান
মাটি ও জমি	দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাঝারী উঁচু জমি	দোআঁশ ও বেলে দোআঁশ মাঝারী উঁচু জমি	দোআঁশ ও এঁটেল মাটি মাঝারী উঁচু ও মাঝারী নিচু	দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটি মাঝারী উঁচু ও মাঝারী নিচু
বপন	জুলাই প্রথম সপ্তাহ বীজতলায় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়	অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের ১ম সপ্তাহে বীজ বপন (কার্তিক মাসের ২য়-৩য় সপ্তাহ)	মধ্য ডিসেম্বর থেকে শেষ ডিসেম্বর (১-১৫ অগ্রহায়ণ)	এপ্রিলের ১০-১৫ তারিখ বীজ তলায় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়
চারা রোপণের/ বপনের সময়	জুলাই মাসের শেষ (শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয়) সপ্তাহে চারা রোপণ		জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ	মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ
সার (কেজি/ হেক্টর)	১৫০ঃ ১১০ঃ ৫০ঃ ৫০ঃ ১ ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমওপিঃ জিপসামঃ দস্তা	২০০ঃ১৫০ঃ৭০ঃ ১২০ঃ১ঃ০.৫ ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমপি জিপসাম ঃ জিংকঅক্সাইড ঃ বোরিক এসিড	৩০০ঃ৯৭ঃ১২০ঃ ১১৩ঃ১১ ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমওপি জিপসাম	১৫০ঃ ৭৫ঃ ৭৫ঃ ৩৭৫০ ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমওপিঃ গোবর
সার প্রয়োগ	ইউরিয়া সমান তিনভাগে ভাগ করে চারা রোপণের ৭, ২২ ও ৪২ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	অর্ধেক ইউরিয়া শেষ চাষের আগে এবং বাকি ইউরিয়া চারা গজানোর ২০-২২ দিন পর অর্থাৎ ফুল আসার আগেই প্রয়োগ করতে হবে।	এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার জমি শেষ চাষের পূর্বে, ১/৩ ইউরিয়া সার রোপণের ১৫-২০ দিন পর এবং ১/৩ ইউরিয়া সার কাইচ থোড় আসার ৫/৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়।	ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে চারা রোপণের ১০-১৫ দিনে প্রথম উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ৩০-৩৫ দিনে দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
বীজের হার	২৫-৩০ কেজি/ হেক্টর	৬-৭ কেজি/ হেক্টর	২৫-৩০কেজি/ হেক্টর	২৫-৩০ কেজি/ হেক্টর
দূরত্ব	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি (২০ সেমি) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি)	এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ৩০ সেমি। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫ সেমি। ছিটিয়ে বীজ বোনা যায়।	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি (২০ সেমি) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি)	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি)
ফসলের পরিচর্যা	চারা রোপণের পর ১০/১৫ দিন অন্তর নিড়ানী অথবা হাত দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে	চারা গজানোর ১০-১২ দিনে প্রথমবার এবং ২০-২৫ দিনে দ্বিতীয়বার নিড়ানী এবং গাছ পাতলা করতে হবে (৫০-৬০টি গাছ প্রতি বর্গমিটারে)।	ধান লাগানোর ১৫-২০ দিন পর এবং ৪০-৫০ দিন পর জমিতে নিড়ানী দিতে হবে।	চারা রোপণের পর ১০/১৫ দিন অন্তর নিড়ানী অথবা হাত দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে

	আমন ধান	সরিষা	বোরো ধান	আউশ ধান
সার প্রয়োগ	ইউরিয়া সমান তিন ভাগে ভাগ করে চারা রোপণের ৭, ২২ ও ৪২ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হয়।	অর্ধেক ইউরিয়া শেষ চাষের আগে এবং বাকি ইউরিয়া চারা গজানোর ২০-২২ দিন পর অর্থাৎ ফুল আসার আগেই প্রয়োগ করতে হবে।	এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার জমি শেষ চাষের পূর্বে, ১/৩ ইউরিয়া সার রোপণের ১৫-২০ দিন পর এবং ১/৩ ইউরিয়া সার কাইচ থোড় আসার ৫/৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়।	ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে চারা রোপণের ১০-১৫ দিনে প্রথম উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ৩০-৩৫ দিনে দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
বীজের হার	২৫-৩০ কেজি/ হেক্টর	৬-৭ কেজি/ হেক্টর	২৫-৩০ কেজি/ হেক্টর	২৫-৩০ কেজি/ হেক্টর
দূরত্ব	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি (২০ সেমি) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি)।	এক সারি থেকে অন্য সারির দূরত্ব ৩০ সেমি। গাছ থেকে গাছের দূরত্ব ৫ সেমি। ছিটিয়ে বীজ বোনা যায়।	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৮ ইঞ্চি (২০ সেমি) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি)।	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি)।
ফসলের পরিচর্যা	চারা রোপণের পর ১০/১৫ দিন অন্তর নিড়ানি অথবা হাত দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।	চারা গজানোর ১০-১২ দিনে প্রথমবার এবং ২০-২৫ দিনে দ্বিতীয়বার নিড়ানি এবং গাছ পাতলা করতে হবে (৫০-৬০টি গাছপ্রতি বর্গমিটারে)।	ধান লাগানোর ১৫-২০ দিন পর এবং ৪০-৫০ দিন পর জমি নিড়ানি দিতে হবে।	চারা রোপণের পর ১০/১৫ দিন অন্তর নিড়ানী অথবা হাত দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করে দিতে হবে।

৩. আমন ধান-আলু-বোরো ধান-আউশ ধান

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য প্রতি ইউনিট আবাদি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। এক ফসলি, দুই ফসলি ও তিন ফসলি জমিতে চারটি ফসল আবাদ করে ফসলের নিবিড়তা ১৯১% থেকে ৪০০% এ উন্নীত করা সম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বিনা উদ্ভাবিত স্বল্পমেয়াদী 'বিনা ধান-৭', বারি উদ ৬াবিত স্বল্পমেয়াদী আলুর জাত 'বারি আলু-৭', ব্রি উদ্ভাবিত স্বল্পমেয়াদী জাত 'ব্রি ধান২৮', এবং আউশের স্বল্পমেয়াদী জাত 'পারিজা' সমন্বয় করে রোপা আমন-আলু-বোরো-রোপা আউশ ফসল বিন্যাস উদ্ভাবন করেছে। এই ফসল বিন্যাস অবলম্বন করে কৃষক অধিক ফলন পেয়ে আর্থিকভাবে লাভবান হবে। এছাড়া মৃত্তিকার উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি, ভূগর্ভস্থ পানির সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় এই ফসল বিন্যাস যথেষ্ট অবদান রাখবে। মোটকথা কৃষকের আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি বিশেষ করে নারী কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এই ফসল বিন্যাস অবদান রাখবে।

ফসলধার : রোপা আমন - আলু - বোরো - রোপা আউশ

তিন বছর ব্যাপী (২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪) রোপা আমন ধান-আলু-বোরো ধান-রোপা আউশ ধান পরীক্ষাটি গাজীপুরে কৃতকার্যের সহিত সম্পন্ন করা হয়। রোপা আমন-আলু-বোরো ধান-রোপা আউশ ফসল ধারাটি রোপা আমন-পতিত-বোরো-পতিত ফসল ধারার সঙ্গে তুলনামূলক পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, ২০১১-১২ থেকে

২০১৩-১৪ সালে উন্নত পদ্ধতিতে এই ফসল ধারায় ধানের সাদৃশ্য ফলন (Rice equivalent yield) ৩৪.০৬ টন/হেক্টর এবং কৃষকের ফসল ধারায় সাদৃশ্য ফলন ১৪.৩০ টন/হেক্টর। এই ফসল ধারায় প্রতি হেক্টরে প্রতিবছর মোট আয় ৫,০০,৪৬৯ টাকা এবং মোট ব্যয় ২,৩৬,৩৮৬ টাকা। মোট প্রান্তিক আয় ২,৬৩,৭৭৩ টাকা এবং মোট লাভ এবং খরচের অনুপাত ২.১২ঃ১। কিন্তু কৃষকের ধারায় প্রতি হেক্টরে আয় ১,৯৬,৮৭৫ টাকা, খরচ ১,১০,৬৫৫ টাকা, প্রান্তিক আয় ৮৬,২২০ টাকা এবং লাভ খরচের অনুপাত ১.৭৮ঃ১।

রোপা আমন-আলু-বোরো ধান-রোপা আউশ ফসল ধারায় ২০১১-১২ থেকে ২০১৩-১৪ তিন বছরের গড় ফলন, আয়, ব্যয় ও লাভ খরচের অনুপাত।

ফসল ধারা	মোট উৎপাদন (টন/হে.)	মোট আয় (টাকা/হে.)	মোট ব্যয় (টাকা/হে.)	প্রান্তিক আয় (টাকা/হে.)	লাভ খরচের অনুপাত
রোপা আমন-আলু-বোরো ধান-রোপা আউশ	৩৪.০৬	৫,০০,৪৬৯	২,৩৬,৩৮৬	২,৬৩,৭৭৩	২.১২ঃ১
রোপা আমন - পতিত - বোরো ধান- পতিত	১৪.৩০	১,৯৬,৮৭৫	১,১০,৬৫৫	৮৬,২২০	১.৭৮ঃ১

রোপা আমন-আলু-বোরো ধান-রোপা আউশ ফসল ধারায় অন্তর্ভুক্ত ফসলের নাম ও চাষের সময়।

	ফসলের নাম (জাতের নাম)			
	রোপা আমন - (বিনা ধান-৭)	আলু - (বারি আলু-৭)	বোরো ধান - (ব্রি ধান২৮)	রোপা আউশ - (পারিজা)
ফসল চাষের সময় (বীজতলার সময় ছাড়া)	জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে চারা রোপণ-অক্টোবরের ৩য় সপ্তাহে ফসল কর্তন (৯০ দিন)।	অক্টোবর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে জানুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ (৮০ দিন)।	জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে চারা রোপণ। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে (১০০ দিন) ফসল কর্তন।	মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে চারা রোপণ। জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে (৭০ দিন) ফসল কর্তন।

রোপা আমন-আলু-বোরো ধান-রোপা আউশ ফসল ধারার ফসল চাষ পঞ্জিকা।

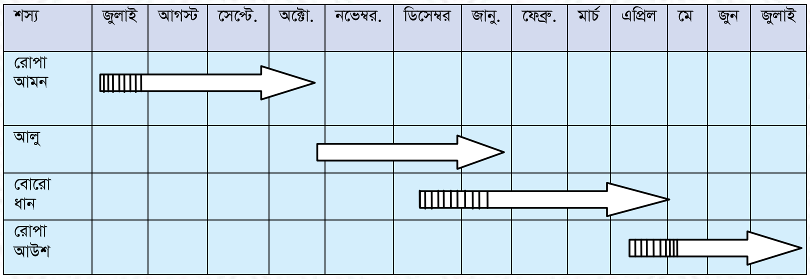

রোপা আমন-আলু-বোরো-রোপা আউশ ফসল ধারাটি কৃষকের ফসল ধারা (রোপা আমন-পতিত-বোরো ধান-পতিত) থেকে অতিরিক্ত আয় পাওয়া গেছে ১,৭৬,৩০৪ টাকা। সুতরাং বাংলাদেশে যে সমস্ত এলাকায় রোপা আমন-পতিত-বোরো-পতিত ফসল ধারা রয়েছে সেই সব এলাকায় রোপা আমন-আলু-বোরো-রোপা আউশ ফসল ধারা প্রচলন করা সম্ভব অর্থাৎ চার ফসল ভিত্তিক ফসল ধারাসমূহ কৃষি তাত্ত্বিকভাবে চাষ করা সম্ভব। এতে জমির ফসল নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে, কৃষকের আয় বৃদ্ধি পাবে অর্থাৎ অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে। ফলে আগামী দিন এই ফসলধারা ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমি থেকে বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হিসেবে কাজ করবে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

রোপা আমন -আলু-বোরো ধান-আউশ ধানের সংক্ষিপ্ত চাষ পদ্ধতি।

	আমন ধান	আলু	বোরো ধান	আউশ ধান
মাটি ও জমি	দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাঝারী উঁচু জমি	রৌদ্রযুক্ত বেলে দোআঁশ মাটি	দোআঁশ ও এঁটেল মাটি মাঝারী উঁচ ও মাঝারী নিচু জমি	দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ মাটি মাঝারী উঁচু ও মাঝারী নিচু জমি
বপন	জুলাই প্রথম সপ্তাহ বীজতলায় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়	নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হতে দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে অর্থাৎ কার্তিকের মাঝামাঝি হতে শেষ পর্যন্ত বীজ বপনের সময়	মধ্য ডিসেম্বর থেকে শেষ ডিসেম্বর (১-১৫ অগ্রহায়ণ)	এপ্রিলের ১০-১৫ তারিখ বীজতলায় বীজ বপনের উপযুক্ত সময়
রোপণের সময়	জুলাই মাসের শেষ (শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয়) সপ্তাহে চারা রোপণ	-	জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ	মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ

	আমন ধান	আলু	বোরো ধান	আউশ ধান
সার (কেজি/ হেক্টর)	১৫০ঃ ১১০ঃ ৫০ঃ ৫০ঃ ১ ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমওপিঃ জিপসামঃ দস্তা	১০০০০ঃ ৩৫০ঃ ২২০ঃ ২৬০ঃ ১২০ঃ ৬ঃ গোবরঃ ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমওপিঃ জিপসামঃ বোরিক এসিড	৩০০ঃ৯৭ঃ১২০ঃ১ ১৩ঃ১১ ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমওপিঃ জিপসাম	১৫০ঃ ৭৫ঃ ৭৫ঃ ৩৭৫০ ইউরিয়াঃ টিএসপিঃ এমওপিঃ গোবর
সার প্রয়োগ	ইউরিয়া সমান তিনভাগে ভাগ করে চারা রোপণের ৭, ২২ ও ৪২ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হয়।	প্রথম অর্ধেক ইউরিয়া বীজ লাগানোর ৭-১০ দিন পর এবং বাকি অর্ধেক ইউরিয়া আলু বপনের ৩০-৩৫ দিন পর জমিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে	এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া সার জমি শেষ চাষের পূর্বে, ১/৩ ইউরিয়া সার রোপণের ১৫-২০ দিন পর এবং ১/৩ ইউরিয়া সার কাইচ থোড় আসার ৫/৭ দিন পূর্বে প্রয়োগ করতে হয়।	ইউরিয়া সমান দুই ভাগে ভাগ করে চারা রোপণের ১০-১৫ দিনে প্রথম উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ৩০-৩৫ দিনে দ্বিতীয় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
বীজের হার	২৫-৩০ কেজি/ হেক্টর	১.৫-২.০ টন/ হেক্টর	২৫-৩০ কেজি/ হেক্টর	২৫-৩০ কেজি/ হেক্টর
দূরত্ব	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৮ইঞ্চি (২০ সেমি)এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি)	আলু হতে আলর়ু দূরত ২৫ সেমি এবং সারি হতে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৮ইঞ্চি (২০ সেমি) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি)	সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি) এবং সারিতে গুছি হতে গুছির দূরত্ব ৬ ইঞ্চি (১৫ সেমি)
ফসলের পরিচর্যা	চারা রোপণের পর ১০/১৫ দিন অন্তর নিড়ানী অথবা হাত দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।	জমি হতে আলুর অন্য জাত ও সমস্ত আগাছা তুলে ফেলে দিতে হবে	ধান লাগানোর ১৫-২০ দিন পর এবং ৪০-৫০ দিন পর জমি নিড়ানী দিতে হবে।	চারা রোপণের পর ১০/১৫ দিন অন্তর নিড়ানী অথবা হাত দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করতে হবে।
সেচ প্রয়োগ	চারা রোপণের পর থেকে ক্ষেতে ৩-৫ সেমি এবং গাছ বড় হবার সাথে সাথে পানির মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে	আলু লাগানোর পর রস নিশ্চিত করতে প্রথম সেচ দেয়া হয়। এছাড়াও ২৫-৩০ দিন পর যখন স্টোলন বের হওয়া শুরু হয় তখন দ্বিতীয় সেচ দিতে হবে হয়। আলু বৃদ্ধির শেষ সময় অর্থাৎ ৬০-৬৫ দিনের মধ্যে সেচের প্রয়োজন হয়	ধানের চারা রোপণের পর জমিতে ১০-১২ দিন পর্যন্ত ছিপছিপে পানি রাখতে হবে। থোর অবস্থা থেকে দানার দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।	ধানের চারা রোপণের পর জমিতে ১০-১২ দিন পর্যন্ত ছিপছিপে পানি রাখতে হবে, থোর অবস্থা থেকে দানার দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।
নিষ্কাশন	অধিক পানি জমে গেলে মাঝে মাঝে পানি বের করে দিয়ে জমি শুকিয়ে ফেলতে হবে	অতিরিক্ত পানি বের করে দিতে হবে।	অধিঁক পানি ঁজমে গেলে মাঝে মাঝে পানি বের করে দিয়ে জমি শুকিয়ে ফেলতে হবে	অধিঁক পানি ঁজমে গেলে মাঝে মাঝে পানি বের করে দিয়ে জমি শুকিয়ে ফেলতে হবে
ফসল কাটা	ধানের গাছ কর্তনের সময় হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং দানাপুষ্ট হলে ধান কর্তন করা যায়।	সাধারণত সকালে অথবা বিকালে যখন তাপমাত্রা কম থাকে সে অবস্থায় উত্তোলন করতে হবে	শেষের শতকরা ৮০ ভাগ ধানের চাল শক্ত ও স্বচ্ছ হলে ধান কাটার উপযুক্ত সময়।	ধানের গাছ কর্তনের সময় হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং দানাপুষ্ট হলে ধান কর্তন করা যায়।

হালকা বুনটের মাটির জন্য লাভজনক ফসল-ধারা: আগাম আলু-গম-মুগডাল-আমন ধান

বাংলাদেশে একদিকে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে জনসংখ্যা। তাই বাড়তি জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগান দেয়ার জন্য অল্প জমিতে বেশি ফসল ফলানোর বিকল্প নেই। অধিক খাদ্য উৎপাদনের প্রয়োজনে একই জমিতে বেশি শস্য আবাদের কারণে অনেক ক্ষেত্রে জমির উর্বরতা কমে যাচ্ছে। জমির উর্বরতা ঠিক রেখে একই জমিতে বছরে ৩টির জায়গায় ৪টি ফসল ফলাতে পারলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকের আয় ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে রংপুর বিভাগের বেশির ভাগ জমি উঁচু এবং মাটি বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির। এ মাটির পানি-নিষ্কাষণ খুব ভালো হওয়ায় এবং শীতকালের আগেই তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় আগাম আলু উৎপাদন করা সম্ভব। আগাম আলুর ভালো দাম পাওয়া যায় বলে এ অঞ্চলের বেশ কিছু সংখক কৃষক অক্টোবর মাসের মধ্যে আলু বীজ রোপণ করে। আগাম আলু রোপণ করতে হবে বলে অনেক সময় আমন মৌসুমে জমি পতিত থাকে। অথচ স্বল্প-মেয়াদী জাতের আমন ধানের চাষ করেও আগাম আলু উৎপাদন করা সম্ভব। খরিফ-২ মৌসুমে যেমন বেশির ভাগ কৃষক আমন ধান আবাদ করে তেমনি আগাম আলু আবাদ করার পর ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলার কিছু সংখক কৃষক গমের আবাদ করে। গমের পরে খরিফ-১ মৌসুমে অল্প খরচে স্বল্প-মেয়াদী জাতের মুগডাল আবাদ করা সম্ভব। মুগডাল আবাদে আমিষের চাহিদাপূর্ণ হবে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে। আগাম আলু, তাপসহিষ্ণু জাতের গম, স্বল্প-মেয়াদী জাতের মুগডাল এবং স্বল্প-মেয়াদী জাতের আমনধান- এই ৪টি ফসল গম গবেষণা কেন্দ্র, নশিপুর, দিনাজপুরে একই জমিতে পর পর ৪ বছর সফলভাবে আবাদ করা হয় এবং আগাম আলু-গম-মুগডাল-আমনধান ফসল-ধারাটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের জন্য সুপারিশ করা হয়।

প্রযুক্তির বিবরণ: একই জমিতে বছরে ৪ টি ফসল উৎপাদন করা সম্ভব। আগাম আলু লাগানোর জন্য আমন মৌসুমে (খরিফ-২) স্বল্প-মেয়াদীজাত যেমন বিনা ধান- ৭ বা ১৫ অথবা ব্রি ধান ৫৬, ৫৭ বা ৬২ অথবা ব্রি হাইব্রিড ধান ৪ লাগাতে হবে। আমন ধান কাটার পর ১৫-২০ অক্টোবরে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এমন আলুর জাত যেমন গ্রানোলা বাসাগিতা লাগাতে হবে এবং ৬০ দিন পর আলু উত্তোলন করতে হবে। আলু উত্তোলনের পর পরই গম বপন করতে হবে।

প্রযুক্তি হতে ফলন: এই ফসল-ধারায় বছরে গড়ে ১৯.৫৭ টন গমের সমতুল্য ফলন পাওয়া যায় এবং গড়ে ১,৯০,০০০ টাকা খরচ করে ১,৬০,০০০ টাকা লাভকরা সম্ভব।

প্রয়োগের স্থান: দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হালকা বুনটের মাটিতে এই ফসল-ধারা খুবই উপযোগী। যেখানে ঘনঘন সেচ দিয়ে বোরো চাষ খুব একটা লাভজনক নয়, সেখানে এই ফসল-ধারা বেশ লাভজনক।

গোলআলু (গ্রানোলা)　*গম (বারি গম ২৫)*　*মুগডাল (বারিমুগ ৬)*　*আমনধান (বিনাধান ৭)*

হালকা বুনটের মাটির জন্য অধিক লাভজনক ফসল-ধারা: আগাম আলু-গম-ভুট্টা-আমন ধান

বাংলাদেশে একদিকে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে জনসংখ্যা। তাই বাড়তি জনগোষ্ঠীর খাদ্য যোগান দেয়ার জন্য অল্প জমিতে বেশি ফসল ফলানোর বিকল্প নেই। জমির উর্বরতা ঠিক রেখে একই জমিতে বছরে ৩টির জায়গায় ৪টি ফসল ফলাতে পারলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকের আয় ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বিশেষ করে রংপুর বিভাগের বেশির ভাগ জমি উঁচু এবং মাটি বেলে-দোআঁশ প্রকৃতির। এ মাটির

পানি-নিষ্কাষন খুব ভালো হওয়ায় এবং শীতকালের আগেই তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় আগাম আলু উৎপাদন করা সম্ভব। আগাম আলুর ভালো দাম পাওয়া যায় বলে এ অঞ্চলের বেশ কিছু সংখ্যক কৃষক অক্টোবর মাসের মধ্যে আলু বীজ রোপণ করে। আগাম আলু রোপণ করতে হবে বলে অনেক সময় আমন মৌসুমে জমি পতিত থাকে। অথচ স্বল্প-মেয়াদী জাতের আমন ধানের চাষ করেও আগাম আলু উৎপাদন করা সম্ভব। খরিফ-২ মৌসুমে যেমন বেশিরভাগ কৃষক আমন ধান আবাদ করে তেমনি আগাম আলু আবাদ করার পর ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড় ও নীলফামারী জেলার কিছু সংখ্যক কৃষক গমের আবাদ করে। গমের পরে খরিফ-১ মৌসুমে লাভজনকভাবে হাইব্রিড ভুট্টার আবাদ করা সম্ভব। আগাম আলু, তাপ সহিষ্ণু জাতের গম, হাইব্রিড ভুট্টা এবং স্বল্প-মেয়াদী জাতের আমন ধান- এই ৪টি ফসল গম গবেষণা কেন্দ্র, নশিপুর, দিনাজপুরে একই জমিতে পর পর ৪ বছর সফলভাবে আবাদ করা হয় এবং আগাম আলু-গম-ভুট্টা-আমন ধান ফসল-ধারাটি দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকদের জন্য সুপারিশ করা হয়।

গোল আলু (গ্রানোলা) *গম (বারি গম ২৫)* *ভুট্টা (প্যাসিফিক ৯৮৪)* *আমন ধান (বিনাধান ৭)*

প্রযুক্তির বিবরণ: আগাম আলু লাগানোর জন্য আমন মৌসুমে (খরিফ-২) স্বল্প-মেয়াদী জাত যেমন বিনা ধান-৭ বা ১৫ অথবা ব্রি ধান ৫৬, ৫৭ বা ৬২ অথবা ব্রি হাইব্রিড ধান ৪ লাগাতে হবে। আমন ধান কাটার পর ১৫-২০ অক্টোবরে তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এমন আলুর জাত যেমন গ্রানোলাবাসাগিতা লাগাতে হবে এবং ৬০ দিন পর আলু উত্তোলন করতে হবে। আলু উত্তোলনের পর পরই গম বপন করতে হবে।

প্রযুক্তি হতে ফলন: এই ফসল-ধারায় বছরে গড়ে ২২,১৬১ কেজি গমের সমতুল্য ফলন পাওয়া যায় এবং গড়ে ২,২০,০০০ টাকা খরচ করে ১,৭৫,০০০ টাকা লাভ করা সম্ভব।

প্রয়োগের স্থান: দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হালকা বুনটের মাটিতে এই ফসল-ধারা খুবই উপযোগী। যেখানে ঘনঘন সেচ দিয়ে বোরো চাষ খুব একটা লাভজনক নয়, সেখানে এই ফসল-ধারা খুব লাভজনক।

গম-ভুট্টা-আমনধান ফসলধারায় স্বল্পচাষ ও মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনবৃদ্ধি

পাওয়ার টিলার চালিত বপন যন্ত্রের (PTOS) সাহায্যে এক চাষে গম, গমের পরে বিনাচাষে ভুট্টা অতঃপর আমনধান চাষ একটি লাভজনক কৃষি প্রযুক্তি। গমের সবগুলো আধুনিক জাত যেমন- বারি গম-২৫, বারি গম- ২৬, বারি গম-২৮, বারি গম-৩০, ভুট্টার হাইব্রিড জাত যেমন বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯, বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১, এন কে ৪০ এবং ধানের স্বল্প মেয়াদি জাত যেমন বিনা ধান-৭, ব্রি ধান ৫৬, ৫৭ এই ফসল ধারায় সফলভাবে চাষ করা যায়। গম ও ভুট্টা বপনের ক্ষেত্রে পাওয়ার টিলার চালিত বপন যন্ত্রের ব্যবহার জমিতে ফসলের অবশিষ্টাংশ প্রয়োগে এবং জমি তৈরির সময় কমাতে সহায়ক।

প্রযুক্তির বিবরণ: সাধারণভাবে গম ও ভুট্টা শস্য দু'টি রবি মৌসুমে আবাদ করা হয় এবং শস্য প্রতিযোগিতায় উভয়েরই আবাদি জমির পরিমাণ কমে যায়। ভুট্টা ফসলটিকে গম-ভুট্টা-আমনধান ফসল ধারায় রবি থেকে খরিফ মৌসুমে স্থানান্তর করে গমের আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধিসহ শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করা সম্ভব। নিবিড় এই ফসল ধারায় জমির উর্বরতা সংরক্ষণে সুষম সারের প্রয়োগ ও মাটির ব্যবস্থাপনা যেমন স্বল্প চাষ, শস্যের অবশিষ্টাংশ জমিতে প্রয়োগ দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাওয়ার জন্য অত্যন্ত উপযোগী। আমন ধান কাটার সময় গোড়ায় না কেটে ২০-৩০ সেমি উপরে কর্তন করতে হবে। জমির 'জো' অবস্থায় গমের জন্য অনুমোদিত মাত্রার সার ছিটিয়ে দিয়ে বপন যন্ত্রের সাহায্যে এক চাষে ৬ সারিতে বীজ বপন করা যায়। একই ভাবে গম ফসল সংগ্রহের সময় শস্য গোড়া থেকে ২০-৩০ সেমি উপরে কর্তন করতে হবে এবং বিনা চাষে ভুট্টা বপন করতে হবে। এইভাবে গম ও ভুট্টা চাষে জমিতে জৈব পদার্থ যোগ হয়, ভূমির উর্বরতা এবং মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

প্রযুক্তি হতে ফলন: প্রযুক্তিটির ব্যবহারে জমি চাষ খরচ কম হওয়ায় ফসলের উৎপাদন ব্যয় কমে এবং মোট উৎপাদন বাড়ায় কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়। শস্যের অবশিষ্টাংশ মাটিতে যোগ হওয়ায় মাটির ভৌত অবস্থা উন্নত হয়, উর্বরতা বাড়ে ফলে গম-ভুট্টা-ধান ফসলধারায় প্রত্যেকটি শস্যের ফলন বৃদ্ধি পায়। প্রযুক্তিটি ব্যবহারে গমের ৪.০-৫.১ টন/হেক্টর, ভুট্টার ৬.২-৭.০ টন/হেক্টর এবং ধানের ৫.১-৬.০ টন/হেক্টর ফলন পাওয়া যায়।

প্রয়োগের স্থান: দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সকল গম আবাদ উপযোগী উচু/মাঝারী উচুজমিতে এ প্রযুক্তিটি সম্প্রসারণের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে বাঁধাকপি উৎপাদন

বাঁধাকপি (বৃদ্ধি পর্যায়)

চারা লাগানোর ৪৫ দিন পর ২য় বার GA_3 স্প্রে করা হচ্ছে।

হরমোন স্প্রে ব্যাতিত (কন্ট্রোল)

৫০ পিপিএম GA_3 স্প্রে

৭৫ পিপিএম GA_3 স্প্রে

বাঁধাকপি Brassicaceae পরিবারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পাতা জাতীয় সবজি। বিশ্বের সর্বপ্রধান পাঁচটি সবজির মধ্যে এটি অন্যতম। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Brassica oleracea var. capitata* L. মানবপুষ্টি ও স্বাস্থ্যের উপকারী দিক থেকে বাঁধাকপির জুড়ি নেই। সবজিটিতে পানির পরিমাণ ৯৩%, সম্পৃক্ত চর্বি ও খারাপ এলডিএল (LDL) কোলস্টেরলের পরিমাণ খুবই কম, খাবার উপযোগী আঁশের পরিমান বেশি। সবজিটিতে ভিটামিন ‘এ’, ভিটামিন ‘সি’, রিবোফ্লাভিন, থায়ামিন, ভিটামিন বি৬, ভিটামিন ‘কে’, বায়োটিন, ফলিক এসিড, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এতে ক্যান্সার প্রতিরোধী ফাইটোকেমিক্যাল যেমন- গ্লুকোসিনোলেট, ইনডোল-৩- কার্বিনল, সালফোরাফেন, ডাইইনডোল মিথেন ও আইসোথায়োসায়ানেট থাকার কারইে এটা খেলে দেহে যকৃতের ক্যান্সার, প্রস্টেট ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার, ফুসফুস ক্যান্সার ও কোলন ক্যান্সার বাসা বাধতে পারে না। সবজিটিতে পটাসিয়াম ও অন্যান্য প্রধান খনিজ লবণের উপস্থিতি ও আঁশ সমৃদ্ধতার কারণে এটা খেলে মানব দেহের হাড় মজবুত হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্যতা দূর হয়, রক্তে কোলেস্টটরোলের পরিমান কমে যায় এবং উচ্চরক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। বাঁধাকপি অ্যামাইনোএসিড গ্লুটামিন সমৃদ্ধ। গ্লুটামিন মানব শরীরে পেপটিক আলসার তৈরিতে বাঁধা প্রদান করে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	বিবরণ
ফসল	বাঁধাকপি
জাত	অ্যাটলাস-৭০, কেকে-ক্রস, কেওয়াই-ক্রস, কৃষিবিদ বাইব্রিড-১
বীজ বপনের সময়	অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ থেকে অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ
চারা রোপণের সময়	নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ
রোপণ পদ্ধতি	সাধারণত ৩০-৩৫ দিনের চারা ৬০ সেমি × ৪০ সেমি দূরত্বে রোপণ করতে হয়।
প্রয়োগকৃত হরমোনের মাত্রা	জিবারেলিক এসিড ৫০-৭৫ পিপিএম ; ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড ৬০ পিপিএম
হরমোন প্রয়োগ পদ্ধতি	চারা লাগানোর ২৫ দিন পরে একবার এবং প্রথম স্প্রে করার ২০ দিন পরে আরেকবার জিবারেলিক এসিড বা ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। জিবারেলিক এসিড বা ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড-এর দ্রবণের মধ্যে।

বিষয়	বিবরণ
	টুইন-২০ বা ট্রিক্স ০.০৫% হারে মিশিয়ে নিলে দ্রবণের পাতায় হরমোন লেগে থাকার সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
সারের মাত্রা /হেক্টর	
ইউরিয়া	৩০০ কেজি
টিএসপি	২০০ কেজি
এমওপি	২৫০ কেজি
জিপসাম	১৫০ কেজি
বরিক এসিড	১০ কেজি
জিংক সালফেট	১২ কেজি
গোবর/কম্পোস্ট	৫ টন
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	জমি তৈরির সময় অর্ধেক গোবর/ কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, বরিক এসিড ও জিংক সালফেট এর সবটুকু প্রয়োগ করতে হবে। বাকি অর্ধেক গোবর/ কম্পোস্ট চারা রোপণের ১ সপ্তাহ পূর্বে মাদায় দিয়ে মিশিয়ে রাখতে হবে। এরপর চারা রোপণ করে চারার গোড়ায় পানি দিতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান ২ কিস্তিতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর ১৫ দিন পর ১ম কিস্তি এবং তার এক মাস পর ২য় কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
অন্যান্য অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা	আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। জমির প্রয়োজন অনুসারে সেচ প্রয়োগ করতে হবে। চারা লাগানোর পর চারার পোড়ায় ঝাঝরি দিয়ে বেশ কয়েকদিন পানি দিতে হবে। চারা মাটিতে সেট না হওয়া পর্যন্ত এভাবে পানি দিতে হবে। বাঁধাকপিতে শুষ্ক মৌসুমে ঘন ঘন সেচ দিতে হয়। মাটির প্রকৃতিভেদে ৫-৬ টি প্লাবন সেচের প্রয়োজন হয়।
প্রযুক্তি ব্যবহারে সম্ভাব্য ফলন	৮০-৮৫ টন/হেক্টর। হরমোন প্রয়োগের ফলে হেক্টর প্রতি ১৫-২০% বেশি ফলন পাওয়া যায়।
ফসল সংগ্রহ	চারা রোপণের ৭০-৮৫ দিন পর মাথা দৃঢ় হয়ে আসলে কপি সংগ্রহ করা যায়। কোনো কোনো জাতের মাথা পরিণত হওয়ার সময় ফেটে যায়। এসব জাত সংগ্রহে দেরি করা উচিত নয়।
খরচ ও নিট মুনাফা	প্রতি হেক্টরে প্রায় ১.৩০ থেকে ১.৩৫ লক্ষ টাকা খরচ করে নিট মুনাফা প্রায় ৩.০ থেকে ৪.০ লক্ষ টাকা আয় করা যায়। হেক্টর প্রতি বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্যের জন্য খরচ হয় ৮০০০.০০ থেকে ৯০০০.০ টাকা। প্রতি শতাংশে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্যসহ ৫০০.০০ থেকে ৬০০.০০ টাকা খরচ করে ১২০০.০০ তেকে ১৫০০.০০ টাকা আয় করা যায়।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে করলা উৎপাদন

করলা Cucurbitaceae গোত্রভুক্ত বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় সবজি। এর বৈজ্ঞানিক নাম *Momordica charantia* L.। এটি উষ্ণ মণ্ডল ও অব-উষ্ণ মণ্ডলীয় অঞ্চলের ফসল। ইহা উষ্ণ ও শুষ্ক জলবায়ুতে ভাল জন্মে। বারি করলা-১, বারি করলা-২ এবং বারি করলা-৩ জনপ্রিয় করলার জাত।

মানবপুষ্টি ও স্বাস্থের উপকারী দিক থেকে করলার জুড়ি নেই। সবজিটিতে পানির পরিমাণ ৯৩%, সম্পৃক্ত চর্বি ও কোলষ্টেরলের পরিমাণ খুবই কম। এতে ভিটামিন 'সি', ভিটামিন 'এ', রিবোফ্লাবিন, আয়রন ও ক্যালসিয়াম যথেষ্ট পরিমাণে আছে। করলাতে 'স্যাপোটেনিন' নামক রাসায়নিক উপাদান থাকায় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য ইহা একটি উত্তম সবজি। 'কিউকারবিটাসিন' ও 'মোমোরডিসিন' রাসায়নিক উপাদান থাকার কারণে করলার পাতা ও ফল তিতা স্বাদ

হয়। করলার পাতা ও ফলে বিষাক্ত কোনো 'কিউকারবিটাসিন' না থাকার কারণে সবজিটি মানুষের জন্য নিরাপদ। Cucurbitaceae গোত্রের করলা ব্যাতিত অন্যান্য সবজি (শশা, লাউ, ধুন্দল প্রভৃতি) তিতা স্বাদ যুক্ত হলে সেগুলো খাওয়া থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। কেননা এগুলোতে বিষাক্ত 'কিউকারবিটাসিন' থাকে। বিষাক্ত 'কিউকারবিটাসিন' যুক্ত সবজি খেলে কিডনি বিকল হয়ে মানুষ মারা যেতে পারে।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে করলা উৎপাদন

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাব

উদ্ভিদ শারীরতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণে উদ্ভিদ বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক রাসায়নিক দ্রব্যাদির (Plant Growth Regulators) ভূমিকা সর্বজন বিদিত। সাধারণত করলা গাছে পুরুষ ফুলের সংখ্যা স্ত্রী ফুলের চেয়ে বেশি হয়। গ্রীষ্মকালের লম্বা দিবা দৈর্ঘ্য ও প্রখর আলো করলার পুরুষ ফুলের সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়, পরিণতিতে স্ত্রী ফুলের সংখ্যা কমে যায়। স্ত্রী ফুলের সংখ্যা কমে যাওয়ার ফলে ফলের সংখ্যা কমে যায় এবং ফলশ্রুতিতে হেক্টরপ্রতি ফলন কমে যায়। বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক দ্রব্য (জিবারেলিক এসিড- GA_3 ও ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড-NAA) ব্যাবহার করলে পুরুষ ফুলের সংখ্যা কমে যায় এবং স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। GA_3 ও NAA প্রয়োগে প্রতিটি ফলের ওজনও বৃদ্ধি পায়।

NAA ব্যাতিত (কন্ট্রোল)

২০০ পিপিএম NAA স্প্রে

উৎপাদন প্রযুক্তি

উৎপাদন মৌসুম: বীজ বপনের সময় ফেব্রুয়ারি-মার্চ।

জমি তৈরি ও বীজ বপন: প্রথমে জমি ভালভাবে চাষ ও মই দিয়ে জমি প্রস্তুত করতে হবে। তারপর নির্দিষ্ট দূরত্বে মাদা তৈরি করতে হবে, মাদা ১৫ সেমি উঁচু হওয়া বাঞ্ছনীয়। পাশাপাশি দুটো মাদার মধ্যে দু'মিটার দূরত্ব রাখতে হবে। করলার বীজের খোসা বেশি শক্ত বিধায় বপনের পূর্বে বীজ ২৪ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখলে অঙ্কুরোদ্গম তরান্বিত হয়। জিবারেলিক এসিড (GA_3) এর ১০ পিপিএম দ্রবণে বীজ ১২-১৮ ঘণ্টা ভিজিয়ে রাখলে শতকরা ৯০ ভাগেরও বেশি অঙ্কুরোদ্গম হয়। বীজ সরাসরি মাদায় বপন করা যায়। প্রতি মাদায় ৫-৬ টি বীজ লাগাতে হয়। পরে মাদা প্রতি ২ টি চারা রেখে দিতে হয়। আবার বীজ পলিব্যাগে অথবা প্লাস্টিক পটে তৈরি করে নেয়া যায়। ২-৩ পাতা বিশিষ্ট চারা (১৪-১৬ দিন বয়স্ক) মাঠে প্রতি মাদায় ২ টি করে লাগাতে হয়। বীজ অথবা চারা সারি করেও লাগানো যায়। সারি থেকে সারির দূরত্ব হবে ২.০ মিটার এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব হবে ১.০ মিটার।

বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্য, তার মাত্রা ও প্রয়োগ: ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড (NAA) করলার ফলন বৃদ্ধির জন্য খুবই কার্যকরী বৃদ্ধিনিয়ন্ত্রক দ্রব্য। NAA ১৫০-২০০ ppm নিদিষ্ট মাত্রায় নিদিষ্ট বয়সের চারায় স্প্রে করতে হবে। করলার চারা ১৪-১৫ দিন পরে ২ পাতা বিশিষ্ট হলে NAA প্রয়োগ করতে হবে। পরে চার থেকে ছয় দিন পরে একই হরে ঐ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব চারার পাতায় প্রয়োগ করতে হবে।

সারের পরিমান ও প্রয়োগ পদ্ধতি

সারের নাম	পরিমাণ (প্রতি হেক্টর)
গোবর/কম্পোস্ট	৫ টন
ইউরিয়া	২৬০ কেজি
ট্রিপল সুপার ফসফেট (টিএসপি)	২০০ কেজি
মিউরিয়েট অব পটাশ (এমওপি)	১৬০ কেজি
জিপসাম	১৬৫ কেজি
জিংক সালফেট	১১ কেজি
বোরিক এসিড	১২ কেজি

গোবর/কম্পোস্ট, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও বোরিক এসিড এর সবটুকু এবং ইউরিয়া ও এমওপি এ দুটি সারের তিনভাগের এক ভাগ মাদায় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি ইউরিয়া ও এমওপি সার দুটি চারা লাগানোর ২০ দিন পর থেকে সমান ৪-৫ কিস্তিতে ২০ দিন পর পর মাদা (চারা)'র চারপাশে মাটির সাথে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে।

অন্যান্যা পরিচর্যা: বাউনী দেয়া করলার প্রধান পরিচর্যা। বাধাহীনভাবে বাইতে না পারলে করলার গাছে ফলনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটে না। তাই করলায় বাউনী দেয়া প্রয়োজন। বাঁশ ও কঞ্চির সাহায্যে অথবা অন্য উপায়েও বাউনী দেয়া যেতে পারে।

পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন: করলার গাছ চারা অবস্থায় রেড পামকিন বীটল ও এপিলাকনা বীটল দ্বারা আক্রান্ত হয়। এ পোকাদ্বয় দমনের জন্য সেভিন/কার্বারিল-৮৫ ডব্লিইপি ২ গ্রাম ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে গাছে ৭ দিন পর পর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। গাছে ফল আসার সময় ফলের মাছি পোকার উপদ্রব মারাত্মক আকারে দেখা দেয়। সেক্স ফেরোমেন ও বিষটোপের যৌথ ব্যাবহারে এ পোকার আক্রমণ থেকে ফসলকে রক্ষা করা যায়। বিষটোপের জন্য থেতলানো ১০০ গ্রাম মিষ্টি কুমড়ার সাথে ০.২৫ গ্রাম সেভিন/কার্বারিল-৮৫ ডব্লিইপি পাওডার মিশিয়ে ব্যাবহার করতে হয়। বিষটোপ ৩-৪ দিন পরপর পরিবর্তন করতে হয়। সেক্স ফেরোমেন স্ট্রিপ 'কিউ ফেরো' নামে বাজারে পাওয়া যায়। ফেরোমেন স্ট্রিপ ফাদে ঝুলিয়ে ফাদের নিচে সাবান মিশ্রিত পানি রাখলে ফেরোমেনের গন্ধে পুরুষ পোকা আকৃষ্ট হয়ে সাবান মিশ্রিত পানিতে পড়ে মারা যায়। এতে ফলের মাছি পোকার আক্রমণ বহুলাংশে কমে যায়।

ফলনের ওপর বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্যের প্রভাব: ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড (NAA) ব্যাবহার করলে পুরুষ ফুলের সংখ্যা কমে যায় এবং স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলশ্রুতিতে গাছপ্রতি ফলের সংখ্যা ও প্রতিটি ফলের ওজন বৃদ্ধি পায় এবং করলার ফলন বাড়ে। বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক দ্রব্য সঠিকভাবে প্রয়োগ করলে প্রতিটি করলা গাছে ফলের সংখ্যা ৩০-৩৫% বৃদ্ধি পায় । এতে ফলন প্রায় ২৫%-৩০% বৃদ্ধি পায়।

খরচ ও নিট মুনাফা: প্রতি হেক্টরে প্রায় ২.৩০ লক্ষ টাকা খরচ করে নিট মুনাফা প্রায় ৫ লক্ষ টাকা আয় করা যায়। হেক্টর প্রতি ন্যাপথ্যালিন এসিটিক এসিড (NAA) এর জন্য খরচ হয় ৫০০০.০০- ৬০০০.০ টাকা। প্রতি শতাংশে ১০০০.০০ টাকা খরচ করে ২০০০.০০ টাকা আয় করা যায়।

টমেটো উৎপাদনে ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: টমেটো উৎপাদনে ১০০% অনুমোদিত রাসায়নিক সারের (নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, সালফার, জিংক ও বোরন যথাক্রমে হেক্টরপ্রতি ১২০, ৪৫, ৬০, ২০, ২ ও ১ কেজি) পাশাপাশি ১.৫ টন ভার্মিকম্পোস্ট প্রয়োগ করলে টমেটোর সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া যায়। ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহার করলে ফলন ভাল হয় এবং মাটির স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: গাজীপুরের সোপান মাটিতে টমেটো চাষ করা যায়।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য: শস্য- টমেটো; জাত-বারি টমেটো-১৪

সারের মাত্রা

সারের নাম	সারের পরিমাণ (প্রতি হেক্টরে)
ইউরিয়া	২৬০ কেজি
টিএসপি	৯০ কেজি
এমওপি	১২০ কেজি
জিপসাম	৯০ কেজি
জিংক সালফেট (মনো হাইড্রেট)	৫.৫ কেজি
বোরিক এসিড	৬ কেজি
ভার্মিকম্পোস্ট	১.৫ টন

সার প্রয়োগ পদ্ধতি- সমস্ত টিএসপি, এমওপি, জিপসাম, জিংক সালফেট (মনো হাইড্রেট), বোরিক এসিড ও ভার্মিকম্পোস্ট এবং ১/৩ অংশ ইউরিয়া সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় মৌল মাত্রা হিসাবে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া সমান দুই কিস্তিতে টমেটো গাছের অঙ্গজ বৃদ্ধির পর্যায়ে (চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর) ও ফুল উৎপাদন পর্যায়ে (চারা রোপণের ৫৫-৬০ দিন পর) প্রয়োগ করতে হবে।

ফলন: ৬৫-৭০ টন/হেক্টর।

গাজীপুরে ১.৫ টন/হেক্টর ভার্মিকম্পোস্ট ও ১০০% অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক সার সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে ১০০% অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক সারের তুলনায় টমেটোর শতকরা ১৫-২৬ ভাগ ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

মটরশুঁটি উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: মটরশুঁটি চাষে ইউরিয়া সারের পরিবর্তে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার (বারি আরপিএস-৫০১) ও ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহার করলে ফলন ভাল হয় এবং মাটির অবস্থাও ভাল থাকে। মটরশুঁটি গাছের শিকড়ে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়া গুটি বা নডিউল তৈরি করে। উক্ত ব্যাকটেরিয়া বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চায়ন করে মটরশুঁটি গাছকে দেয় এবং বিনিময়ে মটরশুঁটি গাছ থেকে নিজের জন্য কার্বোহাইড্রেট নেয়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: গাজীপুর ও রহমতপুরসহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় বেলে দোআঁশ মাটিতে মটরশুঁটি চাষ করা যায়।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য: শস্য-মটরশুঁটি; জাত-বারি মটরশুঁটি-৩।

সারের মাত্রা-

সারের নাম (বারি আরপিএস-৫০১)	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
অণুজীব সার	১.৫ কেজি
টিএসপি	০
এমওপি	৫২
জিপসাম	৯৪
জিংক সালফেট	১৩
বোরিক এসিড	৪.৪৭
ভার্মিকম্পোস্ট (টন/হেক্টর)	৫

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: পরিমাণমতো গাম বা শুধুমাত্র পানি দিয়ে বীজের সাথে অণুজীব সার মেশাতে হবে। ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় রেখে অণুজীব সার মিশ্রিত বীজ বাতাসে শুকাতে হবে। অণুজীব সার ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

ফলন: ৯.৮৮-১১.২ টন/হেক্টর ১.৫ কেজি/হেক্টর রাইজোবিয়াম ইনোকুলাম, ৫ টন/হেক্টর ভার্মিকম্পোস্ট ও ইউরিয়া বাদে অন্যান্য রাসায়নিক সার সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক সারের তুলনায় গাজীপুর ও রহমতপুরে মটরশুঁটির শতকরা ২০-৩২ ভাগ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব।

ঝাড়শিম উৎপাদনে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার, ভার্মিকম্পোস্ট ও রাসায়নিক সারের সমন্বিত ব্যবহার

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: ঝাড়শিম চাষে ইউরিয়া সারের পরিবর্তে রাইজোবিয়াম অণুজীব সার (বারি আরপিভি-৭০২) ও ভার্মিকম্পোস্ট ব্যবহার করলে ফলন ভাল হয় এবং মাটির অবস্থাও ভাল থাকে। ঝাড়শিম গাছের শিকড়ে রাইজোবিয়াম নামক ব্যাকটেরিয়া গুটি বা নডিউল তৈরি করে। উক্ত ব্যাকটেরিয়া বায়ুমন্ডল থেকে নাইট্রোজেন সঞ্চায়ন করে ঝাড়শিম গাছকে দেয় এবং বিনিময়ে ঝাড়শিম গাছ থেকে নিজের জন্য কার্বোহাইড্রেট নেয়।

প্রযুক্তির উপযোগিতা: গাজীপুর ও রহমতপুরসহ বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি জেলায় বেলে দোআঁশ মাটিতে ঝাড়শিম চাষ করা যায়।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য: শস্য-ঝাড়শিম; জাত- বারি ঝাড়শিম-১

সারের মাত্রা-

সারের নাম (বারি আরপিভি-৭০২)	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)
অণুজীব সার	১.৫ কেজি
টিএসপি	৬০
এমওপি	১২৮
জিপসাম	৯৪
জিংক সালফেট	১৩
বোরিক এসিড	৪.৪৭
ভার্মিকম্পোস্ট(টন/হেক্টর)	৫

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: পরিমাণমতো গাম বা শুধুমাত্র পানি দিয়ে বীজের সাথে অণুজীব সার মিশাতে হবে। ঠাণ্ডা ও শুকনো জায়গায় রেখে অণুজীব সার মিশ্রিত বীজ বাতাসে শুকাতে হবে। অণুজীব সার ছাড়া অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

ফলন: ১৫.৮-১৬.৩ টন/হেক্টর

১.৫ কেজি/হেক্টর রাইজোবিয়াম ইনোকুলাম, ৫ টন/হেক্টর ভার্মিকম্পোস্ট ও ইউরিয়া বাদে অন্যান্য রাসায়নিক সার সমন্বিত ভাবে ব্যবহার করে অনুমোদিত মাত্রার রাসায়নিক সারের তুলনায় গাজীপুর ও রহমতপুরে ঝাড়শিমের শতকরা ২১-৪৬ ভাগ ফলন বৃদ্ধি সম্ভব।

ফুলকপির বীজ উৎপাদনে মলিবডেনামের ব্যবহার

অনুমোদিত মাত্রায় (প্রতি হেক্টরে গোবর সার-১০ টন, ইউরিয়া-৩০০ কেজি, টিএসপি-২০০ কেজি, এমওপি-২৫০ কেজি, জিপসাম-১০০ কেজি, জিংক সালফেট-১২ কেজি এবং বোরিক এসিড-১০ কেজি) এর সাথে ১.৫ কেজি মলিবডেনাম (৪ কেজি সোডিয়াম মলিবডেট) ব্যবহার করে সর্বোচ্চ পরিমাণ বীজ পাওয়া যায় এবং বীজের গুণগত মান ভাল হয়। ইউরিয়া ও এমওপি ছাড়া গোবর ও অন্যান্য সার জমি তৈরির শেষ

ফুলকপির বীজ উৎপাদন

চাষের সময় প্রয়োগ করে ভালভাবে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া ও এমওপি সমান চার ভাগে ভাগ করে চারা লাগানোর ১৫, ৪০, ৬০ ও ৯০ দিন পর গাছের চতুর্দিকে রিং আকারে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে দিতে হবে। মলিবডেনাম জমি তৈরির শেষ চাষের সময় অথবা অর্ধেক শেষ চাষের সময় ও বাকি অর্ধেক পুষ্পমঞ্জুরী বের হওয়ার সময় স্প্রে করলে সর্বোচ্চ পরিমাণ বীজ (২৪০-২৫০ কেজি/হেক্টর) পাওয়া যায় তবে জমি তৈরির শেষ চাষের সময় প্রয়োগ করা তুলনামূলক লাভজনক।

উঁচু বেড পদ্ধতি ও পটাশিয়াম ব্যবহারের মাধ্যমে লবণাক্ত মৃত্তিকা ব্যবস্থাপনা ও ভুট্টা উৎপাদন

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য: পটুয়াখালির কুয়াকাটা ও নোয়াখালির হাজিরহাট যেখানে মাটির লবণাক্ততা খরা মৌসুমে (মার্চ এপ্রিল মাসে) ০৯-১৩ ডিএস/মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায় সেসব এলাকায় উঁচু বেড পদ্ধতি ও প্রচলিত সুপারিশের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশি মাত্রার পটাশিয়াম সার (এমওপি) প্রয়োগ করে বারি হাইব্রিড ভুট্টা- ৯ এর ৯.১৭ টন/হেক্টর ফলন পাওয়া গেছে যা প্রচলিত চাষাবাদ পদ্ধতির তুলনায় শতকরা ২৯ ভাগ বেশি। এমতাবস্থায় লবণাক্ত অঞ্চলে প্রচলিত সুপারিশের চেয়ে শতকার ৫০ ভাগ অধিক মাত্রায় পটাশিয়াম প্রয়োগ করে উঁচু বেড পদ্ধতিতে ভুট্টা চাষ করলে একদিকে যেমন মৃত্তিকা দ্রবণের পটাশিয়াম আধিক্যের কারণে গাছ কর্তৃক সোডিয়াম আহরণ বাধাগ্রস্থ হয় ও লবণাক্ততার বিরূপ প্রভাব গাছ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয় অন্যদিকে ফসলের ফলন বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে উঁচু বেড পদ্ধতি লবণ দ্রব্যের উর্ধ্বমুখী চাপ কমিয়ে দিয়ে প্রাথমিক অবস্থায় গাছের মূলসহ অন্যান্য অঙ্গের বৃদ্ধি ওবিকাশের কার্যকর ভূমিকা রাখে।

লবণাক্ত অঞ্চল কোয়াকাট, পটুয়াখালীতে হাইব্রিড ভুট্টা উৎপাদন

প্রযুক্তির উপযোগিতা: নোয়াখালী, পটুয়াখালীসহ উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চল।

মাঠ পর্যায়ে তথ্য: শস্য-ভুট্টা; জাত- বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯

সারের মাত্রা-

সারের নাম	সারের পরিমাণ (কেজি/হেক্টর)*	
	নোয়াখালী	পটুয়াখালী
ইউরিয়া	৬৩৬	৫৯৫
টিএসটি	৩৪০	২৮৫
এমওপি	২৭০	১৬০
জিপসাম	১২৫	১৫৫
জিংক সালফেট (মনো হাইড্রেট)	১০	১০
বোরিক এসিড	০৬	০৬

* মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অঞ্চলভেদে উক্ত সারের মাত্রা কম/বেশি হতে পারে।

সার প্রয়োগ পদ্ধতি: উপরোক্ত সুপারিশের সম্পূর্ণ পরিমাণ টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট (মনোহাইড্রেট), বোরিক এসিড এবং দুই তৃতীয়াংশ এমওপি সার জমি তৈরির শেষে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সার সমান তিন ভাগ করে প্রথম কিস্তি বীজ গজানোর ৫ দিন পর, দ্বিতীয় কিস্তি গাছের কাণ্ড বৃদ্ধি পর্যায়ে সাধারণত বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর এবং শেষ কিস্তি পুরুষফুল আসার পর্যায়ে (বীজ গজানোর ৫০-৫৫ দিন পর) প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ এমওপি সার দ্বিতীয় কিস্তি ইউরিয়া সারের সাথে বীজ গজানোর ৩০-৩৫ দিন পর প্রয়োগ করা বিধেয়।

ফলন: ৮-৯ টন/হেক্টর

উঁচু বেড পদ্ধতি ব্যবহার করে ও প্রচলিত সুপারিশের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশি মাত্রার পটাশিয়াম ব্যবহার করে লবণাক্ত এলাকায় হাইব্রিড ভট্টা ৩০-৪০% অতিরিক্ত ফলন পাওয়া যেতে পারে।

সমন্বিত আগাছা দমনের মাধ্যমে মুগডালের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন

মুগডাল ফসল উৎপাদনে আগাছার উপদ্রব একটি মারাত্মক সমস্যা। বিশেষত খরিফ-১ মৌসুমে আগাছা দমন দুরূহ হয়ে পড়ে। মুগডালের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদনে বীজ বপন পূর্বক আগাছা নাশক প্রয়োগ এবং এর সাথে বীজ বপন পরবর্তী আগাছা দমন খুবই কার্যকরী। জমি চাষের এক সপ্তাহ পূর্বে আগাছা নাশক গ্লাইফোসেট প্রতিলিটার পানিতে ৭.৫ মিলিলিটার হারে ৫ শতক জমির জন্য ১০ লিটার মিশ্রণ প্রয়োগ করে পরবর্তীতে চারা গজানোর ২০ দিন পর একবার নিড়ানী দ্বারা আগাছা পরিষ্কার করলে ১.৫৭ টন/হেক্টও মানসম্পন্ন (শতকরা ৮০ ভাগের অধিক গজানো ক্ষমতা সম্পন্ন) মুগডালের বীজ পাওয়া যায়। আগাছা নাশক গ্লাইফোসেট সব ধরনের আগাছা দমনের জন্য কার্যকরী।

সমন্বিত আগাছা দমনের পরীক্ষণ প্লটের ছবি

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্য

উপযোগিতা: সমন্বিত আগাছা দমন প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষক একদিকে মুগডালের অধিক বীজ পাবে, অন্যদিকে বীজের উৎপাদন খরচ কম পড়বে। প্রচলিত হাত দ্বারা আগাছা দমন পদ্ধতিতো অনেক কৃষি শ্রমিকের প্রয়োজন পড়ে, তাছাড়া সময়মতো কৃষি শ্রমিক পাওয়াও যায় না। সমন্বিত আগাছা দমন প্রযুক্তি ব্যবহারে কৃষক স্বল্প খরচে ও সঠিক সময়ে আগাছা দমন করতে পারে বিধায় মানসম্পন্ন মুগডালের অধিক বীজ উৎপাদন করতে পারে। এজন্য কৃষকেরা অধিক আয় করতে পারে। এই প্রযুক্তিতে গ্রস মার্জিন (Gross Margin) ১,৩৪,৮৫০ টাকা/হেক্টর এবং মারজিনাল বেনেফিট কস্ট রেশিও (Marginal Benefit Cost Ratio) ৫.৩২। এই প্রযুক্তি বাংলাদেশের মুগডাল উৎপাদনকারী অঞ্চলসমূহ যেমন-যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, নাটোর, পাবনা, রাজশাহী ও বরিশাল জেলার জন্য উপযোগী হবে।

সমন্বিত আগাছা দমনের প্লটের বীজের অঙ্কুরোদ্গম

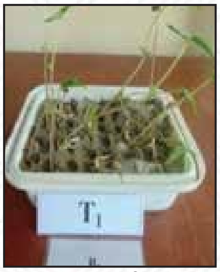

আগাছা দমন বিহীন প্লটের বীজের অঙ্কুরোদ্গম

উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক সেচ প্রয়োগে ফসল উৎপাদন

- বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে স্বাদু পানির উৎস খুবই সীমিত (সাধারণত পুকুরের পানি বা কিছু কিছু এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানি অপেক্ষাকৃত কম লবণাক্ত), অথচ এসব এলাকায় পর্যাপ্ত পানির আধার রয়েছে যার বেশিরভাগই মাঝারী থেকে অধিক মাত্রায় লবণাক্ত (যেমন- খাল, নদী বা আশেপাশের নিম্নভূমির পানি) ।
- প্রতিটা ফসলই তাদের অঙ্কুরোদ্গমের সময় ও বৃদ্ধির প্রাথমিক পর্যায়ে লবণাক্ততা সহ্য

স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক সেচে ভুট্টা (স্থান: বেনারপোতা, সাতক্ষীরা) সূর্যমুখী ও গম চাষ।

করতে পারেনা। যদি শুধুমাত্র লবণাক্ত পানি দিয়ে সবগুলো সেচ দেয়া হয় তাহলে ফসলের ফলন ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এমতাবস্থায়, ফসলের প্রাথমিক সংবেদনশীল পর্যায়ে পরিমিত মাত্রার অপেক্ষাকৃত স্বাদু পানির একটি সেচের ব্যবস্থা করে পরবর্তী পর্যায়গুলোতে প্রয়োজন অনুযায়ী ২/৩ টি লোনা পানির সেচ দেয়া হলে আশানুরূপ ফলন পাওয়া যায়।

- ফসল উৎপাদনে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির এরূপ ব্যবহারকে বলা হয় সংযোজক ব্যবহার।
- সেচ কাজে স্বাদু ও লবণাক্ত পানির সংযোজক ব্যবহার যেমন উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃত পতিতভূমিতে ফসল উৎপাদনে সহায়ক ভুমিকা পালন করতে পারে, তেমনি সীমিত স্বাদু পানির উৎসগুলোকে (বিশেষত ভূ-গর্ভস্থ স্বাদু পানি) সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে।
- এই প্রযুক্তির সম্প্রসারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধি পাবে, ফলশ্রুতিতে অত্র অঞ্চলের কৃষকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

সেডনেটে জারবেরা পাতায় GA_3 প্রয়োগের মাধ্যমে ফুলের গুণগত মান ও সংখ্যা বৃদ্ধি

ভূমিকাঃ জারবেরা অ্যাসটারেসী পরিবারভুক্ত উচ্চমূল্যের একটি আকর্ষণীয় ফুল। সমগ্র বিশ্বের ফুল বাণিজ্যে যে চারটি ফুল সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় জারবেরা তাদের মধ্যে অন্যতম। চাহিদার দিক দিয়ে এবং বাণিজ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশে এ ফুলের জুড়ি নেই। সারাবছরই বাজারে এর চাহিদা থাকে এবং বিভিন্নভাবে এ ফুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে কাটফ্লাওয়ার হিসেবে ফুলদানীর জন্য এটি অনন্য। এ ছাড়া মালা, পুষ্পস্তবক, বেনী, খোঁপায় এবং মুকুট তৈরিতে এ ফুল ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের আবহাওয়া এ ফুল চাষের জন্য উপযোগী। উচ্চমূল্যের ফুল ফসলের কারণে জারবেরার চাষ এখন লাভজনক ফসল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। বাংলাদেশে সাধারণত শীতের সময় জারবেরা ফুলের চাষ করা হয়। গ্রীষ্মকালে অতিরিক্ত বৃষ্টি ও তাপমাত্রা জারবেরা চাষের জন্য ক্ষতিকর। এজন্য পলিসেডে জারবেরা চাষের মাধ্যমে সারা বছরব্যাপী রোগ-পোকামাকড় মুক্ত ও গুণগতমানের ফুল উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে উদ্ভিদ বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক হরমোনের (গ্রোথ হরমোন) ব্যবহার দিনদিন বাড়ছে। এটি উদ্ভিদের শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার উপর প্রভাব ফেলে। এছাড়া ফুল গাছের ফলন ও ফুলের গুণগত মান বৃদ্ধি করে। অন্যান্য গ্রোথ হরমোনের মধ্যে GA_3 ফুলের গুণগত মান বৃদ্ধি ও দ্রুতসময়ে ফুল উৎপাদনের জন্য বেশি কার্যকর।

প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ গবেষণায় দেখা গেছে, সেডনেটে ১০০ পিপিএম ঘনত্বের GA_3 জারবেরা পাতায় ২ বার প্রয়োগের মাধ্যমে ফুলের কাঙ্ক্ষিত বৈশিষ্ট্যগুলো যেমন আগাম ফুল ফোটা, গাছের দৈর্ঘ্য, গাছপ্রতি ফুলের সংখ্যা, বাজারযোগ্য ফুলের স্টিকের সংখ্যা, ফুলের সজীবতা বৃদ্ধি ইত্যাদি অর্জিত হয়েছে। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে চারা লাগাতে হবে। চারা গুলোকে ৫০ সেমি × ৪০ সেমি দূরত্বে রোপণ করতে হবে। হেক্টরপ্রতি জমিতে ৫ টন গোবর, ৫০০ কেজি কোকোডাস্ট, ১৫০ কেজি নাইট্রোজেন, ১৫০ কেজি এমওপি, ৭৫ কেজি ফসফরাস, ১২ কেজি বোরন, ৩০ কেজি সালফার ও ৪ কেজি জিংক প্রয়োগ করতে হবে। টিএসপি, এমওপি, কোকোডাস্ট, ফসফরাস, বোরন, সালফার, জিংক বেসাল ডোজ হিসেবে দিতে হবে। ইউরিয়া সার চারা লাগানোর ৩০ ও ৬০ দিন পরবর্তীতে উপরি প্রয়োগ করতে হবে। গ্রোথ হরমোন প্রয়োগের ক্ষেত্রে এমনদিন বাছাই করতে হবে যেদিন বা যার পরদিন বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা কম থাকে। এক্ষেত্রে লাগানো চারার বয়স যথাক্রমে ২৫, ৫০ দিন হলে ১০০পিপিএম GA_3 এর জলীয় দ্রবণ পাতায় স্প্রে করতে হবে।

প্রযুক্তি-১: কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১ এ আলু-ভুট্টা-রোপা আমন ধান ফসল ধারায় সার-সুপারিশমালা

কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১ এ আলু-ভূট্টা-রোপা আমন ধান একটি প্রচলিত শস্যবিন্যাস এবং দিনাজপুর অঞ্চলে প্রায় ১১% জমিতে এই ফসল ধারা চাষাবাদ করা হয়। এই ফসলধারাতে আলু ও ভুট্টা উৎপাদনে প্রচুর পরিমাণ সারের প্রয়োজন হয় কিন্তু কৃষক আলুতে প্রচুর সার দেয় কিন্তু ভুট্টাতে কোন সার প্রয়োগ করা হয় না বা দিলেও সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করে ফলে কাঙ্খিত ফলন পায় না। এতে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ২০১৫ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে এই ফসলধারায় সার সুপারিশ করে এতে ধানের সমতুল্য ফলন ২৯.৫ এবং ৩০.৫ টন/হেক্টর পাওয়া যায় মাটি পরীক্ষা ভিত্তিক সার এবং সাথে আরও ২৫% বেশী সার দিয়ে এবং ১০০% মাটি পরীক্ষা ভিত্তিক সারের সাথে প্রতি হেক্টরে ৩ টন মুরগীর বিষ্ঠা প্রয়োগে। এতে প্রায় কৃষক এর ব্যবহৃত সার এর মাত্রা থেকে ৩৮% বেশী মুনাফা পাওয়া যায় ।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ		
উসল	আলু	ভুট্টা	রোপা আমন ধান
জাত	বারি আলু-৭	বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯	ব্রি ধান৬২
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৬০×২০	৬০×২০	২০×১৫
বপন/রোপণের সময়	নভেম্বরের ১ম সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারির ১ম সপ্তাহ	জুলাই এর শেষ সপ্তাহ
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	৩২৫	৪৭৫	১১০
টিএসপি	৯৫	১৭০	৫০
এমওপি	২৬২	২১৬	৫০
জিপসাম	৭৫	১৬৫	২১
জিংক সালফেট	৩	৩	০
বরিক এসিড	৭.৫	৭.৫	০
মুরগির বিষ্ঠা	৩	০	০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	ইউরিয়া ছাড়া সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সমান ২ ভাগে রোপণের ২৫ এবং ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া ছাড়া সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় এবং ইউরিয়া সমান ২ কিস্তিতে বপনের ৩০ এবং ৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া ছাড়া সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় এবং ইউরিয়া সমান তিন কিস্তিতে ১৫, ৩০ এবং ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
ফসলের আন্তঃপরিচর্যা	আলু রোপণের ২০ দিন পর আগাছা দমন ও সেচ দিতে হবে। আলুর ব্লাইট রোগ দমনের জন্য ডায়থেন এম-৪৫ ডাপ্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম মিশিয়ে রোপণের ৪০ দিন পর প্রতি ১০ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে।	কাটুই পোকা দমনের জন্য ফুরাডান ১০ কেজি/হেক্টর জমি তৈরির সময় প্রয়োগ করতে হবে।	স্টেমবোরার দমনের জন্য ফুরাডান ১৫ কেজি/হেক্টর দ্বিতীয় বার আগাছা দমনের সময় প্রয়োগ করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ	জুলাই এর ২য় সপ্তাহ	অক্টোবর মাসের ২য় সপ্তাহ
ফলন (টন/হেক্টর)	৩৫.৩	১০.৭৫	৪.৪০
জীবনকাল (দিন)	৮০	১৫৮	৮০
দুই ফসলের আন্তবর্তীকালীন সময় (দিন)	২৫	১২	১০
লাভক্ষতির বিবরণ	মোট আয় : হেক্টর প্রতি টাকা ৪৭২,০০০/- উৎপাদন ব্যয় : হেক্টর প্রতি টাকা ২১৬,৫৪৬/ - লাভ খরচের অনুপাত : ২.১৮		

উপযোগী অঞ্চল: দিনাজপুর ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১ এর অনুরূপ অঞ্চল

উদ্ভাবনের বছর: ২০১৫-২০১৭

প্রযুক্তি-২: লাউ এর ডগা উৎপাদনে ইউরিয়া সারের ব্যবহার

বর্তমানে বাংলাদেশে লাউ এর ডগা একটি জনপ্রিয় শাক হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। এদেশের কৃষক খুব সহজে লাউ এর ডগা উৎপাদন করে সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে। প্রায় ১৫ দিন অন্তর অন্তর ৪-৫ বার ডগা সহজেই তোলা যায় কিন্তু এতে লাউ এর পাতার বৃদ্ধির জন্য এবং বার বার উত্তোলনের জন্য ইউরিয়া সারের ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কিন্তু আমাদের দেশে লাউ এর ডগা উৎপাদনের জন্য ইউরিয়া সারের কোন সার সুপারিশমালা নেই। টাংগাইল অঞ্চলে সরেজমিন গবেষণা বিভাগ এ ২০১৪-২০১৭ সাল পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে ইউরিয়া সারের সুষম মাত্রা বের করেন। যদি ২১৭ কেজি ইউরিয়া (১০০ কেজি নাইট্রোজেন) এর এক তৃতীয়াংশ ২-৩ পাতা অবস্থায় এবং বাকি ইউরিয়া প্রতি বার ডগা উত্তোলনের পর প্রয়োগ করলে প্রায় ৫৫ টন প্রতি হেক্টরে ডগা উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

ফসল	লাউ
জাত	বারি লাউ-৪
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৩০ × ২০
বপন/রোপণের সময়	অক্টোবর মাসের ৩য় সপ্তাহ
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)	
ইউরিয়া	২১৭
টিএসপি	২৪০
এমওপি	১২০
জিপসাম	১৭.৬
জিংক সালফেট	৬
বরিক এসিড	১২.৫
গোবর সার	৫০০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	অর্ধেক পটাশ সার, সম্পূর্ণ গোবর সার এবং অন্যান্য সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হবে। বাকি পটাশ সার সমান পাঁচ ভাগে ভাগ করে ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে হবে।
ফসলের আন্তঃ পরিচর্যা	লাউ ফসল পানির প্রতি খুবই সংবেদনশীল। কাজেই সেচ নালা দিয়ে প্রয়োজন অনুসারে নিয়মিত সেচ দিতে হবে। লাউয়ের জমিতে কখনও সমস্ত জমি ভিজিয়ে প্লাবন সেচ দেয়া যাবে না। শুধুমাত্র সেচ নালায় পানি দিয়ে আটকে রাখলে গাছ পানি টেনে নিবে। প্রয়োজনে সেচ নালা হতে ছোট কোন পাত্র দিয়ে কিছু পানি গাছের গোড়ায় সেচ দেওয়া যায়। শুস্ক মৌসুমে লাউ ফসলে ৫-৭ দিন অন্তর সেচ দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। গাছের গোড়ার দিকে ৪০ -৪৫ সেমি পর্যন্ত শোষক শাখা (ডালপালা) গুলো ধারালো বেড দিয়ে কেটে অপসারণ কতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	বপনের ৩৫ দিন পর থেকেই ডগা কর্তন শুরু করা যায় এবং ৯৫ দিন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।
ফলন (টন/হেক্টর)	৫৫
লাভক্ষতির বিবরণ	মোট আয় : হেক্টর প্রতি টাকা ১২,০৮,৬৯৬/- উৎপাদন ব্যয় : হেক্টর প্রতি টাকা ১,৫০,১৫২/- মোট মুনাফা : হেক্টর প্রতি টাকা ১০,৫৮,৫৪১/-

উপযোগী অঞ্চল: টাঙ্গাইল ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৭, ৮, ৯ এবং ২৮ এর অনুরূপ অঞ্চল

প্রযুক্তি-৩: টাংগাইল অঞ্চলে চার ফসল ভিত্তিক আলু-সবজি-পাট-মাসকলাই একটি উন্নত ফসল বিন্যাস

বৃহত্তর টাংগাইল অঞ্চলে তামাক-পাট-মাসকলাই একটি প্রচলিত ফসল বিন্যাস কিন্তু তামাক পরিবেশ ও শারীরিকভাবে হুমকি হওয়ায় তামাকের পরিবর্তে আলু ও সবজি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এই উন্নত ফসল বিন্যাসে (আলু-সবজি-পাট-মাসকলাই) আলু, সবজি ও মাসকলাই এর উন্নত জাত ও এতে আলুর সমতুল্য ফলন ৬১% বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে যেখানে কৃষকের প্রচলিত বিন্যাসে ২৫.৯৯ টন/হেক্টর সমতুল্য ফলন পাওয়া যায়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ			
ফসল	আলু	সবজি	পাট	মাসকলাই
জাত	বারি আলু-৭	বারি ডাটা-২ বারি পুঁইশাক-২ বারি গিমাকলমী-১	ও-৯৮৯৭	বারি মাস-৩
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৬০ × ২৫	ছিটিয়ে ৩০ × ২০ ৩০ × ২০	ছিটিয়ে	ছিটিয়ে
বপন/রোপণের সময়	নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ	মে শেষ সপ্তাহ	সেপ্টেম্বরের ২য় সপ্তাহ
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)				
ইউরিয়া	২৪০	২৫০ ১৮০ ১৬০	২০০	৪০
টিএসপি	১৩০	১০০ ১২৫ ১২০	৫০	৮৫
এমওপি	২৫০	১৫০ ১২৫ ৩৭৫	৬০	৩০
জিপসাম	১৩২	০	১১০	০
জিংক সালফেট	১০.৩	০	১১.২	০
বরিক এসিড	১০.৩	০	০	০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	ইউরিয়া ছাড়া সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং ইউরিয়া সমান ২ ভাগে রোপনের ২৫ এবং ৪৫ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে।	এক তৃতীয়াংশ ইউরিয়া এবং বাকি সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকী ইউরিয়া দুই ভাগে ভাগ করে পুঁইশাক ও গীমাকলমী প্রথম ও ২য় বার উত্তোলনের পর প্রয়োগ করতে হবে।	অর্ধেক ইউরিয়া এবং বাকি সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় এবং বাকি অর্ধেক বপনের ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	সকল সার জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হবে।

ফসলের আন্তঃপরিচর্যা	আলু রোপণের ২০ দিন পর আগাছা দমন ও সেচ দিতে হবে। আলুর বস্নাইট রোগ দমনের জন্য ডায়থেন এম-৪৫ ডপিস্নউপি প্রতি লিটার পানিতে ০.২ গ্রাম মিশিয়ে রোপনের ৪০ দিন পর প্রতি ১০ দিন অন্তর ২ বার স্প্রে করতে হবে।	সেচ, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা প্রয়োজনমত করতে হবে।	তোষা পাটে খরার সময় হলুদ মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে। সেই সময় থিওভিট ৮০% প্রতিবার ৫ লিটার পানির সাথে ৩৫ গ্রাম পাউডার মিশিয়ে তিন দিন পাতার নীচের দিকে স্প্রে করলে মাকড় দমন করা যায়।	সেচ, রোগবালাই ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য আন্তঃপরিচর্যা প্রয়োজনমত করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	ফেব্রুয়ারির ১ম সপ্তাহ	এপ্রিলের ৩য় সপ্তাহ	জুলাই এর ৩য় সপ্তাহ	অক্টোবর এর শেষ সপ্তাহ
ফলন (টন/হেক্টর)	২২.৬	ডাটা : ১৪.৫ পুঁইশাক : ১৫.৩ গীমাকলমি : ২৩.২	৩.৩	১.২
জীবনকাল (দিন)	৯৫	৭৯	১০০	৬৮
দুই ফসলের আন্তঃর্বর্তীকালীন সময় (দিন)	২	২	১৭	৩
লাভক্ষতির বিবরণ	মোট আয় উৎপাদন ব্যয় মুনাফা	: : :	হেক্টর প্রতি টাকা ৬৫০৯৫৩/- হেক্টর প্রতি টাকা ২৭১৪৯৬/- হেক্টর প্রতি টাকা ৩৭৯৪৫৭/-	

উপযোগী অঞ্চল: টাংগাইল ও কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ৭, ৮, ৯, ও ২৮ এর অনুরূপ অঞ্চল।

প্রযুক্তি-৬: খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলে রোপা আমন-সরিষা-মুগডাল একটি উন্নত ফসল ধারা

খুলনার উপকূলীয় অঞ্চলে উন্নত ফসল ধারায় সরিষা ও মুগডাল অন্তর্ভুক্ত করায় ধানের সমতুল্য ফলন ১২.১৫ টন/হেক্টর যেখানে রোপা আমন ধান-পতিত-পতিত ফসল ধারায় ৪.৬৩ টন/হেক্টর পাওয়া যায় যা ১৬২% বৃদ্ধি পায় কৃষকের ফসল ধারার চেয়ে রোপা আমন ধান কাটার পর স্বল্প মেয়াদী সরিষা ও মুগ অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এতে মুনাফা ১২৫% বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসল বিন্যাসের বিবরণ		
ফসল	রোপা আমন ধান	সরিষা	মুগবীন
জাত	বিনাধান-৭	বারি সরিষা-১৪	বারি মুগ-৬
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	২০ × ১৫	ছিটিয়ে	ছিটিয়ে
বপন/রোপণের সময়	জুলাই এর শেষ সপ্তাহ থেকে আগষ্টের ২য় সপ্তাহ	নভেম্বর	ফেব্রুয়ারির ৩য় সপ্তাহ

সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	১৮০	৩৩০	৫০
টিএসপি	১২৫	১৮০	৮৫
এমওপি	৭৫	৪০	৩৫
জিপসাম	৬২.৫	১৮৫	০
জিংক সালফেট	৫	১৫	০
বরিক এসিড	০	৭	০
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	ইউরিয়া ব্যতীত সকল সার জমি প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে দিতে হবে। ইউরিয়া সমান তিনভাগে ভাগ করে চারা রোপনের ১৫,৩০, ও ৪৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	ইউরিয়া ছাড়া বাকি সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় এবং ইউরিয়া সমান দুই কিসিত্মতে বপনের ৭ ও ২০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হবে।
ফসলের আন্তঃ পরিচর্যা	স্টেমবোরার দমনের জন্য ফুরাডান ১৫ কেজি/হেক্টর দ্বিতীয় বার আগাছা দমনের সময় প্রয়োগ করতে হবে।	সরিষাতে ১০-১২ এবং ২০-২২ দিনের ভিতরে দুই বার অতিরিক্ত চারা এবং আগাছা তুলে ফেলতে হবে। রোভরাল ডব্লিউপি প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম মিশিয়ে ৩ বার স্প্রে করে সরিষার অল্টারনেরিয়া ব্লাইট দমন করা যায়।	আগাছা দমন এবং পাতলা করণ বীজ বপনের ২০ দিনের মধ্যে করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ	ফেব্রুয়ারির ৩য সপ্তাহ	এপ্রিলের ৩য় সপ্তাহ থেকে মে এর ৩য় সপ্তাহ
ফলন (টন/হেক্টর)	৪.৩	১.৩	১.৪
জীবনকাল (দিন)	৯০	৮০	৭০
দুই ফসলের অন্তর্বর্তীকালীন সময় (দিন)	২৫	২০	৯০
লাভক্ষ তির বিবরণ	মোট আয় : হেক্টর প্রতি টাকা ১৯৮৪৭০/- উৎপাদন ব্যয় : হেক্টর প্রতি টাকা ১১০৯২২/- মুনাফা : হেক্টর প্রতি টাকা ৮৭৫৪৮/-		

উপযোগী অঞ্চল: খুলনার উপকূলবর্তী এলাকা এবং কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১১, ১৩ ও ১৪ এর অনরূপ অঞ্চল।

প্রযুক্তি-৭: বগুড়ার চরাঞ্চলে রসুনের সাথে চীনাবাদামের আন্তঃফসল চাষ একটি লাভজনক প্রযুক্তি

বগুড়ার চরাঞ্চলে (সারিয়াকান্দি) চীনাবাদাম একক হিসেবে চাষাবাদ করা হয়। সরেজমিন গবেষণা বিভাগে বগুড়ার চরাঞ্চলে চীনাবাদামের একক ফসলের পরিবর্তে চীনাবাদামের দুই সারির মধ্যে দুই সারি রসুন আবাদ করা হয় এবং এতে চীনাবাদামের সমতুল্য ফলন ৭.৫৪ টন/হেক্টর পাওয়া যায়। দেখা যায় একক চীনাবাদামের চাষের চেয়ে রসুনের সাথে চীনাবাদামের আন্তঃফসল চাষে প্রায় ১৬১% বেশি মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসলের বিবরণ	
ফসল	রসুন	চীনাবাদাম
জাত	বারি রসুন-১	বারি চীনাবাদাম-৮
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	১৫ × ৫	৪০ × ১৫
বপন পদ্ধতি	দুই সারি রসুনের মাঝে এক সারি চীনাবাদাম	
বপন/রোপণের সময়	নভেম্বরের ২য় সপ্তাহ	
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর):		
ইউরিয়া	১০৫	
টিএসপি	৪০০	
এমওপি	৮০	
জিপসাম	১৭০	
জিংক সালফেট	১৩.৫	
বরিক এসিড	৭	
গোবর সার	৫০০০	
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	অর্ধেক ইউরিয়াসহ বাকি সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় প্রয়োগ করতে হবে এবং বাকি ইউরিয়া সমান দুইভাগে করে ফুল আসার সময় উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	
ফসলের আন্তঃ পরিচর্যা	রোপণের ৩৫ দিন পর থ্রিপস দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ২ মিলিলিটার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।	মোট ৭-৮ টি সেচ প্রয়োগ করতে হবে। রোগবালাই এবং অন্যান্য আন্তঃ পরিচর্যা সময়মতো করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	এপ্রিলের ২য় সপ্তাহ	এপ্রিলের শেষ সপ্তাহ
ফলন (টন/হেক্টর)	৪.৭	২.৪
লাভক্ষতির বিবরণ	মোট আয় : হেক্টর প্রতি টাকা ৪১৪৭০০/- উৎপাদন ব্যয় : হেক্টর প্রতি টাকা ৯৫৯৩৯/- মোট মুনাফা : হেক্টর প্রতি টাকা ৩১৮৭৬১/-	

উপযোগী অঞ্চল: বগুড়ার চরাঞ্চল এবং কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-৪ এর অনুরূপ অঞ্চল।

প্রযুক্তি-৮: ভোলা অঞ্চলে পেঁয়াজের সাথে মরিচ ও বাদামের আন্তঃফসল চাষ

মরিচ এবং চীনাবাদাম ভোলা অঞ্চলের প্রধান রবি ফসল এবং শীতকাল দেরিতে আসার কারণে ভোলাতে পেঁয়াজের ফলন খুব কম হয়। এজন্য সরেজমিন গবেষণা বিভাগ ভোলা অঞ্চলে দুই সারি মরিচের মাঝে দুই সারি পেঁয়াজ এবং দুই সারি চীনাবাদামের মাঝে এক সারি পেঁয়াজ চাষ করে লাভবান হয়েছে এবং সামগ্রিক ফলনও বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন প্রকার ফলনের উপর প্রভাব না ফেলে শুকনা মরিচের সমতুল্য ফলন ২.৫৫ টন/হেক্টর এবং চীনাবাদামের সমতুল্য ফলন ২.১৩ টন/হেক্টর পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া পেঁয়াজ ও মরিচের আন্তঃফসল চাষে ৩০% এবং পেঁয়াজ ও বাদামের আন্তঃফসল চাষে ১০১% মুনাফা পাওয়া গেছে।

উৎপাদন প্রযুক্তি

বিষয়	ফসলের বিবরণ		
ফসল	মরিচ	চীনাবাদাম	পেঁয়াজ
জাত	বারি মরিচ-১	ঢাকা-১	বারি পেঁয়াজ-১
বপন/রোপণ দূরত্ব (সেমি)	৪০ × ৪০	৩০ × ১৫	১০ × ৫
বপন পদ্ধতি	দুই সারি মরিচের সাথে দুই সারি পেঁয়াজ	দুই সারি বাদামের মাঝে এক সারি পেঁয়াজ	
বপন/রোপণের সময়	ডিসেম্বরের ২য় সপ্তাহ	ডিসেম্বরের ৩য় সপ্তাহ	
সারের মাত্রা (কেজি/হেক্টর)			
ইউরিয়া	২০৬	১২০	-
টিএসপি	২৭০	২২০	-
এমওপি	৪০	৯০	-
জিপসাম	১৬০	১৩৫	-
জিংক সালফেট	৩.৫	৩.৫	-
বরিক এসিড	০	০	-
গোবর সার	৫০০০	৫০০০	-
সার প্রয়োগ পদ্ধতি	এক তৃতীয়াংশ পটাশ এবং ইউরিয়া ছাড়া সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় এবং ইউরিয়া সমান তিন কিস্তিতে রোপণের ২৫, ৫০ এবং ৭০ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	এক তৃতীয়াংশ পটাশ এবং ইউরিয়া ছাড়া সকল সার শেষ জমি প্রস্তুতের সময় এবং ইউরিয়া সমান তিন কিস্তিতে রোপণের ১৫, ৫০ এবং ৬৫ দিন পর উপরি প্রয়োগ করতে হবে।	
ফসলের আন্তঃ পরিচর্যা	ফসলে চারা রোপণের ২০-২৫ দিনে একবার এবং ৪০-৪৫ দিন পর একবার আগাছা দমন করতে হয়।	মোট ৭-৮ টি সেচ প্রয়োগ করতে হবে। রোগবালাই এবং অন্যান্য আন্তঃ পরিচর্যা সময়মতো করতে হবে।	রোপণের ৩৫ দিন পর থ্রিপস দমনের জন্য ম্যালাথিয়ন ৫৭ ইসি@ ২ মিলিলিটার প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।
ফসল সংগ্রহের সময়কাল	এপ্রিলের ২য় সপ্তাহ থেকে ৩য় সপ্তাহ	মে এর ২য় সপ্তাহ	মার্চের শেষ সপ্তাহ
ফলন (টন/হেক্টর)	পেঁয়াজ : ৩.৯ মরিচ : ১.৯	পেঁয়াজ : ২.৯৪ চীনাবাদাম : ১.৪	
লাভক্ষতির বিবরণ			
মোট আয় (হেক্টর প্রতি টাকা)	৩০৬০০০	১৭০০০০	-
উৎপাদন ব্যয় (হেক্টর প্রতি টাকা)	১৩১৬৪৫	৯৮৬৫০	-
মুনাফা (হেক্টর প্রতি টাকা)	১৭৪৩৫৫	৭১৩৫০	-

উপযোগী অঞ্চল: ভোলাসহ কৃষি পরিবেশ অঞ্চল-১৮।

বিএআরআই উদ্ভাবিত ফসলের জাতসমূহ

গম

প্রযুক্তি/ ফসল/ জাত	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন		জীবনকাল (দিন)
			রবি টন/হেক্টর	খরিফ টন/ হেক্টর	
কল্যানসোনা (মেক্সি-৬৫)	১৯৭৪	রবি	২.৬-৩.২	-	১০৭-১১২
সনোরা-৬৪	১৯৭৪	রবি	১.৬-২.২	-	১০৫-১০৭
ইনিয়া-৬৬	১৯৭৪	রবি	২.৫-৩.০	-	১০৫-১১০
নরটেনো-৬৭	১৯৭৪	রবি	২.৮-৩.২	-	১০৫-১১০
সোনালিকা	১৯৭৪	রবি	৩.০-৩.৫	-	১০০-১০৪
ট্যানোরি-৭১	১৯৭৫	রবি	২.৮-৩.২	-	১০৪-১০৮
জুপাটেকো- ৭৩	১৯৭৫	রবি	৩.০-৩.২	-	১০৯-১১৪
নুরী-১০	১৯৭৫	রবি	২.৫-৩.০	-	১১০-১১৫
পাভন-৭৬	১৯৭৯	রবি	৩.০-৩.৬	-	১১২-১১৭
দোয়েল	১৯৭৯	রবি	২.৫-৩.০	-	১০৭-১১২
বলাকা	১৯৭৯	রবি	২.৬-৩.০	-	১০৫-১১০
আনন্দ	১৯৮৩	রবি	২.৪-৩.৪	-	১০৩-১০৮
কাঞ্চন	১৯৮৩	রবি	৩.৩-৪.০	-	১০৬-১১২
বরকত	১৯৮৩	রবি	৩.৪-৪.০	-	১০৫-১১০
আকবর	১৯৮৩	রবি	৩.৫-৪.০	-	১০৩-১০৮
অঘ্রানী	১৯৮৭	রবি	২.৫-৩.৬	-	১০৩-১১০
সওগাত	১৯৯৩	রবি	২.৭-৩.৭	-	১০৪-১০৮
প্রতিভা	১৯৯৩	রবি	২.৮-৩.৮	-	১০৫-১১০
বারি গম-১৯ (সৌরভ)	১৯৯৮	রবি	৩.৫-৪.৬	-	১০২-১১০
বারি গম-২০ (গৌরব)	১৯৯৮	রবি	৩.৬-৪.৮	-	১০০-১০৮
বারি গম-২১ (শতাব্দী)	২০০০	রবি	৩.৬-৪.৮	-	১০৮-১১৫
বারি গম-২২ (সুফী)	২০০৫	রবি	৩.৬-৪.৩	-	১০০-১১০
বারি গম-২৩ (বিজয়)	২০০৫	রবি	৪.৩-৫.০	-	১০৪-১১২
বারি গম-২৪ (প্রদীপ)	২০০৫	রবি	৪.৩-৫.১	-	১০৪-১১০
বারি গম-২৫	২০১০	রবি	৩.৮-৫.০	-	১০২-১১০
বারি গম-২৬	২০১০	রবি	৪.০-৫.০	-	১০৪-১১০
বারি গম-২৭	২০১২	রবি	৪.০-৫.৪	-	১০৬-১১২
বারি গম-২৮	২০১২	রবি	৪.০-৫.৫	-	১০২-১০৮
বারি গম-২৯	২০১৪	রবি	৪.০-৫.০	-	১০৫-১১০
বারি গম-৩০	২০১৪	রবি	৪.৫-৫.৫	-	১০০-১০৫
বারি গম-৩১	২০১৭	রবি	৪.৫-৫	-	১০৫-১০৯
বারি গম-৩২	২০১৭	রবি	৪.৬-৫	-	৯৬-১০৫
বারি গম-৩৩	২০১৭	রবি	৪.০-৫.০	-	১১০-১১৫

ট্রিটিক্যালি-২

প্রযুক্তি/ ফসল/ জাত	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন		জীবনকাল (দিন)
			রবি টন/হেক্টর	খরিফ টন/ হেক্টর	
বারি ট্রিটিক্যালি-১	২০০৯	রবি	বপনের ৪০ দিন পর একবার ঘাস হিসেবে কাটলে হেক্টরপ্রতি ৪.৩-৪.৫ টন দানা এবং ১০-১২ সবুজ ঘাস পাওয়া যায়		১০৬-১১২
বারি ট্রিটিক্যালি-২	২০০৯	রবি	বপনের ৪০ দিন পর একবার ঘাস হিসেবে কাটলে হেক্টরপ্রতি ৪.৩-৪.৬ টন দানা এবং ১০-১২ টন সবুজ ঘাস পাওয়া যায়		১১০-১১৬

ভুট্টা

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
শুভ্রা	১৯৮৬	রবি	৪.৫-৫.৫	১৩৫-১৪৫
বর্ণালী	১৯৮৬	রবি	৫.৫-৬.০	১৪০-১৪৫
খৈ-ভুট্টা	১৯৮৬	রবি	৩.৫-৪.০	১২৫-১৩০
মোহর	১৯৯১	রবি	৫.০-৫.৫	১৩৫-১৪৫
বারি ভুট্টা -৫	১৯৯৮	রবি	৫.০-৫.৫	১৪৫-১৫৫
বারি ভুট্টা -৬	১৯৯৮	রবি	৬.৫-৭.০	১৪৫-১৫০
বারি ভুট্টা -৭	২০০২	রবি	৬.৫-৭.৫	১৪৫-১৫৫
বারি মিষ্টি ভুট্টা-১	২০০২	রবি	১০.০-১০.৫	১১৫-১২০ (কাঁচা মোচা)
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১	২০০২	রবি	৮.৫-৯.৫	১৪০-১৫০
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-২	২০০২	রবি	৮.০-৯.০	১৪৫-১৫০
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৩	২০০২	রবি	৯.৫-১০.০	১৪৫-১৫০
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৪	২০০২	রবি	৭.৫-৮.৫	১৪০-১৪৫
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৫	২০০৪	রবি	৯.৫-১০.০	১৪০-১৪৫
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৬	২০০৬	রবি	৯.৫-১০.০	১৪০-১৪৫
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৭	২০০৬	রবি	১০.৫-১১.৫	১৪০-১৪৫
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৮	২০০৭	রবি	১০.৫-১১.৫	১৪৫-১৫০
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-৯	২০০৭	রবি	১১.৫-১২.৫	১৪৫-১৫০
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১০	২০০৯	রবি	১০.০-১১.৫	১৪৫-১৫০
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১১	২০০৯	রবি	১০.৫-১১.৫	১৫০-১৫৫
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১২	২০১৬	রবি	৮.১-৮.৫ (খরা অবস্থায়	১৪০ - ১৪৫

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
			একটি সেচ প্রয়োগে) ১০.০-১১.১ (স্বাভাবিক সেচ প্রয়োগে)	
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৩	২০১৬	রবি	৮.২-৮.৯ (খরা অবস্থায় একটি সেচ প্রয়োগে) ১০.১-১১.২ (স্বাভাবিক সেচ প্রয়োগে	১৪৫-১৫২
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৪	২০১৭	রবি খরিফ	রবি মৌসুমে ১০.৮৪ টন খরিফ মৌসুমে ১০.৫২ টন	রবি - ১৪০ দিন খরিফ - ১১৫ দিন
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৫	২০১৭	রবি খরিফ	রবি মৌসুমে ১২.৭৫ টন খরিফ মৌসুমে ১২.০৭ টন	রবি - ১৪৮ দিন খরিফ - ১২১ দিন
বারি হাইব্রিড ভুট্টা-১৬	২০১৮	রবি	রবি মৌসুমে ১১.৫৭ লবণাক্ত এলাকায় ৭.০৬ টন	রবি - ১৪৫ দিন
বারি বেবি কর্ণ-১	২০১৩	রবি	১.২৭-১.৩০ (খোসা বিহীন)	৮৫-১০০ (মোচা সংগ্রহের সময়)
কাউন				
তিতাস	১৯৮৯	রবি	২.০-২.৫	৯০-১১০
বারি কাউন-২	২০০১	রবি	২.৭৫-৩.০	১২০-১২৫
বারি কাউন-৩	২০০১	রবি	২.৫-৩.০০	১২০-১২৫
চিনা				
তুষার	১৯৮৯	রবি	২.৫-৩.০	৯০-৯৫
বার্লি				
বারি বার্লি-১	১৯৯৪	রবি	২.০-২.৫	১০৮-১১২
বারি বার্লি-২	১৯৯৪	রবি	২.০-২.২	১১০-১১৫
বারি বার্লি-৩	২০০১	রবি	২.২-২.৫	৯৫-১০০
বারি বার্লি-৪	২০০১	রবি	১.৭৫-২.০	৯৫-১০০

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি বার্লি-৫	২০০৫	রবি	২.৫-৩.০	৯৫-৯৮
বারি বার্লি-৬	২০০৫	রবি	২.৫-২.৭৫	৯৮-১০২
বারি বার্লি-৭	২০১৫	রবি	২.২-২.৫	৯০-১০৫
বারি বার্লি-৮	২০১৮	রবি	২.২০-২.৫১	৯৫
বারি বার্লি-৯	২০১৮	রবি	২.২ টন (দানা) ৪.২ টন (খড়)	৯৭-৯৯

ডাল ফসল

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
ছোলা				
নবীন	১৯৮৭	রবি	১.৭-১.৮	১১৫-১২০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)
বারি ছোলা-২	১৯৯৩	রবি	১.৮-১.৯	১২০-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)
বারি ছোলা-৩	১৯৯৩	রবি	১.৮-১.৯	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)
বারি ছোলা-৪	১৯৯৬	রবি	১.৭-১.৮	১২০-১২৫ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)
বারি ছোলা-৫	১৯৯৬	রবি	১.৮-১.৯	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)
বারি ছোলা-৬	১৯৯৬	রবি	১.৮-২.০	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)
বারি ছোলা-৭	১৯৯৮	রবি	২.৫-২.৮	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)
বারি ছোলা-৮	১৯৯৮	রবি	১.৫-১.৬০	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)
বারি ছোলা-৯	২০১১	রবি	১.৫০-২.৫	১২৫-১৩০ (মধ্য নভেম্বর মধ্য মার্চ)
বারি ছোলা-১০	২০১৭	রবি	১.৮-২.০৩	১১২-১২১
বারি ছোলা-১১	২০১৮	রবি	১.২৫-১.৫	১০০-১০৬
মসুর				
উৎফলা	১৯৯১	রবি	১.৭-১.৮	১০৫-১১০ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)
বারি মসুর-২	১৯৯৩	রবি	১.৭-১.৮	১০৫-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)
বারি মসুর-৩	১৯৯৬	রবি	১.৮-১.৯	১০৫-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি মসুর-৪	১৯৯৬	রবি	১.৯-২.০	১০৫-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)
বারি মসুর-৫	২০০৬	রবি	২.০-২.২	১১০-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)
বারি মসুর-৬	২০০৬	রবি	২.০-২.৩০	১১০-১১৫ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)
বারি মসুর-৭	২০১১	রবি	১.৬০-২.২	১১৫-১২০ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মধ্য ফেব্রুয়ারি)
বারি মসুর-৮	২০১৫	রবি	২.২-২.৩	১১৫-১২০ (অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ থেকে মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ)
বারি মসুর-৯	২০১৮	রবি	১.১৯-১.৫২	৮৫-৯০
খেসারি				
বারি খেসারি-১	১৯৯৩	রবি	১.৪-১.৬	১২৫-১৩০ (নভেম্বর-মার্চ)
বারি খেসারি-২	১৯৯৬	রবি	১.৫০-২.০	১২৫-১৩০ (নভেম্বর-মার্চ)
বারি খেসারি-৩	২০১১	রবি	১.৫-১.৭	১৩০-১৩৫ (নভেম্বর-মার্চ)
বারি খেসারি-৪	২০১৪	রবি	০.৭২-১.০৮	১১৪-১১৭
বারি খেসারি-৫	২০১৮	রবি	১.৪৭-১.৭০	১২১-১২৫
মুগ				
মুবারিক	১৯৮২	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.২-১.৩০ ১.৫-১.৬০ ১.০-১.১০	৬৫-৭০
কান্তি	১৯৮৭	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.২-১.৩০ ১.৫-১.৬০ ১.০-১.১০	৬০-৬৫
বারি মুগ-৩	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.২-১.৩ ১.৩-১.৪ ১.০-১.১	৬০-৬৫
বারি মুগ-৪	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৩-১.৪ ১.৪-১.৫ ১.২-১.৩	৬০-৬৫
বারি মুগ-৫	১৯৯৭	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৭-১.৮ ২.০-২.১ ১.৫-১.৬	৫৫-৬০

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি মুগ-৬	২০০৩	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৮-১.৯ ২.০-২.১ ১.৭-১.৮	৫৫-৫৮
বারি মুগ-৭	২০১৫	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৮-১.৯ ২.০-২.২ ১.৭-১.৮	৬০-৬২
বারি মুগ-৮	২০১৫	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৫-১.৬ ১.৬-১.৭ ১.৫-১.৬	৬০-৬২
মাসকলাই				
বারি মাস-১	১৯৯০	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৫-১.৬ ১.৫-১.৬ ১.৬-১.৭	৭০-৭৫
বারি মাস-২	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৫-১.৬ ১.৫-১.৬ ১.৬-১.৭	৭০-৭৫
বারি মাস-৩	১৯৯৬	বিলম্ব রবি খরিফ-১ খরিফ-২	১.৬-১.৭ ১.৬-১.৭ ১.৮-১.৯	৭০-৭৫
বারি মাস-৪	২০১৭	খরিফ-১ খরিফ-২	১২৫০-১৪৪০ কেজি/হেক্টর	৬৯-৭৩
ফেলন				
বারি ফেলন-১	১৯৯৩	রবি	১.৫-১.৬	১২৫-১৩৫
বারি ফেলন-২	১৯৯৬	রবি	১.৫-১.৬	১২০-১৩০
মটর				
বারি মটর-১	২০১৩	রবি	১.৫-১.৮	১১০-১১৫
বারি মটর-২	২০১৫	রবি	১.০৮-১.১৪	৭৫-৮০
বারি মটর-৩	২০১৭	রবি	২.০১-২.২৯	১০১-১০৫

তৈলবীজ ফসল

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
সরিষা				
টরি-৭	১৯৭৬	রবি	০.৯-১.০	৭০-৮০
রাই-৫	১৯৭৬	রবি	১.০-১.১	৯০-১০০
কল্যাণীয়া (টিএস-৭২)	১৯৭৯	রবি	১.৪৫-১.৬৫	৮৫-৯০
সোনালী (এসএস-৭৫)	১৯৭৯	রবি	১.৮-২.০	৯০-১০০
দৌলত	১৯৮৮	রবি	১.১-১.৩	৯০-১০৫
বারি সরিষা-৬ (ধলি)	১৯৯৪	রবি	১.৯-২.২	৯০-১০০

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি সরিষা-৭	১৯৯৪	রবি	২.০-২.৫	৯০-৯৫
বারি সরিষা-৮	১৯৯৪	রবি	২.০-২.৫	৯০-৯৫
বারি সরিষা-৯	২০০০	রবি	১.২৫-১.৪৫	৮০-৮৫
বারি সরিষা-১০	২০০০	রবি	১.২৫-১.৪৫	৮০-৮৫
বারি সরিষা-১১	২০০১	রবি	২.০-২.৫	১০৫-১১০
বারি সরিষা-১২	২০০১	রবি	১.৪৫-১.৬৫	৮৫-৯০
বারি সরিষা-১৩	২০০৪	রবি	২.২০-২.৮০	৯০-৯৫
বারি সরিষা-১৪	২০০৬	রবি	১.৪-১.৬	৭৫-৮০
বারি সরিষা-১৫	২০০৬	রবি	১.৪-১.৭	৮০-৮৫
বারি সরিষা-১৬	২০০৯	রবি	২.২-২.৫	১০৫-১১০
বারি সরিষা-১৭	২০১৩	রবি	১.৭-১.৮	৮০-৮৫
বারি সরিষা-১৮	২০১৮	রবি	২.০-২.৫	৯৫-১০০
তিল				
টি-৬	১৯৭৬	খরিফ	০.৯৫-১.১০	৮৫-৯০
বারি তিল-২	২০০১	খরিফ	১.২০-১.৩০	৯০-১০০
বারি তিল-৩	২০০১	খরিফ	১.২-১.৪	৯০-১০০
বারি তিল-৪	২০০৯	খরিফ	১.৪-১.৫	৯০-১০০
চীনাবাদাম				
মাইজচর (ঢাকা-১)	১৯৭৬	রবি খরিফ	১.৬-২.০ ১.৬-১.৮	১৪০-১৫০ ১২০-১৪০
বাসন্তী (ডিজি-২)	১৯৮১	রবি খরিফ	১.৮০-২.২ ২.০-২.২	১৫০-১৬৫ ১৪৫-১৫৫
ত্রিদানা (ডিএম-১)	১৯৮৭	খরিফ	২.০-২.৪	১২০-১৩০
ঝিঙ্গাবাদাম	১৯৮৮	রবি খরিফ	২.৪.২.৬ ২.৪-২.৬	১৪৫-১৫৫ ১৩০-১৪০
বারি চীনাবাদাম-৫	১৯৯৮	রবি খরিফ	২.৭-৩.০ ২.২.৫.০	১৩৫-১৫০ ১১৫-১২৫
বারি চীনাবাদাম-৬	১৯৯৮	রবি খরিফ	২.৫-২.৮ ২.০-২.৪	১৩৫-১৫০ ১১৫-১২৫
বারি চীনাবাদাম-৭	২০০৪	রবি খরিফ	২.৮-৩.০ ২.০-২.৫	১৩৫-১৫০ ১২০-১৩০
বারি চীনাবাদাম-৮	২০০৬	রবি খরিফ	২.৩-২-৫ ২.০-২.২	১৪০-১৫০ ১৩৫-১৪০
বারি চীনাবাদাম-৯	২০১০	রবি খরিফ	২.৩-২-৫ ২.০-২.২	১৪০-১৫০ ১৩০-১৩৫
বারি চীনাবাদাম-১০	২০১৬	রবি খরিফ	২.২-২-৫ ২.০-২.২	১৪০-১৫৫ ১২০-১৩৫

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদন মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
সয়াবিন				
সোহাগ	১৯৯২	রবি ও খরিফ	১.৫-২.০	৯০-১১০
বাংলাদেশ সয়াবিন-৪	১৯৯৪	রবি খরিফ	১.৫-২.২ ১.৫-২.০	১২০-২২০ ৮৫-৯৫
বারি সয়াবিন-৫	২০০১	রবি ও খরিফ	১.৬-২.০	৯০-১০০
বারি সয়াবিন -৬	২০০৯	রবি খরিফ	২.০-২.২ ১-৬-১.৮	১০০-১১০ ৯০-১০০
সূর্যমুখী				
কিরণী (ডিএস-১)	১৯৮৪	রবি খরিফ	১.৬-১.৮ ১.২-১.৪	১০০-১১০ ৯০-১০০
বারি সূর্যমুখী-২	২০০৪	রবি খরিফ	২.০-২.৩ ১.৫-১.৮	৯৫-১০০ ৮৫-৯০
গর্জন তিল				
শোভা	১৯৮৮	রবি	১.০৫-১.১৫	১০৫-১১০
তিসি				
নীলা	১৯৮৮	রবি	০.৯৫-১.১	১০০-১১৫
কুসুম				
বারি সেফ-১	১৯৯৯	রবি	১.১০-১.২০	১০০-১২০

সবজি ফসল

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি টমেটো ১ (মানিক)	১৯৮৬	রবি	৮৫-৯০	১০৫-১১০
বারি টমেটো ২ (রতন)	১৯৮৬	রবি	৮০-৮৫	১০৫-১১০
বারি টমেটো ৩	১৯৯৬	রবি	৮৫-৯০	১১০-১১৫
বারি টমেটো ৪	১৯৯৬	খরিফ	২০-২২	৯০-৯৫
বারি টমেটো ৫	১৯৯৬	খরিফ	২০-২২	৯৫-১০০
বারি টমেটো ৬ (চৈতী)	১৯৯৮	রবি ও খরিফ	৮৫-৯০ (শীতকালীন) ৪৫-৫০ (গ্রীষ্মকালীন)	১০০-১১০
বারি টমেটো ৭ (অপূর্ব)	১৯৯৮	রবি	৯৫-১০০	১০০-১১০
বারি টমেটো ৮ (শিলা)	১৯৯৮	রবি	৯০-৯৫	১০০-১১০

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি টমেটো ৯ (লালিমা)	১৯৯৮	রবি	৮৫-৯০	৯৫-১০৫
বারি টমেটো ১০ (অনুপমা)	১৯৯৮	খরিফ	৪৫-৫৫	৯০-১০০
বারি টমেটো ১১ (ঝুমকা)	২০০০	রবি	৪০-৫০	১০০-১১০
বারি টমেটো ১২ (সিঁদুর)	২০০০	রবি	৭৫-৮৫	১০০-১২০
বারি টমেটো ১৩ (শ্রাবণী)	২০০০	খরিফ	৪০-৪৫	১২০-১৩০
বারি টমেটো ১৪	২০০৭	রবি	৯০-৯৫	১৫০-১৬০
বারি টমেটো ১৫	২০০৯	রবি	৮০-৮৫	১৫০-১৬০
বারি টমেটো ১৬	২০১৫	রবি	৭০-৮০	১৬০-১৮০
বারি টমেটো ১৭	২০১৫	রবি	৭০-৭৫	১২০-১৩০
বারি টমেটো ১৮	২০১৭	রবি	৭০-৮০	১২০-১৫০
বারি টমেটো ১৯	২০১৭	রবি	৬৫-৬৭	১২০-১৫০
বারি হাইব্রিড টমেটো ৩ (গ্রীষ্মকালীন)	২০০৬	খরিফ	৪০-৪৫	১২০-১৩০
বারি হাইব্রিড টমেটো ৪ (গ্রীষ্মকালীন)	২০০৬	খরিফ	৪০-৫০	১২০-১৩০
বারি হাইব্রিড টমেটো ৫	২০০৮	রবি	৯৫-১০০	১২০-১৩০
বারি হাইব্রিড টমেটো ৬	২০০৮	রবি	৯০-৯৫	১২০-১৩০
বারি হাইব্রিড টমেটো ৭	২০১১	রবি	৯০-১০০	১৩০-১৫০
বারি হাইব্রিড টমেটো ৮	২০১১	খরিফ	৯০-৯৫	১৪০-১৫০
বারি হাইব্রিড টমেটো ৯	২০১৫	রবি	৭৫-৮০	১৪০-১৫০
বারি হাইব্রিড টমেটো ১০	২০১৭	খরিফ	৪০-৪২	১২০-১৩০
বারি বেগুন ১ (উত্তরা)	১৯৮৬	রবি	৫০-৫৫	১৩০-১৪০
বারি বেগুন ২ (শুকতারা)	১৯৯২	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩০

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি বেগুন-৩ (তারাপুরী)	১৯৯২	রবি	৫০-৫৫	১১০-১৪০
বারি বেগুন-৪ (কাজলা)	১৯৯৮	রবি	৫০-৫৫	১৫০-১৯০
বারি বেগুন-৫ (নয়নতারা)	১৯৯৮	রবি	৪০-৪৫	১৩০-১৫০
বারি বেগুন-৬	২০০৬	রবি	৪৫-৫০	১৪০-১৫০
বারি বেগুন-৭	২০০৬	রবি	৪০-৪৫	১৫০-১৬০
বারি বেগুন-৮	২০০৬	খরিফ	২০-২৫ (গ্রীষ্মকালে) ৪০-৪৫ (শীতকালে)	১৫০-১৬০
বারি বেগুন-৯	২০০৯	রবি	৪৫-৫০	১৮০-১৯০
বারি বেগুন-১০	২০০৯	রবি খরিফ	২৫-৩০ (গ্রীষ্মকালে) ৪৫-৫০ (শীতকালে)	১৮০-১৯০
বারি হাইব্রিড বেগুন-৩	২০১১	রবি	৫০-৫৫	১৪০-১৫০
বারি হাইব্রিড বেগুন-৪	২০১১	রবি	৫০-৫৫	১৪০-১৫০
বারি বিটি বেগুন-১	২০১৩	রবি	৫০-৫৫	১৩৫-১৪০
বারি বিটি বেগুন-২	২০১৩	রবি	৫০-৫৫	১৩০-১৪০
বারি বিটি বেগুন-৩	২০১৩	রবি	৪০-৪৫	১৪০-১৫০
বারি বিটি বেগুন-৪	২০১৩	রবি	৪৫-৫০	১৩০-১৪০
বারি ফুলকপি-১ (রূপা)	১৯৯৮	রবি	২৫-২৮	৯০-১০৫
বারি ফুলকপি-২	২০০৬	রবি	২৫-২৭	৯০-১০৫
বারি বাঁধাকপি-১ (প্রভাতী)	১৯৮৬	রবি	৫০-৬০	১০০-১১০
বারি বাঁধাকপি-২ (অগ্রদূত)	১৯৯৮	রবি	৫৫-৫৬	১০০-১১০
বারি মুলা-১ (তাসাকীসান মুলা)	১৯৮৪	রবি	৭০-৮০	৬৫-৭৫ (মুলার জন্য) ১৪৫-১৫৫ (বীজের জন্য)

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি মুলা-২ (পিংকি)	১৯৯৬	রবি	৫৫-৬০	৭০-৮০ (মুলার জন্য) ১৪৫-১৫৫ (বীজের জন্য)
বারি মুলা-৩ (দ্রুতি)	১৯৯৮	রবি	৪০-৪৫	৫৫-৬০
বারি মুলা-৪	২০০৮	রবি	৬৫-৭০	৬০-৭০
বারি বাটিশাক	১৯৮৪	রবি	৪০-৫০	১১০-১২০
বারি চিনাশাক	১৯৮৪	রবি	৪০-৫০	১১০-১২০
বারি চিনাকপি-১	১৯৯৬	রবি	৪৫-৫০	১১০-১২০
বারি লাউ-১	১৯৯৬	রবি	৪২-৪৫	১২০-১৪০
বারি লাউ-২	২০০৬	রবি	৪৫-৫০	১২০-১৪০
বারি লাউ-৩	২০১০	রবি	৬০-৬৫	১৩০-১৫০
বারি লাউ-৪	২০১০	রবি খরিফ	৫৫-৬০	১৩০-১৫০
বারি লাউ-৫	২০১৭	রবি	৪৮-৫০	১৪০-১৫০
বারি মিষ্টি কুমড়া-১	২০০৭	রবি	৩৫-৪০	১৩০-১৫০
বারি মিষ্টি কুমড়া-২	২০০৭	রবি ও খরিফ	২৫-৩০	১৩০-১৫০
বারি হাইব্রিড মিষ্টি কুমড়া-১	২০১৫	রবি	৩৮-৪২	১৪০-১৫০
বারি করলা-১	২০০৬	খরিফ	২২-২৩	১২০-১৩০
বারি করলা-২	২০১৭	খরিফ	২১.১	১০০-১২০
বারি করলা-৩	২০১৭	খরিফ	২১	১০০-১২০
বারি হাইব্রিড করলা-১	২০১১	খরিফ	১৬-২০	১৫০-১৬৫
বারি চালকুমড়া-১	২০০৬	খরিফ	২৫-৩০	১২০-১৩০
বারি পটল-১	২০০৬	খরিফ	৩০-৩৫	১১০-১২০
বারি পটল-২	২০০৬	খরিফ	৩৮-৪০	১১০-১২০
বারি হাইব্রিড পটল-১	২০১৫	খরিফ	১০-৪০	১২০-১৩০
বারি ঝিঙ্গা-১	২০০৮	খরিফ	২৫-২৬	১২০-১৩০
বারি ঝিঙ্গা-২	২০১৫	খরিফ	২৩-২৪	১২০-১৩০
বারি চিচিঙ্গা-১	২০১১	খরিফ	২৫-৩০	১০০-১৩০
বারি শিম-১	১৯৯৬	রবি	২০-২২	২০০-২২০
বারি শিম-২	১৯৯৬	রবি	১০-১২	১৯০-২১০
বারি শিম-৩	২০০৬	রবি ও খরিফ	১৫-২০	১৩০-১৫০
বারি শিম-৪	২০০৭	রবি	২৫-৩০	৮০-৯০
বারি শিম-৫ (খাটো)	২০০৯	রবি	১২-১৩	৭৫-৮০
বারি শিম-৬	২০১১	রবি	১৭-২০	২২০-২২৫

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি শিম-৭	২০১১	খরিফ	১২-১৩	১৫০-২০০
বারি শিম-৮	২০১৫	রবি	২২-২৫	১৫০-১৮০
বারি শিম-৯	২০১৭	রবি	শিমের ফলন ১৫.৫-১৬.২, বীজের ফলন ৭.৩-৯.৫	১৩০-১৬০
বারি শিম-১০	২০১৭	রবি	শিমের ফলন ১২.৬-১৫.৫, বীজের ফলন ৫.৫-৮.৫	১৫০-২০০
বারি মটরশুঁটি ১	১৯৯৬	রবি	১০-১২	৮০-৯০
বারি মটরশুঁটি ২	১৯৯৬	রবি	১২-১৪	৮০-৯০
বারি মটরশুঁটি ৩ (আগুরী)	২০০০	রবি	১০-১২	৮০-৮৫
বারি বরবটি ১	২০০৬	খরিফ	১৫-২০	১২০-১৩৫
বারি ঝাড় শিম ১ (ফ্রেন্সবিন)	১৯৯৬	রবি	১৩-১৫	১০০-১১০
বারি ঝাড় শিম ২ (ফ্রেন্সবিন)	২০০২	রবি	১৫-২০	১০০-১১০
বারি ঝাড় শিম ৩ (খাইস্যা)	২০১১	রবি	বীজের ফলন ৪.৫-৫	৭৫-৮০
বারি জ্যাক শিম ১	২০১১	রবি	১৪-১৬	৯০-১০০
বারি স্কোয়াশ-১	২০১৭	শীতকালে অক্টোবর-ডিসেম্বর	৪৩-৪৫ টন	৯০-১০০
বারি ঢেঁড়স ১	১৯৯৬	খরিফ	১৪-১৬	৮০-৮৫
বারি ঢেঁড়স ২	২০১৫	খরিফ	১৭-২১	৮০-৮৫
বারি গিমাকলমী ১	১৯৮৪	খরিফ	৪০-৫৪	৭০-৮০
বারি পুঁইশাক-১ (চিত্রা)	২০০০	খরিফ	৫০-৭৫	১০০-১১০
বারি পুঁইশাক ২	২০০৬	খরিফ	৫০-৭৫	১১০-১১৫
বারি লালশাক ১	১৯৯৬	রবি	১২-১৪	৪০-৪৫
বারি সবুজ ডাঁটাশাক ১	২০০৬	খরিফ	১০-১২	৪০-৪৫
বারি ডাঁটা-১ (লাবনী)	২০০০	খরিফ	৩৫-৪০	৫০-৬০
বারি ডাঁটা ২	২০০৬	খরিফ	৪৫-৫০	৫০-৬০
বারি লেটুস ১	২০০৭	রবি	২২-২৫	৫৫-৬০

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি মিষ্টি মরিচ-১	২০০৯	রবি	১৪-১৫	১২৫-১৩৫
বারি মিষ্টি মরিচ-২	২০১৫	রবি	২৫-৩০	১২৫-১৩৫
বারি সীতা লাউ-১	২০১১	রবি খরিফ	৩০-৩৫	১০-১৫ বৎসর
বারি কামরাঙ্গা শিম-১	২০১৫	রবি খরিফ	২০-২১	৮০-৯০
বারি পালংশাক-১	২০১৫	রবি	৪৫-৫০	৫৫-৬০
বারি চিনাল-১	২০১৫	রবি	২০-২২	৮০-৯০
বারি ব্রোকলী-১	২০১৫	রবি	১৫-২০	১৩৫-১৪০

ফল ফসল

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি আম-১	১৯৯৬	খরিফ (মে শেষ সপ্তাহ)	১৫	বহুবর্ষজীবী
বারি আম-২	১৯৯৬	খরিফ (জুন)	২০-২২	বহুবর্ষজীবী
বারি আম-৩	১৯৯৬	খরিফ (জুন- জুলাই)	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী
বারি আম-৪	২০০২	খরিফ (জুলাই- আগস্ট)	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী
বারি আম-৫	২০০৯	খরিফ (মে)	১৫-২০	বহুবর্ষজীবী
বারি আম-৬	২০০৯	খরিফ (জুন)	১৫-১৬	বহুবর্ষজীবী
বারি আম-৭	২০০৯	খরিফ (জুন)	২০-২৫	বহুবর্ষজীবী
বারি আম-৮ (বহুভ্রূণী)	২০০৯	খরিফ (জুলাই)	২০-২৫	বহুবর্ষজীবী
বারি আম-৯	২০১১	খরিফ (মে)	১.৩৫ (সাত বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী
বারি আম-১০	২০১২	খরিফ (জুন)	১৫-২০	বহুবর্ষজীবী
বারি আম-১১	২০১৫	রবি ও খরিফ	২.২ (৬ বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী
বারি কাঁঠাল-১	২০০৮	মে-জুন	১১৮	বহুবর্ষজীবী
বারি কাঁঠাল-২	২০১১	জানুয়ারি- এপ্রিল	৩৮-৫৮	বহুবর্ষজীবী
বারি কাঁঠাল-৩	২০১৪	সেপ্টেম্বর-জুন	১২০-১৩০ (৩২ বছর বয়স্ক গাছে)	বহুবর্ষজীবী
বারি কলা -১	২০০০	সারা বছর	৫০-৬০	১২-১৪ মাস
বারি কলা-২	২০০০	সারা বছর	৩৫-৪০	১১-১২ মাস
বারি কলা-৩	২০০৫	সারা বছর	৪০-৫০	১২-১৪ মাস
বারি কলা-৪	২০০৭	অক্টোবর-মার্চ	৪২-৪৭	১১-১৩ মাস
বারি কলা-৫	২০১৭	নভেম্বর-মার্চ	৫০	৩১০-৩২০
শাহী পেঁপে	১৯৯২	সারা বছর	৪০-৬০	৮-১০ মাস
কাজী পেয়ারা	১৯৮৪	সারা বছর	২৮	বহুবর্ষজীবী
বারি পেয়ারা-২	১৯৯৬	সারা বছর	২৫-৩০	বহুবর্ষজীবী
বারি পেয়ারা-৩	২০০৩	সারা বছর	২০-২০	বহুবর্ষজীবী
বারি পেয়ারা-৪	২০১৭	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	৩০-৩৫	বহুবর্ষজীবী
বারি বাতাবি লেবু-১	১৯৯৭	-	১৪-১৬	বহুবর্ষজীবী
বারি বাতাবি লেবু-২	১৯৯৭	-	১২-১৪	বহুবর্ষজীবী
বারি বাতাবি লেবু-৩	২০০৩	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	২৫-৩০	বহুবর্ষজীবী
বারি বাতাবি লেবু-৪	২০০৪	-	১৫-২০	বহুবর্ষজীবী
বারি বাতাবি লেবু-৫	-	-	১০.০৩	বহুবর্ষজীবী
বারি কাগজী লেবু-১	২০১৮	মে থেকে নভেম্বর	৭১ টন	বহুবর্ষজীবী
বারি লেবু-১	১৯৯৬	জুন-জুলাই, অক্টোবর-নভেম্বর	১০-১৫	বহুবর্ষজীবী
বারি লেবু-২	১৯৯৬	সারা বছর	১০-১২	বহুবর্ষজীবী
বারি লেবু-৩	১৯৯৭	সারা বছর	-	বহুবর্ষজীবী
বারি লেবু-৪	২০১৮	সারা বছর	৭৮ টন	বহুবর্ষজীবী
বারি লেবু-৫	২০১৮	-	-	বহুবর্ষজীবী
বারি নারিকেল-১	১৯৯৬	এপ্রিল- মে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর	১৩-১৫	বহুবর্ষজীবী
বারি নারিকেল-২	১৯৯৭	মার্চ- মে সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	১৪-১৬	বহুবর্ষজীবী
বারি আমড়া-১	২০০৩	সারা বছর	১৫-১৭	বহুবর্ষজীবী
বারি আমড়া-২	২০০৭	সারা বছর	১৬-১৮	বহুবর্ষজীবী
বারি আমলকি -১	২০১১	খরিফ-রবি (মে-জুন ও নভেম্বর-ডিসেম্বর)	২৫-৩০	বহুবর্ষজীবী

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি বিলাতী গাব-১	২০১১	খরিফ (আগস্ট-সেপ্টেম্বর)	৩০-৩৫	বহুবর্ষজীবী
বারি সফেদা-১	১৯৯৬	সারা বছর	২০-২৫	বহুবর্ষজীবী
বারি সফেদা-২	২০০৩	মধ্য-ডিসেম্বর থেকে মধ্য-এপ্রিল	২০-২২	বহুবর্ষজীবী
বারি সফেদা-৩	২০০৯	রবি (অক্টোবর-নভেম্বর ও জানুয়ারি-এপ্রিল)	৩০-৩৫	বহুবর্ষজীবী
বারি কুল-১ (নারকেলী কুল)	২০০৩	রবি (ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় থেকে শেষ সপ্তাহ)	১০-১৫	বহুবর্ষজীবী
বারি কুল-২ (খাসার কুল)	২০০৩	---	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী
বারি কুল-৩	২০০৯	রবি (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি)	২২-২৫	বহুবর্ষজীবী
বারি কুল-৪	২০১৩	রবি (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি)	৫৫-৬০	বহুবর্ষজীবী
বারি আঁশফল-১	১৯৯৭	খরিফ	৩-৪	বহুবর্ষজীবী
বারি আঁশফল-২	২০০৯	খরিফ (আগস্ট)	৮-১০	বহুবর্ষজীবী
বারি কামরাঙ্গা-১	২০০৭	প্রায় সারা বছর	৩৫	বহুবর্ষজীবী
বারি কামরাঙ্গা-২	২০০৯	প্রায় সারা বছর	৫০-৫৫	বহুবর্ষজীবী
বারি তেঁতুল -১	২০০৯	রবি (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী
বারি রাম্বুতান-১	২০০৯	খরিফ (জুলাই)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী
বারি লিচু-১	১৯৯৬	খরিফ (মে)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী
বারি লিচু-২	১৯৯৬	খরিফ (মে মাসের শেষ সপ্তাহ-জুনের প্রথম সপ্তাহ)	৫-৬	বহুবর্ষজীবী
বারি লিচু-৩	১৯৯৬	খরিফ (মে মাসের শেষ সপ্তাহ-জুনের প্রথম সপ্তাহ)	৫-৬	বহুবর্ষজীবী
বারি লিচু-৪	২০০৮	খরিফ (জুনের প্রথম থেকে দ্বিতীয় সপ্তাহ)	১০-১২	বহুবর্ষজীবী
বারি লিচু-৫	২০১২	খরিফ (১-১৫ জুন)	৮-১০	বহুবর্ষজীবী
বারি জামরুল-১	১৯৯৭	খরিফ (এপ্রিল-মে)	২০	বহুবর্ষজীবী
বারি জামরুল-২	২০১২	খরিফ (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল-জুলাই)	৪৫-৫০	বহুবর্ষজীবী
বারি জামরুল-৩	-	খরিফ (এপ্রিল-মে)	৬.৬	বহুবর্ষজীবী
বারি মিষ্টি লেবু-১	২০১২	রবি (ডিসেম্বর-জানুয়ারি)	৩৮	বহুবর্ষজীবী
বারি মিষ্টি লেবু-২	২০১২	রবি (ডিসেম্বর-জানুয়ারি)	৩৮	বহুবর্ষজীবী
বারি কমলা-১	১৯৯৬	-	২০-২৫	বহুবর্ষজীবী
বারি কমলা-২	২০১৩	খরিফ-রবি (নভেম্বর-ডিসেম্বর)	৫০০ কেজি (৪-৫ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী
বারি কমলা-৩	২০১৭	খরিফ-রবি (নভেম্বর-ডিসেম্বর)	৫.৩৬	বহুবর্ষজীবী
বারি মাল্টা-১ (মুসাম্বি)	২০০৪	অক্টোবর-ডিসেম্বর	১৮-২০	বহুবর্ষজীবী
বারি মাল্টা-২	২০১৮	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর	১৪.৭ টন	বহুবর্ষজীবী
বারি স্ট্রবেরি-১	২০০৭	নভেম্বর-মার্চ	১০-১২	বর্ষজীবী
বারি স্ট্রবেরি-২	২০১৪	মধ্য ডিসেম্বর-মধ্য মে	২০-২৫	বর্ষজীবী
বারি স্ট্রবেরি-৩	২০১৪	ডিসেম্বর-এপ্রিল	২০-২৫	বর্ষজীবী
বারি ড্রাগন ফল-১	২০১৪	জুন-ডিসেম্বর	১৫-২০ (৪-৫ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী
বারি জলপাই-১	২০১৪	মধ্য নভেম্বর-নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে	১৫-২০ (৬ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি কদবেল-১	২০১৪	অক্টোবর-নভেম্বর	৫-৮ (৬ বছরের গাছে)	বহুবর্ষজীবী
বারি বেল-১	২০১৫	মধ্য মার্চ থেকে মধ্য জুন	৩৪ কেজি গাছ প্রতি (গাছের বয়স-৬ বছর)	বহুবর্ষজীবী
বারি সাতকরা-১	২০০৪	রবি (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর)	১০	বহুবর্ষজীবী
বারি তৈকর-১	১৯৯৬	সারা বছর	৭০-৭৫	বহুবর্ষজীবী
বারি লটকন-১	২০০৮	জুলাই-আগস্ট	১৮	বহুবর্ষজীবী

মসলা ফসল

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি মরিচ-১	২০০১	সারা বছর	১০-১২ (কাঁচা) ২.৫-৩.০ (শুকনা)	১২০-১৫০
বারি মরিচ-২	২০১৩	গ্রীষ্মকালীন	২০-২২ (কাঁচা)	২৪০-২৫০
বারি মরিচ-৩	২০১৩	শীতকালীন	৮-১০ (পাকা)	১৬০-১৯০
বারি পেঁয়াজ-১	১৯৯৬	শীতকালীন	১২-১৮ (কন্দ)	১২০-১৩৫
বারি পেঁয়াজ-২	২০০০	গ্রীষ্মকালীন	১২-১৪ (কন্দ)	৯০-১০৫
বারি পেঁয়াজ-৩	২০০০	গ্রীষ্মকালীন	১৪-১৮ (কন্দ)	৯০-১০৫
বারি পেঁয়াজ-৪	২০০৮	শীতকালীন	১২-১৬ (কন্দ)	১২০-১৩৫
বারি পেঁয়াজ-৫	২০০৮	গ্রীষ্মকালীন	১৬-২২	৯০-১০৫
বারি রসুন-১	২০০৪	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর-মার্চ)	৬-৭	১৩৫-১৫০
বারি রসুন-২	২০০৬	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর-মার্চ)	৭-৮	১৩৫-১৫০
বারি রসুন-৩	২০১৬	শীতকালীন	১০-১১ টন	১৩৬-১৪০
বারি রসুন-৪	২০১৬	শীতকালীন	৮-৯ টন	১৩০-১৪০
বারি হলুদ-১ (ডিমলা)	১৯৯৬	এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি	২৮-৩২ (কাঁচা)	২৭০-২৮০

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি হলুদ-২ (সিঁন্দুরী)	১৯৯৬	এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি	২৫-২৮ (কাঁচা)	২৭০-২৮০
বারি হলুদ-৩	২০০০	এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি	২৫-৩০ (কাঁচা)	২৭০-২৯০
বারি হলুদ-৪	২০১৩	মধ্য এপ্রিল-মধ্য ফেব্রুয়ারি	২৮-৩০ (কাঁচা)	২৭০-২৯০
বারি হলুদ-৫	২০১৩	মধ্য এপ্রিল-মধ্য ফেব্রুয়ারি	১৮-২০ (কাঁচা)	২৭০ -৩০০
বারি আদা-১	২০০৯	এপ্রিল-ফেব্রুয়ারি	৩০-৩২ (কাঁচা)	২৭০-৩০০
বারি আদা-২	২০১৭	জানুয়ারি শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি	৩৭.৯৯ টন	৩০০-৩১৫
বারি আদা-৩	২০১৭	জানুয়ারি শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি	২৯.০৫ টন	৩০০-৩১০
বারি ধনিয়া-১	১৯৯৬	শীতকালীন (নভেম্বর-মার্চ)	৩.৫-৪.০ (পাতা) ১.৭-২.০ (বীজ)	১২০-১৩৫
বারি ধনিয়া-২	২০১৬	শীতকালীন	১.৮-২.৪ টন	১৩৫-১৪০
বারি বিলাতি ধনিয়া-১	২০১৩	সারা বছর	৩০-৫০ (পাতা) ৩০০-৪০০ কেজি (বীজ)	১৫০-২৮০
বারি কালজিরা-১	২০০৯	শীতকালীন (নভেম্বর-মার্চ)	০.৮-১.০	১২০-১৩৫
বারি মেথী-১	২০০০	শীতকালীন (নভেম্বর-মার্চ)	১.২-১.৫	১২০-১৩৫
বারি মেথী-২	২০০৬	শীতকালীন (মধ্য অক্টোবর-মার্চ)	১.৮-২.১ কেজি	১২০-১৩৫
জৈন্তা গোলমরিচ	১৯৮৮	বহুবর্ষী ফসল	২-২.২৫ কেজি/ গাছ (প্রতি বছর)	বহুবর্ষী উদ্ভিদ
বারি পান-১	১৯৯৬	বহুবর্ষী ফসল	৩৬ লক্ষ পাতা	বহুবর্ষী উদ্ভিদ
বারি পান-২	১৯৯৬	বহুবর্ষী ফসল	৪০ লক্ষ পাতা	বহুবর্ষী উদ্ভিদ
বারি পান-৩	২০১৭	বহুবর্ষী ফসল	৩২ লক্ষ পাতা	বহুবর্ষী উদ্ভিদ
বারি আলুবোখারা-১	২০১৩	ফেব্রুয়ারি-জুন	৭.০৩	বহুবর্ষী উদ্ভিদ

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি পাতা পেঁয়াজ-১	২০১৪	সারা বছর	১০-১৩ (পাতা) ৪২০-১৩৪০ কেজি /হেক্টর (বীজ)	৩৬০-৩৬৫
বারি মৌরি-১	২০১৬	শীতকালীন	১.৫-২.১ টন	১৪০ -১৫০
বারি মৌরি-২	২০১৬	শীতকালীন	১.৬-১.৮ টন	১৩০-১৪০
বারি দারুচিনি-১	২০১৭	ডিসেম্বর থেকে মার্চ	৩৮৫ কেজি	বহুবর্ষী উদ্ভিদ
বারি তেজপাতা-১	২০১৮	সারা বছর	গাছ প্রতি ৩০-৩৪ কেজি	বহুবর্ষী উদ্ভিদ
বারি একাঙ্গী-১	২০১৮	জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারি	১২-১৫ টন	৯-১০ মাস বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ
বার চিভ-১	২০১৮	এপ্রিল-মে	১০-১২ টন	৬৫-৭০ দিন

কন্দাল ফসল

আলু

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি আলু-১ (হীরা)	১৯৯০	রবি	২৫-৪০	৭৫-৮৫
বারি আলু-২ (মরিনি)	১৯৯০	রবি	২৫-৩০	৮০-৮৫
বারি আলু-৩ (অরিগো)	১৯৯০	রবি	২৫-৩০	৮০-৮৫
বারি আলু-৪ (আইলসা)	১৯৯৩	রবি	২৫-৩০	৮০-৮৫
বারি আলু-৫ (প্যাট্রোনিস)	১৯৯৩	রবি	২০-৩০	৮০-৮৫
বারি আলু-৬ (মুল্টা)	১৯৯৩	রবি	২৫-৩৫	৮০-৮৫
বারি আলু-৭ (ডায়ামন্ট)	১৯৯৩	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-৮ (কার্ডিনাল)	১৯৯৩	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-৯ (মন্ডিয়াল)	১৯৯৩	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-১০ (কুফরী সন্দুরী)	১৯৯৩	রবি	২০-৩০	১০০-১০৫
বারি আলু-১১ (চমক)	১৯৯৩	রবি	২০-৩৫	৮০-৮৫
বারি আলু-১২ (ধীরা)	১৯৯৩	রবি	২০-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-১৩ (গ্রানোলা)	১৯৯৪	রবি	২০-৩০	৮৫-৯৫
বারি আলু-১৪ (ক্লিওপেট্রা)	১৯৯৪	রবি	২৫-৩০	৯০-৯৫
বারি আলু-১৫ (বিনেলা)	১৯৯৪	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-১৬ (অরিভা)	২০০০	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-১৭ (রাজা)	২০০০	রবি	২৫-৩০	৯০-৯৫
বারি আলু-১৮ (বারাকা)	২০০৩	রবি	২৫-৩০	৯০-৯৫
বারি আলু-১৯ (বিন্টজে)	২০০৩	রবি	২০-২৫	৯০-৯৫
বারি আলু-২০ (জারলা)	২০০৩	রবি	২৫-৩০	৮৫-৯৫
বারি আলু-২১ (প্রাভেন্টো)	২০০৪	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-২২ (সৈকত)	২০০৪	রবি	২৫-৩০	৮৫-৯৫
বারি আলু-২৩ (আল্ট্রা)	২০০৫	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-২৪ (ডুরা)	২০০৫	রবি	২৫-৩৫	৮৫-৯০
বারি আলু-২৫ (এসটারিক্স)	২০০৫	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-২৬ (ফেলসিনা)	২০০৬	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-২৭ (স্পিরিট)	২০০৮	রবি	২৫-৩৫	৮৫-৯০
বারি আলু-২৮ (লেডি রোসেটা)	২০০৮	রবি	২৫-৩০	৮৫-৯০
বারি আলু-২৯ (কারেজ)	২০০৮	রবি	২০-২৬	৮৫-৯০

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি আলু-৩০ (মেরিডিয়ান)	২০০৯	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-৩১ (সাগিটা)	২০১০	রবি	৩০-৪০	৯০-৯৫
বারি আলু-৩২ (কুইন্সি)	২০১০	রবি	৩০-৪০	৯০-৯৫
বারি আলু-৩৩ (আলমিরা)	২০১১	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-৩৪ (লরা)	২০১১	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-৩৫	২০১২	রবি	৩০-৪৫	৯০-৯৫
বারি আলু-৩৬	২০১২	রবি	৩০-৪০	৯০-৯৫
বারি আলু-৩৭	২০১২	রবি	৩০-৪০	৯০-৯৫
বারি আলু-৩৮	২০১২	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-৩৯	২০১২	রবি	২৫-৩৫	৯০-৯৫
বারি আলু-৪০	২০১২	রবি	৩৫-৫৫	৯০-৯৫
বারি আলু-৪১	২০১২	রবি	৩৮-৪৪	৯০-৯৫
বারি আলু-৪২	২০১২	রবি	২৫-৪০	৯০-৯৫
বারি আলু-৪৩	২০১২	রবি	২৫-৫০	৯০-৯৫
বারি আলু-৪৪	২০১২	রবি	২৫-৫০	৯০-৯৫
বারি আলু-৪৫	২০১২	রবি	২৫-৫০	৯০-৯৫
বারি আলু-৪৬	২০১৩	রবি	৩০-৪০	৯০-৯৫
বারি আলু-৪৭	২০১৪	রবি	৪৫.১৪ (৩২.৩৬-৬৩.০৬)	৯০-৯৫
বারি আলু-৪৮	২০১৪	রবি	৪৩.৪২ (২৬.০৫-৬২.৪১)	৯০-৯৫
বারি আলু-৪৯	২০১৪	রবি	৪৬.৪৫ (২৫.৩২-৬৬.১১)	৯০-৯৫
বারি আলু-৫০	২০১৪	রবি	৪৬.৫৯ (৩৪.৫২-৬২.৮৭)	৯০-৯৫

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি আলু-৫১	২০১৪	রবি	৪০.৫২ (৩৬.৬৯-৪৭.৩১)	৯০-৯৫
বারি আলু-৫২	২০১৪	রবি	৪৩.৭৯ (৩০.৬৭-৫৩.২৪)	৯০-৯৫
বারি আলু-৫৩	২০১৪	রবি	৩২-৩৪	৯০-৯৫
বারি আলু-৫৪	২০১৪	রবি	৪১.১৯ (২৫.৫৯-৫৭.৫১)	৯০-৯৫
বারি আলু-৫৫	২০১৪	রবি	৩০-৩৩	৯০-৯৫
বারি আলু-৫৬	২০১৪	রবি	৩৬.৬৭ (২৯.৬৪-৪৫.০১)	৯০-৯৫
বারি আলু-৫৭	২০১৪	রবি	৩৭.৭৪ (২৯.৩৪-৪৫.২৪)	৯০-৯৫
বারি আলু-৫৮	২০১৪	রবি	৪৪.৬১ (৪২.৪৬-৪৬.৬৩)	৯০-৯৫
বারি আলু-৫৯	২০১৪	রবি	৪৩.৫৩ (৩৯.২৪-৪৮.৮৮)	৯০-৯৫
বারি আলু-৬০	২০১৪	রবি	৪২.০৫ (৩৫.৭৯-৪৮.২৯)	৯০-৯৫
বারি আলু-৬১	২০১৪	রবি	৩৯.৯৬ (৩৬.৪৪-৪৩.৫৭)	৯০-৯৫
বারি আলু-৬২	২০১৫	রবি	৪৩.৭০ (৩৫.৭৮-৫৬.৩২)	৯০-৯৫
বারি আলু-৬৩	২০১৫	রবি	৪৩.২৯ (৩২.৩০-৫১.৬৭)	৯০-৯৫
বারি আলু-৬৪	২০১৫	রবি	৩৭.৩১ (৩১.১৩-৪৮.৮৯)	৯০-৯৫
বারি আলু-৬৫	২০১৫	রবি	৩৬.৯৩ (২৯.৪৮-৪৭.৭৮)	৯০-৯৫
বারি আলু-৬৬	২০১৫	রবি	৩৪.৪০ (২৫.৫২-৪৬.০৬)	৯০-৯৫
বারি আলু-৬৭	২০১৫	রবি	৩৩.০৬ (২৬.৪৪-৪২.৬৮)	৮৫-৯০
বারি আলু-৬৮	২০১৫	রবি	৩১.৭২ (১৯.১৫-৪৫.৫১)	৮৫-৯০

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি আলু-৬৯	২০১৬	রবি	৩৮.২৪ (২৫.৯৯-৫৭.৫৫)	৮০-৮৫
বারি আলু-৭০	২০১৬	রবি	৩২.১৬ (২৮.৬৬-৩৮.২৯)	৮৫-৯০
বারি আলু-৭১	২০১৬	রবি	২৯.৬৪ (২২.৯৪-৩৮.৭১)	৯০-৯৫
বারি আলু-৭২	২০১৬	রবি	১১.৩২-৩৭.৫৩	৯০-৯৫
বারি আলু-৭৩	২০১৬	রবি	১১.৩২-৩৭.৫৩	৮৫-৯০
আলু-৭৪	২০১৭	রবি	২২.৪০-৪০.৬৩	৯০-৯৫
আলু-৭৫	২০১৭	রবি	২৩.৬২-৫৩.২৩	৭০-৭৫
আলু-৭৬	২০১৭	রবি	২৭.৭৪ -৪৪.৪০	৯০-৯৫
আলু-৭৭	২০১৭	রবি	২৭.৯৫-৪২.৪৭	৯০-৯৫
আলু-৭৮	২০১৭	রবি	৩৩.৯৮-৬১.৩৫	৮৫-৯০
আলু-৭৯	২০১৭	রবি	৩৫.২৩-৫৪.৪৯	৮৫-৯০
বারি টিপিএস-১	১৯৯৭	রবি	সিডলিং টিউবার ৪৫-৬০ আলু ২৫-৪০	১০০-১০৫
বারি টিপিএস-২	১৯৯৭	রবি	সিডলিং টিউবার ৪৫-৬০ আলু ২৫-৪০	১০০-১০৫

মিষ্টি আলু

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি মিষ্টি আলু-১ (তৃপ্তি)	১৯৮৬	রবি	৪০-৪৫	১৪০-১৫০
বারি মিষ্টি আলু-২ (কমলাসুন্দরী)	১৯৮৬	রবি	৪০-৪৫	১৪০-১৫০
বারি মিষ্টি আলু-৩ (দৌলতপুরী)	১৯৮৮	রবি	৩০-৩৫	১৪০-১৫০
বারি মিষ্টি আলু-৪	১৯৯৪	রবি	৩০-৩৫	১২০-১৩৫
বারি মিষ্টি আলু-৫	১৯৯৪	রবি	৩০-৩৫	১২০-১৩৫
বারি মিষ্টি আলু-৬ (লাল কুঠি)	২০০৪	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫
বারি মিষ্টি আলু-৭ (কাল মেঘ)	২০০৪	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫
বারি মিষ্টি আলু-৮	২০০৮	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫
বারি মিষ্টি আলু-৯	২০০৮	রবি	৪০-৪৫	১২০-১৩৫
বারি মিষ্টি আলু-১০	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১২০-১৩০
বারি মিষ্টি আলু-১১	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১২০-১৩০
বারি মিষ্টি আলু-১২	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১২০-১৩০
বারি মিষ্টি আলু-১৩	২০১৩	রবি	৩৫-৪০	১৩০-১৪০
বারি মিষ্টি আলু-১৪	২০১৮	রবি	৩০-৪০	১২০-১৩০
বারি মিষ্টি আলু-১৫	২০১৮	রবি	৩০-৪০	১২০-১৩০

কচু

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি মুখী কচু-১ (বিলাসী)	১৯৮৮	খরিফ	২৫-৩০	১৮০-২০০
বারি মুখী কচু-২	২০১৩	খরিফ	৩০-৩৫	১৮০-২০০
বারি পানি কচু-১ (লতিরাজ)	১৯৮৮		২৫-৩০ (লতি) ১৫-২০ (রাইজোম)	১৮০-২৭০
বারি পানিকচু-২	২০০৪	খরিফ	২৫-৩০ (লতি) ১৮-২২ (রাইজোম)	২৫০-৩০০
বারি পানি কচু-৩	২০০৮	খরিফ	১০-১২ (লতি) ২৫-৩০ (রাইজোম)	২৫০-৩০০
বারি পানি কচু-৪	২০১৩	খরিফ	৫-৮ (লতি) ৩৫-৪৫ (রাইজোম)	২৫০-৩০০
বারি পানি কচু-৫	২০১৩	খরিফ	৫-৭ (লতি) ৪০-৪৫ (রাইজোম)	২৫০-৩০০
বারি পানি কচু-৬	২০১৭	খরিফ	৬-৭ (লতি) ৮০-৯০ (রাইজোম)	২৫০-৩০০

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি ফলন (টন)	জীবনকাল (দিন)
বারি ওলকচু-১	২০১৮	-	৪৫-৫৫	২১০-২৭০
বারি ওলকচু-২	২০১৮	-	৩৫-৪৫	২১০-২৭০

ফুল ফসল

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি স্টিক	জীবনকাল (দিন)
বারি অর্কিড-১	২০০৩	মার্চ-মে	১,৯০,০০০ - ২,০০,০০০	মৌসুমী ৯০
বারি গ্লাডিওলাস-১	২০০৩	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভাল হয়	১,৭৫,০০০ - ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমী ১২০-১৫০
বারি গ্লাডিওলাস-২	২০০৩	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভাল হয়	১,৭৫,০০০ - ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমী ১২০-১৫০
বারি গ্লাডিওলাস-৩	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভাল হয়	১,৭৫,০০০ - ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমী ১২০-১৫০
বারি গ্লাডিওলাস-৪	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভাল হয়	১,৭৫,০০০ - ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমী ১২০-১৫০
বারি গ্লাডিওলাস-৫	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভাল হয়	১,৭৫,০০০ - ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমী ১২০-১৫০
বারি গ্লাডিওলাস-৬	২০১৬	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে ভাল হয়	১,৭৫,০০০ - ২,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর	মৌসুমী ১২০-১৫০
বারি চন্দ্রমল্লিকা-১	২০০৯	রবি মৌসুম	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-৩০ টি	মৌসুমী ১২০-১৫০
বারি চন্দ্রমল্লিকা-২	২০০৯	রবি	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২৫ টি	মৌসুমী ১২০-১৫০ দিন

জাতের নাম	অবমুক্তির সাল	উৎপাদনের মৌসুম	হেক্টরপ্রতি স্টিক	জীবনকাল (দিন)
বারি চন্দ্রমল্লিকা-৩	২০০৯	রবি	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২৫ টি	মৌসুমী ১২০-১৫০ দিন
বারি চন্দ্রমল্লিকা-৪	২০১৬	রবি মৌসুম	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২৫ টি	মৌসুমী ১২০-১৫০
বারি জারবেরা-১	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে বেশি ভাল হয়	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ১৮-২০ টি	বহু বর্ষজীবী হার্ব, সারা বছর
বারি জারবেরা-২	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে বেশি ভাল হয়	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ২০-২২ টি	বহু বর্ষজীবী হার্ব, সারা বছর
বারি এ্যানথুরিয়াম-১	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে রবি মৌসুমে বেশি ভাল হয়	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ৫-৬টি	বহু বর্ষজীবী হার্ব, সারা বছর
বারি ডালিয়া-১	২০০৯	রবি মৌসুম	গাছ প্রতি ফুলের সংখ্যা প্রায় ১৪ -১৫ টি	মৌসুমী ১২০-১৩০
বারি লিলি-১	২০০৯	গ্রীষ্মকালীন	প্রতিটি গাছে ফুলের সংখ্যা থাকে প্রায় ৫-৬টি	মৌসুমী ১২০-১৩০ দিন
বারি এলপিনিয়া-১	২০০৯	প্রায় সারা বছর তবে গ্রীষ্ম মৌসুমে বেশি ভাল হয়	প্রতি গাছে ফুলের সংখ্যা বছরে প্রায় ১০ -১২ টি	বহু বর্ষজীবী, সারা বছর
বারি গাঁদা-১	২০০৯	গ্রীষ্মকালীন	৫.০ - ৫.৫ লাখ	মৌসুমী ১০০-১২০
বারি রজনিগন্ধ্যা-১	২০১৬	প্রায় সারা বছর তবে খরিফ মৌসুমে বেশি ভাল হয়	৫,০০,০০০ স্টিক/হেক্টর।	বহু বর্ষজীবী, সারা বছর

নোট

Editorial & Publication
Training & Communication Wing
Bangladesh Agricultural Research Institute
Joydebpur, Gazipur-1701, Bangladesh
Phone: 02 49270038
E-mail: editor.bjar@gmail.com